সাহিত্য
ও
সংস্কৃতি
বিষয়ক
দ্বিমাসিক

এক্ষণ

দ্বিতীয় বর্ষ
প্রথম সংখ্যা

সম্পাদক
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
নির্মাল্য আচার্য

কমলকুমার মজুমদার
লিখিত 'অন্তর্জলী যাত্রা'
আগামী শ্রাবণের সংখ্যায়
প্রকাশিত হচ্ছে। উদ্ভ্রান্ত
লেখা—বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়
প্রকাশিত কয়েকটি সুবিখ্যাত
পত্রের সংকলন—আমরা
প্রকাশ করছি। শেষোক্ত
বইটি আমরা আশা করি
ভাদ্রমাসে প্রকাশিত হবে।

কথা শিল্প প্রকাশ
১২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা বারো

দ্বিতীয় বর্ষ

এক্ষণ

প্রথম সংখ্যা

॥ সূচীপত্র ॥

প্রবন্ধ

ওজো রূপ ও রীতি

অনুবাদ

ওথেলো

পুনর্মুদ্রণ

ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত — প্যারীচাঁদ মিত্র

প্রবন্ধ

পশ্চিমের ঘাটে — শান্তি বসু

অগাস্টাস ডি. ঈয়েটস : জীবনের কবি — ডেভিড ম্যাকব্রাটনিয়ন

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় — নির্মাল্য আচার্য

পত্রিকা প্রসঙ্গে

'একক' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো। আমাদের শুভানুধ্যায়ী সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক ডঃ জীবেন্দ্র সিংহরায়। ঐ বিষয়ে একটি দীর্ঘ লেখার এটি প্রস্তাবনা। উইলিয়ম শেক্সপীয়রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'ওথেলো' অনুবাদ করেছেন শ্রীসুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে এক একটি অঙ্কে সমগ্র নাটকটি প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। শেক্সপীয়র-অনুবাদে শ্রীচট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল নিরত রয়েছেন। ইতিপূর্বে তাঁর 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' ও 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে। বাংলা ভাষায় শেক্সপীয়র-অনুবাদের তথা অনুবাদ-চর্চার সার্থকতা বিষয়েও অদূর ভবিষ্যতে আলোচনা প্রকাশ করা হবে। এই মুহূর্তে কর্মে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সাফল্য-অসাফল্য বিষয়ে আমরা উৎসাহী পাঠকদের মতামত বিশেষভাবে আহ্বান করছি।

প্রত্যেক সংখ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা পুনর্মুদ্রণ করার পরিকল্পনা আমাদের আছে। প্রথম বছরের পত্রিকার কয়েকটি পুনর্মুদ্রণ পাঠকদের বিশেষ সমর্থন পাওয়ায় আমরা আরও উৎসাহ বোধ করছি।

য়ুরোপের দর্শন, রাজনীতি ও সাহিত্যে যে হতাশা ও অবক্ষয়ের চিহ্ন পড়েছে সে বিষয়ে একটি আলোচনার সূত্রপাত করেছেন কবি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শ্রীশান্তি বসু। এ বিষয়েও পাঠকদের চিন্তাশীল ও যুক্তিপূর্ণ মতামত আমরা আশা করি।

এ সংখ্যায় সর্বশেষ প্রবন্ধটি লিখেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ডেভিড ম্যাকুতাচিয়ন। কবি ইয়েট্‌স সম্পর্কে বাঙালী পাঠকদের আগ্রহ থাকা নানা কারণে স্বাভাবিক। প্রবন্ধটি ইংরাজিতেই তিনি আমাদের লিখে দিয়েছিলেন। সেটি এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হলো।

পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন বিষয়ে মতামত ও সমালোচনা সর্বদাই পাঠকদের কাছে আশা করা যায়। এ অঙ্কে বিশেষ ঘোষণা বাহুল্য। ইতিপূর্বেও আমরা তা জানিয়েছি।

এই সংখ্যার কয়েকটি প্রসঙ্গে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই 'সাহিত্য পত্র' কর্তৃপক্ষ ও কবি শ্রীঅরুণ মিত্রকে।

ওডের রূপ ও রীতি

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

'ওড্' এক জাতীয় লিরিক কবিতা। প্রাচীন কালে বীণাযন্ত্র (lyre) সহযোগে যে কাব্যসঙ্গীত গীত হত, তারই নাম ছিল 'লিরিক'।১ কালক্রমে এই সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটে; কারণ বীণাযন্ত্রের সাহায্যে লিরিক গাওয়ার রীতি উঠে যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সঙ্গীত থেকে উদ্ভূত লিরিক তার গীতাত্মক ধর্ম আজও কম-বেশি বহন করে চলেছে। ওড্ শব্দটিরও বাচ্যার্থ হচ্ছে 'সঙ্গীত'। প্রাচীন গ্রীসে সঙ্গীত হিসেবে গাওয়ার জন্য যে কাব্যগীতি লেখা হত, তাকেই ওড্ বলা হত।২

ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ কবিতা তথা ওড্ রচনা করা গ্রীকদের রীতি ছিল। তার কারণও আছে। গ্রীকরা ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে যতখানি সচেতন ছিল, নৃত্য-গীত-সঙ্গীত সম্পর্কে তার চেয়ে কম সচেতন ছিল না—এগুলি ছিল তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গম্ভীর ধর্মকৃত্য থেকে শুরু করে দৈনন্দিন গৃহস্থালি পর্যন্ত প্রায় সকল ব্যাপার উপলক্ষেই তারা নৃত্যগীতাদির আয়োজন করত। শুধু তা-ই নয়, এই নৃত্যগীতের ক্ষেত্রে তারা গতানুগতিকতাও ছিল না। জাতীয় ইতিহাসের পরিণতির পথে মহাযাত্রী সূর্যকরণের জন্য অ্যাপোলোর কাছে পূজার্চনা দেওয়ার সময় যে ধরণের সঙ্গীত, নৃত্য ও গীতের ব্যবস্থা করা হত, বিবাহানুষ্ঠান উপলক্ষে নিশ্চয়ই সেই ধরণের নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থা করা হত না।৩ সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সমবেত সঙ্গীত-নৃত্য-গীত যেমন গ্রীকদের জীবনের অপরিহার্য অংশ ছিল, তেমনি তাতে বৈচিত্র্যও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।

যুগের পর যুগ ধরে সমবেত নৃত্যগীতাদির এই ঐতিহ্যের ধারা চলেছিল। কিন্তু এদের অন্তর্গত সঙ্গীত কি ধরণের ছিল তা আজ নিশ্চয় করে বলা কঠিন। পরবর্তী কালের পণ্ডিত ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের লেখায় তাদের সংক্ষিপ্ত অংশ মাত্র উদ্ধৃত হয়েছে। তবে সেই অংশগুলিরও রচনাকাল নির্ণয় করা বা তাদের আদি রূপ বজায় আছে কিনা সে-সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত করা দুঃসাধ্য।

প্লুটার্ক 'গ্রীক কোশ্চেন্‌স্'-এ ইলীয় রমণীদের প্রার্থনায় (ডায়োনিসাসের কাছে) যে উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন, তা হচ্ছে—

Come, hero Dionysus,
Come to the Eleans' shrine,
To our holy shrine with the Graces,
Raging hither with ox's hoof
O goodly bull,
O goodly bull.

কিংবা রোডসের দোয়ারো-বেশধারী বালক-বালিকাদের গীত বসন্তকালীন ভিক্ষা-সঙ্গীত হচ্ছে—

Will you give us? Or shall we go?
If you will,—why, rest you so;
But and if you shall say us nay,
Then we will carry the door away,
Or the lintel above it, or, easiest of all,
Your wife within, for she is but small.
Give us our need
And take God speed.
Open the door to the swallow, then,
For we are children and not old men. ৪

এই জাতীয় অনুচ্ছেদগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সূচনা-পর্বের সঙ্গীতগুলি সরল ও জনপ্রিয় ছিল। তবে সেই সূচনা থেকে কালক্রমে গ্রীক কাব্য-সাহিত্যের এক জটিল ও বিস্তৃত রূপ গড়ে ওঠে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর কোরাল সঙ্গীত হচ্ছে তারই উদাহরণ। আর এই কোরাল সঙ্গীত জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি ছিল না, তা পেশাদারী কবিদের সচেতন শিল্পসৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পিণ্ডার প্রমুখ কবিরা কোরাল সঙ্গীত রচনাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অভিজাত পুরোহিত বংশের সন্তান; যুবক বয়সে বাঁশি বাজাতে শেখেন এবং এথেন্সে কোরাল সঙ্গীত রচনার কলাকৌশল সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। শুধু তা-ই নয়, গ্রীসের সকল স্থান থেকে তাঁর কাছে ডাক আসত এবং তিনি অর্থের বিনিময়ে সকল

রঙ্গমের অনুষ্ঠানের উপযোগী কোরাল সঙ্গীত রচনা করে দিতেন। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, প্রথমে জনকণ্ঠে অনায়াস রচনা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও কোরাল সঙ্গীত কালক্রমে 'গুরুগম্ভীর ও অর্থবহুল শিল্পবিচারে পরিণত হয়। পিণ্ডার নিজেই বলেছেন—

For then was the Muse not yet a lover of gain, nor a hireling was she.
Nor then honey-throated Terpsichore sold the melting melody
Of her lays, nor with faces silver-masked did they tread the stage.
But now she biddeth us heed the word of the Argive sage
Which cometh all too near to the truth in this our age:
'T is money, 'tis money that maketh the man!' he said,
When his friends forshook him so soon as his wealth had fled. ৪

পিণ্ডারের সঙ্গীতাবলীর মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি মাত্র টিঁকে আছে এবং উত্তর-পুরুষের কাছে এসে পৌঁছেছে। অন্যান্য কবিদের রচনার কিছু কিছু অংশ পাওয়া গেলেও পিণ্ডারের সঙ্গীতই এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। পিণ্ডার ও অন্যান্য কবির রচনার তুলনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়—'...all these examples are variations of one and the same type which developed from simplicity to elaboration, and changed in tone and outlook as it was affected by different circumstances or the personalities of different individuals, yet was uniform enough for it to be said that here again out of traditional beginnings there has emerged a single literary convention.'৬

যেহেতু কনভেনশন্ যেমনও কোরাসের গঠন ও গতিবিধি, অনুষ্ঠানের প্রকৃতি ও উপলক্ষ্য অনুযায়ী কোরাল সঙ্গীত কিছুটা বৈচিত্র্যধর্মী হত, সেইজন্য কোরাল গান বা কোরাল গুচ্ছ নাম সঙ্গীত-প্রকরণের অনেক অভিধা ছিল। আলেকজেন্দ্রীয় পণ্ডিতেরা বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, এক পিণ্ডারের গুচ্ছই

আটটি বিভিন্ন ঢঙের ছিল। তবে ওড্ যে ঢঙেরই হোক না কেন, তাদের মধ্যে একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। ওড্ প্রথমতঃ তিনটি স্তবকে বিভক্ত হত এবং সেই তিনটি স্তবককে যথাক্রমে স্ট্রোফি, অ্যান্টিস্ট্রোফি ও এপোড্ বলা হত। তিনটি স্তবক নিয়ে গঠিত এই কাব্যরূপের নাম ছিল ত্রিপাদ বা Triad। এক একটি ওডে এক বা একাধিক ত্রিপাদ থাকা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু প্রত্যেকটি ত্রিপাদের স্ট্রোফি ও অ্যান্টিস্ট্রোফির ছন্দ-মিলের পদ্ধতি এক ছিল এবং এক ত্রিপাদের এপোড্ ছিল অন্য ত্রিপাদগুলির এপোডের অনুরূপ। সুতরাং ক্লাসিক্যাল ওডের গঠন যে জটিল ধরণের ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর একটা কথা। স্ট্রোফি বা অ্যান্টিস্ট্রোফি বা এপোড্ রচনার আদর্শটি মূলতঃ সাঙ্গীতিক—কোরাস দলের গতিবিধির সঙ্গে যুক্ত। তারা প্রথমে বাম দিক থেকে স্ট্রোফি, পরে বিপরীত দিকে (অর্থাৎ ডান দিকে) ঘুরে অ্যান্টিস্ট্রোফি এবং সর্বশেষে এক স্থানে দাঁড়িয়ে এপোড্ গাইত। এই কারণেই জনসন স্ট্রোফি, অ্যান্টিস্ট্রোফি ও এপোড্‌কে বলেছেন যথাক্রমে turn, counter-turn ও stand।

আদিতে ওডের সঙ্গে যে সঙ্গীত ও নৃত্য জড়িত ছিল, বর্তমানে তার স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন। তবে ওড্-গীতের লিখিত ভাষা বিচার করলে তার ছন্দোরীতির জটিলতা সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। প্রথাসিদ্ধ সামগ্রিক গঠন ঠিক রেখেও কবিরা প্রত্যেক ওড্‌কে যথাসম্ভব নূতন ভাবে উপস্থিত করতেন —ছন্দ ও ছন্দঃস্পন্দ, বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে নূতন নূতন পরীক্ষায় ব্রতী হতেন।

কোর‍্যাল ওডের ভাষা কোন অঞ্চলের কথ্যভাষা ছিল না, নানা অঞ্চলের কথ্যভাষার বিচিত্র মিশ্রণে সেই এক প্রকারের কৃত্রিম ভাষায় এগুলি রচিত হত। ছন্দোরীতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি শব্দ ও প্রবচনাবলী, রূপক ও উপমা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ওডের কবিরা নিরন্তর পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। ফলে ওডের ভাষাও হয়ে দাঁড়িয়েছিল উচ্চগ্রামের ভাষা।

আর অন্তরঙ্গীন বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি কোর‍্যাল ওড্‌কে বিষয়ানুগ ও উপলক্ষ্যানুযায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা ছিল। অবশ্য বর্ণিতব্য বিষয়ের সঙ্গে পুরাণকথা ও কিংবদন্তী মিশিয়ে তবে তা পরিবেশন করা হত। সে যা-ই হোক, কালক্রমে কোর‍্যাল ওড্ দরদ থেকে বিষয়, প্রথানুগত থেকে অভিনব বিষয়-নির্ভর হয়ে পড়ে।

কোরাল ওডের ইতিহাসে পিণ্ডারের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁর ওডে ধর্ম ও নীতি, রূপক ও পৌরাণিক কাহিনীর অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। তুচ্ছ ও অনুন্নত ভাব নিয়েও কিভাবে উচ্চশ্রেণীর কাব্যগীতি রচনা করা যায়, তিনি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রেখে গিয়েছেন। তাঁর 'এপিনিকিয়ান্' বা 'বিজয়ী ওড্স' (Epinikian or Victory Odes) সবচেয়ে খ্যাত। অলিম্পিয়ান্, পিথিয়ান্, নেমিয়ান্ ও ইস্থ্মিয়ান্—এই চারখণ্ডে ওড্গুলি বিভক্ত। অলিম্পিয়া, ডেল্ফি, নেমিয়া ও করিন্থ নামক স্থানে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্য উপলক্ষ্যে এই চারখণ্ডের ওড্গুলি রচিত হয়েছিল। লক্ষণীয় এই যে, ওড্গুলি রচনার মূল প্রেরণা ছিল জনগণের আনন্দোৎসব ও ধর্মানুষ্ঠানে, ব্যক্তিগত ভাবানুভূতিতে নয়। কিন্তু এগুলি যতই 'বাজারে' রচনা হোক না কেন, তাদের মধ্যে কবি সম্ভাব্য সকল রূপকের কলাকৌশল, চিত্রাঙ্কনক্ষমতা, ভাষার প্রসাধনকলা ও অলঙ্করণশক্তি প্রয়োগ করেছেন। পিণ্ডার চিত্রের পর চিত্র, রূপকের পর রূপক সাজিয়ে যে কাব্যগীতি রচনা করেছেন, তা জনসাধারণের পক্ষে নয়—একমাত্র রসবেত্তাদের পক্ষেই অভিপ্রেত। তাঁর ওডে একটা বিশেষ সুর, আবহ ও বৃত্তিগুলি রয়েছে যা—যথার্থই উচ্চকোটির।

পিণ্ডারের কোরাল ওডের একটা উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক—

Glorious is the legend of Aiákos, glorious the fame by sea
of Aigína. By the gods' good will
the Dorian host of Hyllos
and Aigímios, there arriving,
founded her ; by their standards administered
her people live, transgressing
no right nor privilege of strangers ; for active achievement
they are dolphins in the sea : accomplished dispensers
of the Muses, and the games' endeavors.

—The Ninth Isthmian Ode.৭

কিন্তু এই কোরাল ওড্ ছাড়াও আরেক রকমের ওড্ গ্রীক সিরিকের ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাদের বলা হত মনস্তিক ওড্। একক কণ্ঠে গাওয়ার জন্য এই জাতীয় গীত রচিত হত। কোরাল ওড্ ধর্মগত ও

সমষ্টিগত হলেও লিরিক হয় ওড্, যদিও ছিল প্রায়-ধর্মনিরপেক্ষ ও ব্যক্তিগত। কোন ক্রমিক আন্তঃপ্রদেশীয় ভাষায় নয়, কবির আঞ্চলিক উপভাষায় যদিও রচনার প্রথা ছিল। কোরাল লিরিকের চেয়ে তা আকারে ছোট ও প্রকৃতিতে সরল হত। এই পার্থক্য সত্ত্বেও এই দুই জাতীয় ওডের উপস্থাপনার রূপ ও রীতিতে ভেদ নির্ণয় করা আজ পর্যন্ত সম্ভব নয়। সাফো, অ্যালসিউস, অ্যানাক্রিয়ন, সিমোনিডেস ইত্যাদির নাম যদিও আলোচনায় উল্লেখযোগ্য।

সাফোর একটি লিরিক যদি এখানে উদ্ধৃত করলে তাঁর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাবে—

Come to me from Crete to this holy temple,
Aphrodite. Here is a grove of apple
trees for your delight, and the smoking altars
fragrant with incense.
Here cold water rustles down through the apple
ranches; all the lawn is beset and darkened
under roses, and, from the leaves that tremble,
sleep of enchantment
Comes descending. Here is a meadow pasture
where the horses graze and with flowers of
springtime
now in blossom, here where the light winds passing
blow in their freshness.
Here in this place, lady of Cyprus, lightly
lifting, lightly pour in the golden goblets
as for those who keep a festival, nectar:
wine for our drinking.

—Invocation to Aphrodite. ৮

এই লিরিকটি পড়লে মনে হয়, সাফো সৌন্দর্য ও প্রেমের দেবতা অ্যাফ্রোডিতের তত্ত্বকে (cult) আপন জীবনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। এ এক রকমের ধর্মীয় সংস্কার হলেও ব্যক্তিগত জীবনবেদও বটে—কারণ এ-বেদ শারীরিক

শোভনভাবে স্বীকার ও অনুশীলন করতে শিখা যেন। দ্বিতীয়তঃ এতে ব্যক্তিহৃদয়ের ভাবানুভূতির লীলা ব্যর্থ নয়। তৃতীয়তঃ এখানে যে প্রাকৃতিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাতে সৌন্দর্যবোধ ও রসগ্রহণ কবিচিত্তের স্বাক্ষর আছে। চতুর্থতঃ তিনি জীবনে যে সঙ্গীত ও চিত্রের পাঠ নিয়েছিলেন, তার প্রভাবও বর্তমান কবিতার ভাবরূপের মধ্যে দেখা যায়।

অ্যালসিউসের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলেও তাতে তাঁর ব্যক্তি-চিত্তের পরিচয় চোখে পড়ে। প্রথম দিকে বিদ্রূপপ্রবণতা প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু পরে যুবমিত্রদের এক ফাঁকে সুরা ও নারীর ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাদের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন শান্তি ও স্বস্তি। তাঁর রচিত একটি 'ড্রিঙ্কিং সঙ' এখানে নমুনা হিসেবে তুলে ধরা যাক—

Drink ! Why wait for lamps ? The day
Has not another inch to fall.
Fetch the biggest beakers—they
Hang on pegs along the wall.

Bacchus, son of Semele
And of Zeus, discovered wine,
Giving it to man to be
Care's oblivious anodyne. ১

ল্যাটিন ভাষায় ওড্ রচনায় হোরেসের (খৃষ্টপূর্ব ৬৫-৮) কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। পিণ্ডারের কাব্যরীতি ছিল বিপদ, জটিল ও আবেগাত্মক। কিন্তু হোরেস যে ওড্ রচনা করেন তার কাব্যপ্রকৃতি অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিগত, সরল ও সংহত। জীবনের দিক থেকেও পিণ্ডারের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য ছিল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে তিনি অর্থোপার্জন করার চেষ্টা করেননি। যশ-লিপ্সা, অর্থ-লোলুপতা ও ক্ষমতাপ্রিয়তা তাঁর ছিল না। তিনি নির্জনে নিরিবিলি জীবন যাপন করতেই ভালবাসতেন। অথচ দীপ্তি ও প্রতিভার জন্য তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিমনীষী হয়ে উঠেছিলেন। কোন প্রকারের হাস-মনোভাবকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না, কিন্তু বহুজনকে আকর্ষণ করার মত

চরিত্র-বাহুল্য তাঁর ছিল। ভাগ্যের অধোগতির দিনে হোরেস কোন প্রকারে একটা কেরানীর পদ পেয়ে যান এবং সেই সময়েই পদ্য-রচনায় আপন শক্তির অনুশীলন করতে থাকেন। প্রথমতঃ ব্যঙ্গকবিতার দিকেই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং তাতে তিনি সাফল্যও অর্জন করেন। কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খৃষ্টপূর্ব সনের শেষে 'সেকিউলার গেম্‌স্' উপলক্ষে অ্যাপোলো ও ডায়নার উদ্দেশে প্রার্থনা-সঙ্গীত রচনার জন্য তিনি সম্রাট অগাস্টাস কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। রাজকীয় সৈন্যদের জয়লাভ ও জয়ের মধ্য দিয়ে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে তিনি গুচ্ছ-সংগ্রহের চতুর্থ খণ্ডের অধিকাংশ কবিতা রচনা করেন। সে যা-ই হোক, তিনি ক্রমে ব্যঙ্গকবিতা ছেড়ে গীতিকবিতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তাঁর কবিতা পড়লে অগাস্টাসের যুগের নরনারী, তাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ভাব ও অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তা-ই নয়, রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা ও রাজভক্তির নিদর্শনও তাঁর কবিতায় মেলে—বিশেষ করে ওডে। তাই বলা হয়েছে—'In support of the imperial reforms he wrote a seriesof Odes on national questions, denouncing the growing luxury of Roman life and calling on his countrymen to revive the virtues of their ancestors. These Odes, particularly the group of six that stand together at the beginning of Book III, gave powerful expression to capacities in Horace's nature which his adaptations of Greek lyrics could never have released. ১০ কতকটা এই দেশপ্রেমের আবহাওয়ার জন্যই তাঁর ওডগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে সমকালের দাবি মিটিয়েও তাঁর কবিতায় কালজয়ী উপাদান থাকায় তিনি আজও বরেণ্য কবিপুরুষ রূপে স্বীকৃত।

হোরেসের কবিতা শুধু ভাবের দিক থেকেই বিশিষ্ট নয়। রূপ ও রীতির ক্ষেত্রেও তাঁর পরীক্ষা লক্ষ্য করার মত। ব্যক্তিগত অনুভূতি ও ভাবোদ্বেল-বোধের প্রকাশ তাঁর কবি-প্রতিভার প্রধান সম্বল ছিল না। তিনি উপযুক্ত ও উপাদেয় শিল্পরীতি সন্ধানেও ব্রত ছিলেন। প্রাচীন গ্রীক কবিরা, বিশেষ করে সাফো ও অ্যালসিউস যতখানি সংগঠনগত উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন, তা নিজের ভাষায় ফুটিয়ে তোলা তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি লক্ষ্য রাখ্‌বিধির

সাহায্যে কবিতার রূপাবয়ব নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, যদিও অ-পূর্ব অভিনবত্ব সন্ধান করার কোন চেষ্টা তাঁর মধ্যে ছিল বলে মনে হয় না। ফলে তাঁর ওড্‌গুলি সহজবোধ্য হয়েও সাধারণ হয়ে ওঠেনি। ১১

কাব্যচর্চাকে হোরেস শিল্পচর্চা হিসেবে দেখতেন। তাঁর কাছে কবিকর্ম ছিল সাধনার বিষয়। সেদিক থেকে গ্রীক কবিরা তাঁর গুরু ছিলেন। অন্যদিকে নিজের ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা ছিল। শুধু তা-ই নয়, কাব্যচর্চায় আপন সিদ্ধির পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট। তাঁর মত কবিরা যে কাব্যসঙ্গীত ল্যাটিন ভাষায় রচনা করেছেন, তার আদর্শ প্রথম দেখা গেছে গ্রীক কবি—লেস্‌বিয়ান পোয়েট—অ্যালসিউসের রচনার মধ্যে—

A Lesbian poet showed us first
Thy passion and thy fluent power;
And in the battle's lust and thirst,
Or quiet of the calmer hour,
He swept the silent strings; he versed
The lovely Venus in her pride;
Or should us Cupid being nursed
Close at her side.

—To His Lyre. ১২

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অ্যালসিউসাদি লিরিক (মদভিত্ত) কবিদের আদর্শ অনুসরণ করে তিনি ল্যাটিন ওড্‌ রচনা করতে চেয়েছিলেন—

I pray thee tune the throbbing wire
From which my dearest songs have flowed,
And let me build for my desire
A Latin Ode.

—To his Lyre.

রাজপুরুষেরা যুগে যুগে কত কীর্তি রচনা করে গেছেন, রোমের মূর্তি বা পিরামিডের মধ্যে তাঁরা কিছুকাল বেঁচে থাকেন। কিন্তু কবি তাঁর কাব্যের মধ্যে বেঁচে থাকেন চিরকাল। মহাকাল কবির নাম পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে না। হোরেস তাই বলেছেন—'I shall not wholly die' এবং 'For me fresh praise shall ever multiply.' কিন্তু

এই কবিজনোচিত আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করতে গিয়েও তিনি বলতে ভোলেন নি—

> And first taught Grecian numbers how to run
> In Latin measure.
>
> —His Monument. ১৩

অর্থাৎ গ্রীক কবিতার অক্ষর-মাত্রা-যতি ইত্যাদি ল্যাটিন ছন্দে ফুটিয়ে তোলা হোরেসের উদ্দেশ্য ছিল। তবে, আগেই বলেছি, পিণ্ডার মত— লিরিক মনস্তির কবিরাই তাঁর যথার্থ গুরু ছিলেন। তিনি শুধু এঁদের কবিতার রূপরেখাই অনুসরণ করেন নি, স্থানবিশেষে কতকটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই তাঁদের কাব্যকৃতি অনুসরণ করেছেন। মাতৃভাষাকে গ্রীক ওডের পাদনে আনতেও তাঁর প্রয়াস অবধি ছিল না।

হোরেসের ওড্‌গুলির গঠন বেশ জটিল—প্রধানতঃ অ্যাল্‌ক্লিপিয়ান্, অ্যাল্‌কেইক ও সাফিক ছন্দোরীতির সমবায়ে গঠিত এক মিশ্র ছন্দোরীতিই তাঁর সাধ্য ছিল। চার রকমের অ্যাল্‌ক্লিপিয়ান্ চরণের বিচিত্র মিশ্রণের উদাহরণও তাঁর ওডের মধ্যে পাওয়া যায়। ১৪ কখনও কখনও মূল গ্রীক আদর্শের কিছু কিছু পরিবর্তনও তিনি করতেন। তাছাড়া তিনি ভিন্ন রকমের যতি (caesura) চরণের মধ্যে ব্যবহার করেছেন ১৫—তাতে গাম্ভীর্য কমেছে, কিন্তু গতি এসেছে। পূর্বে বলেছি, হোরেস অগাস্টাসের আবাহনে কোরাল ওড্ রচনা করেন। এই উপলক্ষে রচিত 'Carmen Saiculare' বা 'The Secular Hymn' নামক ওডটির মধ্যে সাফিক ছন্দের সন্ধান পাওয়া যায়। ওডটির কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করছি—

> O Phoebus, O Diana, forest Queen,
> Ye glorious splendours of the sky,
> Adored and evenmore to be adored,
> This sacred season hear our cry—
>
> The season when the Sibyl's verse prescribed
> That chosen maids and lads unstained
> Should sing a hymn unto the gods whose favour
> The seven hills ever have retained.

O fostering Sun, who in thy radiant car
Bring'st day and hid'st it in the tomb
And risest other yet the same, may'st thou
Ne'er look on greater thing than Rome. ১৬

এতে প্রমাণ হয় যে, সকল রকমের হৃদ্যোগত প্রয়োগের মধ্যে লাতিন পদ্ধতিই কবির কাছে প্রিয় ও অনুশীলনযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তার কারণ বোধহয় এই যে, পিণ্ডারীয় ওডের বিপদ ও জটিল রূপ ও রীতি ল্যাটিন কবিদের অনায়ত্ত ছিল।

ফ্রান্সের বিভিন্ন ভাষায় রচিত ওড্‌গুলি পিণ্ডার ও হোরেসের দ্বারা প্রভাবিত। ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় ওড্‌ লেখা শুরু হয় রেনেসাঁসের যুগে। কারণ গ্রীস ও রোমের ক্লাসিক্যাল বিদ্যার চর্চা ছিল রেনেসাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ফরাসী দেশের একটি সুপরিচিত মুদ্রণালয়ের মালিক এবং পণ্ডিত আঁরি এতিয়েন (Henri Estienne। ১৫৩১-৯৮।) একখানা গ্রীক অভিধান সঙ্কলন করেন এবং অ্যানাক্রিয়নের ওড্‌ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে কবির দল গ্রীক ও ল্যাটিন মানবতাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কাব্য-বিপ্লব আনেন, তাঁরা প্রথমে ব্রিগেড (Brigade) ও পরে প্লেইয়াদ (Pléiade) নামে পরিচিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত গ্রীকবিদ্যাবিশারদ জাঁ দরা (Jean Dorat) তাঁর অন্যতম শিষ্য জ্যু বেলে (du Bellay) ও রঁসার (Ronsard)-এর মধ্যে গ্রীক সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ জাগিয়ে তোলেন। প্রাচীন কবিদের কাব্যসৌন্দর্য তাঁর বক্তৃতায় উদ্ঘাটিত হয়েছিল। এই গোষ্ঠীর কতোয়া প্রকাশিত হয় ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দে। কতোয়ার রচয়িতা জ্যু বেলে (du Bellay) দাবি করেন যে, ফরাসী ভাষায় গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের মত সাহিত্য লেখা যায়। মৌলিকতা অক্ষুণ্ণ রেখেও প্রাচীনদের পথাদর্শ অনুসরণ করার আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং গ্রীক ও ল্যাটিন কাব্যরূপ অনুশীলন করাকে তিনি কর্তব্য বলে মনে করতেন। ১৭ মহাকাব্য, ব্যঙ্গকাব্য, ওড্‌, সনেট ইত্যাদি প্রাচীন কাব্যকলার রূপবৈচিত্র্যের পক্ষপাতী হওয়ার ফলে তিনি প্লেইয়াদ-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রথম ওড্‌ রচনা ও প্রকাশ করেন।

তবে তাঁর কবিতায় অনুভূতির লীলা যতটা ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল যুক্তির ব্যাখ্যান-কৌশল। পৌরাণিক প্রসঙ্গের দ্বারাও তাঁর কবিতা ছিল ভারাক্রান্ত। রঁসার দ্য বেলে-র কাছে শিক্ষা লাভ করে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যে পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রথম কাব্যকৃতি হচ্ছে ওড্-সংগ্রহ (১৫৫০)। তাঁর রচিত চারখণ্ড ওড্-সংগ্রহে পিণ্ডার, অ্যানাক্রিয়ন, হোরেস ও নব্য-ল্যাটিন-কবিকুলের অনুসরণ আছে। তবে কিছু ওডে পিণ্ডারের আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা সত্ত্বেও দু'একটা ছাড়া তাঁর পিণ্ডারীয় ওড্ আদৃত হয়নি। বরং হোরেস ও অ্যানাক্রিয়নের আদর্শই তাঁর সুস্থ রুচি ইন্দ্রিয়বাদী মেজাজের অনুকূল ছিল। হোরেসের রচনা থেকে তিনি এপিকিউরীয় বিষয় নিয়ে ওড্ রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন। অ্যানাক্রিয়ন ও নব্য-ল্যাটিনিষ্টদের অনুসরণে রচিত ওড্গুলির মধ্যে একটা মনোহর শোভা ও লাবণ্য দেখা দিয়েছে। রঁসারের কৃতিত্ব এই যে, তিনি ছন্দোরীতির নূতন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, আলেকজেন্দ্রীয় ছন্দ (Alexandrine) সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন, একাক্ষর (masculine) ও যুগ্মাক্ষর (feminine) মিলের একান্তর প্রয়োগে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ফ্রঁসোয়া দ্য মালের্ব (François de Malherbe। ১৫৫৫-১৬২৮) কিছু ওড্ রচনা করেন। দেপর্তে-র (Desportes) মৃত্যুর পর সভাকবি হয়ে তিনি রাজনৈতিক ঘটনা ও রাজপুরুষদের নিয়ে যে ওড্ লেখেন তাতে উচ্ছ্বাস কম থাকলেও আলঙ্কারিকতা, স্পষ্টতা ও উজ্জ্বলতা ছিল।

মেইয়ার-সোঁশ্রি গদ্য-রচনার একটি স্বতন্ত্রীয় আদর্শ ওডের মধ্যে খুঁজে পেলেও তাঁদের রচিত ওড্ গ্রীক শব্দ ব্যবহার ও পরীক্ষামূলক ভণ্ডামির দিক থেকে ফরাসী ভাষার আসল প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে নি। ফলে যেমন দ্রুত খ্যাতি পেয়েছিল, তেমনি দ্রুত লোপ পেয়ে যায়। আবার এজ্, অব এম্পাইটমেন্টে আবির্ভূত একুশার লেব্রুঁ (Ecouchard Lebrun। ১৭২৯-১৮০৭)-এর নামের সঙ্গে যদিও পিণ্ডারের নাম জড়িয়ে যায় ('Lebrun-Pindare') তবু তাঁর ওড্ কৃত্রিম ও অলঙ্কার-সর্বস্ব। সিলবাটের ওড্ ছিল সত্যিই আকর্ষণীয়, যদিও তার রূপে মেজাজারিতা ছিল। উনিশ শতকে ভিক্তর হুগোর হাতে ওডের আবার উজ্জীবন ঘটে। প্রথম রচিত ওড্গুলির জন্য তিনি আঁদ্রে শেনিয়ের কাছ থেকে অল্প বয়সেই সেন্সর লাভ করেন। তাঁর 'Odes et Poésies diverses' (১৮২২) পাঠ করলে দেখা

যায় যে, তিনি ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্য অনুসরণ করলেও গতি ও চিত্রকল্পের সাহায্যে তাঁর শুষ্কতাকে কিছুটা আধুনিক করে তুলতে পেরেছেন। কিন্তু থেওদর দ বাঁভিল (Théodore de Banville। ১৮২৩-৯১) তাঁর এক রকমের বাক্‌চাতুরীতেই কবির প্রকাশের সেরা আছে।

কয়েকটি ফরাসী শুদ্ধের কিছুটা অংশ এখানে তুলে ধরছি—

Plusieurs de leurs corps dénués
Se sont vus en diverse terre
Miraculeusement mués,
L'un en serpent et l'autre en pierre ;

L'un en fleur, l'autre en orbrisseau
L'un en loup, l'autre en colombelle :
L'un se vit changer en ruisseau,
Et l'autre devint arondelle.

Mais je voudrais être miroir
Afin que toujours tu me visses :
Chemise je voudrais me voir,
Afin que souvent tu me prisses.

Volontiers eau je deviendrais.
Afin que ton corps je levasse :
Être du perfum je voudrais,
Afin que je le perfumasse. ১৮

—Ronsard.

Un corbeau devant moi croasse,
Un ombre offusque mes regards;
Deux belettes et deux renards
Traversent l'endroit où je passe
Les pieds faillent à mon cheval,
Mon laquais tombe du haut mal :
J'entends craqueter le tonnerre ;
Un esprit se présente à moi ;
J'ois Charon qui m'appelle à soi,
Je vois le centre de la terre. ১৯

—Viau.

Ode a Marie-Anne-Charlotte Corday.

Quo ! tandis que partout, ou sinc`eres ou feintes,
Des l`aches, des pervers, les larmes et les plaintes
Consacrent leur Marat parmi les immortels,
Et que, pr`etre orgueilleux de cette idole vile,
Des fanges du Parnasse un impudent reptile
Vomit un hymne inf`ame au pied de ses autels,

La Ve´rite´ se tait ! Dans sa bouche glace´e,
Des liens de la peur sa langue embarrasse´e
De´robe un juste hommage aux exploits glorieux !
Vivre est-il donc si doux ? De quel prix est la vie,
Quand, sous un joug honteux la pense´e asservie,
Tremblante, au fond du coeur se cache `a tous
les yeux ? ৯০
—Che´nier

৪

ইংরেজীতে প্রথমে ওড্ রচনার চেষ্টা করেন চসার (১৩৭৩ ?-১৪০৭)। তিনি স্ট্রোফি, অ্যান্টিস্ট্রোফি ও এপোড সহযোগে যে পিণ্ডারীয় ওড্ রচনার প্রয়াস পান, তা পরীক্ষা মাত্র এবং সে-পরীক্ষায় তিনি সফল হন নি। তা নিতান্তই কৃত্রিম রূপ লাভ করেছে এবং গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে প্রচুর অধিকার থাকা সত্ত্বেও উচ্চমানের লিরিক রচনার প্রতিভা তাঁর ছিল কিনা সন্দেহ। তারপর উল্লেখ করা যায় এড্মণ্ড স্পেন্সারের (১৫৫২ ?—১৫৯৯) কথা। তাঁর রচিত Epithalamion ও Prothalamion কবিতা দুটি ইংরেজী ওডের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম কবিতাটিতে তেইশটি স্তবক এবং স্তবকগুলিতে সতের থেকে উনিশ চরণ আছে। তবে শেষ স্তবকটিতে মাত্র সাতটি আলেকজেন্দ্রীয় চরণ থাকায় এই ওড্টির গঠন একটু নূতন ধরণের হয়ে উঠেছে। বিবাহোৎসবের এক একটি অনুষ্ঠান এক একটি স্তবকে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্যেক স্ট্রোফির মধ্য দিয়ে যে সপ্রাণতা শেষ পর্যন্ত বয়ে গেছে, চিত্রপরম্পরার মধ্যে যে ঊর্জস্বলা রয়েছে এবং সমগ্র কবিতাটির ভেতরে যে ক্লাসিক্যাল গঠন অনুসৃত হয়েছে, তাতে স্পেন্সারের প্রতিভার প্রশংসা না করে পারা যায় না। একজন সমালোচক বলেছেন—'The style

ranges from utter simplicity to highly wrought and richly coloured imagery, and draws alike upon the resources of mediaeval superstition and classic myth. And Spenser's unfailing power over music is here unsurpassed. His intricate stanza form was suggested by the canzoni of Petrarch, but it is all his own. The linked melody of the rhymes, the varying rhythms, the relief of the occasional short line, and the lingering refrain of the final Alexandrine unite in a metrical design sustained throughout with marvellous beauty.' ২১ এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, কবিতাটির গীতাত্মকতা, স্তবক-গঠনের শৈল্পিকীয় চঙ, ছন্দ-মাধুর্য ও ধ্বনি-সম্পদ এবং ছোট বাক্যগুলির ঘন্টাধ্বনিবৎ দ্রুততা ওড্ হিসেবে কবিতাটিকে লক্ষণীয় করে তুলেছে। তবে ওডের অনিয়মিত (irregular) ২২ পদ্ধতিই এখানে অনুসৃত। ড্রাইডেনের 'Song for Saint Cecilia's Day', কলিন্সের 'The passions' ইত্যাদিও এই শ্রেণীতে পড়ে।

আব্রাহাম কাউলে (১৬১৮–১৬৬৭) ক্লাসিক্যাল যুগ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। মানবতন্ত্রী কবির উৎসাহ নিয়ে তিনি পিণ্ডারের অনুকরণে ওড্ রচনা করতে চেয়েছিলেন। যেন অনুসরণের ওড্-চর্চা শুরুতর সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ছিল না, কিন্তু কাউলে সোৎসাহে ও শ্রম-সহকারে পিণ্ডারীয় ওড্ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন—'to reproduce Piudar's enthusiasm, the boldness of his images and the freedom of his strophes.' কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলি পিণ্ডারীয় ওড্ হয়নি। তাদের ছন্দোরীতি যেমনি যথেচ্ছাচারী বলা যায় বটে, বরং অনুসরণীয় ও অটিল—তবু অসমান দৈর্ঘের স্তবক এবং বহুবিচিত্র ছন্দোরীতির জন্য তারা অনিয়মিত ও বিকৃত পিণ্ডারীয় ওড্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিক থেকে কাউলের তথাকথিত পিণ্ডারীয় ওড্গুলিকে বরং স্পেন্সারীয় চঙের বলা যেতে পারে। কিন্তু স্পেন্সারের কবিতাটিতে (Epithalamion) যে কবিত্ব ও সুরেলা ধ্বনি-সম্পদ আছে কাউলের ওডে তা নেই। তারপর এ-প্রসঙ্গে মিল্টন (১৬০৮–১৬৭৪) স্মরণীয়। তাঁর On the Morning of Christ's Nativity' যদিও ওড ধর্মীয় গঠন নিয়মিত ও সরল (regular and simple)।

কবিতাটির প্রতি স্তবকে নানা মাপের আট চরণ আছে এবং তার পরাপরি ঘটেছে একটি আলেকজান্দ্রেরীয় স্তবক দিয়ে। এর মধ্যে একটা গতি ও মহিমা, সুরেলা ধ্বনি ও ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্য আছে। এখানে ড্রাইডেনের (১৬৩১-১৭০০) কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবনের শেষ পনের বছর তিনি যে সব ওড্ লিখেছেন তার আদর্শ হচ্ছে কাউলের তথাকথিত পিন্ডারীয় ওড্গুলি।

'Threnodia Augustalis' ও 'Britannia Rediviva' রাজকবির সরকারী কাব্যপ্রচেষ্টা, তাতে বিস্তৃত স্তবকসজ্জা ও অনবদ্য চরণগুচ্ছ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবু একটা পরিমিতি ও শৃঙ্খলা, গতি ও গীতিধর্ম এই দুটি কবিতার মধ্যে রয়েছে। 'Alexander's Feast'-এর ছন্দোরীতি অভিনব, তার গঠনের মধ্যে একটা নমনীয়তা, বৈচিত্র্য ও ছন্দোগত ঐশ্বর্য লক্ষণীয়।

১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে কন্‌গ্রেভ পিন্ডারীয় ওড্ সম্বন্ধে একটা আলোচনা প্রকাশ করেন এবং স্ট্রোফি, অ্যান্টিস্ট্রোফি ও এপোড নিয়ে যে ওড্ রচনা করেন, তাতে কবিত্বের তেমন প্রকাশ ঘটেনি। কলিন্স (১৭২১-১৭৫৯) ক্লাসিক্যাল ভাষা ও কাব্যের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কতকগুলি ওড্ লেখেন, কিন্তু সেই সব ওড্ কখনও কখনও অস্পষ্ট ও কষ্টকৃত বলে মনে হয়। তাঁর রচনার বিষয় নির্বাচনে কোন মৌলিকত্ব নেই, পিন্ডারীয় ঐতিহ্যই তাঁর অবলম্বন ছিল। সরল ও নিয়মিত স্তবকের সাহায্যেই তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওড্ লিখেছেন। তাঁর 'Ode to Evening' নিয়মানুগ রীতির অন্যতম উদাহরণ। এটি আঠারো পঙক্তির একটি উৎকৃষ্ট কবিতা। তবে কবিতাটিতে মিল নেই (unrimed)। এই কবিতাটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে—'Here again the language is learned, wholly steeped in literary memories, but of a natural spontaneous grace; and the classical instrument is handled with a subtlety of feeling that is quite modern. It is in this way that Collins has at times rejuvenated the form of poetry; a very fine sense of word values, a musical perception of their expressive force, give them an appropriateness, a freshness, a force of suggestion, that seem to renew them.' ২৩

পিণ্ডারীয় রীতির ওড্ রচনায় টমাস গ্রে'র (১৭১৬-৭১) কৃতিত্ব বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর 'Progress of Poesy' ও 'The Bard' নামক কবিতা দুটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি কবিতাতে তিনটি ত্রিপাদ আছে এবং প্রতিটি ত্রিপাদে আছে তিনটি স্তবক—যার প্রথমটি হচ্ছে স্ট্রোফি, দ্বিতীয় অ্যান্টিস্ট্রোফি ও তৃতীয়টি এপোড। প্রতিটি ত্রিপাদের প্রথম দুটি স্তবক (অর্থাৎ স্ট্রোফি ও অ্যান্টিস্ট্রোফি) যেমন গঠনের দিক থেকে পরস্পরের অনুরূপ, তেমনি অন্য দুটি ত্রিপাদের স্ট্রোফি ও অ্যান্টিস্ট্রোফিরও অনুরূপ। 'Progress of Poesy'-তে প্রতিটি ত্রিপাদের স্ট্রোফি ও অ্যান্টিস্ট্রোফির মিলের পদ্ধতি হচ্ছে—a bb a cc dd ff gg (মূল-মিলের পদ্ধতি এক হলেও মিলসূচক শব্দ সন্নিবেশ ভিন্ন ভিন্ন—একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে)। অন্যদিকে প্রতিটি ত্রিপাদের অন্তর্গত এপোডের গঠন-রীতি একই প্রকারের, যদিওএই ক্ষেত্রেও মিলসূচক শব্দসমষ্টি একই ধরণের নয়। বোঝার সুবিধার জন্য কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

প্রথম ত্রিপাদের স্ট্রোফি :

Awake, Aeolian lyre, awake,
And give to rapture all thy trembling strings.
From Helicon's harmonious springs
A thousand rills their mazy progress take :
The laughing flowers that round them blow,
Drink life and fragrance as they flow.
Now the rich stream of music winds along,
Deep majestic, smooth, and strong,
Thro' verdant vales, and Ceres' golden reign :
Now rolling down the steep amain,
Headlong, impetuous, see it pour ;
The rocks and nodding groves rebellow to the roar.

দ্বিতীয় ত্রিপাদের স্ট্রোফি :

Man's feeble race what ills await !
Labour, and penury, the rocks of pain,
Disease, and Sorrow's weeping train,
And Death, sad refuge from the storms of fate !
The fond complaint, my song, disprove,
And justify the laws of Jove.

Say, has he giv'n in vain the heav'nly Muse ?
Night and all her sickly dews,
Her spectres wan, and birds of boding cry,
He gives to range the dreary sky ;
Till down the eastern cliffs afar
Hyperion's march they spy, and glitt'ring
shafts of war.

দ্বিতীয় বিপাকের এপোড :

Woods, that wave o'er Delphi's steep.
Isles, that crown th' Aegean deep,
Fields, that cool Ilissus laves,
Or where Maeander's amber waves
In lingering lab'rinths creep,
How do your tuneful echoes languish,
Mute, but to the voice of anguish !
Where each old poetic mountain
Inspiration-breath'd around ;
Ev'ry shade and hallow'd fountain
Murmur'd deep a solemn sound :
Till the sad Nine, in Greece's evil hour,
Left the Parnassus for their Latian plains.
Alike they scorn the pomp of tyrant Power,
And coward Vice, that revels in her chains.
When Latium had her lofty spirit lost,
They sought, oh Albion ! next thy
sea-encircled coast.

তৃতীয় বিপাকের এপোড :

Hark, his hands the lyre explore !
Bright-eyed Fancy, hov'ring o'er,
Scatters from her pictur'd urn
Thoughts that breathe, and words that burn.
But ah ! 'tis heard no more—
Oh ! lyre divine, what daring spirit
Wakes thee now ? Tho' he inherit
Nor the pride, nor ample pinion,

That the Theban eagle bear
Sailing with supreme dominion
Thro' the azure deep of air :
Yet oft before his infant eyes would run
Such forms as glitter in the Muse's ray,
With orient hues, unborrow'd of the sun :
Yet shall he mount, and keep his distant way
Beyond the limits of a vulgar fate,
Beneath the Good how far—but far above
the Great.

গ্রে অবশ্য অনিয়মিত ওড্‌ও লিখেছেন—যেমন 'Ode for Music' যোরেসের 'Ad Scatium' নামক ওড্‌কে ভিত্তি করে তিনি যে ওড্‌টি লেখেন, তার নাম হচ্ছে 'On the spring'।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও (১৭৭০—১৮৫০) ওড্‌ লিখেছেন। তাঁর 'Ode on the Intimations of Immortality' দুটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ ওড্‌টি অনিয়মিত রীতিতে লিখিত। দ্বিতীয়তঃ এর স্তবকগুলি সমমান —অর্থাৎ মিটারের সংখ্যা স্তবকগুলিতে নির্দিষ্ট নয়। পরস্পর বিষম স্তবক পরস্পরার মধ্য দিয়ে লিখিত এই ওড্‌টির স্তবকে আট থেকে উনত্রিশ ছত্র পর্যন্ত আছে। শেলীর (১৭৯২-১৮২২) 'To a Skylark' ও 'Ode to the West Wind' নিয়মিত স্তবকসজ্জার সাহায্যে রচিত। কিন্তু তাঁর 'Ode to Naples' অনিয়মিত রীতিতে লেখা, এতে স্পষ্টতঃই গ্রীক রীতির বিপর্যয় ঘটেছে। দুটি এপোড দিয়ে কবিতা আরম্ভ করা, তারপর দুটি স্ট্রোফি রচনা করা এবং সর্বশেষে চারটি অ্যান্টিস্ট্রোফি যোজনা করা, গ্রীক আদর্শের বিরোধী সন্দেহ নেই। কীটস্‌ (১৭৯৫-১৮২১) জীবনের অন্তিম পর্বে (১৮১৯) তাঁর বিখ্যাত ওড্‌গুলি রচনা করেন। ক্ষুদ্র ও বিষম রূপ ও রীতিতে রচিত তাঁর ওড্‌গুলিতে গ্রীক আদর্শের ভাস্কর্যধর্মী সৌকর্য ও সমষ্টি-সুষমা অভিব্যক্ত। কখনও সরল ও নিয়মিত রীতিতে (যেমন 'To Fancy'), কখনও নিয়মিত ও অনিয়মিত রীতির যুগ্মযোগে একটা রীতিতে তাঁর ওড্‌ গড়ে উঠেছে। অত্যন্ত জটিল অথচ প্রায় নিয়মিত ও অনুরূপ আদর্শে গঠিত স্তবকসজ্জা নিয়ে তিনি যে ওড্‌গুলি রচনা করেছেন তা-ও এখানে উল্লেখযোগ্য।

এই আলোচনা থেকে আমরা বিভিন্ন প্রকারের ওড্ সম্পর্কে মোটামুটি ভাবে কয়েকটা সিদ্ধান্ত করতে পারি। প্রথমতঃ গ্রীক ওড্ সম্পর্কে বলা যায়—

(ক) ওড্ লিরিক-কবিতা। সঙ্গীত হিসেবে গাওয়ার জন্ত তার সৃষ্টি। তাই গীতাত্মকতা তার বিশিষ্ট ধর্ম

(খ) ওডে বিষয় বৈচিত্র্য ছিল। পান-গীতি (অ্যালসিউস) থেকে শুরু করে প্রেম-গীতি-(সাফো) ও বিশেষ বিশেষ ঘটনাশ্রিত ও সাময়িক সমষ্টি-গীতি (পিণ্ডার) পর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(গ) ওডে রূপ-বৈচিত্র্যও ছিল—প্রধানতঃ কোরাল ওড্ ও মনডিক ওড্। কোরাল ওডেরও আবার নানা চঙ ছিল; এক পিণ্ডারই নাকি আটটি বিভিন্ন চঙের ওড্ রচনা করেছেন।

(ঘ) কোরাল ওডের রূপ ও রীতি কালক্রমে জটিল ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু মনডিক ওড্ ছিল তার চেয়ে আকারে ছোট ও প্রকৃতিতে সরল। প্রথমটির ভাষা ছিল আড়ম্বরপ্রাধান্তিক ও ভূয়িষ্ঠ, দ্বিতীয়টির ভাষা ছিল আঙ্গিক।

(ঙ) কোরাল ওড্ ছিল ধর্মকেন্দ্রিক, আনুষ্ঠানিক ও সমষ্টিগত শিল্প। কিন্তু মনডিক ওড্ ছিল প্রায় ধর্মনিরপেক্ষ, ব্যক্তিগত ও আত্মগত।

পরবর্তী রোমেনীয় (ল্যাটিন) ওডে এই সব গ্রীক আদর্শের কিছু কিছু রূপবদল ঘটে—

(ক) পিণ্ডারীয় বা কোরাল ওড্ ল্যাটিন ভাষায় লেখা হয়েছে, কিন্তু বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। কারণ পিণ্ডারীয় ওডের বিস্তৃত রূপরীতি ও জটিল বিন্যাসধর্ম ল্যাটিন কবিরা আয়ত্ত করতে পারেন নি। তার চেয়ে অ্যালসিউস, সাফো, অ্যানাক্রিয়ন, সিমনডেস ইত্যাদির মনডিক ওড্ই ল্যাটিনে বেশি অনুসৃত হয়েছে।

(খ) দেশের নানা ঘটনা, রাজনৈতিক অবস্থা ও দেশপ্রেমমূলক বিষয় নিয়ে লেখা হলেও ল্যাটিন ওড্ ছিল গ্রীক আদর্শের তুলনায় ব্যক্তিগত ও ধর্মনিরপেক্ষ। বন্ধুজন ও জগৎগত বিষয় নিয়ে লিখিত হোরেসের ওড্গুলিতে তার প্রমাণ আছে। একটা এপিকিউরীয় মেজাজও তাঁর ওডে দেখা যায়।

(গ) পিণ্ডারীয় ওড্ যেমন কালক্রমে পেশাদারী সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল, ল্যাটিন ওড্ তেমন পেশাদারী সৃষ্টি নয়।

(খ) ল্যাটিন ওজের শিথিলতর রূপের মধ্যে কবিদের অধিকতর যত্ন ও অনুশীলনের পরিচয় আছে।

(গ) গ্রীক ছন্দ-পর্ব (measure) ল্যাটিনে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু হোরেসের ছন্দোরীতির মধ্যে জটিলতা থাকলেও পিণ্ডারীয় ওজের জটিল ও বিলম্বিত ছন্দ তিনি ও অন্যান্য কবি ঠিক অনুসরণ করেন নি। তার চেয়ে বরং সাঙ্কিক ওঅ্যালথেইক পদ্ধতিই ল্যাটিনে অধিকতর সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত। কোন কোন ক্ষেত্রে নূতন পদ্ধতিও অনুসৃত হয়েছে।

ফরাসী ওজের ইতিহাসে লক্ষণীয় হচ্ছে—

(ক) গ্রীক ওজের আদর্শ ফরাসী ওজে অনুসরণের চেষ্টা হয়েছে।

(খ) কোঁয়াল ওজের পিণ্ডারীয় আদর্শের চেয়ে মনস্তিক ওজের অ্যানাক্রিয়নীয় আদর্শ ও ল্যাটিন ওজের হোরেসীয় আদর্শই ফ্রাঁসোয়ের মত কবিদের কাছে বেশি সমাদৃত হয়েছে।

(গ) গ্রীক ওজের অনুসরণ ফরাসী ভাষার আসল প্রকৃতিকে ঠিক অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি বলেই দীর্ঘদিন ওজের চর্চা সেখানে বন্ধ ছিল।

(ঘ) ছন্দোরীতির নূতন নূতন পরীক্ষায়, আলঙ্কারিক ও উজ্জ্বল কাব্যশৈলীর অনুশীলনে ফরাসী ওজ্ কখনও কখনও অভিনব ও আধুনিক হয়ে উঠেছে।

(ঙ) ফরাসী ওজে অনুভূতির লীলার চেয়ে বুদ্ধির লীলা ও বাক্‌চাতুরী অনেক ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে।

ইংরেজী ওজের ক্রমবিকাশের ধারা অনুধাবন করলে দেখা যায়—

(ক) ওজের পিণ্ডারীয় আদর্শ অনুসরণের প্রয়াস যেন জনসনের আমল থেকে বারে বারেই হয়েছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের মাটিতে তার কোন যথার্থ সমৃদ্ধি ঘটেনি।

(খ) ড্রে'র ওড্ গুলি ওজ্ খাঁটি পিণ্ডারীয় রীতির, সন্দেহ নেই। কিন্তু 'such poems follow their model in appearance only, and as the original choric significance of the divisions no longer exists, they are, like all such attempts to reproduce "an ancient form through which the spirit breathe no more," essentially artificial productions.'

(গ) ওড্ রচনার হোরেসীয় আদর্শও ইংরেজী ভাষায় অনুশীলিত

হয়েছে। রেনেসাঁসের সময় থেকে যুগে যুগে হোরেসের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ দেখতে পাই—তাঁর একটি ওড্ (Odes II, 10) লিভ্‌নি ('Draw in Thy Swelling Sailes') ও দারে ('Praise of Meane and Constant Estate') উভয়েই অনুবাদ করেন। তাই বলা হয়েছে—'The rendering of Horace into English has long been a standard avocation of both professional poets and amateurs of letters.' ইংরেজী ওডে যে শিল্পগত সংহতি ও প্রাঞ্জলতা এবং ব্যক্তিগত সুর রয়েছে, তার পেছনে হোরেসের প্রভাব আছে।

(খ) বেন জনসন, স্পেন্সার, ডাউসে, ড্রাইডেন, কন্‌গ্রেভ, কলিন্স, গ্রে ইত্যাদি যেমন ক্লাসিক্যাল ওডের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, তেমনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, কীটস্ ইত্যাদি রোমান্টিক ওড্ সৃষ্টিতে প্রয়াস পেয়েছেন।

(গ) ইংরেজী ওডকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) পিণ্ডারীয় ও নিয়মিত (২) নিয়মিত ও সরল (৩) অনিয়মিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাক অধ্যায় থেকে শুরু করে ইংরেজী অধ্যায় পর্যন্ত ওডের ইতিহাস একই আদর্শের দিকে অবিচলিতভাবে এগিয়ে চলেনি। প্রত্যেক ভাষা, সাহিত্য ও জাতির প্রকৃতি অনুযায়ী প্রাচীন আদর্শের গ্রহণ-বর্জন ও রদ-বদল ঘটেছে। সবচেয়ে বড় কথা, ওডের জন্মের সঙ্গে যে সুরের সহযোগ ছিল, তার আর চলন নেই। এমন অনেক ওড্ আছে, যাকে সুরের মধ্যে ফেলা যায় না (যেমন মিল্টনের 'নেটিভিটি' ওড্‌টি), তেমনি বহুগীত অনেক গীতিকবিতা আছে যাদের ওড্ বলা সম্ভব নয় (যেমন বার্নসের কবিতা)। সুতরাং ওডের সংজ্ঞা এখন প্রশস্ত হয়ে উঠেছে।

অন্য দিকে ওড্ বলতে বর্তমানে পূর্বের মতো শুধু 'লিরিক' বোঝায় না, বরং 'এক বিশেষ শ্রেণীর লিরিক' বোঝায়। লিরিক থেকে তার সংজ্ঞা সঙ্কীর্ণও হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই বিশেষ শ্রেণীর লিরিকেরও এমন কোন অপরিবর্তনীয় ও অপরিহার্য সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়নি, যার সাহায্যে অন্যান্য লিরিকের সঙ্গে ওডের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা যায়। কোন্‌টি ওড্ আর কোন্‌টি ওড্ নয়—এই নিয়েও মতপার্থক্যের শেষ নেই। ওডের কয়েকটি আধুনিক সংজ্ঞা এখানে উদ্ধৃত করলে বিষয়টির অনির্দিষ্টতা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা সম্ভব হবে—

(ক) A rimed (rarely unrimed) lyric, often in the form of an address; usually dignified or exalted in subject, feeling and style, but sometimes simple and familiar, and rarely extending to 150 lines.

—Shorter Oxford English Dictionary.

(খ) 'a lyric poem of elaborate metrical structure, solemn in tone, and usually taking the form of an address,' very often to some abstraction or quality.

—A. R. Weekes.

(গ) Ode is now a days used to classify a fairly long and stately poem written on some public occasion or addressed to some person, thing or personified quality.

—M. Boulton.

(ঘ) any strain of enthusiastic or exalted lyrical verse, directed to a fixed purpose, and dealing progressively with a dignified theme.

—E. Gosse.

(ঙ) In addition dignity or exaltation of matter and manner and a logical evolution of thought, which may be accepted among its more habitual characteristics, it is generally, though it would seem not necessarily, marked by a certain amount of complexity and elaboration; it has often something of the quality of a poetical oration; while often, again, it is inspired...by some great public occasion.

—W. H. Hudson.

উপরি-উদ্ধৃত সংজ্ঞাগুলিকে একত্র বিচার করে ওডের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে নির্দেশ করা যেতে পারে—

(ক) ওড্ এক প্রকারের গাম্ভীর্যপূর্ণ লিরিক কবিতা।

(খ) গম্ভীরচেতা ও উদ্দীপিত বিষয় নিয়ে ওড্ লিখিত হয়।

(গ) ভাবানুভূতি ও সুরের দিক থেকে ওড্ বহিরাবাচক হয়ে থাকে।

(ঘ) ওডের ভাবধারা যুক্তিসঙ্গতভাবে ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত হয়।

(ঙ) ওডের বিষয়ের মত তার রচনারীতির মধ্যেও যেন একটা গুরু-গম্ভীর চাল থাকে।

(ঙ) ওডের জন্মকাল হল প্রশস্ত, জটিল ও ভাবপ্রধান।

(চ) ওড, কোন ব্যক্তি বা জনগত বিষয়কে সম্বোধন করে রচিত হয়।

প্রসঙ্গ-নির্দেশিকা

১. 'Lyrics would properly mean songs to be accompanied by the lyre.'—Greek Lyrics, Translated by Richmond Lattimore ; Preface to the second edition.

২. দ্রষ্টব্য : The Odes of John Keats, Edited by A. R. Weekes ; Introduction.

৩. 'Yet one feature of choral song in this final form—unlike its traditional prototypes—is novelty : each occasion must be celebrated with a fresh product ; within the limits allowed by the convention each poem must be unique.'—Greek Literature for the Modern Reader, H. C. Baldry.

৪. দ্রষ্টব্য : Athenaeus VIII, 360 b. Tr. Beeching.

৫. দ্রষ্টব্য : Isthmian II, 11. 6-12. Tr. Way.

৬. দ্রষ্টব্য : Greek Literature for the Modern Reader, H. C. Baldry.

৭. Translated by Richmond Latti

৮. ঐ

৯. দ্রষ্টব্য : Fr. 168. Tr. Bowra.

১০. দ্রষ্টব্য : Introduction, Selected Poems of Horace (Edited by George F. Whicher.)

১১. ঐ

১২. Odes I, 32, Translated by Louis Untermeyer.

১৩. Odes III, 30, Translated by Grant Showerman.

১৪. এ-সম্পর্কে আলোচনা আছে 'Encyclopaedia Britannica' গ্রন্থে।

১৫. দ্রষ্টব্য : Selected Poems of Horace, Edited by G. F. whicher, পৃ: ৪৮।

১৬. Translated by A. E. Murison.

১৭. দ্রষ্টব্য : A Concise Survey of French Literature—By Germaine Mason.

১৮. জিওফ্রে ব্রেরেটন (Geoffrey Brereton)-কৃত ইংরেজী অনুবাদ—'Many' divested of their bodies, have seen themselves in various lands miraculously transformed, one into a serpent and another into a stone ;

One into a flower, another into a shrub, another into a wolf, another into a dove : one saw himself changed into a stream and another became a swallow.

But I would like to be a mirror, so that you should always see me : I would like to be a shift, so that you should often take me up.

Gladly would I become water, so that I should wash your body : I would like to be perfume, so that I should perfume you.'

১৯. ফিলাক্রে মেরেউস-কৃত ইংরেজী অনুবাদ—'A Raven croaks in front of me, a shadow startles my eyes ; two weasels and two foxes cross the path down which I pass, my horse's feet slip, my servant falls in a fit ; I hear the thunder crackling ; a spectre appears before me ; I hear Charon calling me to him, I see the centre of the earth.'

২০. ফিলাক্রে মেরেউস-কৃত ইংরেজী অনুবাদ—'Ah, while on all sides the tears and moans, sincere or feigned, of cowardly, perverted minds consecrate their Marat among the immortals, while—arrogantly officiating before that vile idol—an impudent reptile from the slime of Parnassus vomits foul hymn at the foot of his alters,

Truth is silent ! In her numbed mouth, her tongue, impeded by the trammels of fear, denies the homage justly due to (such) glorious deeds ! Is it so sweet to live, then ? Of what value is life when thought, enslaved beneath a shameful yoke, hides itself, timorously from every eye in the depths of the heart ?'

২১. The Poems of Spencer : Introduction by E. De Selincourt.

২২. W. H. Hudson-লিখিত An Introduction to the Study of Literature-এ Epithalamion-কে regular বলা হয়েছে।

২৩. A History of English Literature—By Legouis and Cazamian.

উইলিয়ম
শেক্সপীয়রের
ট্রাজেডি
অনুবাদ

ওথেলো

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—ভেনিস। রাজপথ

[রোডারিগো ও ইয়াগো'র প্রবেশ]

রোডারিগো। থাক, আর ক'রো না কথা ; আমার টাকার থলি
নিয়ে তুমি যা খুশি করেছ, অথচ, ইয়াগো, তুমি
আগেই এসব জানতে। খুবই মর্মাহত আমি।

ইয়াগো। জাহ্ কথুল, কিন্তু তুমি শুনবে না কোনোই কথা ;
এমন ঘটনা যদি কখনও স্বপ্নেও জেনে থাকি
ঘৃণা ক'রো আমাকে তবে।

রোডারিগো। তুমিই তো বলেছিলে সে তোমার চক্ষুশূল।

ইয়াগো। তা না হলে ছোটলোক আমি। তিন তিন নগরপ্রধান
খুবই নত হয়ে তাকে ব্যক্তিগত অনুরোধ করে
সহকারী আমাকে নিতে ; আর সত্যি বলতে কি,
নিজের কী মূল্য জানিতো, এ কাজেরযোগ্য কিছু অযোগ্য
আমার ; অথচ এমনই জিদ্ এত দম্ভ তার,
এড়ালো তাদের সব বড় বড় কথার ফুলঝুরীতে
যুদ্ধের বিকট যত যুক্তি দিয়ে ঠাসা ;
শেষমেশ হল এই,—
ফিরে এল শুভাশীষ ; কারণ, তারই কথা, "জেনে রাখবেন
সহকারী কে যে হবে আগেই রেখেছি ঠিক করে।"
সে হল সে কে ?

সে মহাপণ্ডিত বটে পাটিগণিতের,
মাইকেল কেসিও নাম, ফ্লোরেন্সে নিবাস,
যে কোনো যুদ্ধরীর হস্তে অবলীলাতে যেতে সে উদ্‌গ্রীব ;
কখনো সে সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে চালনা করে নি,
কি ভাবে দাঙ্গাতে হয় যুদ্ধকালে সেনা
তাও জানে অনুচার মত। পুঁথিগত বিদ্যা শুধু সার ;
তাই যদি সব হ'ত, তৌগাবাজী সেনেটরগুলো
তারই মত যুদ্ধ বিশারদ ; শুধু ধূলি, কাজে সেই,
এই তার রণবিদ্যা। সে-ই শুধু হল নির্বাচিত ;
আর আমি, নিজ চোখে দেখেছে কতর বার
রোডস্‌'এ সাইপ্রাস'এ আরো বহু বহু স্থানে
খৃষ্টান অখৃষ্টান দেশে,—সেই আমি রইলাম পড়ে
হিসাব-নবিশটার তলে ; এই আকাট মূর্খটা
সময়ে ঠিকই হবে সাহসিক সহকারী তার,
আর আমি—হা নসিব!—মহামান্য মূরের পতাকী।

রোডারিগো। ধর্ম সাক্ষী, আমি হলে হতাম মাতক তার।

ইয়াগো। কি করি উপায় নেই। সোকরির এই অভিশাপ,
বিদ্যা ও চিঠির জোরে পদোন্নতি ঘটে।
অগ্রগণ্য সবাই একালে, দ্বিতীয় হয় না আর
প্রথমের উত্তরাধিকারী। এখন নিজেই ভেবে দেখ,
তোমাতে কখনো কি সম্ভব আমার পক্ষে
ভালোবাসা এ যেন বুঝতে।

রোডারিগো। আমি হলে বিতাম ইস্তফা।

ইয়াগো। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো ;
তোষ মুখে তোষ দিতে আমি তার সেবনে রয়েছি ;
নসিব পারি না যতে আমরা সকলে, তেমনি সকল সব
নসিব হলেই তার সেবা করা। দেখবে মজর ক'রে
পা-চাটা অনেক বান্দা কাজেতে দেয় না ফাঁকি,
সোলামীর অপমান তাদের মজ্জাগত,
জীবন কাটিয়ে দেয় নসিবের গাধাটার মত

মুঠো অন্নের লোভে, মুড়ো হলে গলাধাক্কা জোটে :
চাষবাসে হয় এই হতচ্ছাড়াদের। এ ছাড়াও কিছু আছে,
আকারে ইঙ্গিতে তারা সর্বত্রগতী ধানাইপানাই,
অথচ মনটা রাখে নিজেদের স্বার্থের খাঁচায়,
নোকরির মুখোশ পরে ধনিদের চোখে ধুলো দিয়ে
স্বার্থসিদ্ধি করে চলে তাদেরই মৌলতে। নিজেদের ঠাঁক
ওরে ভুলে
নিজেদেরই বাড় করে তারা : এদের পদার্থ কিছু আছে,
এদেরই একজন আমি। কারণ, একথা ঠিক,
যেমন সঠিক তুমি রোডারিগো নিজে,
আমি মুর হলে পর হতাম না ইয়াগো কখনো,
তার পদসেবা করে নিজেকেই সেবা করে থাকি ;
খোদা জানেন, আমি নেই ভালোবাসা কর্তব্য বিলোতে,
ওসব দেখাই শুধু মতলব হাসিল হবে বলে :
কারণ বাইরের কাজে যদি ধরা পড়ে
মনে মনে ভাবি যা যা আমি, গোপনে যা করি
সবার গোচরে আসে, তাহলে বস্তুতি দেখা যাবে
প্রকাশ্যে জাহির করা আমার দিলটা নিয়ে
হানাহানি করছে সকলে ; এই আমি, আমি নয় যেনো।

রোডারিগো। কী মতলব তবে এই জানালুখোটার
এ ভাবে ভাসিয়ে চলে যদি।

ইয়াগো। ডেকে তোল মেয়ের বাবাকে,
টেনে তোল সে-লোকের পেছনে লাগো, আনন্দ বিষিয়ে তোল,
হটাও কুকীর্তি তার, উসকে দাও মেয়ের পক্ষকে ;
যদিও এখন দিন মধুময় তার,
অমুক সে মন্ত্রিকার হলে ; তার সুখ সুখই, তবু
এমন উত্যক্ত কর সুখভোগ তার,
যাতে সুখ বিষে ভরে আসে।

রোডারিগো। মেয়ের বাপের বাড়ি এই ; দিই জোরে হাঁক।

ইয়াগো। তবে কাঁপা কাঁপা করে দাও হাঁক এমন জোরালো,

মাঝরাতে আচমিতে আগুনের শিখা দেখে
হেঁকে ওঠে অনাকীর্ণ সহর যেমন।

রোডারিগো। ব্রাবানশিও—সিনিয়র ব্রাবানশিও-ও-ও।

ইয়াগো। উঁচুন। উঁচুন ব্রাবানশিও—চোর, চোর, চোর।
দেখে নিন বলিগুলো, দেখুন দেরেকে খুঁজে বাড়িটা দেখুন।
চোর। চোর। চোর।
[উপরের জানালায় ব্রাবানশিও'র আবির্ভাব]

ব্রাবানশিও। কেন এই হৈ হল্লা' এত ডাকাডাকি,
ঘটল কী অঘটন?

রোডারিগো। লোকজন আপনার বাড়িতে আছে তো সব?

ইয়াগো। দোরগুলো ভালোমত আছে?

ব্রাবানশিও। কেন? কি হয়েছে?

ইয়াগো। মশাই যে সর্বনাশ। তোমা, তোমা, গায়ে
কিছু দিন আগে।
দিলটা তো কেটে গেছে, আত্মার অর্ধেকটা লোপাট;
এইক্ষণে এইমাত্র কালো দুম্বো ভেড়া এক
মেতে আছে আপনার বয়সী ভেড়ীকে নিয়ে। উঁচুন,
উঁচুন, ঢং ঢং বাজিয়ে ঘণ্টা লোকজন জাগিয়ে তুলুন,
নইলে শয়তান ঠিক দাদামশাই বানাবে আপনাকে।
বলছি, উঁচুন গিগ্‌গিরি।

ব্রাবানশিও। তোমরা কি পাগল হয়েছ?

রোডারিগো। মহামান্য সিনিয়র, গলা শুনে চিনছেন কি?

ব্রাবানশিও। চিনি না, কে তুমি?

রোডারিগো। রোডারিগো নাম আমার।

ব্রাবানশিও। তাহলে তো আরো অবাঞ্ছিত:
বারণ করেছি তোকে এ বাড়ীর ধার না মাড়াতে:
সোজা স্পষ্ট কথা তুই আগেই আমার শুনেছিস,
পাবি নাকো আমার মেয়েকে: এখন মাতাল হয়ে
একপাশা দিলে আর মেলাতাতে ভূত হয়ে
বদ মতলব এঁটে ছুটেছিস এখানে আমার
অশান্তি ঘটাতে?

রোডারিগো। মশায়, একটা কথা।

ব্রাবানশিও। কিন্তু তোর আসা দরকার,
মেজাজে ও মর্যাদায় এমন ক্ষমতা যদি আমি
শিক্ষা দিতে পারি তোকে।

রোডারিগো। মোহাই, শান্ত হন।

ব্রাবানশিও। দর্পঘাত, কি কথা বলছিলি? ডেকিস না এটা?
এ বাড়ীটা থামার নয়।
মহামান্য ব্রাবানশিও,
খোলা মনে অকপটে এসেছি আপনার কাছে।

ইয়াগো। চুলায় যাক্ মশায়,আপনি দেখছি ভগবানের নামও করবেন না, যদি শোনেন শয়তান নাম করতে বলেছে। যেহেতু আমরা আপনার উপকার করতে এসেছি, আর আপনি মনে করেন আমরা বদ লোক, অতএব একটা যাহ্‌বাড়ি ঘোড়া আপনার মেয়েকে যাতে ভোগ করে আপনি তা করবেনই; অতএব আপনার নাতি নাতনি আপনার কাছে চিঁহিহি করে ডাকতে থাক; অতএব দৌড়ের ঘোড়াগুলোকে নিজের আত্মীয় বলে আর খুটিয়া ঘোড়াকে প্রাণের দোসর বলে জড়িয়ে ধরুন।

ব্রাবানশিও। কে রে তুই হতচ্ছাড়া বদ?

ইয়াগো। আমি সেই লোক যে আপনার কাছে এই সুখবর বয়ে এনেছে, আপনার মেয়ে ও মূর তালগোল পাকিয়ে দুপিঠওলা একটা জানোয়ার হয়ে রয়েছে।

ব্রাবানশিও। পাষণ্ড বদমাশ তুই।

ইয়াগো। আর আপনি—সেনেটর।

ব্রাবানশিও। দিবি তুই জবাব এর: রোডারিগো তোকে আমি চিনি।

রোডারিগো। জবাব যা দেবার, দেব। অনুরোধ শুধু শুনুন তবু,
আপনারই সম্মতিক্রমে, আপনারই অভিপ্রায় যদি,—
দেখছি, কিছুটা তাই,—আপনার রূপসী মেয়ে
এ সময়ে রাতদুপুরে, ঘুমঘোরে সবাই যখন,
ভাড়াটে ভৃত্য, মানে, মাত্র এক সঙ্গে নিয়ে শুধু,—

কি ঘরের পাহারা সে অনুমান কঠিন নয়,—
যার কোনো লম্পট সুরের আলিঙ্গনে ধরা দিতে ;
এ যদি জানেন আপনি, সমর্থন করেন যদি,
তাহলে করেছি আমরা অপরাধ খুবই গুরুতর।
না যদি জানেন, তবে সাক্ষী এই মাননীয়েরই,
অথবাই বকুনি খেলাম। কখনো জানবেন না মনে
ভদ্রাভদ্র কাণ্ডজ্ঞান এতখানি খুয়েছে আমার
ঠাট্টা তামাসা করব বয়স্ক আপনার সঙ্গে :
আমার বলছি আমি, আপনার ও মেয়ে,
আপনার অমতে গেলে, অমাবাতা চুলাও করেছে,—
এভাবে বিয়েকে যুক্তি রূপ গুণ ভবিষ্যৎ তার
সঁপে দিয়ে উল্কাঝড় তিনদেশী এক যাযাবরে,
ভিটেমাটি কিছু যার নেই। যেমুন পরখ করে ;
ঘরে তার অথবা বাড়িতে তাকে খুঁজে যদি পান
রাষ্ট্রের বিচার মত শাস্তি দিন অবাধে আমাকে
আপনাকে ঠকিয়েছি বলে।
কে আছিস্ আলো আন।
বাতি দে আমাকে। লোকজন ডেকে তোল।
সত্য দেখা যদি আর এ দুর্যোগে নেইকো অধিক।
যদি সত্য হয় যদি, আগে থেকে হয়েছি উন্মেষে।
আলো আন্, আলো কই।

[উপর থেকে প্রস্থান]

চলি আমি, যাওয়াটা দরকারও :
আমার যে চাকরি তাতে উচিতও না, শোভনও না,
সুরের বিবাদী হয়ে ধরা পড়ে যাওয়া।
থাকলে তা হতেই হবে : জানা আছে শাসকমহল,
হয়ত সে বাধ্য হবে এর ফলে কিছুটা সংযত হ'তে,
কিন্তু তাকে দূর করা অসম্ভব ; কারণ তারই 'পরে
যোগ্য কারণেই ন্যস্ত সাইপ্রাসের সুখের ভার,—
সে সুখও শুরু হয়ে গেছে,—সর্বস্ব দিয়েও এখন

পাবে নাকো খুঁজে তারা ওর মত আর একজন
উপযুক্ত এ কাজের। এই সব বিবেচনা করে,
ঘৃণা করি যদিও তাকে নরক যন্ত্রণা মত,
তবু শুধু বর্তমান চাকরির খাতিরে,
দেখাবো তারই বাধ্য, কত ভালোবাসি যেন।
নিতান্তই দেখানো তা। যদি তার দেখা পাও
বলে বলে হানা দাও সাজিটারি সরাই খানায়।
সেখানে তার সঙ্গে থাকব। এখন চললাম।

[ইয়াগোর প্রস্থান]

[মিচে কপাল হাতে ব্রাবানশিও ও তার অনুচরগণের প্রবেশ]

ব্রাবানশিও। বাস্তবিকই দুঃসংবাদ! গিয়েছে সে চলে,
কিসের আশায় থাকব অভিশপ্ত এ জীবন নিয়ে
যেখানে তিক্ততা ছাড়া কিছু আর নেই। রোডারিগো,
কোথায় দেখেছ তাকে? হায় হতভাগী!
বললে না, যুবের সঙ্গে? কে চাইবে পিতা হতে আর!
কি করে জানলে তুমি আমারই সে মেয়ে? উঃ প্রতারণা
চিন্তার অতীত! কী বলেছে তোমাকে সে? ওরে আলো
আন আরো
ডেকে তোল লোকজন। বিয়েটা কি হয়ে গেছে জানো?

রোডারিগো। মনে হয় নির্ঘাৎ হয়েছে।

ব্রাবানশিও। হা কপাল! কি করে পালাল সে? উঃ রক্তের হারামী?
পিতারা, এখন থেকে কন্যাদের কাছ থেকে
বুঝোনা তাদের মন। আছে কি এমন যার
মর্ম স্বভাব যাতে কুমারী মেয়ের
বিকল করতে পারে? রোডারিগো, পড়েছ তুমি
এমন বিষয়ে কিছু?

রোডারিগো। আছে, আমি পড়েছি তা।

ব্রাবানশিও। ডেকে তোল ভাইকে আমার। উঃ, দিতাম তোমারই হাতে
যদি।
কিছু যাও এদিকে ওদিকে কিছু। জানো কি তুমি
কোথা গেলে ধরা যায় যুবকে ও মেয়েকে আমার?

রোডারিগো। মনে হয় সত্ত নয় খুঁজে বের করা, দয়া করে তবু
কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে আসুন আমার সঙ্গে।

ব্রাবানশিও। বেশ, তুমি আগে চল। বাড়ি বাড়ি হানা দেব আমি।
অনেকে আমার অনুগত। সন্দে নে রে অস্ত্রশস্ত্র সব!
ডেকে তোল জনকতক রাতের পাহারীকে।
খুব ভালো রোডারিগো, চল; এ কষ্টের পাবে পুরস্কার।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য—ভিন্ন রাজপথ

[ওথেলো, ইয়াগো ও মশালসহ অনুচরগণের প্রবেশ।]

ইয়াগো। খুন ব্যবসায়ে ঘটে নরহত্যা করেছি বিস্তর,
তবুও আমার পক্ষে ভেবে স্থির খুন করা
বিবেকের একান্ত নিষেধ; স্বার্থবোধে যে অন্যায়
করণীয়, তাও পারি যাকো। নয় কিংবা দশবার
ভেবেছি বিঁধিয়ে দিই এই ঠিক পাঁজরার নিচেটা তার।

ওথেলো। করনি, ভালোই।

ইয়াগো। তাই বলে কুৎসা রটি
অভাবনা অকথ্য কথা আপনার উদ্দেশে
কত আর শোনা যায়।
শুনে যে সরেছি তার কারণ কিছুটা
সাধুতা রয়েছে যাতে। বলবেন হয়া ক'রে
বিয়ায় কি হবে শেষে? কারণ, সন্দেহ নেই,
ভদ্রলোক সবার শ্রদ্ধার পাত্র,
কার্যত ক্ষমতা তাঁর ডিউকেরই মত,
অঙ্কের থেকে তা বিগুণ; এ বিয়ে ভাঙবেনই তিনি,
না পারেন ফেলবেন ঠিক আইনের বিধান মতে
নানারূপ বাধার বিপাকে, আইনের প্রয়োগেও তিনি
চেষ্টার করবেন না ত্রুটি।

ওথেলো। যা খুশি তা করুন আক্রোশে।
নানাভাবে পরিষদ পেয়েছে আমার সেবা,
তাই তাঁর অভিযোগ নীরব করে রেখে। জানাইনি এতকাল,—
যখন বুঝেছি আমি নিজেকে আহির করা সম্মান সংগত,
এবারে সকলে জানবে, খুলে শীলে রাজসিক
বংশগত আমি, আমার যা নিজস্ব মর্যাদা,
যাদা মত না করেই স্বাধিকারে দাবি করতে পারে
এখনকার এ পদগৌরব। ইয়াগো, একথা জেনো,
ভালোবাসি আজ বীর ডেসডিমোনাকে,
তা না হলে সাদরের সম্পদ সেলেও
কখনো বীরত্বাম নাকো উদ্ধত বিষাদী এই মন
গভীরেরা বিবাহ বন্ধনে। কিন্তু দেখ, আসছে কিসের আলো?

ইয়াগো। জেগে উঠে আসছেন পদসে কন্যার পিতা।
আপনার আড়ালে যাওয়া ভালো।

ওথেলো। কখনো না; অবশ্যই ধরা দেব।
কপটতা মর্যাদা আর অনাবিল বিবেক আমার
আমার সুযোগ্য সাক্ষী। এরা কি তাঁরাই?

ইয়াগো। না, না, এরা নয় তারা।
[মশাল হাতে কেসিও ও কতিপয় কর্মচারীর প্রবেশ]

ওথেলো। ডিউকের অনুচর এরা, আমারও সহকারী দেখছি।
বন্ধুগণ, রাতের শুভেচ্ছা জেনো!
কি খবর বল?

কেসিও। সেনাপতি, ডিউক সাক্ষাৎ প্রার্থী,
অবিলম্বে চান তিনি আপনার উপস্থিতি,
এখনি, এ মুহূর্তেই।

ওথেলো। কি ব্যাপার, মনে হয়?

কেসিও। অনুমানে মনে হয়, সাইপ্রাস থেকে কিছু।
কোনো কিছু জরুরী ব্যাপার। নৌবহর থেকে
ক্রমান্বয়ে পাঠিয়েছে বারোজন সংবাদবাহক
একের পরেতে এক আজই এই রাতের ভেতরে।

শয্যা ছেড়ে কনসালেরা অধিকাংশ জড়ো হয়েছেন
এরই মধ্যে ডিউকের কাছে। আপনাকে চাইছেন সবাই।
আপনাকে আপনার গৃহে না পাওয়ার ফলে
সেনেটের আদেশে গেছে তিন দল লোক তিন দিকে
আপনার অন্বেষণে।

ওথেলো। ভালো হল, তুমি দেখা পেলে।
সামান্য অপেক্ষা কর, বাড়িতে একটা কথা বলে
ফিরে এসে সঙ্গে যাবো।

[প্রস্থান]

কেসিও। সত্যকী, ব্যাপার কি, এখানে যে উনি?

ইয়াগো। জানেন না, আজ রাতে বাসিয়েছেন ফলপ্রসূত এক:
তা যদি পারেন রাখতে, কেল্লা ফতে তাঁর।

কেসিও। বুঝলাম না কিছু।

ইয়াগো। করেছেন বিয়ে।

কেসিও। কাকে?

[ওথেলোর পুনঃপ্রবেশ]

ইয়াগো। বিয়ে—ইয়ে—আসুন, চলুন?

ওথেলো। তৈরী আমি চল।

কেসিও। আসছে আরেক দল আপনার সন্ধানে।

ইয়াগো। আসছেন ব্রাবানশিও। হুঁশিয়ার, সেনাপতি,
মতলব খারাপ মনে হয়।

[মশাল ও অস্ত্র-শস্ত্র সহ ব্রাবানশিও, রোডারিগো,
ও অন্যান্য কর্মচারীদের প্রবেশ]

ওথেলো। সাবধান, দাঁড়াও ওখানে।

রোডারিগো। সিনিয়র, এই যুদ্ধ।

ব্রাবানশিও। বলাতলে যা তুই বজ্জাত।

[উভয়ে তরবারি নিষ্কাশন]

চলে আয় রোডারিগো, লড়ে যা আমার সঙ্গে।

ওথেলো। রাখুন ও নীতি আদি তুলে, শিশিরের ছোঁয়া লেগে মরতে
ধরে যাবে।
তত্ত্ব সিনিয়র, আপনি অন্তরঙ্গের থেকে যখন-তখনই
করবেন অধিক শাসন।

ব্রাবানশিও। নীচ তস্কর, বল রেখেছিস কোথায় মেয়েকে?
শাসত যেমন তুই, নিশ্চয় যাদু করে রেখেছিস তাকে:
সাধারণ সহজ বুদ্ধি প্রমাণ আমার,
যাদুর শেকলে বন্দী না হলে সে মেয়ে,—
এমন কোমল নম্র, আনমপ্রতিমা,
বিবাহে অনিচ্ছা এত, প্রত্যাখ্যান করেছে যে
রূপে অর্থে সেরা সেরা স্বজাতি দুলাল,—
সে মেয়ে সবার কাছে হাস্যাস্পদ হতে
নিশ্চিত আশ্রয় ছেড়ে যায় কি কখনো ছুটে
তোর মত কালিমাখা শিশাচের বুকে? হর্ষ নয়,
ভীতি যে জাগায়?
এ জগৎ করুক বিচার, এ ব্যাপার স্বতোসিদ্ধ কিনা,—
তুই হীন কুহক প্রয়োগ করেছিস সে মেয়েতে,
ওষধি প্রভাবে তার যৌবন ফুলের মত
করেছিস বিষম বিকল; এ বিবাহ সহজে মিটছে না।
যেমন সম্ভব তেমনি আবশ্য এ ঘটনা।
তোকে তাই বন্দী করছি, অপরাধ তোর,—
সমাজের শত্রু তুই, পেশা তোর যাদুকরী,
নিষিদ্ধ সম্মোহ বিদ্যা তোর ব্যবসায়।
ধর ওই পাষণ্ডকে; বাধা দিতে এলে
জোর করে বাধ্যতা শেখাবি।

ওথেলো। শান্ত হন;
সসম্ভ্রম বিনয় আমি সবাইকে করছি অনুরোধ!
যুদ্ধ যদি চাইতাম তবে হতাম প্রস্তুত
আরও মিলাই। বলুন কোথায় যেতে হবে
আমাকে জবাব দিতে?

ব্রাবানশিও। কারাগারে। থাকবি সেখানে
যতদিন আইন ও আদালত তদন্ত না করে তোকে
তবাবদিহির জন্যে।

ওথেলো। যদি তা মেনেই নি, তবে?
ডিউকের ইচ্ছা পূর্ণ তাহলে কি করে হবে?
এখানে আমার কাজে উপস্থিত এরা তাঁর দূত;
রাজ্যের জরুরী কোনো প্রয়োজনে এসেছে এরা
তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যেতে।

কর্মচারী। মহামান্য সিনিয়র, সত্য এই কথা।
পরিষদে সমাসীন ডিউক, নিশ্চিত আমার বিশ্বাস
আপনারও পাঠিয়েছে ডাক।

ব্রাবানশিও। কি ব্যাপার? সভাসীন ডিউক!
অসময়ে এত রাত্রে। নিয়ে চল ওকে,
অভিযোগ আমার তুচ্ছ নয়। ডিউক স্বয়ং,
অথবা এ রাষ্ট্রের সহকর্মী যে যে আছে
না ভেবে পারেন না কেউ এ অন্যায়ে তাঁরা ব্যথাহত;
কারণ, এমন কার্য যদি হয় অবাধে সাধন
সবারে ও ক্রীতদাসে এই রাজ্য করবে শাসন।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য—সভাগৃহ

[টেবিলের চারপাশে ডিউক ও সেনেটরগণ উপবিষ্ট।
কর্মচারীগণ তাঁদের আদেশের প্রতীক্ষারত।]

ডিউক। সারবত্তা কিছু নেই এ সব সংবাদে,
অবিশ্বাস্য সব।

প্রথম সেনে। বাস্তবিক কোন মিল নেই।
আমার চিঠিতে দেখছি আছাত্তর জাহাজ।

ডিউক। আর আমার একশ' চল্লিশ।

দ্বিতীয় সেনে। আমার শ'দুই।
এইসব বিবরণে যদিও সেলে না কছু যথার্থ হিসেব,—
যেমন এ চিঠিগুলো শুধুমাত্র অনুমানে ভরা,—
গরমিল স্বাভাবিক,—তবুও সকলে একমত,
তুর্কীর নৌবহর এই, এবং তা সাইপ্রাসগামী।

ডিউক। ভালোভাবে ভেবে দেখলে একমাত্র এটাই সম্ভব।
গরমিলে ভরসা করে নিরাপদ ভাবি না নিজেকে,
বরঞ্চ মোটামুটি খবরটা যদি মেনে নিই
শঙ্কার কারণ আছে।

নাবিক। [নেপথ্যে] কে আছেন, শুনুন, শুনুন।

কর্মচারী। নৌবহর থেকে এক দূত।

[একজন নাবিকের প্রবেশ]

ডিউক। কি খবর বল।

নাবিক। তুর্কীর নৌবহর রোডস্ অভিমুখী।
সিনিয়র এঞ্জেলোর আদেশে একথা
জানাই।

ডিউক। কি কারণে এ পরিবর্তন?

প্রথম সেনে। অসম্ভব,
একেবারে অযৌক্তিক; নিছক একটা ধোঁকা
আমাদের চোখে ধুলো দিতে। যদি ভেবে দেখি,
সাইপ্রাসের গুরুত্ব বেশী তুর্কীদের কাছে,
আরো যদি চিন্তা করি সহজেই যুক্তি তাহলে,
রোডস্ থেকে সাইপ্রাসেই তুর্কীদের অধিক স্বার্থ,
তেমনি সাইপ্রাসজয় কষ্টসাধ্য নয়ক' ততটা,
যেহেতু সেখানে নেই যুদ্ধের তেমন প্রস্তুতি,
যুদ্ধ পায় সরঞ্জাম নিতান্ত বিরল তায়
রোডস্'এর সঙ্গে তুলনায়। এই কথা যদি মনে রাখি,
তাহলে ভাবি না যেন তুর্কীদের এতটা নির্বোধ
যে তারা হাতের লক্ষ্মী ঠেলে ফেলে দেবে;
অনায়াস দখলের সুযোগকে অবহেলা করে

বিনা দাতে খোঁচা দিয়ে বিপদকে ভুলতে জাগিয়ে।

ডিউক। বাস্তবিক, মনে হয়, রোডস্ নব উদ্বেগ তাদের।

প্রথম কর্ম। আরো কিছু খবর এসেছে।

[একজন দূতের প্রবেশ]

দূত। মহামান্য মহামতি, তুরস্কের রণপোতগুলি
রোডস্ দ্বীপ অভিমুখে গতি স্থির রেখে
যুক্ত হয়েছে এক অনুগামী নৌবহর সাথে।

প্রথম সেনে। যা ভেবেছি, সংখ্যায় কত মনে হয়?

দূত। তিরিশটা রণতরী, এখন ফিরছে তারা
সিপ্রসের পথে; নিজ মূর্তি প্রকট এবারে।
সাইপ্রাসই তাদের লক্ষ্য। সিনিয়র মন্টানো,
আপনাদের সুবিশ্বস্ত বীর অনুচর,
তড়িদ্বেগে এ সংবাদ নিবেদন করেছেন এ ব'লে,
যত্ন করে এ খবরে বিশ্বাস রাখেন যেন।

ডিউক। সাইপ্রাসই ওদের লক্ষ্য তবে।
মার্কস লুচিকোস নেই কি শহরে?

প্রথম সেনে। এখন রোডেসে আছে।

ডিউক। আমাদের নামে লিখে দিন: পত্রপাঠ যাত্রা করে যেন।

প্রথম সেনে। আসছেন ব্রাবানশিও নির্ভীক যুবের সঙ্গে।

[ব্রাবানশিও, ওথেলো, ইয়াগো ও অন্যান্য কর্মচারীগণের প্রবেশ]

ডিউক। নির্ভীক ওথেলো শোনো, এখনি তোমাকে যেতে হবে
চিরশত্রু তুর্কীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।
[ব্রাবানশিওকে] আপনাকে পাইনি দেখতে; আসুন,
আসুন, সিনিয়র;
আজ রাতে বঞ্চিত হয়েছি আমরা আপনার পরামর্শ থেকে।

ব্রাবানশিও। আমিও আপনাদের। ক্ষুব্ধের ক্ষমাপ্রার্থী আমি;
রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বোধ কিম্বা কোনো জরুরী তলব
শয্যাঘাত করেনি আমার, সাধারণ কল্যাণ চিন্তাও
আমার ভাবনায় নেই। কারণ আমার শোক
বড়ো প্রাবনের মত এখন সর্বগ্রাসী,

আর সব দুঃখ তাতে পূর্ণভ্রত হয়ে মিশে যায়,
তবু শোক যেমন তেমনই থাকে।

ডিউক। কি ব্যাপার, ঘটেছে কি ?

ব্রাবানশিও। আমার—আমার মেয়ে। ওঃ।

ডিউক। } যারা দেছে ?
সেনে। }

ব্রাবানশিও। হাঁ, তাই, আমার কাছে।
ধর্ষিতা সে অপহৃতা, বুদ্ধি তার বিকল হয়েছে
ওঝার ওষুধে আর যাদুমন্ত্র প্রয়োগের ফলে।
কারণ স্বভাব থেকে এতটা বিচ্যুতি,—
নয় যে নির্বোধ অন্ধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন,—
কখনো সম্ভব নয় বিনা সম্মোহনে।

ডিউক। যে কেউ হোক সে ব্যক্তি, এই মত অন্যায় উপায়ে
করেছে যে আত্মহারা কন্যা আপনার
আর কন্যাহারা আপনাকে, নিষ্করুণ তাহে নিজে
ঘনাইচ্ছা আইনের নির্দয় বিধান
প্রয়োগ করুন তার 'পরে, হোক সেই নরাধম
আমাদের পুত্র, তবু।

ব্রাবানশিও। মাননীয় বন্ধুবর।
এই সেই ব্যক্তি, এই মূঢ়; বোধ হয় এখন তাকে
রাজ্যের প্রয়োজনে আপনারই আদেশবলে
ডেকে আনা হয়েছে এখানে।

ডিউক। } আমরা সর্বাহত।
সেনেটরগণ। }

ডিউক। [ওথেলোকে] আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু আছে বক্তব্য তোমার ?

ব্রাবানশিও। কিছু নেই অন্যায় স্বীকার ছাড়া।

ওথেলো। মহামতি পূজনীয় ভেনিসীয় সিনিয়রগণ,
অতীব মহৎ আর সদাশয় প্রভুরা আমার,
এ বৃদ্ধের কন্যাকে আমি করেছি হরণ,
অভিযোগ অতি সত্য; সত্য তাকে বিবাহে বেঁধেছি;

আমার যা কিছু ত্রুটি, অন্যায় যা কিছু,
এই মাত্র, আর নয়। আমি রূঢ়ভাষী,
জানি না ললিত কথা শান্তির শিষ্টাচারসম্মত ;
কারণ এ হাত দুটি সাত বছর বয়স থেকে
আজ অবধি, ব্যতিক্রম বিগত ন'মাস,
লিপ্ত আছে রণক্ষেত্রে অতি প্রিয় কাজে ;
কীই বা বলতে পারি বিপুল এ পৃথিবীর কথা,
পারি শুধু যুদ্ধবন্ধ-সম্পর্কে কেবল।
স্বভাবত সাদাসিধে আত্মসচেতন সমধিক হবে
নিজে যদি বলি নিজ কথা। তবু, একটু ধৈর্য্য ভিক্ষা চাই,
শুনুন বলি যা আমি স্পষ্টভাষে বিনা ভনিতায়
ইতিহাস আমার প্রেমের, যেমন কী ওষুধি, দুহক,
সম্মোহন অথবা কী সাংঘাতিক যাদুমন্ত্রবলে,
যে হেতু এ সব দোষে দোষী মাত্র আমি,
আমি তাঁর কন্যাকে বেঁধেছি।

ব্রাবানশিও। কি নিষ্ঠুর মেয়েটা আহা।
স্বভাবত শান্তশীল এত, নিজের চলনভঙ্গী
নিজেকেই লজ্জা দেয় ; সেই মেয়ে কিনা
দেশ মান বয়স স্বভাব, সব কিছু অস্বীকার করে
যাকে দেখে ভয়ে সারা, তারই প্রেমে হয়েছে পাগল।
সে বিচারে ত্রুটি আছে, বিচার বিচারই নয়,
যে বিচার মেনে নেয় এ ছলনাময়ীর পক্ষে
স্বভাবের এতটা বিচ্যুতি ; বিচারের আগে
নিশ্চয় জানতে হবে ক্রুর যত পিশাচ আচার
ঘটায় যা এমন প্রমাদ। আমার বিশ্বাস তাই পুনরায় বলি,
মোহিত প্রবলক্রিয় কোনোরূপ ওষুধের ফলে
কিম্বা কোনো যন্ত্রই ওষধি প্রয়োগে
মেয়েকে সে করেছে বশ।

ডিউক। বিশ্বাস প্রমাণ নয়,
আরো বেশী সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই।

আপাতত এ অনুমান, এইটুকু ক্ষীণ সম্ভাবনা
এ অভিযোগের পক্ষে কভু গণ্য নয়।

প্রথম সেনে। ওথেলো, এবারে বল :
ছলে কিংবা বলে এই তরুণীকে বশীভূত করে
বিপর্যস্ত করেছ কি শুধু মনোগতি?
অথবা এসেছে সে কি দাম্পত্যের সুসংগত আলাপের পথে
অন্তরে অন্তর যথা আসে?

ওথেলো। অনুরোধ,
আসুন সে মহিলাকে সাক্ষিটারি থেকে,
নিজের পিতার সামনে বলুক সে আমার বিষয়ে;
যদি তার বিবরণে মনে হয় আমারই সম্পূর্ণ দোষ,
যে বিশ্বাস, যে অধিকার রেখেছেন অধীনের 'পরে,
নিন তা কিরিয়ে, অধিকন্তু মুণ্ডপাতে
দণ্ড দিন মৃত্যুদণ্ড।

ডিউক। নিয়ে এস ডেসডিমোনাকে।

ওথেলো। পতাকী, সঙ্গে যাও; সেই স্থান ভালো জানো তুমি।
[ইয়াগো ও অনুচরগণের প্রস্থান]
যতক্ষণ না আসে সে, ঈশ্বরের সম্মুখে যেমন
অসংকোচে মেলে ধরি অন্যায় বা স্বভাবে আমার,
সেই মত অকপটে জানীগুণী আপনাদের কাছে
বলব। শুনুন, আমি কি ভাবে পেয়েছি এই সুন্দরীর প্রেম,
সেও প্রেম পেয়েছে আমার।

ডিউক। শোনাও ওথেলো।

ওথেলো। ব্রিশাধ স্নেহের পাত্র কন্যার পিতার, প্রায়ই কাছে ডাকতেন,
নিয়ত উদ্‌গ্রীব তিনি শুনতে এই জীবন কাহিনী,—
বর্ষ থেকে বর্ষান্তরে মুহূ অবরোধ কত ভাগ্য বিপর্যয়
অতিক্রান্ত এ জীবনপথে।
বলেছি আগুন সব, এমন কি কিশোর কাল থেকে
জিজ্ঞাসা করার সেই মুহূর্ত অবধি;
প্রসঙ্গে বলেছি আমি রোমহর্ষ নানা দুর্বিপাক,

সাগরে প্রান্তরে কত দুর্ঘটনা বিপদসঙ্কুল,
মৃত্যুরন্ধ্রে পলায়নে কতবার জীবন সংশয়,
কি ভাবে দাস্তিক শত্রু কবলিত হয়ে
দাসরূপে হয়েছি বিক্রীত, পরে মুক্ত হয়েছি কি করে,
আরও কত অভিজ্ঞতা দেশে দেশে পথিন কালে :
বিরাট গুহার কথা, চিরস্থায়ী সুবিস্তীর্ণ মরু,
রুক্ষ শিলাকর আর শৈলচূড়া আকাশচুম্বিত
যবে দেখি বর্ণনায়,—এইভাবে বলেছি কাহিনী।
প্রসঙ্গে হয়েছে কথা কানিবল নর মাংসাশীর
আরো নরখাদকের, বিচিত্র মানুষের কথা
যাদের স্কন্ধ নিচে। এ সব শোনার জন্য
ডেসডিমোনা থাকত উৎসুক হয়ে ;
কিন্তু ঘরের কাজে প্রায় তাকে চলে যেতে হত।
সে কাজ সমাধা করে সাধ্বীসতী শঙ্কিত পদক্ষেপে
আবার আসত ফিরে, উৎকর্ণ উদ্গ্রীব হয়ে
শুনতে আমার কথা। সব সময় করেছি আমি :
কোনো এক অবসরে যাচিত সুযোগ এল
তার নিজ মুখ থেকে আমার এ উপরোধ আমায় করার,—
সুবিস্তারে বলি যেন আমার জীবনকথা,
কিছু কিছু অংশ যার শুনেছে সে বিচ্ছিন্নভাবে,
তাও নয় একাগ্রে শোনা : হলাম স্বীকার ;
কত যে দেখেছি তার ঘুমঘোর চোখে জলে ভরে,
যখনই শুনেছে কোন প্রতিকূল ভাগ্যের প্রহারে
আর্তক্লিষ্ট যৌবন আমার। কাহিনী শেষ হলে
পুরস্কার দিয়েছে সে সহস্র দীর্ঘশ্বাস কত ;
বলেছে অবাক হয়ে, কী আশ্চর্য, অদ্ভুত আশ্চর্য,
কী দুঃখের, মর্মান্তিক দুঃখের কাহিনী ;
না শোনাই ছিল ভালো বলে আমায় বলেছে,
এমনি পুরুষ যদি ভাগ্যে হত তার : ধন্যবাদ দিয়ে
বলেছে আমায় যদি বন্ধু থাকে প্রেমপ্রার্থী তার,

তাকে যেন শিক্ষা দিই এ কাহিনী বলার ধরণ,
তাই তাকে জয় করে নেবে। এ ইস্যুতে আমিও বলেছি।
সে আমাকে বলেছিল তাদের দুর্গত দিনের কথা শুনে,
তাকেও বলেছি আমি, কেঁদেছে সে দুর্ভাগ্যে আমার।
এইমাত্র যাদুমন্ত্র প্রয়োগ করেছি তার পরে :
কন্যা নিজেই আসছে ; সেই সাক্ষী ঠিক।
[ডেসডিমোনা, ইয়াগো ও অনুচরের প্রবেশ]

ডিউক। এ কাহিনী আমারও বুঝি কন্যাকে জয় করে নিত।
ভদ্র ব্রাবানশিও,
বিক্ষত এ ঘটনার যতটুকু ভালো তাই নিন ;
অস্ত্র যদি ভেঙে যায় শুধু তার আগে ব্যবহার
নিরস্ত্র হওয়ার চেয়ে ভালো।

ব্রাবানশিও। প্রার্থনা, শুনুন কন্যার কথা ;
যদি সে স্বীকার করে এই প্রেমে অর্ধেক সে দায়ী,
সর্বনাশ হোক আমার, যদি আমি বিনা অপরাধে
দোষী করি এ ব্যক্তিকে। আয় মা, এদিকে আয় :
সম্মানিত এ সভায় দেখ্ দেখি কে এমন আছে
যার প্রতি সবচেয়ে অনুগত তুই ?

ডেসডিমোনা। পিতৃদেব,
কর্তব্য এখানে দেখি বিভক্ত বিষয় :
জন্মদাতা পিতা তুমি শিক্ষাদাতা গুরু :
এই জন্য এই শিক্ষা দেখায় আমাকে
তোমাকে শ্রদ্ধার রীতি। তুমি তাই কর্তব্যের প্রভু,
এই অবধি আমি কন্যা। কিন্তু এখানে আমার স্বামী :
যতটা কর্তব্যনিষ্ঠ মা আমার ছিলেন তোমাতে,
তাঁর পিতৃকুলনাশ তোমাকেই প্রিয়তর জেনে,
ততখানি অধিকার দাবি করি আমি
স্বামী মুর প্রতি।

ব্রাবানশিও। ঈশ্বর ভরসা তোর। আমার হয়েছে দায়।
অনুরোধ মহাভাগ, রাজকার্য শুরু হোক :

ঔরস সন্তান থেকে বরঞ্চ সেতু ছিল ভালো।
শুনে যা এদিকে, মূঢ় :
অন্তর উজাড় করে এ মুহূর্তে তোকে যা দিলাম,
না এলে ধরণে তোর, সমস্ত অন্তর দিয়ে
রাখতাম তোর থেকে দূরে। কন্যারত্ন, কি বলব আর,
যথার্থই খুশি আমি, নেই আর সন্তান আমার।'
কারণ তোর এ কীর্তি মিছুরতা শেখাত আমাকে,
বীরত্বাম দেবলে তাদের। আমার হয়েছে শেষ, প্রভু।
যদি তবে উপযোগী কিছু নীতিকথা,
তার ফলে যদি এ দুফল ভাগ্যে কিছুটা লাঘবে
আপনার আশীর্বাদ জোটে।
প্রতিকার নেই তবে, আশা শুধু ছল
সর্বনাশ ঘটে গেলে দিয়ে অশ্রুজল।
যে দুর্দৈব অনাগত, তা লয়ে বিলাপ
পরবর্তী দুর্দৈবের অনিবার্য ধাপ।
অদৃষ্টের গ্রাস হতে মুক্তি যদি অসম্ভবপর,
সহিষ্ণুতা সেই ক্ষতি পরিহাসে করে রূপান্তর।
দুষ্টিত, হাসির ছলে মুঠ করে দুঠেরার ধন,
অসার্থক শোক শুধু ছুটে নেয় শোকার্তের মন।
ব্রাবানশিও। আমাদের কাছ থেকে নিক ছুকী লাইগ্রাস তবে,
ক্ষতি তবে হবে না তা যতদিন মুখে হাসি রবে।
যার কোনো ধোকা নেই নীতিকথা সেই খাঁটি বুকে
খোলা কথা থেকে সে-ই আনন্দরস পায় খুঁজে।
নীতিকথা সাথে যাঁরা নয় ভাগ্যহীন
লোকের যাদুল দিতে সহ যার ক্ষীণ।
এইসব নীতিকথা একই কালে ভিক্ত সুখকর,
উত্তরত ধরতায়, অর্থান্তরে সমান মুখর :
কথা কিন্তু কথা শুধু : এ পর্যন্ত হয় নি সোচর
প্রতিপথে কোনো কথা স্পর্শ করে বিক্ষত অন্তর।
আমার বিনীত অনুরোধ, রাজকার্যে ব্রত হন।

তুর্কীরা বিপুল সমরসাজে সাইপ্রাস'এর দিকে যাত্রা করেছে।
সেখানকার রক্ষা ব্যবস্থা যে কেমন, ওথেলো, তুমি ভালো-
ভাবেই জানো; সেখানে যে আছে সে যদিও সুদক্ষ এবং
যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য, তবু, সবার মত, তুমি তার নিলে আরও
বেশী নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। জানো ত' সাধারণের ধারণা
কখনও ভুল হয় না। অতএব তোমার নব জীবনের
এই আনন্দকে যদি বিপদসঙ্কুল অনিবার্য এ অভিযানে
আপাতত চাপা দিতে হয়, তবুও তোমাকে এই বাণিজ্য খুশী
মনে গ্রহণ করতে হবে।

ওথেলো। মহামান্য সেনেটরগণ, নিত্য ক্লেশ অভ্যাসের ফলে
ইস্পাত কঠিন ওই রণশয্যা আমার কাছে
পুষ্পশয্যা সুকোমল: এ আমার অন্তরের কথা,
উৎসুক আগ্রহে আমি স্বভাবত ছুটে যাই
কঠিন যা তার দিকে: নিলাম এ ভার
তুর্কীদের প্রতিপক্ষে যুদ্ধ চালনার।
অতএব পরিবর্তে বিনীত এ প্রার্থনা আনাই,
আমার পত্নীর জন্যে যথা হোক যোগ্য আয়োজন,
যেমন, আবাস তার, অর্থ পরিমিত,
দাসদাসী অনুচর সুযোগ সুবিধা,
যুদ্ধে যেন যথা প্রাপ্য তার।

ডিউক। যদি রাজী থাকো
থাক না সে পিতৃগৃহে।

ব্রাবানশিও। আমি তা চাই না।

ওথেলো। আসিও না।

ডেসডিমোনা। আসিও না; দাও নেই সেখানে থাকায়,
পিতার চোখের সামনে তাঁর নিত্য চক্ষুশূল হয়ে
বিরক্তির ইন্ধন যোগাতে। মহামান্য উজীর ডিউক,
আমার মনের কথা দয়া করে একটু শুনুন;
আমার সরল কথা আপনার আশীর্বাদে যেন
হয় সমর্থিত।

ডিউক। কী তোমার ইচ্ছা, ডেসডিমোনা ?

ডেসডিমোনা। মুরকে বেছেছি ভালো একসাথে থাকার আশায়,
আমার অবাধ্য কাজে আর আমার ভাগ্যবিপর্যয়ে
এ কথাই রয়েছে রাষ্ট্র : আমার হৃদয় যেন
স্বামীর সত্তার সঙ্গে একান্ত হয়ে মিশে গেছে ;
ওথেলোর মুখে আমি দেখেছি মনের ছবি তার ;
তার যশস্বীর্যে তার সম্মানে গৌরবে
এ হৃদয় ভাসা আমি উৎসর্গ করেছি।
তাই প্রিয় প্রভুরা আমার, যদি দিয়ে থাকি একা
শান্তির সুখের নীড়ে, আর তাকে যুদ্ধে যেতে হয়,
অধিকার চ্যুত হব বর্ম থেকে সহধর্মিণীর,
তাছাড়া সইতে হবে গুরুভার মধ্যবর্তীকাল
প্রিয়তম বিরহ দুঃখ। সঙ্গে তার যেতে দিন প্রভু।

ওথেলো। ইচ্ছা ওর পূর্ণ হোক আপনাদের সম্মতিলাভে।
ভগবান আমার সাক্ষী, এ ভিক্ষা চাই না আমি
লোলুপ লালসা হবে চরিতার্থ বলে,
কিংবা উন্মাদনা মোহে,—তারুণ্যের সে উত্তাপ
নিতে গেছে কবে,—অথবা সুখের মোহে,
আকাঙ্ক্ষা কেবল তার অবাধে মেটাতে চাই আমি ;
তা বলে, প্রভুরা, যেন এই ভাবনা মনেতে না জাগে,
আপনাদের এ গুরুদায়িত্বভার উপেক্ষিত হবে,
যেহেতু সে সঙ্গে রবে। কখনো না, লঘুপাক পুষ্পধনু
যদি দৃষ্টি অন্ধ করে পুষ্পশরাঘাতে,
বিবশ বিকল করে সুস্থ চিত্ত কর্মকুশলতা,
মাতার বিলাস সুখে, ভ্রান্তি আনে কর্তব্যে আমার,
হোক আমার শিরস্ত্রাণ শাটিকার রঙিন তৈজস,
ঘৃণ্য ও জঘন্য যত নিন্দা অপবাদ
যশ খ্যাতি সব দিক যুদ্ধে।

ডিউক। তোমার যা ইচ্ছা হয়, থাক সে এখানে
কিংবা সঙ্গে নিয়ে যাও : এ সঙ্কটে বিলম্ব নয় না,

অবিলম্বে সাহায্য চাই।

প্রথম সেনে। আজ রাতে যাত্রা কর স্থির।

ওথেলো। সর্বান্তঃকরণে।

ডিউক। আবার এখানে আমরা মিলব কাল সকাল ন'টায়।
ওথেলো, এখানে কোনো কর্মচারী রেখে যেও,
আমাদের সনদ সে নিয়ে যাবে তোমার কাছে,
সঙ্গে নেবে আরও সব সম্মান ভূষণ
তোমার মর্যাদা মত।

ওথেলো। যথা আজ্ঞা, রইল সত্তাকী এই;
বিশ্বাসে ও সততায় এ ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য:
আমার পত্নীর ভার রইল ওর 'পরে।
যদি কিছু পাঠাবার থাকে, পাঠাবেন ওরই হাতে
আমার নিকটে পরে।

ডিউক। বেশ, তাই হবে।
রাত্রি শুভ হোক সবাকার। [ব্রাবানশিওকে] আর তুমহর
সদগুণ যতীত রূপে হলে মনোহর,
আপনার জামাতা কভু কালো নয়, অতীব সুন্দর।

প্রথম সেনে। বিদায় নির্ভীকচেতা, যত্নে রেখো ডেসডিমোনাকে।

ব্রাবানশিও। চোখে রেখো তাকে, মূর, চোখ যদি থাকে:
পিতাকে যে ঠকিয়েছে, পারে সে তোমাকে।
[ডিউক, সেনেটর ও কর্মচারীগণের প্রস্থান]

ওথেলো। এ জীবন অঙ্গীকার তার সততায়। সাধু ইয়াগো, শোনো,
রইল তোমার কাছে আমার ডেসডিমোনা:
তোমার পত্নীকে ব'লো পরিচর্যা করে যেন তার;
পরে অবসর মত তাদের সঙ্গে এনো।
এসো ডেসডিমোনা; আছে মাত্র একঘণ্টা
বিষয় ব্যাপারে কিংবা প্রেমালাপে তোমার সঙ্গে
নিয়ত থাকার: সময়ের দাস আমরা সব।
[ওথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান]

রোডারিগো। ইয়াগো!

ইয়াগো। কি ভাই, ব্যাপার কোন্ত?

রোডারিগো। এবার, আমি কি করি?

ইয়াগো। কেন, শয়নে পদ্মনাভঞ্চ।

রোডারিগো। আমি এক্ষুনি ডুবে মরব।

ইয়াগো। তা যদি কর, তোমার পক্ষে মতি আর টিকবে না। কিন্তু তোমার এ বোকামি কেন?

রোডারিগো। বেঁচে থাকা মানে যখন জ্বলে মরা, তখন বাঁচাই তো বোকামি। আর মরাই যখন সুশিক্ষিত আসান তখন মরাই ত' একমাত্র দাওয়াই।

ইয়াগো। হিঃ হিঃ হিঃ, এ সব শুনলেও পাপ। এই দুকুড়ি আট বছর ধরে এই দুনিয়াটাকে দেখে আসছি: অথচ যেদিন থেকে আমি বুঝতে শিখেছি কিসে লাভ আর কিসে লোকসান, সেদিন থেকে এমন একটা মরদও খুঁজে পেলাম না যে জানে কি করে নিজেকে ভালোবাসতে হয়। একটা বেশ্যার ভালোবাসার জন্যে ডুবে মরব, একথা বলার আগে মরদ একটা বেজুনের কাছে আমার ভেতরকার মানুষটাকে বিকিয়ে দেব।

রোডারিগো। কি করব বল? আমি জানি, আমার এই পাগলামি লজ্জার বিষয় কিন্তু নিজের স্বভাব শোধরানো আমার সাধ্যে নেই।

ইয়াগো। সাধ্য! হোঃ। এই কিংবা ওই হওয়াটা একেবারে আমাদের মনের ব্যাপার। আমাদের শরীরগুলো বাগান, আর তার মালী—আমাদের মর্জি; এ বাগানে তাই বিছুটিও চষতে পারি আবার শাকসব্জীও বুনতে পারি, ফুলগাছও পুঁততে পারি, বটে গাছও ছুঁড়তে পারি, একজাতের সতার যেমন ওরাট করতে পারি তেমনি নানাজাতের গাছগাছড়াও চষতে পারি, কুঁড়েমি করে নিষ্ফলাও রাখতে পারি, আবার সার দিয়ে মেটেখুটে ফলাও করতে পারি; যখন যা মর্জি, মর্জির জোরে সবই সম্ভব। আমাদের জীবনের তুলাদণ্ডে একদিকে দুষ্কি

আরেক দিকে প্রবৃত্তি। এই যুক্তি যদি প্রবৃত্তিকে বশে না রাখত, তাহলে আমাদের স্বভাবের মধ্যে যা আছিল, যা বস্তু, তা আমাদের নিষ্করুণ পরিণতির মুখে ঠেলে দিয়ে যেত। কিন্তু আমাদের যুক্তি আছে, সেই যুক্তি দিয়েই আমরা আমাদের রিপুর আবেগকে, লালসার স্বপ্নকে, উদ্দাম কামনাকে দমন করি: এর থেকে প্রতিপন্ন হয় তুমি যাকে 'ভালোবাসা' বল তা এই লালসারূপেরই একটা তারা বা পরগাছা।

রোডারিগো। কখনো না।

ইয়াগো। আমি বলছি, এ নিছক রক্তের লালসা, মর্জির দরায় টিঁকে থাকে। মরদের মত সব ঝেড়ে ফেল। ডুবে মরবে? কেন, তুমি কি কানা কুত্তুর। যা, বেরাল বাচ্চা। সবাই জানে আমি তোমার বন্ধু, তোমার কাজে স্বীকার করছি। তোমার যা তলাবলী তার সঙ্গে আমি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছি; এখন যদি তোমার পাশে না দাঁড়াই কবে আর দাঁড়াব। শোন বলি, টাকায় থলি ভরো, আর যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে রওনা হও; মুটো দাড়ি লাগিয়ে চেহারা বিলকুল পালটে ফেল; যা বললাম, থলি ভরে টাকা নিও। বলে দিচ্ছি, মেখো, মুরের উপর ডেসডিমোনার ভালোবাসা বেশীদিন টিকতে পারে না,—মোদ্দা, থলি ভরে টাকা নিও, —তেমনি, মুরেরও টিকবে না। রক্তের মত যেমন আকস্মিক এর আরম্ভ, দেখবে, এর শেষও তেমনি। থলিটা শুধু টাকায় ভরে রেখো। এই মুরগুলোর মর্জির ঠিক নেই। তুমি শুধু টাকায় থলি ভরতে থাকো:—এখন যা তার কাছে মধুর মত মিষ্টি, দেখতে দেখতে তাই তার কাছে নিমের মত তেতো হয়ে দাঁড়াবে। জোয়ান বয়সের ছোকরাকে দেখে সে মেয়ে ভাসবেই, মুরের দেহভোগে তার আশ মিটে গেলে ও মেয়ে ঠিক বুঝবে মুরকে বিয়ে করে কি ভুল করেছে। নিশ্চয় বলছি, ও মেয়ে ছেড়ে যাবেই: তাই জেনে, যত পারো টাকায় থলি ভর্তি কর। সত্যি যদি তুমি

মরতে চাও, না ডুবে তা অনেক সুষ্ঠুভাবে সারতে পারো। সাধ্যমত টাকার জোগাড় কর। হয়ত্যো একটা ঝড়ের সঙ্গে অত্যন্ত শক্তিধর এক ভিনিশীয় মেয়ের বিয়ের ভাঁড়ামি আর মেকী পাঁটহত্তা যদি আমার ফুটবুদ্ধির কাছে, সেইসঙ্গে মরকের সব শিসাচ শক্তির কাছে টিঁকে থাকতে না পারে, তবে জেনে রেখো, ও মেয়েকে তুমি ভোগ করবেই; অতএব টাকার জোগাড় কর। ডুলোর থাকে, তোমার ডুবে মরা। ও মতলবটা একেবারে বেতালা: মজা লুটতে গিয়ে যদি ফাঁশীতে লটকাতে হয়, তাও ভালো, কিন্তু তাকে ভোগ না করে ডুবে মরার মতলব ছাড়ো।

রোডারিগো। তোমার কথায় যদি ভরসা রাখি, তুমি কি আমার আশ মেটাতে আগ্রাণ চেষ্টা করবে?

ইয়াগো। আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থেকো: আগে টাকার জোগাড় কর গিয়ে। তোমাকে আগে অনেকবার, বার বার বলেছি, মুরটা আমার চক্ষুশূল: আমার আক্রোশ আমার মনে বিঁধে আছে: তোমারও মনের আশা কম নয়। প্রতিশোধ নিতে এস আমরা হাতে হাত মেলাই; যদি তার বৌকে ভাগাতে পারো তাহলে নিজে তো মজা লুটবেই, আমিও মজা দেখব। ভবিষ্যতে অনেক কিছুই ঢাপা আছে, সময়ে সব জানবে। যাও এখন; এগোও: টাকার যোগাড় রেখো। কাল এ বিষয়ে আরো কথা হবে। এখন এস।

রোডারিগো। সকালে কোথায় আমাদের দেখা হবে?

ইয়াগো। আমার বাড়িতে এসো।

রোডারিগো। ঠিক সময়ে হাজির হব।

ইয়াগো। আচ্ছা বেশ, এখন যাও। রোডারিগো, শুনছ?

রোডারিগো। কিছু বলছ?

ইয়াগো। ডুবে মরার কথা আর নেই ত, কিহে?

রোডারিগো। না, না, এখন আমি একেবারে পালটে গেছি। যা কিছু জমিজমা আছে সব বেচে দিচ্ছি।

ইয়াগো। হাঁ। তাই যাওগে যাও। এখন তাহলে এসো। টাকার থলি
ওর ভুলতে-ভুলো না। [রোডারিগোর প্রস্থান]
ইয়াগো। এইভাবে নির্বোধকে করি আমি ভূয়ের ভাণ্ডার।
আমার অর্জিত বিদ্যা একেবারে হত অপব্যয়
যদি এ পাজলের সঙ্গে সময়টা কাটিয়ে দিতাম
বিনা স্বার্থে কিংবা হলে। মুরটা আমায় চক্ষুশূল :
এ ধারণা অনেকেরই, আমার বিছানায় নাকি
করেছে সে আমারই কাজ : জানি না, এ সত্যি কিনা :
আমি কিন্তু সন্দেহই যথেষ্ট সত্য যেনে নিয়ে
ব্যবহার করে যাব। আমি তার সুবক্তরে ;
এতে তাকে ফাঁদে ফেলা খুবই সহজ হবে।
ক্যাসিওটা দেখতে ভালো ; ভেবে দেখি তাহলে এবার ;
ও চাকরিটা বাগাতেই হবে ; কথী আঁটা চাই
এক ঢিলে দুপাখী মারার ; কেমনে,কি করে ?—দেখা যাক :
কিছু দিন পর থেকে ওথেলোর কানে মন্ত্র দেওয়া
তার স্ত্রীর সঙ্গে ওর চলেছে আশনাই :
তার যা চেহারা আর চুলু চুলু ভাব,
সন্দের সহজে জাগে, জন্ম যেন মেরে পটাতেই।
মুরটা তো সাদাসিধে সরল বিশ্বাসী
তার কাছে সেই সৎ যে সৎ সাজতে পারে।
অনায়াসে অবাধে সে নাসিকা চালিত হবে
ঠিক গর্দভের মত।
বাজী-মাৎ ; কথী ঠিক ; নরক ও রাত্রি মনোহর
এ বীভৎস চক্রান্তকে করুক গোচর।

[যবনিকা]

'ওথেলো' প্রথম অঙ্কের অনুবাদ ১৩৮৩-র শারদীয়া সংখ্যা 'সাহিত্য পত্রে' প্রকাশিত হয়েছিল। সেই অনুবাদ সামান্যরূপে পরিবর্তন করে আমার প্রকাশিত হচ্ছে। 'ওথেলো' নাটকের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ 'একক'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার কথা আছে। এ ক্ষেত্রে প্রথম থেকে-শুরু করা সমীচীনও। সদা যাহুল্য, অনুবাদে মূলের গঠন যথাসাধ্য বজায় রাখা হয়েছে।

—অনুবাদক

ডেবিড হেয়ারের জীবন চরিত

প্যারীচাঁদ মিত্র

বিলাতে হেয়ার সাহেবের পিতা বড়ি প্রস্তুত ও ব্যবসায় করিতেন। স্কটলণ্ডীয় এবর্ডিন দেশস্থ এক নারীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার চারি পুত্র জন্মে, জোসেফ, আলেক্সজণ্ডর, জন্ ও ডেবিড। কলিকাতায় আসিবার অগ্রে ডেবিড একবার দেশে আপন মাতৃসম্বন্ধীয় কুটুম্ব সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। পরে ডেবিড কলিকাতায় আসিলে আলেক্সজণ্ডর এখানে আইসেন ও এক কন্যা রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। জনও ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ও ধন উপার্জ্জন করিয়া বিলাতে জোসেফের সহিত বাস করেন।

১৭৭৫ সালে স্কটলণ্ডে ডেবিড হেয়ারের জন্ম হয়। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পর, তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। কয়েক বৎসর ঘড়ির কার্য্যে হেয়ার সাহেব ধন সঞ্চয় করতঃ তাঁহার বন্ধু ব্রে সাহেবকে আপন কার্য্য অর্পণ করিলেন। প্রায় অধিকাংশ ইংরাজেরা এখানে আসিয়া ধন উপার্জ্জন করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এদেশ অপেক্ষা স্বদেশ তাহাদিগের পক্ষে সর্ব্ব প্রকারে শ্লাঘনীয় আর এদেশে থাকিবার কোন বন্ধন নাই। হেয়ার সাহেবেরও এখানে কোন বন্ধন ছিল না—বিলাতে তাঁহার ভ্রাতারা ও ভ্রাতাদিগের পরিবার ছিল কিন্তু তিনি সকল পার্থিব ভাব পরিত্যাগ করিয়া এদেশে কি প্রকারে বিশেষরূপে পরোপকার করিতে পারেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ ভদ্র ভদ্র হিন্দুদিগের বাটীতে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে তাঁহাদিগের সহিত সংমিলন হয় তাহাতেই উদ্যত হইলেন। কি নাচ, কি যাত্রা, কি কবি, কি আকড়াই, কি খেঁউড়ওয়ালা, কি পাঁচালি, কি ঘুলঘুলের লড়াই সকলেতেই হেয়ার সাহেব আহূত হইলে বসিয়া আমোদ করিতেন। উপরোক্ত আমোদ ভিন্ন ঐ সময়ে অন্যান্য কৌতুক ছিল। কোন কোন স্থানে সম্বেশের মজলিস অর্থাৎ সোলা বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া বৈঠকী সঙ্গীত হইত। কোন কোন স্থানে মানুষ পক্ষীর মত অর্থাৎ বৃহৎ বৃহৎ খাঁচার ভিতর মনুষ্য পক্ষীস্বরূপ থাকিতেন—

সভায় আনীত হইলে কেহ কাক, কেহ কাদাখোঁচা, কেহ সারস, কেহ বক এইরূপ নানা পক্ষীর প্রকৃতি দেখাইতেন ও মধ্যে মধ্যে গান করিতেন যথা "কুড়ুক কিং লাক্ ক্যাকুসন, গুলবর ক্যাকুসন, আলিপুরি ক্যাকুসন, কু—ক—।" কিয়ৎকাল বাবুদিগের সহবাসে হেয়ার সাহেব দেখিলেন যে, বাঙ্গালিদের মধ্যে বাঙ্গালা কি ইংরাজী কিছুই উত্তমরূপে অনুশীলিত হইতেছে না—স্থানে স্থানে যে পাঠশালা ছিল তাহা দেখিয়া এই স্থির করিলেন যে পাঠ্য পুস্তকের অভাব। ছাত্রেরা কেবল কিঞ্চিৎ অঙ্কবিদ্যা, পত্রলেখা, জমাওয়াসিল বাকি, গুরুদক্ষিণা ও গঙ্গার বন্দনা শিখিতেছে, কিন্তু শুদ্ধ লেখনে ও কথা কহিতে অক্ষম। ইংরাজিও নামমাত্র রূপে শিক্ষা হইতেছে। ভাল পুস্তক নাই, ভাল শিক্ষক নাই। এই অভাব সকল দূরে কিসে হয় এই চিন্তায় তিনি অন্যান্য যোগ্য ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি ইহারা ঐ সময়ের হিন্দু লোক ছিলেন। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান জজ স্যার হাইড ইষ্ট এতদ্দেশীয় লোকদিগের বড় হিতকারী ছিলেন। হেয়ার সাহেব তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন এই নগরে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় হইলে বাঙ্গালিদিগের উন্নতি হয়। স্যার হাইড ইষ্ট এই প্রস্তাব বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে জ্ঞাত করিয়া বলিলেন তুমি প্রধান প্রধান হিন্দুদিগের নিকট যাইয়া এবিষয়ে তাহাদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা যাহা বলেন তাহা আমাকে আসিয়া বল। এই সংবাদ শুনিয়া হেয়ার সাহেব সকলের নিকট যাইয়া আনুকূল্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এই জন্য সকলেই বৈদ্যনাথ বাবুর নিকটে ঐ প্রস্তাবের পোষকতা করিলেন। পরে বৈদ্যনাথ বাবু স্যার হাইড ইষ্টের নিকট আসিয়া তাঁহার প্রস্তাবে স্বদেশীয় প্রধান প্রধান লোকের সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর স্যার হাইড ইষ্টের বাটীতে কয়েক বৈঠকে এই ধার্য্য হইল যে এতদ্দেশীয় বালকগণের শিক্ষার্থে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত করা কর্ত্তব্য। সকল কার্য্য নিরুদ্বেগে সমাহিত হয় না। ঐ সময়ে রামমোহন রায় সহমরণ কলিকাতায় বড় গোলযোগ হইয়া উঠে। যাহাতে সহমরণ নিবারণ হয়—পৌত্তলিকতা উঠিয়া যায় ও এক নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা সকলে করেন, এই জন্য রামমোহন রায় প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র হইতে উক্ত মতের পোষকতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন—শাস্ত্রী যাহা গোপন ছিল তাহা প্রকাশিত

হইল, ও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং" মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহারা শাকোর উপাসক তাহারা একেবারে চটিয়া উঠিলেন ও রামমোহন রায়ের নাম শুনিলে বলিতেন—ও পাষণ্ডের নাম করিও না—ওটা নাস্তিক। অনন্তর হইল যে রামমোহন রায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের এক জন অধ্যক্ষ হইবেন। কলিকাতাবাসী অনেকেই রামমোহন রায়ের দ্বেষী ছিলেন। যাহারা যাহারা প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্থাপনে আনুকূল্য স্বীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে বৈদ্যনাথ বাবুকে ডাকাইয়া বলিলেন—শুনিতেছি রামমোহন রায় না কি প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ হইবেন? তাহা হইলে ওবিষয়ে আমাদিগের সহিত কোন সংস্রব থাকিবে না, নাস্তিকের সঙ্গে কে কার্য্য করিবে? বৈদ্যনাথ বাবু একটী শুভ কার্য্য সাফল্যে ত্বরান্বিত ছিলেন, এক্ষণে এই কথা শুনিয়া ম্লান হইলেন ও স্বকর্মস্থিতে স্যার হাইড ইষ্টের নিকটে যাইয়া অশুভ সংবাদ প্রচার করিলেন। স্যার হাইড ইষ্ট সুপ্রীম কোর্টের প্রধান জজ ও সর্ব্বপ্রকারে প্রেষ্ঠ ও বৈদ্যনাথ বাবুও উচ্চকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ কিন্তু দুই জনে নিরুপায় হইয়া থাকিলেন। সকল কার্য্যে যত্ন বুদ্ধি চাই। যে উপায়ে কার্য্য সর্শে এমন বুদ্ধি সকলের উপস্থিত হয় না—পরিষ্কার বুদ্ধি অভাবে উদ্দেশ্য সাধনে অনেক গোলযোগ ও হানি হয়। কোন্ পথ অবলম্বন করিলে কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে তাহা হেয়ার সাহেব ভাল বিবেচনা করিতে পারিতেন। তিনি দেখিলেন যে রামমোহন রায়কে নিরস্ত করাই শ্রেয়ঃ কল্প। এই ধার্য্য করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন যে তিনি অধ্যক্ষতা হইতে ক্ষান্ত না হইলে প্রস্তাবিত বিদ্যালয় স্থাপিত হয় না। রামমোহন রায়ের উদার চরিত্র ছিল, তিনি দেশের হিত সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন—আপন যশ ও গৌরব অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। রামমোহন রায়ের এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা হইলে যাহারা আপত্তি করিয়াছিলেন তাহারা সকলে স্যার হাইড ইষ্টের বাটীতে উপস্থিত হইয়া অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কালেজের নিয়মাদি করেক বৈঠকে ধার্য্য হইল। হেয়ার সাহেব উপস্থিত থাকিয়া সৎপরামর্শ প্রদান করেন। হিন্দুকালেজ স্থাপন জন্য হেয়ার সাহেব দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অনেক টাকা সংগ্রহ করেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারিতে হিন্দু কালেজ গরাণহাটা গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে স্যার হাইড ইষ্ট, হেরিংটন সাহেব ও হেয়ার সাহেব উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বাঙ্গালীদিগকে

বৈদ্যনাথ বাবু বলিলেন—এই বিদ্যালয় এক্ষণে বীজ স্বরূপ—পরে বট বৃক্ষের আকার ধারণ করতঃ অনেককে বীজ দ্বারা দ্বারা শীতলতা প্রদান করিবে। হেয়ার সাহেব হিন্দুকালেজে প্রতিদিবস আসিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। পটলডাঙ্গায় তাঁহার কিছু ভূমি সম্পত্তি ছিল কালেজ বাটীর. জন্য তিনি তাহা দান করিলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারীতে হিন্দুকালেজের বাটী নির্ম্মাণের সূত্রপাত হয়। এক বৎসরের মধ্যে বাটী প্রস্তুত হয় ও হেয়ার সাহেব কমিটীর অবৈতনিক মেম্বর হয়েন। হিন্দু কালেজের কার্য্য এইরূপে চলিতে লাগিল।

এদেশের হিতার্থে হেয়ার সাহেব কেবল হিন্দুকালেজে লিপ্ত ছিলেন না। ১৮১৭ সালে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী স্থাপিত হয়। এই সভার অভিপ্রায় যে, পাঠশালার জন্য ইংরাজী ও এতদ্দেশীয় ভাষায় পুস্তক সকল প্রস্তুত হইয়া অল্প অথবা বিনামূল্যে প্রদত্ত হইবে। এই সভার সভ্য কয়েকজন ইংরাজ ও বাঙ্গালী ছিলেন। পরে তাঁহারা বিবেচনা করিলেন যে, এই নগরে কতিপয় বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য। এজন্য ১লা সেপ্টেম্বর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে টাউন হলে এক প্রকাশ্য সভা হয়। ঐ সভায় এই ধার্য্য হয় যে, কলিকাতা স্কুল সোসাইটী নামক এক সভা স্থাপিত হউক ও এই সভার অভিপ্রায় এই যে, বঙ্গদেশীয় লোকদিগের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিস্তার জন্য যে সকল পাঠশালা আছে, তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনানুসারে পাঠশালা সংস্থাপন আবশ্যক। আর, এই সকল পাঠশালায় যে সকল ছাত্র বিখ্যাত হইবে তাহাদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা যাইবে। হেয়ার সাহেব উক্ত দুই সভারই সভ্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা স্কুল সোসাইটীর সম্পাদক হইলেন ও সকল পাঠশালারই তত্ত্বাবধান করিতেন। যে পাঠশালা আড়পুলিতে ছিল তথায় হেয়ার সাহেব অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন। এই পাঠশালায়, বিখ্যাত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গভাষা শিখেন—প্রথমে কলা গেছে পড়ো শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮২৩ সালে এই পাঠশালার নিকটে এক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যে যে বালক পাঠশালাতে বিখ্যাত হইত তাহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত। সমস্ত নগর চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক এক খণ্ড পাঠশালা সকল এক এক জনের অধীনে ছিল। তাঁহারা আপন আপন বাটীতে প্রধান প্রধান বালকদিগকে বৎসরের মধ্যে তিনবার পরীক্ষা করতঃ তাহাদিগকে ও গুরুমহাশয়দিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক

দিতেন। প্রতিবৎসর, কলিকাতার যত পাঠশালা ছিল তাহার ছাত্রদিগের পরীক্ষা রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীতে হইত এবং ঐ পরীক্ষা দ্বারা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল যে বঙ্গভাষা উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে। এই বাৎসরিক পরীক্ষা কালীন কিবেল সোসাইটীর বালিকাদিগের পরীক্ষা হইত ও তাহাদের ব্যুৎপত্তি সকলের সন্তোষজনক হইয়াছিল। এতদ্দেশীয় বালকেরা যে বঙ্গভাষা বিশেষ করিয়া শিক্ষা করেন ইহাই হেয়ার সাহেবের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। আড়পুলীয় ইংরাজী স্কুলে যাহারা প্রেরিত হইত তাহারা পাঠশালায় প্রাতে ও বৈকালে আসিয়া বঙ্গভাষা শিখিত। এইরূপ প্রথা হওয়ায় নিকটস্থ অন্যান্য পাঠশালার বালকদিগের বঙ্গভাষার অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। হেয়ার সাহেবের তত্ত্বাবধানে ও আড়পুলীর ছাত্রেরা বিখ্যাত হইয়া কেহ কেহ ইংরাজী স্কুলে ও কেহ ২ হিন্দু কালেজে প্রেরিত হইল। যাহারা হিন্দুকালেজে যাইত তাহারা প্রশংসা ভাজন হইত। ১৮২৯ সালে কলিকাতা স্কুলবুক সভা স্থাপিত হয়। এই সভার অধীনে শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটালীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময়ে রাজা রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক পুস্তক লেখেন ও ঐ পুস্তক উক্ত সভা দ্বারা প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের মর্ম এই যে, পূর্ব্বকালে স্ত্রীশিক্ষা এদেশে প্রচলিত ছিল। হেয়ার সাহেব বালিকাদিগের শিক্ষার্থেও অনুরাগী ছিলেন। ঐ বিষয়েও তিনি আপন অর্থ প্রদান করিতেন ও তাহাদিগের পরীক্ষাকালীন উপস্থিত থাকিতেন। ডাক্তার কেরি ও মার্শমেন এক সভা করেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে শ্রীরামপুরের নিকটস্থ সকল স্থানে বঙ্গভাষা অনুশীলন হইবে। হেয়ার সাহেব এই সভার ব্যয়ার্থ অর্থানুকূল্য করিতেন।

হিন্দুকালেজে যত শিক্ষক ছিল, তাহাদিগের মধ্যে ডিরোজিও যৌবন কালে উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিতেন, এজন্য কতিপয় শিষ্য অবকাশ পাইলেই তাঁহার নিকটে যাইত। তাঁহার শিক্ষার এই ফল দর্শিল যে ছাত্রেরা ধর্ম্মজ্ঞানবিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিল, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অখাদ্য ভোজন, অপেয় পান, আর হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা ও বিদ্রূপ অনেক পরিবারে প্রকাশ পাইল। কালেজের কমিটী বৈঠক করিয়া ডিরোজিও সাহেবকে বিদায় করিলেন। কালেজে হেয়ার সাহেবের পরোপকারিতা ছাত্রদিগের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

১৮৩০ সালে হিন্দুকালেজের ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা মাধবচন্দ্র

মল্লিকের বাটীতে হেয়ার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থ এক সভা করিলেন। তাহাতে এই ধার্য্য হইল যে হেয়ার সাহেব কায়িক পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে এদেশের লোকের বিশেষ উপকার করিয়াছেন এজন্য তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি রাখা কর্ত্তব্য। এক প্রশংসা পত্র পার্লমেণ্টে লিখিত হইয়া হেয়ার সাহেবকে প্রদত্ত হইলে তিনি এই বক্তৃতা করেন।

"এদেশে আসিয়া দেখিলাম যে, এখানে নানা-প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইতেছে—ভূমির উৎপাদিকা ও অর্থপ্রদ শক্তি অল্প—লোক সকলও বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী এবং অন্যান্য সভ্যদেশের লোকদিগের ন্যায় ক্ষমতাবান, কিন্তু বহুকালাবধি কুশাসন ও প্রজাপীড়ন হেতু এদেশ একেবারে অজ্ঞানতায় আবৃত হইয়াছে। এদেশের অবস্থা সংশোধন জন্য ইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচার করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। যে বীজ আমা কর্ত্তৃক বপিত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বৃহদ্রূপে বপ্রকাশ—উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিতেছে এবং তাহার সাক্ষী আমার চতুষ্পার্শ্বে রহিয়াছে।"

হেয়ার সাহেবের যে ছবি প্রস্তুত হইয়াছে তাহা তাঁহার স্কুলে বর্ত্তমান আছে। কঠোপনিষদে লিখিত আছে যে প্রায় অধিকাংশ লোক প্রেয়পথ অবলম্বী—প্রেয়ঃপথ অবলম্বী অতি অল্প লোক। প্রেয়, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিজনক—মান ও গৌরব বর্দ্ধক। প্রেয়ঃ নিষ্কাম ভাবে ধর্মানুষ্ঠান—বিদ্য ও কঠোরতা অতিক্রম করিয়া আধ্যাত্মিকতায় বিলীন হওন। যদা যদা পণ্ডিতেরাও প্রেয়পথ অবলম্বী হয়েন ও সামান্য জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা প্রেয়ঃপথ অবলম্বন করে। প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃ অনুষ্ঠান করা স্বভাবতঃ হইতে পারে ও উপদেশাধীন না হইতে পারে। যে সকল লোকের আত্মবল অধিক তাহারাই প্রেয়ঃ অবলম্বী। হেয়ার সাহেব সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার আহার সামান্য ছিল—বস্ত্র সাংসে রুচি ছিল না—তিনি বলিতেন এদেশের ঘরিয়া মিতাহারী ছিলেন—এটি বড় উত্তম। এদেশের মিঠাই, সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ডাবের জল ও মধুর রসের তাল বাসিতেন। প্রাতে তিন চারি খানি টোষ্ট, দুইটি ডিমসিদ্ধ ও এক পিয়ালা চা খাইয়া বাহির হইতেন, রাত্রে সামান্য আহার করিতেন। তাঁহার আত্মা, এক ভাবেই থাকিত—কি প্রকারে পরোপকার সাধন করিতে পারেন—এই তাঁহার ভাবনা—এই তাঁহার চিন্তা—এই তাঁহার তৃষ্ণা। প্রতিদিন দশটার মধ্যে পালকীতে ঔষধ ও পুস্তক পুরিয়া কালেজে আসিতেন। তাহার পর আপন স্কুলে যাইতেন। রেজিষ্টরি দেখিয়া যে যে বালক

অনুপস্থিত তাহাদিগের তালিকা করিতেন। পরে প্রত্যেক শ্রেণীতে যাইয়া প্রত্যেক বালক যেমন পড়িতেছে ও কিরূপ ব্যবহার করিতেছে তাহার অনুসন্ধান করিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদিগের যাহা বক্তব্য তাহা শুনিতেন ও যাহাকে যে পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা দিতেন। তিনি মানব স্বভাব ভাল বুঝিতেন ও যে বালকের যে দোষ তাহা শীঘ্র অনুধাবন করিতে পারিতেন। যে বালকের যে যে বিষয়ে দুর্ব্বলতা থাকিত তাহাকে প্রকারান্তরে যথাযোগ্য ঔষধ প্রদান করিতেন। কুপ্রবৃত্তি বিনাশ করিয়া সুপ্রবৃত্তি প্রদানে তাঁহার বিশেষ কৌশল ছিল। প্রত্যেক বালক বাটীতে কিরূপে সময় ক্ষেপণ করে ও কি প্রকার বালকের সহিত একত্রে থাকে ও পরিবারের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিতেন। বালকদিগের পিতা মাতা কর্ত্তৃক যাহা না হইত, তাহা হেরার সাহেব করিতেন। সকল বালকের সুপ্রবৃত্তি দর্শনে, তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয় আহ্লাদে স্ফীত। কোন বালকের কুনীতি অথবা আলস্যের সংবাদ শুনিলে, তাঁহার মর্ম্মবেদনা হইত। বালকদিগকে, যেন স্বীয় স্নেহপাশে আবদ্ধ করিতেন—সকলেই সুপথে গমন করিতেছে এই দর্শনে, তাঁহার চিত্তে উল্লাস হইত। যে যে বালক অনুপস্থিত হইত অনুপস্থিতির কারণ লোক দ্বারা অথবা তাহার বাটীতে আপনি গিয়া জানিতেন। বালকের পীড়া হইলে তাহার নিকট দিবারাত্রে আপনি বসিয়া ঔষধ সেবন করাইয়া আরোগ্য করিতেন। কদাচিৎ কাহারও পীড়ার সংবাদ না পাইলে বিরক্ত হইতেন। যে প্রকারেই হউক পরোপকার করিতে পারিলেই আহ্লাদিত হইতেন। যে সকল বালক প্রাণাচ্ছাদন বিহীন তাহাদিগকে অন্ন ও বস্ত্র দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন। যাহারা পুস্তকাদি অভাবে পড়িতে পারিত না, তাহাদিগকে পুস্তকাদি দিতেন। যাহারা লেখা পড়া শিখিয়া জীবিকার জন্য ব্যাকুল, তাহাদিগকে সুপারিস দ্বারা কর্ম্ম করিয়া দিতেন। তিনি পর দুঃখে দুঃখী, পরসুখে সুখী, দুঃখ দেখিলে দুঃখ বিমোচন করিতেন—এজন্য পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান করিতেন না। যদি কোন কারণ বশতঃ আত প্রতিকারে অশক্ত, তজ্জন্য দুঃখ বিমোচনের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিত। একদা এক স্বামীহীনা নারী পুত্রকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্য তাঁহার নিকট আইল। হেরার সাহেব বলিলেন স্কুলে স্থান নাই। ঐ বিধবা স্ত্রীলোক দুঃখভরে অশ্রুপাত করিতে করিতে চলিয়া গেল। যিনি সামান্য দুঃখ দেখিলে কাতর হইতেন তিনি যে দুঃখিনী স্বামীহীনার রোদনে অধিক কাতর

হইবেন, তাহার আশ্চর্য্য কি? নিকটে একজন বাবু বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হেয়ার সাহেব ঐ দুঃখিনী নারীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ দুঃখিনী আপন কুটীর হইতে বাহির হইয়া পরিচয় দিল। হেয়ার সাহেব দুঃখেতে কাতর হইয়া তাহাকে কিঞ্চিত অর্থ দিয়া বলিলেন তুমি রোদন করিওনা, তোমার পুত্রের ভরণ পোষণ ও অধ্যয়ন করাইবার ভার আমি লইলাম। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। হেয়ার সাহেব সকল বালককে সমভাবে দেখিতেন—সকলের হিতার্থে সমান যত্ন করিতেন ও সকল বালক মনে করিত যে আমাকে হেয়ার সাহেব যেমন ভাল বাসেন তেমন আর কাহাকেও ভাল বাসেন না। মনের কার্য্য পরিমিত—তারতম্য হয়—সর্ব্বজীব সমদৃষ্টি করিতে মন অক্ষম কিন্তু আত্মার প্রকৃতি সমদর্শন—আত্মা যত মুক্ত ততো নির্বিশেষ শক্তি প্রকাশ করে।

দুঃখী দরিদ্র বালকেরা অধিক দিন পাঠশালায় থাকিতে পারে না। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহারা ব্যস্ত হইবে, এজন্য তাহারা কেমন লেখে তাহা প্রতিদিবস বৈকালে আপনি দৃষ্টি করতঃ লেখার দোষ দর্শাইতেন ও লেখা এইরূপ শুধরাইতে সংশোধিত হইত।

হেয়ার সাহেব দুর্গোৎসবকালীন দুঃখী ও দরিদ্র বালক ও তাহাদিগের ভগিনী এবং মাতাদিগকে বস্ত্রাদি দিতেন। উৎসব কালীন কি ধনী, কি নির্ধনী, সকলের বাটীতে তিনি গমন করিতেন, এই জন্য আবাল, বৃদ্ধ, যুবা ও কুলনারীরা তাঁহাকে ভালরূপে জানিতেন। পটলডাঙ্গার কুলসোসাইটীর স্কুল যাহা হেয়ার স্কুল নামে এক্ষণে বিখ্যাত, ঐ স্কুলের ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তকের ও কাগজ কলমের ব্যয় হেয়ার সাহেব আপনি দিতেন। আড়পুলিতে যে পাঠশালা ছিল, তাহারও সমস্ত ব্যয় তিনি দিতেন। বাঙ্গালীদিগের হিতার্থে তিনি অন্যের নিকট ভিক্ষুক হইতেন ও আপনি লক্ষ ২ টাকা ব্যয় করেন। হিন্দু কালেজের দক্ষিণ ও পশ্চিমে তাঁহার অনেক ভূমি ছিল, ঐ সকল ভূমি বিক্রয় করিয়া এতদ্দেশীয় লোকদিগের মঙ্গলার্থে ব্যয় করেন। যখন তাঁহার হস্তে টাকা অল্প হইল, তখন তাঁহার চীনদেশীয় এক ধনী কুটুম্বের নিকট হইতে টাকা আনাইয়া ব্যয় করিতে লাগিলেন। ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি বড় পরহিতৈষী প্রযুক্ত হেয়ার সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুতা হয়।

হেয়ার সাহেব যে সৎকর্ম্ম করিতেন তাহা প্রশংসা পাইবার জন্য করিতেন না,—কেবল আত্মার সন্তোষার্থে করিতেন।

হেয়ার সাহেব মিতাহারী ছিলেন—ছুটিতে মাংস দিয়া খাইতেন না। যেমন অন্তরে শান্তভাব, তেমনি শরীরে বিশেষ বল ছিল। তিনি ব্রে সাহেবের সহিত থাকিতেন। এক রাত্রে চা খাইতেছেন—ইতিমধ্যে একজন যুবকের সহিত পরব্রহ্মে গমনের কথা উপস্থিত হইল। হেয়ার সাহেব বলিলেন তুমি আমার সহিত চানকে যাইতে পার? যুবক বলিলেন, হাঁ, পারি। চানক কলিকাতা হইতে সাত ক্রোশ। হেয়ার সাহেব বলিলেন আইস, দেখা যাউক। দুই জনে উঠিলেন। কিছুকাল পরে দুইজনে ফিরিয়া আইলেন। যুবক শ্রান্ত ও বীর্য্যহীন—আস্তে আস্তে আসিতেছেন। হেয়ার সাহেব সবল ও হেয়ার ষ্ট্রীটে আসিয়া মৌতিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এক দিবস হিন্দুকালেজের একজন ছাত্রের পাল্কি বাহিরে ছিল। একজন বলবান গোরা, কোচমান সহিসের সঙ্গে বিবাদ করিয়া, পাল্কি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। কালেজের চাপরাশি, ব্রজবাসি দরওয়ান কেহই তাহাকে ধরিতে পারিল না। ইতিমধ্যে হেয়ার সাহেব আসিয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া তাঁহের ছাত্র গমন করতঃ গোরাকে ধৃত করিয়া থানায় জিম্মা করিয়া দিলেন।

হেয়ার সাহেব পরদুঃখে অথবা ক্রোধে সর্ব্বদা কাতর হইতেন। এক দিবস হেয়ার সাহেব বাটীতে আছেন। সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি শ্রাবণের ধারার ন্যায় পড়িতেছে। চন্দ্রশেখর দেব বাবু বৃষ্টিতে ভিজিয়া উপস্থিত। সাহেব আস্তেব্যস্তে তাহাকে এক বস্ত্র পরিধান করিতে দিয়া আপন হস্তে তাঁহার ভিজা ও চাদর নিংড়াইয়া শুখাইতে দিলেন। রাত্রি অধিক হইলে বৃষ্টি থামিয়া গেল। চন্দ্রশেখরকে সন্দেশ আনাইয়া খাওয়াইয়া আপনি এক বৃহৎ যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। চুনাগলির নিকট আসিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, এই স্থানে মাতওয়ালা গোরা থাকে, হয়ত তোমার জন্য তাহাদিগের সহিত হাতাহাতি করিতে হইবে। পরে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে সেস্থান হইতে গমন করিলেন।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি বঙ্গ বালকদিগের সংশোধন জন্য অতিশয় সতর্ক থাকিতেন। যে বালকের প্রতি তাঁহার সন্দেহ হইত, তাহার বাটীতে হঠাৎ উপস্থিত হইতেন। বাটীতে তাহাকে না পাইলে সে যে স্থানে থাকুক অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া আপন শাসনাধীন করিতেন। অনেক বালক ঊর্দ্ধগামী ছিল, পরে তাহারা হেয়ার সাহেবের যত্নে সচ্চরিত্রশীল হয়। যে

যাকি কুপ্রবৃত্তি বিনাশ করিয়া সুপ্রবৃত্তি দমন করেন—যিনি পাপ মতিকে অংশ করিয়া আত্মার পুণ্য জ্যোতি প্রকাশ করাইয়া দেন, তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত অভিপ্রায় সাধন করেন—তিনিই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসক।

পূর্ব্বে কলিকাতায় অনেক কুপ্রথা ছিল। রাত্রিযাত্রার সময় বাবুরা বেশ্যা লইয়া বাগানে যাইতেন। শোনা গিয়াছে যে, এক বাবু সুরাপান করতঃ বজরার বাহিরের সুরাপান করান। তাহারা লোক্স বা তুলিয়া সমস্ত রাত্রি গীত বাদ্য ও খেয়ানকার বজরা সেই খানেই থাকে। এইরূপ ঘটনা হইত, পাছে বাবুদের সঙ্গে কোন বালক গমন করে এজন্য হেয়ার সাহেব সতর্ক থাকিতেন। এরূপে কোন কোন বালককে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বালকেরা পরস্পরের কুৎসা করিত। এক ধনীর পুত্র এক বালকের গ্লানি ছাপাইয়া রাত্রিযোগে কালেজে যাইয়া খাতেতে মারিয়া রাখে। হেয়ার সাহেব এই সংবাদ পাইয়া এক লাঠান হাতে করিয়া উপস্থিত হইয়া কাগজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে, পাবলিক্ ইনষ্ট্রক্শন কমিটি এইবর্ষে রিপোর্ট করেন,—আমরা গবর্ণমেণ্টের গোচরার্থে ধর্ম্মশীল হেয়ার সাহেবের বিষয় লিখিতেছি। এতদ্দেশীয় লোকদিগের শিক্ষার্থে যে সকল ব্যক্তি যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে হেয়ার সাহেব অগ্রগণ্য। তাঁহারই পরিশ্রমে এই রাজধানীর বালকেরা ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্ববৎ লোকের কেবল কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী শিক্ষা হয় নাই। তাহাদিগের এতদূর শিক্ষা হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা ইউরোপীয় দর্শনবিদ্যা জানা যায়। হেয়ারসাহেব হিন্দু কালেজ ও হিন্দুস্কুলের স্থাপনে সাহায্য করেন। এই সকল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ জন্য অনেক বৎসরাবধি তিনি সমস্ত সময় অর্পণ করিয়াছেন। বিদ্যালয় সকল তিনি সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করেন। যে বালক ভীরু তাহাকে উৎসাহ দেন—যে অজ্ঞাত, তাহাকে সৎপরামর্শ প্রদান করেন—যে অলস ও মন্দ তাহাকে স্নেহযুক্ত ভর্ৎসনায় শোধন করেন। বালকদিগের মধ্যে যে কলহ হয় তাহা তিনি নিষ্পত্তি করেন ও পিতা পুত্রের মধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাও তিনি মীমাংসা করিয়া দেন। যাহার চিত্ত পরোপকারে রত ও পরোপকার করণ যাহার আহার ও পান সে ব্যক্তি ঐ চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন। হেয়ার সাহেব যখন দেখিলেন যে বাঙ্গালিরা ইংরাজী ও মাতৃভাষা ভাষায় উন্নত হইয়াছে, তখন তাহার ব্যবসা উপযোগী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া

বিখ্যাত হন, এই তাঁহার বাসনা হইতে লাগিল। ঐ সময়ে লার্ড আকলেণ্ড গবর্ণরজেনেরল ছিলেন। তিনি এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি বড় আত্মমূল্য করিতেন। হেয়ার তাঁহার নিকট সর্ব্বদা যাইতেন। ঐ সময়ে কলিকাতায় একটি মেডিকেল কালেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয় কিন্তু এই সন্দেহ হইতে লাগিল যে হিন্দুবালক মৃতদেহ স্পর্শ করিতে কোন আপত্তি করিবে কি না। এক দিবস হেয়ার সাহেব বসিয়া আছেন। মধুসূদন গুপ্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। আস্তে আস্তে হেয়ার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—হিন্দুধর্ম্ম প্রতাবলম্বীদিগের নিকট হইতে কোন আপত্তি হইবে কি? মধুসূদন বলিলেন যদি তাঁহারা যাবা বেদ,তবে পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে পরাস্তব করিবেন। হেয়ার সাহেব বলিলেন আমি আহ্লাদিত হইলাম, কলাই লার্ড আকলেণ্ডের নিকট যাইব। ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হয়। কিছুকাল পরে ডাক্তার ব্রাবলি বক্তৃতা করেন "হেয়ার সাহেবের উৎসাহ ও সাহায্যে কালেজ অনেক উপকৃত। কালেজ স্থাপিত হইবার অগ্রে হেয়ার সাহেব আপন সৎচিত্তের ভাবে গলিত হইয়া ইহার হিত সাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য দ্বারা অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তিনি উপদেশ দেওন কালীন সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া শিষ্যদিগের সন্তাব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমার এক২ বার বোধ হইত যে কালেজ থাকা ভার কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য, শান্ত গুণে পরিশ্রম জন্য কালেজ রক্ষিত হইয়াছে। ফলতঃ হেয়ার সাহেবের সাহায্য ব্যতিরেকে এ কালেজ স্থাপন করা যাইত না এজন্য তাঁহার নিকট সাক্ষেপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।"

হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে মেডিকেল কালেজে অনেক ছাত্র ভর্ত্তি হয়। ঐ সকল ছাত্র তাঁহার বশীভূত ছিল সুতরাং তাহাদিগের দৃষ্টান্তে অন্যান্য বালক তাহাদিগের ন্যায় চলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল হেয়ার সাহেব কালেজের সম্পাদক ছিলেন, তাহার পর কালেজ কউনসেলের অনরেরি মেম্বর হন।

মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হওয়াবধি হেয়ার সাহেব তথায় প্রতিদিন যাইতেন। অন্যান্য বিভাগের যেরূপ তত্ত্বাবধারক করিতেন, মেডিকেল কালেজের বালকদিগেরও সেইরূপ তত্ত্বাবধারক করিতে লাগিলেন। আর হস্পিটলে যাইয়া প্রত্যেক রোগী কিরূপ আছে, ক্রমশঃ আরোগ্য হইতেছে, কি না—বা পীড়ার বৃদ্ধি হইতেছে এ সমস্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া যথাসাধ্য প্রতিকার করিতেন। সকলের পথ্য ও অন্যান্য বিষয় যাহা জানিবার আবশ্যক হইত তাহা

জানিয়া রোমীদিগকে আরাধে রাখিবার জন্য সম্রাটরূপে ঘোষিত হইতেন। যাঁহার চিত্ত পরোপকারে রত তাঁহার সকল কার্য্য পরদুঃখ বিমোচন ও পরসুখ বিবর্দ্ধন জন্য হইয়া থাকে।

হিন্দুকালেজ ও হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষিত কতিপয় যুবক ডিরোজিও সাহেবকে সভাপতি করিয়া একাডেমিক এসোসিয়াসন নামক এক সভা স্থাপন করেন। প্রতি সপ্তাহে বৈঠক হইত ও সকলে বক্তৃতা করিতেন। এইরূপে সকলের বক্তৃতা শক্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। হেয়ার সাহেব প্রতি বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন ও পরে ঐ সভার সভাপতি হইয়া তাহার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। অনন্তর, ১৮৩৪ সালে সাধারণ জ্ঞানউপার্জ্জিকা সভা স্থাপিত হয়। ঐ সভার বৈঠকে এক একজন সভ্য এক এক রচনা পাঠ করিতেন, ও তাহা লইয়া অন্যান্য সভ্যরা তর্ক বিতর্ক করিতেন। হেয়ার সাহেব এই সভার অনরেরি ভিজিটর ছিলেন। বিদ্যা অনুশীলনার্থে যে স্থানে যাহা হইত, হেয়ার সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেন।

১৮৩৫ সালে হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষেরা, কালেজের নিকট বঙ্গ ভাষা উত্তম রূপে শিক্ষার্থে, এক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। পাঠশালা গৃহের ভিত্তি স্থাপনের দিবস অনেকে উপস্থিত থাকেন। সকলে হেয়ার সাহেবের সম্মানার্থে তাঁহাকে প্রস্তর স্থাপন করিতে আহ্বান করেন। তৎকালে তিনি এক বক্তৃতা করেন, পরিশেষে জজ ষ্টাইন তাঁহার অনেক প্রশংসা করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

যে প্রকারেই হউক এদেশের মঙ্গল সাধনে হেয়ার সাহেব কখনই ক্লান্ত হইতেন না। পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে সকল বিষয় সাহস পূর্ব্বক লিখিত হইত না। গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে লিখিলে লেখকের নামে অভিযোগ হইত, আর কোন বিষয় বিবেচনার্থে প্রকাশ্য সভা হইত না। এইরূপ নিয়মে সাধারণ লোকেরা আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইত—ইহাতে দেশের অমঙ্গল ব্যতিরেকে মঙ্গল সম্ভব হয় না। এই দুই নিয়ম উঠাইয়া দিবার জন্য ও পার্লিয়ামেণ্টকে এদেশের ভাবী বিষয়ে এক দরখাস্ত করিবার জন্য ১৮৩৫ সালে ৩ জানুয়ারিতে টাউনহলে এক প্রকাশ্য সভা হয়। হেয়ার সাহেব উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"সভ্যগণ! যখন আমি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করি, ও দেখি এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া কর্ত্তব্যতা

সাধন করিতেছেন তখন বোধ হয়, যে এদিন ভারতবর্ষের সৌরবের ও সৌভাগ্যের দিবস"।

১৮১৩ সালে খ্রিষ্ট দ্বীপে এদেশ হইতে কুলি পাঠান আরম্ভ হয়। যে সকল কুলির গমনে ইচ্ছা ছিল না তাহারা ছলনা ও প্রতারণা দ্বারা প্রেরিত হইত। পটলডাঙ্গার এক বাটীতে অনেক কুলি বদ্ধ ছিল। হেয়ার সাহেব তাহা জানিতে পারিয়া পুলিসের সাহায্যে তাহাদিগকে খালাস করিয়া দিলেন। কুলিরা হেয়ার সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেল।

এইরূপ অহরহঃ অনেক পরোপকার হেয়ার সাহেবের দ্বারা কৃত হইত।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৩১ মে মাসের রাত্রে হেয়ার সাহেবের ওলাউঠা হয়। আপন সহধর্মিণীকে হেয়ারকে বলিলেন, ঐ সাহেবকে বল, আমি বাঁচিব না—আমার জন্য কফিন প্রস্তুত করিতে কহে। পরদিবস বেলেঘাটার আলা না সহিতে পারিয়া বলিলেন—আমাকে আস্তাবলে ধরিতে দেও। কিছুকাল পরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কলিকাতার সমস্ত লোক শোকান্বিত হইল। সহস্র সহস্র চক্ষু দিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল—কেহ বিলাপে কাতর, —কেহ নিস্তব্ধভাবে অন্তরে রোরুদ্যমান—কেহ তাঁহার গুণবর্ণনে পণ্ডিত—কেহ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে ভাবাক্রান্ত—কেহ যেন পিতৃশোক—কেহ যেন ভ্রাতৃশোক, কেহ যেন জ্ঞাতৃশোক—কেহ যেন অকৃত্রিম বন্ধুশোকে ব্যাকুল। অন্যদিগের হৃদয় কোমল—তাহারা প্রণীড়িত হইয়া দুঃখে মগ্ন হইলেন। বালকদিগের নয়নে অন্তরের শোক প্রকাশ হইল। হেয়ার সাহেবের মৃত্যু ঐ সাহেবের বাটীতে হয়—মৃত্যুসংবাদ প্রচার হইলে ঐ বাটী লোকে পূর্ণ হইল। হেয়ার সাহেবের দেহ স্বাভাবিক বেশে আচ্ছাদিত—কফিনে স্থাপিত—বদন শীতল ও শান্ত—নয়ন মুদিত—বালক ও যুবক নিকটে যাইয়া প্রেম ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তাঁহার বদন স্পর্শ পূর্ব্বক অনিবার্য্য কাতরতায় বিগলিত বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১ লা জুনে তারি সূর্য্যোদয় হয়—বৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়িতেছে—আকাশ ঘনঘোর আচ্ছন্ন—রাস্তা সকল জলে সিক্ত, তথাচ লোকারণ্য হইল—মৃতদেহের সঙ্গে ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার লোক চলিল—পাল্কিতে রাস্তা পূর্ণ—কতক খানা কৃষ্ণবর্ণ শোক চিহ্নিত গাড়িতে ছোট ছোট বালক আরূঢ় হইল। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালীন, ঐ মহাত্মার সমাধি হইল। সমাধি হিন্দুকালেজের সম্মুখে হইয়াছিল। তাহার উপর যে কবর নির্ম্মিত হয়, তাহার

যাহ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক এক টাকা চাঁদা দিয়া নির্ব্বাহ করে। চাঁদা এত হইল যে, কতক চাঁদা আদায় করণ আবশ্যক হইল না।

কিয়ৎ কাল পরে, এক প্রকাশ্য সভাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি করণ ধার্য্য হয় ও ঐ প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার স্কুলের নিকট প্রকাশ্যরূপে স্থাপিত হইয়াছে।

হেয়ার সাহেব এতদ্দেশীয় লোকের মহোপকারী, এজন্য তাঁহার স্মরণ ও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বৎসর বৎসর ১লা জুন তারিখে এক সভা হয় ও ঐ বৈঠকে বক্তৃতা হইয়া থাকে।

হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থে হেয়ার প্রাইজ কমিটি নামক এক কমিটি আছে। তাঁহাদিগের উৎসাহে ও আনুকূল্যে অনেক অনেক ভাল ২ বিষয় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে ঐ কমিটি কেবল স্ত্রীলোক শিক্ষা উপযোগী পুস্তকাদি প্রকাশ করণ ধার্য্য করিয়াছেন।

হেয়ার সাহেব ঘড়ির কারবার হইতে কান্ত হইয়া অল্প পরিমাণে বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার বাণিজ্য করিবার অভিপ্রায় এই যে যদি লাভ করিতে পারেন তবে ঐ লাভ পরোপকারার্থে অর্পণ করিবেন। তাঁহার বীয় অভাব অতি অল্প ছিল। সামান্য বস্ত্রাদি পরিধান করিতেন ও সামান্য রূপে ভোজন করিতেন—পানীয়—দুগ্ধ, জল ও চা মাত্র। দৈবযোগে তাঁহার সকল টাকা নষ্ট হইল ও তিনি ঋণ পাশে বদ্ধ হইলেন। একটি অর্দ্ধনির্ম্মিত বাটী ছিল তাহা গাঁথিয়া দিয়া পাওনাদারদিগকে দিলেন ও আপনি ব্রে সাহেবের বাটীতে আসিয়া থাকিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার দুই সহোদরের কাল হওয়াতে শোকে মগ্ন হইলেন। কিন্তু যদিও ক্ষতি ও শোকে পীড়িত, তথাচ তাঁহার শান্তভাবের হ্রাস হয় নাই। দৈনিক কার্য্য সকল পূর্ব্ববৎ করিতেন—বালকেরা বিরক্ত করিত কিন্তু তিনি সমাহিত থাকিতেন। যে সকল মহাত্মা শোক দুঃখে সমাহিত থাকেন—তাঁহারা আত্মার শান্ত ও শিব ভাব প্রতীয়মান করেন।

হেয়ার সাহেবের জীবন পাঠে কে না উন্নত ভাবে স্থিত হইবে? যে ব্যক্তি নিষ্কামচিত্তে আপন বল, বুদ্ধি ও অর্থ—আপন জীবন পরোপকারার্থে—পর সুখার্থে অর্পণ করিয়াছিলেন—যিনি আপনার সুখ অন্বেষণ করেন নাই—ও যাঁহার কোন পার্থিব বাসনা ছিল না, তিনি যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিবে? জগদীশ্বর আমাদিগকে এই কৃপা করুন যে, হেয়ার সাহেবের যেরূপ শুদ্ধ প্রেম ছিল, সেই শুদ্ধ প্রেমে আমরা যেন পরিপূর্ণ থাকি।

সম্পূর্ণ।

ডেভিড হেয়ার ছিলেন বাঙালীর অকৃত্রিম বন্ধু এবং এদেশে শিক্ষাবিস্তারের প্রধান পুরোহিত। তাঁর উদ্যম ব্যতীত রামমোহন প্রমুখ ব্যক্তিগণের দ্বারা।

এ কাজ কোনক্রমেই সম্ভব হতো না তার প্রমাণ আমরা উপরে মুদ্রিত রচনায় দেখেছি। ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত ইতিপূর্বেই হয়েছিল, হেয়ার সাহেব তাকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করে তুলেছিলেন। সেই সঙ্গে বাংলাভাষা চর্চার ও শিক্ষার প্রথম উৎসাহদাতা যে তিনিই তা আমরা অনেকেই স্মরণ রাখি না। তাই তাঁকে বলা হয়েছে, 'ফাদার অব নেটিভ এডুকেশন।' বলার যৌক্তিকতা আছে। তাঁর মত দরদী, মানবপ্রেমিক, সেবাপরায়ণ মানুষ অল্পই দেখা যায়। যে সব ভারতপ্রেমিক আমাদের ইতিহাসে অক্ষয় স্থান লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে ডেভিড হেয়ার অগ্রগণ্য। প্যারীচাঁদের লেখনীতে যে পরিচয় সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এবং 'নব্য বঙ্গ' গঠনে ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা এই সংক্ষিপ্ত রচনাতেও উজ্জ্বল ও স্পষ্ট। আর পাই তখনকার কলকাতা শহরকে।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হয়। তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ বন্ধুবাসী তাঁর স্মৃতিরক্ষায় যত্নবান হন এবং তাঁর সমাধিস্তম্ভ, প্রস্তরমূর্তি ও স্মৃতিফলক নির্মাণ করেন। কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যোগে হেয়ার বার্ষিক উৎসব সমিতি গঠিত হয়। প্রতি বৎসর ১লা জুন এই সম্মিলনীতে ভারতবাসীর মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ হতো। নবীন যুগের ছাত্রদের হৃদয়ে তাঁর মহৎ জীবনের পুণ্যকর্মগুলি সর্বদা জাগরূক থাকে ও উন্নত ভাবগুলি প্রতিফলিত হয়, এই ছিল সমিতির আদর্শ। ১৮৪৬-এ কিশোরীচাঁদের অগ্রজ প্যারীচাঁদ মিত্র এই সমিতির সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। কিশোরীচাঁদ হেয়ার পুরস্কার ভাণ্ডারও গঠিত করেন, প্রতি বৎসর সর্বোৎকৃষ্ট বাংলা প্রবন্ধের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হতো।

যাই হোক, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত একটি বক্তৃতা করেন [দ্রষ্টব্য : সাহিত্যসাধক চরিতমালা, ১২ সংখ্যক]। উক্ত বক্তৃতা 'শ্রীযুক্ত হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা' নামে মুদ্রিত হয়েছিল। সেই দুর্লভ বক্তৃতার কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো :

"...এইক্ষণে তাহার সহিত সেই সুখের দিবসকে প্রতীক্ষা করিতেছি যখন ভারতবর্ষীয় লোক আপনারদিগের বুদ্ধি ও ক্ষমতা দ্বারা সমুদ্রপোত নির্মাণ করিবেক, সেতু রচনা করিবেক, বাষ্পযন্ত্র প্রস্তুত করিবেক এবং স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা স্বদেশে নানা প্রকার শিল্পকার্যের উন্নতি করিবেক। কিন্তু এইক্ষণে যে এই সকল মঙ্গলের চিহ্ন দেখিতেছি, এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রত্যাশাতে

পুলকিত হইতেছি, ইহার মূল কোথায়? নদীর স্রোতে স্থির হইয়া তাহার উৎপত্তিস্থান অন্বেষণ করিলে যে প্রকার পর্ব্বতশিখরের প্রতি দৃষ্টি হয়, বায়ু-প্রবাহে সৌরভের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাহার আকর অন্বেষণ করিলে যে প্রকার মনোহর পুষ্পোদ্যানের স্মরণ হয়, তদ্রূপ এই বর্ত্তমান জ্ঞানের বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে সৌভাগ্যের উপক্রম আলোচনা করিয়া সেই পরম হিতৈষির নাম ও সেই পরম দয়ালু ব্যক্তির চরিত্র স্মরণ হইতেছে, যাঁহার উপকার দ্বারা এ দেশ পূর্ণ রহিয়াছে, যাঁহার দয়াকে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতবর্ষের লোক কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র রহিয়াছেন, যাঁহার নামকে স্থায়ি করিবার জন্য এই সাম্বৎসরিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং যাঁহার গুণানুবাদ করিবার জন্য আমরা অদ্য এই অট্টালিকাতে একত্র হইয়াছি—এই মহাত্মার নাম শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। তাঁহার এই সত্য জ্ঞান ছিল, যে পরের উপকার জন্য তাঁহার জন্ম, এবং পরের উপকার তাঁহার জীবনের সমুদায় কার্য্য; এবং শরীর, বুদ্ধি, সম্পত্তি সমুদয় তিনি পরের হিতের জন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষকে ভিন্ন জানিতেন না। এই সত্যের প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, যে পৃথিবী তাঁহার জন্মভূমি, এবং সমুদয় মনুষ্য তাঁহার পরিবার। বিশেষতঃ তাঁহার চরিত্র তখন বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, যখন এ দেশের বিদ্যা উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়। কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে এদেশ অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু তিনি এ দুরবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া এই অন্ধকারময় ভারতবর্ষকে জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল করিতে যত্নবান্ হইলেন, এবং লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞাত কার্য্য অনেক ভাগে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই মহোপকার সাধন জন্য তিনি শারীরিক ক্লেশ, মানসিক পরিশ্রম, অর্থের ব্যয় ইত্যাদি কোন্ প্রকারে যত্ন না করিয়াছিলেন? এইক্ষণে আমরা যে কিছু জ্ঞান উপার্জ্জন করিতেছি, সে কেবল তাঁহারই প্রসাদাৎ। তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা পৃথিবীর বিষয় সকল জ্ঞাত হইতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ সূর্য্য নক্ষত্রাদির পরিমাণ জানিতেছি,...আমরা এক নূতন প্রকার জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়াছি। ভারতবর্ষের মহৎ বিদ্যালয় যে হিন্দু কালেজ, তাহা স্থাপনের মূলাধার কারণ কোন্ ব্যক্তি—সকলেই অবশ্য ব্যক্ত করিবেন যে, শ্রীযুক্ত ডেবিড হেয়ার সাহেব। বঙ্গভাষাকে উন্নত করিবার জন্য প্রথম যত্নবান্ হয়েন কোন্ মনুষ্য?—ডেবিড হেয়ার সাহেব। উপদেশ দ্বারা চিকিৎসা বিদ্যা বিস্তার জন্য মহোৎসাহী কোন্ পুরুষ?—ডেবিড হেয়ার। অশেষ মঙ্গলের

কারণ যে মুহূর্তে তাহার স্বাধীনতা হরণে বিশেষ উদ্‌যোগী কোন্ ব্যক্তি!—ডেভিড হেয়ার সাহেব। ...তিনি আমাদিগকে হীরক যেন দান করেন নাই, স্বর্ণ যেন দান করেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ—কোটি গুণ মূল্যবান্ বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন।...শীতিতের রোগ শান্তি, বিপদ্‌গ্রস্তের দুঃখমোচন, অধিজকে পরামর্শ দান, মিত্রপ্রেমকে আশ্রয় প্রদান ইত্যাদি হিতকার্য্য তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। ...যিনি সকল স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল আমাদিগেরই উপকার করিয়া এমত আত্মাদিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিমিত্তে কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব!—"

ডেভিড হেয়ারের কর্মোদ্যমকে কেন্দ্র করে সেকালের বাঙালী শিক্ষাবিস্তারের বহু কারণে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল। তাই উক্ত বক্তৃতার একস্থানে অক্ষয়কুমার বলেছেন :

"...এ দেশীয় লোকের উৎসাহ প্রবাহ তখন প্রবল দেখি, এবং তখন অন্তঃকরণ সাহসে পরিপূর্ণ হয়। যখন এই সম্প্রতিকার ঘটনাকে স্মরণ করি—যখন স্মরণ করি, যে দরিদ্র হিন্দু বালকদিগকে বিদ্যা দানের নিমিত্তে নগরস্থ সকল লোক উদ্‌যোগি হইয়াছেন। অন্য জাতি মধ্যে যদিও এ অতি সামান্য কার্য্য, কিন্তু ভারতবর্ষ পরাধীন হইলে এ দেশীয় লোকের মধ্যে এমত শুভসূচক ঘটনা কদাপি হয় নাই—এমত ঐক্য কদাপি বদ্ধ হয় নাই..."

তৎকালীন শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের নাম অবিচ্ছেদ্য ও একাত্মভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। এমন কি একথা কতদূর গভীর সত্য, বাঙালী জাতির বিদ্যার্জনের ব্যাকুলতা তিনি কতখানি উদ্দীপ্ত করতে পেরেছিলেন, অংশত বোঝা যায় এই উদ্ধৃতিতে : "when he came out in the streets, young boys would follow him about, clamouring for a free seat in his school, and this was not a rare occurrence." [P. R. Sen, Western Influence in Bengali Literature, Chapter III.]

অক্ষয়কুমারের বক্তৃতায় আমাদের শিক্ষা আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ বাঙালীকে দেখে যে আশার সুর ধ্বনিত হয়েছে তা অযথার্থ নয়। কারণ হিন্দু কলেজের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রেরা অনেকগুলি অবৈতনিক বিদ্যালয় পরিচালনা করতে আরম্ভ করেন। প্যারীচাঁদ মিত্রও তাঁর গৃহে এই রকম

একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ভাই লিখেছেন: "Babu Peary Chand Mittra established a similar school at his house at Nimtollah Street ; Mr. Derozio and Mr. David Hare took a lively interest in this school frequently visiting and examining the boys and distributing prizes to the most meritorious among them." ['On the Progress of Education in Bengali', Kissory Chand Mittra, Transactions of the Bengal Social Science Association, Vol I, 1867.] ডেভিড হেয়ারের প্রতি নিজ পরিবারের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার পরিচয় আমরা লক্ষ করেছি। বিদ্বেষ সাহেবপ্রীতি তাঁদের ছিল না তা নয়। প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত 'মাসিক পত্রিকা' সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন:

"...ঐ পত্রিকা লেখকদিগের সকলেরি সাহেবি মেজাজ ও তাঁহারদিগের লেখাতে সাহেবি গন্ধ আছে।..." [ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ১৮৫৪, ৩০শে নভেম্বর, সংবাদ প্রভাকর]

প্যারীচাঁদ যখন সভ্যসমিতির সঙ্গে সঙ্গে বীটন সোসাইটিরও অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৭খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজিতে তিনি হেয়ার সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছিলেন তাঁর 'A Biographical Sketch of David Hare'-এ। পরের বছর (১৮৭৮ খ্রী:) তিনি বাংলা ভাষায় লেখেন 'ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত'। এর ভূমিকায় লিখেছেন:

"ইতিপূর্বে হেয়ার সাহেবের জীবন চরিত ইংরাজীতে লেখা হইয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীলোক ও ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জন্য তাঁহার জীবনের সংক্ষেপ বিবরণ বাঙ্গালা ভাষায় লেখা গেল। যদিও রচনা উৎকৃষ্ট হয় নাই তথাপি যাঁহার গুণকীর্তন করা হইল তিনি মহৎ ও চিরস্মরণীয় লোক ছিলেন। ভরসা করি এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে পাঠকের মনে বহুৎভাবের উদয় হইবে।"

'আলালের ঘরের দুলাল'-এর স্রষ্টা প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে [জন্ম ১৮১৪]। মৃত্যুর পর রে: কৃষ্ণমোহন ২৮শে নভেম্বর ১৮৮৩-তে নিজ পরিবারকে একটি পত্রে লিখেছিলেন: "He was a link of union between European and Native Society which will be regeretted now as a 'missing link' by both those communities...."

প্যারীচাঁদের দুষ্প্রাপ্য পুস্তিকাটি 'একণ' পত্রে অবিকল পুনর্মুদ্রিত হলো। ১৮৯২-এর দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ এখানে গৃহীত হয়েছে।

সম্পাদক।

পশ্চিমের ঘাটে

শান্তি বসু

হাঃ! হাঃ! হাঃ। তুমি যাই বলোনা কেনো, তুমি ত জানো, বাস্তবে যাহাই ঘটুক কেবে বস্তু নেই।—ফর্মএন্ডাস।

আমরা আশিতায় করেছি যে আমরা আমাদের ভূমিকা জানিয়ে, একটা আয়না খুঁজছি আমরা। আমাদের আজ ভুলে যেতে চাচ্ছি, যা-কিছু আমাদের বিশ্বে সঞ্চিত হয়ে যেতে চাই, হতে চাই সত্য। কিন্তু ভুলে যেছি এমন একটা টুকরো হতাশের, কোথাও তবুও লেগে আছে। আমাদের ভুলতে একটা আত্মিকতার ভিত্তি থেকে গেছে। যেখানে পালিয়ে যে আমাদের সুখের কোনটা বেঁচে। আর তাই ইতিহাসে ঘুরে বেড়াই, যেনো একটা বিজ্ঞান আর তবুই অর্থেক : সত্য লাভ করিনি আমরা এবং অভিযোক্তাও নই। —নিত্শে।

রবীন্দ্রনাথ একবার ভেবেছিলেন পশ্চিমের দুয়ার খুলেছে আমাদের জীবনে, সুর পশ্চিমের দ্বন্দ্ব বুঝি নিঃসংশয়ে ঘুচেছে। ঘোচা উচিত কারণ সত্যতার আদান-প্রদানে বিরোধের বীজ নষ্ট হয়, আর সম্পূর্ণই যদি নষ্ট না-হয় তো বিরোধের নদীতে পারাপারের সেতু জোটে। আরো একবার রবীন্দ্রনাথেরই মনে হয়েছিলো শেষ পর্যন্ত বুঝি প্রতীচ্য শুধু বিরোধের বীজই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সত্যতার সঙ্কটে আমাদের মনে, প্রাচ্যের মুক্তিতে থাকবে শুধুই আলো, যন্ত্রণা ও তিক্ততার স্বাদ। অথচ, আমরা যারা য়ুরোপের চাপে বা আলোয় নতুন জীবনের আস্বাদ পেয়েছি, কার্যত না-হোক, বক্তব্যে, চিন্তায় নতুন জীবন গড়ার আশ্বাসে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকি। নবজাগরণের জোয়ার যদি ভাঁটার নেমে থাকে তো পশ্চিমের জীবনযাত্রা, কল্পনা ও চর্চা আমাদের এখনো মাতায়। মনে করি পশ্চিমের সৌর্য, বীর্য, চিন্তা আমাদের পাওনার কড়ি। কার্যতই নয় বা কেনো। আমাদের উনিশ শতকের একাংশ নিয়ন্ত্রণের ইতিবৃত্ত আর বর্তমান শতকের অধিকাংশই তো ঘরে ফেরার রাস্তা খোঁজে পশ্চিমের খুঁটি ধরে। সমাজবিজ্ঞানের ছক, রাষ্ট্রগঠনের রীতি, শিল্পসাহিত্যের কৌশিক আত্মসচেতনতা, এককথায় চৈতন্যের রূপটাই আমরা পড়ে নেতে চাই য়ুরোপের নজীরে। আত্মআবিষ্কারের প্রশ্নে সহজেই মনে পড়ে বুঝি আমাদের স্বকীয় কোনো পথ নেই, যা-কিছু আছে তা নিতান্তই ভাবানুগা, অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর, কাঁপা আধ্যাত্মিকতার অযৌক্তিক কার্যক্রম। ভালো

যা মনে যাই হোক, এমন কি সত্যাধিষ্ঠার প্রসঙ্গ না তুলেও জানি, আমাদের কোনো কবি ভারতে বা বাঙলা দেশেই কেবল পশ্চিমের সঙ্গে, রাজনীতিজ্ঞ তান্ত্রিকের মনে হয় ভারতীয় সাধনার ধারা য়ুরোপীয় সাধনার থেকেই। হাল আমলের রাজনীতি ঘোরে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রতত্ত্বের চাকায়। এমন কি তার পুঁজিবাদী এটিবিদ্যুতি যাদ বা-দিয়েই, কি আইনে কি বাঁধে, য়ুরোপের পুলি সর্বত্রই উচ্চারিত হয় মন্ত্রের মতো, যদিও পথ ও ঐতিহ্যের কথা নামাবলীর মতো অজানো থাকে। আমাদেরও যে ভাববার কথা ছিলো, আমাদেরও যে দেখবার মতো নিজস্ব ভঙ্গী ছিলো বা সেই ভাবনা ও দেখার নজীর ছড়িয়ে আছে বিরাট দেশের হাজার বহুরব্যাপী সংস্কৃতির নানা স্তরে, ঐশ্বর্যের বিচিত্র সম্ভারে, সে-কথা সচরাচর মনে পড়ে না। কোনো একজন মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের কথাটা উঠলে আমরা কখনো হকচকিয়ে যাই, কখনো বা চুলিসারে তাদের স্মৃতি ইতিহাস থেকে মুছে ফেলি যেমন মুছে গেছেন মধুসূদন, বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্র, আর রবীন্দ্রনাথের মতো কেউ কাঁধে চেপে বসলে হনুমূলে রোদের মূলের মতো তাকে ভাসিয়ে দিই ঘোলাজলের বানে। যেমন রবীন্দ্র শতবর্ষের মাতামাতিতে বাঙলাদেশে বাঙলা ভাষার কথা লেখনে পড়ে থাকে আর দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের হিসেব-নিকেশ, রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের শত বক্তব্য সত্ত্বেও, জাতীয় মানসে দাগ কাটে না। আমরা যেমন ছিলুম এতোকাল তেমনিই থাকি, ভারতীয় ইতিহাসের ধারা পুঁথিপত্রেই চাপা পড়ে, জীবনে চর্চার বিষয় হিসেবে গণ্য হয় না, য়ুরোপীয় ইতিহাসের গাড়ি আমাদের বাপটের মনে টেনে নিয়ে যায় তার বাঁধা পথে।

অথচ য়ুরোপে নিজের আত্মা বিষয়ে ভাবনাচিন্তার শেষ নেই। সেই আত্মা নিছক ঈশ্বরের প্রতিরূপ কি শয়তানের কাছে বিক্রীত এ-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ, আলোচনা ও বিতর্ক চলছে। আমরা অবশ্য কখনো কখনো এলিয়ট কি অন্য কাউকে আউড়ে বলতে ভুলিনা যে য়ুরোপের মন বর্তমানে অবক্ষয়ের শেষ তলানিতে, সমস্ত জীবনটাই একটা পোড়া পতিত জমি। আমরাও বুঝি ওদেরই মতো শূন্য ফাঁপা মানুষ। ওদের অপরাধ, ওদের গ্লানি আমাদেরও অপরাধ, আমাদেরও গ্লানি। আবার কখনো স্পেংলার বা টয়নবীর উদ্ধৃতিতে বলতে চাই যে য়ুরোপের শেষ আলো, পতনের অনিবার্যতা য়ুরোপের ভাগ্যবিধাতা রুখতে পারবে না। অথবা, মার্কুসের সুরমাচারে, বর্তমান য়ুরোপের চিন্তাজগতের

ওপর উঠ্‌বে পুঞ্জনমুক্ত প্রতিবেশীর বিজয় গৌরব। প্রাচীন অথর্ব যুরোপী সমাজের পাদপীঠ যুরোপ ভেঙে বদলে নতুন রূপ পাবে আসল ইতিহাসের শুরুতে। প্রাক্-পুরাণিক জীবন অর্থাৎ যুরোপের প্রাক্-ঐতিহাসিক পর্যায় যুরোপে আসাদী সাম্যবাদী সমাজের স্বাধীন সুখী অস্তিত্বে। চক্রাকারে ঘুরে এসে যুরোপের নবীন উদ্‌বর্তন হবে কি হবে না, রাষ্ট্রিক ইতিহাসের পরিণতি সাম্যবাদের অনিবার্যতায় কিনা এ-বিষয়ে মানামুনির নানা মতের সংঘর্ষে আমরা নিশ্চয়ই ব্যতিব্যস্ত, এমনকি শেষ বিচারের ভার আমাদের ওপরেও ন্যস্ত নয় তবু যুরোপের মনে যে একটা বিরাট সংক্ষোভ উপস্থিত হয়েছে তা বুঝি, তার আঁচ আমাদের গায়ে লাগে। আমাদের কোনো কোনো পূর্বপুরুষ ভেবেছিলেন প্রতীচ্য থেকে আমাদের নেবার প্রধান বস্তু হলো যন্ত্র বা যন্ত্রশিল্প আর তার বদলে আমরা দেবো আমাদের আধ্যাত্মিকতা। প্রতীচ্য আমাদের প্রাচীন জগতে এসে পেছে ওদের এলাকায় পৌঁছোবার অনেক আগে। আমরা যখন তার ধাক্কায় দিশেহারা বা অনেকটাই প্রহৃত করে সেই ফাঁকে নিজেদের সামলে ব্যস্ত তখন বহু হাত ঘুরে ভারতবর্ষ গিয়ে পৌঁছোলো ওই দেশে। চীনের হালচাল তার আগে থেকেই। আমাদের শাস্ত্র পাঠ করে, সংস্কৃতির ছিটে ফোঁটা পেয়েই ওঁরা ভারত আবিষ্কারে ব্যস্ত হলেন আর আমরা মনুষ্য করে পাঠ নিলুম ওঁদেরই কাছে ভারতবর্ষের আত্মার। ওঁদের কেউ কেউ নিশ্চয় ভাবলেন যে যুরোপের মুক্তি ভারতবর্ষের পথে, কিন্তু ভারতবর্ষের পরিচয় কখনোই সত্য হলো না ওঁদের মনে যেহেতু ভারতীয়দের জীবনেই ভারতবর্ষের রূপ মৃত। আর যে নতুন ভারতবর্ষ, বুদ্ধ ইত্যাদির বাণী আউড়ে সামনে এগুলো সেই ভারতবর্ষ যুরোপেরই একটি নিকৃষ্ট সংস্করণ মাত্র। ফলে যুরোপের আধ্যাত্মিক সঙ্কটের চেহারা আমাদের সচেতনতায় তেমন স্পষ্ট হয়ে ফোটে না বা এমন কি সত্যিসত্যিই যুরোপের যে সঙ্কট সমস্যা থাকতে পারে এমন বোধ আমাদের অনেকের কাছে অস্পষ্ট। যদিও আমরা সঙ্কট, অবক্ষয় ইত্যাদি শব্দ সদাই আউড়ে চলেছি। কারণ, সঙ্কটের বোধ বা সমস্যার রূপ বিষয়ে সচেতন হলে আমরা নকলনবীশ না-হয়ে নিজেদের চরিত্র বিষয়েই চিন্তিত হতাম বেশি। যতোটুকু আঁচ গায়ে লাগছে তার আসা মনের গভীরে বিশেষ পৌঁছোয়না; মন কোনো আত্মজিজ্ঞাসায়-প্রশ্নেই জাগ্রত থেকে মুক্তি পায়, কারণ মন অভিজ্ঞতাবাদীদের পরিষ্কার একটি শ্লেট মাত্র নয়। এমনকি কোনো একটি মুকুর আরশীও নয়।

আমাদের পূর্বপুরুষরা যোটামুটিভাবে সঠিক বুঝেছিলেন যে ইয়োরোপ মেনে যন্ত্র আর যন্ত্রশিল্প। কারণ যন্ত্রের গৌরবেই ইয়োরোপের অগ্রগতির গৌরব। যে-কোনো ইতিহাসের পুঁথিতেই আমরা পড়েছি যে ইয়োরোপের বিস্তীর্ণ মধ্যযুগ জুড়ে ও প্রাক্তন দাসত্বের মেঘাচ্ছন্নে মানুষ ও মানুষের মনকে বেঁধে রেখে দিয়েছিলো। চলমান জগচ্চিত্রে মানুষ ছিলো নিতান্ত দুর্বল, ঘরকুনো। নিজেকে ছড়িয়ে, গতির অবাধ প্রকাশে, বিশ্বকে জানবার সুযোগ ছিলো না তার জীবনে। শ্রমবিভক্তি সমাজে, ঔদ্ধত্যের অনুশাসন চেপে বসেছিলো জগদ্দল পাথরের মতো। সমাজের ক্রম ও শান্তি স্থির ছিলো পারস্পরের স্বীকৃত কর্তব্যে; যে-যার যথাবিহিত চরিত্রানুগ কাজ করে যাবে এবং নির্দিষ্ট কর্মের সূত্রেই সামগ্রিক শান্তি আসবে জীবনে, ঐশ্বর্য বিকশিত হবে সৃষ্টিকর্তার নিয়মে, যে-নিয়ম স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও ভাঙেন না। ঈশ্বরের দিব্যজগৎ ও দৈনন্দিন মানুষের জগতে, আত্মা ও দেহের মধ্যে মৌলিক তফাৎ নিশ্চয়ই ছিলো। শুধু দৈনন্দিন জগতের কার্যকারণ জেনে, নির্দিষ্ট সত্তার চাপে পরিচালিত হয়েই দিব্যজগতে উত্তরণের কথা, যেমন এই দেহকে এড়িয়ে নয় দেহের নিয়মকানুন জেনে আত্মার অনুসন্ধান। দৈনন্দিন জগৎ নিশ্চয়ই অসত্য, যেমন অসত্য এই দেহ। আত্মার লক্ষ্যে, দিব্যজীবন লাভের আকাঙ্ক্ষায় দেহকে পরিচালনার কথা ছিলো। আর জাগতিক বিশ্বে ঈশ্বরের প্রতিভূ ছিলেন রাজা। এই জগতে যন্ত্র ছিলো, কিন্তু যন্ত্রের প্রয়োজন ছিলো সীমাবদ্ধ। যন্ত্রকে ঘিরে শিল্পের সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। এরিস্টটলের হিসেবে গতি শুধুই চক্রাকারে পরিণতি পেতো, সোজা সরল রেখায় চলতো না। দিব্যজগৎ ও মানুষী জগতের সেতু রচনা করবার কথা ছিলো ঈশ্বরপুত্রের আত্মদানে, তাঁর পুনর্জন্মের ইতিবৃত্তে। এই মধ্যযুগের কল্পনাতেও তাই ইয়োরোপের বিনাশের কথা লুকিয়ে, আত্মাবিকারের বক্তব্য ধর্ম ও তর্কের দ্বন্দ্ব ও দ্বন্দ্ব সমাধানে। মধ্যযুগের এই চিন্তার ও লক্ষ্যে প্রথম কিছুটা অন্য কথা শোনালেন সন্ত টমাস। তিনি নিশ্চয়ই গীর্জার আধিপত্য অস্বীকার করেন নি কিন্তু এরিস্টটলের শরণ নিয়েছিলেন এই বলে যে তিনিই জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পুরাণের মহীরহে সন্ত টমাস শুধুই মানতে চাননি, জানতেও চেয়েছিলেন। যুক্তি ও বোধিতে কোনো বিরোধ তিনি দেখেন নি বরং বুঝিয়েছিলেন তারা পরস্পর সম্পূরক। এরা একই সত্য, ঈশ্বরের সত্যকেই বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে। যদি কখনো বিরোধ ঘটে—সন্ত টমাস জানতেন বিরোধ নিশ্চয়ই ঘটে—তবে যুক্তির পাল্লা

বোধির চাইতে ছাড়া ; অবশ্যই মানুষের চিন্তাতে বিরোধের কার্য-কারণ। প্রকৃতির জগৎ ও ঈশ্বরের করুণার ক্ষেত্রে কোনো বিরোধ নেই, যে-যার ক্ষেত্রে পূর্ণ ও নিজের নিয়মে অধিষ্ঠিত। সুতরাং সন্ত টমাসের ব্যাখ্যায় পদার্থবিদ্যা বিশ্বাসের হাত থেকে ছাড়া পায়। টমাস-শুরু ব্রেই এলবার্ট ঘোষণা করেন যে প্রাকৃতিক ঘটনার কোনো ব্যাখ্যাই মিলবে না ছাদে বা ধর্মের অনুশাসনে, প্রকৃতি নিজেকে খোলে বিশেষ অভিজ্ঞতায়। টমাস দেখিয়েছেন অধিবিদ্যার আলোচ্য নিশ্চয়ই প্রাথমিক বা আদি কারণ কিন্তু আদি কারণই একমাত্র কারণ নয়। বিশ্বের সবকিছুই, যা কিছু সীমাবদ্ধ, আংশিক ও ইন্দ্রিয়জ, ঈশ্বরের সৃষ্টি ; এ-কারণেই তারা ঈশ্বরের পূর্ণতার অংশ গ্রহণ করে এবং তাদের স্বকীয় ক্রম ও সৌন্দর্য আছে। তারা অবশ্যই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য লাভ করেনা যেহেতু তাদের সৌন্দর্য অংশগ্রহণের ফলে শুধু নিজেদের সীমায় তাদের তাৎপর্য পূর্ণতায়। দিব্যজগৎ ও ইন্দ্রিয়ের জগতে যে-পুরোনো বিরোধ ছিলো মধ্যযুগের সোভায় সন্ত টমাস সেই বিরোধ ঘোচালেন এবং জানালেন যে মানুষ কেবলমাত্র দুটি সম্পূর্ণ পৃথক ও বিরোধী পদার্থের মিশ্রণ নয়, মানুষ পরিপূর্ণ একটি ঐক্য। সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের ক্ষেত্রে কর্মের স্বাধীনতা স্বীকৃত হলো। নিজের চেষ্টায় ভাল ও সত্যের জগৎ গড়ে নেবার কথা এলো। আর এই সূত্রেই পরবর্তী কাল এলো জ্ঞানের নতুন সম্ভাবনা নিয়ে। ব্রুনো, কেপলার, গ্যালিলিও হয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞান নিউটনে এসে একটা চূড়ান্ত রূপ পেলো। ঈশ্বরের দিব্যজগৎ ও প্রাকৃতিক জগতের দ্বন্দ্ব চাপা পড়ে থাকে গিয়ে। সমাজের স্তরবিন্যাস বাড়া খেলো যন্ত্রশিল্পের সম্ভাবনায়। উৎপাদনের নতুন ব্যবস্থায় জমি থেকে ছাড়া পেয়ে মানুষ নিজেকে ছড়াতে চাইলো মুক্তির সম্ভাবনায় বিরাট বিশ্বে। সমস্ত বিশ্বজগতে মানুষের কর্তৃত্বের প্রতিরূপ হলো যন্ত্র। অমিত শক্তির অধিকারী মানুষ পৃথিবীকেই একটি যন্ত্র বলে ধরে নেয়। লাপলাসের গর্বিত উক্তিতে উচ্চারিত হয় মানুষের সর্বজয়ের সংকল্প। ঈশ্বরের স্থানে প্রকৃতিই প্রধান হয়ে ওঠে, ঈশ্বরের দিব্যজগতেও মানুষের হাত পৌঁছোতে চায়। নবজাগরণের চূড়ায় উনিশ শতক পর্যন্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সংশয়ের চিহ্ন নেই কোনো, সর্বত্রই মানুষের বিজয় ঘোষণা।

অথচ এই যন্ত্র, যন্ত্রশিল্প ও মানুষের অনায়াস-অর্জিত ক্ষমতাই বর্তমান ইউরোপের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। শ্রেচোর জগতে যন্ত্রের ছায়া বিরাট হয়ে

পড়েনি কিন্তু ক্ষমতার দাপটে তিনি চিহ্নিত হয়ে উঠেছিলেন। একটি নৈতিক পরিবেশের কল্পনায় তিনি মথিত হয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক জগতে রাষ্ট্র ও শক্তির চাপ তৈরি করেছিলো তাত্ত্বিক সোফিস্টরাই। আদর্শ রাষ্ট্রের আলোচনায়, তাঁরা বলতেন, একমাত্র ক্ষমতাই সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারে। "ক্ষমতাই ন্যায়" এই তত্ত্ব আমাদের মতো এথেনীয়দের মাতাতে পেরি করেনি। ন্যায়ের ভাবনায় চিহ্নিত প্লেটোর সমস্ত চেষ্টায় ছিলো এই তত্ত্বকে অস্বীকার করা, এই তত্ত্বের সম্ভাবনাকেই নির্মূল করা। প্রথম লড়াই তিনি শুরু করেন 'থিয়েতিস' গ্রন্থে সক্রাটেস ক্যালিক্লসের আলোচনায়, দ্বিতীয় পর্ব পাই বিখ্যাত 'রিপাবলিক' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে থ্রাসিমেকস ও সক্রাটেসের বাকযুদ্ধে। সক্রাটেসের মুখে প্লেটো এত চোদেন সমস্ত ভাবনা ও আবেগের লক্ষ্য কি? তর্কযুদ্ধে জয়ী হবার জন্যেই কেউ চায় না প্লেটো জানতেন, প্রতিটি বাসনার লক্ষ্য থাকে এবং সমস্ত প্রয়াসই সেই লক্ষ্যের সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু ক্ষমতার বাসনার কোন হেতু নেই। এই বাসনার চরিত্রই হলো নীতিহীন দাবী; কোনো এক রাজা ক্যালিউট এসে বলবেনা, আর নয়—এটুকুই শুধু। প্লেটোর ভাষায় এই বাসনার তৃপ্তি ফুটো পাত্রে জল ঢালবার মতো। জীবনে ক্ষমতার এই লোভকে প্লেটো পাপ মনে করতেন, নাম দিয়েছিলেন, 'প্লিওনেক্সিয়া' অর্থাৎ আরো-র জন্য অতৃপ্ত বাসনা। প্লেটোর কল্পনায় তাই একদিকে "ন্যায়" ও অন্যদিকে "ক্ষমতার লোভ"; এই দুই বিরোধী বাসনার টানাপোড়েনে মনুষ্যত্বের পরীক্ষা। নীতির প্রমাণ "ন্যায়ে"র কষ্টিপাথরে আর মানুষ তখনই পূর্ণ যখন সে তার জীবনে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। প্লেটোর চিন্তার আলোতেই আধুনিক দুরোগের সঙ্কট প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। যে-যন্ত্র মানুষকে বিশ্বের কেন্দ্রে বসিয়েছিলো সেই যন্ত্রই আজ মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে। যন্ত্র হয়ে উঠেছে ঈশ্বর। বিজ্ঞানের হাতে মারণাস্ত্র হয়ে উঠেছে বিভীষিকার সংকেতে আর স্রষ্টা বৈজ্ঞানিকরা অবোধ বিস্ময়ে ভাগ্যের কার্য-কারণ তত্ত্বে দিশেহারা। মানুষের কল্যাণের বদলে মানুষের জন্য মারণাস্ত্রের রাজনীতির ঘুঁটি। আত্মহননের প্রতিটি যান তৈরী করছে মানুষ নিজে। অগ্রগতি ও আবিষ্কারের বিজয় ঘুড়িতে যন্ত্র ও যন্ত্রের দাপট ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং এই স্ক্র্যাপেনস্টাইনের ছায়া বর্তমানে সারা বিশ্বে। মানুষ যন্ত্রের নজীরে নিজেরাই যন্ত্র হয়ে পড়েছে। মধ্যযুগের মানবিক সম্পর্কের শৃঙ্খল ভেঙে দুটি মানুষের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক বন্ধন এনেছে যন্ত্র এবং যন্ত্রের বন্ধনে যেহেতু মানুষের প্রয়োজন নেই

মানুষেরাই প্রাণহীন পুতুল হয়ে উঠছে। যন্ত্র যেমন মানুষের হয়ে কাজ করে দেয় মানুষকে নির্জীবপ্রায় করে তোলে তেমনি, য়ুরোপের মনীষীরা ঘোষণা করছেন, সমস্ত দেশ জুড়ে সাধারণ মানুষরা অন্তর্নির্জীবপ্রায় যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। যুক্তিবান, স্বাধীন বিবেকী মানুষ নয়; জনসাধারণ, মাথাহীন সোত্রহীন একটা পিণ্ড। একটা জন্তু যেনো, যে কেবল অন্যের দ্বারা চালিত হয়, যার সম্মিলিত বাহুতে অমিত বীর্য কিন্তু যার কোনো মস্তিষ্ক নেই, চোখ নেই, হৃদয় নেই। যন্ত্রের চাপে, যন্ত্রের সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বের প্রভাবে ব্যক্তি যে নিষ্পেষিত হয়ে একটি সাধারণীকৃত পশু হয়ে উঠবে সমাজতন্ত্র বা রাষ্ট্রতন্ত্রের সত্তরকে সে-কথা ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভক্ত জন ইঁট মিলের সময় এতোয় মি। তিনি লিখেছিলেন 'লিবার্টি' গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে: "The combination of all these causes forms so great a mass of influences hostile to Individuality, that it is not easy to see how it can stand its ground. It will do so with increasing difficulty, unless the intelligent part of the public can be made to feel its value—to see that it is good that there should be difference, even though not for the better, even though, as it may appear to them, some should be for the worse. If the claims of individuality are even to be asserted, the time is now, while much is still wanting to complete the enforced assimilation. It is only in the earlier stages that any stand can be successfully made against the encroachment. The demand that all other people shall resemble ourselves grows by what it feeds on. If resistance waits till life is reduced *merely* to one uniform type, all deviations from that time will come to be considered impious, immoral, even monstrous and contrary to nature." যন্ত্র সব এক ছাঁচে ঢালে, কারণ যন্ত্র হলো বৈষয়িক একটি বাধ্যতা যা নিজের প্রয়োজনে যিনিই হাত পেতে, নিজেকে প্রতিটি মুহূর্তে ভেঙেচুরে ব্যক্তির প্রাতিস্বিকতার আত্মাকে ব্যক্ত করে না। কারণ, যন্ত্রের আত্মা নেই এবং উৎপাদনের প্রয়োজনই তার প্রয়োজন। উৎপাদনে সংখ্যার হিসেব। ফলে সভ্যতার গন্তব্যতা মানুষের, সংখ্যার লক্ষ্যটাই প্রধান। তখন যন্ত্রের হিসেব মতোই সাধারণ নিয়ম বা সূত্রের চালে জীবন চালাতে সুবিধে। ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রশ্নে যন্ত্রের গতি ব্যাহত হয়।

বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে দূরবর্তী যন্ত্র চালাবার কৌশলে ব্যক্তিদেরও চালানো হচ্ছে জনসাধারণ নামক যন্ত্রপিণ্ডের আকারে। সামনে শুধু আশার ছলনা, ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্নবিলাস।

যন্ত্র ও যন্ত্রকৌশলকে ঘিরে য়ুরোপের সঙ্কটের স্বৈতরূপ। যন্ত্রের অনন্ত সম্ভাবনার পরিণতি একদিকে মারণযজ্ঞের লেলিহান আগুন ও অন্যদিকে ব্যক্তির ওপর নির্বিশেষ জনসাধারণের অন্ধ শাসন। কুরী, রাদারফোর্ড, আইনস্টাইন, বোর, হাইসেনবার্গ এই অসামান্য পদার্থতত্ত্ববিদ্‌দের জ্ঞানার্জনের চূড়ান্ত 'সিদ্ধি' পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার বৈজ্ঞানিকদের আত্মবিস্ময়ে। অথচ এ কথাও জানা যে মানুষের অস্তিত্বের প্রাথমিক অবলম্বনই ছিলো যন্ত্র, তার হাতিয়ার। উন্নত যন্ত্রকৌশলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সভ্যতার প্রতিটি ধাপ। সভ্যতার আদিতে প্রথম হাতিয়ার ও আগুন মানুষকে ঠেলে দিয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে, দিয়ে এসেছে জটিল যন্ত্রবিন্যাসের রাজপথে। আর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের সামনে কঠিন প্রশ্নটি মাথা তোলে, এই যন্ত্রকৌশল দিয়ে সে কি করবে? কারণ মানুষের ভাগ্যে একই সঙ্গে জড়িত তার বিচিত্র সম্ভাবনা আর তার অন্ধ নিয়তি, স্বস্তি ; কারণ মানুষের হৃদয় স্বর্গের সঙ্গেই শঠতায় পূর্ণ, সত্যের সঙ্গে অসত্যে। চীনের তাও কল্পনায় আদিতে যে অখণ্ড শান্তির ছবি ছিলো তা ভাঙে মানুষের উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাজে, আবিষ্কারে, সৃষ্টিতে। যন্ত্রকৌশল এই অভ্যাসের একটি হাতিয়ার। যন্ত্রকৌশলের তাড়নাতেই মানুষ সহজে তার স্বাভাবিকতা হারায়, অন্যায়ের পথে, লোভের পথে পা বাড়ায়। রুশোর এক শিষ্যের সঙ্গে একটি বালীর কথোপকথনে জানতে পারি এই উত্তরণী চীনের কথা। পাথরের সিঁড়ি বেয়ে-কল টেনে এনে সেই বালীটি অনেক কষ্টে বাগানে জল দিচ্ছে একদিন। রুশোশিষ্যপত্নী দেখতে পেয়ে তাকে নতুন এক আবিষ্কারের কাহিনী শোনায়। দ্বিধাহীন জবাব আসে বালীর, "যেখানেই অসৎ আবিষ্কার সেখানেই তার অসৎ ব্যবহার, আর যেখানে অসৎ ব্যবহার সেখানেই অসৎ হৃদয়। অসৎ হলে হৃদয়ের শুদ্ধতাই নষ্ট। আমি আবিষ্কারটি জানি কিন্তু ওটা ব্যবহার করতে আমি লজ্জিত।" বোতাই বাজে যন্ত্রকৌশলতত্ত্ব দিয়ে যন্ত্রকৌশলের সঙ্কট ঘোচে না। সমস্যা মানুষের, মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের।

কিন্তু মানুষের হৃদয়পরিবর্তনের সমস্যাই জটিল হয়ে উঠেছে য়ুরোপে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের চাপে। ব্যক্তি যে নির্বিশেষ জনসাধারণে পরিণত হচ্ছে তার প্রধান

কারণও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিশ্লেষণ। প্লেটো যদিও জেনেছিলেন যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মানুষে মানুষে হানাহানি অনিবার্য এবং সেই সংঘর্ষের জগতে জ্ঞানীতির প্রশ্ন নেই এবং সেই জ্ঞানের সূত্রে আদর্শ রাষ্ট্রের শুধু পরিকল্পনাই করেন নি কার্যত তা রূপ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরেছিলেন, তবু প্লেটোর বহুবীর মুরোপের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করে না। সন্ত টমাসের প্রভাবে মধ্যযুগে ব্যক্তির নিজস্ব কর্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো, নবজাগরণ আনলো নতুন রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রতত্ত্ব ও পরিকল্পনা যদিও ব্যক্তির অধিকারের ওপর দাঁড়িয়ে তবু ব্যক্তির স্বার্থের এমনই ভাঙন যে প্রগতির মধ্যপাদেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বার্থপরতার বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের প্রতিভূ রাজা যদিও ক্রমশই ক্ষমতাহীন হতে থাকে, রাষ্ট্রকর্ণধারদের দাপট বাড়তে দেরি হয় না। ব্যক্তির প্রত্যক্ষ শাসনের বদলে নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রের ক্ষমতা আকাশ পরিমাণ হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ আর রাষ্ট্রের কর্ণধার জনসাধারণ বা জনসাধারণের প্রতিনিধিই হোক না কেনো রাষ্ট্রশক্তির কাছে প্রত্যেকে নতি স্বীকার করতে বাধ্য। দার্শনিক হবস রাষ্ট্রের এই চরম ক্ষমতার কথা শোনালেন এবং ইতিপূর্বেই মাকিয়াভেলী তাঁর 'প্রিন্স' গ্রন্থে আধুনিক রাষ্ট্রের পত্তন করেছেন। ঈশ্বরকে মাকিয়াভেলী অপ্রয়োজনীয় বোধে পরিত্যাগ করেন তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্যে এবং এ-কথা জানাতে ভোলেন না যে ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিরা কখনোই ভালো যোদ্ধা হবে না যদিও তারা ভালো সামাজিক মানুষ হতে পারে। আসলে তিনি জানাতে চাচ্ছেন যে রাষ্ট্রের সঙ্গে বা রাজপুরুষের সঙ্গে ধর্মের কোনো যোগ নেই। শক্তিই মূল লক্ষ্য। এ-কারণেই তিনি লেখেন: "A prince ought to know how to resemble a beast as well as a man, upon occasion: and this is obscurely hinted to us by ancient writers who relate that Achilles and several other princes in former times were sent to be educated by Chiron the Centaur, that as their preceptor was half-man and half-beast, they might be taught to imitate both natures since one cannot long support itself without the other. Now, because it is so necessary for a prince to learn how to act the part of a beast sometimes, he should make the lion and the fox his patterns: for the lion has not cunning enough of himself

to keep out the snares and toils, nor the fox sufficient strength to cope with a wolf: So that he must be a fox to enable him to find out the snares, and a lion in order to terrify the wolves." প্রজাতান্ত্রিক রুশো অবশ্য জনসাধারণের "সাধারণ ইচ্ছা"র কথা বলেন কিন্তু সাধারণ ইচ্ছার হিসেব গুলিয়ে ফেলায় তিনি অবশ্য-ভাবিতে সংখ্যালঘুকে মানিয়ে নেবার কথা ভোলেন, যে-রন্ধ্রপথে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রকর্তৃত্বের প্রভাব আসেন হেগেল। রুশোর সাধারণ সরল "সাধারণ ইচ্ছা"কে হেগেল "সারবত্তায়" ও "চৈতন্যে"র সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে দেন যে পরমভাবের চূড়ান্ত প্রকাশ রাষ্ট্রের মধ্যেই ঘটতে থাকে। যদিও তিনি নেপোলিয়নকে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তবু প্রশিয়ার রাষ্ট্রের হাতেই জীবন ও জগতের শেষ এবং সর্ববিধ ক্ষমতা ছেড়ে দিতে দার্শনিক প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন যেহেতু—"The State is the spirit that dwells in the world and realises itself in the world through consciousness...It is the course of God through the world that constitutes the State..."

ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতির ধারায় যে-হেগেলীয় বক্তব্য রাষ্ট্রের হাতে অমোঘ ও সর্বগ্রাসী কর্তৃত্ব তুলে দেয় তারই নগ্নপ্রসারিত কাঠামো দেখতে পাই ইয়োরোপে ফ্যাসীবাদ ও সাম্যবাদের রাষ্ট্রতত্ত্বে। একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে ফ্যাসীবাদে গণতন্ত্রের মতোই রাষ্ট্র অবয়ব-অক্ষয়, কিন্তু মার্কসীয় সাম্যবাদে রাষ্ট্রের মৃত্যু ঘোষিত। তবু কার্যত হেগেল-পন্থী এই দুই বক্তব্যে রাষ্ট্রের মাহ জীবনের সর্বস্তরেই প্রসারিত। প্রাক্-সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র শ্রেণীসংগ্রামনিরোধের যন্ত্র অর্থাৎ নিষ্পেষণের যন্ত্র এবং সাম্যবাদী দলের কর্তৃত্বে এই রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত দলীয় স্বার্থের বাহন। শ্রেণীর বিনাশে যেহেতু ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রশ্ন গৌণ মার্কসীয় রাষ্ট্রতত্ত্বে অবান্তর প্রসঙ্গ নিতান্তই অবান্তর। দল-ব্যাখ্যাত সত্তা বা দলপ্রধান ব্যাখ্যাত সত্তাই সত্য, রাষ্ট্র এই সত্যের বাহন মাত্র। ব্যক্তি এই রাষ্ট্রে একটি সংখ্যা বা সমাজতন্ত্রের গড়পড়তা হিসেব, তার ভাগ্য সাম্যবাদী দলের উত্থানপতনের নিয়তির সঙ্গে জড়িত। সাম্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী বক্তব্যের পাশে নিশ্চয়ই গণতান্ত্রিক বক্তব্য আছে, যেমন কান্টে. জন স্টুয়ার্ট মিলে, টমাস হিল গ্রীণে কিন্তু গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ হিসেবে অভিজ্ঞতায় এতোই পৌঁজাবিল যে সাম্যবাদের বাজা তার পক্ষে নয় করা অসম্ভব। মার্কস্ সঠিক ভাবেই দেখিয়েছিলেন যে অন্নের

নিয়ামক মানুষেরা মূলধারা সমাজে ব্যক্তিগত স্বার্থে পরিচালিত, তাই বহুত ব্যক্তিগত স্বার্থ ও হিংসার বাহন। মার্ক্স আরো দেখিয়েছিলেন যে একদিকে ব্যক্তিগত মালিকানা ও মালিকানা-জাত লাভ আর অন্যদিকে সামাজিক সংগঠিত উৎপাদন ও ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত অভাব। তাই মার্ক্সের চিন্তার শোষণ নির্মূল করার দিশা খুঁজেছিল সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে। ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রশ্নে মার্ক্স বলতে চেয়েছেন যে গণতন্ত্রের সার্থকতা কখনোই অর্থনৈতিক শোষণমুক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। সাম্যবাদই শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্র।

গণতন্ত্রের বিশৃঙ্খল নৈরাজ্যে, একচেটিয়া মালিকানার বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা নিশ্চয়ই সাম্যবাদ। রাষ্ট্রে সঞ্চিত শক্তি ও ব্যক্তির অধিকারের সীমা ও স্তর এখনো সবিশেষ নির্ধারিত হয়নি। এবং স্বভাবতই তাই অর্থনীতির যুক্তিতে বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তি সংগঠিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের চৌহদ্দিতেই নিজেকে একা, নিঃসহায় বোধ করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাস গণতন্ত্রের পীঠস্থান যুক্তরাজ্য পর্যন্ত সর্বত্রই এক ইতিহাস। এ-কারণেই বোধহয় এক্টা অলক্ষ্য চাপ থাকে চিন্তায়, রুচিতে, ব্যবহারে নির্দিষ্ট ছাপ ফেলে দেবার দিকে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমন, আমরা কোনো মার্কিন মনীষীরাও, ইয়াঙ্কি-অন্ধতা ও বোধহীন রুচিবিকারের কথা বলেছেন। শুধু হালের বীজব্যাবসায়ীরাই নয়, সাবেকী ফরাসী ঘটকেতিলও এমন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের যুক্তিটা তাই প্রায় নিরুপায় সত্য হয়ে উঠেছে। আর ক্যাথলিকী দেশে বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রে মিল কথিত 'enforced assimilation' তো সর্বজনস্বীকৃত ঘটনা। মার্ক্সবাদীদের এ-বিষয়ে লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই যেহেতু তাঁরা শ্রেণীকে জানেন ব্যক্তিকে নয়। শ্রেণীবিশ্লেষণের আগে ব্যক্তির কথা মার্ক্সীয় সাম্যে যেহেতু থাকতে পারে না, বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়ার আপত্তি কোথায়? গণতন্ত্রে কথা 'জনসাধারণ' আর সাম্যবাদী রাষ্ট্রে কথা 'শ্রেণী'। গণতন্ত্র অন্তত মৌল স্বাধীনতার কথা বলে, সাম্যবাদের সে দায় একদার সত্যতার গর্ভমান পর্ব শেষ হলে। তাই উদ্ভাসের প্রাবল্যেও রুশ শিক্ষাব্যবস্থায় নির্দিষ্ট ছাঁচের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্ব পড়েছিলো।

কি সাম্যবাদ কি গণতন্ত্র স্বতঃই যে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্বগ্রাসী হয়ে উঠতে চায় তার কারণ য়ুরোপের ইতিহাসের মৌল বোঁকে নিহিত। ভারতবর্ষের

প্রতিপক্ষে, য়ুরোপে সভ্যতার শুরু থেকেই দৃঢ়, কঠিন সংগঠন গড়ে উঠেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার শুরু প্রাচীন গ্রীক যাদেরও এই সংগঠনের চিন্তার ছাপ আছে। মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তি বিষয়ে যদিও গ্রীকেরা চিন্তিত ছিলো, যদিও য়ুরোপে সর্বপ্রথম ব্যক্তির অধিকার ও দায়িত্বের কথা গ্রীসেই উচ্চারিত হয় তবু সমাজবিন্যাসে শোষণের ব্যবস্থা গ্রীকসংগঠনের প্রমাণ দেয়। সংগঠন নিশ্চয়ই প্রত্যেক সমাজব্যবস্থার ভিত্তি, কিন্তু গ্রীসে এই সংগঠনের রূপ মানুষের সত্তার 'স্বাভাবিকতার' মঞ্জীরে এমন ভাবে বেঁধে ফেলার চেষ্টা হয় যে ব্যক্তির স্বাধীনতার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। স্বয়ং এরিস্টটল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তেমন জোরালো প্রতিবাদ করেন না, আর মহৎ ধার্মনিক প্লেটো মানুষের মনকে ত্রিবিধ ভাগে ভাগ করে মানুষ মঞ্জীরে শ্রেণীবদ্ধ করেন তপাতল থেকে। গ্রীসে অবশ্য পাকাপাকিভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয় না, হয় পরবর্তী রোমে। সাম্রাজ্যবাদী রোম সমাজসংগঠনের ক্ষেত্রে গ্রীসকে টেক্কা দিয়ে দাঁড়ায়। এমন একটি রাষ্ট্রকাঠামো শোষণের ওপর তৈরী হয় যার ছাপ এমন কি খ্রীষ্টীয় গীর্জা-সংগঠনের ওপর লেগে থাকে। স্তরবিভক্ত সমাজের ছবি যথাযথ পাই রোমক রাষ্ট্রবিন্যাসে ও খ্রীষ্টীয় সংগঠনে। ব্যক্তি এখানে গোষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠীতে বিভক্ত। খ্রীষ্টীয় গীর্জা-সংগঠনে ব্যক্তি তার বিবিধ বীক্ষণের ও গীর্জা অবলম্বন করেই জীবন গড়ে। এর বাইরে তার স্বাধীনতার সীমা বিস্তৃত নয়। ব্যক্তির নিজস্ব সম্ভাবনা ও পরিণতি শাসিতই রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুশাসনে চালিত। য়ুরোপের ইতিহাসে তাই সমাজের চাইতে রাষ্ট্রের ছাপটা বেশি, ধর্মের চাইতে গীর্জার। ফলে স্বভাবতই য়ুরোপে সর্বগ্রাসী কর্তৃত্বের মনোভাব ও সংগঠন পদ্ধতি গড়ে ওঠে, একনায়কতন্ত্র ছাপটে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। যন্ত্রকৌশল ও যন্ত্রপ্রসঙ্গে দেখিয়েছি যে য়ুরোপের সমস্যা হৃদয় পরিবর্তনের সমস্যা। আপাত সহজ এই ভারতীয় বা কমনসীয় মৌল সমাধানের ক্ষেত্রটি যে কতো জটিল তার প্রমাণ মিলবে জীবনে নীতিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে। মার্ক্সবাদীরা বলে হৃদয় পরিবর্তন নির্ভর করে সংগঠন পরিবর্তনের ওপর। সমাজবিন্যাস বদলাতে পারলেই প্রায় যেনো স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষেরা বদলে যাবে। য়ুরোপে মার্ক্সবাদীও অ-মার্ক্সবাদীদের নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় ধরা পড়ে তারা কে কেমনভাবে নিয়তই ভাবের ঘরে চুরি করছে। নীতিশাস্ত্রের মঞ্জীর এ-কারণে যে মানুষের জীবনযাত্রা ও জীবনযাত্রার মূল্যবোধেই চরিত্রের ও সংস্কৃতির পরিচয়। কোনো সংস্কৃতিই তার নীতির পরীক্ষা না দিয়ে বাঁচতে হতে

পারেনা। য়ুরোপে যন্ত্র ও মনুষ্যত্বের যে-সমস্যার পরিচয় আমি তুলেছি তার স্বরূপ আরো স্পষ্ট হবে বর্তমানে চালু নীতিবিরোধী দার্শনিকতার কয়েকটি মতামত বিচার করলে।

'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থে রাসেল লেখেন "আজ্ঞান দেশে প্রয়োগ তত্ত্বকে অনুপ্রেরিত করে, অজ্ঞর তত্ত্ব প্রয়োগকে।" প্রাচ্যের তুলনায় প্রতীচ্য নিঃসন্দেহেই উন্নত কাজেই তার তত্ত্বের চরিত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন জীবনে জ্ঞাননীতির প্রশ্নে রাসেল নিজেই লেখেন : "If we all agreed, we might hold that we know values by intuition. We cannot prove,to a colour-blind man,that grass is green and not red. But there are various ways of proving to him that he lacks a power of discrimination which most men possess, whereas in the case of values there are no such ways, and disagreements are much more frequent than in the case of colours···Hence, the conclusion is forced on us that the difference is one of tastes, not one as to any objective truth." এই বক্তব্যে আমরা জানছি যে মূল্যবোধের কোনো বিচার্য স্থান নেই। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অসংখ্য বিভেদের মতো রুচিতেও অসংখ্য পার্থক্য। মূল্যের বোধ সম্পূর্ণ রুচি-নির্ভর। বিভিন্ন রুচি বিষয়ে কারো কোনো তাত্ত্বিক বক্তব্য থাকতে পারে না। সুতরাং মূল্য বিষয়েও কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা সম্ভব নয়। রাসেলের এই উক্তি প্রত্যক্ষবাদীদের নীতিশাস্ত্র বিষয়ক তত্ত্বের একটি অংশ। বর্তমানে যারা পৃথিবীতে প্রত্যক্ষবাদীদের প্রতিভূ স্থানীয়। তাঁরা বোঝাতে চাচ্ছেন নীতিশাস্ত্র বলে সত্যিই কিছু হয় না, নীতিশাস্ত্রের কোনো বচনই সত্যবচন নয়। যে যে উক্তি নীতিশাস্ত্রে আমাদের আলোচ্য তা একান্তই আবেগ-প্রধান, আমাদের মনোভাব মাত্র সুতরাং জ্ঞানের বচন নয়। অধ্যাপক এয়ার যেমন লিখেছেন : "কোনো বচনে নীতিশাস্ত্রের প্রতীক থাকলেই তার তথ্যগত তাৎপর্য থাকে না। তাই যদি কাউকে বলি, 'ওই টাকা চুরি করে তুমি অন্যায় করেছো' তবে আমি 'তুমি টাকা চুরি করেছো' বাক্যটির চেয়ে অন্য বাড়তি কিছু বলতাম না। 'তুমি অন্যায় করছো' এইটুকু যুক্ত দিলেই এ বিষয়ে বাড়তি মন্তব্য করা হচ্ছে না। আমি শুধুমাত্র আমার নৈতিক অসমর্থন প্রকাশ করছি। যেনো 'তুমি

টাকাটা চুরি করেছো' বলেছি তবের এক বিশেষ কণ্ঠস্বরে, যা কয়েকটা বিশেষ আক্ষরিকোবক চিহ্ন ফুটে তাটা লিখেছি।" এই তত্ত্বের মানবিক ভ্রান্তির মধ্যে প্রধান একটি হলো এই যে মূলাকে তার স্বাভাবিক স্থান থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন ধরা যাক আমি 'ক' বাবুর বন্ধু। আমার প্রতি ওঁর অখণ্ড বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। কিন্তু আমি মামার কৌশলে ওঁর উইলটা পালটে সমস্ত সম্পত্তি নিজে নিলুম আর জলের সঙ্গে বিষ দিয়ে ওঁর জীবন শেষ করে দিলুম। 'ক'বাবু নিশ্চিন্তমনে চিরনিদ্রায় ডুবলেন। কোন যন্ত্রণা তিনি পাননি, আমিও কৌশলে ধরা পড়বার সমস্ত সূত্র মুছে ফেললুম। এবারে আমাকে কি বলা হবে? 'ক'বাবু বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারতেন কিন্তু জীবদ্দশায় ওঁর মনোভাব ছিলো শ্রদ্ধার, বিশ্বাসের। সুতরাং হত্যা বিষয়ে বলবার কিছু নেই প্রত্যক্ষতার অভাবে, কার্যত হত্যাই ঘটেনি। একমাত্র আমি নিজে সাক্ষাৎ ভাবে জানি যা ঘটবার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু আমি ধূরন্ধর লোক, তাই কাউকে দুঃখকষ্ট যন্ত্রণা না-দিয়ে আমার ভবিষ্যতের পাকা ব্যবস্থা করেছি। আর একথা এয়ার-ব্রাসেলরা নিশ্চয়ই মানবেন যে কারো কোনো প্রতিবাদী বা আপত্তিকর মনোভাবের অনুপস্থিতিতে কোনো অর্থেই আমাকে খুনী বলা চলেনা বা ঘটনাটাকে নিন্দে করা যায় না। সুতরাং এই তত্ত্বে হত্যাপরাধ কেমন চমৎকার নীতিশাস্ত্রের আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও অনেক ঝামেলা, কারণ পরস্পরবিরোধী মনোভাবের প্রসঙ্গে সত্যবিচারের কোনো মানদণ্ড নেই। ফলে এই দার্শনিক প্রস্তাবনায় জনমতোত্তা আন্দোলনের বিরুদ্ধে কণ্ঠে আঙুলও তোলবার সমর্থন নেই। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নীতির সত্যতা বিষয়ে প্রশ্ন নেহাৎই অবান্তর। তাই বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্র নিয়োগে যুদ্ধ বাধানোর অমানসাধনী সংগ্রামে ওঁর নিজের নীতিশাস্ত্রবিরোধী বক্তব্যের পাশে য়ুরোপীয় মানসের মূঢ়তাকেই তুলে ধরে।

প্রত্যক্ষবাদের পাশে মার্ক্সবাদের সাপেক্ষ নীতিতত্ত্ব সমস্যাকে আরো জটিল করেছে। এই সাপেক্ষ তত্ত্ব অবশ্যই ব্যক্তিনির্ভর নয়। ক্যাপীবাদের 'কোক'-এর স্থানে, মার্ক্সবাদের 'শ্রেণী'। লেনিনের উক্তিতে জানি, "আমাদের নীতিতত্ত্ব সম্পূর্ণই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থের দ্বারা যেন চলে। শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের তথ্য ও প্রয়োজন থেকেই আমরা নীতিতত্ত্বকে আহরণ করি।" অবশ্য এমনেন্স ঘোষণা করতে ভোলেন না যে, "A really human morality which transcends class antagonisms and their

legacies in thought becomes possible only at a stage of society which has not only overcome class antagonisms, but has even forgotten them in practical life." এই তত্ত্বে প্রধান হচ্ছে সামাজিক শ্রেণীগুলোর স্বার্থ সম্পূর্ণই পরস্পরবিরোধী। এই বিরোধ থেকে পৃথক পৃথক নীতিশাস্ত্র জন্মায়। যদিও মার্ক্সীয় শাস্ত্রে বলা হয় যা পৃথক শ্রেণীর কারণে বা পৃথক স্বার্থের কারণেই কেনো পৃথক নীতিবোধ জন্মাবে তবু সহজবুদ্ধিতে এ-কথা নিশ্চয়ই বোঝা যায় যে সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণে, ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে বিভিন্ন নীতির জন্ম। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যুক্তির সঙ্গীন সত্ত্বেও মার্ক্সবাদীরা আন্তরিকভাবে দাবী করেন বুর্জোয়া নীতিবোধের চাইতে শ্রমিকশ্রেণীর নীতিবোধ শ্রেষ্ঠ। যদি কেউ প্রশ্ন করেন এই শ্রেষ্ঠত্ব কি ভাবে প্রতিপন্ন হচ্ছে তবে ওঁরা মানবতা ও সভ্যতার দোহাই তোলেন। কারণ মার্ক্সের ভাষায় শ্রমিকশ্রেণীই বুর্জোয়া পর্যায়ে সমস্ত মানবতার প্রতীক। যদি এ-কথা সত্য হয় তবে সঙ্গে সঙ্গেই আসতে হবে আদিতে, মানবসভ্যতার সূত্রপাতেই মানবিক নীতিবোধ আছে। অথচ এ-বক্তব্যের সঙ্গে নীতির শ্রেণীতত্ত্ব কোনোক্রমেই মেলে না। মানবিক নীতিবোধ সর্বজনীন নীতিবোধ, তাতে প্রত্যেক শ্রেণীরই অংশীদারত্ব আছে এবং সে-ক্ষেত্রে সমাজকে সম্পূর্ণ বিরোধী স্বার্থের ভিত্তিতে ভাগ করবার কোনো কারণ নেই। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে মার্ক্সবাদ নীতিবিচারের সঠিক মানদণ্ড উপস্থিত করেনা। আরো আশ্চর্যের কথা এই যে আদিতে নয়, বিশিষ্ট পর্যায়ের অন্তেই সর্বজনীন নীতিশাস্ত্র আসছে। প্রশ্ন তোলা যায় এই সর্বজনীন নীতি এলো বা আসবে কোথা থেকে? ওঁরা নিশ্চয়ই জবাব দেবেন শ্রেণী যা থাকলেই সর্বজনীন নীতি আসে। কিন্তু একথা বোঝা যায় না, কেমন করে, কোথা থেকে শ্রেণী ঘুচে গেলেই সর্বজনীন নীতিগুলো হড়মুড় করে এসে পড়বে। কারণ সাম্যবাদের সূত্রপাত পর্যন্ত শ্রেণী থাকবে, রাষ্ট্র সেই শ্রেণীস্বার্থের বাহন হবে, রাষ্ট্রে শ্রেণীর নীতিও নিশ্চয়ই থাকবে। শ্রেণীর নীতির পরে পরেই কি সর্বজনীন নীতি তৈরি হচ্ছে? যদি হয় তো কেমন করে হচ্ছে? যদি হয় তো বর্তমানের পৃথিবীতে অন্তত শ্রেণীর পাশাপাশিই সর্বজনীন নীতি সম্ভব নয় কেনো? মার্ক্সবাদে এই সমাজতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বের টানেই দ্বিধার বক্তব্য প্রধান হয়ে পড়ে কারণ প্রতিটি মন্ত্রীর যদি

শ্রেণীস্বার্থের বাহন হয়এবং সমাজ পরস্পরবিরোধী শক্তির আকর হলে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, বুদ্ধি বিবেচনার ক্ষেত্র সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়, হয়তো যা সম্পূর্ণ বিলোপ পায় আর তখন একমাত্র হিংসারই পথ খোলা থাকে। শান্তির দার্শনিকরা তখন সত্যিই ব্যর্থ পরিহাস।

প্রত্যক্ষবাদ ও মার্ক্সবাদ উভয়েই মানুষকে বুদ্ধি বিবেচনার পাত্র হিসেবে ভাবা হয়েছে, তাকে প্রাণহীন যন্ত্রের মতো অজ্ঞানের হাতে, রাষ্ট্রের হাতে, দলের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অজ্ঞান ও চৈতন্যহীন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত জনতার চাপে ব্যক্তির অবস্থা তখন কাফকার 'কে'র মতো, যার বিচার চলছে অথচ যে অপরাধ বিষয়ে অবহিত নয়। কাফকা লিখেছেন—"ওদের বেরে নিতে বলা হলো রাজা হবে কি হবে তার বার্তাবহ। শিশুরা যেমন করে, ওরা সব বার্তাবহ হতে চাইলো। তাই রইলো শুধু বার্তাবহের দল যারা মিথ্যে শুধু ছুটে বেড়ায়, চীৎকার করে পরস্পরের প্রতি সেই সংবাদগুলো—কারণ রাজা তো নেই—যা অর্থহীন হয়ে গেছে। ওরা ওদের এই দীন জীবনকে খতম করে ফেলতে চায় কিন্তু সাহস পায় না যেহেতু তারা সেবা করবার শপথ নিয়েছে।"

বর্তমানের সবচেয়ে চালু শাস্ত্র সমাজতত্ত্বে মানহাইমের জবানীতে একই কথা পাচ্ছি, সেই অজ্ঞানের জয়যাত্রা। মানহাইম মনে করেন সমস্ত তত্ত্বই হলো 'আইডিওলজি' অর্থাৎ যা সামাজিক অবস্থার ফসল মাত্র। নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থার চাপেই সব তত্ত্বের জন্ম, এর বাইরে সত্যের কোনো স্থান নেই। পর্যন্তরে মানহাইম লিখতে পারেন: "The view which holds that all cultural life is an orientation towards objective values is just one more illustration of a typically modern rationalistic disregard for the basic irrational mechanisms which govern man's relation to his world···there is, then, no norm which can lay claim to formal validity···" এবং জানেন "জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব" তৈরি করলেই বুঝি সত্যতা ও সচেতনতার দায় মেটে। ওঁর মতে দুটি পথ মাত্র খোলা আছে। একটি হলো বুদ্ধির পথ। বুদ্ধিই মানুষের প্রধান অবলম্বন এবং বুদ্ধির দাবিতেই মানুষ বিশ্বরহস্যের চূড়ায় পৌঁছে, আপাতবিরোধী বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে ঐক্য খুঁজে পাচ্ছে। দ্বিতীয়টির মতে, সংসার কেবল নিরন্তর ঘটনাপ্রবাহ, এই ঘটনাপ্রবাহে

কার্যকারণের সূত্র অনুপস্থিত যেহেতু যুক্তির বিষয়ে ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত নয়। ঘটনা ঘটছে, অতীতে ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। কেনো ঘটছে, কি তার পরিণতি বা উদ্দেশ্য জানতে বাসনা হলেও জানার চেষ্টা অর্থহীন কারণ আমরা জানি জানে যুক্তির পরম্পরায়, কিন্তু ঘটনাপ্রবাহের দোহনে কোনো যুক্তির খেলা নেই। মানহাইমের দ্বিতীয় মতটিই মানেন কিন্তু ভুলে যান যে জ্ঞান যদি নিছক সমাজ ও সময়-সাপেক্ষ হয় তবে এই জ্ঞানের বোধ বা বক্তব্যটিরও অর্থাৎ মানহাইমের জ্ঞানের সমাজতত্ত্বেরও সমাজতত্ত্ব থাকবে এবং এমনি করে সমাজ-তত্ত্বের পিছুহটা চলবে নিরবধি কাল ধরে, আমরা কোনো একটি বক্তব্যের স্থিরতাতেও এসে দাঁড়াতে পারবো না। মানহাইম এই বিপদমুক্তির পথ খোঁজেন এই বলে ব্যক্তি যদিও অন্ধতার দোষী তবু পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের অন্ধতা ভেঙে হয়তো একটা যৌক্তিক সমন্বয় অবস্থা তৈরি করা যায়। কিন্তু তিনি ভুলে যান তার জন্যে শুরুতেই একটি মানদণ্ডের প্রয়োজন যা ব্যক্তির অন্ধতা ও অজ্ঞানের সৃষ্টি হতে পারে না।

মনস্তত্ত্বের অজ্ঞানের কথা আজ বিশ্ববিশ্রুত। সুতরাং মনস্তত্ত্ব ছেড়ে আমরা দর্শনের রাজ্যে আসি। প্রত্যক্ষবাদ আবিষ্কারেই বিজ্ঞানের বাইরে সমস্ত জ্ঞানের সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়েছে। আর নির্জ্ঞানের প্রসারে অস্তিত্ববাদ প্রত্যক্ষবাদকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। যুক্তির পথে, চিন্তার নেতৃত্বে সত্যজ্ঞানের সম্ভাবনা অস্তিত্ববাদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। একক মানুষের নিয়ে অস্তিত্ববাদের সূত্রপাত। প্রতিটি মানুষই একক ও নিঃসঙ্গ। তাকে গড়ে নিতে হবে যেমন নিজের জগৎ, তেমনি নিজেকে। কোনো কিছুই তার চারপাশে স্থির নেই, নির্দিষ্ট নেই। তার যেমন নেই পশ্চাৎ, তেমনি নেই নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ। পূর্ববর্তী দর্শনে জ্ঞানের অনন্ত সম্ভাবনা ও মানুষের বিপুল ভবিষ্যতের কল্পনা করা হয়েছিলো কিন্তু অস্তিত্ববাদের ঘোষণায় সেই মানুষ অর্থহীনভাবে শুধুই যুক্তির হাত ধরে চলে, মানুষ শুধুই তার চরিত্রের নির্দিষ্ট স্বাভাবিকতায় পরিণতি পায়। অথচ বিশ্বে কোনো কিছুই যুক্তির নিয়মে চলে না, পুরোনো প্রতিটি প্রত্যয় ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে। মার্সি লিখছেন: "মানুষ আর কিছুই নয় সে নিজেকে যা বানায় তা ছাড়া। এটাই হলো অস্তিত্ববাদের প্রথম সূত্র।" লিখছেন: "For we mean to say that man primarily exists—that man is, before all else, something which propels itself towards a future and is aware that it is

doing so···Before the projection of the self nothing exists; not even in the heaven of intelligence: man will only attain existence when he is what he purposes to be. Not, however, what he may wish to be. For what we usually understand by wishing or willing is a conscious decision taken—much more often than not—after we have made ourselves what we are." সার্ত্র অবশ্য ব্যাখ্যা করেন না কেনো একমাত্র মানুষই নিজেকে সৃষ্টি করবে আর: সৃষ্টি করবে কি ভাবে, কোন্ লক্ষ্যে। তিনি লিখেছেন যে সত্তার আগে অস্তিত্ব স্বীকৃত হলে মানুষ নিজের জন্যে নিজেই দায়ী। কিন্তু এই দায়িত্বের সাধারণ বক্তব্যের পর প্রশ্ন উঠবে দায়িত্ব নিশ্চয়ই নিজেকে গড়বার কিন্তু মানুষ নিজেকে গড়বার প্রেরণা পাবে কেনো? প্রেরণা ছাড়া তার দায়িত্বের অর্থই বা কি? সার্ত্র আরো জানান যে নিজেকে গড়বার সূত্রেই বাকি "নিজেকে বাছাই করে।" "যদি বলি মানুষ নিজেকে বাছাই করে তবে নিশ্চয়ই বোঝাতে চাই যে আমাদের প্রত্যেককেই নিজেকে বাছাই করতে হবে। এ দ্বারা আরো বোঝাতে চাই, যে নিজের জন্যে বাছাই করে সে সবার জন্যেই বাছাই করে।" মানুষ যদি সম্পূর্ণই নিজে নিজেকে বাছাই করে তবে অন্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবার কথা নয় এবং প্রসঙ্গত সার্ত্র তা মানেনও না। অথচ তিনি বিনা দ্বিধায় বলতে পারেন যে নিজেকে বাছাই করে অন্যের জন্যেও বাছাই করা হচ্ছে। "এটা ওটার অর্থ বাছাই করা হলো যা বাছাই করা হয়েছে তার মূল্যকেই সমর্থন করা, কারণ আমরা কখনোই খারাপ বাছাই করতে পারিনে।" কেনো যে পারিনে সার্ত্র তা জানান না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো অগ্রপশ্চাৎহীন মানুষ একক বিশ্বে শুধু নিজেতেই বিশ্বাস রেখে এগোতে পারে এবং নিজেকে গড়ে নিতে পারে। অথচ তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি আসবে কোথা থেকে ও কার কাছে সার্ত্র ব্যাখ্যা করেন না। এমন একটা বিশ্বে সে এসে পড়েছে যা সে নিজে গড়েনি, এমন কোনো স্বীকৃত নীতি নেই যা সে সমর্থন করে এগোতে পারে। তাই তার জীবন নিঃসন্দেহেই শুধু 'এন্‌গ্‌ষ্ট' ও 'সোর্গ' অর্থাৎ 'দুশ্চিন্তা' ও 'ভয়'। তাই হাইডেগ্গেরের কাছে "ভয় থেকে মুক্তি একমাত্র সেই মানুষটিই পেতে পারে যে মরণের কাছে নিজেকে মেলে ধরে দৃঢ়চিত্তে শূন্যতার মুখোমুখি দাঁড়ায় আত্মবিলুপ্তির অপেক্ষায়।"

'লা নসি'র নায়ক হঠাৎ আকস্মিক এক মুহূর্তে পার্কে বসে তার অস্তিত্বের আস্বাদ পেয়েছিলো। সেই মুহূর্তের আগে সে জানতো না অস্তিত্বের কি অর্থ : "আমি ছিলুম অন্য সবার মতো, ওই লোকগুলোর মতো যারা বসন্তের দিনে সমুদ্রের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের মতোই আমি বলেছি 'সমুদ্রটা সুন্দর, ওই উঁচু বালি বেলা সমুদ্রে মেশে সেই তার হৃদ পাখা, ওই যে একটা সী-গাল উড়লো'। কিন্তু অনুভব করিনি যে ওদের কেউ আছে, সী-গাল সত্যিই একটা অস্তিত্ববান সী-গাল। কার্যত অস্তিত্ব নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। আমাদের চারপাশে আছে, আছে আমাদের ভেতরেও, আমরাই তা, তার কথা না-বলে ঘুটো কথাও আওড়াতে পারিনে তবু শেষ পর্যন্ত তা আমাদের নাগালের বাইরে। যখন কল্পনা করেছি আমি তার বিষয় ভাবছি, তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে যে আমি মোটেই ভাবছিলুম না, আমার মন ছিলো ফাঁকা অথবা হয়তো আমার মনে একটি মাত্র কথা ছিলো, সেই কথাটি 'সত্তা'। ...নিজেকে বললাম সমুদ্র সবুজ বস্তুর মধ্যে পড়ে অথবা সবুজ সমুদ্রের একটা গুণ। যখন এর দিকে তাকিয়েছি তখনো আমি চিন্তার একশো মাইলের মধ্যে নেই যে তারা অস্তিত্ববান; মঞ্চের দৃশ্যের মতো মনে হচ্ছিলো তাদের। ...আগে যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো অস্তিত্ব কী, আমি বিশ্বাসের সঙ্গেই জবাব দিতুম, ওটা কিছুই নয়, বাইরের বস্তুতে চাপানো একটা শূন্য আকার মাত্র যাতে বস্তুর চরিত্রে একটুও পাল্টায় না। আর এখন, এক মুহূর্তেই, সে উপস্থিত, দিনের মতো স্বচ্ছ। অস্তিত্ব আকস্মিকভাবে আবরণমুক্ত হয়েছে।" বোঝাই যাচ্ছে অস্তিত্ব চিন্তার বিষয় নয়, জানে তার পরিচয় মেলে না। যায় বস্তুপুঞ্জের ওপর চাপানো অর্থহীন একটা আকারের মতো সে থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। তার স্বরূপ প্রকাশিত হয় অন্তর্দৃষ্টিতে, মনের গভীর থেকে। প্রায় যেনো ক্রমবীয় নির্জ্ঞান হঠাৎ মনের আগল ঠেলে এসে পৌঁছেছে সচেতনতায়। আর তাই যুক্তিবিরোধী বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে অস্তিত্ববাদের শব্দরূপে। চিন্তার নয়, সত্তার আভাস মেলে যেহেতু আবেগে, আকস্মিক দীপ্তির ঝোলুষে যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তিকে প্রস্তুত থাকতে হয় কর্মে, নিজেকে গড়ে নেবার চেষ্টায়। এই গড়ে নেওয়া বা নিজেকে জানানো প্রায় ঘরে ঘুরন্ত মানুষের চলার মতো। 'এক্স' ও 'দিসটেন্স' অর্থাৎ 'কাজে নামা'।

সার্ত্রর সমগ্র রচনাবলীতে এই চিন্তাহীন 'কাজে নামা'র পরিচয় ছড়িয়ে আছে। কাজের মধ্যেই সার্ত্র ঘোষণা করেন 'পুরো মানুষ'টিকে পাওয়া যাবে।

এই কাজের চরিত্রটি কেমন ? সার্ত্র চমৎকার ব্যাখ্যা করে দেখান যে আমাদের পূর্ববর্তী শিল্পী, যাদের কাছে আমরা পেয়েছি আমাদের সংস্কৃতি, বোধ, বিধি, নিষেধ, আমাদের প্রবাদ, আমাদের বাসস্থান, তাঁরা ছিলেন নাভিশীতোষ্ণ অঞ্চলের লোক। অর্থাৎ নিরুপদ্রব। তাঁরা 'সমগ্র মানুষ'টির খোঁজে জানেন এমন সমসাময়িক অবস্থা যা অত্যাচারে, দুঃসহতায়, চাপে পাত্রপাত্রীদের নিষ্পেষিত করবে। ঘাম ও রক্তে সর্বাঙ্গ ভাসবে মানুষদের আর সেই অসহায়তার জ্ঞানের ও সচেতনতার সাহায্য ছাড়াই হঠাৎ জানতে পারবে নিজেদের অস্তিত্বের কথা। কিন্তু সার্ত্র জানেন এই রক্ত ও ঘামের, ইতিহাসের চাপের কাহিনীতে মানুষের দৃষ্টি ঢেকে যায়। সমসাময়িক কালের চরিত্র নজরে আসেনা কারণ সময়ের কেন্দ্রে অন্য মানুষ নিজের বাইরে তাকাতে পারেনা। আর তার চারপাশেই তো কেবল চাপের কথা যেহেতু কৃষ্ণবাদ আবহাওয়ায় মানুষের মনুষ্যত্ব না-হোক সার্ত্র-কথিত সামগ্রিকতার বিকাশ। অবশ্য সার্ত্র জানতেও চাননা কারণ তিনি বলেন সবটাই 'অবোধ্য', শুধু মারাত্মক চাপটা অনুভব করলেই চলবে। সার্ত্রর নায়করা তাই এমন ধরণের লোক যাদের জীবনে সব কিছুই ঘটে, তারা ঘটায়না। তারা নিষ্ক্রিয় সব মানুষ, উইলহাম দুইলের মতে, 'সিসিফিস জাতীয়'। শুধু কি সার্ত্রতেই ? এলবেয়ের কামুর নায়ক মিরশ একটি অপোগণ্ড ভ্যাবলা মাত্র—তার ভাবনা-চিন্তার প্রশ্ন নেই।

সার্ত্রর মতো আন্দ্রে মাল্রোরও একই সমস্যা। মাল্রোর বিশ্বেও মানবিকতার প্রবেশ কর্মে এবং সেই কর্ম হত্যায় সংঘটিত হয়। মাল্রো তাই লেখেন : "In imposing his personality upon the external world man finds the only outlet which remains to him, his one and only chance of escaping—imprfectly—from Nothingness (an neant)." আসলে অপরটা মানবিকই নয়। মানবিকতা নিশ্চয়ই প্রকাশ পায় কর্মে কিন্তু সেই কর্ম যুক্তি ও সচেতনতার হাত ধরে নিজের স্বভাবকে প্রকাশ করবার চেষ্টায়। সার্ত্ররা যেহেতু অপরকে শূন্যের নামান্তর মনে করেনএবং পূর্বাপর সমস্ত অতীতকে অস্বীকার করেন সুতরাং তাদের যুক্তি পলায়নের পথেই আসে এবং সেই পলায়ন কখনো হত্যার রূপে, কখনো নিরঙ্কুশ চাপের রূপে। মাল্রোর ভাষাতেই তাই বাঁচার তাৎপর্য হলো "to lead, to be he who decides, to coerce. That is to live." সার্ত্র

অবশ্য এই পলায়নের মর্মে তাঁরা শিল্পীর স্বাধীনতা আসে রাজনীতির ত্যাগ-তাগিদে। রাজনীতির পরিবর্তন ছাড়া শিল্পীর অস্তিত্বের কোনো জগৎ নেই। আর বর্তমানের রাজনীতিতে আছে অবিসম্বাদী দুইপক্ষ: বুর্জোয়া ও সাম্যবাদী। সার্ত্রকে চান শিল্পীকে পক্ষ বাছাই করে নিতে হবে এদের মধ্যে যদিও তিনি নিজে বুর্জোয়াদের ঘেন্নাকরেন তবু ভাবতে পারেন না যে সাম্যবাদী দলে যোগ দেবেন। অথচ ওঁর অভিযোগের অন্ত নেই যে সাম্যবাদীরা ওঁর পাঠক অর্থাৎ প্রহিত শ্রেণীকে কেড়ে নিয়েছে। শিল্পীদের যে পক্ষ বাছাই করে নিতেই হবে, রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ছাড়া শিল্পীর মুক্তি নেই, এই তত্ত্বে সার্ত্র সাম্যবাদীদের কাছে এগিয়ে আসেন (যদিও তিনি লেখেন 'For Communists a writer is suspect on principle') এবং অস্তিত্ববাদের অন্যতম শিল্পীর স্বাধীনতাকে তুলে দেন সর্বত্রাণী দল ও দলসমর্থিত রাষ্ট্রের হাতে।

মালরোর, 'মানুষের ভাগ্য' উপন্যাসটিতে একটি আশ্চর্য কথোপকথন আছে। এই কথোপকথনে সূক্ষ্মতার বিকট দাঁত অন্ধকারেও ঝলসে ওঠে। জানতে পারা যায় জীবনের স্তরে স্তরে ঘুরোপে কেমন সন্দেহ, হতাশা ও অজ্ঞানের অন্ধকার জমেছে।

"সিসরকে সে ইতিমধ্যেই খুন করেছে কিনা জিজ্ঞেস করে নেতিবাচক উত্তর পাবার পর চেনের হঠাৎ মনে হলো যে 'সিসরের মধ্যে কিছু একটার অভাব আছে'।

সিসর জিজ্ঞেস করলো:

'প্রথম যখন কোনো মেয়ের সঙ্গে শুয়েছিলে—পরে কি ভেবেছো?'

'গর্ব।'

'মানুষ হবার জন্যে?'

'মেয়ে মানুষ না-হবার জন্যে', চেন জবাব দিলো···

'মেয়েদের কথা তুলে ভালোই করেছো। যে লোকটিকে খুন করা হয়েছে তার জন্যে হয়তো একটা বিবাগ থাকে। তবে অন্যদের তুলায় চাইতে তাকে কমই ঘৃণা করা হয়।'

'তুমি বলছো তাদের চাইতে যারা খুন করেনি?'

'যারা খুন করেনি তাদের চাইতে—কুকুরদের চাইতে।'

এই হলো বর্তমান য়ুরোপের অবস্থা। আমরা যারা এখনো কর্মের পথে পলায়নের জন্য খুন করিনি, যারা এখনো ইতিহাসবোধের প্রয়োজনে নিষ্পেষণের যুক্তি, রক্তস্নানে ধরিত্রীকে লিপ্ত হবার বাসনা প্রকাশ করিনি তারা নিছক 'কুমার' অর্থাৎ জীবনের পূর্বাপর অভিজ্ঞতাহীন নিরেট বোকা ছেলে। জীবনের কোনো তাৎপর্যই নেই আমাদের সত্তায়, অস্তিত্বের অর্থ এখনো ফোটেনি আমাদের হৃদয়ে, আমরা তাই ঘৃণার পাত্র। এ-কথা নিশ্চয়ই সত্য নয় যে য়ুরোপের প্রতিটি মানুষ এমনি করে ভাবে বা য়ুরোপের সবাই সচেতনতা ও যুক্তির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে, তবু এটাই বর্তমান য়ুরোপের জীবনচর্চার প্রধান দিক। যন্ত্রের ও যন্ত্রকৌশলের ক্রমিক অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানুষের নৈতিক চেতনার উন্নয়ন হয়নি, যন্ত্রোবড়ো কারাক থেকে গেছে। এই ফাঁকটাই বর্তমানে বিরাট দুর্ব্যাদান করে মানুষের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে আর ন্যুরেমবার্গের উত্তরসাধকরা ক্ষমতার লোভে, স্বার্থের তাড়নায় রাষ্ট্রকে তাদের হাতিয়ার করে বিশ্ব অভিযানে বেরিয়েছে। ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ রাখবার জন্যে মানুষের লোভ ও মোহ এমন একটা সংগঠন চালু রাখতে চাচ্ছে যার চাপে বাকি সবে পিষে পিণ্ডে পরিণত হবে, তার অধিকারের ঘর মুৎকারেই উড়িয়ে দেওয়া যাবে। নিষ্পেষণের আগে তার বুদ্ধি বিবেচনা কেড়ে নেওয়া দরকার যেহেতু বুদ্ধি বিবেচনাহীন মানুষ অন্ধতার দুর্বল পুতুল মাত্র। তাই য়ুরোপ-জোড়া অজ্ঞানের অভিযান। মানুষের মহত্ত্বের কথা না শুনিয়ে তাকে নিছক অস্তিত্বের অনুকূলে আটকে রাখবার চেষ্টায় বার্লিনের শিল্পীরা সর্বক্ষণ ব্যস্ত। শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রী করে য়ুরোপ এখন এমন এক নিঃসীম গহ্বরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যে হয় তাকে অতল আঁধারে নিমজ্জিত হতে হবে নয়তো আত্ম অধিকারের বাসনায় জ্ঞান, যুক্তি ও বিশ্বাসের সচেতন লক্ষ্যে জীবনের সমস্ত কর্ম ও প্রেরণাকে চালিত করতে হবে। কোনো দল, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর হাতে অধিকারের প্রশ্ন তুলে না-দিয়ে ব্যক্তির নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে সমগ্র মানব সত্তাতার গভীর আলোয়। শ্রেয় ও প্রেয়র দ্বন্দ্বে সজ্ঞানে বুঝে শ্রেয়কেই আশ্রয় করতে হবে।. মানুষের সামনে সমস্ত সম্ভাবনার পথই খোলা, ইচ্ছায় সে হতে পারে দেব বা দানব। য়ুরোপ কি হবে তার ওপর অনেক মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

ডব্লিউ. বি. ইয়েট্‌স : জীবনের কবি

ডেভিড ম্যাক্‌কাচিঅন

> God save me from the thoughts men think
> In the mind alone. —Yeats

আধুনিক কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে টি. এস. এলিঅটের নাম জড়িয়ে গেছে। আমাদের প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং কিছু লোকের মনে ইয়েট্‌স এখনো পর্যন্ত উনিশ শতকের কবি। সম্প্রতি ইতালির ভাষা থেকে অনুবাদ দুটি কাব্য সংকলন আমার নজরে পড়লো। দুটি গ্রন্থেই ইয়েট্‌স-এর সোতার দিকের প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিতা স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নাম সংযুক্ত এবং এমন ধারণা অনেকেরই আছে যে যিনি গীতাঞ্জলির ভূমিকা লিখেছেন তিনি নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের মতই কবিতা লিখবেন। অন্যদিকে এলিঅট তাঁর একান্ত পাঠকদের মনে চমক সৃষ্টি করলেন সেই সন্ধ্যার বর্ণনায় যে সন্ধ্যা 'spread out against the sky like a patient etherised upon a table'। কিন্তু ইয়েট্‌স তাঁর সমস্ত জীবন কবিতায় হৃদয়ের দিক রক্ষা করেছেন ও গভীর বিশ্বাস। এবং Oxford Book of Modern Verse-এর ভূমিকায় তিনি কি হপকিন্‌সকে নিন্দা ও এলিঅটকে তাচ্ছিল্য করেন নি?

ইয়েট্‌স উনিশ ও বিশ শতক জুড়ে কাব্য ইতিহাসে বিস্তৃত হয়ে রয়েছেন। ১৮৮৯-এ যখন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তখন অলিঅটের বয়স এক বছর। টেনিসন ও সেটার তখনো জীবিত; তখনো বার্নার্ড শ ও অস্কার ওয়াইল্ড্‌ তত্তটা বিখ্যাত ন'ন। কিন্তু যখন ১৯৩৯-এ তাঁর শেষ কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হলো তখন The Waste Land-এর বয়স কুড়ির কাছাকাছি। 'সব যুদ্ধ শেষ করার যুদ্ধ' হয়েছে ও আর একটি নতুন যুদ্ধের মুখ বেশি দেরি নেই। সেই বিপর্যয়ের মধ্যেও ইয়েট্‌স তাঁর আপন পথে চলেছিলেন। তিনি শুরু করেছিলেন স্বপ্ন ও বিষাদের কবি হয়ে, আর শেষ করলেন আধুনিকদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী হিসেবে।

ইয়েট্‌স-এর কাব্যের বিবর্তনধারা অনন্য: বয়স যতই বেড়েছে, তাঁর কবিতা যেন ততই তরুণতর হয়ে উঠেছে। সাধারণত আমরা মনে করি যে

কবিমাত্রেই প্রথম জীবনে তারুণ্যের উল্লাসের মধ্যে কবিতা আরম্ভ করেন এবং ক্রমশ তাঁর মধ্যে আসে বিস্তৃতা—যেমন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, যাঁর বিস্তৃতা কবিতাকে এতটা আচ্ছন্ন করেছে যে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃতাটুকুই রয়েছে অবশিষ্ট। অথবা গোটে, শুরু করেছিলেন *Sturm und Drang*-এ এবং শেষ করলেন ঐশ্বরিক নির্লিপ্তিতে। ইয়েট্‌স কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত : জীবনকে অস্বীকার করে তাঁর আরম্ভ, আর শেষ হচ্ছে জীবনকে চূড়ান্তভাবে স্বীকার করে ও তার কাছে উত্তরোত্তর হারিয়ে।

এই হচ্ছেন গোড়ার দিকের ইয়েট্‌স :

Far off, most secret, and inviolate Rose,
Enfold me in my hour of hours; where those
Who sought thee in the Holy Sepulchre,
Or in the wine-vat, dwell beyond the stir
And tumult of defeated dreams; and deep
Among pale eyelids, heavy with the sleep
Men have named beauty.

ছন্দ এখানে আত্ত নিখুঁত করে তোলার চেষ্টায় ভারাক্রান্ত, নৈরাশ্যে বিবশ। ক্রিশ্চিনা রসেটির কবিতা মনে আসে :

O earth, lie heavily upon her eyes;
Seal her sweet eyes weary of watching, Earth;
Lie close around her; leave no room for mirth
With its harsh laughter; nor for sound of sighs.
She hath no questions, she hath no replies,
Hushed in and curtained with a blessed dearth
Of all that irked her from the hour of birth;
With stillness that is almost Paradise.

এই ছিলেন রাইমার্স ক্লাবের ইয়েট্‌স, যে ক্লাবের সভ্যদের সম্পর্কেই হারবার্ট রীড বলেছিলেন, তাঁদের আর যাই থাক 'হক মাংস' ছিল না। তিনি ছিলেন উনিশ শতকের পৃথিবীর নিষ্ঠুরতায় বিপর্যস্ত 'ক্লান্ত শিশুদিনের' একজন। তাঁর প্রথম দিকের কবিতা দীর্ঘশ্বাস ও মৃদু আক্ষেপে ভরা, তার মধ্যে সকল কিছুর দ্রুত অপসৃতির জন্যে হাহাকার এবং ক্লান্তি ও নৈরাশ্যে ভরা বিবর্ণ মন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে যে চূড়ান্ত অবক্ষয়ের রূপ ফুটে উঠলো তার সূত্রপাত হয়েছিল ইংরেজ রোমান্টিকদের আগেই। বিষয়

ভাবুকতা দিয়ে গড়া তথাকথিত 'graveyard school'-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রে'র Elegy, ইয়ং-এর Night Thoughts এবং অবশ্যই, ম্যাকফারসনের দুর্বোধ্য 'ওসিয়ান' কাব্যমালা। সমগ্র ইউরোপে রোমান্টিক হতাশা ছড়িয়েছিল গ্যেটের যে ভেটের, সে ছিল 'ওসিয়ান'-এর অত্যন্ত ভক্ত :

> কী আশ্চর্য পৃথিবী...। মৃত প্রান্তরের ওপর দিয়ে বেড়াবো—ঘোড়া হাওয়া কাশের মধ্যে এসে যাবে. তারাভরা কুয়াশার মধ্যে দেখা যাবে জ্যোৎস্নার পূর্ণমুকুলনের প্রেতাত্মা আলোকিত হয়ে উঠতে থাকে। আমরা পাহাড়ের ওপর থেকে ঝিরে নেমে আসা—যেখানে আমরা বর্ণার পর্জনের মধ্যে শোনা যায় তাহাতির কত আত্মার আর্তনাদ এবং কত অসহা দুরাত্মার করুণ বিলাপ, যে সব দুরাত্মা তাদের নিজস্বতার গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যুর শোকে মদ-আচ্ছাদিত ও প্রচুর ঘাসে ভরা পাথর চাতালের পাশে নিজেরাই রহস্যের কোলে চলে পড়েছে।*

সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা ও রোমান্টিক বিষাদের সুর, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি পরাজিত মনোভাবই উনিশ শতকে প্রধান হয়ে উঠেছিল। কোল ব্রেক বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রাথমিক উদ্দীপনা হয়তো শেলীর আত্ম-করুণা ও টেনিসনের 'অন্ধ অসহ অন্ধ'-র কাছে চাপা পড়েছে। তারপর থেকে কত কবি 'সহজ মৃত্যুর প্রতি অর্ধেক প্রেমে' ও 'শতাব্দীর অসুস্থতায়' আত্মহারা বিভিন্ন হতাশায় শিকার হলেন। চ্যাটারটন হ'য়ে উঠলেন তাঁদের প্রতীক—যে 'আত্মাশ্চর্য বালক' এক হিংসেবী হিতবাদী সমাজের তাড়নায় আত্মহত্যায় বাধ্য হয়েছিল।

বিগত যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের স্পষ্ট পার্থক্য যতটা আদিকের পরিবর্তনের ('ইমেজিস্‌ম' কিংবা চেতনা প্রবাহ রীতি) ফল, তার চেয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীলতার পরিবর্তনের—সে পার্থক্য জীবন-অস্বীকৃতি থেকে জীবন-স্বীকৃতিতে। এর প্রধান প্রবক্তা হচ্ছেন নীৎশে, যিনি সক্রেটিস ও খ্রীষ্টের পরবর্তী সমগ্র যুক্তিবাদী ও খ্রীষ্টান ঐতিহ্যকে বর্জন করেছিলেন। যে সমাজ কেবল আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের পুঁথি আওড়ায় অথচ নিজে বস্তুগত লাভের লোভে দৌড়ায়, যে সমাজ মানুষের মধ্যে সৌভ্রাত্রের বাণী বিতরণ করে কিন্তু নিজে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের নিগড়ে বন্দী, সেই সমাজের অন্তঃসারশূন্য মুখোসকে তিনি একদিকে খুলে দিলেন। এবং অন্যদিকে তুলে ধরলেন প্রাণশক্তি বিস্ফোরকারী সেই আত্মনিগ্রহকে যা খ্রীষ্টীয়

* Goethe : *Die Leiden des Jungen Werthers.*

যুক্তিনির্ভর সাধুতির অবদান। তিনিই প্রথম দিওনিউসকে খ্রীষ্টের প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করালেন ('ক্রাস' মনোবৃত্তি), দুর্বার প্রাণশক্তির মধ্যে প্রত্যাবর্তনের কথা তিনিই প্রচার করলেন যদিও তার ট্র্যাজিক তাৎপর্য তাঁর অজানা ছিল না। তিনি ঠিক হিটলারী অভ্যুত্থানের কথা বলেননি, যে হিটলার প্রাচীন জর্মী বেপরোয়াদের প্রবঞ্চনায় মেতেছিলেন। কিন্তু চিন্তিত হয়েছিলেন সাধারণ শক্তিবিমুখতা ও মহত্ত্ববিরোধিতা দেখে। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে প্রাণধারণের আনন্দ আত্মবিচারের ধৈর্যের চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং মানুষের উচিত ইতিহাসের বাইরে বাঁচতে শেখা :

> যে মানুষ সকল অতীতকে ছুঁড়ে ফেলে শুধু বর্তমান মুহূর্তকে আঁকড়ে থাকে বাঁচতে না পারে, তার ও তাতা কাটির মধ্যে দেওয়ার মত মুহূর্তেও স্থির দাঁড়াতে না পারে, সে মানুষ কখনো জানবে না সুখ কী—আরও দুঃখের বিষয় : সে এমন কিছুই করতে পারবে না যা অন্যকে সুখী করতে পারে।*

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে গ্যেটে-স্বেই সত্যিকার আধুনিক কবি বলতে হয়, এলিয়টকে নয়—যে এলিয়ট নৈরাশ্যবাদ, সদা অপ্রসন্ন বাঙ্গ ও বিগত শতাব্দী-শেষের 'লব্ধ গৃহীত বেদনা' নিয়েই চলেছেন এবং স্বভাবতই আশ্রয় নিয়েছেন গীর্জার মধ্যে। একই কারণে ডি. এইচ. লরেন্স যেমন করলের চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক। করলের গুরু ছিলেন ডস্টয়েভস্কি, যাঁর সম্পর্কে লরেন্স বলেছিলেন যে তিনি 'জীবন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন যেন তা এক কুষ্ঠরোগ।'

উনিশ শতকী রোমান্টিকরা শুধু সমাজবিচ্ছিন্নই ছিলেন না, জীবন থেকেই ছিলেন বিচ্যুত। তাঁরা ছিলেন অতি হতভাগ্য ও পলায়নবাদী এবং বিশ্ববিমুখ, কারণ তাঁরা এমন এক আদর্শের প্রেমে পড়েছিলেন যা এ জগতে কোনদিনই মিলবে না। আত্ম-প্রতারণা বা মোহমুক্তি—এর একটাকে তাঁদের বেছে নিতে হয়েছিল : হয় হিকর ল্যুপোর মত স্বভাবভণ্ড হতে হয়েছিল, যিনি প্রেম ও রাজনীতিতে উচ্চ আদর্শবাদের প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও আসলে নিজের স্ত্রীকে প্রবঞ্চনা ও রাজনীতিতে ক্ষমতার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছেন —অথবা তাঁদের জীবন ও আদর্শের মৃদুতার হাল ছেড়ে দিয়ে ডুবতে হয়েছিল সত্তার হতাশায় (বদলেয়ার থেকে কাফকা পর্যন্ত যন্ত্রণার ঐতিহ্য)। প্রথম

* Nietzsche : *Vom Nutzen und Nachteil der Historie.*

রোমান্টিকদের জাঁকালো ভঙ্গি—গভীর প্রেম, চরম বিষাদ, বীরত্ব, আত্মত্যাগ ইত্যাদি—বেশিক্ষণ তৃপ্ত রাখতে পারলো না, তার স্পষ্ট কারণ হচ্ছে এই যে তা ছিল একান্তই অলীক। এই সব বিত্তহ-চিত্ত নায়িকাদের ও মহানুভব বন্ধুদের চিরপ্রথাগী প্রেম ও আত্মত্যাগ উপার্জনের উপর কে বিশ্বাস রাখতে পারে? ভিক্টর হুগোর Hernani ও শীলারের Robbers হচ্ছে অপরিণত অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী যাদের নায়ক আসলে দুরুদ্যমতি বালকেরা। বাস্তব অভিজ্ঞতার সামনে গিয়ে, স্বপ্নবিলাসকে ত্যাগ করার বয়সে, রোমান্টিকরা জগৎ থেকেই আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন: ভলপার কাছে ভগবানের গুরুতার পাঠ নিয়ে তাঁরা বিরূপ বিশ্বে একমাত্র নিজেদেরই মহৎ মনে করতে লাগলেন। যদি কখন সোভালিস অথবা হোল্ডারলিন বা শেলী কেমন এক সত্য ও সুখের অপ্রাপনীয় স্বপ্নে বিভোর, সেই স্বর্গে সকল প্রেমিকরা পুনর্মিলিত, অথবা এক স্বর্গময় গ্রীস যা কখনো ছিল না কিংবা নাইটিঙ্গেল যা স্কাইলার্ক 'বিহঙ্গ ছিলে না কভু'র কল্পনা। তীব্র আকুলতায় তারা এই সব কবিতা এতই ভগবিদারক যে সমস্ত প্রাণশক্তিকে নষ্ট করে দিতে চায়। কবি তাঁর চারপাশের জগৎকে ভুলে নিজের ব্যক্তিগত নৈরাশ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে থাকেন, তিনি নিজের মধ্যেই সরে আসেন অথবা স্বপ্নলোকের কাছে: তিনি নিজের সংবোধির চর্চাতে ব্যাপৃত থাকেন। নিজের শিল্পকর্মে সেই জগৎই তিনি সৃষ্টি করেন যা জীবন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এইভাবেই জন্ম নেয় বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদ এবং তা সকল বাস্তব কর্মকাণ্ডকে ঘৃণাভরে অস্বীকার করে: 'জীবনদাত্রেয়? আমাদের ভৃত্যরা আমাদের হয়ে সে কাজটা করবে।'* যখন জীবনের চেয়ে শিল্পকে বেশি মূল্য দেওয়া হয় তখনই ঘটে অদ্ভুত বিরোধ। তথাপি রোমান্টিককে জীবন ও শিল্পের একটাকে বেছে নিতে হয়, কারণ বাঁচতে হলে তাঁকে নিজের প্রেরণাগত আদর্শের সঙ্গে আপোস করতে হয়: শিল্পকে হয় তাঁর বর্জন করতে হবে, কিংবা জীবন ও শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে, অথবা নিজেকে করতে হবে বঞ্চনা।

এই দ্বন্দ্বেরই সম্মুখীন হয়েছিলেন ইয়েট্‌স বিশ শতকের সোভার দিকে। দ্বিতবাদী বিশ্বের বিরুদ্ধে মামুলী বিদ্রোহ করেই তাঁর আরম্ভ: সেই ডিক্টোরিয় ইংলণ্ড—সেই হাক্সলি, ঈস্তাল, ক্যারোলাস-দ্যুরিএল, বাডিএন-লেপাজ (সেই সব নাম যাঁরা আত্মজীবনীর মধ্যে বার বার ঘৃণার সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছেন)।

* Villiers de l' Isle-Adam : Axël

প্রতীকবাদীদের সঙ্গে নিজের মিল দেখতে পেয়ে তিনি এক ভাবাদ্ রোমান্টো-পন্থী হয়ে উঠেছিলেন, তাই অনুসরণ করলেন 'সুন্দর—চোখের জলের কুয়াশায় ভাসা ছায়া'কে। তাঁর কবিতা 'ছায়া'র শেষনে ছুটলেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বাস্তব কায়ার রূপকে ধরতে চাইলেন : নারীর সৌন্দর্যের যে চরম আদর্শ তাঁর কল্পনায় ছিল তা রূপ নিল মড্ গোন-এর মধ্যে. স্বাধীন আত্মার্পণের রূপও তিনি দেখতে চাইলেন যাকে কেন্দ্র করে এক সাংস্কৃতিক উজ্জীবন হবে, সকল মানুষ হবে তার অংশীদার। একের পর এক তাঁর স্বপ্ন ভাঙলো। স্বাধীনতা আন্দোলন অবশ্য বাগাড়ম্বরে ও বলীয় আর্থপরতাতে পরিণত হলো। পার্নেল এক হীন ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়লেন। চরমপন্থীরা তাঁর সঙ্গ ও'লিয়ারির নরমপন্থাকে সবলে একপাশে সরিয়ে দিল. এমন কি মড্ গোনকে বিয়ে করেছিল যে 'সুরাসক্ত অতি অহংকারী ভাঁড়' ম্যাকব্রাইড তাকে শুদ্ধ। ১৮৯৯-এ, ইয়েট্স লেডি গ্রেগরী ও অন্যান্য উৎসাহীদের সঙ্গে আইরিশ জাতীয় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, কিন্তু সেখানে অভিনীত নতুন নাটকগুলিকে জনসাধারণ ও পাত্রীর দল বিদ্রূপ করে বসিয়ে দিল—তাদের অভিযোগ অদ্ভুত, যেমন, সিঙ্গের Playboy-এ কোন আপত্তিকর শব্দ। এই ধরণের সব অভিজ্ঞতা তাঁর জীবন ও কবিতাকে হয়তো খানিকটা আরও বিক্ষিপ্ত করে রাখতো। হয়তো তিনি অতীন্দ্রিয়বাদ ও রহস্যবাদের পাঠে আরও বেশি করে মনোযোগ দিতেন ও তাঁর বন্ধু আর্থ রাসেলের মত ক্রমশই স্থিরতা ও শান্তির মধ্যে ডুবে যেতে পারতেন। আসলে ঘটলো তার উল্টো : বাস্তব জীবনের সব স্বপ্ন ভেঙে গেলে স্বপ্নের কবিতা রচনার পথও তিনি ত্যাগ করলেন।

তিনি কবি হওয়াই স্থির করেছিলেন এবং শিল্পী—দার্শনিক বা অতীন্দ্রিয়বাদী নয়। ১৯০৬-এ লিখেছিলেন, স্বর্গরাজ্যের খোঁজে আমাদের ঘুরে বেড়ানো উচিত নয় : 'আমাদের কেবল জীবনকেই কামনা করতে হবে···।' তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর শুষ্কতার স্বপ্ন আসলে ছিল বস্তুহীন, অলীক—তিনি নাম দিয়েছিলেন—'কারুকর্ম করা ল্যাভেন্ডার'। প্রায় তিন বছর পরে 'সেভ রোমান্টিক'দের নিয়ে এই স্মৃতিলিপিটি লিখেছিলেন :

> Shakespearean fish swim the sea, far away from land :
> Romantic fish swim in nets coming in to the land :
> What are all those fish that lie gasping on the strand ?

তিনি তীরে বসে খাবি খেতে নারাজ ছিলেন এবং বিশ্বজগতের সঙ্গে

আন্তরিকভাবে জড়িত শেলীয়ের, হোমর ও সুইডেনবর্গের সঙ্গে দাঁতার দিতে চেয়েছিলেন। এই বিশ্বাস শুধু কাব্যের আঙ্গিকের প্রশ্ন নয়, কারণ জীবন সম্পর্কে লিখতে হলে জীবনকে স্বীকার করতেই হবে : এ হচ্ছে সুখের সন্ধানে পরাজয় ও ক্লান্তির যুগকে বর্জন করার বাসনা। তিনি লিখেছেন তাঁর *Reveries over Childhood and Youth* (1914)-এ :

> জীবন থেকে এক একটা বছর পার হয়ে গেছে আর আমি প্রত্যেকটি হারে হারেছি. যেন নিজের মাথা কিছুকে জয় করে চলেছি। কারণ আমার যা দুঃখ তা নিজেই অন্য কারও তৈরী নয়, সে আমার নিজেরই অংশ।

যে কবি জীবনকে উদ্‌যাপন করতে চা'ন, তাঁকে ভিক্টর হুগোর কাছে ফিরে গেলে চলবে না। পৃথিবীতে স্বর্গের কল্পনা আঠারশ শতকী বিশ্বাসের অংশ, সে বিশ্বাস বলে, পৃথিবীকে বহৎ ও সত্য করে তোলা যায়। কারণ এখন আমরা জেনে গেছি যে জীবনের প্রকৃতিই হচ্ছে অপরিপূর্ণতা এবং যারা সেই জীবনকে বরণ করতে যাচ্ছে তারা কেবল এর সৌন্দর্য ও আনন্দই পাবে না, সেই সঙ্গে তাদের মিলবে নিষ্ঠুরতা, অবিচার, হিংসা এবং চরম অর্থহীনতা। তাই ইয়েট্‌স বৈপরীত্যের মধ্যেই জীবনের স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন : মন্দ ছাড়া ভালো হতে পারে না, সাদা ছাড়া কালোর অস্তিত্ব অসম্ভব। তিনি ষোড়শ শতকের মিষ্টিক জেকব বোমে ও ইংরেজ মিষ্টিক কবি উইলিয়ম ব্লেকের দিকে ফিরলেন। বোমে'র যুক্তি হচ্ছে যে পৃথক বৈশিষ্ট্য ব্যতীত কিছুরই অস্তিত্ব নেই—ঈশ্বরেরও না। ঈশ্বর যদি হ'ন প্রেম, তাহলে প্রেমের অস্তিত্বই নেই যদি না ঘৃণারও অস্তিত্ব থাকে। শুভ মন্দ একভাবে বিরাজ করতে পারে না : বোমে'র কথায়, ঈশ্বর শুধু 'ইতি' নয়, 'নেতি'ও—আলো নেই, অন্ধকার ছাড়া। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের এমন সৃষ্টি যে তার যতকিছু দ্বন্দ্ব তা ঈশ্বরের অস্তিত্বেরই প্রকাশ। এবং বিশ্বে ভালো ও মন্দের লড়াই আসলে ঈশ্বরের তাঁর নিজের সঙ্গেই লড়াই। ঈশ্বরই হচ্ছেন বিশ্ব—প্রেটোর তত্ত্ব অনুযায়ী তার বাইরের ন'ন।

এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দু মানসের বিশেষ পরিচিত, কিন্তু খ্রীস্টান বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। তাই ব্লেক তাঁর The Marriage of Heaven and Hell-এ দেহ অশুচি ও আত্মা শুচি এই ধরণের খ্রীষ্টিয় বিভাগকে আক্রমণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন জীবন হচ্ছে একটা প্রবাহ এবং 'বৈপরীত্য ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, যুক্তি ও আবেগ, প্রেম ও ঘৃণা

মানুষের অস্তিত্বের জন্যই প্রয়োজনীয়।' তাই ইয়েট্‌স তাঁর 'বৈপরীত্য'-এর তত্ত্ব রচনা করেছিলেন। সর্বত্রই তিনি দেখেছিলেন অসংখ্য পরস্পরবিরোধী বিষয় যারা একত্রে এক অখণ্ড বিশ্বতত্ত্বের রূপ পায় : দেহ-আত্মা, নিধ-জীবন, শক্তি-জ্ঞান, জীবনের প্রতি আসক্তি ও প্রেটোনিক নাস্তিকতা, অশান্তি ও শৃঙ্খলা, একক বুদ্ধি ও সামাজিক সংযোগ···। কোন মানুষই এক সঙ্গে বিপরীত বস্তুর দুই প্রান্তকে ধরতে পারে না : একই সঙ্গে সৈনিক ও চিন্তাশীল অথবা কবি ও রাজনীতিবিদ হওয়া যায় না। কিন্তু ইয়েট্‌স বিশ্বাস করেন যে মানুষের নিজের সত্তার সম্পূর্ণ বিপরীত তার সেই আদর্শ সত্তা যার সেবনে সে সমস্ত জীবন ছুটছে এবং সে নিজে অবিরাম এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। তাই সৈনিক চিন্তানায়ক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছে, চিন্তাশীল ব্যক্তি সৈনিকের প্রশংসায় মুখর এবং কবি রাজনীতিবিদ্ হওয়ার জন্যে প্রাণপণ কামনা করছে। তাই 'তিক্ত ও উগ্র' প্রাচীন পূর্বপুরুষদের প্রস্তর মূর্তির মধ্যে 'লালিত হয় সেই মানুষ যা সকল মানুষের দিনরাত্রির কামনা'। ইয়েট্‌স সর্বদাই তাঁর পরিচিত মানুষদের এই দ্বন্দ্বে (অবশ্য তার সব জটিলতা নিয়েই) ব্যাখ্যা করতেন, এবং তাঁর আত্মজীবনী এই জাতীয় অসংখ্য উদাহরণে ভরা। যেমন, উইলিয়ম মরিস : তিনি ছিলেন 'আলস্যহীন, বিপুল দৈহিক শক্তির অধিকারী ও প্রচণ্ড রাগী' যিনি 'বিষাদের ও দুর্বল ব্যক্তির নতুন রূপ সৃষ্টি করেছিলেন'। অথবা ডব্লিউ. বি. হেন্‌লি 'প্রায় অসংলগ্ন কথা বলেন···ব্যক্তিগত বিষয়ে তর্কপরায়ণ, শান্ত ও ঔদার্যের প্রতিমূর্তি, সময়ে সময়ে হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মত তাঁর প্রকৃত স্বরূপ ধরা পড়ে।' এবং তাঁর মতে ওয়াইল্ড্ ছিলেন এক হঠাৎ-বিখ্যাত ব্যক্তি যিনি 'তাঁর বাল্যে বা প্রথম যৌবনে যা কিছু জেনেছিলেন সারাজীবন তার উল্টো খেলায় মেতেছিলেন'। সুতরাং ওয়াইল্ড্, হেন্‌লি, মরিস যে তাঁদের স্বাভাবিক সত্তার বা বাস্তব পৃথিবীর বিপরীত কোন্ আদর্শ সত্তার রূপকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করতেন ইয়েট্‌স-এর বর্ণনায় তার আভাস পাচ্ছি।

কিন্তু নিজের সম্পর্কে তাঁর কী ধারণা ছিল? তিনি ঠিক নিশ্চিত হতে পারেননি : 'আমি খুব সামান্যই জানি নিজের সম্পর্কে এবং আরও কম জানি আমার বিপরীত-সত্তাকে।' নিজেকে তিনি খুব সামাজিক ও আড্ডারসিক ব্যক্তি হিসেবে ভাবতে ইচ্ছুক ছিলেন যিনি 'লোকের সঙ্গে কথা বলার জন্যে এখানে ওখানে ঘুরতেন এবং ভয়ে যা সৌভাগ্যলাভের আশায় নিজের প্রিয় বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন' মনে মনে আবার

অহংকেন্দ্রী ও নিঃসঙ্গ দার্শনিক আদর্শ কাজ করতো। কিন্তু তাঁর কবিতা এই আদর্শের প্রকাশে নিযুক্ত হয়নি, কারণ কবি জীবনকেই কামনা করেন ও গোটা জীবনকে প্রকাশ করতে চা'ন। তিনি নিশ্চয়ই শুধু উঁচু মিনারের ও অন্ধ সন্ন্যাসীর (মনীষার প্রতীক) কথাই কবিতায় লিখবেন না, সেই সঙ্গে লিখবেন তরবারি ও রেশমী পোষাকের (শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতীক) কথা। সুতরাং তাঁর কবিতা তাঁর নিজের বিপরীতধর্মী প্রকৃতিকেই রূপ দিয়েছে—পর্যায়ক্রমে বিনম্র ও উদ্ধত, কোমল ও বিদ্রূপাত্মক, উল্লসিত ও দুঃখিত, শান্ত ও দুরন্ত···। কারণ তাঁর দ্বন্দ্ব শুধুই নিজের সঙ্গে নিজের বিরোধী-সত্তার নয়, দ্বন্দ্ব ইচ্ছার সঙ্গে মনের, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিবেশের। সব মানুষই নিজের সত্তার একটা ঐক্য পৌঁছাতে চায়, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বময় আবেগে সতত্বাবিচ্ছিন্ন হতে থাকে এবং সেই দ্বন্দ্ব তার মূল ও পরিবেশের সঙ্গে। তাই ইয়েট্‌স স্থির করতে পারেন না, তিনি কবির পথ ধরবেন, না কর্মীর :

> I turn away and shut the door, and on the air
> Wonder how many times I could have proved my worth
> In something that all others understand or share. *

কিন্তু সিদ্ধান্ত হচ্ছে, কোনটাই তৃপ্তি আনতে পারে না, কারণ জীবন হচ্ছে একটানা অস্থিরতা—কোন একটি কীর্তিই আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারে না, যে কোন এক সাফল্য তার বিপরীত দিকে আমাদের টানতে থাকে : বিখ্যাত কোন কবি নিজের ফেলে আসা কর্মময় জীবনের জন্যে অনুশোচনা করেন, প্রখ্যাত বিজেতা শান্ত জীবনকে ঈর্ষা করেন ও দর্শন দিয়ে তৈরী করেন এক মঠ। তাই ইয়েট্‌স কবির জীবন বরণ করে নিলেন। সেই সিদ্ধান্তের ফলে ব্যাহত হলো 'প্রচুর স্বাভাবিক শ্রম'—কর্মের মধ্যে নষ্ট হলো যে সময় তার জন্যে দুঃখ করেছেন :

> I cry continually against my life. I have sleepless nights, thinking of the time that I must take from poetry—last night I could not sleep—and yet, perhaps, I must do all these things that I may set myself into a life of action and express not the traditional poet but that forgotten thing, the normal active man. * *

* Meditations in Time of Civil War. ** Autobiographies : Estrangement (1909).

ইয়েট্‌স বিশ্বাস করতেন যে মানুষ এখন অনেকগুলি অবতারত্বের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয় যা তার মানবিক অস্তিত্বের সমস্ত সম্ভাবনাকে সৃষ্ট করে তোলে। এই সব অবতারকে তিনি চন্দ্রকলার বিভিন্ন পর্যায়ের রূপক বর্ণনা করেছেন। সব মিলিয়ে আঠাশটি অবতার (অথবা বলা যায়: তেরটি দ্বাবিংশটি, কারণ দুটি পরিপূর্ণতার ভাবপর্ব—পূর্ণিমা ও অমাবস্যা)। এর অর্ধেকের (২—১৪) পরে ইচ্ছাশক্তির ক্রমশ প্রাধান্য ঘটে (অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ক্রমশ আত্মগত হতে থাকে)। এবং অপর অর্ধেকে (১৬—২৮) এই ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করে (অর্থাৎ ব্যক্তি ক্রমশ বস্তুমুখী হতে থাকে। রণবিজেতা ও কবি 'পরস্পর বিপরীত' আত্মমুখী ভাবপর্বে (৮—২১) বিরাজ করে, আর সাধুসন্ত ও বৈজ্ঞানিক 'প্রাথমিক' বস্তুমুখী ভাবপর্বে (২২—৭)। ইতিহাসের চক্রও এই ছকই অনুসরণ করে: তাই রেনেসাঁস হচ্ছে আত্মমুখিনতার চরম বিন্দু এবং আধুনিক বিজ্ঞান সাম্যবাদের আন্দোলন বস্তুমুখিনতার বিকাশ ঘটাচ্ছে। এই হচ্ছে সহজ কথায় *A vision*-এর 'কঠোর জ্যামিতি'। এই ব্যাখ্যা সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিকে নিয়তিবাদ ও পরবশসহিষ্ণুতার দিকে প্রভাবিত করতে থাকে,—ইয়েট্‌স এমন কি এতদূর পর্যন্ত বলতে চা'ন যে তাঁর এই ছক জগৎকে দেখার একটা পদ্ধতি এবং তা যথাযথ ভাবপর্বে জন্মানো ব্যক্তিদের পক্ষেই সঠিক অনুধাবন করা সম্ভব। কর্মের ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তি সেই অবতারের সান্নিধ্যে এসে, তা সকল নিদিধ্যির বিরোধিতা করে যাতে কার্যত কোন ব্যক্তি তার যথোপযুক্ত বস্তুমুখী ভাবপর্বে ছাড়া নিয়তিবাদী বা সহনশীল হতে না পারে। পরম পূর্ণতার (প্রতীক: একটি সোনার) কল্পনা কল্পনাই হয়ে যায়: তাকে বুদ্ধিবৃত্তি (অস্তিত্বের সর্ববিধ পূর্ণতায়) দিয়ে অনুধাবন করতে হয়, কখনোই তাকে রূপের মধ্যে পাওয়া যায় না। বস্তুজগতের আনন্দ-বেদনাও সমগ্রতার অংশ, তাকে বাদ দিয়ে 'আধ্যাত্মিক' জীবন নিজেই আংশিক। ইয়েট্‌স ছিলেন প্লটিনাস্ সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী, যাঁর শিক্ষা হচ্ছে আত্মা দেহের সীমা ছাড়াতে সদাই ব্যাকুল। তাহলে আত্মা আদৌ কেন দেহের বাঁধনে ধরা দিল? ইয়েট্‌স উত্তর দিতেন: নিজেকে জানার জন্যে - কারণ যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁর নিজের সঙ্গে বিরোধিতার মধ্যেই, ঠিক তেমনি আত্মাও দেহের মধ্যে প্রবেশ করে সীমার বন্ধন গ্রহণ করে, যেহেতু সকল জ্ঞানই আসলে বৈষম্যের জ্ঞান। সুতরাং এখানেই ইয়েট্‌স-এর চূড়ান্ত মূল্যবোধ, জীবনের উদ্দেশ্য: জ্ঞান। অভিজ্ঞতা নিজেই নিজের মধ্যে মূল্যবান, সে অভিজ্ঞতা

ভাল বা মন্দ, সুখ বা দুঃখ যাই হোক না কেন। এবং যদিও এই জ্ঞান শেষ পর্যন্ত ভালমন্দের উর্ধ্বে, তবুও তা ভালমন্দেরই।

ইয়েট্‌স দর্শন শাস্ত্রের সেই সব সমস্যার সমাধান করেছেন যাতে মন্দকে ভালোর পরিপূরক হিসাবে ধরা হয়, অথবা মন্দকে ঈশ্বরীয় লীলার নির্বিকার সৃষ্টি বলে মনে করে, এবং যা পরমপূর্ণের ধ্যানে মানুষকে জীবন সম্পর্কে নির্মোহ করে তোলে: যেমন, লিব্‌নিৎস্‌-এর আশাবাদের, কিংবা স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদের দর্শন—যিনি উপদেশ দিয়েছেন 'না হাসতে, না দুঃখ করতে, না অভিযোগ করতে, কেবলমাত্র অনুধাবন করতে'। এই সব দর্শন দুঃখভোগের ও অংশের বীভৎসতার সর্বগ্রাসী গুরুত্ব কমিয়ে যেমন যেন তুচ্ছ ও মসৃণ করে দিতে চায়। তারা যেন পরোক্ষে মন্দের প্রতি অদৃষ্টবাদী সমর্থন জানায়। অস্তিত্ববাদীরা নির্বস্তুক তত্ত্বের অবাস্তবতাকে আক্রমণ করে থাকেন, ইয়েট্‌স তাঁদের যেন কাছাকাছি: একমাত্র প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে কেবল মুহূর্তের জ্ঞান: প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, মনন নয়। ভালবাসার মধ্যে থাকা আর ভালবাসার বিবরণ দেওয়া অথবা যন্ত্রণার অনুভূতিতে ও যন্ত্রণার বর্ণনায় বিস্তর পার্থক্য। হিরোশিমা, বুখেনওয়াল্ড্‌ ও সোলাস্তের নাৎসী অবরোধের বিভীষিকাকে কেবলমাত্র সর্বাধিক পরিমাণ মন্দের স্তূপে এক প্রাজ্ঞ নিরপেক্ষ মস্তব্য অযৌক্তিক, এই বলে সহজে উড়িয়ে দিতে পারা যাবে না। ইয়েট্‌স প্রচণ্ড আবেগে আমাদের বেঁচে থাকার সমস্ত বাস্তবতাকে মেনে নিয়েছেন, যন্ত্রণা ও অবিচারকে সেই বাঁচার অনিবার্য অভিজ্ঞতা বলেই দেখেছেন, তাকে কোন রকমেই বর্জনীয় হতে দেননি। অভিজ্ঞতা থেকে সমস্ত রকমে দূরে থাকা জীবনের উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেয়, এই ছিল জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা। জীবনের সমস্ত আবেগ ব্যর্থতাবোধ ও আকাঙ্ক্ষা মিলিয়ে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতার পথে নিজের ব্যক্তিত্বের বর্তমান পথ থেকেই অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি অবিচারের বিরুদ্ধে ক্রোধ জানিয়েছেন, পৃথিবীর সৌন্দর্যে পুলকিত হয়েছেন, য়ুরোপের ঘনায়মান সর্বনাশে দুঃখ পেয়েছেন, সেই সঙ্গে নিজের মুখকে চিরকালীন আবর্তিত চক্রের একটি অংশ মনে করে, নিজের জীবনকে দেখেছেন বহুরূপের মধ্যে একটি বিশিষ্ট রূপ হিসাবে। এমন কি যখন তিনি ক্রোধে উত্তেজিত হয়েছেন তখনো মেনেছেন, তাঁর কাছ থেকে সেই মূল্যবান জিনিষ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না: তাঁর উপলব্ধি।

ইয়েট্‌স-এর রচনাবলীকে তিনটি কালগত পর্বে ভাগ করা সুবিধাজনক

—প্রথম দিকের ধরধর কাব্য, শব্দ ও প্রতিমূর্তির মত সুন্দর ; মধ্যপর্ব হচ্ছে *The Winding Stair* পর্যন্ত, যা বৈপরীত্যের উত্তেজনায় শক্তি পেয়েছিল; এবং দুর্বার মুক্তির শেষ পর্ব :

A mind Micheol Angelo knew
That can pierce the clouds,
Or inspired by frenzy
Shake the dead in their shrouds. *

তাঁর জীবন ও কর্ম বিপরীতমুখে বাহিত। সমস্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে যতই তিনি নিজেকে সরালেন, ততই তাঁর কবিতা হয়ে উঠলো বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। অল্প বয়সে তিনি ছিলেন 'খুব ধার্মিক', পরবর্তী জীবনে ক্রমশই সোজাসুজি এর দিকে এগিয়ে গেছেন। তাঁর *Vacillation* (1932)-এর শেষে যেখানে 'ও তাঁর খ্রীষ্টান হৃদয়ে'র সমর্থনে তিনি যেখান ক্যাথলিক অতীন্দ্রিয়বাদী সব হ্যাসেলকে বাতিল করে দেন ('ঘড়িও তারা অনেকটা এক, কারণ আমরা/সবদের অলৌকিক লীলা মেনে নিই, শুচিতাকে আমাই সন্ধান')। তাঁর দেহ যতই দুর্বল হয়ে আসতে লাগলো তাঁর কবিতা ততই হয়ে উঠলো অশান্ত :

Never had I more
Excited, passionate, fantastical
Imagination, nor an ear and eye
That more expected the impossible—
No, not in boyhood when with rod and fly,
Or the humbler worm, I climbed Ben Bulben's back
And had the livelong summer day to spend. **

নূতন শতাব্দীর সূচনা থেকেই ইয়েট্‌স তাঁর সোজার দিকের কাব্যরীতি থেকে বিদায় নিতে লাগলেন। ১৯০৩-এ লেডি গ্রেগরীকে লিখছেন : 'আমার লেখা আজাল আরও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে বৈদগ্ধ্য এসেছে।' এবং ১৯০৪-এ তিনি জর্জ রাসেলকে লিখেছেন : 'যার মধ্যে কোন সেতুর আনন্দ নেই, যত সুন্দরই হোক তেমন কোন আবেগ আমাদের না থাকাই ভাল।' তাঁর কাব্যের ১৯০৬-এর সংস্করণের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন :

...the search for more of manful energy, more of cheerful acceptance of whatever arises out of the logic of events, and for clear outline, instead of those outlines of lyric poetry that are blurred with desire and vague regret.

*. An Acre of Grass ** The Tower.

পরিবর্তনের প্রথম চিহ্ন দেখা দিল তাঁর *The Green Helmet and Other Poems* (1910) কাব্যে। এর মধ্যে রোমান্টিক এশিভাবের অনেক নিদর্শন আছে ও বাস্তবকে এখানে আরও দৃঢ়ভাবে ধরেছেন (যেমন *No Second Troy*-এ, যেখানে তিনি শুধু আর বিলাপ করছেন না, তিনি বুঝতে চাইছেন) এবং বাস্তব জীবনকে কবিতার বিষয়বস্তু করার প্রত্যয় লাভ করেছেন (My curse on plays/That have to be set up in fifty different ways,/On the day's war with every knave and dolt')। তাঁর ভাষাকে তখন তিনি বাহুল্যবর্জিত করে তুলছিলেন এবং ১৯০৮-এ এজরা পাউণ্ড ইংলণ্ডে এলে এ বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করেছিলেন: তাঁর কবিতায় যে সব শব্দে বা গ্রহণে গত শতাব্দীর শেষ দশকের গন্ধ পাওয়া যেতো পাউণ্ড সেই সব কবিতায় চিহ্ন দিয়ে দিতেন। ইয়েট্স অবিজ্ঞাসত্ত্বেও সেগুলি লক্ষ্য করতেন। অবশেষে ১৯১২-তে একটি ছোট কবিতায় তিনি বর্ণনা করলেন 'একটি পরম আত্মা/কারুকর্মে ঢাকা/পুরাণ থেকে নেওয়া/···কারণ, তাতে আছে অনেক বাহাদুরি/খালি পায়ে হাঁটা'। 'পুরাণ'-এর প্রত্যাবর্তন অবশ্য ঘটলো, কিন্তু তা আর 'কারুকর্মে ঢাকা' নয়; কবিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই। ইয়েট্স তাঁর লক্ষ্যপ্রক্রিয়া বিষয়ে তাঁর একটি শেষ জীবনের কবিতায় লিখেছেন:

> Those masterful images because complete
> Grew in pure mind, but out of what began?
> A mound of refuse or the sweepings of the street,
> Old kettles, old bottles, and a broken can,
> Old iron, old bones, old rags, that raving slut
> Who keeps the till. *

ইয়েট্স-এর জীবন-দর্শন সব চেয়ে বড় ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছিল আইরিশ গৃহযুদ্ধে। বিখ্যাত *The Tower* ও *The Winding Stair* কবিতায় তিনি সংঘর্ষময় পৃথিবীর বিচারহীন ঔদ্ধত্যপনার ও তার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক বিষয়ে চিন্তিত। কারণ, কর্মই সংঘাত ও হত্যার মধ্যে নিয়ে যায়:

> a drunken soldiery
> Can leave the mother, murdered at her door,
> To crawl in her own blood, and go scot-free. =

গৃহযুদ্ধ তাঁর রাজনৈতিক দর্শনকে বিমূঢ় করে দিল ('আমরা···পৃথিবীকে

---

* The Circus Animal's Desertion. = Nineteen Hundred and Nineteen.

একটি শাসনে আনার পরিকল্পনা করেছি'), তাঁর সেই সব 'মর্যাদায় ও সভ্যে'র বাণীকে এবং তাঁর কন্যার জন্য প্রার্থনাকে ('যেন তার স্বামী নিয়ে যায় তাকে এক গৃহে/যেখানে সব কিছুই মানায়, আর অনুষ্ঠানের মত মনে হয়') মনে হলো অর্থহীন। আয়ার্ল্যাণ্ডের নিজস্ব প্রাচীন বনেদি ধর্মীয় ভাবধারা, যার মধ্যে ইয়েট্‌স কল্পনা করেছিলেন তিনি দেখেছেন বীরোচিত ও মহানুভব জীবনের আদর্শ, তাকে ছিন্ন জনতা আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করে দিল। তাঁর কাছে এই গৃহযুদ্ধ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, যে চরম বিচ্ছিন্নতা ও মহা সর্বনাশের মধ্যে সমস্ত য়ুরোপ প্রবেশ করতে চলেছে এ যেন তারই পূর্বাভাস, এই বিষয়ে লিখেছেন *The Second Coming*। এবং *Meditations* ও *Nineteen Hundred and Nineteen*-এর ভাবাবহ প্রত্যাবেশের দুঃস্বপ্নকে রূপ দিয়েছে একই মনোভঙ্গি। ইয়েট্‌স-এর কাছে ইতিহাসের ধারা অপরিবর্তনীয় ও অমোঘ: মহাচক্র—নিয়ত পর্যাবর্তনে কখনো সরল, কখনো বক্রময়। মানুষ তাকে উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু বদলাতে পারে না। এই বক্তব্য তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতায় রূপলাভ করেছে: *Leda and the Swan*, *Two songs from a Play*:

> Another Troy must rise and set,
> Another lineage feed the crow,
> Another Argo's painted prow
> Drive to a flashier bauble yet.

আর একটি বিখ্যাত কবিতা, *Among Schoolchildren*, জীবনের হতাশার উপর দাঁড়িয়ে আছে—মন্ত্র সোনের প্রতি তাঁর নিজের স্নেহ, সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ, এবং ষাট বছরের দৃষ্টিকোণ থেকে সেই ভালবাসাকে কী অসহায়ভাবে অবান্তর মনে হয়। *All Souls' Night*-এ তাঁর যৌবনের বন্ধুদের স্মরণ করেছেন, যাঁদের সঙ্গে অলৌকিক তত্ত্বের চর্চায় মেতেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন অর্ধোন্মাদ ও বলিষ্ঠ আশায় ভরা, আজ মৃত্যুতে সবাই স্তব্ধ। তিনি যেন গ্রীকদের নৈরাশ্যবাদের দিকেই ফিরেছিলেন:

> Never to have lived is best, ancient writers say;
> Never to have drawn the breath of life, never to have
> looked into the light of day:
> The second best's a very goodnight and quickly turn away. *

* Chorus from 'Oedipus at Colonus'.

পরে অবশ্যই ইয়েট্স লিখেছিলেন : '*The Tower*-এর ভিক্ততা আমাকে বিস্মিত করে।' দার্শনিকবোধের কাণ্ডারণে তিনি আজ ভারাক্রান্ত : তাঁর কবিতা কি কাউকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে? তাঁর মনোভাবের এই দোলাচলতায় তিনিও অপূর্ণতা ও অপরাধবোধের বিষণ্ণ অনুভূতির অভিজ্ঞতা, —যেমন এলিয়ট তাঁর Little Gidding-এ,—লাভ করতে পারেন :

> Things said or done long years ago.
> Or things I did not do or say
> But thought that I might say or do,
> Weigh me down, and not a day
> But something is recalled,
> My conscience or my vanity appalled. *

রোমান্টিক সংকট ইয়েট্স-এর উপর তীব্র আকারে প্রতিক্রিয়া তৈরী করেছিল : জীবনকে স্বীকার করার অর্থ মৃত্যুকেও স্বীকার করা ; জীবনকে অস্বীকার করার অর্থ শিল্পের প্রেরণা জীবনীশক্তিকেই অস্বীকার। তাই জিজ্ঞাসা করতে পেরেছিলেন :

> But is there any comfort to be found?
> Man is in love and loves what vanishes,
> What more is there to say? **

কবির কী কর্তব্য? বিরতির ক্লেদক্লান্ত যুগের গান গাওয়া, অথবা পবিত্র বাইজান্টিয়াম শহরে ফিরে যাওয়া—যেখানে সভ্যতার অবশুদ্ধতা রচিত হয়েছে ও শিল্পের চরমোৎকর্ষের আদর্শ মূর্তিলাভ করেছে? নিজের যুগকে গ্রহণ করা, অথবা এক কাল্পনিক যুগে বাস করা? তাঁর জীবন ও জীবনের কাব্যকে বর্জন করা ও তার বদলে ধর্ম ও দর্শনে আত্মসমর্পণ কি বাঞ্ছনীয় : 'কবিতার কল্পনাকে বিদায় দেওয়া/প্রেচো ও প্লটিনাস্‌কে বন্ধুরূপে গ্রহণ?' এই পরিপ্রেক্ষিতের উল্লাসে ভরা বিশ্ব ('The salmon falls, the mackerel-crowded sea') কোন জরাগ্রস্ত যুগের আবাসভূমি নয়। 'মহাকালের কৌশলের' কাছে আত্মসমর্পণই কি বাঞ্ছনীয়? নিজের সঙ্গে আত্মার এই সংলাপের পরিণাম সম্পর্কে প্রকৃতই কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কারণ যেহেতু ইয়েট্স কবি তাই শক্তি ও সৌন্দর্যে ভরা বিশ্বের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। জ্ঞান ও বিনয় কখনোই সৌন্দর্য রচনা করতে পারেনি :

---

* Vacillation. ** Nineteen Hundred and Nineteen.

ঠিক ও শক্তিমান ব্যক্তিরাই হচ্ছে 'রূপসৃষ্টি ও শিল্পীত্বরূপে কবিত'। যারা জীবনের সঙ্গে যুক্ত তাদের দার্শনিকতার এগিয়ে যাবার রাস্তা নেই। যারা বাঁচতে চায় তাদের রক্তমোক্ষণ হবেই, এমন কি তাদের আদর্শ যদি হয় 'মেধাযুক্ত চক্ষের শুচিতা'ও, তাহলেও। কেউ শুধু জ্ঞানবান হয়েই বাঁচতে পারে না :

For wisdom is the property of the dead,
A something incompatible with life ; and power,
Like everything that has the stain of blood,
A property of the living ; *

Symbols নামে ছোট একটি কবিতায় ইয়েট্‌স প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তা, জ্ঞান ও সৌন্দর্যের বৈপরীত্যের বিষয়ে চিন্তা করছেন :

A storm-beaten old watch tower,
A blind hermit rings the hour.

All-destroying sword blade still
Carried by the wandering fool.

Gold-sewn silk on the sword blade,
Beauty and fool together laid.

মিনারের সন্ন্যাসী—শেলীর জ্ঞানীপুরুষ—বিশ্বের জ্ঞানধারা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন, জীবনের বিপর্যয়ে যার যাওয়া, অথচ প্রাসাদের মধ্যে কিছু-বিন্যাসে আশ্রিত। এই মিনার হচ্ছে সভ্যতার, জাতির ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের প্রতীক। মিনার রক্ষা করে, তরবারি সংহার করে। অন্ধ সন্ন্যাসী জ্ঞানবান নির্বোধের, সৈনিকের বিপরীত রূপ। ইয়েট্‌স-এর কাছে বুদ্ধি ও শক্তির বৈপরীত্য স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু রেশমের উপর সোনার কাজ করা খাপে ঢাকা সংহারক তরবারি হচ্ছে নারী ও সৌন্দর্যের প্রতীক। অতএব সিদ্ধান্ত : জ্ঞানবানের কাছে সৌন্দর্য মিলবে না, মিলবে শক্তিমানের কাছে এবং সেখানেও কবি তাকে খুঁজবেন। শক্তি ও সৌন্দর্য নিয়ে যে জীবন এবং একাকিত্ব ও অন্তর্জীবনতা নিয়ে যে জ্ঞান এই উভয়ের সমুদ্ভবে ইয়েট্‌স তখন জীবনকেই বেছে নিলেন। যতই তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এই কবি,—যাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা পঞ্চাশোর্ধে রচিত,—ততই তাঁর

* Blood and the Moon.

ব্যক্তিত্ব ও তার অভিব্যক্তির মধ্যে তীব্র প্রত্যুত্তা ও আত্মপ্রত্যয় জন্মাচ্ছিল। একজন সত্তাকার স্রষ্টা বৃদ্ধ, *An Acre of Grass* কবিতায় নিজেকে এইভাবে এঁকেছেন :

> Grant me an old man's frenzy,
> Myself must I remake...

তাঁর জন্যে পুস্তক ও চিত্রশোভিত কোন পাত্র যথেষ্ট ছিল না, ছিল কিং লিয়রের ক্রোধ। একদল কুশীলবের (শয়নঘরের ঘাসী, উন্মত্ত জেন, অপ্রকৃতিস্থ টম, কর্ণেল মার্টিন ইত্যাদি) মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবনকেই সমর্থন করে গেছেন। তিনি সম্ভবত নিজেকে 'ক্ষয়ত বয়মাদ বুড়ো'র সঙ্গে একাত্মবোধ করেছেন, যে বুড়ো 'মেয়েদের জন্যে উন্মাদ' এবং 'শিশুর কামনায় অপ্রকৃতিস্থ'। এমন কি মেয়ের জন্যে আত্মাকেও বলিদান করা হয়েছে (*A Last Confession*)। *Supernatural Songs*-এ বিশ্বাস-এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি খ্রীষ্টতত্ত্বের নম্র আত্মবিসৃষ্টিকে শেষবারের মত ধিক্কার দিয়ে গেছেন। প্রেম যখন পরম পূর্ণতার স্তর সেখানে কেবল ঈশ্বরই পৌঁছাতে পারেন, কিন্তু 'ঈশ্বরের ঘৃণাই আত্মাকে ঈশ্বরের কাছে টানতে পারে।' এই হচ্ছে সেই ঘৃণা (*sacra indignatio*) যা তিনি ব্লেইক্-এর মধ্যে প্রশংসনীয় মনে করেছেন। অহংকার বিনয়ের চেয়ে অনেক বেশি গৌরবময় :

> Pride, like that of the morn,
> When the headlong light is loose...*

গ্রন্থিবাদ্-এর স্বর্গে তিনি প্যান-কে এনে ফেলেছেন।—এই শেষ পর্বে তিনি বিশ্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেন তাকে বিদ্রূপ করে গেছেন। তাঁর শেষ দিকের কাব্যের রূপগঠনে অর্জিত রীতি, উদ্ধত ও তাচ্ছিল্যভরা—তাতে বাক্যগঠন, অসম ছন্দ, অসতর্ক মিলবিন্যাস, আকস্মিক সুর-পরিবর্তন প্রায়ই দেখা যায়। তথাপি তিনি যে কুশলী ও আত্মপ্রত্যয়শীল তা বুঝতে পারা যায়। বিষয়বস্তু হতে পারে দুর্বার প্রাণশক্তিতে ভরা, কিন্তু তার আস্বাদ অদ্ভুত শীতল বা ঘনীভূত অনুষ্ঠানের মত। অনেক কাল আগে ইয়েট্স এমন একটি কবিতা লেখার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন যা '...may be as cold/ And passionate as the dawn।' বাইরে বেহিসেবিপনার পেছনে কাজ

---

* The Tower.

করতো তাঁর কল্পনায় ও ভাষায় এমন এক বুদ্ধিদীপ্ত সংযম যা কেবল সমগ্র জীবনের সচেতন প্রয়াসের দ্বারাই লাভ করা সম্ভব। 'কেন বৃদ্ধেরা উন্মত্ত হতে পারবে না'—এই তাঁর প্রশ্ন। সংযমের বাঁধ ভেঙে দেওয়ার ক্ষতির দিকটি তিনি অর্জন করেছিলেন :

> Who reckons what the soul can claim
> So great a sweetness flows into the breast
> We must laugh and we must sing,
> We are blest by everything,
> Everything we look upon is blest. *

ভয় ও উদ্বেগ সৌন্দর্যের বিরোধী। *Poetry and Tradition* (1907) ইয়েট্স লিখেছিলেন :

> তিন শ্রেণীর মানুষ স্বাধীনভাবে সুন্দর কিছু সৃষ্টি করেছে। অভিজাত সম্প্রদায় সুন্দর আবহণ সৃষ্টি করেছে, কারণ তারা এমন স্থানের অধিকারী যেখানে তাদের জীবনের কোন ভয় নেই। মানুষ কবিরা কত সুন্দর কাহিনী ও আকর্ষ বিষয় রচনা করেছে, কারণ তাদের কিছুই হারাবার নেই, তাই ভয়ও নেই। আর অধিনিষ্ঠ সব সৌন্দর্যই শিল্পীর সৃষ্টি, কারণ বিধাতা তাদের উদারতা দিয়ে ভরিয়েছেন।

কোন আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা ব্যতীত জীবনকে বরণ করার অর্থই হচ্ছে জীবন সম্পর্কে একটা ট্র্যাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বরণ করা—অর্থাৎ গ্রীক ও এলিজাবেথীয়দের কাছে ফিরে যাওয়া। তাই ইয়েট্স লিখেছিলেন : 'যে মুহূর্তে বুঝি জীবনটা ট্র্যাজেডি, সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের জীবন আরম্ভ হয়।' প্রায় তিন শতাব্দী ধরে যুক্তিপন্থী আশাবাদীরা ট্র্যাজেডিকে খুবই নিচুভাবে দেখে আসতেন, যা মনে করতেন তা এক ভাবালু নৈরাশ্যের খাত। ইয়েট্স এলিজাবেথীয় স্টোইকবাদের পুনরুজ্জীবন করলেন :

> A great man in his pride
> Confronting murderous men
> Casts derision upon
> Supression of breath. **

তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে যখন মঠাধ্যক্ষ সিমন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন : 'তাহলে তুমি মনে কর আচরণটা কোন ব্যাপারই নয়?'—ইয়েট্স তখন

---

* A Dialogue of Self and Soul. ** Death.

জবাব দিয়েছিলেন : 'বীরোচিত মন ছাড়া কিছুই গ্রাহ্য নয়।'
মানুষের ও তার অভিজ্ঞতার বাইরে কিছুই নেই :

> Whatever flares upon the night
> Man's own resinous heart has fed. *

মানুষ অবশ্যই জানবে কেমন করে নিজেকে ও নিজের অবস্থাকে বিধাহীনভাবে সম্মুখীন হতে হয় ('নিজের মুখকে দেখার নির্ভীক নিষ্ঠা')। কারণ বাঁচার অর্থই হচ্ছে পরিবর্তন ও অপূর্ণতাকে স্বীকার করে নেওয়া, এমন কি তার মধ্যেই আনন্দের কারণও খুঁজে পেতে হয়। তাই ইয়েট্স আগে থেকেই বুঝেছিলেন তাঁর 'ফিনার' জগৎ হবে, জেনেও দিয়েছিলেন। এ যেন মানুষের পরিবার ও তার সভ্যতার অনিবার্য অধঃপতন—কাটলবরা পাথর ঢালাইয়ের মধ্যে পেঁচার বাসা ও শূন্য আকাশের দিকে তার নিঃসঙ্গতার হাহাকার। তাঁর শেষ মনোভাব নীৎশের *amor fati*-র, ট্র্যাজিক আনন্দের কাছাকাছি :

> What matter though numb nightmare ride on top,
> And blood and mire the sensitive body stain?
> What matter? Heave no sigh, let no tear drop,
> A greater, a more gracious time has gone;
> For painted forms or boxes of make-up
> In ancient tombs I sighed, but not again;
> What matter? Out of cavern comes a voice,
> And all it knows is that one word 'Rejoice!' **

এবং নিম্নলিখিত কবিতা, *Lapis Lazuli*,-তে ইয়েট্স ঘোষণা করেছেন যে হ্যামলেট ও লিয়র হচ্ছেন উৎকৃষ্ট, কারণ তাঁরা ছিলেন শাশ্বত নিয়মের অধীন :

> All things fall and are built again
> And those that build them again are gay.

সৃষ্টি ও ধ্বংস—জীবনের দুই বিপরীত কোটি—উভয়েরই শুরু হয় আনন্দের মধ্যে। ইয়েট্স তাঁর *The Tree of Life* নিবন্ধে ঘোষণা করেন : 'যাদের সত্তার সঙ্গে আনন্দ মিশে আছে তাদের মধ্যে কী অপরিসীম মাধুর্য, কী

* Two Songs from a Play. ** The Gyres.

হৃদ্যোষব তাদের গতি!' এবং *Poetry and Tradition*-এ : 'আমরা যেন সব কিছু থেকেই মুক্ত হতে পারি, অন্ধ ক্রোধ, পবিত্র ঘৃণা, বিদেষী উদ্বেগ, বিশ্রী সন্দেহ, শিথিল আশা,—যেন আনন্দের মধ্যে হয় আমাদের পুনর্জন্ম।' এ হচ্ছে কবির দর্শন, তাতে সন্দেহ নেই—হয়তো যে-কোন জীবন-দর্শনের মতই, কিন্তু এ তার শিল্পী-সত্তার প্রকাশ। ব্রেক কি বলেন নি যে, সব 'অভিজ্ঞতার কবি' শয়তানের দলভুক্ত—যুক্তির বিরুদ্ধে প্রাণশক্তির উপরই তাঁদের পক্ষপাত? এবং 'প্রাণশক্তি হচ্ছে শাশ্বত আনন্দ।'

একক

দুই মাস অন্তর বছরে মোট ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক-মূল্য (বার্ষিক) ছয় টাকা।
ডাকখরচ আমাদের। পত্রিকা 'লাইটিফিকেট অব পোস্টিং'-এ পাঠানো হয়।
প্রতি সংখ্যার দাম এক টাকা। পত্রিকা ভি. পি. করা হয় না।
পূরক সংখ্যা বা গ্রাহকের জন্য টাকা মনিঅর্ডারে পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

কলকাতা ও বাইরে পরিবেশনার জন্য যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পত্রিকায় যাঁরা লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক তাঁরা 'খসড়া' রেখে লেখা পাঠাবেন। উপযুক্ত ডাক টিকিট না দিলে সব সময়ে চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না।

সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগের ও টাকা পাঠানোর ঠিকানা: প্রবীর ঘোষ, ৩ রাধানাথ অক্রুর লেন, কলিকাতা ১২

ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস, ৯১৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রবীর ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ৩, রাধানাথ অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২ হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় বর্ষ

এষণা

দ্বিতীয় সংখ্যা

॥ সূচীপত্র ॥

অনুবাদ

ওথেলো — সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাষ্য

কবিতা

পাঁচটি কবিতা — বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

প্রবন্ধ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : নাট্যশালা ও অভিনয়

গ্রন্থ সমীক্ষা

বক্তব্য — পরমাত্ম রায়গুপ্ত

মৌমাছি তত্ত্ব — সরল চট্টোপাধ্যায়

পুনর্মুদ্রণ

আমার কথা — বিনোদিনী দাসী

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় — নির্মাল্য আচার্য

সাম্প্রতিক উপন্যাস

রক্তের হাওয়া

অসীম রায়

যার পূর্বপ্রকাশিত উপন্যাসগুলি চিন্তাশীল পাঠকমহলে আলোড়িত ও প্রশংসিত, সেই মননধর্মী ও প্রতিভাবান লেখকের শক্তিমত্তার স্বাক্ষর আছে এই উপন্যাসে। এঁর কৃতিত্ব জনপ্রিয়তায় নয়, চিন্তার উদ্রেকে।

মূল্য পাঁচ টাকা।

সোনালী আগুন

বিজন ভট্টাচার্য

নবনাট্য আন্দোলনের অন্যতম পাথেয়তের বলিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী উপন্যাস।

মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা।

সুন্দরবনম্

শিবশঙ্কর মিত্র

সুন্দরবনের ওপরের সুন্দর চিত্রকথা।

মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

কথাশিল্প প্রকাশ

১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এক্ষণ

দুই মাস অন্তর বছরে মোট ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক-মূল্য (বার্ষিক) ছয় টাকা। পত্রিকা 'সার্টিফিকেট অব পোস্টিং'-এ পাঠানো হয়। ডাকখরচ আমাদের। প্রতি সংখ্যার দাম এক টাকা। পত্রিকা ভি. পি. করা হয় না। পূরক সংখ্যা বা গ্রাহকের জন্য টাকা যদি অর্ডারে পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

কলকাতা ও বাইরের সবত্র এজেন্সীর জন্য যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

পত্রিকায় যাঁরা লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক তাঁরা 'কপি' রেখে লেখা পাঠাবেন। উপযুক্ত ডাক টিকিট না দিলে সব সময়ে চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

সমস্ত বিষয়ে যোগাযোগ ও টাকা পাঠানোর ঠিকানা: প্রবীর ঘোষ, ৬ রাধারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২।

CU

এক্ষণ
দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৮১

উইলিয়ম
শেক্সপীয়রের
নাটকের
অনুসরণে

ওথেলো

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—সাইপ্রাসের এক বন্দর।
সৈন্যাবাসের কাছাকাছি এক উন্মুক্ত স্থান।

[মোন্টানো ও দুজন ভদ্রলোকের প্রবেশ]

মোন্টানো। সমুদ্রে কিছু কি দেখছেন তটপ্রান্ত থেকে ?

প্রথম ভদ্রলোক। কিছুই না ; ঢেউএ ঢেউএ তোলপাড় শুধু,
আকাশ ও সাগরের মাঝখানে কোথাও দেখি না
জাহাজের চিহ্নমাত্র।

মোন্টানো। বাতাস গর্জায় যেন তট লক্ষ্য করে',
এরচে' প্রবল ঝড়ে কাঁপেনি কখনো এই দুর্গপ্রাকার :
এ ঝড় সাগরে যদি দুর্যোগ এমন,
কোন তরী এত শক্ত পাহাড় আছড়ালে তাতে
জোড়ে জোড়ে টিঁকে থাকবে ? কি হবে কে জানে ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। দুরন্ত বহরের এক ক্ষুদ্রতম অংশ শুধু :
কেনিল এ তীরে এসে একবার দাঁড়িয়ে দেখুন,
তাড়িত তরঙ্গগুলো বেগে বেগে ছুঁড়ে মারে যেন ;
আহত ফেনা চেউ উত্তুঙ্গ নিকট তার কেশর ফুলিয়ে
অনন্ত সপ্তর্ষি বুঝি দিল জলে ঠেকে,
ধ্রুবতারকার রক্ষী তারাদের বুঝি তা নেভাল ;
কখনো দেখিনি আমি এমন বিক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ
ক্রুদ্ধ সাগরের বুকে।

মোন্টানো। তুর্কীবহর যদি
না পায় আশ্রয় কোন জাহাজঘাটায়, তবে নির্ঘাৎ ডুববে,
অসম্ভব টিঁকে থাকা এই অবস্থায়।
[তৃতীয় এক ভদ্রলোকের প্রবেশ]
তৃতীয় ভদ্রলোক। ও জনাই, সুখবর, আপনাদের লড়াই খতম :
বাবাস এ তল্লাটে এত নাজেহাল হয়েছে তুর্কীরা
যে তাদের বত্রিশ পত : ভেনিসের আরেক জাহাজ
মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি প্রত্যক্ষ করেছে
অধিকাংশ জাহাজে তাদের।
মোন্টানো। সেকি। একথা সত্যি?
তৃতীয় ভদ্রলোক। জাহাজটা এখানে ভিড়েছে,
ভেরোনার এ জাহাজ ; যাঁর মুর ওথেলোর
সহকারী মাইকেল কেসিও
ঘাটে এসে নেমেছেন ; মুর নিজে আছেন পাশের পথে,
পূর্ণ অধিকার নিয়ে আসছেন সাইপ্রাসে তিনি।
মোন্টানো। শুনে খুশি আমি, সুযোগ্য শাসক তিনি।
তৃতীয় ভদ্রলোক। কিন্তু এই কেসিও যদিও তুর্কীদের ক্ষতির খবর এনে
চিন্তা দূর করেছেন, তবু তাঁর দৃষ্টিতে বিষাদ
মুর নিরাপদ কিনা ভেবে, কারণ তুফান শুরু
দুজনের হয় ছাড়াছাড়ি।
মোন্টানো। ঈশ্বর রাখুন তাঁকে :
আমি তাঁর অধীনে ছিলাম, সাচ্চা সৈনিকের মত
তাঁর আচরণ : চলুন সমুদ্র তীরে যাই।
দেখা যাবে যে জাহাজ নোঙর করেছে,
সেইসঙ্গে খুঁজব দুচোখ মেলে বীর ওথেলোকে
ঘুরে ঘুরে যে পর্যন্ত আকাশ ও সাগরের নীল
একাকার হয়ে না মিশছে।
তৃতীয় ভদ্রলোক। তাহলে চলুন যাই,
কারণ প্রতিটি ক্ষণ আরো কত আগমন
প্রত্যাশায় ভরা।

[কেসিওর প্রবেশ]

এ যোগ্য দ্বীপের বীর সন্তানেরা, ধন্যবাদ,
ধন্যবাদ, মুরকে ভয়ের জন্যে, ভগবান দিন তাঁকে
এ দৈব দুর্যোগ থেকে নিজেকে রক্ষার শক্তি,
কারণ তারাই তাঁকে ভয়ংকর উন্মাদ লাগবে।

মোন্টানো। জাহাজটা ভালো তো তাঁর ?

কেসিও। জাহাজটা শক্ত কাঠের, এবং নাবিক তাঁর,
সকলেই জানে, সবদিকে বিচক্ষণ ;
তাইতো আমার আশা ঝড়কে না ব্যর্থ করে,
সার্থক হতেই হবে।

[নেপথ্যে চিৎকার : "জাহাজ, জাহাজ, জাহাজ"]

[এক দূতের প্রবেশ]

কেসিও। কী এ গোলমাল ?

দূত। বন্দর হয়েছে শূন্য, সব লোক সমুদ্রের ধারে
সার বেঁধে 'জাহাজ', 'জাহাজ' বলে করছে চিৎকার।

কেসিও। আশা হচ্ছে ইনি রাজপাল। [তোপধ্বনি]

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ওরা এই তোপ দাগছে সৌজন্য জানাতে,
আমাদের মিত্র অন্তত।
অনুরোধ, একবার যান,
বাস্তবিক কে এলেন আসুন তা ঠিকমত জেনে।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। যাচ্ছি আমি। [প্রস্থান]

মোন্টানো। কৌজদার, সেনাপতি করেছেন বিবাহ কি ?

কেসিও। এ বিষয়ে খুবই ভাগ্যবান, যে কন্যাকে পেয়েছেন
বর্ণনা-অতীত তিনি, শ্রেষ্ঠ খ্যাতি স্নান তাঁর কাছে :
উদ্ভাসিত লেখনীর শত প্রশংসাও তাঁর পায় না নাগাল,
প্রকৃতি গড়েছে তাঁকে ত্রিলোকমা এমনই সুন্দরী
হায় মানে কবির কল্পনা।

[দ্বিতীয় ভদ্রলোকের প্রবেশ]

কি খবর, কে ভিড়েছে ঘাটে ?

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। ইয়াগো নামের একজন, সেনাপতির পতাকী।

খুবই অনুকূল যাত্রা ভাগ্যক্রমে পেয়েছেন তিনি :
উত্তাল সমুদ্র আর ঝুড় কত বন্দর যাতন,
স্রোতাহত শিলারাশি, বালিচর অমাট কঠিন,
জলদস্যু এরা সব ঘোরে সদা নির্দোষ তরীর,—
জলে মুগ্ধ হয়ে বুঝি এরাও ভুলেছে
সাধারণ স্বভাব তাদের, নিরাপদে যেতে দিল তাই
অনিন্দ্য ডেস্‌ডিমোনাকে।

মোণ্টানো। কে এই রমণী?

কেসিও। যাঁর কথা বললাম সেনানায়ক-নায়িকা তিনি,
যাঁর ইয়াগোর 'পরে ভার ছিল ওঁকে আনবার ;
আমাদের প্রত্যাশার সাত রাত আগে তিনি
তীরে এসে পৌঁছেছেন।.....হে ঈশ্বর, দেখো
যুদ্ধেলোকে,
ঘিরে দিও তাঁর পাল তোমার দুর্জয় বাসে,
যাতে তিনি বিপুল তরণী নিয়ে এ তীর করেন ধন্য,
ডেসডিমোনার মনে হর্ষ যাতে অচিরে বিলসন,

[ডেসডিমোনা, ইয়াগো, এমিলিয়া ও রোডারিগোর প্রবেশ]

আমাদের তিমিত মনে এনে দেন নব উদ্দীপনা,
সারা সাইপ্রাসে যাতে আনেন সান্ত্বনা,.....
দেখো, দেখো,
জাহাজের রব যত তীরেতে এসেছে উঠে।
সাইপ্রাসবাসীগণ, সম্মান জানাও এঁকে নতজানু হয়ে।
সুবাসিত, মহীয়সী। ঈশ্বরীয় আশিস শুভ
আগে গিয়ে আপনার চতুর্দিকে ঘিরে
রহুক কল্যাণ চক্র।

ডেসডিমোনা। ধন্যবাদ অজেয় কেসিও ;
আমার স্বামীর কোন সংবাদ আছে কি?

কেসিও। আসেন নি এখনও, কিছুই জানি না আর,
তবে তিনি আছেন ভালোই, আসছেন
শীঘ্রই এখানে।

ডেসডিমোনা। বড় ভয় হয়.....কী করে আপনাদের ছাড়াছাড়ি হল ?
[বেপথো "জাহাজ, জাহাজ"]

কেসিও। সমুদ্রের আক্রোশের দারুণ দুর্যোগে
আমরা হলাম সঙ্গীহারা : কিন্তু ওই জাহাজের পাল।
[তোপধ্বনি]

দ্বিতীয় ভদ্রলোক। বন্দর-দুর্গকে ওরা শুভেচ্ছা জানাল,
মিত্র বলে মনে হয়।
স্বচক্ষে আসুন দেখে। [ভদ্রলোকের প্রস্থান]
পতাকী, আপনাকে স্বাগত, [এমিলিয়াকে] হে দেবী,
আপনাকেও।
ভদ্র ইয়াগো, ধৈর্যচ্যুত হবেন না যেন
আমার আদব দেখে ; শিক্ষানবীশা এমনি আমার
যাতে আমি এইভাবে ভদ্রতা দেখাতে সাহসী।
[এমিলিয়াকে চুম্বন]

ইয়াগো। মশাই, আপনাকে যদি দেয় ওর ঠোঁটের আস্বাদ
ঠিক সেই পরিমাণ যতটা জিতের কাল
আদায়ে সে রাজে,
তবেই পাবেন পুরো প্রাপ্য আপনার।

ডেসডিমোনা। সেকি, ও যে কথাই বলে না।

ইয়াগো। বলে, বলে, বড় বেশী বলে :
আমি দেখি, বলে, যখনই আমার ঘুম আসে—
যাইহি, আপনার সামনে এখন রয়েছে বলে
জিতটা সিঁদিয়েছে একটু মনের ভেতরে
মনে মনে শ্রাদ্ধ করছে ঠিক।

এমিলিয়া। একথা বলার মত কি তুমি দেখেছ ?

ইয়াগো। থাক, থাক, বাড়ির বাইরে তোমরা পটের ছবি ;
বৈঠকখানায় ঘণ্টা ; ঘুনো বেয়াদব হেঁসেলে :
খোঁচা দিতে নিরীহ বোষ্টমী ; খোঁচা খেলে বেহায়া
শিশাচী ;
অগোছালো ঘরকন্নার ; নিষ্ক্রীয়তা বিছানায় শুধু।

ডেসডিমোনা। ধিক্, ধিক্, কী নিষ্ঠুর, হিঃ হিঃ।

ইয়াগো। হাতে হাতে সত্যি নইলে তুকী আমি ঠিক,
আপনারা জাগেন যেমনে, কবিষ্ঠা হন তেমনে দিবে।

এমিলিয়া। আমার ওপর কথা অনেক হয়েছে।

ইয়াগো। যা বলেছ, থামি তবে।

ডেসডিমোনা। আমার ওপর কথা বলতে হলে কিভাবে বলবেন?

ইয়াগো। বলবেন না এ কাজ করতে, দোহাই আপনাকে,
আমাতে আমিই নেই যদি না পরের দোষ ধরি।

ডেসডিমোনা। আচ্ছা, বলুন তো দেখি।···জাহাজঘাটে কি কেউ গেছে?

ইয়াগো। হ্যাঁ গিয়েছে।

ডেসডিমোনা। ভাল লাগছে না কিছু, তবু আমি নিজের স্বরূপ
চাপা দিয়ে অন্যরূপে দেখাচ্ছি নিজেকে:
বলুন, আমার গুণ কিভাবে গাইবেন?

ইয়াগো। চেষ্টা করছি, তবে কিনা কবিত্ব আমার
এঁটেলে পলস যেন, তেমনি সেঁটে থাকে মগজেতে,
শিশুতত্ত্ব উপজে আসে: কল্পনা কাতরাচ্ছে কিন্তু,
সত্য যা প্রসব হল শুনুন বলি তা:
রূপ আর বুদ্ধি কোন রমণীতে হলে একসাথ;
রূপ করে কাজ, আর বুদ্ধি দেয় কাজের বরাত।

ডেসডিমোনা। যথেষ্ট হয়েছে স্তুতি! কালো মেয়ে বুদ্ধিমতী হলে?

ইয়াগো। বুদ্ধিমতী কোন মেয়ে হয় যদি কালো,
সঙ্গী হবে বলো, তার কালো হবে আলো।

ডেসডিমোনা। খারাপের চেয়েও খারাপ।

এমিলিয়া। সুন্দরী—বোকা হয় যদি?

ইয়াগো। সুন্দরী যে, অভাবধি কখনোই হয়নি সে বোকা,
যেহেতু বোকামি তারও কোলে আনে বাড়বাড়ি বোকা।

ডেসডিমোনা। এগুলো তো আজিকালের বাঁধাঁ, ভাটিখানার
পাকদদের হাসির খোরাক; যে মেয়ে কুৎসিত তার
ওপরে বোকা, তার কতটা ব্রাহ্ম করতে পারেন,
দেখি?

ইয়াগো। কুৎসিত এবং বোকা হবনি এমন কোন নারী,
চটুলা ও কুটিলার হল চাতুরীতে যে আমাকী।

ডেসডিমোনা। কী আকাট মূর্খোমি, সবচেয়ে যে খারাপ তাকেই কিনা সবচে' বেশী প্রশংসা : কিন্তু এমন মেয়ের কী প্রশংসা করতে পারেন, যে মেয়ে সত্যিই বোকা, যে মেয়ে নিজের হৃদয়ে বিশ্বনিন্দুককে তার স্বপক্ষে সাক্ষী মানতে পিছপা নয়।

ইয়াগো। রূপের অভাব নেই তবু যার গর্ব নেই যাতে,
পটীয়সী যাচনে যে তবু কথা কয় নিচু যাদে,
সোনামনা আছে তের তবু অঙ্গে নেইকো বাহার,
যে ইচ্ছা সাধ্যাবত্ত তাতেও আসক্তি নেই তার ;
রাগের সময়ে যদি প্রতিপক্ষ সামনে উপস্থিত,
প্রতিশোধে কাত তবু, অন্তরে কোথা তিরোহিত ;
সাধারণ বুদ্ধি যার নয় এত কাঁচা
রুইএর মুড়োটা ফেলে মেয়ে কই-ল্যাজা ;
যে মেয়ে চিন্তায় মত্ত, চিন্তা কিন্তু রাখে সে গোপনে,
অনুরাগী পিছে চলে, তবু ফিরে চায় না পিছনে ;
এ মেয়ে আদৎ মেয়ে, যদি থাকে এমন স্বভাব—

ডেসডিমোনা। কী তাহা করতে ?

ইয়াগো। গাত্রলকে শুদ্ধ দিতে, আর রাখতে মুদ্রির হিসাব।

ডেসডিমোনা। ইস্, কী, বেখাপ্পা বিদ্রূপেই শেষ : এমিলিয়া, যদিও উনি তোমার স্বামী, ওঁর কাছ থেকে কিন্তু কিছু শিখো না ; কেসিও, আপনার কী মত, মত বদ ও নোংরা পরামর্শ দিতে ভদ্রলোক বিচক্ষণ, তাই না ?

কেসিও। একটু কাটা কাটা কথা বলেন, পণ্ডিতের থেকে সৈনিক হিসেবেই ওঁকে বেশী ভালো লাগবে।

ইয়াগো। [জনান্তিকে] হাতে হাত দিয়ে ওকে ধরছে ; আবার চুপিচুপি কথা, বহৎ আচ্ছা ; এইটুকু মাকড়শার জালে কেসিওর মত বেড়ে মাছিটাকে আমি জড়াব। ওর দিকে চেয়ে কিক কিক করে হাসা হচ্ছে, বেশ, চালাও ; তোমার

কেতা দিয়েই তোমাকে বাঁধছি : যা বলব, ঠিক, খুব খাঁটি কথা। এই ধরণের কেতার ঠেলায় অবশ্য কৌজদারীটা বলে যায় যদি, তাহলে অত ঘন ঘন নিজের তিন আঙুলে চুমু না খেলেই পারতে, অথচ আমার কারবার এই সুযোগটা নেবার জন্যে এখনো ঘুরিয়ে রয়েছে : ভালো, ভালো, যেতে চুমু চালাচ্ছ, বাসা ভরতা ; বাঃ বাঃ : আবার, নিজের আঙুলগুলো আবার ঠোঁটে ঠেকান হচ্ছে ? তোর জন্যে ওগুলো বিষের নল হল না কেন ? ……[পূর্বগতি] দূর, দূর আসছেন, তাঁর পূর্বগতি আমি জানি।

কেসিও। বাস্তবিক তাই।

ডেসডিমোনা। দেখা করে অভ্যর্থনা জানাই, চলুন।

[ওথেলো ও অনুচরগণের প্রবেশ।]

কেসিও। ওই তিনি আসছেন।

ওথেলো। আমার বীরাঙ্গনা !

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম ওথেলো আমার।

ওথেলো। তোমাকে আমার আগে এইখানে দেখে
অতিভূত আনন্দে বিস্ময়ে আমি : কী আনন্দ আজ।
যদি প্রতি তরঙ্গ নেমে আসে শান্তি এমনই মধুর
আসুক তুফান তবে মৃত্যু জেগে না ওঠা অবধি,
উঠুক বাতাস ভরা কৈলাস শিখর সম
সাগরচূড়ায়, তারপর ঝাঁপ দিক পতীর অতলে,
স্বর্গ থেকে পাতালে যেমন। এ মুহূর্তে মৃত্যু হলে
এই মুহূর্তই হ'ত চূড়ান্ত সুখের, কারণ আমার ভয়,
এই যে চরম সুখে এ হৃদয় ভরপুর,
অজানা অদৃষ্টে আর এ সুখের আনন্দের
নেই বুঝি দ্বিতীয় দোসর।

ডেসডিমোনা। বলো না, বলো না ও কথা,
আমাদের ভালোবাসা সুখ-শান্তি দিনে দিনে উঠুক ফুলের মত ফুটে।

অথেলো। তাই কর, হে কল্যাণময়!
আমার এ আনন্দ প্রকাশের আর ভাষা নেই,
সব কথা ভেসে যায়, অসম্ভব এই হর্ষ-সুখ :
এই, এই, এইভাবে আমাদের মূলধন যখন
একমাত্র স্বপ্নভূমে থাকবে নিয়ত। [চুম্বন]

ইয়াগো। [জনান্তিকে] এখন দুজনে দেখছি একসুরে বাঁধা,
আমি যদি আমি হই, সুয়েলা ও তারটাকে
দিচ্ছি আলগা করে।

অথেলো। এস, চল প্রাসাদে যাই।
বন্ধুগণ, সুখবর, যুদ্ধ শেষ, তুর্কীরা ডুবেছে।
এ দ্বীপের পুরনো বন্ধুরা সব কে কেমন আছে?
মন্ত্রিপত্নী, তোমাকেও সাইপ্রাস সাদরে নেবে।
পেয়েছি গভীর প্রেম তাদের ভেতরে : ও আমার প্রিয়া,
অবান্তর কী বলে চলেছি, নিজেরই আনন্দ নিয়ে
হয়েছি নিজেই বশ : অনুরোধ, ভদ্র ইয়াগো,
জাহাজঘাটায় যাও, আমার জিনিসপত্র আনবে নামিয়ে।
কাপ্তেনকে সঙ্গে এনো বন্দর কেল্লায়;
লোকটি খুবই ভালো, তার দক্ষতার জন্যে
সত্যিই সে প্রশংসার পাত্র : এস, ডেসডিমোনা,
আবার তোমাকে বলি, মধুময় এ মিলন সাইপ্রাসে।

[ইয়াগো ও রোডারিগো ছাড়া আর সবার প্রস্থান]

ইয়াগো। এখুনি আমার সঙ্গে জাহাজঘাটায় দেখা ক'রো। এদিকে এস। যদি তোমার সাহস থাকে,—না থাকলেও তা হবে, লোকে বলে, প্রেমের দরায় অপদার্থ লোকদেরও স্বাভাবিক স্বভাবকে ছাপিয়ে মহৎভাবের একটা দ্যুতি বেরুতে থাকে।—শোন যা বলি! কৌজদার আজ রাতে দিপাই-কাঁড়িতে পাহারায় থাকছে : প্রথমেই তোমাকে বলা দরকার, ডেসডিমোনা সরাসরি ওর প্রেমে পড়েছে।

রোডারিগো। ওর সঙ্গে? না, না, কিছুতে সম্ভব নয়।

ইয়াগো। এইভাবে আড়ুদে মুখ ঢেকে যা বলি প্রণিধান কর। মনে রেখো, ওই মেয়ে মুরকে প্রথমটায় কী প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসে। সে-ভালোবাসা কিসের জন্যে?—শুধুমাত্র লম্বা লম্বা বুলি আর উদ্ভট উদ্ভট মিথ্যে কথার জন্যে। তুমি কি মনে কর, এই মেয়ে এখনো ওই সব বাজে কথার ছলে ওকে ভালোবাসবে? এ সব কথা তোমার বিবেচনার মধ্যেও আসবে না। আসবে, তার চোখের খোরাক চাই-ই চাই, আর ওই ভূতটাকে দেখে সে কী আনন্দ পেতে পারে বল? ভোগ করতে করতে রক্ত যখন ফিকিয়ে পড়ে, তখন আবার তা জাগিয়ে তুলতে, অরুচির জায়গায় নতুন রুচি ফিরিয়ে আনতে, দরকার চেহারার রমণীয়তা, রূপ আর যৌবনের সামঞ্জস্য; মুর-এ এর সবগুলিরই অভাব: এখন এইসব একান্ত প্রয়োজনের অভাবে ওই নারীর সেসব রমণীয়তা নিত্য ক্ষুণ্ণ হবে, তার কাছে মুর হয়ে উঠবে ঘৃণ্য, ভয়াবহজনক, অসহ্য। তখন নিজের থেকেই সে বুঝতে পারবে, তাই কেন, বাধ্য হবে আরেক জনকে দোসর নিতে। অতএব, মহাশয়, এই অবস্থা যদি মেনে নেওয়া যায়—অবশ্য দেখতেই পাচ্ছ, অবস্থাটা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সরল—তাহলে এই সৌভাগ্য লাভের যোগ্যতা কেসিওর চেয়ে আর কার বেশী? অত্যন্ত বিশ্বাসী ধূর্ত, যার চক্ষুলজ্জা ঠিক ততটুকু যতটুকু ভব্যতা-সভ্যতার বাইরের আবরণটুকু বজায় রেখে তার গোপন লালসা ভালোভাবে চরিতার্থ করা যায়; সুযোগ-সন্ধানী—যেমন চতুর তেমনি ধড়িবাজ; সত্যিকারের সুযোগ না এলেও তার এমন চোখ যে জাল সুযোগ তৈরি করে নিতে পারে। এ ছাড়া লোকটা দেখতে সুন্দর, বয়সে কাঁচা, নিরীহ আনাড়ি মন যা চায় সবই তার আছে; সামাজিক আর লোকটা একটা এবং এরই জন্যে এই ব্যক্তি ওই নারীর মনে লেগেছে।

রোডারিগো। ও মহিলা সম্পর্কে আমি এসব কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, যা কিছু ভালো তারই ভেতরে আছে।

ইয়াগো। ভালো না ছাই! যে মদ সে খায় তা আঙুরেই তৈরি: যদি সে সত্যিই ভালো হত তবে মুরকে সে কখনো ভালোবাসতে পারত না। দেখলে না লোকটার হাতের পাতা নিয়ে কি রকম খেলা করছিল?

রোডারিগো। তা বটে, তবে তা নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে।

ইয়াগো। লাম্পট্য, লাম্পট্য, আমার হাতের দিব্যি: কুচিন্তা ও কামুকতার ইতিবৃত্তে এ সূচনা ও প্রস্তাবনা: ঠোঁটে ঠোঁটে তারা এত কাছাকাছি এসেছিল যে তাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে আলিঙ্গন হয়ে গেছে। যখন এই ধরণের আদানপ্রদান শুরু করতে থাকে তখন আসল কাজের, মানে, দেহগত মিলনের বেশী দেরি হয় না। যাই হোক, আপাতত আমার কথা শুনে চল, খেয়াল রেখো, আমিই তোমাকে ভেনিস থেকে আনিয়েছি: আজ রাতে পাহারায় থাকবে, যা কিছু নির্দেশ দেবার দিয়ে দিচ্ছি। কেসিও তোমাকে চেনে না; আমি তোমার থেকে বেশী দূরে থাকব না। কোনো একটা ছুতো খুঁজে কেসিওকে চটিয়ে দেবে, হয় চীৎকার করে কথা বলে, নয়, তার নিয়মকানুনের দোষ ধরে, অথবা যাতে সুবিধে বুঝবে তাই করে: এর সুফল সময়ে ফলবে।

রোডারিগো। বহুৎ আচ্ছা।

ইয়াগো। শোন, লোকটা বদরাগী, অল্পেই চটে ওঠে, হয়ত তার লাঠি দিয়ে তোমাকে দু-এক ঘা বসিয়েও দিতে পারে; এমনভাবে খোঁচা দেবে যাতে সত্যিই বসিয়ে দেয়, কারণ সাধারণ ওইটুকু থেকেই সাইপ্রাসের লোকগুলোকে আমি খেপিয়ে তুলব; তারা কেসিওকে বরখাস্ত না করা অবধি কিছুতেই শান্ত হবে না। তখন আমি যে উপায় বলে দেব তাতে করে সহজেই তোমার মনের আশা মিটে যাবে; পথের কাঁটাটা দূর হলে এ কাজের সুবিধেই

হবে, তা না হলে আমরা তো সুদিনের আশাই করতে পারি না।

রোডারিগো। এর ফলে যদি সুরাহা হয়, আমি তা করবই।

ইয়াগো। আমি বলছি, হবে; একটু পরে কেয়ার কাছে খোঁজ ক'র: তাঁর বাসগৃহগুলো আবার নামিয়ে আনতে যেতে হবে……তাহলে এখন এসো।

রোডারিগো। তাহলে আসি। [প্রস্থান]

ইয়াগো। কেসিও যে ভালোবাসে ওকে, আমি তা বিশ্বাস করি;
ও মেয়েও তাকে ভালোবাসে, স্বাভাবিক, বিশ্বাসযোগ্য;
মুরকে যদিও আমি সইতেই পারি না,
লোকটা তবুও সৎ, একনিষ্ঠ, মধুরস্বভাব;
আমার যা মনে হয়, ডেসডিমোনার কাছে গণ্য হবে
প্রিয়তম স্বামী বলে: ও মেয়েকে আমিও চাই,
মন শুধু ভোগ করতে, যদিও অবশ্য
ও রকম শুরুপাকে লিপ্ত যে নই তা নয়,
তবে প্রতিহিংসা নিতে কিছুটা তাগিদ আমি,
কারণ এ বিশ্বাস আমার, লম্পট মুরটা আমারই
আসনে বসেছে শুয়ে। এই চিন্তা মনের ভেতরে
বিষাক্ত ধাতুর মত কেবল চলেছে ঘুরে ঘুরে,
কিছুই আমার মনে শান্তি দিতে পারে না, দেবে না,
যতক্ষণ আমি ওর স্ত্রীভাগ্যেও না হই সমান।
তা যদি না পারি, অন্তত মুরকে আমি
প্রচণ্ড ঈর্ষার জ্বালে জড়াব এমন,
ব্যর্থ হবে বুদ্ধি-বিবেচনা; একাজ করার জন্যে
ভেনিসের হতভাগা এই যে লোকটা, যাই-যাই লোভনীয়
রেখেছি লাগামে বেঁধে, যদি চলে শেখানো তালে,
মাইকেল কেসিওকে পাবে আমি আমার বাগেতে,
যা-তা বলে তার নামে লাগাব মুরকে,
কারণ সন্দেহ হয়, কেসিওটা তারীদার আমার সম্যাস,
মুরটা আমাকে দেবে ধন্যবাদ, পুরস্কার, ভালোবেসে

পড়ে যাবে,
যে হেতু প্রকাণ্ড একটা গর্হিত বানিয়েছি তাকে,
এবং নাস্তিতে তার মুখে তার আগুন আদিয়ে
করেছি উন্মাদ : জয়া আছে এইখানে, আসল এখনো ;
শয়তানির আসল রূপ কার্যকালে ছাড়া দেখা যায় না
কখনও।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ঘোষণা পাঠ করতে করতে ঘোষকের প্রবেশ :
পিছনে লোকের ভিড়]

আমাদের মহামহিম মহাপরাক্রম সেনাপতি ওথেলোর অভিপ্রায় অনুযায়ী জানাচ্ছি যে, এইমাত্র কিছু সংবাদ পাওয়া গেছে যাতে জানা গেল তুর্কীবহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে : এই উপলক্ষে প্রত্যেকে তার উৎসবে যোগ দিক ; নৃত্য করুক, মশাল জ্বালিয়ে, যার যে রকম খুশী আমোদ-প্রমোদে মত্ত হন ; কারণ, এই সুসংবাদ ছাড়া, এ উৎসব তাঁর বিবাহ উৎসবও। তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে এই ঘোষণা করা হল। এখন এই পাঁচটা থেকে এগারোটা বাজা অবধি দোকানপাট সরাইখানা সব খোলা থাকবে—কিছুতে কোন বাধা নেই। ভগবান এই সাইপ্রাস দ্বীপের ও আমাদের মহামহিম সেনাপতির মঙ্গল করুন।

তৃতীয় দৃশ্য—প্রাসাদকক্ষ

[ওথেলো, কেসিও ও ডেসডিমোনার প্রবেশ]

ওথেলো। মাইকেল, আজ রাতে পাহারাটা চোখে চোখে রেখো,
তরবারি খাপে রেখে সদলবলে কখন থামতে হয়
আমাদের সেটা খেয়াল রেখো।

কী করা কর্তব্য ইয়াগো নিয়েছে জেনে :
তা সত্ত্বেও আমি নিজে এ ব্যাপারে
রাখব নজর।

ওথেলো। ইয়াগোতে কোন খাদ নেই।
মাইকেল, এখন এসো : কাল যত তোরে পার,
আসবে, আমার কথা আছে। এস, এস, প্রিয়া,
সবদা হয়েছে সারা, কল তার ফলবে এবার,
তোমাতে আমাতে সফলতা হতে কত দেরি আর।
রাত শুভ হোক।

[ওথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান]

[ইয়াগোর প্রবেশ]

কেসিও। এই যে ইয়াগো, চলুন, আমাদের পাহারায় যেতে হবে।

ইয়াগো। সবুর কৌজদার মশাই, এখনই কিসের; এখন তো দশটাই বাজে নি; আমাদের সেনাপতি এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে গেলেন তাঁর ডেসডিমোনাকে পাবার জন্যে : এখনো তো ওঁদের ফুলশয্যাই হয়নি; বাস্তবিক ও মেয়ে দেবতার ভোগের।

কেসিও। অনবদ্য অপূর্ব মহিলা।

ইয়াগো। বাজি রাখছি, ও মেয়ে দারুণ খেলিয়ে।

কেসিও। সত্যি খুব কোমল সরল স্বভাব তাঁর।

ইয়াগো। আহা, কী চোখ। দামামার বাজনার মত যেন খেপিয়ে তোলে।

কেসিও। মন ভোলানো চোখ ঠিকই, তবু মনে হয় যেন লজ্জা।

ইয়াগো। আর কথা?—আহা—একেবারে প্রেম আগানিয়া।

কেসিও। সত্যিই নিখুঁত।

ইয়াগো। আহা, ওঁদের ফুলশয্যা সুখের হোক!.....আসুন কৌজদার, একপাত্তর মদ যোগাড় করে রেখেছি, আর, বাইরে সাইপ্রাসের একজোড়া রসিক নাগর অপেক্ষা করছে, তাদের ইচ্ছে তারা আমাদের কালা ওথেলোর নাম করে একটু সুধা পান করবে।

কেসিও। না থাক ভাই ইয়াগো, আজ রাতটার থাক ; মদ খেলে আমার মাথার ঠিক থাকে না, অল্পেই বেসামাল হয়ে পড়ি : সত্যি ভাই ভাবি, আপ্যায়িত করার জন্যে শিষ্টাচারের অন্য কোন রেওয়াজ যদি চালু হত।

ইয়াগো। ওরা আমাদের বন্ধু : কিছুই না, মাত্র এক পাত্র। না হয় আপনার হয়ে আমিই ঢালিয়ে দেব।

কেসিও। আজ রাত্তিরে মাত্র এক পাত্র খেয়েছি, তাও যেন খানিকটা জল মিশিয়ে, তারই ফলে দেখুন এখানে কি রকম চাপ পড়েছে : এই অক্ষমতাটাই আমার দুর্ভাগ্য, আরও বেশী খেয়ে দুর্বলতাটা বাড়িয়ে দিতে ভরসা হয় না।

ইয়াগো। সে কি মশাই, আজ ফুর্তির রাত, বন্ধুরা সবাই চাইছে।

কেসিও। তারা কোথায় ?

ইয়াগো। এই তো দরজার পাশেই, আপনি একবার নিজে গিয়ে ওদের ডাকুন না।

কেসিও। যাচ্ছি, তবে আমার ভালো লাগছে না। [প্রস্থান]

ইয়াগো। আজ রাতে ইতিমধ্যে যা খেয়েছে তার-ওপর
আরো এক পাত্র যদি কোনক্রমে পারি ঠেলে দিতে,
চেঁচামেচি গালমন্দ এইসা চালাবে,
তরুণীর কুত্তাটা যেন : আর এই পাগলা রোডারিগো,
প্রেমে পড়ে মতিচ্ছন্ন যাকি নেই যার,
ডেসডিমোনার নামে আজ রাতে টেনেছে সে কষে
পুরো এক পিপে, সে আজ পাহারা দেবে :
তা ছাড়াও আছে তিন সাইপ্রাসী খেয়াকী ছোকরা,
ইজ্জৎ রক্ষায় এরা অত্যন্ত সজাগ,
জন্মী এ দ্বীপের এরা সাচ্চা জোয়ান,
মদ ঢেলে তাদেরও আমি রেখেছি তাতিয়ে,
তারাও পাহারা দেবে : এখন এ মাতালের ভিড়ে
কেসিওকে এনে আমি করাব এমন কাজ
যাতে এ দ্বীপের মনে লাগে।

[মোস্টানো, কেসিও ও অন্য অনেকের প্রবেশ]

এখন আসছে তারা :

আমার মতলব যত ফল যদি ফলে
বইবে অবাধে তবে পাল তুলে ঈজানের জলে।
যাইহি, এরই মধ্যে ওরা মিলে আমাকে বেশ খানিকটা
সিসিয়ে দিয়েছে।

মোস্টানো। মোহাই আর একটু ; এক পাঁচের বেশী না,
কৌজীর জবান্।

ইয়াগো। কে আছিস — সরাব !

[গান]

টুং টাং টুং টাং পেয়ালা বোলে
টুং টাং টুং টাং পেয়ালা বোলে
সিপাই সুরুখ রে
জীবন কানুন রে
সিপাই সরাব পিও, পিও তাহলে।

এই ছোঁড়ারা, লে আও সরাব !

কেসিও। বাইরি, আলবৎ গাও।

ইয়াগো। এ গান আমি ইংলণ্ডে শিখি। সেখানকার লোকেরা, হাঁ, মদ খেতে ওস্তাদ বটে ; তোমাদের দিনেমার মদ, তোমাদের জার্মান মদ, তোমাদের ফ্লেমিশ ডলমাজ মদ,—চালাও ভাই, চালাও—এই ইংরেজদের কাছে কিছু নয়, কিছু নয়।

কেসিও। মদ খেতে কি ইংরেজরা এত ওস্তাদ ?

ইয়াগো। নয়ত কি, সে যখন সহজে পাত্রের পর পাত্র ঢালিয়ে যাচ্ছে তখন তোমার দিনেমার তো বেহুঁশ মাতাল ; তোমার জার্মানকে কাহিল করতে তার কপাল একটু ঘামেও না ; তার আরেক পেয়ালা ভর্তি করার আগেই তো তোমার ডলমাজটা বমি করে মরছে।

কেসিও। আমাদের সেনাপতির নামে।

মোস্টানো। কৌজদার, আমিও আছি ; কথা দিচ্ছি, মাত্রা ছাড়াব না।

ইয়াগো। ও আমার ইংলণ্ডরে!

[গান] ঈজিয়ান রাজা কী মাতোয়ারা,
পাহাড়মাতে হু আনা যায় লাগে;
রাজা ভাবেন হু আনা যায় আমরা,
তাকাত বলে ভাঙেন দর্জিটাকে,
কেউকেটা লোক জানে সবাই ওঁকে,
আর তুমি তো হাড়হাবাতে চাষা,
দেশের পতন হয় সেযাকি জাঁকে,
ছেঁড়া কানিত পর ছেঁড়াই খাসা।

কই হে, সে আও সরাব।

কেসিও। মাইরি, ওটার চেয়ে এটা বহৎ সহৎ আচ্ছা।

ইয়াগো। আরেকবার শুনবেন?

কেসিও। না:, যে এইসব কাজ করে তাকে আমি একটা অপদার্থ মনে করি। যাকগে, ভগবান ওপরে আছেন; কোন কোন আত্মা ঠিক তরে যাবে, কোন কোন আত্মা কিছুতেই তরবে না।

ইয়াগো। সাচ্চা বাত, কৌজদার সা'ব্।

কেসিও। আমার কথা বলতে গেলে—না, না, সেনাপতি হলাইকে বা সম্রাজ্ঞী ডেসডিমনাকে তাচ্ছিল্য করছি না কিন্তু,—আশা করি, আমিও তরে যাব।

ইয়াগো। কৌজদার, আমিও আশা করি।

কেসিও। তা বেশ, তবে একটা কথা, আমার আগে নয়; কৌজদারের সদগতি নিশ্চয় পতাকীর আগে। এসব কথা এখন থাক, এবারে কাজের কথা; ভগবান আমাদের সব পাপ ক্ষমা করুন। ভদ্রমহোদয়গণ, এবারে কাজে লাগা যাক। ভদ্রমহোদয়গণ, ভাববেন না আমি মাতাল হয়েছি; এ আমার পতাকী, এটা আমার ডান হাত, এটা আমার বাঁ হাত: দেখছেন, এখনো আমি মাতাল হইনি; এই দেখুন, ঠিক ঠিক আমি দাঁড়াতে পারছি, ঠিক ঠিক জিব'র কথাও বলতে পারছি।

সকলে। বাঃ বাঃ, বড়ো বড়ো।

কেসিও। বেশ, তাই ভালো; আপনারা কখনো ভাববেন না কিন্তু, আমি মাতাল। [প্রস্থান]

মোন্টানো। চলুন ঘরের ভিতরে; দাম্পত্যের মোতায়েন করা দরকার।

ইয়াগো। এই যে লোকটা গেল যেমনটি আপনি
সীজারের সমকক্ষ সৈনিক হিসেবে, তার মত
দক্ষ সেনাচালনায় : এই লোকে যেমন কী দোষ,
গুণের পাশেতে দোষ ঠিক যেন ক্রান্তিপাত,
দিন রাত সমান সমান : দুঃখ হয় ওর জন্যে,
ভয় হয়, ওর'পরে ওথেলোর আছে যে বিশ্বাস,
বুঝি তাই ওর কোন, অসতর্ক দুর্বল সময়ে
এ দ্বীপ টলিয়ে দেয়।

মোন্টানো। ওর কি প্রায়ই এই দশা?

ইয়াগো। নিয়ত ঘুমের জন্যে তার এই প্রস্তাবনা :
ঘুমঝা ঘড়ির কাঁটা ঘুরে যাবে যেখনে সে জেগে,
মদ যদি না দোলায় ঘুমে।

মোন্টানো। ভালো হত
সেনাপতিএ ব্যাপারে অবহিত হলে।
হয় তাঁর নজরে পড়ে না, নয়, সৎপ্রকৃতি তাঁর
অধিক মর্যাদা দেয় কেসিওর গুণগুলোকেই,
দোষগুলি আদলে আনে না : এ কথা সত্যি না?

[রোডারিগোর প্রবেশ]

ইয়াগো। [জনান্তিকে] কি খবর, রোডারিগো?
বলি শোন, কৌজদারের পিছেতে যাও, চটপট।

[রোডারিগোর প্রস্থান]

মোন্টানো। বড়ই দুঃখের কথা, মুর মহাশয় তাঁর
নিজ সহকারী পদ দিলেন এমন জনে
দুর্বলতা যার মজ্জাগত :
আমাদের দিক থেকে মুরকে একথা বলা
খুবই সঙ্গত।

ইয়াগো। এ দীপ দিলেও আমি এ কাজে নারাজ :
কেসিওকে খুনি ভালোবাসি, বরং সাধ্যমত
[নেপথ্যে চিৎকার : "বাঁচাও, বাঁচাও"]
তার এই দোষটা ছাড়াব :—কিন্তু ওকি, কিসের চিৎকার ?
[রোডারিগোকে ঠেলতে ঠেলতে কেসিওর পুনঃ প্রবেশ]

কেসিও। পাজি, বদমাস্ কাঁহাকা !

মোন্টানো। কি ব্যাপার, ফৌজদার ?

কেসিও। ব্যাটা আমাকে কর্তব্য শেখাচ্ছে। মারতে মারতে ভূলোধূনো করে ছাড়ব।

রোডারিগো। আমাকে মারবেন ?

কেসিও। আবার কথা, বেল্লিক কাঁহাকা !

[রোডারিগোকে প্রহার]

মোন্টানো। ফৌজদার জনাব ; কি করছেন, ছেড়ে দিন।

কেসিও। হাটুন বলছি, নইলে ওই খুলিটা দেব কাটিয়ে।

মোন্টানো। শান্ত হন, আপনি মাতাল হয়েছেন।

কেসিও। মাতাল ?

[উভয়ে যুদ্ধরত]

ইয়াগো। [রোডারিগোকে জনান্তিকে]
যাও যাও, শীঘ্র যাও, বিদ্রোহের খবর রটাও।

[রোডারিগোর প্রস্থান]

থামুন, থামুন ফৌজদার : ভগবান যা করেন, ও জনাব,
কে আছ, বাঁচাও !—ফৌজদার,—ও জনাব,—মোন্টানো,—
বাঁচাও, বাঁচাও,—কী সুন্দর পাহারা চলেছে,

[ঘণ্টার শব্দ]

কে আবার ঘণ্টাটা বাজাল ?—কোন শয়তান……
শহর উঠবে জেগে ; ভগবান যা করেন, ফৌজদার,
থামুন, থামুন,
চিরতরে বেইজ্জৎ হবেন শেষটা।
[সশস্ত্র নাগরিকদের সঙ্গে ওথেলোর প্রবেশ]

ওথেলো। কি ব্যাপার চলছে এখানে ?

মোণ্টানো। রক্তে ভেসে যাচ্ছি,
দারুণ আঘাত, উঃ, মরো সেলাম।
ওথেলো। বাঁচতে চাওতো থামো!
ইয়াগো। থামুন, থামুন,
কৌজদার,—সা'ব,—মোণ্টানো,—মশাই,—
জ্ঞান কাল কর্তব্যের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে?
সেনাপতি কথা কইছেন। লজ্জা নেই? থামুন, থামুন!
ওথেলো। কী এ কাণ্ড, কী ব্যাপার! কী থেকে এ সূত্রপাত?
আমরা কি বনেছি তুর্কী, তুর্কীরা যা থেকে আজ
বিধাতার অভিপ্রায়ে, আমরা নিজে করছি তাই?
খৃষ্টানী লজ্জা থাকলে আজ কর বর্বর বিবাদ;
এরপরে যে নড়েছে ক্রোধে বজ্র হবে,
তার কাছে জান্ সস্তা: নড়েছে কি মরেছে সে;
প্রত্যেকের ঘণ্টাটা থামাও, এ দ্বীপের শান্ত পরিবেশ
হচ্ছে আতঙ্কিত: কী হয়েছে তোমাদের?
সাধু ইয়াগো, দেখছি দুঃখে শোকে ম্রিয়মান তুমি,
বল, শুরু কে করেছে? দাবি করছি ভালোবাসা বলে।
ইয়াগো। কিছুই জানি না আমি, এইমাত্র বন্ধু তারা, সবে
যে যার কর্তব্যে রত, এত মিল মরমে মরমে
শয্যায় বিবস্ত্র হবে, আর এ মুহূর্ত মধ্যে
যেন কোন গ্রহদোষে কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল,
খোলা তলোয়ার হাতে, এ ওর বুক লক্ষ্য করে'
রক্তাক্ত বিরোধে রত। বলতে পারি না আমি
নির্বোধ এ বিবাদের কোথা সূত্রপাত:
ভালো হত, যদি কোন সংগ্রামে গৌরবে
হারাতাম পা দুখানা, এনেছে যা আমাকে এখানে।
ওথেলো। কি করে, মাইকেল, তুমি নিজেকে এতটা ভুললে?
কেসিও। আমাকে করুন ক্ষমা, বলতে পারব না।
ওথেলো। সুযোগ্য মোণ্টানো, তুমি স্বভাবত শিষ্টভদ্র আমি,
তোমার যৌবনধর্মে প্রশান্ত গাম্ভীর্যভরা

সুবিদিত সকলের কাছে ; অতি সূক্ষ্ম বিচারেও
অভিযুক্ত হবার তোমার : তুমি বল কি হয়েছে,
যাতে তুমি এইভাবে সুযশ বিদিয়ে দিচ্ছ,
সুনাম ঘুইয়ে দিয়ে কিনতে চাইছ তুমি
রাতের শুশ্রূষা নাম ? কথার জবাব দাও।

যোশীনো। সুযোগ্য ওথেলো, সাংঘাতিক জখম আমি,
আপনার কর্তব্যরীতি ইয়াগো জানাবে আপনাকে—
ততক্ষণ চুপ করে থাকি, কথা বলতে ভয় হচ্ছে—
জানাবে আমি যা আমি : তাছাড়া জানিনা আমি
আজ রাতে আপত্তিকর বলেছি বা করেছি কিছু,
যদি না নিজের চিন্তা কখনো অধর্ম হয়,
এবং নিজেকে রক্ষা আক্রান্ত হবার পর
পাপ বলে গণ্য হয়।

ওথেলো। এখন, ঈশ্বর সাক্ষী
রক্তের শাসনে জেগে সুপ্ত হচ্ছে সংযম আমার,
রুদ্র রোষ আমার বিচারবুদ্ধি ঠেলে ফেলে
চালাচ্ছে আমাকে। একবার যদি নড়ি,
কিংবা শুধু তুলি হাতখানা, তোমাদের মধ্যে সেরা
এক ঘায়ে সোটাবে মাটিতে : ঈশ্ব জানাও বলছি
এই হীন বর্বরতা কিসে শুরু, কে এই নাটের গুরু,
এবং এ দোষে যে দোষী বলে প্রমাণিত হবে,
যদি এক লগুহাত আমার ঘনছ হয় শুধু
আমাকে সে হারাবে নিশ্চিত : এ কী, মুছিটই এ নগর,
এখনো বিভ্রান্ত, জনসাধারণ ভয়ে বিশাহারা ;
এর মধ্যে নিজেদের ব্যক্তিগত ঘরোয়া বিবাদ,
তাও রাতে এবং শান্তিরক্ষীর শিবিরে ?
পৈশাচিক এ সব। ইয়াগো, কে করেছে শুরু ?

যোশীনো। বন্ধুতা খাতিরে কিংবা চাকরি মোহাই দিয়ে,
যা সত্য তার চে' যদি বলেন বেশী বা কম,
তা হলে সৈনিক নন।

ইয়াগো। ধাতে যা দেবেন না এতটা,
মাইকেল কেসিওর মনে আঘাত হেনার আগে
ধরুক এ রসনাটা ছিঁড়ে ফেলব এ মুখ থেকে :
তথাপি এ বিশ্বাস আমার, সত্য যদি বলি
ওঁর প্রতি অন্যায় হবে না। সেনাপতি ঘটনাটা এই :
আমাতে ও মোন্টানোতে দুজনে ছিলাম কথা,
হঠাৎ সেখানে এল একজন 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে,
কেসিও পেছনে তার মারমুখো তলোয়ার হাতে
হানতে উদ্যত তাকে : মহাশয়, তখন এ ভদ্রলোক
কেসিওর কাছে গিয়ে শান্ত হতে অনুরোধ করে ;
আমি আর্ত লোকটার দিনু ধাওয়া করি,
পায়ে তার চিৎকারে,—অবশ্য ধরণও তাই—
শহরটা তবে জেগে ওঠে ; ক্ষিপ্রগতি সে আমার
উদ্দেশ্য করল ব্যর্থ ; মনে হল ফেরাই উচিত,
কারণ কানেতে এল অস্ত্রের ঝনঝনা আর ঘাত প্রতিঘাত,
সেই সঙ্গে কেসিওর দাপাদাপি চিৎকার, এ রাতের আগে
এ রকম কখনো শুনিনি। যখন এলাম ফিরে—
অল্পক্ষণই গিয়েছে এ তো—দেখলাম দুজনেই
নিদারুণ যুদ্ধে রত ; সেই ভাবে ছিল তারা
যখন আপনি এসে তাদের ছাড়িয়ে দেন।
এর বেশী আর কিছু আমার বলার নেই,
তবে মানুষ মানুষই, খুশিও তো মতিভ্রম ঘটে :
এঁর প্রতি কেসিও যদিও করেছেন কিছুটা অন্যায়,—
রেগে গেলে পরম বন্ধুকে লোকে তো আঘাত করে,
আমার বিশ্বাস তবু, পলাতক লোকটার কাছে
কেসিও এমন কোন পেয়েছেন অদ্ভুত আঘাত,
যা যায় না সহ্য করা।

ওথেলো। ইয়াগো বুঝেছি আমি,
ভালোবেসে সততায় ব্যাপারটা হাল্কা করে
কেসিওকে বাঁচাতে চাইছ। কেসিও,তোমাকে ভালবাসি,

তথাপি আমার কাছে তোমার কাজের এই দেষ।

[সহচরীদের সঙ্গে ডেসডিমোনার প্রবেশ]

ছেড়ে দেব প্রেয়সীকে শয্যা থেকে কে এনেছে তুলে!
তোমাকে নমীয় করব।

ডেসডিমোনা। কেন, কি ব্যাপার হল?

অথেলো। সব ঠিক হয়ে গেছে প্রিয়া; ফিরে চল আপন শয্যায়:
তোমার ও কতগুলো আমিই চিকিৎসা করব;
নিয়ে যাও ওকে। [মোণ্টানোকে নিয়ে যাওয়া হল]
নগরের সর্বত্র, ইয়াগো, সতর্ক দৃষ্টি রেখো,
শান্ত ক'রো এই নীচ হটগোলে যারা উত্তেজিত।
এসো ডেসডিমোনা: সৈনিকের এই তো জীবন
বিরোধে বিষাদে তার সুখনিদ্রা ভাঙে ক্ষণে ক্ষণ।

[ইয়াগো ও কেসিও ছাড়া আর সবার প্রস্থান]

ইয়াগো। কৌজদার, জখম হয়েছেন নাকি?

কেসিও। হয়েছি, এ জখমের চিকিৎসা নেই।

ইয়াগো। সর্বনাশ, সে কি!

কেসিও। সুনাম, সুনাম, সুনাম, আমার সুনাম আমি খুইয়েছি! আমার অমর অংশকে আমি খুইয়েছি, যা আছে তা পশু; ইয়াগো, আমার সুনাম, আমার সুনাম!

ইয়াগো। আমি সাদাসিধে মানুষ, ভেবেছিলাম দেহে কোন আঘাত পেয়েছেন বুঝি, সুনামের চেয়ে ওতে অন্তত লাগে বেশী; সুনাম তো একটা চাপানো কথা—যেমন যাকে তেমনি জুটে, প্রায়ই তা বিনা যোগ্যতায় আসে আর বিনা কারণে চলে যায়। আপনি একটুও আপনার সুনাম হারান নি, যদি না তা হারিয়েছেন বলে মনে করেন। মাথা ঝাঁকাচ্ছেন কেন, সেনাপতির মেজাজকে গড়ার উপায় তো রয়েছে: আপাতত আপনি তাঁর বেয়াদবের খপ্পরে পড়েছেন; এ শাস্তির চেয়েও যতটা বিষের আছে তার চেয়েও বেশী আছে একটা চাল; অনেকটা যেমন আমেন, যদিও আজি দিবসকে তব

দেখাবার জন্যে নিরীহ মুরগিকে ধরে যেমন মায়া লাগান হয়, তেমনি। আমার ওঁর হাতে পায়ে ধরুন, যেমনেন, গলে গেছেন।

কেসিও। বরঞ্চ ওঁর বিরাগভাজন হবার জন্যই ওঁর হাতে পায়ে ধরব, অমন ভালো সেনাপতিকে এরকম একটা মাতাল রগচটা অপদার্থ কর্মচারীর জন্যে কিছু বলে প্রতারণা করার চাইতে সেও ভালো। আমি মাতাল? মাতাল হয়ে আবোল তাবোল বকেছি? ঝগড়া করেছি? ধরাকে সরা জ্ঞান করেছি? গালাগালি দিয়েছি? নিজের ছায়ার সঙ্গে আজে বাজে কথা বলেছি? বন্ধু তোর কী অদ্ভুত শক্তি, যদি তোর কোন নাম না থাকে, তবে তোর নাম রাখছি শয়তান।

ইয়াগো। সে লোকটা কে, খোলা তলোয়ার নিয়ে যার পিছু ধাওয়া করছিলেন? সে আপনার কী করেছিল?

কেসিও। আমি জানি না।

ইয়াগো। এ কি সম্ভব?

কেসিও। ভালোগোল পাকানো অনেক কিছুই মনে পড়ছে; কিন্তু কিছুই স্পষ্ট নয়; একটা ঝগড়া হয়েছিল, কিন্তু কিসের থেকে কিছুই মনে নেই। হা ভগবান, মানুষ ইচ্ছে করে মুখের ভেতরে কেন এমন শত্রুকে পোরে, যে তার বুদ্ধি সুদ্ধি সব লোপাট করে দেয়; কেন আমরা আনন্দের সঙ্গে ফুর্তি করতে করতে, বাহবা দিতে দিতে নিজেদের জানোয়ারে পরিণত করি!

ইয়াগো। আপনাকে এখন তো বেশ সুস্থ দেখছি: কি করে নিজেকে এখন সামলে নিলেন?

কেসিও। যে হেতু শয়তান মাতলামি শয়তান আক্রোশকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। একটা ত্রুটি আমার আরেকটা ত্রুটিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে, যার ফলে আমার নিজের ওপরেই নিজের বিতৃষ্ণা হচ্ছে।

ইয়াগো। হয়েছে, হয়েছে, আপনি নীতিধারীদের মত বাড়াবাড়ি

করছেন : স্থান, কাল, দেশের হালচাল বিবেচনা করলে অবশ্য এ ঘটনা না ঘটলেই আন্তরিক খুশী হতাম ; তবু, যা হবার যখন হয়ে গেছে, নিজেরই ভালোর জন্যে তা ঠিক করে নিতে হবে তো।

আমাকে আমার কাজে বহাল করতে বললে, তিনি ঠিক বলবেন, আমি একটা মাতাল : আমার হাজারটা খুঁত থাকলেও এ উক্তির সব কটা খুঁতকে ঘামিয়ে দিত। এই হাত যার খুঁড়ি বিবেচনা চমৎকার, দেখতে দেখতে সেই-ই গাড়ল, খানিক পরে আস্ত একটা জানোয়ার হয়ে গেল! প্রতিটি পাত্র অপরিমিত আর পাত্রের তেতরকার জিনিস শয়তান ছাড়া কিছু নয়।

ইয়াগো। তা কেন, ভালো মদ ভালো বন্ধুর মত, অবশ্য পরিমাণে ঠিক রাখলে : মদকে শুধু শুধু আর গালিগালাজ দেবেন না। একটা কথা, ফৌজদার মশাই, আমার মনে হয় আপনি ভাবেন আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।

কেসিও। আমার এই মনে করার যথেষ্ট ভিত্তি আছে। কিন্তু··· আমি মাতাল।

ইয়াগো। আপনি বা যে কোন লোক কোন না কোন সময়ে মাতাল হতে পারে : আপনাকে কি করতে হবে আমি বাতলে দিচ্ছি।·····আমাদের সেনাপতি মশায়ের স্ত্রীই এখন সেনাপতি : এ কথা বলবার এইজন্যে যে, সেনাপতি মশাই এখন তাঁর স্ত্রীর রূপে গুণে অনুরক্ত, বিভোর, মানে, তাই এখন তাঁর ধ্যান জ্ঞান চিন্তা। তাঁকে সব খুলে বলুন, তাঁকে সেবে ধরুন, তিনিই আপনাকে বহাল করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন : তিনি এত ভালো, এত সদয়, এত উদার, এত মধুর তাঁর স্বভাব, যে তাঁকে যতটুকু অনুরোধ করা যায় তার বেশী কিছু না করাটা তিনি দোষের মনে করেন। আপনার ও তাঁর স্বামীর মধ্যেকার এই ফাটলটা জুড়ে দিতে তাঁকেই বলুন,

আমার যথাসর্বস্ব বাজি রাখছি, আপনাদের ভালবাসা
আগের থেকে জোরালো হয়ে উঠবে।

কেসিও। ভালোই পরামর্শ দিয়েছেন।

ইয়াগো। আমার আন্তরিক ভালবাসা ও সন্দেহাতীত সহৃদয়তার
দোহাই দিয়ে বলছি, এই মত চলে যেতুন।
সত্যি, কথাটা আমার মনে লেগেছে; সকালের দিকে
এক সময়ে গুণবতী ডেসডিমোনাকে দিয়ে বলব; যদি
আমি ব্যর্থ হই, মুরের আমার কপালই খারাপ।

ইয়াগো। ঠিক বলেছেন। কৌজদার, তা হলে আসি, আমাকে
আমার পাহারায় যেতে হবে।

কেসিও। যমস্তার, সাধু ইয়াগো।

[প্রস্থান]

ইয়াগো। এর থেকে কে বলবে খেলেছি আমি শয়তানের খেলা,
যখন এ উপদেশ সৎ, শুভ, বিচারবুদ্ধিতে
যথার্থ গ্রহণযোগ্য, এবং একমাত্র পন্থা
মুরের শুদ্ধর জয়ের। কারণ সহজ খুনি,
যে কোন সঙ্গত কাজে ডেসডিমোনাকে
সম্মত করান; দরাজ সে স্বভাবত
আলো জল বাতাসের মত: অতঃপর, তার পক্ষে
মুরকে বশ করা, যদি তার কাম্য হয় খুব
দোজখের কবচ শুদ্ধ, স্বর্গও দিক বিসর্জন,
এ নারীর প্রেমে তার সত্তা এত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা,
মুরকে তাড়াসত্তা তার ইচ্ছার অধীন;
এ নারীর আকাঙ্ক্ষা যেন অমোঘ বিধাতা
মুরের দুর্বল প্রকৃতিতে। তা হলে শয়তান হব কেন,
কেসিওরই ভালোর জন্যে তালে তালে পা ফেলে চলার
পরামর্শ যদি দিয়ে থাকি? নরকের স্বর্গদ্বার আছা।
অতি হীন পাপাচারে শয়তান যখন নিরত,
প্রথমে সে ভান করে পবিত্র কাজের,
যেমন করছি আমি: কারণ এ সাফল্যটা যখন

হতভাগা ফিরে গেতে ডেসডিমোনাকে দুঃখে,
এবং তাহি অন্তে সে নারীও পীড়াপীড়ি করবে মুহূর্তে,
তখন মুহূর্তে কাজে সর্বনাশা এই বিষ ঢেলে দেব আমি,
নিজেরই ভোগের জন্যে ও নারী হবাল তার শত্রু ;
যত বেশী করবে সে ডেসিওর মঙ্গল প্রয়াস
ততখানি হারাবে সে মুহূর্তে বিশ্বাস।
মহিলার গুণগুলো এইভাবে কালি লেপে দেব,
আর তার সততা থেকে গড়ব যে জাল,
সেই জালে সকলে জড়াবে।

[রোডারিগোর প্রবেশ]

কি খবর, রোডারিগো ?

রোডারিগো। আমি শিকারের পেছনে ছুটেছি শিকারী কুকুরের মত নয়,
নেড়িকুত্তাগুলোর মত শুধু ঘেউ ঘেউ করতে। আমার
টাকাপয়সা তো ফুরিয়ে এসেছে, আজ রাতে উত্তম মধ্যম
খেয়েছিও বেশ ; মোদ্দা ফল দাঁড়াচ্ছে, এত কষ্টের বদলে
খুচি কিছুটা পাওনা। অতএব এবারে ভেনিসে ফিরে
যাব কপর্দকহীন পকেট ও কিছু পরিবাগ খুচি নিয়ে।

ইয়াগো। যাদের ধৈর্য নেই কত হীন অসহায় তারা !
ধীরে ধীরে ছাড়া কত লাভে কি কখনো ?
জানো তো খুচি দিয়ে আমাদের কাজ, যাদু মন্ত্রে নয়,
এবং মহুর তাল খুচির সহায়।
কেন, কাজ হচ্ছে না কি ? হ্যাঁ, কেসিও মেরেছে তোমাকে,
এই একটু মেরেছে বলে কেসিওর চাকরিটা গেল।
যদিও সূর্যের তাপে সব কিছু ভাঁপা হয়ে ওঠে
তবুও যে ফল আগে ফলে, আগেই তা পাকে।
আপাতত খুশী থাকো ; কি তাজ্জব, ভোর হয়ে গেল ;
আনন্দ হুল্লোড়ে যেন ঘণ্টাগুলো ঘোড়া হয়ে গেছে।
সরে পড় ; ফিরে যাও তোমার ডেরায় ;
ভাগো, ভাগো, এ বিষয়ে আরও জানবে পরে :
হটপট, যাও, কেটে পড়। [রোডারিগোর প্রস্থান]

কর্তব্য রয়েছে কিছু :
কর্ত্রীকে আমার সিস্টী, বলবে কেসিওর জন্যে
আমি ওকে লাগাচ্ছি একাজে :
এই অবসরে আমি মুরকে আড়ালে রাখি.
আমার গুপ্তচর তাকে যখন সে দেখবে সামনে
কেসিওকে স্ত্রীর সঙ্গে তার। এই ঠিক রয়েছে উপায়,
দেখিতে বা টিলেমিতে কথাটা যা পড় হয়ে যায়।

[প্রস্থান]

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভার

উদয় রায়

সেই 'পরিচয়'-এর উদ্বোধনের দিন থেকে বিষ্ণু দে-র কণ্ঠস্বর আমরা শুনে আসছি। দীর্ঘদিনের সাহিত্যভাষুক যিনি, নানা কারণেই তাঁর মতামত এ কালের সন্ধানীর কাছে তাৎপর্যপূর্ণ। তিন দশক ধরে সাহিত্যের চড়াই-উৎরাই হেঁটে এসে, নানা অপ্রত্যাশিত দুস্তরদলের সঙ্গে নিজের চেতনার যোগবিয়োগের পাল্লারচনার দায়িত্ব যিনি নেন, তিনি প্রাসঙ্গিক কারণেই আমাদের শ্রদ্ধেয়। যে-কোন আলোচনার কথামুখ হিসেবে বিষ্ণু দে এই প্রাপ্য নিশ্চয় দাবী করতে পারেন।

প্রায় এক দশকের ওপারে প্রকাশিত "সাহিত্যের ভবিষ্যৎ"* সম্পর্কে আলোচনায় উদ্যুক্ত হতে গিয়ে প্রথমেই মনে হয় যে এ-গ্রন্থ যে সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আবহ থেকে নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে উঠেছে, চলমান সাহিত্যে তার কোন রেশ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই যথার্থ প্রেক্ষাভূমি ছাড়া এই গ্রন্থের বিচার সম্ভব নয়। অথচ লেখক এই তাৎকাল্যকে সংকেতিত করেছেন, সংযুক্ত করেছেন—তাই দশ বছর আগে যে আলোচনাগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের নানা গোষ্ঠীচক্রে ঢেউ তুলেছিল, আজ তা নিষ্পন্দ। প্রত্যাশিত পরিণতি এটা নয়—যদিচ এই 'প্রস্তাব'গুলির নানা প্রস্তাবে বহু মূল্যবান ইঙ্গিত, চিন্তার নিজস্ব, চর্চার নিষ্ঠা ও কৌলীন্য সম্পর্কে আন্তরিক সমর্থন মেলে, শুধু কয়েকটি মৌলিক কারণে এই শুভসংকেতগুলি প্রকীর্ণ থেকে গেছে।

এই মৌলিক প্রশ্নের কয়েকটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার যোগ্য।

"সাহিত্যের ভবিষ্যৎ"-এর একাধিক প্রস্তাব উৎসারিত হয়েছে নানা আলোচনার সংঘাতে-প্রতিঘাতে। তাঁর বিরুদ্ধী সমালোচকদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ প্রত্যুত্তরের রেশটুকু এখানে দৃশ্য। ঠাণ্ডা-যুদ্ধের আবহাওয়া থেকে মন কিছুতেই মুক্তি পায় না। মাঝে মাঝে তাঁর স্বগত কবিকণ্ঠ শোনা যায় বটে,—কিন্তু কবিকে আড়াল করে যোদ্ধার উল্লাস, সত্যের সাধিষ্ঠানে আসে মন্তব্যের ধারধেয়ালীপনা। দেশীবিদেশী নানা সাহিত্যে বেদ্ধাবিহার, বহুদূরী

* সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। বিষ্ণু দে। দিগন্ত প্রেস।

বিষয়চর্চা—প্রত্নতত্ত্ব, মৃত্তত্ত্ব, চিত্রশিল্প, সংগীত, দর্শন-বিজ্ঞান—আধুনিক মনন-সাধনার কোন আয়োজনের এতে অভাব নেই। তবু মূল্যমান-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে লেখক কোন নির্দিষ্ট আয়তন সৃষ্টি করতে পারেন নি। "সাহিত্যের ভবিষ্যৎ"-এর পাঠক তাই বিস্ময় লক্ষ্য করবেন যে কোন প্রবল একমুখী সাহিত্যদর্শনের অভাবে নানাচারী আহরণ বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। টেবল-টকের মেজাজে যে-গুলো অলংকরণ,প্রস্তাব রচনায় অনেক ক্ষেত্রেই তাকে মনে হয় আবরণ। ক্রতুবী বাঙ্গের ঝিলিক মাঝে মাঝে মুগ্ধ করে, গলদশ্রু রবীন্দ্র-উদ্ধৃতিও বার বার চোখে পড়ে, কয়েকটি ইতস্ততঃ 'quips'-এ আমরা আক্রান্ত হই, সুন্দর কয়েকটি 'ব্যাসকূট' আমাদের উদ্বেলিত করে—কিন্তু সব মিলিয়ে কোন অখণ্ড সাহিত্যপ্রত্যয় উদ্ভাসিত হয় না। সাহিত্যাচার বা সাহিত্যসমাজ সম্পর্কে বিষ্ণু দে-র অনেক মন্তব্য বা সুদূরভেদী শুচিশীল—কিন্তু এই প্রকীর্ণ উপকরণগুলোর মধ্যে যোগসূত্র কোথায়? সব মিলিয়ে মনে হয় tantalizing fragments.

২

একদা 'প্রগতিসাহিত্যের আলোচনা'-র নামে যে কাব্যপাহাড়ী বিক্রম জেগে উঠেছিল, ঐতিহ্যের ধ্বনিভূমি সৃষ্টি করে ইতিবাদী সাহিত্যবিচার সেদিনের সংগতিকর্মীর পক্ষে যে দুর্লক্ষণ ও দুর্যোগ সৃষ্টি করেছিল—"সাহিত্যের ভবিষ্যৎ"-এর একশ্রেণীর প্রস্তাবে বিষ্ণু দে তারলক্ষভাবেই তাদের আঘাত করেছেন। একাধিক প্রবন্ধের বহু প্রাসঙ্গিক উক্তিকে আপাতদৃষ্টিতে নিরুদ্দেশ মনে হলেও, যথাযথ উৎসন্ধানের পর একটি প্রেক্ষিত জেগে ওঠে। "সাহিত্যের ভবিষ্যৎ"-এর প্রেক্ষিত হিসেবে একে গ্রহণ করা চলে—'মার্কসবাদী'-সংকলন এবং 'পরিচয়' পত্রে প্রগতি সাহিত্যের মূল্যমান-সন্ধানের ঘনঘটার দিনে সেদিন সাহিত্যের যাত্রারী মূল্যের কথা যাঁরা বলেছেন, তাঁরা 'তৃতীয় শিবির' আখ্যা পেয়েছেন, বিষ্ণু দে-র 'তৃতীয় পক্ষীয়' ছদ্মবেশের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল 'বাংলাসাহিত্যের কয়েকটি ধারা' (মার্কসবাদী), প্রকাশ রায়ের যাযাবরী বিপ্লববাদকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন 'চোরা সন্তোষবাদ', আবার মানিকবাবুকে শ্রেণীনিরপেক্ষ সাহিত্যের প্রবক্তা হিসেবে যথেষ্ট তিরস্কার করা হয়েছে, রবীন্দ্র শুদ্ধর প্রলয়ংকরী সাহিত্যবিশ্লেষণের একবাক্স নিরিখ হয়েছিল 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামাত্মক

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মপ্রয়াস,' বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মূল্য আসনে হতোম-দীনবন্ধুর স্থান নির্দেশ করা হয়েছিল।

এই বক্তব্যে বিষ্ণু দে যে যানাস্থানে ব্যঙ্গ করেছেন, এদের মূল্যমান সম্পর্কে স্বভাবতঃই প্রশ্ন তুলেছেন, সাহিত্যসমাজের নানা দলাদলি সম্পর্কে যথাযোগ্য মানক খুঁজেছেন। 'সেই রকম কয়েকবছর ধরে পরিচয় ও কয়েকজন প্রগতি-লেখকদের মধ্যে মাঝে মাঝে যে অসহিষ্ণু দলীয়তা দেখে এসেছি, তার ফলেই বার্গসিঁর সমর্থন ওঁরা করে থাকুন, সেও একটা লাগসই ভ্রম, তারাই নাকি অসাধারণ, তাঁরাই প্রগতি আর সবাই এক বিরাট প্রতিক্রিয়াশীল পিণ্ড' (পৃঃ ৫১) অথবা কুদ্ধ মন্তব্য "মার্কস্‌বাদী এখনও সাহিত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেয়তো দেন নি, কবিতা তিনি অসম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করেন, ছলকথায় জগৎ ওঁর ছক থেকে বাদ যেন,...নিছক মার্কস্‌বাদীরা আবার আলোচনার নেমে কটুকাটব্য গালিগালাজকে উদ্ধৃত করেন, বোধের ও জ্ঞানের অভাবকে ঢাকেন 'অন্ধের আত্মস্তরিতায়' (পৃঃ ৭২)।" মার্কস্‌বাদী সাহিত্যবিচার সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, "একদা মার্কস্‌বাদীর মনে হয় শেষের কবিতাকে মূল্যবান, কারণ তাতে শ্রেণীর দ্বন্দ্বে শ্রেণ বার্থ...এমনিতর একটা সাহিত্য তথা শ্রেণীব্যাখ্যার ভ্রান্তিবিলাস"—এর দ্বারা বোঝা যায়, লেখক তৎকালীন মার্ক্সীয় সাহিত্য-সমাজ বা বিশেষ সাহিত্যপ্রত্যয়ে আস্থাবান নন। সুতরাং তাঁর পক্ষে স্বৈরতঃ অ-মার্কস্‌বাদী হওয়ার অন্তরায় নেই। কিন্তু সেই নিঃসঙ্গ পথে যাত্রিক হওয়ার জন্য যে 'অন্তঃপ্রেরিত মানুষ' (inner-directed man) হওয়া চাই, বিষ্ণু দে তা নন। 'রোম যেদিন থাকব, অথচ রোমান হব না'—এই মোহ দুর্জয়। সংঘ ও ব্যক্তি, শ্রেণী ও মানুষ, ইত্যাদি মৌল-প্রশ্ন অগ্রাহ্য করেও বিষ্ণু দে 'মার্কস্‌বাদী'। মার্কস-এঙ্গেল্‌স থেকে তিনি যথেচ্ছ উদ্ধৃতি দেন—কিন্তু মার্কস্‌বাদী-লেনিনবাদী সাহিত্যবিচারের অনেক মর্মগত প্রশ্ন (—যেমন শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বা শ্রেণী-সম্পর্কের প্রশ্ন, সংঘ-সাহিত্য ও উচ্চমার্গ সাহিত্যের সম্পর্ক) তিনি অস্বীকার করেন। এই 'পারাডক্স' বড় কৌতুককর।

যদি তর্কের খাতিরে আমরা ধরে নিই যে বিষ্ণু দে মার্ক্সীয় সাহিত্য-বিচারে সরলীকরণ, অসতীর পরিক্রমা, যান্ত্রিকতা প্রভৃতি সম্পর্কে স্বাভাবতঃ বৈরী, এবং 'বিশুদ্ধ মার্ক্সীয়' দৃষ্টিই তাঁর কাম্য, তাহলে তাঁর 'সাহিত্যের স্বাধীনতা'-র ও 'রাষ্ট্রশাসনের'-কল্পনা আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? বিষ্ণু দে 'জ্ঞানের সমাজতত্ত্বে' (Sociology of Knowledge-এ) বিশ্বাস

করেন, কারণ "সাহিত্যের ভবিষ্যৎ"-এর একাধিক প্রস্তাবে 'বৈজ্ঞানিকমনা বোঁক', এবং 'ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রসার'-এর প্রতিশ্রুতি বর্তমান। সামাজিক বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের সম্পর্ক-প্রসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন :— "বিবর্তনবিবাহ যদি সত্যই সমাজে বাস্তবিক হয়ে ওঠে, তাহলে কি রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র রূপ ভিন্ন হয় না ?"—তখনই তিনি বলতে পারেন, যখন 'ব্যক্তির স্বরূপ' বা 'স্বকীয়তা'-কে তিনি বিশেষ মূল্যে মূল্যবান দেখেন—"সাহিত্যের আসল কারবার চিরকালই চলেছে মানুষকে নিয়ে, ব্যক্তিস্বরূপ বা পার্সন্যালিটিকে নিয়েই;—কিন্তু সে মানুষ প্রায়ই হয়েছে তার জীবনযাত্রার দাসানুদাস, ব্যক্তিস্বরূপ বিকৃষিত হয়েছে বহিঃসমাজের চাপে, আকস্মিকতায়।" (পৃঃ ৪১) এই দৃষ্টিভঙ্গী রোমান্টিক মানবতন্ত্রী-সুলভ। "কিন্তু সমাজ এখনও সেই পুরোনো আর্থিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই চলেছে, ফলে এই আধুনিক সাহিত্যের স্বাধীন ব্যক্তিরা এতই স্বাধীন যে তাদের বাহির রূপ প্রায় নেই বললেই চলে, আছে শুধু তাদের মনের অন্তরঙ্গ স্বাধীনতা।" (পৃ :৪১) একজন প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ বলেছেন : "If he belonged to the romantic conservative and Protestant movement, he understood by it 'inner freedom' i. e., the right of each individual to live according to his own individual personality." এই প্রত্যয় বিষ্ণু দে-র 'সাহিত্যের স্বাধীনতা', 'ব্যক্তি-স্বরূপবাদ-তত্ত্ব'-এ কেন্দ্রস্থ।

সভ্যতার ইতিহাস ব্যাখ্যায় দু-একটি রেখাভাস যা পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় বিষ্ণু দে ভাবাদর্শটিকে প্রায় করলেও ইতিহাস ব্যাখ্যার পরিণামে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিবাদকেই আঁকড়ে ধরেছেন। প্রায় অধিকাংশ সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাসের আলোচনা-গ্রন্থে এই 'মেলোড্রামাটিক' রূপ-বিকৃতি আমাদের একথা নিশ্চয় ভাবায় যে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক এখনও স্থির হয় নি। কিন্তু এই বিষয়ে মার্ক্সবাদী প্রত্যয় অত্যন্ত দৃঢ় ও আপস বিহীনে আস্থাবান—এবং নিঃসংশয়ে বিষ্ণু দে-র চিন্তার সঙ্গে তার মৌলিক সমতা নেই। আমস্টার্ডামের মানবতন্ত্রীর মত বিষ্ণু দে-ও বিশ্বাস করেন মানব সমাজের পরিণত স্তরে ব্যক্তিস্বরূপের উন্মেষ ঘটে আপন হর্ষে, একান্ত স্বাভাবী মূল্যে, সেই অনাগত কালের 'ইউটোপিয়া' স্বপ্নে তাঁর কবিপ্রাণ 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে উল্লসিত।

শিল্পসাহিত্যের 'সমাজতান্ত্রিক বিচার' এর জটিলতা সম্পর্কে যে অবধান লেখক বার বার দেখিয়েছেন, তা সত্যই সাধুবাদযোগ্য। সাহিত্যের মান সম্পর্কে এক সজাগ বোধ সর্বদা অতন্দ্র এ-কথা আমাদের বার বার উচ্চকিত করে তোলে। বলা বাহুল্য, যাঁরা মার্ক্সীয় দৃষ্টে এ-অংশটির আলোচনা-পর্যায়ের খবর রাখেন, তাঁরা জানেন 'সুপারস্ট্রাক্চারের' সঙ্গে সাহিত্য-শিল্পের সম্পর্ক ব্যাখ্যায় তাঁরা যে গুরুত্ব দিয়েছেন তা সাহিত্যের 'সহজিয়া' ব্যাখ্যার প্রতিরোধ করে। আমার মনে হয়, য়ুরোপীয় এন্‌লেটিক্‌সে এই প্রসঙ্গ ত' বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। সাহিত্য যে 'ইমিটেশন্‌অফ্‌লাইফ', সাহিত্য বাস্তবের অনুকরণ না পুনর্সৃষ্টি, কল্পনার অন্তঃসারিনী প্রভাব—প্রভৃতি বৌদ্ধ সমস্যায় যে বীজভাষ গ্রীকমনীষীরা করেছিলেন, পরবর্তীকালে ত' তারই মূলানুগ ব্যাখ্যা চলেছে। বহির্গত ও অন্তর্গাহন—সাহিত্যের এই সমস্যা প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ব্যক্তি ভাবতে চেষ্টা করেছেন। এককেন্দ্রীয় মার্ক্সীয় ব্যাখ্যায় এই বোধ অজ্ঞাত ছিল বলেই তাঁরা সাহিত্য ও সমাজ, প্রচার ও সৃষ্টি, স্রষ্টার মন ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণশক্তি সম্পর্কে অতি সরলীকরণের সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন। বিষ্ণু দে-র আলোচনা এই দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, এ-সম্পর্কে ওঁর মন্তব্য বাক্‌ভঙ্গীতে স্পষ্ট বলে উদ্ধৃতি যোগ্য :—"সামাজিক রাজনৈতিক পটবিচারের মূল্যনিরূপণের সঙ্গে সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণ না মেলে, তাহলে তা মেলাতে হয় সংকেতে নয়, পুনর্জিজ্ঞাসায়। শিল্পসাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসের পটে মিলিয়ে এবং সাহিত্যশিল্পের প্রক্রিয়াগত রূপান্তরগত নিজস্ব সার্থকতা বা ব্যর্থতার মর্যাদা রেখে।" সাহিত্যের রূপান্তরগত সার্থকতা অত্যন্ত মূল্যবান এবং বলা চলে, সাহিত্যিক বিচার সাধ্যসাধনতত্ত্ব—কিন্তু প্রশ্নের নীরেন্দ্রনাথ রায় যে প্রশ্নটি সেকালে তুলেছিলেন—যে 'নীলদর্পণ' ও 'হুতোম' সাংস্কৃতিক ও সমাজ-বাস্তবগত মূল্য আজ হ'লেও "ইংরেজী আমলের বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু-কালীপ্রসন্নই কি বাঙালীর সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন?" 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'বলাকা'র বিশ্লেষণ সিদ্ধি সত্যই চিন্তনযোগ্য। নিঃসন্দেহে অবস্থাটি সমস্যাময়! এ-সম্পর্কে লিঙ্‌সিংস-সুলিভন সংখ্যার একটা দৃঢ় পথনির্দেশ—এবং বিষ্ণু যে সমস্যায় এই সীমান্তেই থেমে গিয়েছেন, কোন নতুন আলো আমাদের উপহার দেন নি। সাহিত্যের সাহিত্যমূল্য এবং সাংস্কৃতিক রূপায়ণ-মূল্যের প্রশ্নটি আজও তর্কাতীত নয়, এবং

একাধিক কারণে জটিল। বিষ্ণু দে-কে এই সব প্রসঙ্গ আলোচনায় মনে হয় একান্তভাবে fragmentary।

৩

সাহিত্যের তত্ত্বদৃষ্টিতে বিষ্ণু দে আধুনিক। 'বৈজ্ঞানিকমনা খোঁক' ও 'ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রসার'—এই দুই প্রতিশ্রুতিতে তাঁর সাহিত্যদর্শন ভাস্বর। এখন আমাদের আলোচনার বিষয় এই তত্ত্ব কিভাবে তাঁর আধুনিক কাব্য-শিল্প ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত হয়েছে।

এলিয়ট, আরাগঁ ও পিকাসো—এই তিন শ্রেষ্ঠ আধুনিক শিল্পীকে নিয়ে বিষ্ণু দে তাঁর আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। এলিয়ট তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত প্রবন্ধ—কিন্তু এই প্রবন্ধে তাঁর সাহিত্যদৃষ্টিকে আমাদের যথেষ্ট আধুনিক মনে হয়নি—এমন কি বিষ্ণু দে-র সাহিত্যতত্ত্বের কোন প্রয়োগ এতে নেই। এলিয়ট সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত এ্যাবস্ট্রাক্ট-রীতির এবং ম্যাথিসনের কাছেও যে প্রত্যাশিত ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রসার আমরা দেখেছি, বিষ্ণু দে-র বিচারশৈলীতে তা অনুপস্থিত। মনে হয়, তত্ত্বতঃ তিনি যা, কার্যতঃ তিনি তা নন।

'এলিয়ট আত্মসচেতনতারই মহাকবি'—এই বিদ্যুৎপ্রভ উক্তিটি সমস্ত আলোচনার কুটিল আবর্তে একমাত্র উক্তি যা স্পর্শযোগ্য। বস্তুচেতনার কবি এলিয়ট সামাজিক বিচ্ছিন্নতা যদি প্রকাশ করে থাকেন, তবে বলতে হয় একটি বিশেষ সূত্রের 'morphology'-কে তিনি প্রকাশ করেছেন মাত্র। আত্মসচেতনতার মহাকবি তাঁকে কিভাবে বলা যায়? "আত্মসচেতন মানস স্বকীয় বিশ্বাস খণ্ডিত সমাজে দীর্ণ হতে বাধ্য, সততা যদি থাকে। এখানে ও বিশ্বাস ইতিহাস বা কারণ নির্দেশ অবান্তর।"—ঐতিহাসিক চেতনাবান ও 'বৈজ্ঞানিকমনস্ক' সমালোচকের মানস-পরিমণ্ডল নিশ্চয় এটা নয়। আমেরিকার বিশিষ্ট সমালোচক ম্যাথিসন তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে (The Achievement of T. S. Eliot) এই সামাজিক বিচ্ছিন্নতার যে মূল্যভিত্তিক আলোচনা করেছেন, তাতে মনে হয়, তত্ত্বদৃষ্টিতে ম্যাথিসন বিষ্ণু দে-র মত 'মার্ক্সবাদী' না হয়েও সামাজিক-ঐতিহাসিক কার্যকারণ ব্যাখ্যা অবান্তর মনে করেন নি।

"এলিয়টের কাব্যে যে বেদনা, যে রোম্যান্টিক যন্ত্রণা—সেই ভাবাশ্রিত

বিশেষত্বেই এলিয়ট আমাদের এত বাস্তা দেন"—এই উক্তিটি এলকাইলাস থেকে এলিয়ট, বিদ্যাপতি থেকে সুধীন দত্ত সব কবি সম্পর্কেই প্রযোজ্য। সাহিত্যবিচারে প্রত্যেকটি প্রবী সমালোচক বৈশেষিক লক্ষণ সন্ধান করেন। সেখানেই সমালোচকের কৃতিত্ব। এই সঙ্গে স্বভাবতঃ আমরা প্রত্যাশা করব যে তিনি আপনি পদ্ধতিতে আস্থাবান, দৃঢ়চেতা হবেন।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, এলিয়ট-ভক্ত বিষ্ণু দে এই আলোচনায় Allen Tate-এর মত বিচারবুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা দেখান নি, এ-ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টি উদারতরীয়। এলিয়ট-কাব্যের সীমানির্দেশে 'এ্যাংলো-ক্যাথলিক-প্রত্যয়'-এর ভূমিকা সম্পর্কে বিষ্ণু দে যে অর্থ-মনস্ক—এ-বিষয়ে সন্দেহ কি যে তাঁর দল চাইতে বড় যার্থতার জন্য দায়ী তাঁর 'Quasi-religious-altitude', বিদগ্ধজনের মতে তাঁর কাব্যে পরাহত শ্রীষ্টের ছায়া পড়েছে। প্রসঙ্গত বিষ্ণু দে বলেছেন : "প্রগতির গতিলতা, সুদূরের পিয়াসী আমাদের এই শেষ রোম্যান্টিকদের প্রেরণা দিয়েছে ক্লাসিসিজমের দিকে, তাদবেষনা তাই খুঁজেছে গির্জার সমর্থন। সমাজবোধের অভাব আত্মগোপন করতে গেছে সামন্তযুগী রাজশক্তির কল্পনায়।" এলিয়ট-কাব্যে যে 'রোম্যান্টিক এগনি' প্রকাশিত, তা 'ডেকাডেন্ট'-লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। সমগ্র এলিয়ট-বিবর্তন বুঝতে চেষ্টা করলে আমরা জানতে পারব কিভাবে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও ঐক্যের দ্বন্দ্বে একটি দর্শনে প্রত্যাবর্তী হবার জন্যে ১৯১৩ সালে ব্র্যাড্‌লের অদ্বৈতবাদে তিনি ঝাঁপ দিয়েছিলেন—"Ourpsychical ,totality,experience together as a co-existing mass"—এই বোধ-প্রেরণায় তিনি 'মিথ্'-এর ব্যবহার করেছেন (Ulysses, Order and Myth), এবং শেষে ব্রাহ্ম যাত্রীর মত "ঈশ্বরের অখণ্ডের ঘুড়ি সন্ধানে ব্যস্ত।" Hellen Kenner এই স্তরপর্যায়গুলোর ব্যাখ্যা করেছেন, সন্দেহ নেই যে এলিয়ট-আলোচনায় প্রগতির চেয়ে পর্যায়ভঙ্গের আলোচনা অনেক বেশী যুক্তিমান। আর এ-বিষয় এলিয়টই আমাদের সুযোগ দিয়েছেন সর্বাধিক তাঁর অজস্র গদ্যরচনাসম্ভারে। বিষ্ণু দে এই বিবর্তনমূলক, অন্তঃসম্পর্কনির্ভর ব্যাখ্যা-পদ্ধতিতে মনঃসংযোগ করেন নি। এলিয়টের শ্রেষ্ঠ দান তাঁর বৈদগ্ধ্যিকতা, কিন্তু সেই সঙ্গে আত্মসচেতনতার কি সম্পর্ক এ-সম্পর্কে ম্যাথিসন বলেছেন : "This particular kind of consciousness is in part which led him to feel the necessity of growing into structure of his longest poem in something outside himself

in an objective patten of myth." (The Achievement of T. S. Eliot, p 44)

একমাত্র এলিয়টকে তিনি বলেছেন 'প্রতিনিধিমূল্যের কবি'—এলিয়ট নিজেও যে একথা বিশ্বাস করতেন, তার প্রমাণ ১৯৩১ সালে এলিয়ট নিজের কাব্য সম্পর্কে "disillusionment of generation" এই ব্যাখ্যায় প্রতিবাদ করেছিলেন, যেহেতু তাঁর দাবিত্ব ছিল যুগের অন্তর্লীন ট্র্যাজিক স্বরূপটি প্রকাশ করা। "এলিয়ট তাই অনিবার্য কারণে বিজ্ঞানবিদ্বেষী, মানবচৈতন্যের লঘুতা তাঁর কল্পনায় নেই, শুদ্ধপ্রকৃতি বা সমাজে সম্ভব যে মানুষের বিন্যাস, তা তিনি মানেন না" অথবা "বিজ্ঞানবিরোধী, তিনি গতিশীল জীবনে কোন ভায়েলেকটিসের স্থান ধরতে পারেন না"—ইত্যাকার বাক্যাবলীতে দুটি প্রশ্ন মনে জাগে : এক, যুগের এই চলস্রোত অস্বীকার করেও একজন কবি কি করে প্রতিনিধিমূল্যের কবি হন ? দুই, সামাজিক ঐতিহাসিক কোন্ পটে এলিয়টের প্রতিভূত্বের বিচার এখানে হোল ? বলা বাহুল্য, এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের চিন্তিত করে, বিমূঢ় করে।

আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূল্যনির্ণয় যেহেতু এই গ্রন্থের সবিশেষ উদ্দেশ্য, সেখানে একটা একপেশেমিও যে চোখে পড়ে না এমন নয়। আরাগঁ, পিকাসো এবং এলুয়ারের সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক উক্তিতে বোঝা যায় এই কবি-সমালোচকের রুচি ও রচনার প্রবণতা ; কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক তখনই মনে হয়, যখন দেখি এলিয়ট আছেন, কিন্তু এজরা পাউণ্ড নেই, ঁারে ব্রেটন, রীড বা ভালভ্যাডর ড্যালির শিল্পমীমাংসা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র মূল্যবোধ সত্তা এবং অধিকাংশ বিদেশী গ্রন্থে আধুনিক মননের আলোচনা ক্ষেত্রে এঁদের শিল্পজিজ্ঞাসা সাতিশয়ে বিচারের কারণ হয়েছে, অথচ এই আধুনিক মনন-চিহ্নিত গ্রন্থে তাঁদের প্রত্যাশিত উল্লেখ নেই। যদি এমন হয় যে, আধুনিকতার একটি দিকই শুধু উল্লেখ্য, তাহলে এমনতরো প্রশ্ন নিশ্চয় উঠতো না। কিন্তু এলিয়ট আরাগঁ বিপরীত বিন্দুর কবি (এ-সত্তা বিষ্ণুবাবুর আলোচনা দুটো পড়লেই বোঝা যায়) হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রন্থে স্থানাভাব পেয়েছেন। আত্ম-চেতন মানসের দ্বিধা, আবর্ত, নিরীশ্বরতা যে আধুনিকতার ফুটে উঠেছে, সেই আধুনিকতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা এ-কালের আলোচনার অবোধ, অনস্বীকার্য। মার্ক্সিস্ট্যা প্রশ্ন করেছেন, অডেনের কাব্যে, হেমরি মূরের ভাস্কর্যে, সার্ত্র-কাম্যুর উপন্যাসে আত্মসচেতনতার যে যে শক্তির রূপ ফুটে উঠেছে, তার

পরিণতি কোথায়? আমার মনে হয়, এ প্রশ্ন আধুনিক শিল্পান্দোলনের চাবিকাঠি—এবং এই প্রবন্ধের অনবধানে আলোচনার অপূর্ণতা আদৌ স্বাভাবিক।

তুলনামূলকভাবে 'আরাগঁ'—অনেক বেশি উপভোগ্য এবং উজ্জ্বল প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের গঠনেও, বলার ভঙ্গীতেও অন্য প্রবন্ধের চেয়ে একটি উপভোগ্য স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। আরাগঁ-কাব্যের বিকাশ, তাঁর জাতীয়তার বোধ, ফরাসী কাব্যজিজ্ঞাসার পটে আরাগঁ-কাব্যের মূল্যের যথার্থ আলোচনা তিনি করেছেন এবং একটু পথভ্রষ্ট হয়ে চলে এসেছেন তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব-প্রকল্প-ব্যাখ্যায়। ঐতিহ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যের মার্ক্সবাদী আলোচনাতেও দেখা যাচ্ছে ঐ নির্দেশের আভাস। আরো বেশি আলোচনায় ও অবহিত সাহিত্যপাঠে নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণতা কেটে যাবে। একদিন মুখ্যতঃ একপেশে শিক্ষার প্রভাবে, আমাদের ইংরেজি শাসনব্যবস্থায় সৃষ্টি মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংস্কৃতির অপরিসর চলনবিলেই মার্ক্সবাদের সংস্কৃতি চিন্তা মোটামুটি ঘুরে বেড়াচ্ছিল।" —আরাগঁ-র সংস্কৃতিচর্চার দায়ার্থ থেকে এই প্রশ্ন এসেছে —এবং বেশ বোঝা যায় যে পূর্বোক্ত পটভূমির প্রতি এই ভ্রূকুটি, তিরস্কার সকারণেই দেখা দিয়েছে। আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংস্কৃতি অপরিসরত্বের কোন্ তথ্য আমাদের হাতে এসেছে? যদি কেউ সংস্কৃতির অপব্যাখ্যা করেন, তবে ইতিহাসের ধারা বদলাবে কেন? ভাব-শক্তি সমৃদ্ধ এই কবির পরিচয় উদ্ঘাটনে বিষ্ণু যে দক্ষেই আন্তরিকতা ও কাব্য-বোধের পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু প্রসঙ্গতঃ যে তত্ত্ব ও চিন্তাকে তিনি হয়ত অজ্ঞাতসারে বলেছেন, তাই এই প্রবন্ধের সাহিত্যিক অখণ্ডত্বকে আঘাত করে, এবং সংস্কৃতি-চিন্তার নানা তাৎপর্যহীন জট তৈরী করে।

সংস্কৃতিগত যে প্রশ্ন তিনি এই প্রবন্ধে তুলেছেন, তা নিশ্চয় বিচারযোগ্য। "ঈশ্বর গুপ্ত, টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু বা মাইকেলের বিচারেও সাহিত্যিক মান নথিত করার দরকার নেই, তাঁদের ঐতিহাসিক মর্যাদা এখন কি বিশেষ সাহিত্যিক গুণাগুণ উপভোগে বা আলোচনায়। শিল্পসাহিত্যে একেশ্বর নেই, ইতিহাসেরই মতো"—এই উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি না তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য। বিষ্ণুবাবু কি সাহিত্যিক মান ঐতিহাসিক মর্যাদা-নিরপেক্ষ মনে করেন? তাই যদি হয়, তবে তাঁর সাহিত্যতত্ত্বেই অবিমোচিতা প্রবাসিত হয়। আবার তাই যদি না হয়, তবে সাহিত্যিক মান বলতে তিনি কোন্ নিশ্চয়ক

ভণ্ডামী বোঝান। সাহিত্য কি ম্যাট্রি-পাতা ভূমিতলের কৃত্রিম পুষ্পসজ্জা? "শিল্পসাহিত্যে একেশ্বর নেই"—এ-সত্য যদি মানতে হয়, ত' সমাজ-তাত্ত্বিকদের 'culture-area-concept'-ও মানতে হয়। মানুষ, বাঘ আর ঈশ্বর ভক্ত—এক প্রাণের কায়, কিন্তু সংস্কৃতি পর্যায়ে বিচিত্র। প্রসঙ্গ, ঐতিহ্যের রূপান্তরও বিভিন্ন। এইভাবে যদি বিচারের নিরিখ তোলা হয়, ত' বাংলা সাহিত্যের ব্যাখ্যায় এক কোলাহলের সামনে উপস্থিত হতে হয়। একেশ্বর নয়, সহস্রেশ্বর—কারণ 'culture-area'-এদেশে নানা সংস্কারবর্ষে জটিল। বিষ্ণু যে কোন ক্ষেত্রেই গবেষকের অনুপ্রবেশ নিয়ে সমস্যাগুলো বুঝতে চেষ্টা করেন না, স্রোতের ওপর ভাসমান কয়েকটি টুকরো ইঙ্গিতকে স্পষ্ট বক্তব্যে রূপ দিয়েছেন, এই মাত্র। বলার ধরণে বাগ্মিকতা আছে সত্য—কিন্তু সবত্ত আলোচনার টেম্‌প-টকের মেজাজ থাকায়,তাঁর মন্তব্য,যাদ, চিন্তার নানা 'প্রোফীল্' বোঝা যায়—কিন্তু চিন্তার সংগঠন ধরা যায় না। আর এই ত্রুটি ছাড়া, সাহিত্য তাঁর কাছে তত্ত্ব ও বিশ্বাসের ভেদ নিয়ে দেখা দিয়েছে—তাই তত্ত্বতঃ আধুনিক মনন-উপার্জন-প্রয়াসী হওয়া সত্ত্বেও, প্রেরণাসূত্রতঃ তাঁকে তিনি প্রায় একজন 'অ্যাবষ্ট্রাকট্' সমালোচক। 'মার্ক্সবাদ'-কে বিষাদ সোনা করে অলঙ্কৃত হবার আকর্ষণ আছে দুর্বার,—অথচ তার প্রয়োগবিধি ঘটে না। ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচারে কোন পদ্ধতির অনুকরণ অপেক্ষা 'ইক্লেক্‌টিকের' মেজাজ প্রবল হয়ে ওঠে।

৪

"সাহিত্যের ভবিষ্যৎ"—বার বার পড়তে গিয়ে যে দিকটা অভিনিবেশযোগ্য মনে হয় তা হচ্ছে লেখকের ঐতিহ্যমুখী মন। এই গ্রন্থের অন্যতম নায়কী চিন্তা দাঁড়িয়ে আছে "উত্তরাধিকার আবিষ্কার" এর উৎসাহে—লেখক দেশজ সংস্কৃতির উৎসতটে বার বার যাত্রা করেছেন। এই প্রশংসাযোগ্য প্রয়াস অনেক উজ্জ্বল বুদ্ধিজীবীর পক্ষে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকা উচিত—বিশেষতঃ যেখানে অনেক দুরারোহ বুদ্ধিজীবী স্বদেশী পট-ভাষা সম্পর্কে কৃপালাহন দৃষ্টি বা নির্বোধ প্রকাশ করেন।

স্বদেশী সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনায় বিষ্ণু দে-র কয়েকটি বক্তব্য, কয়েকটি মন্তব্য, কয়েকটি প্রবণতা অত্যন্ত প্রাণবান, এবং বক্তৃতকে। কিন্তু উপযুক্ত তথ্যজ্ঞানের অভাবে অনেক জায়গায় সিদ্ধান্তপরায়ণতা, অনেক 'এ্যাবেচারিশ'

উক্তি এবং মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে সংশয়কর সিদ্ধান্তে এসে পড়েছে। ফলে এই অংশে একদিকে যেমন বিপত্তিজনক সাংস্কৃতিক সমস্যা অন্যদিকে অজস্র মন্তব্যের প্রকীর্ণতা বা fragments.

কয়েকটি আলোচনা করা যাক।

"এই সাহিত্যিক ঐতিহ্য মোটামুটিভাবে আঠারোশতকের ইংরেজি সাহিত্যের সমবয়সী হলেও এর ফীণধারা শুধু থেকে থেকে কয়েকবার ঝলসিয়ে উঠেছে" —এই উক্তি দিয়ে বিষ্ণুবাবু স্বদেশী সাহিত্যের পরিচয় সুরু করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ফীণধারা না প্রষ্টার ফীণদৃষ্টি—এ তর্ক সরিয়ে রেখে একথা আমরা বলতে পারি যে—প্রাচীন বাংলা সাহিত্য নানা সংস্কৃতি-মিশ্রণে এত জটিল, এত বিচিত্র, এবং ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতির প্রভাবে-সংঘাতে এত আবর্তময়, যে সহজপাঠে এই সাহিত্যকে বোঝা যায় না। আর কোন সাহিত্যের কথা আমার জানা নাই যার সূত্রপাতে এত আবর্ত, এত ঘূর্ণি, এত জলোচ্ছ্বাস। প্রাচীন বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে প্রাণের অভাব ছিল না, কীর্তিরও না।

আবার দেখি, "কৃষ্ণকীর্তনের মত প্রাচীন ও কাঁচা রচনাতেও আমরা সংস্কৃতের রাজদরবারোচিত প্রথাসিদ্ধ লালস ও দেশজ লৌকিক যাদনের অস্পষ্ট, কিন্তু সুস্থ প্রাকৃতধর্মের বিরোধ দেখতে পাই"—এই মন্তব্যকে একটি fragmentary comment ছাড়া কিছুই মনে হয় না। সংস্কৃত ও দেশজ ধর্মের বিরোধিতা প্রমাণের কোন্ তথ্য আমাদের করায়ত্ত? 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' —বাইশটি পর্যায়ের তৃতীয় কবি—বিদ্যাপতি-উমাপতি এবং বড়ু চণ্ডীদাস। সুতরাং 'কাঁচা রচনা'—অভিধার যুক্তি কোথায়? বড়ু চণ্ডীদাস মধ্যযুগের সমন্বয়-মানস—এইদিক দেকালে লোকমানসে সংস্কৃত-বিদ্যার অনুরাগের কোন প্রশ্ন উঠত না! 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'—সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তথ্যপ্রমাণিত নয়,— কেবল মন্তব্য মাত্র।

"উপনিষদ ও মহাভারতোত্তর সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবপ্রধান ভাব যে শুধু বাংলাসাহিত্যের গতিরুদ্ধ করতে পারে নি, সে শুধু দেশী কবিরা মৃত্তিকার সন্তান ছিলেন বলেই"—দ্বিজ-আর্য সংস্কৃতি যদি বাংলা সংস্কৃতির জগদ্দলভস্তই হ'ত, তাহলে প্রাক্-চৈতন্যযুগের ভাগবতচর্চা বা পরবর্তীকালের রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদ দেশজ সাহিত্য মানসকে অমন প্রবলাবেগে অনুপ্রাণিত করতে পারত না। দেশী কবিরা সংস্কৃতকে লোকমানসে বইয়ে দেবার দায়িত্ব

নিবেদিতের—কী বাল্যের বন্ধু, কী কবিকঙ্কণ, কী কৃত্তিবাস। তাঁর কারণ সংস্কৃত কাব্য, পুরাণ, রতিশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র ছিল তাঁদের প্রধান শিক্ষক।

এ ছাড়া আছে বহু উক্ত মন্তব্য, যার তাৎপর্য কোন অর্থতন্ত্রে ধরা যায় না। কেন যে "পদকল্পতরু"-র 'কনটেমপরারি' প্রাণহীন (অন্যান্য সংকলন গ্রন্থ সম্পর্কে বিষ্ণুবাবুর মত যদিও জানা যায় নি) কেন যে, "চণ্ডীকাব্যে, মঙ্গলকাব্যে, পাঁচালী ও যাত্রা এ জাতিপুরুষটী যেন বোঝা যায়"—ইত্যাদি উক্তি আমাদের কাছে বাক্‌ভঙ্গী—'love of cryptic statement' ছাড়া কিছু নয়।

"আমাদের প্রয়োজন আপাতত: সেই বিচার যাতে এই সংঘাত-সহযোগে ক্রমবান ও পরিবর্তমান সাংস্কৃতিক বিন্যাসের ধারার রূপ স্পষ্ট হবে এবং বর্তমানের সাংস্কৃতিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে অপচয়হীন নির্দেশ দেবে।...বাংলার এই লৌকিক আভতির স্রোত কিছুটা ইতিহাসের এবং মূলতঃ বিষয়, কিছুটা হয়ত ধর্মতত্ত্ব, কিছুটা সাহিত্যগত"—বাংলাসাহিত্যের বিন্যাসের এই দুটি অবশ্য প্রশংসনীয়—এবং এই সূত্রটি নিয়েই বিষ্ণুবাবু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে অবনীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলের সত্তাবিচারে এই মানদণ্ড প্রয়োগ করেন। লৌকিক পটে এই মনোযোগ বাংলা সাহিত্যের অনেক জট খুলতে সাহায্য করে, সন্দেহ নেই—কিন্তু একটিমাত্র প্রমিতি দ্বারা বাংলাসাহিত্যের সবগুলো বোধ হয় বিচার করা চলে না। এই যাত্রায় তাঁর সহায়ক-গ্রন্থ হয়েছে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গলি লিটারেচার।'

সাংস্কৃতিক উপকরণের যেমন বিস্তর স্তর আছে, তেমনি তার আঙ্গিকের রূপভেদও যে বিচিত্র—এ-সত্তা সমাজবিজ্ঞান-পরীক্ষিত। প্রাচীন বাংলার ওঝাচার বা ধর্মোৎসব বা বৈষ্ণব-আন্দোলনের ক্রমবিস্তার ও তার ফলে স্তরগত পরিবর্তনের ফলে সংস্কৃতি-সন্ধানী যে অপ্রত্যাশিত জটিলতার মুখোমুখি হন, তার বিচারে একটিমাত্র মানদণ্ড আমাদের কোন সাহায্যই করতে পারে না। অবশ্য সত্যিকারের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এই লৌকিক সেতু সম্পর্কে মনোযোগ অনিবার্য—যার বিচিত্র উপকরণ ছড়িয়ে আছে রাধাকমল মুখার্জি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ই. বি. ব্যাস্, ক্যানিংহাম, রাজেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি বিদগ্ধ সন্ধানীদের সমর্পিতপ্রাণ অন্বেষায়। বাংলার 'নোবল স্যাভেজ'—চর্চায় তিনি স্বাভাবত: শরৎচন্দ্র রায়, ভঃ এলুইন বা অবনীন্দ্রনাথকে স্তরোচিত সাধুবাদ জানিয়েছেন।

কিন্তু বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে 'লৌকিক আভতি স্রোত' যে অবিচ্ছিন্ন

বাহার যবে যায় মি, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের এই মন্তব্যকে বিমুবাবু সমর্থন করলেন কোন্ প্রভাবে? ধর্মঠাকুরের মত লোকদেবতার রূপায়ণে বৈদিক-অবৈদিক প্রভাবের সঙ্গে অস্ত্রাত্তমূল কোমের 'টোটেম্-প্রভাব'—থাকা সত্ত্বেও এর পরিণতি হ'ল বর্ণহিন্দু দেবলোকে—লৌকিক টান দুর্বার বলে অঞ্চল-বিশেষে এই দেবতার সেবাধেৎ নিরকোটিক সমাজ (মাণিক গাঙুলীর আক্ষেপ স্মরণীয়)। পরে আবার ধর্মের 'দেয়ানী' হয়েছেন ব্রাহ্মণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য-সমাজের ছাড়পত্র সে পেয়েছে—অবশ্য এই নিম্নস্তি আঞ্চলিক দেবতা 'বড়ম্'-সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় মি। আবার দেখি, লোকসমাজে যে দেবী-উপাসনা বহমান্ত, সেই দেবী উচ্চবর্ণীয় রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয় কেমন করে? 'বাসুলী'কে যদি আর্যদেবীর অনার্য-লোহিতে লোকায়ত পরিণতি বলে মনে করি (বাগেশ্বরী>বাসুলী), তবে কেন যে রাজা লোভাসিংহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বারেক দাঁওতাল কর্তৃক উপাসিতা হয়েছেন, তার একটা আপাত উত্তর পাওয়া যায়। যদি 'বাসুলী'-কে আঞ্চলিক লৌকিক দেবী বলে ধরে নিয়ে, 'বিশালাক্ষী' 'বাগেশ্বরী'-কে জনপ্রিয় দেবতারূপ হিসেবে স্থির করা হয়, তবে যে সমস্যা খুচ, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। কখনও কখনও রাজতন্ত্র লৌকিক ধর্মোপাসনাকে প্রশ্রয় দিয়েছে (মল্লভূম)—সেখানে কালীসাধনা,—বড়ম-পূজার তান্ত্রিক আচারপদ্ধতি ও বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম এসে প্রভাব বিস্তার করেছে—এবং অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে বৈষ্ণবপ্রভাব, 'গাজন'-পূজাকে করেছে রূপান্তরিত (বাসনাপাড়ার চৈত্রসংক্রান্তি পূজা)। ধর্মহিন্দুর প্রভাব সমাজের সাংস্কৃতিক মূল্যমানে যে বিপুল ছিল, তার প্রমাণ 'চণ্ডীমঙ্গল'-কাব্যের কালকেতুর ভাগ্যোন্নতির কাহিনী। "লৌকিক আততির স্রোত"—যদি সে যুগের বাজা-উপবাজা-সমৃদ্ধ সমাজ-মানসে অত মিয়মুণ হোত, তাহলে 'মনসামঙ্গল'-কাব্যে লোকদেবীর প্রতিষ্ঠা নিয়ে অত ঝড় উঠত না? 'আদিবাসী পূজা লৌকিক দেবী' কিভাবে বর্ণহিন্দুসমাজের পৌরাণিক দেবীমণ্ডলে আত্মসমর্পণ করলেন, তার রূপক কাহিনীকাব্য চণ্ডীমঙ্গলের 'কালকেতু কাহিনী'—এবং এই উত্তরায়ণ সুরু হয়েছিল মধ্যযুগের সেই মূলসত্তিতে,—যাকে জ্যোতিষবাবু বলেছেন "has been wrongly regarded as a revival of Brahminism"—এ-সম্পর্কে যে কোন দ্বিমত উক্তিই আধিকর।

বিষ্ণু দে প্রথাসিদ্ধ শিল্পসমালোচক নন। নতুন মূল্যায়নে তিনি বিশ্বাসী—এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা দ্বিধাদীর্ণ, কোন একটি স্পষ্ট যুক্তিগত চরিত্র, একটি মানসিক চৈত্যরূপ এতে খুঁজে পাওয়া যায় না। মার্ক্সীয় ইতিহাস-চৈতন্য ও সামাজিক বিচারের ওপর তিনি বার বার আস্থা জানিয়েছেন,অথচ লেনিনবাদী সাহিত্যতত্ত্বের শ্রেণী-ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি অসহিষ্ণু। কে না জানে "Leninism teaches us how to discriminate the historical content of works of art, how to seperate the living from the dead in them, how to determine what belongs to the future and what is the mark of a slavish past. In this critique lies a real class-analysis" যদি লেনিনের উনষ্টন-বিষয় প্রবন্ধাবলীকে গ্রন্থের পথনির্দেশ বলে করতে হয় (সাহিত্যের ভবিষ্যৎ পৃ: ৭১), তবে লেনিনবাদী সাহিত্য-পদ্ধতিকেও অনুসরণ করা একটা অনিবার্য কৃত্য হওয়া উচিত। প্রসঙ্গহীন উদ্ধৃতিচয়নের দ্বারা উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মার্ক্স-বাদীদের তিনি ব্যঙ্গ করেছেন—এই ব্যঙ্গ ও তিরস্কার কি তাঁরও প্রাপ্য নয়? "সাহিত্যের স্বাধীনতা"-য় যিনি বিশ্বাস করেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দিকে যিনি বার বার মনের সমর্থন জানান, তিনি কি করে ঐতিহাসিক-সামাজিক চেতনায় আস্থাবান হন, এ-যুক্তি আমাদের বোধাতীত। কার্ল পপার বলেছেন: "the historicist sees the individual as a pawn, as a rather insignificant instrument in the general development of mankind." এই সূত্রানুসারে আমরা বিষ্ণু দে-কে কোন্ পদ্ধতির চিন্তাশীল বলে গ্রহণ করতে পারি? আসলে বিষ্ণু দে একজন 'ইক্লেকটিক'—এবং সেই কারণেই তাঁর রচনায় এত স্বতোবিরোধিতা, এত চিন্তাগত আচ্ছন্নতা।

আমরা প্রধান দু-একটা প্রবন্ধের তুলে ধরে এই বিচারকে উপস্থিত করেছি। এই গ্রন্থের সাধুবাদযোগ্য চিন্তার স্বাতন্ত্র্যস্বীকারে, সাহিত্যমানের সম্ভ্রম অঙ্গীকারে। কিন্তু বাক্যগঠনের প্রথা-ভাঙা রীতিটি এত অভিনব যে বহু ক্ষেত্রেই বক্তব্যবিষয় স্পষ্টরেখ হয়ে মনকে নাড়া দেয় না। মাঝে মাঝে কবিকর্ম আমাদের মুগ্ধ করে বটে, কখন কখনও দুয়েকটি প্রবন্ধও (ঈশ্বর গুপ্ত, অবনীন্দ্র নাথ, আরাগঁ) উপভোগ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু পরমুহূর্তেই হয়ত তিনি সচকিত হয়ে ওঠেন, তাঁর প্রস্তাব বুঝি দুরূহবোধ্য হয়ে যায়। প্রথর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদীর আত্মগোপন এই গ্রন্থের মুখ্য লক্ষণ,—তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর

ব্যক্তিগত, প্রকাশভঙ্গী ঘুর্বা-বোঝা। তাঁর বাক্যগঠন, পদবিন্যাসে ক্রমভঙ্গিটি বিচিত্র, এবং এই ক্রমভঙ্গি থেকে বিষ্ণু দেকে নেয়া যায়: "রূপ দেখে রোমান্টিক-বিদ্রোহী পূর্বসূরির চেয়েও কথাটা মাউন্টব্যাটেনস্যাটেল খুলে এখানে আমাদের পক্ষে আরো কঠিনভাবে সত্য—রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক বিদ্রোহী মনির আত্মিক প্রতিভার অনায়াস ব্যাপ্তি সত্ত্বেও।"

আমার ভাষাক্রমকে সহজতর করার জন্য কীভাবে বাক্যের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা যায় তা একটি অনুবাদবস্তু কাজে আসতে পারে: "মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব তার স্বকীয় সত্তাতেই। মানুষের এ-সত্য মনে রাখা দরকার। না হলে তার বেঁচে থাকা অন্যের পক্ষে হয় মৃতেরই সামিল, পাথরের মতো, লোহরের চিপির মতো।" একেই কি bathos বলে?

বাক্যগঠনের একটি দৃষ্টান্তে বিষ্ণুবাবাহারের চূড়ান্ত নমুনা আছে—"পণ্ডিত লেখকের কাছে আমরা পাঠ নিতে চাই। প্রবন্ধে তাই আমরা পাঠশালার আবহাওয়া খুঁজি, ধামধেয়ালী শিল্পীর বহুগুণক গ্রন্থবিহারে আমরা বিমূঢ় হয়ে পড়ি, ভুলে যাই যে অধ্যাপক শিক্ষকের বিদ্যালয়োত্তর জ্ঞানপ্রচার যেমন কিছু করলেও মার্জন করেননি, ফ্লোরিওর কাছে শেক্সপিয়রও কৃতজ্ঞ ছিলেন, যদিও রেমেঁ সেবোঁর পরিচয়ে বিশ্বকোষের রূপণ লেখকদের তথ্যবৃদ্ধি হয় না"—বিষ্ণুর চালিয়াতীর এমন মনোরঞ্জনী প্রলেপ আর হয় না। 'বিজ্ঞানমূলক মজ্জতা' যাঁর কাম্য, তিনি অকারণে প্রসঙ্গহীন ও তাৎপর্যহীনভাবে 'আকৃতি', 'মনোলোভা', 'কৃতার্থে', 'কতজন' 'বালালোল'—প্রভৃতি শব্দমালা সৃষ্টি করে বাবালক পাঠকদের বরাবাধী করে যেন। যদিও পদক্রমের সুষোহীনতা, প্রস্তাবের গঠনগত সৌষম্যের অভাব পাঠকদের উদ্বেজিত করে, তবু এ-আলোচনা এখন পরিহার করাই শ্রেয়, কারণ 'ইাইলটিকস'-এর আলোচনা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র শাখা। বিষ্ণু দে নিজেও ত বিশ্বাস করেন: "ভাষা একটা সামাজিক ব্যাপার। এ কি আশা করা যায় না, যে একদিন ডিজাইন বা রূপায়ণও ভাষার মতো, অক্ষরলিপির মতো সামাজিক সত্তা হয়ে উঠবে, নির্বিশেষ হয়ে উঠবে?"—তবু কেন তাঁর গ্রন্থে 'নয়া ভাষা'-র এত প্রয়োগ, চিন্তার এই দুর্বোধ্যতা।

পাঁচটি কবিতা

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

বাস্তববিহীন বাহুপাশ

দূরের নীরব দয়া এইখানে বলকায়। এই
প্রত্যুষে, যাহার ঘের হয়তো বা যেমন কমলা
হয়ে পড়ে···দক্ষিণের বনে বিত্তাহীন···সেই
গান কিছু বনে আছে, যার রেশ
থেকে থেকে তোলায় আবেশ ?
কতো আর কাছে আছো, সামান্য ঘোতলা—
তা থেকে এমন কি নীল রয়েছে আকাশে,
বাস্তববিহীন, বাহুপাশে ?

কৃষ্ণের ক্রীড়া-কৌতুকের রোল এখানে ক্রমশ
যাইবার যোগ্য—এই হৃদয়বেলায় ;
গলা কাটানোর মতো বহস্র, বা ঘণ্ড
আমাদের কথা বানাবার ছলনায়
ধরা পড়ে। তবু তো ছুপছুপি
কেবলই চলেছে মেঘে, অজস্র বানর
মতোমতে, পরস্পরে চালায় খামচ
খেচে-কুঁদে বাজি করে মাৎ।···
তবু হায়, অধিকারহীন কোনো নীলাভ ছহাত
ছুয়ে থেকে কেবলই করুণা
মেলে দেয় রৌদ্রে, তার শুধু উপাসনা।

'পাপিষ্ঠ!'—ঘুম ভেঙে ওঠে এই রব। জানি বটে
রয়েছে জলের নিচে শয়তান। কিন্তু সে কি পারে
মানুষের মতো কথা,—'তোমার নিয়তি কেরে যারে!'—
শুনে, হাত দিনু রাখি। পাল্লার লড়াই যদি ঘটে—
পারবো কি মুঠো থেকে ফেলে দিতে—সজল বিদ্যুৎ,
শিরস্ত্রাণ প'রে নিতে জ্যোৎস্নার দাঁড়াবো—তার আগে
কোথায় পায়ের কাছে শিকড়ের বিকল সংযোগে;
ব'লে দিতে পারো—কেন সূর্যাস্তে যাতক ভোলে মুখ।

শব্দে বিষণ্ণিত হয় সব। তবু অভ্যস্ত পবনে
নৌকা তার শক্ত হাতে পাটাতন, মুকের শৃঙ্খলা;
কেঁপে যায় পালতল, মুঠোভরা কোমল শরণ।
ব'লে যেতে পারি কামে কানে, কিন্তু কে এই ছলনে
ফিরবে এখন, যার শিয়রে আঁধার কুয়োতলা
কঠিন কংক্রিটে ভাঙে তার দেহ, তার আলিঙ্গন!

চেতনারহিত এই বনে

নিবৃতি আবার, এলো চেতনারহিত এই বনে।
ছড়িয়ে লুটায় এক বিবেকবিহীন মুক্তমালা।
বনের গোলাপ তার অস্ত্র-উৎপাটিত করে মনে।
বনানীর যোগ্য শোক, হলুদ চাঁদের মৃদু ঘাণ।
কোন্ ক্রীতদাসীর নিদর্গ? বুকে অপার ক্রন্দন
কেবলই কি ভাসমান ইাদের শরীর হতে আজ
কোটাবে টগর যুঁই, শরীর-সুরভি আলিঙ্গন;
কার হাতে ক্রীড়নক দেবে, মৃত্যু, গড়েছো সমাজ।

বিবিধ ছত্রির ভাষা, ভক্তি, স্তব, গভীর চুম্বন
প্রতিটি বাগানে রেখে; স্বামী চুম্বতের দিকে আর
কারও হাত নেবে এসে, নিবৃতির মতন নিয়মে
কেড়ে নেবে ঐ ত্রিয় মুখশ্রী; জলের নিচে, গান
ঘুরে ঘুরে মৃতদের প্রায়—তবু এই মুক্ততায়
অনুচ্চারিত মুক্তি—সেবনের জন্য নেবে মনে।

শিকড়ে, পলকমাত্র জ্যোৎস্নাধারা, আত্মঘাতী জানে—
এই রম্য উদ্যানের নিকটে উদার
নেই। তৃষা কেন আর মনের গহন
রাখো আন্দোলিত। হৃদে তীব্র রণরোল
কালের আঙুলে বাজে দৃষ্টিপাতহীন।…
চতুর্দিক থেকে রাত্রি যাবে, শব্দে কারা আসে যায়,
কারা করে জাগ এই তাঁবুর আঁধার
নখের ওপরে রেখে এই সব ধৃতিত হৃদয়!

মাস্তুল গিয়েছে বেঁকে শুধাল জ্যোৎস্নায়, নাবিক
যেথায় নিশানা তীর হতে, তবু স্মৃতির নৌকায়
নীরব কলকে সবই রূপান্তরিত…
ঘণ্টাধ্বনি বহুদূর থেকে ভেসে আসে।
এখন তৃষিত যুবা তার প্রতিমার বিসর্জন
বুক হতে রেখে যাবে জলে,
যে-জলে রূপালি লাল গভীর সোনালি অবয়ব
ত্রিভুজের মতো ফেরে, মসনীর বৃত্তের মতন।
তার স্পর্শে প্রজ্বলন আছে,
যেমন রয়েছে যত্ন যাযাবর, সংগ্রাম, মৃদুকী অন্বেষণ।
তারও পর যা রয়েছে—সেই স্থির, স্থিরতর অবে
কী দেখায়, দর্পণের থেকে ঢের গোলাপি আভার
যাদু, যার কাছে মতশিল্প, কোমল, গভীর
তারা কি নিয়েছে জেনে—জীবনের, মৃত্যুর পিপাসা
একবারই আসে; কষ্ট, তিক্ততা, অস্থির নরকে
বাহুপাশব্যাপী শত তরঙ্গমালায়
আসে, যায়, বিমল রজনী—
এই সব নিমজ্জনের।

এও তো শিকার !—তীব্র ধনুকের লক্ষ্যে ধাবাই রৌদ্রধারা।
মূর্ছিত হবো ; বাতুর শব্দে ফিরবো কি আর বিসর্জনে ;
তারা কোলাহল ক'রে যাবে, আমি বুকের তলা
নিষ্ফলহীন রেখে যেতে পারি···পতিহীন, এসো বিধুর ভাষা।

তারা নিয়ে যাবে আমার শূন্য ; তারকাগুলি
প'ড়ে যাবে নৈঃশব্দে, তখন এই বাগানের কথা সকল
কে আর কুড়াবে, যদি তার থাকে চোখের জলের কঠিন পীড়া !
গাঙীর ঘুরের আঘাতে উড়বে শেষ বিকালের গভীর ধূলা।

আর যদি কেহ না তাকে মূর্ছা, দেখবো ঘষির সংঘোপনে
গোধূলি পাহাড় ডেকে নেয় তারে, তার বিপুল
একে একে ঝরে ; শীতল কক্ষে দীর্ঘ ছায়া।

সকল অস্ত্র ফেলে যাও ওহে ভীষণ বাদুড়া ! শুনি এখন
অন্ধ চোখের হুলাসে কী রটে—মেরুপ্রদাশ—গিরিচূড়ায়।
শিথানে রহিল শেষ উদ্যান পুষ্পবিহীন, হে উজ্জ্বলা !

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : নাট্যশালা ও অভিনয়

সুশীল রায়

বাংলাদেশে নাট্যশালা প্রথম স্থাপিত হয় ১৭৯৫ সালে এক বিদেশীর দ্বারা— তাঁর নাম হেরাসিম লেবেডেফ। এই ভদ্রলোক কয়েক বছর পরেই এ দেশ ত্যাগ করেন, কিন্তু তিনি একটি কীর্তি রেখে গেলেন, বলতে গেলে তিনি নাট্যমঞ্চের সূত্রপাত করলেন। তাঁর এই নাট্যশালায় অভিনয় করতেন এই দেশের লোকেরাই। কিন্তু যেহেতু এর প্রতিষ্ঠাতা দেশী লোক নন, এই জন্যে একে পুরো দেশী প্রতিষ্ঠান বলা চলে না।

তারপর কিছু কাল গত হয়, এদেশে নাট্যালয় আর প্রতিষ্ঠিত হয় না। ১৮২৬ সাল পর্যন্ত এইরূপ অবস্থার বিষয় জানা যায়, ঐ সময় 'সমাচার চন্দ্রিকা' বাংলায় নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন[১]।

অবশেষে তেমন পাকাপোক্ত ভাবে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত না হলেও দেশের বিভিন্ন স্থানে শখের দলের নাট্যাভিনয় হতে থাকে। খেউড় বা কবিগান যারা চিত্তবিনোদনে রীতস্পৃহ হয়েই ক্রমশ শখের দলের উৎপত্তি হতে আরম্ভ করে। এবং ধীরে ধীরে নাট্যালয়-গঠনের জন্য সুধী ও ধনী মহলে উৎসাহের লক্ষণ দেখা যায়।

এ-আমলে আমরা যে-জিনিসের অভাব প্রত্যক্ষ করি, সে-আমলে সেই জিনিসের প্রাচুর্য ছিল। সে জিনিসটি হচ্ছে শখ। শখ না হলে সেকালে সুখ ছিল না। সেই জন্যে সে কালের মানুষের জীবনযাপনের নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে যেমন পাওয়া যায় ঘুড়ি-ওড়ানো বুলবুলির লড়াই, তেমনি আরও একটা দিকও আছে, যেমন নাচগান আমোদ-প্রমোদ নাট্যাভিনয়। এই রকম সৌখিনতার অনেক গল্প আছে। এসব জানার কথা আমাদের নয়, জানার কোনো উপায়ও সম্ভবত থাকত না। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেকালের মানুষ যাঁরা একাল অবধি বেঁচে ছিলেন, তাঁরা তাঁদের জীবন গায়াহে তাঁদের বাল্যকালের স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে ঐসব কথা আমাদের জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর— তাঁর 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইতে এসব কথা আছে। এবং অবনীন্দ্রনাথের পিতা গুণেন্দ্রনাথই ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবিধ প্রকার শখের সঙ্গী।

অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, "শিল্প জিনিসটা কি, তা বুঝিয়ে বলা বড় শক্ত। শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারে শিল্প সৃষ্টি করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে, গাইতে, নাটক লিখতে—যাই বল।"[৭]

অবনীন্দ্রনাথের উক্তি যদি আমরা মানি, তাহলে আমাদের মানতে হবে—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন একজন সেরা শৌখিন লোক। তিনি উল্লিখিত শিল্পের প্রায় সব-কটিতেই তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে গিয়েছেন।

সেকালের মানুষের মনে এই শখ ছিল বলে ধীরে ধীরে বাংলাদেশে শখের নাট্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল—কলকাতা শহরে ও মফস্বলে। গত শতকের মধ্যভাগে কলকাতার নাট্যজগতে নবজীবনের সূত্রপাত হল।—বাংলা নাটকের অভিনয় আরম্ভ হল নাড়ু বাবুর বাড়িতে। এই উৎসাহের পূর্ণ বিকাশ ঘটল বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায়। এই নাট্যশালায় অভিনীত হল মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'। এ ঘটনা ১৮৫৯ সালের। তারপর পাথুরিয়াঘাটায় ও শোভাবাজারে নাট্যশালা স্থাপিত হয়। শোভাবাজারে মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসন প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৫ সালের ১৮ই জুলাই।

এর পরের উল্লেখযোগ্য নাট্যশালা হল জোড়াসাঁকো নাট্যশালা। এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে গঠিত হয়। এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। গোপাল উড়ের যাত্রা শুনেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংকল্প জাগে।

শখের কথা আমরা বলেছি। তখন শখ ষোলো আনা। বাড়িতে গান বাজনা লেগেই আছে। বড় বড় গায়কদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন সংগীতচর্চাতেই বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। নাটক অভিনয় করার দিকেও প্রবল ঝোঁক ছিল। অভিনয় ব্যাপারে সঙ্গী গুণেন্দ্রনাথের অনুরাগ যথেষ্ট। তাঁরা দুইজনে মিলে বাড়িতেই একটি নাট্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করলেন। অভিনয় সংক্রান্ত বিবিধ কাজের জন্যে তৈরি হল একটি কমিটি, তার নাম দেওয়া হল কমিটি অব্ কাইত; অর্থাৎ এ হল নাটকের এক পঞ্চায়েৎ। এর পাঁচজন সভ্য হলেন—হরবিহারী সেন, অক্ষয়কুমার চৌধুরী, সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

এই সময়ে তাঁরা একটা ক্লাবও গড়েছিলেন, নাম ইটিং ক্লাব (Eating Club)। ক্লাবে কাজ ছিল পালা করে এক-এক জনের বাড়িতে খাওয়া। সে ভোজের আয়োজন বেশি ছিল না। লুচি কচুরি সন্দেশ ইত্যাদি খাওয়া হত। এও এক রকমের পথ।

কৃষ্ণবিহারী হলেন কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতা। ইতিপূর্বে তিনি 'বিধবা বিবাহ' নাটকে অভিনয় করেন। নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় মেট্রোপলিটন থিয়েটারে ১৮৫৯ সালে, কেশবচন্দ্র ছিলেন সভাপতি। সম্ভবত কৃষ্ণবিহারী এই সময়েই অভিনয় করেন। তিনি অভিনয় জানেন, সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের এই দলের তিনিই হলেন অভিনয়-শিক্ষক। এ ঘটনা ১৮৫৪ সালের। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়স তখন ষোলো। সেই সময়ে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল এই নাট্যশালা। এই নাট্যশালাই ইতিহাসখ্যাত হয়েছে 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালা' নামে।

তাঁদের সেই খেলেখেলার—সেই অদ্ভুতনাট্যের—পরিণতি এখানে।—

> ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না
> বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে—

সেই গানের অন্তরালের ঝোঁকটি কোথায় তা বুঝি জানা গেল এইবার।

নাট্যশালাটি প্রতিষ্ঠার পর এখানে প্রথমে অভিনীত হয় মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রী-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন—তিনি কৃষ্ণকুমারীর মাতা অহল্যা দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। তারপর মধুসূদনেরই প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনীত হয়। এই নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন পুরুষ ভূমিকা, তিনি সাজেন সারজন।

স্ত্রী ও পুরুষ ব'লে নয়, দুটি চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। একটি হচ্ছে স্নেহশীলা মাতার, অপরটি একটি ফিরিঙ্গির—যে বাংলার কথা বলতে পারে না, যার বুলি না-হিন্দি না-বাংলা না-ইংরেজি, যার মেজাজ সব সময় তিরিক্ষে।

এই দুই রকমের চরিত্রে অভিনয় করে তিনি অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। কেননা, "দুই বারই অভিনয় খুব ভাল হইয়াছিল"[৩]।

অভিনয়ে তাঁর এই দক্ষতার খবর আমরা পাই। এই সাফল্যের জন্যে কৃষ্ণবিহারীর শিক্ষকতা অথবা অভিনেতার যোগ্যতা যা-ই কেননা দায়ী হোক, অভিনয়ে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবণতা ছিল তা অবশ্যই বোঝা যায়।

এঁদের উদ্যোগে গড়ে উঠল নাট্যশালা। দুটি অভিনয়ও হল। কিন্তু একই

নাটক বার বার অভিনয় করা চলে না, বিশেষত এই পথের নাট্যালয়ে। সুতরাং নূতন নাটকের খোঁজ আরম্ভ হল।

অভিনয়যোগ্য অথচ লোকশিক্ষার অনুকূল উৎকৃষ্ট বাংলা নাটকের বিশেষ অভাব তাঁরা অনুভব করতে লাগলেন। ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষক ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারির প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর পরামর্শ নিয়ে তাঁরা সামাজিক নাটকের উপযোগী বিষয় নির্বাচন করে দেবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানালেন। তিনি বিষয় ঠিক করে দিলেন, এবং ঠিক হল এই নির্বাচিত বিষয়ে উৎকৃষ্ট নাটক রচনার জন্যে সংবাদপত্রে পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। বিষয় ঠিক হল তিনটি—১. বহুবিবাহ, ২. বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, ৩. পল্লীগ্রামের জমিদারদের অত্যাচার।

প্রথম বিষয়টি সম্বন্ধে নাটক রচনার জন্যে 'ইণ্ডিয়ান চেম্পি নিউজ'-এ বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় (১৮৫৫)। কিন্তু উপযুক্ত কোনো নাটক হস্তগত না হওয়ায় স্থির হল পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬) উপর এই বিষয়ে নাটক রচনার ভার দেওয়া হোক। অপর দুইটি বিষয়ে নাটক রচনার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় ১৮৫৪ সালের ১৫ই জুলাই তারিখের 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পাক্ষিক সংবাদপত্রে।

রামনারায়ণ তখন বিখ্যাত নাট্যকার, নাট্যরচনার জন্যে তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত এবং নাটুকে রামনারায়ণ নামে তিনি তখন পরিচিত। 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটক লিখে তখন তিনি যশস্বী হয়েছেন। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা আছে; দ্বিজেন্দ্রনাথ এঁর কাছে সংস্কৃতপাঠ নিতেন।

পণ্ডিত রামনারায়ণ নাটকটি রচনা করলেন, নাম দিলেন দীর্ঘ—'বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক অশ্ব-নাটক'। ১৮৫৬ সালের যে মাসে নাটকটি প্রকাশিত হয়। ইনি ইংরেজি জানতেন না, খাঁটি দেশীয় আদর্শে নাটক রচনা করাই এঁর রীতি ছিল, এই নাটকটি তিনি সেই আদর্শেই রচনা করেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতে তিনি "আমাদের বাঙ্গালার সর্বপ্রথম ন্যাশনাল ড্রামাটিস্ট—জাতীয় নাট্যকার"[৭]। কিন্তু এই নাটকে বিদেশী আদর্শের সামান্য মিশ্রণ অবশ্য ছিল; দেশী নাটক, অর্থাৎ সংস্কৃত নাট্য, বিয়োগান্তক হয় না। ইঙ্গবঙ্গদের ভণ্ডামিকে প্রহসন দিয়ে রামনারায়ণ এই নাটক বিয়োগান্তক করেন।

অল্পবয়স্ক বাড়ির ছেলেদের উৎসাহে ব্যাপারটি এতদূর গড়িয়েছে দেখে

বড়র দল এগিয়ে এলেন। ছেলেরা নাট্যশালা স্থাপন করেছে, এবং নাটক পর্যন্ত লিখিয়ে নিয়েছে। বড়র দল এলেন, এঁদের মধ্যে একজন হলেন গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ গৃহে নাট্যাভিনয়ের রেওয়াজ আগে থেকেই আছে, গণেন্দ্রনাথের পিতা গিরীন্দ্রনাথ 'নাবুবিলাস' নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন *।

যাই হোক, বড়র দলই অভিনয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। দোতলার হলের ঘরে স্টেজ বাঁধা হল। পটুয়ারা সীন আঁকল। ভূমিকা বণ্টন হবার পর খুব ঘটা করে রিহার্সেল বসে গেল।

নবনাটকের প্রথম অভিনয় হল জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায়—জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। অভিনয় দেখার জন্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

সেরা পটুয়ারা সীন্ এঁকেছিলেন, এবং রঙ্গমঞ্চটিও খুব সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। "দৃশ্যগুলি যাহাতে যত দূর সম্ভব চোখের কোনও ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের সীনখানিকে আমাদিগ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকি পোকা আঠা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর ও সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত।"*—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই-বর্ণনা দিয়েছেন, এর দ্বারা আমরা তাঁদের উৎসাহের পরিচয় লাভ করি।

১৮৬৭ সালের ৪ঠা জানুয়ারি (২২ পৌষ ১২৭৩) প্রথম অভিনয় হল এই নাট্যশালায়। অভিনয় উচ্চাঙ্গের হয়েছিল, ৯ জানুয়ারি তারিখের National Paper এই অভিনয় সম্বন্ধে লেখেন—"Jorasanko Theatre. On Saturday night last we had the pleasure of witnessing the Jorasanko Theatre, established at the family house of Baboo Gonendra Nath Tagore, grandson of late Baboo Dwarka Nath Tagore. The subject of the performance was the celebrated *nabo natock*···the acting on the stage, which was pronounced by all present on the occasion to be of the most superior order. To choose out one or two or more amateurs for especial commendation, would, we fear, be doing gross injustice to the rest, each acquitted himself so creditably. Beginning with the graceful bow of the *nates*,

the representation of every succeeding character, elicited loud shouts of applause from all sides, and rendered the whole scene an object of peculiar amusement to the audience. The concert was excellent. It had no borrowed airs, and was quite in keeping with national taste."৩

এই অভিনয়ের আসরে নাট্যকার রামনারায়ণও উপস্থিত ছিলেন। অভিনয় দেখে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। অভিনয়ান্তে তিনি তাঁর নাটকের সমালোচকদের উদ্দেশে বলেন, 'যারা প্লট (plot) নাই, প্লটই নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক।' এই বলে তিনি নাটকের সামনে মাথি বিস্তর আস্ফালন করেছিলেন।

এই নাট্যাভিনয়ের সংবাদ পেয়ে ১৮৬৭ সালের ১৬ জানুয়ারি তারিখে দেবেন্দ্রনাথ পত্রযোগে উৎসাহ দেন এবং ঐ ব্যাপারে তাঁর অনুযোদন জানান।[৪] ফ্রাসবাস সেপার যার উল্লেখ করে লিখেছেন, "Beginning with the graceful bow of the *nateé*" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই নাটকে সেই নটীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। কেবল অভিনয় নয়, তিনি গানও করেন। সংস্কৃতে রচিত একটি বসন্ত বর্ণনার গান। তাঁর সাজসজ্জা ও অভিনয় যে সুন্দর হয়েছিল তার কথা উক্ত সংবাদ পত্রের মন্তব্য থেকেই আমরা জানতে পারি।

'রুক্মকুমারী' নাটকে ও 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে আমরা তাঁকে যে দুটি বিভিন্ন চরিত্রে পাই, এখানকার চরিত্রটি সে দুটি থেকেও ভিন্ন। অভিনয়কলায় পারদর্শিতা না থাকলে এইভাবে বারাবিধ চরিত্র-অভিনয় করা সম্ভব নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই পারদর্শিতার অধিকারী ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উক্ত চরিত্রাভিনয় সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করা যায়। এই ঘটনায় থাকা বোঝা যাবে যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নটী-বেশে মেক-আপও কতটা নিপুণ হয়েছিল। ঘটনাটি এই—নটীর ভূমিকায় অভিনয় ছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কনসার্টের হার্মোনিয়াম বাজিয়েছিলেন। সেদিনের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি সীটন কার্ (Seton Carr)। কনসার্ট শোনার জন্যে, এবং কনসার্টে কি কি বাজনা বাজানো হচ্ছে দেখার জন্যে।

অবনীন্দ্রনাথের জন্ম তখনও হয় নি। কিন্তু তিনি তাঁর 'ঘরোয়া'য় এই অভিনয়ের কথা বলেছেন, "দাদামশায় [গিরীন্দ্রনাথ] করেছিলেন 'নবনাটু

বিলাস' তাঁর প্রেমে ফরলেন'নবনাটক'। এই দোতলার হলে থিয়েটার হবে। স্টেজ কমিটিরা যে কোথায় আছে জানিনে, তার মধ্যে কে কী পার্ট নিয়েছিলেন সব লেখা ছিল। তবু যতটা মনে পড়ে বলছি—নট লেজেছিলেন ছোট পিসেমশাই—নীলকমল মুখোপাধ্যায়। নটী জ্যোতি কাকাবাবু।" তিনি কনসার্টের ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে ঢুকেই তিনি 'Beg your pardon—Zenana, Zenana' বলে অপ্রতিভ হয়ে বেরিয়ে যান। পরে তাঁকে অবশ্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ওখানে, জেনানা কেউ ছিলেন না, যাঁকে দেখে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসেন, তিনি নটী-সাজে সজ্জিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।[৫]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুদর্শন পুরুষ ছিলেন, এই রূপে তাঁকে দেখে মহিলা ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। রসরাজ অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেয়ে বছর-চারেকের ছোট। অমৃতলাল যখন হিন্দু স্কুলে পড়েন তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সেটা ১৮৬৫ সাল। এক-একদিন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গাড়ি আসতে দেরি হলে, গাড়ির অপেক্ষায় তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে থাকতেন তখন অমৃতলাল তাঁর গাড়িতে বসে এক দৃষ্টে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে থাকতেন, ঐ সৌন্দর্য দেখে তাঁর মনে হত যে idea of Greek beauty-র যে impression তখন তাঁর মনে ছিল তিনি নাকি তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। পরে অমৃতলাল তাঁর কৈশোরের এই মনোভাবটির কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অনেকবার বলেছেন।[৬]

অমৃতলাল যে সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হন, তার বছর-দুই পরেই এই নটীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই জন্যে লীটন কাপ্ সাহেবের ভ্রম হওয়াটা সম্ভবত অসংগত হয় নি।

এই ঘটনার অনেক বৎসর পরে, ১৮৮২ সালে, বিদ্বজ্জন-সমাবেশে রবীন্দ্রনাথের 'কালমৃগয়া' নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বশরথের ভূমিকায় অভিনয় করেন—এ কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি নাট্যাভিনয়ে যা-যা প্রয়োজন তার সবগুলির মধ্যেই আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে পাই। নাট্যশালা-স্থাপনে তিনি আছেন, নাটকের চরিত্রাভিনয়ে তিনি আছেন, দৃশ্যসজ্জা-ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ আছে; এমন কি কনসার্ট বাজানোতেও তিনি আছেন।

'নবনাটক' উপলক্ষে তাঁদের যে কনসার্ট বাজে, তাতে এই যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হয়—হার্মোনিয়ম, বেহালা, সিকলো, ক্ল্যারিয়োনেট, বড় বাস্ বেহালা, করতাল, ঢোল, তবলা, মন্দিরা।—এই যন্ত্রাবলী দেখার জন্যেই লীটন কার্ সাহেবের কৌতূহল জেগেছিল।

হার্মোনিয়ম তখন এদেশে প্রায় নূতন। তখন সেতারের খুব চলন। ব্রাহ্মসমাজের জন্যে টেবিল হার্মোনিয়ম এসেছিল। বাংলা গানের সঙ্গে হার্মোনিয়ম বাজানো ব্রাহ্মসমাজেই প্রথম আরম্ভ হয়। প্রথমে সমাজে গানের সঙ্গে হার্মোনিয়ম বাজাতেন বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁরা যখন ছেড়ে দিলেন, তখন তা বাজানোর ভার পড়ল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর। সেই থেকেই বিষ্ণু চক্রবর্তীর গানের সঙ্গে এই যন্ত্রটি বাজাতে আরম্ভ করেন তিনি। পূর্বে বিষ্ণু চক্রবর্তীর গানের সঙ্গে বাজত সারেঙ্গ।

হার্মোনিয়মে এই ভাবে হাত পাকিয়ে তিনি তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় কনসার্টে ঐ যন্ত্রটির ভার গ্রহণ করেন।

ঘোষণা অনুযায়ী নবনাটক রচনার জন্যে রামনারায়ণ পুরস্কার লাভ করেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই—১৮৬৬ সালের ৯ই মে তারিখে—টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারিচাঁদ মিত্রের সভাপতিত্বে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে এক প্রকাশ্য সভায় রামনারায়ণকে পুরস্কার দেওয়া হয়।

অন্য যে দুটি নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তার মধ্যে একটি বিষয়ের উপর লিখিত 'হিন্দুমহিলা নাটক' পাওয়া যায়, নাটক-রচয়িতা বিপিনমোহন সেনগুপ্তকে ১৮৬৮ সালে পুরস্কারও দেওয়া হয়। কিন্তু জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় উক্ত নাটক আর অভিনীত হয় নি। নাটকটির 'বিজ্ঞাপনে' উল্লিখিত আছে যে, ১৮৬৭ সনেই জোড়াসাঁকো 'নাট্যশালা-সমাজ বিগত-জীবন' হয়।

জোড়াসাঁকো-নাট্যশালার জীবন সমাপ্ত হল বটে, কিন্তু এর কাহিনী শেষ হল না—নাট্যশালার ইতিহাসে এটি স্থানলাভ করল।

জানুয়ারি মাসে (১৮৬৭) তাঁদের নাট্যশালায় নবনাটক অভিনীত হল। দেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রশংসা তাঁরা লাভ করলেন, সংবাদপত্রে তাঁদের প্রচেষ্টার সুখ্যাতি প্রকাশিত হল। বন্ধুদের কাছ থেকে উৎসাহ পেলেন, এমনকি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও এ-ব্যাপারে শুভেচ্ছা জানালেন। সত্যেন্দ্রনাথ কয়েক মাসের ছুটিতে এসেছিলেন (২৮ অক্টোবর থেকে

৭ এপ্রিল ১৮৬৭) এপ্রিল মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বেঙ্গলমাদার দলে যোগেশ যোগাইতে।

বোম্বাইতে গিয়ে তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন বিভিন্ন বিদ্যা অনুশীলনে, কিন্তু তাঁদের প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালাটির কথা মনে পড়ে। বোম্বাই যাওয়ার কয়েক মাস পরেই (১৪ জুলাই) এই প্রসঙ্গে তিনি গুণেন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে তাঁকে যে চিঠি লেখেন তার থেকে জোড়াসাঁকো-নাট্যশালার উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ জানা যায়। সামান্য একটি উপলক্ষ্য থেকে যে বৃহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি হতে পারে, একটি সামান্য ক্ষুদ্র বীজ থেকে যে বিশাল মহীরুহের উৎপত্তি ঘটে, তার প্রমাণ এই নাট্যশালা। তাঁদের সেই ইটিং ক্লাবের মত নগণ্য একটি দল থেকে এই নাট্যশালার সৃষ্টি। সেই নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে সে-সময়ে নিশ্চয়ই যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট থেকে কোনো দাবি উঠেছিল, তিনি নিজেকে সম্ভবত অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বলে দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত পত্রপাঠে আমরা জানতে পারি যদুনাথের দাবি ভ্রান্ত নয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবনসায়াহ্নে তাঁদের কমিটি অব কাইণ্ডের সভ্যদের মধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগিনীপতি নারায়ণপ্রসাদের নামের পরিবর্তে অন্যতম ভগিনীপতি যদুনাথের নাম করেছেন, যদুনাথ নাটকে অভিনয় করেছিলেন অবশ্য—চিন্তভোষের ভূমিকায়। কিন্তু তাঁর উক্ত চিঠি থেকে এ বিষয়ে এবং নাট্যশালার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিষয় বিশদভাবে জানা যায়। পত্রটি উদ্ধার-যোগ্য বিবেচনায় এখানে তার পূর্ণাংশ লিপিবদ্ধ হল, আঠারো বৎসর বয়সের বালকের লেখা চিঠি—

14th July (1867)
Ahmedabad.

My dear Goonoodada,

It is but a few days ago that I received a letter from yourself and one from Jadoo (Nath Mookerji) and I have already replied to them. You can't expect any letters to reach you, at least in less than 10 days. The origin of the Jorasanko Theatre is now hidden in the deep folds of rusty antiquity !! It is well that some worthy historian should bring it out into light, and expel the gloom which

still hangs about it. Who knew at that time—in those jolly days of our Eating Club, that acorn would grow into an oak ?—that small beginnings would give birth to mighty things ?—that smoke would blaze into a tremendous conflagration ? who, I say, then looked into the seeds of time on would peep into the womb of futurity ?—who knew in fact that a mouse would give birth to a mountain? Had all this been known to us, we certainly would have taken good care to note down every particular of its birth, would have marked, with a vigilant eye, every symptom which it presented in its embryo state. If we but carry ourselves a couple of years back, we would perhaps find ourseelves seated in the snug little room of old, where we passed the brightest moments of our existance, *which* was the usual haunt of a few merry souls, *which* need to be convulsed with roars of laughter, and with the loud chorus of a dozen voices, where we used to enjoy the delicious songs of *Bama*, pleasant buffooneries of Jadoo, where about all "hot hot" কচুরি and ছোলার used to be heaped up in pyramids ; and it was there—in the self-same place that this Jorasanko Theatre got its being !!! Now let me leave aside all metaphors and rather be homely. It was *Gopal Oorish's Jatra* that suggested us the idea of projecting a theatre. It was Gangooly [Saradaprosad], you and I that proposed it ; and I don't think that Jadoo can claim the credit of being one of its projectors. *I do* think that he had no hand in the matter.

Yours affly

J. N. Tagore.

পত্রটি ঈষৎ দীর্ঘ, কিন্তু পত্রটি একটি ধনিল। নাট্যশালাটি গঠিত হওয়ার মাত্র দুই বছরের মধ্যেই উৎপত্তির ইতিবৃত্ত নিয়ে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। এই পত্রটি না থাকলে, এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে হয়তো সম্পূর্ণ ঘটনাটাই অন্ধকারাবৃত হয়ে যেত। দুই বছরের মধ্যেই worthy historian-এর কথা উঠেছিল যিনি এর প্রতিষ্ঠার মূল এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম সন্ধান করবেন।

সৌভাগ্যক্রমে তেমন ঐতিহাসিকের প্রয়োজন হল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেই, নিজের অজানিতেই, এই দলিলটি রেখে গিয়েছেন।

১ ঃ" Asiatic Journal, August 1826 ;—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)'।

২ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ঘরোয়া'

৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)'।

৪ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'

৫ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস'—"জ্ঞানদাদাবাবু [গিরীন্দ্রনাথ] বাদুবিলাস বলে একটি নাটক লেখা আরম্ভ করেছিলেন, একলার তার অভিনয় হয়েছিল।...অভিনয় কি রকম হয়েছিল বিশেষ কিছু বলতে পারি না। আমরা তো আর সে সময়টায় আসল পাই নি ছঁ'কিছু'কি দিয়ে যা-কিছু দেখা।"

৬ মেজেন্দ্রনাথের পত্র—

নাটোর
ফাল্গুনের ৪র্থ রাত্র ১৭৮৮
[১৮৮১, ১৩ ফেব্রুয়ারি]

শ্রদ্ধাস্পদেষু সত্যেন্দ্রনাথ,

তোমাদের নাট্যশালার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সমবেত নাম দ্বারা অনেকের হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছে, অভিনয়-দর্শনে আমাদের অনেকে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। বিদেশে আমোদ আমাদের দেশের যে একটী অভাব, তাহা এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইবে। পূর্বে আমার মধ্যম দাদার [গিরীন্দ্রনাথ : 'বাদুবিলাস' নাটক রচনা করেন] উপর ইহার ভার আমার অনুরোধ ছিল, তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে। কিন্তু আমি স্নেহপূর্বক তোমাকে জানাইতেছি যে, এ প্রকার আমোদ কেবল তোমে পরিণত না হয়। সত্যেন্দ্রের সহিত এ আমোদকে রক্ষা করিলে আমাদের দেশে সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতি শ্রীমেজেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'জীবনস্মৃতি', গ্রন্থপরিচয়

। বক্তব্য। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিঃ

চিন্তাধারা ও মতবাদ বিকাশের সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য অনুসন্ধান প্রসঙ্গে কার্ল মান্‌হাইম যে পদ্ধতির অবতারণা করেছিলেন সেটা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির চিন্তা-ধারা বিশ্লেষণের এক সুষ্ঠু পরিকল্পনা। যদিও ব্যক্তিই চিন্তার কর্তা এবং সৌষ্ঠবের ধারণা নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত, কোন বিশেষ চিন্তাধারার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য কেবলমাত্র ব্যক্তির অভিজ্ঞতাসমূহ তোলপাড় করার মত ভ্রান্তি আর কিছুই হতে পারে না। কারণ ব্যক্তি একা তার চিন্তাধারার জনক নয় এবং ব্যক্তি চিন্তা করে বলার চেয়ে গোষ্ঠিবদ্ধ ব্যক্তি চিন্তা করে বলা অধিকতর সঙ্গত। মানুষের চিন্তাধারা দুটো পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল: প্রথমতঃ, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পরিস্থিতি যার মাধ্যমে পূর্বপুরুষের চিন্তাধারা ব্যক্তি-মনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, দ্বিতীয়তঃ নিয়ত পরিবর্তনশীল বর্তমান যা চিন্তাধারার রূপ পরিবর্তন করে। কোনও চিন্তাধারাকে গোষ্ঠিবদ্ধ অবস্থায় ব্যক্তির চিন্তা থেকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ অন্যান্য মানুষের সঙ্গে বা বিরুদ্ধে চিন্তা করে। এই বিশেষ প্রক্রিয়ার মূল দিকেটা হল ব্যক্তি যে গোষ্ঠি বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সমাজে সেই গোষ্ঠি বা শ্রেণীর অবস্থান। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উত্তরাধিকারসূত্রে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তার চিন্তাধারা ছিল রবীন্দ্রনাথের, জগদীশ বসুর, প্রমথ চৌধুরীর। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা চিন্তানায়কদের মনে বিজ্ঞানচেতনার উন্মেষে। অর্থাৎ যুক্তি, যুক্তি ও প্রত্যক্ষের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ। এ ছাড়া ছিল সাধারণ বাঙালীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। বিশ শতকে এসে বাঙালী সমাজ যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করে তার আশু ফল হল সমাজমানসের বিভিন্ন স্তরে ধনতান্ত্রিক চেতনার অনধিকার অনুপ্রবেশ। তার থেকে যুক্তিলাভের প্রাণপণ প্রয়াসে বুদ্ধিজীবীরা আজ পর্যন্ত কেবলই আত্মকেন্দ্রিকতার পাকে মুখ সমাজজীবনকে বলিদান করেছে। কিন্তু কিসের থেকে মুক্তি? কেন মুক্তি? শ্রেণীবিরোধের সম্ভাবনা অস্বীকার করার জন্য বুদ্ধিজীবী স্বয়ং নিজেকে ক্লাইন্‌-জেনেরেটে বা শ্রেণীমুক্ত বলে আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু সেটা কি প্রাকৃতিক সত্য? সামাজিক বিবর্তনে প্রথম ধনতন্ত্র ও রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য এই 'শ্রেণীমুক্ত' সম্প্রদায় মূলত বুদ্ধিচর্চার উত্তরাধিকারবশতঃ উপলব্ধি করতে

সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু সেটা নিতান্তই নিষ্ক্রিয় জ্ঞানলব্ধ। 'বক্তব্য'-র লেখক এ সত্য সম্পর্কে সচেতন। 'সবচেয়ে বেশী ছিল জীবন থেকে, বিশেষতঃ সামাজিক জীবন থেকে বিচ্যুতি। যুক্তির চর্চায় আমরা বৃত্তচ্যুত হয়ে পড়ি। বুদ্ধিবাদের সর্বনাশ ঐ করেই ঘটে, আমরাও বাদ পড়িনি (—'নতুন ও পুরাতন')। দেশের আভ্যন্তরীন বিক্ষোভ, স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বলতা ইত্যাদি অবশেষে পরবর্তীকালে বুদ্ধিচর্চার প্রাবল্যকে অনেকাংশে কমিয়েছে, কিন্তু তা শুধু নবতর গ্লানির জন্ম দেওয়ার জন্ত। 'স্বীকার করতে হয় ইচ্ছাশক্তিকে, কর্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্তকে, ঘটনার বিশেষত্বকে, তার প্রাথমিকতাকে; মোটামুটি এই অঙ্গীকারগুলিই আজকালকার যুবকদের মানসিক প্রতিজ্ঞা।' কিন্তু পূর্বতন আত্মকেন্দ্রিকতার উত্তরাধিকারবশতঃই এইসব প্রতিজ্ঞার অবয়বে বেদনার পরিবর্তে তরলতা ও অস্থিরতা বিরাজমান। অর্থাৎ জীবন থেকে বিচ্যুতির জন্ত বুদ্ধিবাদকে দায়ী করা কতখানি সঙ্গত সে সম্পর্কে সন্দেহ আসে। এটা সাধারণভাবে বুদ্ধিজীবীরই ভাগ্যবিড়ম্বনা।

(২)

রুশ বিপ্লব বুর্জোয়াপ্রসাদের চিন্তাধারায় এতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, 'বক্তব্য'র প্রথম কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁর ঐতিহাসিক ও সমাজতান্ত্রিক ধারণসমূহে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আধিপত্য স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। এদের মধ্যে 'ইতিহাস' এবং 'মার্কসবাদ ও মনুষ্যধর্ম' সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিক সংস্কার পরিপূর্ণ ব্যক্তিমানসের পক্ষে অনিবার্য। সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-বিরোধ, বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমাজের উত্থান-পতনের প্রশ্ন এবং ইতিহাসের কোনও ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়, পূর্বের এবং পরের ঘটনাবলীর সঙ্গে পারম্পর্য নিশ্চিত আছে। কিন্তু এই পারম্পর্যবোধ কেবলমাত্র প্রত্যয়ের মাধ্যমে আসতে পারে। বুর্জোয়াপ্রসাদ এখানে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অবিমিশ্রভাবে গ্রহণ করেছেন। শ্রেণীবিরোধই ইতিহাসের চলৎশক্তির উৎস। শ্রেণী, অর্থাৎ সেইসব গোষ্ঠী যারা একে অন্তের শ্রম আত্মসাৎ করে উৎপাদন ক্ষেত্রের অধিকার-বলে, ইতিহাসের মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। শ্রেণীর উৎপত্তি সর্বদাই অর্থনৈতিক কারণ থেকে, ধর্মসংস্কার ইত্যাদি থেকে নয়। অবশ্য এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগই অনেক সময় ধর্মসংস্কারের জন্ম দেয় এবং এই সমকালীনতার আলোচনা

সমাজতন্ত্রের পক্ষে অনেক সময় মূল্যবান। যেমন মার্ক্স, জেবার এর 'দি প্রোটেস্টান্ট্ এথিক অ্যাণ্ড্ স্পিরিট অফ্ ক্যাপিটালিজ্ম্'। এ ছাড়া ইতিহাসের নিছক নমনতাত্ত্বিক দিকও আছে যার প্রতি দুর্খটিপ্রসাদ অতিরিক্ত অবহেলা প্রদর্শন করেছেন। তথাপি সব মিলিয়ে প্রবন্ধটি অতুল গুপ্ত-র 'ইতিহাসের মুক্তি'-র চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

মার্ক্সবাদে ব্যক্তির স্থান নেই—এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে দুর্খটিপ্রসাদ মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইউরোপের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে একটা ব্যাপার প্রতীয়মান হয় যে চক্রাকারের প্রেক্ষিতে মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নরূপ গ্রহণ করেছে। আদিম মানুষ প্রকৃতিকে নিজের চেয়ে শতগুণ বেশী শক্তিশালী বলে মনে করত। তারপরে মোটামুটি নিরাপদ জীবনযাত্রা মানুষের আয়ত্তে আসার পর তার আত্মজিজ্ঞাসা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় পরিণত হল, যতদিন না রেনেসাঁসের কার্টেসীয় বিশ্বচেতনার প্রভাবে মানুষ পুনরায় প্রকৃতির কাছে নগণ্য বলে বিবেচিত হল। এরপরে বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণার পরিবর্তন হতে থাকল। কিন্তু মার্ক্সবাদ এই প্রশ্নের এক মৌলিক উত্তর দিতে সক্ষম। সেখানে মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ হয়েও নিজস্ব ক্রিয়াকলাপের সাহায্য সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের বাহক এবং মানুষের সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিকের সম্পর্ক গতিশীল। মানুষ কোনও অন্ধ নিয়তির ক্রীড়নক নয়, যদিও তার আচার ব্যবহার কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা, যা প্রকৃতপক্ষে বস্তুতান্ত্রিক অর্থোন্নতির প্রচেষ্টামাত্র, দূরীভূত হয়ে পুরুষবাদ সমাজে বিকশিত হওয়ার সুযোগপ্রাপ্ত হচ্ছে। মানুষের আত্ম-জিজ্ঞাসার ইতিহাস এরিশ্ ফ্রোম অন্যপ্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করেছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিসত্তার প্রতি অতিরিক্ত মনোনিবেশের ফলে সামাজিক ইতিহাসে তার বিবিধ পরিবর্তনকে ফ্রোম নির্মমতার দিকে নিরবচ্ছিন্ন ধারা বলে ভুল করেছেন।

(৩)

আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতা প্রবাহক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই সিদ্ধান্ত 'ধরুমা'-র বিভিন্ন পাতায় ছড়িয়ে আছে। এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছে দুই ধরণের আলোচনায়। প্রথমতঃ মার্ক্সীয় বিশ্লেষণে অচিরেই ধরা পড়ে যে এই স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, কেননা এর

নেতৃত্বে যে দলের হাতে অর্থাৎ কংগ্রেস, সেই দল প্রকৃতপক্ষে বিশ মাসিকদের স্বার্থসংগত এবং উচ্চশ্রেণীর স্বার্থে আঘাত হানতে অক্ষম। দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ বস্তুদৃষ্টির সাহায্যে আমাদের সমাজের প্রকৃত মঙ্গল কিসের উপর নির্ভরশীল, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন এবং তাঁর যুক্তি অনুসরণ করলেই আমাদের বিভিন্ন পর্যায়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের দর্শন তথা গান্ধীবাদের আন্তঃসারহীন গলদ সহজেই বোধগম্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক দর্শন কতটা গভীর ও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেটা এখন আমরা ক্রমশঃই বেশী করে অনুভব করছি। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দর্শন ইংলণ্ডের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এবং তার সঙ্গে আমাদের সমাজের কোনও যোগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম এর অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ধর্ম রাষ্ট্র নয়, আত্মনির্ভরশীল উন্নতশির জনগণের সমাজ। রাষ্ট্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ রবীন্দ্রনাথের দর্শনে সমার্থক। যে সব চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছে রবীন্দ্রনাথের এই দর্শন প্রথমেই অর্থবোধক হয়ে উঠেছিল সুধীপ্রধান তাঁদের মধ্যে একজন। তাঁর মতে এই দর্শনের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব সমগ্রতাবোধ—সর্বতোমুখীনতার অন্তর্বর্তী ঐক্যচেতনা। এই সমগ্রতাবোধ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির মধ্যেও বিদ্যমান। উপনিষদের ব্যাখ্যাকার রবীন্দ্রনাথ ও চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ অভিন্ন পুরুষসত্তার প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন মনে আসে। রবীন্দ্রনাথ যতদিন যাবৎ ছবি এঁকেছেন, সেটা তাঁর মত প্রতিভাবান পুরুষের পক্ষে খুব কম নয়। দশ বছরে তাঁর কবিতা ও সঙ্গীত অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে। অথচ তাঁর প্রথম দিকের ছবি এবং শেষ দিকের ছবি মেপে এতটুকু তফাৎ চোখে পড়ে না কেন? আর কোনও প্রতিভাবান চিত্রকরের ক্ষেত্রে এরকম ঘটেছে বলে জানিনা। রবীন্দ্রনাথের চিত্রের এই রহস্য সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

বাঙলার সংস্কৃতির প্রতি কর্তব্যবোধেও সুধীপ্রধান রবীন্দ্রপন্থার অনুসারী। বিশেষতঃ বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়োজন তিনি অত্যন্ত তীব্র ভাবে অনুভব করেছেন। এ সম্পর্কে একটি সুন্দর উক্তি পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমতঃ প্যারিক গেডিস্-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে সামাজিক ইতিহাস রচিত হবে ভৌগোলিক সন্ধানে, জাতির গঠনে (নৃতত্ত্ব আদমসুমারী ইত্যাদি) এবং জাতির উৎপাদনীশক্তির পরিচয়ের উপর। এর সঙ্গে থাকবে জাতির ঐতিহ্য

অর্থাৎ সাঙ্গীতিক শরীরের পরিবর্তন, পরিবর্ধন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাও মূলতঃ এই ছিল। ইতিহাস বলতে তিনি জনধ্যানসের ইতিহাস বুঝতেন।

(২)

সঙ্গীত সম্পর্কে চিন্তাধারায় দূর্জটিপ্রসাদ নিজেকে অনেকাংশে স্বাধীন বলে দাবী করেন। প্রথম জীবনে ধ্রুপদ চর্চার ফলে সঙ্গীত সম্পর্কে শুদ্ধরুচি তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। এ ছাড়া মুস্তিবাদ ও রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে রসগ্রাহিতায় তাঁর সঙ্গীতচিন্তা অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল। সঙ্গীত আসলে একটা আর্ট, তার মূল উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি, একথা স্মরণ রাখার প্রয়োজনীয়তা সকলের বোধগম্য হয়নি। যার ফলে অধিকাংশ সময়ে দেখা যায় খেয়ালগানে সমগ্রতাবোধের অভাব। খেয়াল অধিকাংশ সময়ে শুধু তান সরগম মিশ্রি আওয়াজের এক নির্জীব স্তূপ মাত্র। অথচ কিছুকাল আগেও কৈরাজ যাঁর সঙ্গীতে ছিল রসবোধ সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। খেয়াল গানের স্বাপত্য সম্পর্কে সচেতনতা কেবলমাত্র ধ্রুপদ চর্চার মাধ্যমেই পুনরায় ফিরে আসতে পারে। তরল মনোহারিত্বের স্থান আর যাই হোক ধ্রুপদের মধ্যে নেই। ধ্রুপদের এই শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতধ্যানসে পূর্ণমাত্রায় ছিল। দূর্জটিপ্রসাদও শ্রোতা হিসাবে তার উত্তরাধিকার পেয়েছেন। কিন্তু শুধু ধ্রুপদের চর্চাও সম্পূর্ণ শ্রোতার পক্ষে যথেষ্ট নয়। রসগ্রাহিতার বিকাশ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে ঘটে। ভারতবর্ষে এ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমালোচনা হয়নি। সঙ্গীতজ্ঞরা তাঁদের কর্তব্য শেষ করেছেন ওস্তাদি আর পরনিন্দায়। দূর্জটিপ্রসাদের মতে এর কারণ শিক্ষিত মনের অভাব। তাঁর মতে মূল্যজ্ঞান একটি অখণ্ড মনোভাব এবং এর উদয় শিক্ষার পরেই হতে পারে। এ ছাড়া সমালোচকের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস থাকা দরকার। নিরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের উপর দূর্জটিপ্রসাদ জোর দিয়েছেন। কিন্তু এর বিপদ আছে বলে মনে হয়। মানব মনে সাঙ্গীতিক অনুভূতির উন্মেষ ও ক্রমবর্ধনের উপর সঙ্গীতের প্রতিক্রিয়া জটিল বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্ব এর বিশেষ গভীরে যেতে সক্ষম বলে বিশ্বাস হয় না। তদুপরি এসব কথা সত্য হলেও আংশিক সত্য।

সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় রচিত প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থগুলির অনুসন্ধানের প্রয়োজনীতো দূর্জটিপ্রসাদের দৃষ্টি এড়িয়েছে। এমন কি, 'মূর্ছনা' শব্দের অপব্যবহারে সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক পরিচয়ের অভাব সূচিত

হয়। প্রাচীন গ্রন্থের উপর গবেষণা প্রচুর হলে আমাদের সাঙ্গীতিক ইতিহাস সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ও তজ্জনিত মূল্যায়নের অনেক গোলমাল অপসারিত হবে। তাছাড়া সঙ্গীতে রসবোধ বিকাশের সুযোগ আছে মানবিক সঙ্গীতের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে যার প্রতিফলন স্পষ্ট। লোকরঞ্জক সঙ্গীতের বিভঙ্গগুলি একেবারে মূল্যহীন নয়। অন্ততঃ মিশ্রীকরণমূলক মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাদের সাঙ্গীতিক গুরুত্ব অনেক বেশী।

মোটামুটিভাবে 'বক্তব্য' চিন্তাশীলতার একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। রেনেসাঁসের সর্বজনীন পাণ্ডিত্য অর্জন করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আজ নানা কারণেই সম্ভব নয়। কিন্তু চিন্তার উপযুক্ত চর্চার ফলে অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষেই সর্বজনীন রসগ্রাহিতার অধিকারী হওয়া সম্ভব। চিন্তাশীলতা, বিশেষতঃ সমাজের মানবিক কল্যাণার্থে, সর্বকালে প্রত্যেক সমাজেই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

। মৌমাছি তন্ত্র । শিবনারায়ণ রায় । রেনেসাঁস পাব্‌লিসার্স ।

বাংলা ভাষায় বিশ্ব-সাহিত্যের ব্যাপক আলোচনা ঊনবিংশ শতক থেকে সুরু বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বাঙালীর মনীষা এবং প্রখর জিজ্ঞাসু মন কোন চিন্তাধারাকে শুকিয়ে মিছে যেতে দেয় নি। অথবা নির্বিচার আনুগত্য দেখায় নি। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্যকরূপ বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতেই হয়। রামমোহন রায় থেকে বাংলা ভাষায় যুক্তিবাদী আলোচনার বেগবান স্রোতের সূত্রপাত। এই স্রোত পরবর্তীকালে বহু শাখা-উপশাখায় প্রবাহিত হ'য়ে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য-মণ্ডিত করেছে।

সাম্প্রতিক কালের সমালোচনা-সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি হ'ল বিশেষ দার্শনিক মতাদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকরণ-কে বিচার করা। সমালোচনা-পদ্ধতি নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে না। যুগ-মানসের প্রতিচ্ছবি সমালোচনা-পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। হাল আমলে প্রকাশিত শ্রীশিবনারায়ণ রায়ের "মৌমাছি তন্ত্র" গ্রন্থে অনুরূপ অনুসন্ধিৎসু মনের

পরিচয় পাই। 'মৌথাধি তন্ত্র', 'উদার তন্ত্রের অবক্ষয়', 'গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি' এবং 'চার্চ, রেনেসাঁস ও মানব তন্ত্র' এই চারটি প্রবন্ধের সংকলনে গ্রন্থটি সমৃদ্ধ।

কালান্তর-সোভিয়েত 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজি অনুসৃত স্ব-রাজ্য সাধনার পন্থাকে অসমর্থন করেন। 'সাধনা'-পর্বের সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তিনি বলেছিলেন, ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা অধিকার লাভ করা যায় না; অধিকার সৃষ্টি করতে হয়, অর্জন করতে হয়। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য হ'ল বিদেশী সরকারের হাত থেকে দেশকে জয় করা অপেক্ষা বিদ্বেষের দৈন্যতা ও ঔদাসীন্য থেকে দেশকে মুক্ত করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ১৩২৮ সালে প্রকাশিত 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সমাজের আচারজর্জরিতা, প্রথা দাসত্ব ও চিন্তাহীন অভ্যাসনিষ্ঠতার উদ্বেগ প্রকাশ ক'রে বলেছিলেন, ভবিষ্যৎ স্ব-রাজ্য সাধনার নৈর্ব্যক্তিক সমাজ-শাসনের পরিবর্তে গতিহীন ব্যক্তি-শাসনের প্রবর্তন করলে ভারতবাসীর অন্তঃকরণের জড়ত্ব ঘুচবে না। কারণ 'চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা' দেশ এবং সমাজকে গড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুকণ্ঠে বলা যায়, সমাজ মৌচাক নয়, ব্যক্তি মৌমাছি নয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে শ্রীশিবনারায়ণ রায় 'বুদ্ধি-বিচার ও ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধনের ওপরে যে জীবনাদর্শ ও সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা' তার নাম দিয়েছেন 'মৌমাছি তন্ত্র'। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পরিক্রমা ক'রে তিনি দেখলেন 'সহস্রাব্দীর পর সহস্রাব্দী ধ'রে আমাদের পূর্বপুরুষরা এক আশ্চর্য মৌমাছিতন্ত্র গড়ে তুলেছিলেন'। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাজসনেয়োপনিষৎ বর্ণাশ্রম প্রথা উল্লেখ করেছেন। যে কোন সমাজব্যবস্থা অথবা মতাদর্শের প্রকৃত তাৎপর্য ও তার প্রয়োজনীয়তা-অপ্রয়োজনীয়তা সম্যকরূপ অনুশীলন করতে হ'লে দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা প্রয়োজন। ইতিহাস, পদার্থ-বিজ্ঞান অথবা রসায়ন-বিজ্ঞানের সমপর্যায়ভুক্ত কোন ধ্রুব-বিজ্ঞান নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি-বিবর্তন কার্য-কারণ সম্বন্ধের উপর দৃঢ়ভাবে সু-প্রতিষ্ঠিত। ঊনবিংশ শতকের 'বুদ্ধি, বিচার ও ব্যক্তিত্ব' প্রত্যয় শিবনারায়ণবাবু প্রাচীন ভারতীয় ভাবধারায় খুঁজে পান নি। আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মতাদর্শ প্রাচীন বিশ্ব ইতিহাসে অনুসন্ধান করাটা কি ইতিহাস-বোধের পরিচায়ক?

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের বাঙালী সংস্কৃতি বিশ্লেষণ ক'রে শিবনারায়ণ বাবু বললেন, 'রুশোর অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের এই সৌরাষ্ট্রতত্ত্বে দীক্ষা দিয়েছেন এবং আধুনিক কালে গান্ধী হলেন রুশোর সার্থকতম উত্তরসূরী'। ধর্মতত্ত্ব থেকে একটিমাত্র পংক্তি উদ্ধৃত ক'রে শিবনারায়ণবাবু প্রমাণ করলেন, 'ভক্তিবাদ এবং দেশহিতবাদের মিশ্রণ ঘটিয়ে' বঙ্কিমচন্দ্র 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ' সৃষ্টির দ্বারা 'ভারতীয় বুদ্ধিজীবী চেতনাকে আচ্ছন্ন' করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে শিবনারায়ণবাবুর মন্তব্য পাঠ ক'রে স্বাভাবিকভাবে কতকগুলি প্রশ্ন মনে আসে। বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যায়নে শুধুমাত্র 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থই কি যথেষ্ট? তিনি কি রুশো, বেন্থাম, স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ আদর্শবাদী, উপযোগবাদী এবং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিকের দ্বারা সমভাবে প্রভাবান্বিত হ'ন নি? 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে কি রুশো এবং স্টুয়ার্ট মিলের মতামত ব্যাখ্যা করেন নি? তাঁর কৃষি ও কৃষক সম্পর্কিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রবিরোধী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় কি পাওয়া যায় না? অতএব 'হিন্দু-জাতীয়তাবাদ' বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর একমাত্র সুর এ কথা কেমন করে বলা যায়?

শিবনারায়ণবাবু 'অ-পূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা' সৃজনের এবং মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত খুঁজে পেয়েছেন পেরিক্লিসের এথেন্সে। প্রাচীন গ্রীক সমাজেতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন গ্রীক সমাজের বৃহত্তর অংশ ছিল ক্রীতদাস এবং উচ্চবর্ণের সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণা ছিল না। সংস্কৃতির চর্চা ও পৃষ্ঠপোষকতা শুধু শ্রেষ্ঠীর মধ্যে সীমিত ছিল। ব্রিটীশ জাতীয় আন্দোলনে শিক্ষিতের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবল হওয়ায় শিবনারায়ণবাবু 'স্বাধীন চিন্তার বিসর্জন' 'যুক্তিশীলতার বলিদান' এবং 'সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তির আত্মবিলোপ' দেখতে পেলেন সমগ্র জাতীয় আন্দোলনে। অর্থাৎ তিনি বলতে চান কয়েকজন চতুর নেতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নামক মৌচাকের মধ্যে দেশবাসীকে পুরে দিয়ে তাঁদের মৌমাছি ক'রে তুলেছেন। যুক্তির সমর্থনে তিনি রবীন্দ্রনাথের Nationalism গ্রন্থ এবং তাঁর এন্ড্রুজকে লেখা পত্র থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। জাতীয়তাবাদের সৃষ্টিশীল এবং ধ্বংসমুখী দু'টো প্রধান বিপরীতধর্মী দিক আছে। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের আক্রমণাত্মক ও ধ্বংসাত্মক দিকটি আলোচনা ক'রে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি সৃষ্টিশীল দিকটি

কোথাও আলোচনা করেন নি। কিন্তু ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের গতিশীল ও ঐক্যসৃষ্টির ভূমিকা এবং তাতে দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ঘটনা অনস্বীকার্য। এই প্রসঙ্গে শিবনারায়ণবাবুর আলোচনা অসম্পূর্ণ। তাঁর কল্পিত ঘাত্মাত্যাভিমানের সঙ্গে ব্যক্তির বিবর্তির পারিভাষিক সমীকরণ প্রয়াস নিতান্তই অযৌক্তিক।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'উদারতন্ত্রের অবক্ষয়'। শিবনারায়ণবাবু হ্যালেভেল, ম্যাকাইভার, কার্সিয়ার, ব্রেলিয়াস, হবহাউস, লাসলাস্কো, পারিয়ো প্রমুখ পাশ্চাত্য লেখকদের দীর্ঘ উদ্ধৃতির সাহায্যে এই অবক্ষয়ের কারণ নির্দেশ এবং তা হ'তে পরিত্রাণ-পরিকল্পনা রচনা করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে রেনেসাঁসের যুগে পরিস্ফুট 'উদারতন্ত্রের ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং যুক্তিনির্ভরশীল জীবনদর্শন' প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর রাষ্ট্রপ্রাধান্যের প্রকোপে ক্ষয়গ্রস্ত হ'য়ে পড়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিলের ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্পর্কিত 'চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা' শীর্ষক অধ্যায় থেকে অংশ বিশেষ অনূদিত ক'রে শিবনারায়ণবাবু আলোচনা সুরু করেছেন। তাঁর আলোচনা থেকে মনে হয় স্টুয়ার্ট মিল এবং হার্বার্ট স্পেন্সার-এর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। মিল-এর 'স্বাধীনতা' প্রত্যয় নেগেটিভ চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মিল স্পষ্টভাবে দেখেছিলেন কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ সম্ভব নয়। রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বিরুদ্ধে তাঁর বিশেষ অভিযোগ ছিল না। নাগরিকদের intolerant spirit-কে তিনি অভিযুক্ত করেছিলেন। স্টুয়ার্ট মিল ব্যক্তির কার্যকলাপের পরিধিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম পরিধি একান্তভাবে ব্যক্তিমূলীন; দ্বিতীয় পরিধি ব্যক্তি-সমাজ সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয় পরিধি অর্থাৎ ব্যক্তির সমাজ সম্পর্কিত কার্যকলাপে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ মিল সমর্থন করেছেন। শিবনারায়ণবাবু স্টুয়ার্ট মিল-এর চিন্তাধারার অংশবিশেষ-কে বিবর্তিত করেছেন। বিভিন্ন পাশ্চাত্য লেখকগণের রচনার তাবাতর তাঁর প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে। 'উদারতন্ত্রের সমকালীন অবক্ষয়ের ব্যাখ্যা হিসেবে তাঁদের যুক্তি' শিবনারায়ণবাবুর কাছে 'অত্যন্ত অসম্পূর্ণ বলেছে'। পৃথিবীর কোনো দেশেই তরুণ সমাজ উদারতন্ত্রে অনুপ্রেরণা পাচ্ছে না, এটাই তাঁর মতে সম্প্রতি কালের প্রধান সমস্যা।

ব্যক্তি সম্পর্কে শিবনারায়ণবাবুর ধারণা নিতান্ত abstract বা অমূর্ত। কারণ তিনি বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, রেনেসাঁসের বৈষয়িক মানুষ

(universal man) উনবিংশ শতকের উদারতন্ত্রী দর্শনে পর্যবসিত হ'ল বৈষয়িক মানুষে (economic man)। বৈষয়িক মানুষের অস্তিত্ব শুধুমাত্র দেখা যায় ভাববাদী লেখকগণের চিন্তাধারায়। মানবেতিহাসে এর অস্তিত্ব অস্তিত্ব দেখা যায় না। ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিপরীত দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি আবিষ্কার করলেন, আঠার-শতক অর্থাৎ বেনথামী সভ্যতা শুরু হওয়ার ফলে উদারতান্ত্রিক ভাবধারার বহুমুখী বিকাশ স্তিমিত হয়েছে। বেনথামী সভ্যতা আরম্ভের পূর্বে আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চরম বিশৃংখলার মধ্যে উদারতান্ত্রিক ভাবধারা বিকাশের চিন্তা অনৈতিহাসিক। শিবনারায়ণবাবু আক্ষেপ করেছেন যে, পলিটিস্তিক্যুসের প্রভাবে পরবর্তীকালের উদারতন্ত্রীরা ব্যক্তির মূল্য এবং 'মানুষের মৌলিক অধিকারাবলীকে স্বতঃসিদ্ধ' ব'লে অস্বীকার করেছেন। কারণ তাঁদের মতে সামাজিক নির্দেশ হ'ল মানুষের অধিকারের উৎস। এই প্রবন্ধে শিবনারায়ণবাবু মানুষের 'স্বতঃসিদ্ধ অধিকার' এবং 'সর্বজনীন প্রকৃতি'-র উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই শব্দগুলির সঙ্গে natural right বা প্রাকৃতিক অধিকার এবং natural law বা প্রাকৃতিক আইন প্রত্যয়গুলির ঘনিষ্ঠ যোগ বর্তমান। ইউরোপীয় সমাজ চিন্তার ইতিহাসে প্রাকৃতিক সমাজে প্রাকৃতিক অধিকারসম্পন্ন স্বাধীন মানুষের কাল্পনিক অস্তির-চিন্তা সর্বজনবিদিত। স্বতঃসিদ্ধ অধিকার সম্পন্ন' ব্যক্তির অস্তিত্ব বহুকাল পূর্বে অস্বীকৃত হয়েছে। সমাজ অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি এবং ব্যক্তি-অধিকার প্রত্যয়গুলি অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হয়। 'বিশ্বজনীন প্রকৃতি', 'স্বতঃসিদ্ধ অধিকার' প্রভৃতি প্রত্যয়গুলি এক বিশেষ সামাজিক অবস্থার উদ্ভূত মূল্য-মানেরই প্রতিফলন মাত্র। ব্যক্তিমূল্য ব্যক্তি-অধিকার সম্পর্কিত পনের-ষোলো-সতের শতকের ধারণায় শিবনারায়ণ বাবু গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সেজন্য উদারতন্ত্রে অবক্ষয়ের প্রকৃত কারণ অন্বেষণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। এক বিশেষ সামাজিক পটভূমিতে উদারতন্ত্রের জন্ম এবং তার বহুমুখী বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। সম্প্রতি কালে সেই পরিবেশ এবং পটভূমি বিলুপ্ত অবক্ষয়িত।

শিবনারায়ণবাবু আগেই ব'লে রেখেছেন 'ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতায়' তিনি আস্থাহীন। সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার কবল থেকে উদারতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিকে মুক্ত করার জন্য তিনি বিকল্প কার্যকরী প্রস্তাব পেশ করেছেন। সংক্ষেপে তা হ'ল 'সমবায়ের ভিত্তিতে স্বাধীন গণ-সংগঠন এবং অন্যদিকে

সামাজিক ক্ষমতা এবং দায়িত্বের ক্রমিক বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত' করা। সমসাময়িক কালের ব্যক্তি সমাজ সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যার সমাধানস্বরূপ এটাই তাঁর মূল বক্তব্য। সমাজ-রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে এ ধরণের চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়েছে বহুপূর্বে। শিবনারায়ণ বাবুর বক্তব্যে মৌলিকত্ব বা অভিনবত্ব আদৌ নেই। রাষ্ট্রের অমত এবং এবং একক সার্বভৌমত্ব প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে ইউরোপের political pluralists বা রাষ্ট্রনৈতিক বহুত্ববাদীদের আক্রমণ এবং যুক্তিসমূহ অত্যন্ত সুপরিচিত। বহুত্ববাদীদের 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশ তত্ত্ব' আজ পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্য কোন সমকালীন আলোচনায় আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে না। এমন কি অধ্যাপক হ্যারল্ড ল্যাস্কির মত বহুসমাদৃত বহুত্ববাদী প্রবক্তা শেষ পর্যন্ত এই প্রত্যয় ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে আস্থা হারান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে অধ্যাপক ল্যাস্কি রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং সমাজ-রাষ্ট্র-ব্যক্তি সম্বন্ধ নিরূপণে উদারতন্ত্রবাদ এবং বহুত্ববাদের সর্বাঙ্গীন ব্যর্থতার অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। উদারতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতিশ্রুতিসমূহকে বর্তমান অবস্থা হ'তে মুক্ত করার জন্য শিবনারায়ণবাবুর প্রস্তাবটি আদলে পাঠ্য-পুস্তকে বহু আলোচিত বিষয়ের নামান্তর মাত্র। উদারতন্ত্র অবক্ষয়ের প্রকৃত কারণ এবং তা হ'তে সম্ভাব্য মুক্তির উপায় নির্ণয়ে তিনি পাঠকদের সমভাবে হতাশ করেছেন।

সুদীর্ঘ পরিসরব্যাপী প্রবন্ধে 'গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি' আলোচিত হয়েছে। শিব-নারায়ণবাবু বহু গ্রন্থ আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষা কি ভাবে ব্যাপকভাবে ব্যবসায়ীকুলের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এবং সমকালীন বিশ্ববিদ্যা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পণ্যদ্রব্যে পর্যবসিত হ'তে চলেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের মত একনায়কতন্ত্রাদিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রসঙ্গ বাদ দিয়েও দেখা যায়—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক দেশে বহুসমালোচনা বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত ম্যাকার্থির অযৌক্তিক রক্তচক্ষুর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। এক কথায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিসেবীরা বিবেকপ্রণোদিত স্বাধীন সংস্কৃতিচর্চা হ'তে নিজেদের বিরত রেখে ভয়ত্রাস লোকরঞ্জন মহাযজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন। সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্ঞানীগুণীদের এই স্বধর্মচ্যুতিতে শিবনারায়ণবাবু ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁর মতে সংস্কৃতি-কর্মীদের দায়িত্বপালন পরাক্ষুব্ধতার মূলে আছে আধুনিক

সভ্যতার কেন্দ্রাভিগ গতি এবং এই গতিকে অপ্রতিরোধ্য ব'লে স্বীকার করার মনোভাব। এই কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার হাত থেকে সংস্কৃতিকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। শিবনারায়ণবাবু ব্যাধির প্রতিকার নির্দেশ করতে গিয়ে মৌমাছি আশ্রয় অবাস্তব প্রকাশ করেছেন। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার কেন্দ্রাভিমুখ গতি অবশ্যম্ভাবী। উনবিংশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যবস্থাপত্রের দ্বারা আধুনিক কালের রাষ্ট্র-ব্যাধির নিরাময় হয় না। আধুনিক রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং চরিত্র আমূলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে কেন্দ্রাভিমুখী প্রবণতা অনস্বীকার্য। বিকেন্দ্রীয়, স্বয়ং-সম্পূর্ণ আকলিত ক্ষমতা সামন্ততন্ত্রের স্মারক মাত্র। অবশ্য কেন্দ্রাভিমুখিনতার নামে কেন্দ্রীয়নমনতা সমর্থনযোগ্য নয়। সাম্প্রতিক কালে বুদ্ধিজীবী এবং সংস্কৃতিকর্মীরা তাঁদের দায়িত্ব সম্যকভাবে পালন করছেন না এ কথা সত্য। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সর্বাধুনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীরা উচ্চমানের বুদ্ধিচর্চার পরিবেশ লাভ করবেন শিবনারায়ণ বাবুর এ সিদ্ধান্তটি নিতান্ত অনৈতিহাসিক।

শেষ প্রবন্ধ 'চার্চ, রেনেসাঁস ও মানবতন্ত্র'। এই প্রবন্ধে শিবনারায়ণবাবু রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে ক্রিশ্চান চার্চ কি ভাবে সংগঠিত হ'য়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের সৃষ্টি করেছিল সে কাহিনী বিবৃত করেছেন। কেমন ভাবে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপীয় মানসে জ্ঞানান্ধ পলাতক পুনরায় প্রজ্বলিত হ'ল তার বিবরণ পাই এ প্রবন্ধে। বহু গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের উল্লেখ ছাড়াও কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য রেনেসাঁস সম্পর্কে ইংরেজী এবং ফরাসী ভাষায় লিখিত পুস্তক তালিকা তিনি দিয়েছেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও মানবতন্ত্রের দীর্ঘ বিবরণ পাঠের পরেও কৌতূহলী পাঠক অতৃপ্ত থেকে যান। রেনেসাঁস সম্পর্কিত অধিকাংশ উচ্চমানের পাঠ্য পুস্তকে রেনেসাঁস-সংস্কৃতি ও মানবতন্ত্রের অনুরূপ বিবরণ খুঁজে পাওয়া দুর্লভ নয়। ভারতীয় রেনেসাঁস ও মানবতন্ত্রবোধের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। শুধুমাত্র ইউরোপীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির পর্যালোচনা যথেষ্ট নয়। শিবনারায়ণবাবু মাত্র এক লাইনে রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখ ক'রে যে কর্তব্য পালন করেছেন। রেনেসাঁস এবং মানবতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তাঁর ব্যবস্থাপত্র এ গ্রন্থের অন্যান্য প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

সরল চট্টোপাধ্যায়

আমার কথা

বিনোদিনী দাসী

বাল্য-জীবন

অনুরোধ

মহাশয়!

বহু দিবস গত হইল, সে বহুদিনের কথা, তখন মহাশয়ের নিকট হইতে এরূপ অজ্ঞাতভাবে জীবন মুক্তাঙ্কিত ছিল না। সে সময় মহাশয়, বারবার কতবার আমাকে বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বর বিনা কারণে জীবের সৃষ্টি করেন না, সকলেই ঈশ্বরের কার্য্য করিতে এ সংসারে আসে, সকলেই তাঁহার কার্য্য করে; আবার কার্য্য শেষ হইলে দেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।" আপনার এই কথাগুলি আমি কতবার আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু আমি তো আমার জীবন দিয়া বুঝিতে পারিলাম না যে আমার ন্যায় হীন ব্যক্তির দ্বারা ঈশ্বরের কি কার্য্য হইয়াছে, আমি তাঁর কি কার্য্য করিয়াছি, এবং কি কার্য্যই বা করিতেছি; আর যদি তাহাই হয় তবে এতদিন কার্য্য করিয়াও কি কার্য্যের অবসান হইল না? আজীবন যাহা করিলাম, ইহাই কি ঈশ্বরের কার্য্য? এরূপ হীন কার্য্য কি ঈশ্বরের?

বার বার আমার অশান্ত হৃদয় জিজ্ঞাসা করে, "কৈ সংসারে আমার কার্য্য কৈ?" এই তো সংসারের পাঠশালা হইতে বিদায় লইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। তবে এতদিন আমি কি করিলাম? কি সান্ত্বনা বুকে লইয়া এ সংসার হইতে বিদায় লইব। আমি কি সম্বল লইয়া মহাশয়ের সন্নিকট হইব। মহাশয় অনেক বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, আমায় বুঝাইয়া দিন, যে ঈশ্বরের কোন্ কার্য্যে আমি ছিলাম ও আছি এবং থাকিব।

অনুগৃহিতা।

২য় পত্র।

৭ই শ্রাবণ।

মহাশয়!

মরুভূমে পতিত পথিকের তৃষ্ণায় আকুল প্রাণ যেমন দূরে সুশীতল সরোবর দর্শনে তৃপ্তি পায়; সেইরূপ মহাশয়ের আশা-বাক্যে আমার প্রাণের কোণে

আবার আমার আলোক দেখা দিতেছে। কিন্তু যে ঈশ্বরের জগতপূর্ণ নাম, কোথায় সে ঈশ্বর? কোথায় সেই দয়াময়? যিনি আমার মত পাপী তাপীকে দয়া করেন? আপনি লিখিয়াছেন, "কি কার্য্যে সংসারে আছি, তাহা জানিবার আমাদের অধিকার নাই। যিনি সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা তিনিই জানেন।" অবশ্যই জানেন। তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী তিনি তো জানিবেনই। কিন্তু আমার কি হইল? আমার যে আলা সেই আলাই আছে, যে শূন্যতা সেই শূন্যতাই। আমার কি হইল? আমার লাঞ্ছনার জন্য কি রাখিলেন? শেষ অবলম্বন একটী বহুমূল্য কন্যা দিয়াছিলেন আমি তো তাহা চাহি নাই, তিনিই দিয়াছিলেন তবে কেন কাড়িয়া লইলেন? তনেছিলাম স্নেহের দান ফুরায় না। তার কি এই প্রমাণ? না অভাগিনীর ভাগ্য? হায়! ভাগ্যই যদি এত বলবান, তবে তিনি পতিতপাবন নাম ধরিয়াছেন কেন? দুর্ভাগা না হইলে কেন আজিকার করিব, কেন এত কাঁদিব। যে ধন ভক্তি ও সাধনের অধিকারী সে তো জোর করিয়া লয়। প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি আর আর ভক্তগণ তো জোর করিয়া লইয়াছেন। আমার মত অধম, যদি চিরযাতনার বোঝা বহিয়া অনন্ত নরকে গেল, তবে তাঁহার পতিতপাবন নাম কোথায় রহিল?

আপনি লিখিয়াছেন—"তোমার জীবনে অনেক কার্য্য হইবার্ছে, তুমি রঙ্গালয় হইতে শত শত ব্যক্তির হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করিয়াছ। অভিনয় ছলে তোমার অদ্ভুত শক্তি দ্বারা যেরূপ বহু নাটকের চরিত্র প্রস্ফুটিত করিয়াছ, তাহা সামান্য কার্য্য নয়। আমার 'চৈতন্যলীলায়' চৈতন্য সাজিয়া বহুলোকের হৃদয়ে ভক্তির উচ্ছ্বাস তুলিয়াছ ও অনেক বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছ। সামান্য ভাগ্যে কেহ এরূপ কার্য্যের অধিকারী হয় না। যে সকল চরিত্র অভিনয় করিয়া তুমি প্রস্ফুটিত করিয়াছিলে সে সকল চরিত্র গভীর ধ্যান ব্যতীত উপলব্ধি করা যায় না। যদিও তাহার ফল অদ্যাবধি দেখিতে পাও নাই, সে তোমার দোষে নয় অবস্থায় পড়িয়া, এবং তোমার অনুতাপের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে অচিরে সেই ফলের অধিকারী হইবে।"

মহাশয় বলিতেছেন—দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছি। দর্শক কি আমার অন্তর দেখিতে পাইতেন। কৃষ্ণ নাম করিবার সুবিধা পাইয়া কার্য্যবাসে, অন্তরে বাহিরে কত আকুল প্রাণে ডাকিয়াছিলাম। দর্শক কি তাহা দেখিয়াছেন? তবে কেন একবার আমার প্রদীপ নিবিয়া যাইল? আর অনুতাপ। সমস্ত জীবনই তো অনুতাপে গেল। পদে পদে তো অনুতপ্ত

হইয়াছি, জীবন যদি সংশোধন করিবার উপায় থাকিত, তাহা হইলে অনুতাপের ফল হইতে বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু অনুতাপের কি ফল ফলিয়াছে? এখনও তো স্রোতে মগ্ন তৃণ প্রায় ভাসিয়া যাইতেছি। তবে আপনি কাহাকে অনুতাপ বলেন জানি না। এই যে তখন ছোড়া যাতনার বোঝা লইয়া তীর বিশ্বব্যাপী দরজায় পড়িয়া আছি কেন মরা যাই না। আর ডাকিব না, আর কাঁদিব না বলেও যে "হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ" করিয়া হৃদয়ের নিভৃত কোণ হইতে যাহাকে ডাকিতেছি, কোথায় সে হরি?

বাল্য কাল হইতে কত সাধ, কত বাসনা, কত সরল সৎপ্রবৃত্তি কালের কোলে ডুবিয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া বলিব? কৃষ্ণ নাম স্মরণ করিয়া, জগৎ-মুক্তির জগদীশ্বরের দিকে যে বাসনা সৎপথে ছুটিতে চাহিত, তখনি মোহজালে জড়িত মন তাহাকে চোরাবালির মোহে ডুবাইয়া দিয়াছে। যখন জোর করিয়া উঠিতে আরম্ভ হইত, কিন্তু চোরাবালিতে পড়িয়া ডুবিয়া গিয়া, জোর করিয়া উঠিতে গেলে যেমন বালির বোঝা সব চারিদিক হইতে আরও উপরে আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পাতালে ডুবাইয়া দেয়, আমার দুর্বল বাসনাকেও তেমনি মোহ-ঘোর আসিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে। বলহীন বাসনা আশ্রয় পায় নাই, ডুবিয়া গিয়াছে। চোরাবালিতে পড়িয়া পুতে যাওয়ার ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে ডুবিয়াছে। কিন্তু এখন তাই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছি যে বাসনা প্রবৃত্তি উপরে ছুটিতে চায়। কে যেন ধাক্কা ধরিয়া ডুবাইয়া দেয়, তাহা তো বুঝিতে পারি না। তখন কত কাতরে কাঁদি, তবু ডুবি। শক্তিহীন দুর্বল বলিয়াই ডুবি। বলিতে গেলে অনেক বলিতে হয়। মহাশয় মনের আবেগে কত কথা আসিয়া পড়িতেছে। যাহার দিকে চাহিয়া, যাহাকে বড় আপনার করিয়া বড়ই অনাথ হইয়া চরণ ধরিয়া আপনার করিতে যাই, তবু দূরে বহুদূরে পড়িয়া থাকি। অধিক বলিয়া বিরক্ত করিব না, এক্ষণে বিদায় হই।

অভাগিনী।

৩য় পত্র।

মহাশয়।

পূর্ব্বের অবস্থা যাহাই থাকুক, উপস্থিত অবস্থায় কি কার্য্যে আছি! কৃষ্ণ, অবর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ আশা শূন্য, দিনযামিনী এক ভাবেই যাইতেছে, কোনরূপ উৎসাহ নাই। রোগ-শোকের তীব্র কষাঘাতে, নিরুৎসাহের জড়তায় আমার

হইয়া অপরিবর্তিত ভোগ চলিতেছে। আহার, নিদ্রা ও দুশ্চিন্তা, প্রতিদিনের ছবি একদিনে পাওয়া যায়, আজ একরূপ কাল অন্যরূপ কোনই পরিবর্তন নাই। কেবল মাত্র প্রভেদ এই কখন কখন রোগের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় সর্ব্বক্ষণ অবস্থিতি। কেহ যত্ন করিয়া উপদেশের চেষ্টা করিলে, সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত হইতে বলিলে মনে মনে হাসি পায়। কারণ তাঁহারা এই বলিয়া আশ্বাস দেন, বলেন "সুস্থ হইয়া যাও কোনরূপ চিন্তা করিও না।" আমি ভাবি তাঁহারা আমার অবস্থা বোঝেন না। তাঁহারা বোঝেন না যে যদি চেষ্টা করিয়া সুস্থ থাকা সম্ভব হইত, সে চেষ্টা শত সহস্ররূপে হইয়াছে, এবং তাঁহাদের বলার অপেক্ষা থাকিত না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে তাঁহারা আমার মতন ভাগ্যহীনা লোকের যন্ত্রণা অবস্থা না বোঝেন। কারণ এরূপ অবস্থায় না ঠেকিয়া কেহ বুঝিতে পারে না। সততই মনে হয় যে এই আশাশূন্য দুশ্চিন্তায় সদা সর্ব্বদা মগ্ন থাকাই কি ঈশ্বরের কার্য্য? সর্ব্বদাই বলি ভগবান আর কতকাল। দুঃখের অবসান না হউক অন্ততঃ মৃত্যির অনন্ত যাতনা হইতে নিস্তার পাইয়া শান্তি লাভ করি। সে যন্ত্রণা অতি তীব্র। বিনীত ভাবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এইরূপ জরাজীর্ণ দেহ লইয়া অবসন্ন ভাবে সংসারের এক কোণে পড়িয়া থাকিয়া কি আপনার মতে ঈশ্বরের কার্য্য হইতেছে?

৪র্থ পত্র।

মহাশয়!

আপনাকে যখন দুঃখের কথা জানাইয়া পত্র লিখি, পত্রের উত্তরে আপনার সান্ত্বনা বাক্যে আশার ক্ষীণ আলোক হৃদয়ে দেখা দেয়। কিন্তু সে ক্ষণিক— বৈশাখের রজনীতে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায়। আপনি তো জানেন আমার ভবোষধ হৃদয়ের আলোক যন্ত্রণ একটী কন্যা অযাচিত রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সে কন্যাটী নাই। এক্ষণে আমার গাঢ়তমাচ্ছন্ন হৃদয় গাঢ়তর তিমিরে ডুবিয়াছে। যত প্রকারে সান্ত্বনা আসিবার চেষ্টা পাই সকলই বিফল। "ঈশ্বর দয়া কর" "হরি দয়া কর"—বারম্বার বলি সত্য, কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে দেখিতে পাই যে আমার সেই প্রাণপ্রতিমার জন্য আমি লালায়িত। যেমন দিক নির্ণয় যন্ত্রের সূচিকা উত্তরাভিমুখে থাকে, আমারও মন সেইরূপ সেই হারানিধিকে লক্ষ্য করিয়া আছে। যিনি মাতার বেদনা জানেন না, তিনি আমার বেদনা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কন্যার জন্ম হইতে

মরণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঘটনা আমার জীবন দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া আছে। এ অবস্থায় শান্তি কোথায়? সততই মনে হয়, আমি কি এই দারুণ যন্ত্রণা ভোগের জন্য সৃষ্টি হইয়াছি। আপনার নীতিগর্ভ-বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলে হয়তো বা শান্তিলাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু সে বিশ্বাস আমার কোথায়? বাল্যকাল হইতে সংসারচক্রে পড়িয়া অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি, এই অবিশ্বাসের জন্য আমার অভিভাবক, সাংসারিক অবস্থা ও আমি নিজে দায়ী। কিন্তু দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ফল কি? অবিশ্বাস অবিশ্বাসই আছে। অবস্থায় পড়িয়া যে দিকে মনের গতি, তাহার বিপরীত দিকে চিরদিনই চালিত হইয়াছে। এই বিপরীত যুদ্ধে শরীর-মন জর্জ্জরীভূত। বলিয়াছি আমার হৃদয় সেই স্নেহ-প্রতিমার দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহার আলোচনা দুঃখময়, কিন্তু সেই আলোচনাই আমার সুখ। হতাশাপূর্ণ সন্তান-হারা হৃদয়ে আর অপর সুখ নাই। অবিশ্বাসের মূল কিরূপ দৃঢ় হইয়া অন্তরে বসিয়াছে, তাহা আমার জীবনের ঘটনাবলি শুনিলে বুঝিতে পারিবেন। আপনি বলেন, আমার আজীবন বৃত্তান্ত শুনিলে, আমি যে ঈশ্বরের কার্য্যে সন্দেহ করিয়াছি, তাহা ঘুচাইয়া দিবেন। আমিও আমার আদ্যোপান্ত ঘটনাগুলি বিবৃত করিব। যদি কৃপা করিয়া শুনেন, বুঝিতে পারিবেন অবিশ্বাস কিরূপে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। এবং তাহার উচ্ছেদ অসম্ভব। শান্তির মূল বিশ্বাস, ইহা বুঝিতে পারি, কিন্তু সেই বিশ্বাস কোথায়? আমার প্রতি আপনার অশেষ স্নেহ, এই নিমিত্ত সাহস করিয়া আদ্যোপান্ত বলিতেছি। কৃপা করিয়া শুনুন। শুনিতে শুনিতে যদি বিরক্তি জন্মায় পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিবেন। শুনিবেন কি?

মহাশয় আপনি আমার ক্ষুদ্র জীবনী শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। ইহা আমার পক্ষে সামান্য শ্লাঘার বিষয় নয়। আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতেছি দয়া করিয়া শুনিলে কৃতার্থ হইব এবং আপনার ন্যায় মহৎ লোকের নিকট হৃদয়ের বোঝা নামাইয়া এ দুর্ব্বিসহ হৃদয়ভার কতকটা লাঘব করিব।

১ম কথা (পল্লব) রঙ্গালয়ে প্রবেশের সূচনা

বাল্য-জীবন

আমার জন্ম এই কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে সম্ভ্রান্ত সম্পত্তিহীন বংশে। তবে দীন দুঃখী বলা যায় না, কেননা কষ্টে-ক্লেশে এক রকম দিন গুজরান হইত। তবে বড় সুশৃঙ্খলা ছিলনা, অভাব যথেষ্টই ছিল। আমার

মাতামহীর একখানি নিজ বাটী ছিল। তাহাতে খোলার ঘর অনেকগুলি ছিল। সেই কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ১৪৫ নম্বর বাটী এখন আমার অধিকারে আছে। সেই সকল খোলার ঘরে কতকগুলি দরিদ্র ভাড়াটিয়া বাস করিত। সেই আয় উপলক্ষ করিয়াই আমাদের সংসার নির্ব্বাহ হইত। আয় তখন ব্রহ্মাদিসকল সুলভ ছিল; আমরাও অল্প পরিবার। আমার মাতামহী, মাতা আর আমরা দুটী ভ্রাতা ভগ্নী। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের সহিত আমাদের দারিদ্র্য দুঃখ বাড়িতে লাগিল, তখন আমার মাতামহী একটী মাতৃহীনা আড়াই বৎসর বয়সের বালিকার সহিত আমার পঞ্চবর্ষীয় শিশু ভ্রাতার বিবাহ দিয়া তাহার মাতার যৎকিঞ্চিৎ অলঙ্কারাদি ঘরে আনিলেন। তখন অলঙ্কার বিক্রয়ে আমাদের জীবিকা চলিতে লাগিল। কারণ ইহার অগ্রেই মাতামহীর ও মাতাঠাকুরানীর যাহা কিছু ছিল, তাহা সকলই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

আমার মাতামহী ও মাতাঠাকুরানী বড়ই স্নেহময়ী ছিলেন। তাঁহারা স্বর্ণকারের দোকানে এক একখানি করিয়া অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী আনিয়া আমাদের হাতে দিতেন, অলঙ্কার বিক্রয় জন্য কখন দুঃখ করিতেন না।

আমার সেই সময়ের একটী কথা মনে পড়ে; আমার যখন বয়স বছর সাতেক তখন আমার মাতা কাহাদিগের কর্ম্ম-বাড়ী গিয়া আমাদের জন্য কয়েকটী সন্দেশ চাহিয়া আনিয়াছিলেন। অনুগ্রহের দান কিনা, তাহাতেই দশ পনের দিন তুলিয়া রাখিয়া, মাসা কাটাইয়া আমার মাতার হাতে দিয়াছিলেন; এখন হইলে সে সন্দেশ দেখিলে অবশ্য নাকে কাপড় উঠিত। আমার মাতা তাহা বাটীতে আনিয়া আমাদের তিনজনকে আনন্দের সহিত খাইতে দেন। পাছে সেই দুর্লভ সামগ্রী শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এইজন্য অতি অল্প করিয়া খাইতে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা হইয়াছিল। এই আমার সুখের বাল্যকালের ছবি।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অতি অল্প বয়সেই আমার মাতাকে চিরদুঃখিনী করিয়া এ নারকীদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। আমার ভ্রাতার মৃত্যুতে আমার মাতামহী ও মাতাঠাকুরানী একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন। আমার ভ্রাতা অসুস্থ হইলে অর্থের অভাবে তাহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইতে হয়। আমরা দুটি ক্ষুদ্র বালিকা বাটীতে থাকিতাম। আমাদের একটী

ধনাবতী প্রতিবেশিনীর জন্য আমাদের আহারাদির কোন কষ্ট হইত না। তিনি আমাদের সঙ্গে করিয়া আমার মাতার ও মাতামহীর আহার লইয়া ডাক্তারখানায় আমার ভ্রাতাকে দেখিতে যাইতেন। কোন কোন দিন তাঁহাদের আহার করিবার জন্য বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তিনি নিজে আমার ভ্রাতার নিকট বসিয়া থাকিতেন। পরে আমার তাহারা আমার সন্ধান করিয়া সেইখানে যাইলে আমাদের সঙ্গে করিয়া বাটী আসিতেন। কেবল আমাদের বলিয়া নহে, তিনি স্বভাবতই পরোপকারিণী ছিলেন। যদি রাত্রে দ্বিপ্রহরের সময় কেহ আসিয়া তাঁহাকে বিপদ জানাইত, তখন অমনি কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গে তাহাদের বাটী যাইতেন। পরে নিজের শরীর দ্বারাই হউক আর পয়সার দ্বারাই হউক লোকের উপকার সাধন করিতেন। তাঁহার মতন পরোপকারিণী এখনকার দিনে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার নিজের কিছু সম্পত্তি ছিল, সংসারে তাঁহার আর কেহ ছিল না। পরোপকারই তাঁহার ব্রত ছিল।

উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়েই আমার ভ্রাতার মৃত্যু হয়। সে দিন আমার স্মৃতি-পটে জাজ্বল্যমান আছে। তখন ভাবিতে লাগিলাম আমার আমার ভাই আসিবে না কি? মনে নিলে যে আর ফিরাইয়া দেয় না, মূর্চ্ছণে তখন হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। আমার মাতামহী আমার ভ্রাতাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন কিন্তু অতিশয় ধৈর্য্যশালিনীও ছিলেন। তাঁহার গুণা ছিল, ডাক্তারখানায় মরিলে মড়া কাটে, গতি করিতে দেয় না। যেমন আমার ভ্রাতা প্রাণত্যাগ করিল, তিনি অমনি সেই মৃতদেহ বুকে করিয়া তিনতলার উপর হইতে ভক্ ভক্ করিয়া নামিয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে যেন ছুটিলেন। আমরা আমার ভ্রাতার হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলাম। আমার মাতাঠাকুরানী কেমন বিকৃত স্বরে হইয়াছিলেন, তিনি হাঃ হাঃ করিয়া মাঝে মাঝে হাসিতে লাগিলেন। আমাদের অবস্থা দেখিয়া ডাক্তারখানার বড় ডাক্তার বলিতে লাগিলেন; "বাড় হইও না, আমরা মরে রাখিব না।" কিন্তু দিদিমাতা শুনেন নাই, তিনি একেবারে কোলে করিয়া লইয়া গঙ্গার তীরে মৃতদেহ শয়ান করাইয়া দেন। গঙ্গার উপর সেই ডাক্তারখানা। তখন একজন ডাক্তার সেইখান পর্য্যন্ত দৌড়া করিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন যে "এখনই সৎকার করিও না, অতিশয় বিষাক্ত ঔষধ দেওয়া হইয়াছে, আমি আবার আসিতেছি।" পরে তাঁহারা ঘণ্টাখানেক সেই গঙ্গাতীরে সেই মৃতদেহ কোলে

লইয়া বসিয়াছিলেন। সেই ডাক্তার বাবু আসিয়া আমার অনুমতি দিলে তবে কালী দিবের ঘাটে এনে তাকে চিতায় শয়ন করান হয়। ইতিমধ্যে আমাদের সেই দয়াবতী প্রতিবেশিনী তথায় উপস্থিত হন। তিনি বাটী হইতে কিছু অর্থ আনিতে দিয়াছিলেন। ভ্রাতার অবস্থা খারাপ দেখিয়া তার আগের রাত্রে আমি ও ভ্রাতৃবধূ সেইখানেই ছিলাম। এর ভিতরে আর একটী দুর্ঘটনা ঘটিতে ঘটিতে রক্ষা হয়। ভ্রাতার সৎকারের জন্য আমার শাশুড়ী ও সেই প্রতিবেশিনী যখন ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় মা আমার আস্তে আস্তে গঙ্গার জলে কোমর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিলেন। আমি মা'র কাপড় ধরিয়া খুব চিৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকায় আমার দিদিমাতা দৌড়াইয়া আসিয়া মাতাকে ধরিয়া লইয়া যান। ইহার পর মা আমার অনেক-দিন অর্দ্ধ-উন্মাদ অবস্থায় ছিলেন। মোটে কাঁদিতেন না, বরং মাঝে মাঝে হাসিয়া উঠিতেন। সে কারণ আমার দিদিমাতা খুবই সাবধান ছিলেন। মায়ের সম্মুখে কাহাকেও আমার ভ্রাতার কথা কহিতে দিতেন না। যদিও আমার দিদিমাতা আমাদের সকলের অপেক্ষা আমার ভ্রাতাকেই অধিক স্নেহ করিতেন, কেন না আমাদের যাদের পুত্র সন্তান কখন হয় নাই ; মেয়ের মেয়ে, তাহার মেয়ে নিয়েই সব ঘর। কিন্তু নিজ কন্যার অবস্থা দেখিয়া একেবারে চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। একদিন রাত্রে আমরা সকলে শুইয়া আছি, আমার মা "ওরে বাবারে কোথা গেলিরে" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমার দিদিমাতা বলিলেন, "আঃ বাঁচলেম।" আমি 'মা মা' করিয়া উঠিতে দিদিমাতা বলিলেন, যে, "চুপ—চুপ উহাকে কাঁদিতে দে", আমি তবে চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আমারও বড় কান্না আসিতে লাগিল।

শুনিয়াছি আমারও বিবাহ হইয়াছিল এবং এ কথাও যেন মনে পড়ে যে আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় একটী সুন্দর বালক ও আমার ভ্রাতা, বালিকা ভ্রাতৃবধূ আর আর প্রতিবেশিনী বালিকা মিলিয়া আমরা একত্রে খেলা করিতাম। সকলে বলিত ঐ সুন্দর বালকটী আমার বর। কিন্তু কিছুদিন পরে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। শুনিয়াছি যে আমার একজন মাতৃ-ঠাকুরাণী ছিলেন, তিনিই আমার স্বামীকে লইয়া গিয়াছিলেন, আর আসিতে দেন নাই। সেই অবধি আর তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। লোক পরম্পরায় শুনিতাম যে তিনি বিবাহাদি করিয়া সংসার করিতেছেন, এক্ষণে তিনিও আর সংসারে নাই। আমার ভ্রাতার জীবদ্দশায় আমার স্বামীকে আনিবার জন্য

কয়েকবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল। আমি একটি মাত্র কন্যা বলিয়া মাতামহীর ও মাতার ইচ্ছা ছিল যে তিনি আমাদের বাটীতেই থাকেন। কেন না তিনিও আমাদের ন্যায় দরিদ্র ঘরের সন্তান। কিন্তু তাঁহার স্বামী আর আসিতে দেন নাই।

এই তো গেল আমার বালিকা কালের কথা; পরে যখন আমার নয় বৎসর বয়ঃক্রম, সেই সময় আমাদের বাটীতে একটী গায়িকা আসিয়া বাস করেন। আমাদের বাটীতে একখানি পাকা একতলা ঘর ছিল, সেই ঘরে তিনি থাকিতেন। তাঁহার নিজা মাতা কেহ ছিল না, আমার মাতা ও মাতামহী তাঁহাকে কন্যা সদৃশ স্নেহ করিতেন। তাঁহার নাম গঙ্গা বাইজী। অবশেষে উক্ত গঙ্গা বাইজী হাঁর থিয়েটারে একজন প্রসিদ্ধা গায়িকা হইয়াছিলেন। তখনকার বালিকা-সুলভ-স্বভাব বশতঃ তাঁহার সহিত আমার "গোলাপ ফুল" পাতান ছিল; আমরা উভয়ে উভয়কে "গোলাপ" বলিয়া ডাকিতাম এবং তিনিও নিঃসহায় অবস্থায় আমাদের বাটীতে আসিয়া আমার মাতার নিকট কন্যা স্নেহে আদৃত হইয়া পরমানন্দে একসঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে কথা তিনি সদ্ভাবে তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে স্মরণ রাখিয়াছিলেন। সময়ের গতিকে এবং অবস্থা ভেদে পরে যদিও আমাদের দূরে দূরে থাকিতে হইত, তথাপি সেই বাল্য-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে সমভাবে ছিল। এবং তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় উন্নত ও উদার ছিল বলিয়া আমার মাতামহী ও মাতাকে বড়ই সম্মান করিতেন। এখনকার দিনে অনেক লোক বিশেষ উপকৃত হইয়া ভুলিয়া যায় ও স্বীকার করিতে লজ্জা এবং মানের হানি মনে করে, কিন্তু "গঙ্গামণি"—তারে গায়িকা ও অভিনেত্রীর উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও অহঙ্কার শূন্যা ছিলেন। সেই উন্নত হৃদয়া বাল্য-সখী স্বর্গগতা গঙ্গামণি আমার বিশেষ সম্মান ও ভক্তির পাত্রী ছিলেন।

আমাদের আর কোন উপায় না দেখিয়া আমার মাতামহী উক্ত বাইজীর নিকটেই আমার গান শিখিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তখন আমার বয়ঃক্রম ৭ বা ৮ বৎসর এমনই হইবে। আমার তখন গীত বাদ্য যত শিক্ষা করা হউক বা না হউক তাঁহার নিকট যে সকল বন্ধুবান্ধব আসিতেন, তাঁহাদের গল্প শুনা একটী বিশেষ কাজ ছিল। আর আমি একটু চালাক চতুর ছিলাম বলিয়া আমাকে সকলে আদর করিতেন। তখন বালিকা-সুলভ-চপলতা বশতঃ

তাঁহাদের আদর আমার ভালো লাগিত। কি করিতাম, কি করিতেছি, ভালো কি মন্দ কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু খুব বেশী মিশিতাম না; কেমন একটা লজ্জা বা ভয় হইত। দূরে দূরে থাকিতাম, কেন না আমি বালাকাল হইতে আমাদের বাটীর ভাড়াটিয়াদের রকম সকমের প্রতি কেমন একটা বিতৃষ্ণ ছিলাম, যাহারা আমাদের খোলার ঘরে ভাড়াটিয়া ছিল; তাহারা যদিও বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ নহে, তবুও স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় ঘর সংসার করিত; দিন আমিত দিন যাইত এবং সময়ে সময়ে এমন মারামারি করিত যে দেখিলে বোধ হইত বুঝি আর তাহাদের কখনও বাক্যালাপ হইবে না। কিন্তু দেখিতাম যে পরক্ষণেই পুনরায় উঠিয়া আহ্লাদে হাস্য পরিহাস করিত। আমি যদিও তখন অতিশয় বালিকা ছিলাম, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতাম! মনে হইত, আমি তো কখনও এরূপ ঘৃণিত হইব না। তখন জানি নাই যে আমার ভাগ্য দেবতা আমার মাথার উপর কাল্ লেখ লিখার করিয়া রাখিয়াছেন। তখন মনে করিতাম বুঝি এমনি মাতৃক্রোড়ে সরল সুখময় হৃদয় লইয়া চিরদিন কাটিয়া যাইবে। সেই মনোভাব লইয়া আমার বালাসখীর বন্ধুদের সহিত বাহিরে বাহিরে আনন্দ করিয়া খেলা করিয়া, রাত্র হইলে স্নেহময়ী জননীর কোলে শুইয়া আনন্দ লাভ করিতাম। আমার ভ্রাতার মৃত্যুর কিছুদিন পরে, গলাবাসির ঘরে বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ শেঠ বলিয়া দুইটী ভদ্রলোক তাঁহার গান শুনিবার জন্য প্রায়ই আসিতেন। শুনিতাম তাঁহারা নাকি কোনখানে "সীতার বিবাহ" নামে সীতিনাট্য অভিনয় করিবার মানস করিয়াছিলেন। তিনি একদিন আমার মাতামহীকে ডাকিয়া বলিলেন যে "তোমাদের যত কষ্ট দেখিতেছি তা তোমার এই নাতনীটিকে থিয়েটারে দিবে? এখনে জলপানি-স্বরূপ কিছু কিছু পাইবে, তারপর কার্য্য শিক্ষা করিলে অধিক বেতন হইতে পারিবে।" তখন সবে মাত্র দুইটী থিয়েটার ছিল, একটী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগীর "ন্যাশন্যাল থিয়েটার" দ্বিতীয় স্বর্গীয় নগেন্দ্র বোস মহাশয়ের "বেঙ্গল থিয়েটার"। আমার মিসিমাতা দুই চারিটী লোকের সহিত পরামর্শ করিলেন, অবশেষে পূর্ণবাবুর মতে থিয়েটারে দেওয়াই স্থির হইল। তখন পূর্ণবাবু আমাকে সুবিখ্যাত "ন্যাশন্যাল থিয়েটারে" দশ টাকা মাহিনাতে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। গঙ্গা বাইজী যদিও একজন সুদক্ষ গায়িকা ছিলেন, কিন্তু লেখাপড়া কিছুমাত্র জানিতেন না। সেইজন্য আমার থিয়েটারে প্রবেশের বহুদিন পরে তিনি নামমাত্র মাত্র লেখাপড়া

শিখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, পরে উত্তরোত্তর উন্নতি করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত অভিনেত্রীর কার্য্যে ব্রতী ছিলেন।

এই সময় হইতে আমার নূতন জীবন গঠিত হইতে লাগিল। সেই বালিকা বয়সে, সেই সকল বিলাস বিভূষিত লোক সমাজে সেই নূতন শিক্ষা, নূতন কার্য্য, সকলই আমার নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিছুই বুঝিতাম না, কিছুই জানিতাম না, তবে যেরূপ শিক্ষা পাইতাম, প্রাণপণ যত্নে সেইরূপ শিক্ষা করিতাম। পারিবারিক কষ্ট মনে করিয়া আরও আগ্রহ হইত। মাতার শোক দুঃখপূর্ণ মুখখানি মনে করিয়া আরও উৎসাহ বাড়িত। ভাবিতাম যে মায়ের এই দুঃখের সময় যদি কিছু উপার্জ্জন করিতে পারি, তবে পারিবারিক কষ্টও লাঘব হইবে।

যদিও রঙ্গালয়ে শিক্ষানবীশ কার্য্য করিতাম বটে, কিন্তু আমার মনের ভিতর কেমন একটা আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা সতত ঘুরিয়া বেড়াইত। মনে ভাবিতাম, যে আমি কেমন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র এই সকল বড় বড় অভিনেত্রীদের মত কার্য্য শিখিব। আমার মন সকল সময়েই সেই সকল বড় বড় অভিনেত্রীদের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। তখন দলে মাত্র চারিজন অভিনেত্রী স্থানস্থান বিরেটারে ছিলেন। রাজা, ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মী ও নারায়ণী। ক্ষেত্রমণি আর ইহলোকে নাই। সে একজন প্রতিভা অভিনেত্রী ছিল। তাহার অভিনয় কার্য্য এত স্বাভাবিক ছিল যে লোকে আশ্চর্য্য হইত, তাহার স্থান আর কখন পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ। "বিবাহ-বিভ্রাটে" স্ত্রীর অংশ অভিনয় দেখিয়া স্বয়ং "জোটলাট টমসন" বলিয়াছিলেন যে এ রকম অভিনেত্রী আমাদের বিলাতেও অভাব আছে। চৌরঙ্গীর কোন সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে এক সময় অনেক বড় বড় সাহেব ও বাঙ্গালীর অধিবেশন হইয়াছিল, সেই খানেই আমাদের থিয়েটারে বিবাহ-বিভ্রাট অভিনয় হয়, তাহার অভিনয় জোট লাটসাহেব দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক, বড়াই অধিক আর বলিতে সাহস হইতেছে না। যে হেতু সেই সব জীবনের নীরস ও বাজে কথা শুনিতে হয় তো আপনার বিরক্তি জন্মিতে পারে, সেইজন্য এইখানে বন্ধ করিলাম। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা আমি অতি অল্প সময় মধ্যেই তাঁহাদের ন্যায় সমান অংশ অভিনয় করিতে পারিতাম।

দ্বিতীয় পল্লব

রঙ্গালয়ে

মহাশয়।

আপনার যে এখনও আমার জীবনের দুঃখময় কাহিনী শুনিতে ধৈর্য্য আছে, ইহা কেবল আমার উপর মহাশয়ের অপরিমিত স্নেহের পরিচয়।

আপনি ঠিকই ঠিকই বলিতেছেন যে, প্রতি চরিত্র অভিনয়ে আমি মানুষের মনে দেবতার অঙ্কিত করিয়াছি। দর্শক অভিনয় দর্শনে আনন্দ করিয়াছেন ও মনঃসংযোগে দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু কিরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে দেব-ছবি অঙ্কিত করিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি অবকাশ হয় তবে বুঝাইয়া দিবেন। এক্ষণে যদি ধৈর্য্য থাকে তবে আমার নাটকীয় জীবন শুনুন।

আমি যখন প্রথম থিয়েটারে যাই, তখন রসিক মিত্রোপীর গঙ্গার ঘাটের উপর যে বাড়ী ছিল, তাহাতে থিয়েটারের রিহার্সাল হইত। সে স্থান যদিও আমার বিশেষ স্মরণ নাই, তবুও অল্প অল্প মনে পড়ে। বড়ই রমণীয় স্থান ছিল, একেবারে গঙ্গার উপরে বাড়ী ও বারান্দা, নীচে গঙ্গায় যাত্ত বাঁধান ঘাট। দুই ধারে অভিনেতৃ-যাত্রীদিগের বিশ্রাম ঘর। সেই বালিকা কালের সেই রমণীয় ছবি দূর স্মৃতির ছায় এখনও আমার মনোমধ্যে জাগিয়া আছে, কেমন গঙ্গা কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইত। আমি সেই চাঁনা-বারান্দায় ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতাম। আমার মনে কত আনন্দ, কত সুখ-স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিত। বালিকা বলিয়াই হউক, কিম্বা শিক্ষাকার্য্যে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়াই হউক, সকলে আমাকে বিশেষ স্নেহ ও যত্ন করিতেন। আমরা যে তখন যত গরীব ছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ঐ মিত্রের একটী বসত বাটী ছাড়া ভাল কাপড় পরা বা অন্য দ্রব্যাদি কিছুই ছিল না। সেই সময়ে "রাজা" বলিয়া যে প্রধানা অভিনেত্রী ছিলেন, তিনি আমার ছোট হাত-কাটা দুটী ছিটের জামা তৈয়ারী করাইয়া দেন। তাহা পাইয়া আমার কত যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। সেই জামা দুইটীই আমার শীতের সম্বল ছিল। সকলে বলিত যে এই মেয়েটীকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিলে বোধ হয় খুব কাজের লোক হইবে। তখন স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর মহাশয় ম্যানেজার ছিলেন, ৺অবিনাশচন্দ্র কর মহাশয় আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন। আর বোধ হয় বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু শিক্ষা দিতেন। আমার সব মনে পড়ে না। তবে তখন বেলবাবু, অঘোরবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু ও গোপালবাবু, ইঁহারাই বুঝি সব শিক্ষা

দিতেন। তখন বাবু রাধামাধব কর ও উক্ত থিয়েটারে অভিনয় কার্য্য করিতেন এবং বর্ত্তমান সময়ে সম্মানিত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর মহাশয়ও উক্ত ছাপড়াল থিয়েটারে অবৈতনিক অভিনেতা ছিলেন। ইঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় "বেণী-সংহার" পুস্তকে একটী ছোট পার্ট দিলেন, সেটী দ্রৌপদীর-একটী সখীর পার্ট, অতি অল্প কথা। তখন বই প্রস্তুত হইলে, নাট্যমন্দিরে গিয়া ড্রেস-রিহার্সাল দিতে হইত। যে দিন উক্ত বই এর ড্রেস-রিহার্সাল হয়, সে দিন আমার তত ভয় হয় নাই, কেননা—রিহার্সাল বাড়ীতেও যাহারা দেখিত, সেখানেও প্রায় তাহারাই সকলে এবং দুই চারিজন অন্য লোকও থাকিত।

কিন্তু যে দিন পার্ট লইয়া জন সাধারণের সম্মুখে ষ্টেজে বাহির হইতে হইল, সে দিন হৃদয়ভাব ও মনের ব্যাকুলতা কেমন করিয়া বলিব। সেই সকল উজ্জ্বল আলোকমালা, সহস্র সহস্র লোকের উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টি, এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, বুকের ভিতর ধড়্ ধড়্ করিতে লাগিল, পা দুটীও থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, আর চক্ষের উপর সেই সকল উজ্জ্বল দৃশ্য যেন ধোঁয়ার আকার হইয়া গেল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ভিতর হইতে অধ্যক্ষেরা আমায় আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ভয়, ভাবনা ও মনের চঞ্চলতার সহিত কেমন একটা কিসের আগ্রহও যেন মনের মধ্যে উথলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহা কেমন করিয়া বলিব? একে আমি অতিবড় বালিকা, তাহাতে গরীবের কন্যা, কখনও এরূপ সমারোহ স্থানে যাইতে বা কার্য্য করিতে পাই নাই। বাল্যকালে শুশুরবাড়ীর মুখে শুনিতাম ভয় পাইলে হরিকে ডাকিও, আমিও ভয়ে ভয়ে ভগবানকে স্মরণ করিয়া, যে কয়টী কথা বলিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলাম, প্রাণপণ বলে তাঁহাদের শিক্ষানুযায়ী সুচারুরূপে ও সেইরূপ ভাবভঙ্গীর সহিত বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় সমস্ত দর্শক আনন্দধ্বনি করিয়া করতালি দিতে লাগিলেন। ভয়েই হউক, আর উত্তেজনাতেই হউক, আমার তখনও পা কাঁপিতেছিল। ভিতরে আসিতে অধ্যক্ষেরা কত আদর করিলেন। কিন্তু তখন করতালির কি মর্ম্ম তাহা জানিতাম না। পরে সকলে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যে কার্য্যে সফলতা লাভ করিলে আনন্দে করতালি দিয়া থাকেন। ইহার কিছুদিন পরেই সকলে পরামর্শ করিয়া আমায় হরলাল রায়ের "হেমলতা" নাটকে হেমলতার ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

আমার পার্ট শিখিবার আগ্রহ দেখিয়া সকলে বলিত যে এই মেয়েটি হেমলতার পার্ট ভাল করিয়া অভিনয় করিতে পারিবে। এই সময় আর একজন অভিনেত্রী আসিলেন ও সেইসঙ্গে মদনমোহন বর্মণ অপেরা যাইবার হইয়া থিয়েটারে যোগ দিলেন। উক্ত অভিনেত্রীর নাম কাদম্বিনী দাসী। বহুদিন যাবৎ বিশেষ সুখ্যাতির সহিত কাদম্বিনী অভিনয় কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি অবসর প্রাপ্তা। এই "হেমলতা" অভিনয় শিক্ষা দিবার সময় আমার হৃদয় যেন উৎসাহ ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি যখন কার্য্য স্থান হইতে বাড়ীতে আসিতাম, সেই সকল কার্য্য আমার মনে আঁকা থাকিত। তাঁহারা যেমন করিয়া বলিয়া দিতেন, যেমন করিয়া ভাব ভঙ্গি সকল দেখাইয়া দিতেন, সেই সকল যেন আমার খেলার সঙ্গিনীদের ন্যায় চারিদিকে ঘেরিয়া থাকিত। আমি যখন বাড়ীতে খেলা করিতাম তখনও যেন একটা অব্যক্ত শক্তি দ্বারা সেই দিকেই আকৃষ্ট থাকিতাম। বাড়ীতে থাকিতে মন লাগিত না, কখন আবার গাড়ী আসিবে, কখন আবার লইয়া যাইবে, তেমনি করিয়া নূতন নূতন সকল শিখিব, এই সকল সদাই মনে হইত। যদিও তখন আমি ছোট ছিলাম, তবুও মনের ভিতর কেমন একটা উৎসাহপূর্ণ মধুর ভাব ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহার পর যখন আমার শিক্ষা শেষ হইয়া অভিনয়ের দিন আসিল, তখন আর প্রথমবারের মত ভয় হইল না বটে, কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। সে দিন আমি মাতৃকন্যার অভিনয় করিব কিনা—ঝকঝকে ঝকঝকে উজ্জ্বল পোষাক দেখিয়া ভারি আমোদ হইল। তেমন পোষাক পরা ঘুরে থাকু, কখন চক্ষেও দেখি নাই। যাহা হউক, ঈশ্বরের কৃপাতে আমি "হেমলতা"র পার্ট সুচারুরূপে অভিনয় করিলাম। তখন হইতে লোকে বলিত যে "ইহার উপর ঈশ্বরের দয়া আছে।" আর আমারও এখন যেন মনে হয়, যে আমার ন্যায় এমন ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বালিকা ঈশ্বর অনুগ্রহ ব্যতীত কেমন করিয়া সেরূপ দুরূহ কার্য্য সমাপন করিয়াছিল। কেননা আমার কোন গুণ ছিল না। তখন ভাল লেখাপড়াও জানিতাম না, গান ভাল জানিতাম না। তবে শিখিবার বড়ই আগ্রহ ছিল।

সেই সময় হইতে আমি প্রায় প্রধান পার্ট অভিনয় করিতে বাধ্য হইতাম। আমার অগ্রবর্ত্তী অভিনেত্রীগণ যদিও আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্কা ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাদের বয়সে সমান না হইলেও অল্পদিনে কাজে তাঁহাদের সমান হইয়া গিয়াছিলাম। ইহার কয়েক মাস পরেই "গ্রেট

জাগস্তাস" থিয়েটার কোম্পানী পশ্চিম অঞ্চলে থিয়েটার করিতে বাহির হন, এবং আমার আর পাঁচ টাকা মাহিনা বৃদ্ধি করিয়া আমাকে ও আমার মাতাকে সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহারা নানা দেশ ভ্রমণ করেন। পশ্চিমে থিয়েটার করিবার সময় দু'একটী ঘটনা শুনুন,—যদিও সে ঘটনা শুধু আমার সম্বন্ধে নয় তবুও তাহা কৌতূহলকর।

একরাত্রি লক্ষ্ণৌ নগরে হজরতগঞ্জে আমাদের "নীলদর্পণ" অভিনয় হইতেছিল, সেই দিন লক্ষ্ণৌ নগরের প্রায় সকল সাহেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়া ছিলেন। যে স্থানে রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণির উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হইল, তোরাপ দরজা ভাঙ্গিয়া রোগ সাহেবকে মারে, সেইসময় নবীনমাধব ক্ষেত্রমণিকে লইয়া চলিয়া যায়। একে তো "নীলদর্পণ" পুস্তকই অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় হইতেছিল; তাহাতে বাবু মতিলাল সুর—তোরাপ, অবিনাশ কর মহাশয়—মিষ্টার রোগ সাহেবের অংশ অতিশয় দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতে ছিলেন। ইহা দেখিয়া সাহেবেরা বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একটা গোলযোগ হইয়া পড়িল এবং একজন সাহেব দৌড়িয়া একেবারে স্টেজের উপর উঠিয়া তোরাপকে মারিতে উদ্যত। এইরূপ কারণে আমাদের কান্না, অন্যান্যদিগের ভয়, আর ম্যানেজার ধর্মদাস সুর মহাশয়ের কাঁপুনি!! তারপর অভিনয় বন্ধ করিয়া, পোষাক আসবাব বাঁধিয়া ছাঁদিয়া বাসায় এক রকম পলায়ন!! পরদিন প্রাতেই লক্ষ্ণৌ নগর পরিত্যাগ করিয়া হাঁপ ছাড়েন!!!

ইহার পরে আমরা যদিও অনেক স্থানে গিয়াছিলাম; কিন্তু সব কথা আমার মনে নাই, তবে দিল্লীতে যাহার ঘর, বিছানা ব্যতীত কিছুই দেখা যাইত না। এবং সেই প্রথম ভিস্তির জলে স্নান করিতে আমার আপত্তি, মাতার ক্রমাগত রোদন দেখিয়া, আমার মাকে একটী ইঁদারার জল নিজ হাতে তুলিয়া স্নান আহার করিবার সুবিধা করিয়া দেওয়ায় সম্মত হইলেন। আর আমাদের ভিস্তির জলই বন্দোবস্ত। দিল্লীতে আর একটী ঘটনা হয় তাহা ক্ষুদ্র হইলেও আমার বেশ মনে আছে। দিল্লীর বাড়ীর খোলা হাতে আমি একদিন ছুটাছুটী করিয়া খেলা করিতে ছিলাম। কি কারণে মনে নাই, কাদম্বিনীর তাহা অসহ্য হওয়ায় আমার হাত ধরিয়া আমায় গালে দুই চড় মারেন, সেই দিন আমরা মায়ে ঝীয়ে সারাদিন কাঁদিয়া ছিলাম। মা আমার মনের দুঃখে কিছু খান নাই, আমিও মায়ের কাছে সমস্ত দিন বসিয়া ছিলাম, শেষে বৈকালে

থিয়েটারের বাবুরা আমায় জোর করাইয়া আহার করান। আমার মা কিন্তু সে দিন কিছুই আহার করিলেন না। একে তো দিল্লী সহরে মুসলমানের বাড়াবাড়ি দেখিয়া মা আমার ক্রমাগতই কাঁদিতেন, কি করিবেন, একে আমরা গরীব তাহাতে আমি বালিকা, যদিও কর্তৃপক্ষেরা যত্ন করিতেন, তবুও বড় অভিনেত্রীরা নিজের গণ্ডা নিজে বুঝিয়া লইতেন, আমার দরার উপর নির্ভর ছিল। আর কি কারণে জানিনা, সকলের অপেক্ষা কাদম্বিনী যেন কিছু অন্যমনস্কতা দিতেন, আমার উপর কেমন তার স্নেহ ছিল, প্রায়ই মুর হাই করিতেন। তারপর বোধ হয় আমাদের লাহোরে যাইতে হয়। লাহোরে আমাদের বেশী দিন থাকিতে হয়; সেখানে অনেকগুলি বই অভিনয় হইয়াছিল। আমি নানা রকম পার্ট অভিনয় করিয়া ছিলাম। "সতী কি কলঙ্কিনী"তে রাধিকা, "নবীন তপস্বিনী"তে কাদিনী, "সাধবার একাদশী"তে কামন, "বিয়ে পাগলা বুড়ো"তে ফতি—কত বলিব। তবে বলিয়া রাখি যে, সে সময় আমার এত অল্প বয়স ছিল যে বেশ করিবার সময় বেশকারীদের বড় ঝঞ্ঝাটে পড়িতে হইত। আমার মত একটী বালিকাকে কিশোর বয়স্কা বা সময় সময় প্রায় যুবতীর বেশে সজ্জিত করিতে তাহারা সময়ে সময়ে বিরক্ত হইত—তাহা বুঝিতাম। আবার কখন কখন সকলে তামাসা করিয়া বলিত "যে তোকে কাবার দোকানে পাঠাইয়া দিয়া পিটিয়া একটু বড় করিয়া আনাইব।" লাহোরে যখন আমরা অভিনয় করি, তখন আমার সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সেখানে গোলাপ সিংহ বলিয়া একজন বড় জমীদার মহাশয়ের খেয়াল উঠিল, যে তিনি আমায় বিবাহ করিবেন এবং যত টাকা লইয়া আমার মাতা সন্তুষ্ট হন তাহা দিবেন। পূর্ব্বোক্ত জমীদার মহাশয় অর্দ্ধেন্দুবাবু ও ধর্ম্মদাসবাবুকে বড়ই পিড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তখন উঁহারা বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। তিনি নাকি সেখানকার একটী বিশেষ বড়লোক। একে বিদেশ—উপরন্তু এই সকল কথা শুনিয়া আমার মা তো কাঁদিয়াই আকুল। আমিও ভয়ে একেবারে কাঁটা। এই উপলক্ষে আমাদের শীঘ্রই লাহোর ছাড়িতে হয়। ফিরিবার সময় আমরা ৺শ্রীশ্রী বৃন্দাবন ধাম দিয়া আসিয়া ছিলাম। ৺শ্রীবৃন্দাবন ধামে আমার আমি একটী বিশেষ ছেলে মানুষি করিয়া ছিলাম। তাহা এই :—

থিয়েটার কোম্পানী সেই দিন ৺শ্রীধামে পৌঁছিয়া চল্লিশ জন লোকের জলখাবার ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া তাঁহারা ৺শ্রীজীউদিগের দর্শন

করিতে গেলেন এবং আমাকে বলিয়া যান যে "তুমি ছেলে মানুষ, এখনই এই গাড়ীতে আসিলে, এখন জল খাইয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া থাক। আমরা দেবতা দর্শন করিয়া আসি।" আমি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রহিলাম। তাঁহারা সকলে ৺শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর দর্শন করিতে চলিয়া গেলেন। আমার একটু রাগ ও দুঃখ হইল বটে, কিন্তু কি করিব? মনের ক্ষোভ মনেই চাপিয়া রহিলাম। ঘরের দরজা দিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় একটা বাঁদর আসিয়া জানালার কাঠ ধরিয়া বসিল। আমি বালিকা-সুলভ-চপলতা বশতঃ তাহাকে একটী কাঁকড়ি খাইতে দিলাম, সে খাইতেছে এমন সময় আর দুইটা আসিল, আমি তাহাদেরও কিছু খাবার দিলাম, খাবার গোটা দুই আসিল, আমি মনে ভাবিলাম যে ইহাদের কিছু কিছু খাবার দিলে সকলে চলিয়া যাইবে। সেই ঘরের চার পাঁচটী জানালা, আমি যত আহার দিই, ততই জানালায়, ছাদে, বারান্দায় বাঁদরে বাঁদরে ভরিয়া যাইতে লাগিল। তখন আমার বড় ভয় হইল, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে যত খাবার ছিল প্রায় তার সকলই তাহাদের দিতে লাগিলাম। আর মনে করিতে লাগিলাম যে এই বারেই তারা চলিয়া যাইবে। কিন্তু যত খাবার পাইতে লাগিল, বানরের দল তত বাড়িতে লাগিল। আর আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাদের ক্রমাগত আহার দিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কোম্পানীর লোক ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—ছাদ, বারান্দা, জানালা সব বানরে ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহারা লাঠি ইত্যাদি লইয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিয়া আমার দরজা খুলিতে বলিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে দরজা খুলিয়া দিলাম। তাঁহারা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সকল কথা তাঁহাদের বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া আমার মা আমায় দুটী চড় মারিলেন ও বকিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি যে অন্ত ক্ষতি করিয়াছিলাম, শুধু কোম্পানীর সকলে হাসিয়া মাকে মারিতে নিষেধ করিলেন; বলিলেন যে "মারিও না, ছেলে মানুষ ও কি জানে? আমাদের ডেকে, সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেই হইত।" অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন "খোকা মেয়ে আমাদের সকল খাবার বিলাইয়া ব্রজবাসীদিগের ভোজন করাইলি, এখন আমরা কি খাই বল্ দেখি?" আবার জলখাবার ধরিয়া করিয়া আনা হইল, তবে তাঁহারা জল খাইলেন। ঐ কথা লইয়া নীলমাধববাবু আমায় দেখা হইলেই এখনও তামাসা করিয়া বলিতেন যে "৺বৃন্দাবনে গিয়া বাঁদর ভোজন করাবি বিনোদ!" নীলমাধব চক্রবর্ত্তী বঙ্গীয় নাট্যজগতে বিশেষ সুপরিচিত। সকলেই তাঁহার নাম জানেন।

তিনিও আমাদের সঙ্গে পশ্চিমে ছিলেন, তিনি আমার অতিশয় যত্ন করিতেন। দিল্লীতে যখন সব এক্‌ট্রেসরা চাদর, জামা, কাপড় নিজ নিজ পছন্দমত খরিদ করেন। আমার পয়সা ছিল না বলিয়া কিনিতে না পারায় তিনি আমায় একখানি ফুল দেওয়া চাদর ও কাপড় কিনিয়া দেন। সেই তখনকার স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার স্নেহের নিদর্শন আমার কতদিন ছিল। আর একটী প্রথম উপহার, একটী অকৃত্রিম স্নেহের বস্তুর প্রদত্ত আমার বড় আদরের হইয়াছিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর ডাক্তার মহাশয় তিনি একটী চাকার গঠিত রূপার ফুল ও খেলিবার একটী কাঁচের ফুলের খেলনা আমায় দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই স্নেহময় উপহার আমার সেই বালিকা কালে বড়ই আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। নিঃস্বার্থ স্নেহে বশীভূত হইয়া আমি এখনও তাঁ'র দত্ত অনুগ্রহ দ্বারা ও তাঁর বিদায়ে রোগে শোকে সান্ত্বনা পাইয়া থাকি। তাঁহার অকৃত্রিম অনুগ্রহে আমি তাঁহার নিকট চিরঋণী। এই বহু সম্মানিত ডাক্তারবাবু মহাশয় এই অভাগিনীর চির ভক্তির পাত্র। এই ছলেই আমার বাল্যকালের মাটীজীবন।

ইহার পর আমরা কলিকাতা চলিয়া আসি। তার পর বোধহয় পাঁচ ছয় মাস পরে "গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে আমি মাননীয় ৺গরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথমে ২৫৲ পঁচিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। তখনও যদিচ আমি বালিকা কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কার্য্য-তৎপরা এবং চালাক চটপটে হইয়া ছিলাম। স্বর্গীয় গরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ। এইখান হইতেই আমার অভিনয় কার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি এবং উন্নতির প্রথম সোপান। সকলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাননীয় স্বর্গগত গরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অতুলনীয় স্নেহ মমতা। তিনি আমায় এত অধিক যত্ন করিতেন, বোধহয় নিজ কন্যা থাকিলেও এর অধিক স্নেহ পাইত না।

মহাশয়ের আমার উপর অসীম করুণা ছিল, সেই কারণে বলিতে সাহস করিতেছি। যদি অনুমতি করেন তবে বেঙ্গল থিয়েটারে যে কয়েক বৎসর অভিনয় কার্য্য করিয়া ছিলাম, সেই সময়ের ঘটনাগুলি বিবৃত করি।

[আগামী সংখ্যায়]

পত্রিকা প্রসঙ্গে

এ সংখ্যায় 'এখনো' দ্বিতীয় অঙ্কের অনুবাদ প্রকাশ করা হল। প্রথম অঙ্কের অনুবাদ গত সংখ্যায় প্রকাশিত হলে তার সাফল্য-অসাফল্য বিষয়ে পাঠকদের বহু মতামত আমরা পেয়েছিলাম। দ্বিতীয় অঙ্ক নিয়েও যদি এ ধরণের মতামত আমরা জানতে পারি তাহলে উপকৃত ও উৎসাহিত বোধ করব।

বাংলা রঙ্গালয়ের আদিযুগের অভিনেত্রী বিনোদিনীর কথা আজকের ক'জন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন জানি না। বিদ্যাসুন্দর প্রতিযোগিতায় অধিকারিণী বিনোদিনী সেকালের (এবং সম্ভবত এতাবৎ কালের) বাংলা মঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। নিজের চেষ্টায় ও চারিত্রিক ঐশ্বর্যের দ্বারা মহৎ শিল্পীর শিক্ষা ও সংস্কার বিনোদিনীর আয়ত্তগত হয়। তাঁর সমৃদ্ধ জীবনের কিছুটা তিনি 'আমার কথা' নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। 'এখনে' তার পুনর্মুদ্রণ দেখে আশা করি কৌতূহলী পাঠকরা খুশি হবেন এবং বাংলা রঙ্গালয়ের সেই গৌরবময় অধ্যায়ের পুনরাবিষ্কারে উৎসুক হবেন।

আমাদের পরবর্তী সংখ্যা বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে।

বাসনা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৮/৯, হেমাঙ্গ বসুসরণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে প্রবীর ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত এবং ৯, শ্যামাচরণ দত্ত লেন, কলিকাতা-১২ হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সঙ্গে শিক্ষিত-মনের যোগসাধনের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার প্রকাশ। সাহিত্য সমাজ অর্থনীতি ইতিহাস শিক্ষা দর্শন ধর্ম ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে এ পর্যন্ত ১২৯ খানি বই প্রকাশিত হয়েছে।

স মা জ

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান ॥ প্রমথ চৌধুরী
মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি ॥ শ্রীসুকুমার সেন
প্রাচীন বাংলার দৈনন্দিন জীবন ॥ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
বাংলার পালপার্বণ ॥ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী
বাংলার ব্রত ॥ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি ॥ শ্রীসুকুমার সেন
সমবায়নীতি ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
হিন্দু আইনে বিবাহ ॥ শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

সা হি ত্য

অসমীয়া সাহিত্য ॥ শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
ওড়িয়া সাহিত্য ॥ শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন
প্রাকৃত সাহিত্য ॥ ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
বঙ্গসাহিত্যে নারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা ॥ শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
সংস্কৃত সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
সাময়িকপত্র-সম্পাদনে বঙ্গনারী ॥ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য-পাঠের ভূমিকা ॥ ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
সাহিত্য-মীমাংসা ॥ শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য
সাহিত্যের স্বরূপ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠি লিখলে বিস্তৃত বিবরণ পাঠানো হয়।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

দ্বিতীয় বর্ষ

এক্ষণ

তৃতীয় সংখ্যা

॥ সূচীপত্র ॥

পুনর্মুদ্রণ

আমার কথা — বিনোদিনী দাসী

প্রবন্ধ

প্রতিমা : নন্দলালের নূতন রূপকৃতি

অনুবাদ কবিতা

ফুল-পঞ্চক — মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

দ্বৈত-ইতালির — অশোক মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

শিল্পীর স্মৃতি — অসীম রায়

রুশদেশী সাহিত্য — রাজেশ্বর মিত্র

কবিতা

কয়েকটি কবিতা — রণজিৎ সিংহ

প্রবন্ধ

অসীম রায়ের উপন্যাস — সুবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

এরেনবুর্গ-আত্মচরিত — অরুণকুমার সিকদার ৮৩

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও বাংলাদেশ — সুধীর চক্রবর্তী ৯৩

গল্প

ভটওলা — অমিয়ভূষণ মজুমদার

চিত্রসূচী

১ স্বাম্রপালী — নন্দলাল বসু

২ পানাহরা-সিন্ধুসৈকত — নন্দলাল বসু

৩ খেজুর গাছের ভিয়ান — নন্দলাল বসু

৪ শৈলাবাস — নন্দলাল বসু

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

ছায়ালী : জিবনলাল বসু

পাহাড়পুর-বিষ্ণুমৈকত : ঐরাবতাদি ২৭

আমার কথা

বিনোদিনী দাসী

বেঙ্গল থিয়েটারে

বৈদ্যনাথে পদার্পণ করিয়া বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ পূজনীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অধীনে কার্য্যে নিযুক্ত হই। ঠিক মনে পড়ে না, কি কারণবশতঃ আমি "গ্রেট ন্যাশন্যাল" থিয়েটার ত্যাগ করি। এই বেঙ্গল থিয়েটারই আমার কার্য্যের উন্নতির মূল; এই স্থানে শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রধান প্রধান ভূমিকা অভিনয় করিতে আরম্ভ করি। মাননীয় শরৎবাবু আমার কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাঁহার অসীম স্নেহ ও গুণের কথা আমি একমুখে বলিতে পারি না। প্রসিদ্ধা গায়িকা বনবিহারিণী (ভূনি), সুকুমারী দত্ত (গোলাপী) ও এলোকেশী সেই সময় "বেঙ্গলে" অভিনেত্রী ছিলেন। তখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ" কাব্য নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনয়ার্থে প্রস্তুত হইতে ছিল। আমি উক্ত "মেঘনাদ বধ" কাব্যে সাতটী পার্ট একসঙ্গে অভিনয় করিয়াছিলাম। ১ম চিত্রাঙ্গদা, ২য় প্রমীলা, ৩য় বাসন্তী, ৪র্থ রতি, ৫ম মায়া, ৬ষ্ঠ মহামায়া, ৭ম সীতা। বঙ্কিমবাবুর "মৃণালিনীতে" মনোরমা অভিনয়ই করিতাম এবং "দুর্গেশনন্দিনীতে" আয়েষা ও তিলোত্তমা এই দুইটি ভূমিকা প্রয়োজন হইলে দুইটিই একরাত্রি একসঙ্গে অভিনয় করিয়াছি। কারাগারের ভিতর ব্যতীত আয়েষা ও তিলোত্তমার দেখা নাই। কারাগারে তিলোত্তমার কথাও ছিল না অন্য একজন তিলোত্তমার কাপড় পরিয়া কারাগারে গিয়া "কে-ও—বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা?" জগৎ সিংহের মুখে এইমাত্র কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত। আর সেই সময়েই আয়েষার ভূমিকার শেষ অংশ তদ্‌স্থানের সহিত অভিনয়। এই অতি সঙ্কুচিতা ভীরু-স্বভাবা রাজকন্যা তিলোত্তমা, তখনি আবার উন্নত-হৃদয়া-গর্ব্বিণী অপরিসীম হৃদয়-বলশালিনী প্রেমপরিপূর্ণা নবাব পুত্রী আয়েষা! এইরূপ দুইভাগে নিজেকে বিভক্ত করিতে কত যে উদ্যম প্রয়োজন তাহা বলিবার নহে। ইহা যে প্রত্যহ ঘটিত তাহা নহে, কার্য্যকালীন আকস্মিক অভাবে এইরূপে অনেকবার অভিনয় করিতে হইয়া ছিল।

একদিন অভিনয় রাত্রিতে আয়েষা সাজিবার জন্য গৃহ হইতে সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া অভিনয় স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, যিনি "আসমানির" ভূমিকা অভিনয় করিবেন তিনি উপস্থিত নাই। রঙ্গালয় জনপূর্ণ। কর্তৃপক্ষগণের ভিতর চুপি চুপি কথা হইতেছে—"কে বিনোদকে 'আসমানির' পার্ট অভিনয় করিতে বলিবে? উপস্থিত বিনোদ ব্যতীত অন্য কেহই পারিবে না।" আমি বাটী হইতে একেবারে আয়েষার পোষাকে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছি বলিয়া তাহারা কিছুই বলিতেছেন না। এমন সময় বাবু অমৃতলাল বসু আসিয়া অতি আদর করিয়া বলিলেন, "বিনোদ! লক্ষ্মী ভায়টী আমার। আসমানি যে সাজিবে তাহার অসুখ করিয়াছে, তোমায় আজ চালাইয়া দিতে হইবে, নতুবা বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি"। যদিও মুখে অনেকবার "না—পারিব না" বলিয়া ছিলাম বটে, আর বাস্তবিক সেই নবাব পুত্রীর সাজ ছাড়িয়া তখন দাসীর পোষাক পরিতে হইবে, আবার "আয়েষা" সাজিতে অনেক খুঁত হইবে বলিয়া মনে মনে বড় রাগও হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের কথামত কার্য্য করিতে বাধ্য হইলাম। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয় করিবার সময় "ইংলিসম্যান", "ষ্টেটস্‌ম্যান" ইত্যাদি কাগজে আমায় কেহ "সাইনোরা" কেহ কেহ বা "ফ্রাওয়ার অব দি নেটিভ ষ্টেজ" বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এখনও আমার পূর্ব্ব বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা বলেন, যে "সাইনোরা" ভাল আছ তো!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই থিয়েটারে বঙ্কিম বাবুর "মৃণালিনী" অভিনীত হইত। তাহার অভিনয় যেরূপ হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তখনকার বা এখনকার কোন রঙ্গালয়ে এ পুস্তকের এরূপ অভিনয় বোধহয় কোথাও হয় নাই। এই মৃণালিনীতে হরি বৈষ্ণব—হেমচন্দ্র, কিরণ খাঁড়ুয্যে—পশুপতি-গোলাপ (সুকুমারী দত্ত)—গিরিজায়া, ফুন্নী—মৃণালিনী এবং আমি—মনোরমা!

আর গোটাকয়েক কথা বলিয়া বেঙ্গল থিয়েটার সম্বন্ধে কথা শেষ করিব। একবার আমরা সদলবলে চুয়াডাঙ্গা যাই, আমাদের জন্য একখানি গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছিল। সকলে একত্রে যাইতেছি! যাব—স্মরণ নাই, মাঝখানে কোন্ স্টেশনে তাও মনে নাই, তবে সে যে একটী বড় স্টেশন সন্দেহ নাই। সেইখানে নামিয়া "উমিচাঁদ" বলিয়া ছোটবাবু মহাশয়ের একজন আত্মীয় (আমরা মাননীয় শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ছোটবাবু বলিয়া ডাকিতাম) ও আর দুই চারিজন একটার আমাদের জোগাড়ীর জন্য খাবার আনিতে গেলেন। জলখাবার, পাতা ইত্যাদি লইয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন, উমিচাঁদ বাবুর

আসিতে দেরী হইতে লাগিল। এমন সময় গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, ছোটবাবু মহাশয় গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া "ওরে উমিচাঁদ শীঘ্র আয়—শীঘ্র আয়—গাড়ী যে ছাড়িল" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এমন সময় গাড়ীও একটু একটু চলিতে লাগিল, উমিচাঁদ দৌড়িয়া উমিচাঁদ বাবু গাড়ীতে উঠিলেন, গাড়ীও জোরে চলিল। এমন সময় উমিচাঁদ বাবু অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ছোটবাবু মহাশয় ও অন্যান্য সকলে "সর্দ্দিগরমি হইয়াছে, জল দাও জল দাও" করিতে লাগিলেন, চারুচন্দ্র বাবু ব্যস্ত হইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন দুর্দৈব যে সমস্ত গাড়ীখানার ভিতর একটী লোকের কাছে, এমন কি এক গণ্ডুষ জল ছিল না, যে সেই আসন্ন—মৃত্যুমুখে পতিত লোকটীর তৃষ্ণার জন্য তাহা দেয়। "ঘুনি" তখন সবে মাত্র বেঙ্গল থিয়েটারে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহার কোলে ছোট মেয়ে; সে সময় অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া আপনার শুষ্ক বুক একটী শিশুকে করিয়া লইয়া উমিচাঁদের মুখে দিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল। বোধহয় ১০।১৫ মিনিটের মধ্যে এই দুর্ঘটনা ঘটিল। গাড়ী শুদ্ধ লোক একেবারে ভয়ে ভাবনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ছোটবাবু মহাশয় উমিচাঁদের বুকে মুখ রাখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি একে বালিকা, তাহাতে ওরকম মৃত্যু কখন দেখি নাই, ভয়ে মাতার কোলের উপর শুইয়া পড়িলাম। উমিচাঁদ বাবুর মৃত্যুকালীন সেই মুখভঙ্গী আমার মনোক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ অভিনীত হইতে লাগিল। আমার অবস্থা দেখিয়া চারুবাবু মহাশয় ছোট বাবুকে বলিলেন, "শরৎ থাম, যাহা হইবার হইয়াছে: এখন যদি রেলের লোক এ ঘটনা জানিতে পারে, গাড়ী কাটিয়া দিবে, এত লোকজন লইয়া রাস্তার মাঝে আর এক বিপদ হইবে।" ছোটবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমি উমির মা'কে গিয়া কি বলিব? সে আসিবার কালীন উমিচাঁদ সম্বন্ধে কত কথা যে আমাকে বলিয়া দিয়াছিল।" (উমিচাঁদ বাবু মাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন)। যাহা এই রকম ভয়ানক বিপদ মাথে করিয়া আমরা সন্ধ্যার সময় চুয়াডাঙ্গায় নামিলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা, সেখানের ষ্টেশন মাষ্টারকে বলা হইল যে এই আগের ষ্টেশনে এই ঘটনা ঘটিয়াছে। তারপর আমরা বাসায় গিয়া যে যেখানে পাইলাম, অবসন্ন হইয়া সে মাত্রে শুইয়া পড়িলাম। ছোটবাবু ও দুই চারিজন অভিনেতা শব সাহ করিতে যাইলেন। সেখানে তিন দিন থাকিয়া অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সারিয়া সকলে অতি বিষণ্ণ ভাবে কলিকাতায় ফিরিলাম। এই শোকপূর্ণ ঘটনাটি কোন দোষা লেখকের দ্বারা বর্ণিত হইলে সে ভীষণ ছবি কতক পরিমাণে পরিস্ফুট হইত।

আর একবার একটী ঘোর বিপদে পড়ি। সেও কেবল ঘিয়েটারের সহিত সাহেবগঞ্জ না কোথায় একটী জঙ্গলা দেশে যাইতে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে কতকটা জঙ্গলের মধ্য দিয়া হাতী ও গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। ৪টী হাতী ও কয়েকখানি গোরুর গাড়ী আমাদের জন্য প্রেরিত হয়। যাহারা যাহারা গোরুর গাড়ীতে যাইবে, তাহারা তিনটার সময় চলিয়া গেল। আমি ছেলে মানুষির ঝোঁকের বলিলাম, যে "আমি হাতীর উপর যাইব।" হোটবাবু মহাশয় কত বারণ করিলেন। কিন্তু আমি হাতী কখন দেখি নাই! চড়া তো দূরের কথা! তারি আমোদ হইল, আমি গোলাপকে বলিলাম, "দিদি আমি তোমার সঙ্গে হাতীতে যাইব।" গোলাপ বলিল, "আচ্ছা,—বাস্!" সে আমায় তার সঙ্গে রাখিল। মা বকিতে বকিতে আগে চলিয়া গেলেন। আমরা সন্ধ্যা হয় এমন সময় হাতীতে উঠিলাম। আমি, গোলাপ ও আর দুইজন পুরুষ মানুষ একটাতে, আর চারিজন করিয়া অপর তিনটাতে। কিছু দূর গিয়া দেখি, এমন রাস্তা তো কখন দেখি নাই। মোটে এক হাত চওড়া রাস্তা। আর দুইধারে বুক পর্য্যন্ত বন! বান গায় কি অন্য গাছ ধরিতে পারিনা—আর জল! ক্রমে যতই রাত্রি হইতে লাগিল ততই বৃষ্টি চাপিয়া আসিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও আরম্ভ হইল। হাতী তো ঝম্ ঝম্ করিতে লাগিল। শেষে সকলকে বেত বনের মধ্যে লইয়া ফেলিল। তার উপর শিলা বৃষ্টি! হাতীর উপর ছাউনী নাই, সেই জল, ঝড়, বেগ গর্জ্জন, তার উপর শিলা বর্ষণ, আমি কেঁদেই অস্থির! গোলাপও কাঁদিতে লাগিল। শেষে হাতী আর এগোয় না। মাঁক মাথার উপর তুলিয়া আসের পা বাড়াইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। আবার তখন মাহুত বলিল, যে বাঘ বেরিয়েছে তাই হাতী যাইতেছে না।" মাহুত চারিজন হৈ হৈ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল। আমি তো আড়ষ্ট, আমার হাতী চড়ার আমোদ মাথায় উঠিয়াছে। ভয়ে কেঁদে কাঁদিতে লাগিলাম; পাছে হাতীর উপর হইতে পড়িয়া যাই বলিয়া একজন পুরুষ মানুষ আমায় ধরিয়া রহিল। তাহার পর কত কষ্টে প্রায় আধমরা হইয়া আমরা কোন রকমে বাসায় পৌঁছিলাম। জলে শীতে আমরা এমনি অসাড় হইয়া গিয়াছিলাম, যে হাতী হইতে নামিবারও ক্ষমতা ছিল না। ছোট-বাবু নিজে ধরিয়া নামাইয়া নিয়া আগুন করিয়া আমার সমস্ত গা সেঁকিতে লাগিলেন। মা তো বকিতে বকিতে কান্না জুড়িলেন। বার বুলিই ছিল "হতভাড়া মেয়ে কোন কথা শোনে না।" সেই দিনই আমাদের অভিনয়ের কথা ছিল, কিন্তু দুর্য্যোগের জন্য ও আমাদের শারীরিক অবস্থার জন্য সেদিন বন্ধ রহিল।

আর একবার নৌকাতে বিপদে পড়িয়াছিলাম—আর একবার পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া জঙ্গের মাঝে পড়িয়া পথ হারাইয়া পাহাড়ীদের কুটীরে আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করি। সেই পাহাড়ীই আবার রাস্তা দেখাইয়া দিয়া বাসায় রাখিয়া যায়।

একবার কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে ঘোড়ায় চড়িয়া অভিনয় করিতে পড়িয়া গিয়া বড়ই আঘাত পাইয়াছিল। "প্রমীলা"র পার্ট ঘোড়ার উপর বসিয়া অভিনয় করিতে হইত। সেখানে মাটির প্লাটফরম্ প্রস্তুত হইয়াছিল, যেমন আমি স্টেজ হইতে বাহিরে আসিব, অমনি মাটির বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঘোড়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। আমিও ঘোড়ার উপর হইতে প্রায় দুই হস্ত দূরে পতিত হইয়া অতিশয় আঘাত পাইলাম। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না। তখন আমার অভিনয়ের অনেক বাকী আছে—কি হইবে! চারুবাবু আমায় ঔষধ সেবন করাইয়া বেশ করিয়া আমার হাঁটু হইতে পেট পর্য্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। ছোটবাবু মহাশয় কত স্নেহ করিয়া বলিলেন, যে "লক্ষ্মীটি! আজিকার কার্য্যটি কষ্ট করিয়া উদ্ধার করিয়া দাও।" তাঁহার সেই স্নেহময় সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে আমার বেদনা অর্দ্ধেক দূর হইল। কোনরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পরদিন কলিকাতায় ফিরিলাম। ইহার পর আমি এক মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। যাহা হউক, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়কালে আমি একরূপ সুখেই কাটাইয়া ছিলাম। কেননা তখন বেশী উচ্চ আশা হয় নাই। যাহা পাইতাম তাহাতেই তুষ্ট হইতাম। যেটুকু উন্নতি করিতে পারিতাম, সেইটুকুও যথেষ্ট মনে করিতাম। বেশী আশাও ছিল না, অকৃতিও ছিল না। সকলে বড় ভালবাসিত। মেসে খেলে নেচে হেসে দিন কাটাইতাম।

এই সময় মাননীয় কেদারনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রায়ই বেঙ্গল থিয়েটারে যাইতেন। স্বর্গীয় কেদারবাবু আমার "কপালকুণ্ডলার" অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন, যে "এই মেয়েটি যেন প্রকৃত "কপালকুণ্ডলা" ইহার অভিনয়ে বড় সরলতা উৎকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।"

পরে শুনিয়াছিলাম এই সময়ে গিরিশবাবু মহাশয় ছোটবাবুকে বলেন, যে "আমরা একটি থিয়েটার করিব মনে করিতেছি। আপনি যদপি বিনোদকে আমাদের থিয়েটারে যেন তবে বড়ই ভাল হয়।" ছোটবাবু মহাশয় অতি উচ্চ-হৃদয়-সম্পন্ন মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বলিলেন, "বিনোদকে আমি বড়ই

স্নেহ করি ; উহাকে ছাড়িতে হইলে আমার বড়ই ক্ষতি হইবে। তথাপি আপনার অনুরোধ আমি এড়াইতে পারি না, বিনোদকে আপনি লউন।"

তারপর ছোটবাবু মহাশয় একদিন আমায় বলিলেন, যে "কি রে বিনোদ এখান হইতে যাইলে তোর মন কেমন করিবে না?" আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এ বিষয় লইয়া সেদিন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও বলিলেন, যে "ওসব কথা আমারও বেশ মনে আছে। তোমাকে বেঙ্গল থিয়েটার হইতে আনিবার পরও শরৎবাবু মহাশয় আমাদের বলিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্তের বেনিফিট নাইটের "হেমেলনন্দিনীর আত্মহত্যা" ভূমিকা অভিনয় করিবার জন্য লইয়া যান ; আরও কয়েকবার লইয়া গিয়াছিলেন।" যাহা হউক, সেই সময় হইতে আমি মাননীয় গিরিশবাবু মহাশয়ের সহিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার শিক্ষায় আমার যৌবনের প্রথম হইতে জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারে
যৌবনারম্ভে

আমি বেঙ্গল থিয়েটার ত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের ন্যাশন্যাল থিয়েটারে কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত হই। মাসকয়েক "যেমনাম তথ" "স্বপ্নলিনী" ইত্যাদি পুরাতন নাটকে এবং "আসেমনী", "গোলগীলা" প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতিনাট্যে ও অনেক প্রহসন ও প্যান্টোমাইমে প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করি। সকলগুলিই প্রায় গিরিশবাবুর রচিত। ইহার পর গিরিশবাবুর ও আমার থিয়েটারের সহিত সংস্রব শিথিল হইয়া আসে। ঐ সময় ন্যাশন্যাল থিয়েটারের দুর্দ্দশা! অল্পদিনের মধ্যেই থিয়েটার নীলামে বিক্রয় হওয়ায় প্রতাপ চাঁদ জহুরী নামক জনৈক মাড়োয়ারী অধিকারী হইলেন। প্রতাপচাঁদ বাবুর অধীনে থিয়েটারের নাম ন্যাশন্যাল থিয়েটারই রহিল। গিরিশবাবু পুনর্ব্বার ম্যানেজার হইলেন। এই থিয়েটারের প্রথম অভিনয়, স্বর্গীয় কবিবর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বিরচিত "হাম্বীর"। ইহার নায়িকার ভূমিকা আমার ছিল, কিন্তু তখন ন্যাশন্যালের দুর্নাম রটিয়াছে ; অতি দুঃখারের সহিত সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়া অভিনয় হইলেও অধিক দর্শক আকর্ষিত হইল না। ভাল ভাল নাটক যাহা ছিল, সব পুরাতন হইয়া গিয়াছে, নূতন ভাল নাটকও পাওয়া যায় না। "মায়াতরু" নামে একখানি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য গিরিশবাবু রচনা করিলেন। "পলাশীর যুদ্ধের" সহিত একত্রিত হইয়া এই গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়।

দুই তিন রাত্রি অভিনয়ের পরেই এই ক্ষুদ্র নাটিকার গুণে দর্শক আকর্ষিত হইয়া বাড়ী ভরিয়া যাইতে লাগিল। এই ষ্টীভিনাটো আমার "ভূলহাসির" ভূমিকা দেখিয়া "বিজ্ঞ এণ্ড রাঙ্কের" সম্পাদক স্বর্গীয় নন্দুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় লেখেন, "বিনোদিনী *was simply charming*" ক্রমে গিরিশবাবুর "মোহিনী প্রতিমা", "আনন্দ রহো" দর্শক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তারপর "রাবণ বধের" পর হইতে থিয়েটারে লোকের স্থান সঙ্কুলান হইত না। উপরের আসন সকল প্রতিবারই পূর্ণ হইয়া যাইত, যে সকল ধনবান ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা ঘৃণা করিয়া থিয়েটারে আসিতেন না তাঁহাদের দ্বারাই দুই একদিন পূর্ব্বে টিকিট ক্রীত হইয়া অধিকৃত হইত। দিন দিন থিয়েটারের অদ্ভুত উন্নতি দেখিয়া একদিন সত্বাধিকারী প্রতাপচাঁদ বলেন, "বিনোদ তিন সদাগর করছি।" তিন সদাগর অর্থে মাছ! ক্রমে "সীতার বনবাস" প্রভৃতি নাটক চলিল। থিয়েটারের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে অধীনার খ্যাতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

গিরিশবাবুর সহিত থিয়েটার করিতে আরম্ভ করিয়া বিডন ষ্ট্রীটের "ষ্টার থিয়েটার" শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সঙ্গে বরাবর কার্য্য করিয়া আসিয়াছি। কার্য্য ক্ষেত্রে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন এবং আমি তাঁহার প্রথমা ও প্রধানা শিষ্যা ছিলাম। তাঁহার নাটকের প্রধান প্রধান স্ত্রী চরিত্র আমিই অভিনয় করিতাম। তিনিও অতি যত্নে আমায় শিক্ষা দিয়া তাঁহার কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতেন।

যে সময় কেদারেবাবু থিয়েটার করেন, সেইসময় সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র মহাশয় আসিয়া অভিনয় কার্য্যে যোগ দেন। গিরিশবাবুর মুখে শুনিয়া ছিলাম, যে অমৃত মিত্র আগে যাত্রার দলে একটু করিতেন। তাঁহার গলায় সুন্দর স্বর শুনিয়া তিনি প্রথমে থিয়েটারে লইয়া আসেন। উপরে উল্লেখ করিয়াছি, ইতিপূর্ব্বে "মেঘনাদ বধ", "বিল্বমঙ্গল", "সধবার একাদশী", "মৃণালিনী", "পলাশীর যুদ্ধ" ও নানা রকম ছয় অঙ্কের বই নাটকাকারে অভিনীত হইয়াছিল। "মেঘনাদ বধে" অমৃতলাল রাবণ সাজেন এবং আমি এখানেও সাতটি অংশ অভিনয় করিতাম। গিরিশবাবু মেঘনাদে ও রাম, "মৃণালিনীতে" গিরিশবাবু পশুপতি, আমি মনোরমা, "দুর্গেশনন্দিনীতে" গিরিশবাবু জগৎ সিংহ, আমি আয়েষা, "বিল্বমঙ্গলে" গিরিশবাবু নলেজনাথ, আমি কুসুমকুমারী, "পলাশীর যুদ্ধে" গিরিশবাবু ক্লাইব, আমি ক্লটেনিয়া, অমৃত মিত্র জগৎ শেঠ ও

ভাবিনী সাধী ভবানী। কত পুস্তকের নাম করিব। সকল পুস্তকেই আমার, গিরিশবাবুর, অমৃত মিত্রের, অমৃত বসু মহাশয়ের এই সকল বড় বড় পার্ট থাকিত। গিরিশবাবু আমাকে পার্ট অভিনয় জন্য অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালী বড় সুন্দর ছিল। তিনি প্রথম পার্টগুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর পার্ট মুখস্থ করিতে বলিতেন। তাহার পর অবসর মত আমাদের বাটীতে বসিয়া, অমৃত মিত্র, অমৃতবাবু (ভূনীবাবু) আরো অন্যান্য লোকে মিলিয়া নানাবিধ বিলাতী অভিনেত্রীদের, বড় বড় বিলাতী কবি সেক্সপীয়ার, মিল্টন, বায়রণ, স্কোপ প্রভৃতির লেখা গল্পচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন। আমার কখন তাঁদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। নানাবিধ হাব-ভাবের কথা এক এক করিয়া শিখাইয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ যত্নে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অভিনয় কার্য্য শিখিতে লাগিলাম। ইহার আগে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা পড়া পাখীর চতুরতার ন্যায়, আমার নিজের বড় একটা অভিজ্ঞতা হয় নাই। কোন বিষয়ে তর্ক বা যুক্তি দ্বারা কিছু বলিতে বা বুঝিতে পারিতাম না। এই সময় হইতে নিজের অভিনয়-নির্ব্বাচিত ভূমিকা বুঝিয়া লইতে পারিতাম। বিলাতী বড় বড় এক্টার এক্ট্রেস্ আসিলে তাহাদের অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইতাম। আর থিয়েটারের অবকাশেও আমাকে যত্নের সহিত লইয়া গিয়া ইংরাজি থিয়েটার দেখাইয়া আনিতেন। বাটী আসিলে গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিতেন "কি রকম দেখে এলে বল দেখি?" আমার মনে যেমন বোধ হইত, তাঁহার কাছে বলিতাম। তিনি আমার যদি ভুল হইত তাহা সংশোধন করিয়া বুঝাইয়া দিতেন।

"কেদারবাবু প্রায় বৎসরখানেক থিয়েটার করেন; ইহার পর কৃষ্ণধন ও রাধাধন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া দুই ভাই কয়েকমাস থিয়েটারের কর্ত্তৃত্ব করেন। তাহার পর কাশীপুরের প্রাণনাথ চৌধুরীর বাটীর শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলিয়া একব্যক্তি ছয় মাস কি আট মাস এই থিয়েটারের প্রোপ্রাইটার হন। এই সকল থিয়েটারেই গিরিশবাবু মহাশয় ম্যানেজার ও যোশান মাস্টার ছিলেন। কিন্তু সকল প্রোপ্রাইটারই স্ব স্ব প্রধান, গিরিশবাবু আফিসের কার্য্য করিয়া থিয়েটারে অধিক সময় দিতে পারিতেন না। ইহাতে এত বিশৃঙ্খলা হইত যে ব্যবসা বুদ্ধিহীন আমোদপ্রিয় প্রোপ্রাইটারেরা শেষে থলি ঝাড়া হইয়া শূন্য হস্তে ইন্সল্‌ভেন্টের আসামী হইয়া থিয়েটার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন। অথচ আমার বেশ মনে পড়ে যে সে সময় প্রতি রাত্রেই খুব বেশী লোক হইত ও

এমন সুন্দররূপ অভিনয় হইত যে লোকে অভিনয় দর্শনে মোহিত হইয়া একবাক্যে বলিত যে আমরা অভিনয় দর্শন করিতেছি কি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহা বোধ করিতে পারিতেছি না। এত বিজয় সত্ত্বেও যে কেন সব ধনী সন্তানেরা সর্বস্বান্ত হইতেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। লোকে বলিত যে এই বারপাটা ছানা বারণা। এই স্থানের ভূমিখণ্ড কাহাকেও অনুকূল নহে।

গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সৎ উপদেশ গুণে আমি যখন ষ্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াইতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আমি অন্য কেহ। আমি যে চরিত্র লইয়াছি আমি যেন নিজেই সেই চরিত্র। কার্য্য শেষ হইয়া যাইলে আমার চমক ভাঙ্গিত। আমার এইরূপ কার্য্যে উৎসাহ ও যত্ন দেখিয়া রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা আমায় বড়ই ভালবাসিতেন ও অভিশয় স্নেহ মমতা করিতেন। কেহবা কন্যার ন্যায় কেহবা ভগ্নীর ন্যায়, কেহবা সখীর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। আমিও তাঁহাদের যত্নে ও আদরে তাঁহাদের উপর প্রবল স্নেহের অত্যাচার করিতাম। যেমন মা বাপের কাছে আদরের পুত্র কন্যারা বিনা কারণে আদর আবদারের হাঙ্গামা করিয়া তাঁহাদের উৎকণ্ঠিত করে, ভ্রাতা ও ভগ্নীদের নিকট যেমন কোলের ছোট ছোট ভাই ভগ্নীগুলি মিছামিছি ঝগড়া আবদার করে, আমারও সেইরকম স্বভাব হইয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে নানারকমের উচ্চচরিত্র অভিনয় দ্বারা আমার মন যেমন উচ্চদিকে উঠিতে লাগিল, আবার নানারূপ প্রলোভনের আকাঙ্ক্ষাতে আকৃষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে আত্মহারা হইবার উপক্রম হইত।

আমি ক্ষুদ্র দীন দরিদ্রের কন্যা, আমার বল বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র। একদিকে আমার উচ্চবাসনা আমার আত্মবলিদানের জন্য বাধ্য দেয়, অন্যদিকে অসংখ্য প্রলোভনের জীবন্ত চাকচিক্য মূর্ত্তি আমায় আহ্বান করে। এইরূপ অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-হৃদয়-বল কতক্ষণ থাকে? তবুও সাধ্যমত আত্মদমন করিতাম। বুদ্ধির দোষে ও অদৃষ্টের ফেরে আত্মরক্ষা না করিলেও কখনও অভিনয় কার্য্যে অমনোযোগী হই নাই। অমনোযোগী হইবার ক্ষমতাও ছিল না। অভিনয়ই আমার জীবনের সার সম্পদ ছিল। পার্ট অভ্যাস, পার্ট অনুযায়ী চিত্রকে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে সেই সকল প্রকৃতির আকৃতি মনোযোগ স্থাপিত করিয়া তন্ময়ভাবে সেই মনাঙ্কিত ছবিগুলিকে আপনার মধ্যে মিলাইয়া মিলাইয়া দেখা, এমন কি সেইভাবে চলা, বেশ, গঠন, উপবেশন যেন আমার স্বভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল।

আমার অন্য কথা বা অন্য গল্প ভাল লাগিত না। গিরিনবাবু মহাশয় যে সকল বিলাতের বড় বড় অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের গল্প করিতেন, যে সকল বই পড়িয়া শুনাইতেন, আমার তাহাই ভাল লাগিত। মিসেস লিড্‌নিস্ যখন থিয়েটারের কার্য্য ত্যাগ করিয়া, দশবৎসর বিবাহিতা অবস্থায় অতিবাহিত করিবার পর পুনরায় যখন রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার অভিনয়ে কোন সমালোচক কোন স্থানে কিরূপ দোষ ধরিয়াছিল, কোন অংশে তাঁহার উৎকর্ষ বা ত্রুটী ইত্যাদি পুস্তক হইতে পড়িয়া শুনাইয়া দিতেন। কোন্ এক্‌ট্রেস বিলাতে বনের মধ্যে পাখীর আওয়াজের সহিত নিজের স্বর সাধিত, তাহাও বলিতেন। এলেক্‌টারি কিরূপ সাজ-সজ্জা করিত, ম্যাক্‌ডফান কেমন হ্যামলেট সাজিত, ওফেলিয়া কেমন ফুলের পোষাক পরিত, বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশনন্দিনী' কোন্ পুস্তকের ছায়াবলম্বনে লিখিত, 'রজনী' কোন্ ইংরাজী পুস্তকের ভাব সংগ্রহে রচিত, এই রকম কত বলিব গিরিনবাবু মহাশয়ের ও অন্যান্য স্নেহশীল বন্ধুগণের মুখে ইংরাজি, গ্রীক, রোম, জার্ম্মানি প্রভৃতি বড় বড় অক্ষরের কত গল্প যে আমি শুনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। শুধু শুনিতাম না, তাহা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া সতত সেই সকল চিন্তা করিতাম। এই কারণে আমার স্বভাব এমন হইয়া গিয়াছিল যে যদি কখন কোন উদ্যান ভ্রমণ করিতে যাইতাম, সেখানকার ঘর বাড়ী আমার ভাল লাগিত না, আমি কোথায় বন-পুষ্প শোভিত নির্জ্জন স্থান তাহাই খুঁজিতাম। আমার মনে হইত যে আমি বুঝি এই বনের মধ্যে থাকিতাম, আমি ইহাদের চিরপালিত! প্রত্যেক লতাপাতার সৌন্দর্য্যের মাথামাখি দেখিয়া আমার হৃদয় লুটাইয়া পড়িত। আমার প্রাণ যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিত। কখন কোন নদীতীরে যাইলে আমার হৃদয় যেন তরঙ্গে তরঙ্গে ভরিয়া যাইত, আমার মনে হইত আমি বুঝি এই নদীর তরঙ্গে তরঙ্গেই চিরদিন খেলা করিয়া বেড়াইতাম। এখন আমার হৃদয় ছাড়িয়া এই তরঙ্গগুলি আপনা আপনি লুটোপুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কুচবিহারের নদীর বালিগুলি অতি বিশাল, অতি সুন্দর, আমি প্রায় বাসা হইতে দূরে, নদীর ধারে একলাটী যাইয়া সেই বালির উপর শুইয়া নদীর তরঙ্গ দেখিতাম। আমার মনে হইত উহারা বুঝি আমার সহিত কথা কহিতেছে।

নানাবিধ ভাব সংগ্রহের জন্য সদা সর্ব্বক্ষণ মনকে নিযুক্ত রাখায় আমি কল্পনার মধ্যেই বাস করিতাম, কল্পনার চিত্র আমি বিসর্জ্জন করিতে পারিতাম, সেইজন্য বোধ হয় আমি যখন যে পার্ট অভিনয় করিতাম, তাহার চরিত্রগত ভাবের

অভাব হইত না। যাহা অভিনয় করিতাম, তাহা যে অপরের মনোমুগ্ধ করিবার জন্য বা বেতনভোগী অভিনেত্রী বলিয়া কার্য্য করিতেছি ইহা আমার কখন মনেই হইত না। আমি নিজেকে নিজে ভুলিয়া যাইতাম। চরিত্রগত সুখ-দুঃখ নিজেই অনুভব করিতাম, ইহা যে অভিনয় করিতেছি তাহা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাইতাম। সেই কারণে সকলেই আমায় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

একদিন বঙ্কিমবাবু তাঁহার 'মৃণালিনী' অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময় আমি 'মৃণালিনী'তে 'মনোরমা'র অংশ অভিনয় করিতেছিলাম। মনোরমার অংশ অভিনয় দর্শন করিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন যে "আমি মনোরমার চরিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখন যে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিব তাহা মনে ছিল না. আজ মনোরমাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যে আমার মনোরমাকে সামনে দেখিতেছি।" কয়েক মাস হইল এখনকার ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার অমৃতলাল বসু মহাশয় এই কথা বলিয়াছিলেন যে "বিনোদ, তুমি কি সেই বিনোদ,—যাহাকে দেখিয়া বঙ্কিমবাবুও বলিয়াছিলেন যে আমার মনোরমাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি?" যেহেতু এক্ষণে রোগে, শোকে প্রায়ই শয্যাগত।

আমি অতি শৈশবকাল হইতে অভিনয় কার্য্যে ব্রতী হইয়া, বুদ্ধি বৃত্তির প্রথম বিকাশ হইতেই, গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষাগুণে আমার কেমন উচ্ছাসময়ী করিয়া তুলিয়াছিল, কেহ কিছুমাত্র কঠিন ব্যবহার করিলেই বড়ই দুঃখ হইত। আমি সতত্তই আদর ও সোহাগ চাহিতাম। আমার থিয়েটারের বন্ধু-বান্ধবেরাও আমায় অত্যধিক আদর করিতেন। যাহা হউক এই সময় হইতে আমি আত্মনির্ভর করিবার তরলা হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়াছিলাম।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা বলি :—প্রতাপবাবুর থিয়েটারে আসিবার ঠিক আগেই হউক আর প্রথম সময়েই হউক, আমাদের অবস্থা গতিকে আমাকে একটি সম্ভ্রান্ত বন্ধুকের আশ্রয়ে থাকিতে হইত। তিনি অভিনয় সজ্জন ছিলেন; তাঁহার স্বভাব অভিনয় সুন্দর ছিল, এবং আমাকে অন্তরের সহিত স্নেহ করিতেন। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহগুণে আমার তাঁহার কতক অধীন হইতে হইয়াছিল। প্রথম তাঁর ইচ্ছা ছিল, যে আমি থিয়েটারে কার্য্য না করি, কিন্তু যখন ইহাতে কোন মতে রাজী হইলাম না, তখন তিনি বলিলেন, তবে তুমি অবৈতনিকভাবে (এ্যামেচার) হইয়া কার্য্য কর, আমার গাড়ী ঘোড়া তোমায় থিয়েটারে লইয়া যাইবে ও লইয়া আসিবে। আমি মহাবিপদে পড়িলাম,

চিরকাল মাহিনা লইয়া কার্য্য করিয়াছি। আমার মায়ের ধারণা যে থিয়েটারের গয়না হইতে আমাদের দারিদ্র্যদশা ঘুচিয়াছে, অতএব ইহাই আমাদের লক্ষ্মী। আর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, সখের মত কাজ করা হইয়া উঠিত না। হাড়-ভাঙ্গা মেহনত করিতে হইত, সেইজন্য সখেও বড় ইচ্ছা ছিল না। আমি একদা গিরিশবাবু মহাশয়কে বলিলাম, তিনি বলিলেন, যে "তাহাতে আর কি হইবে, তুমি "অমুককে" বলিও যে আমি মাহিনা লই না। তোমার মাহিনার টাকাটা আমি তোমার মা'র হাতে দিয়া আসিব।" যদিও প্রতারণা আমাদের চির সহচরী, এই পঙ্কিল জীবনের প্রতারণা আমাদের ব্যবসা বলিয়াই প্রতিপন্ন, তবুও আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আর আমি ঘৃণিতা বারনারী হইলেও অনেক উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছিলাম, প্রতারণা বা মিথ্যা ব্যবহারকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতাম। অবিশ্বাস আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হইলেও আমি সকলকেই বিশ্বাস করিতাম ও ভাল ব্যবহার পাইতাম। লুকোচুরি ভাঁতাভাঁতি আমার ভাল লাগিত না। কি করিব দায়ে পড়িয়া আমায় গিরিশবাবু মহাশয়ের কথায় সম্মত হইতে হইল। উক্ত ব্যক্তির সহিত গিরিশবাবুর বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল, তিনি গিরিশবাবুকে বড় সম্মান করিতেন। তিনি এত সজ্জন ছিলেন যে পাছে উঁহারা কিছু মনে সন্দেহ করেন বলিয়া কাজের আগে আমায় থিয়েটারে পৌঁছাইয়া দিতেন। সে যাহা হউক প্রতাপ জহরীর থিয়েটার বেশ সুশৃঙ্খলায় চলিতে ছিল; তিনিও অভিনয় শিক্ষায় সুদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। এই স্থানে যে যে ব্যক্তি কার্য্য করিয়াছেন, কেবল প্রতাপবাবুই ঋণগ্রস্ত হন নাই। লাভ হইয়াছিল কি না জানি না অবশ্য তাহা বলিতেন না, তবে যে লোকসান হইত না, তাহা জানা যাইত। কেন না প্রতি রাত্রে অন্ততঃ বিক্রয় হইত, আর চারিদিকে সুনিয়ম ছিল। তাঁর বন্দোবস্তও নিয়মমত ছিল। সকল রকমে তিনি যে একজন ব্যবসায়ী লোক তাহা সকলেই জানিত ও জানেন। এক্ষণে আমার উক্ত থিয়েটার ছাড়িবার কারণ ও "ষ্টার থিয়েটার" সৃষ্টির সূচনার কথা বলিয়া এ অধ্যায় শেষ করি। গিরিশবাবুর নূতন নূতন বই ও নূতন নূতন পার্টোমাইমে আমাদের বড়ই বেশী রকম খাটিতে হইত। প্রতিদিন অভিনয় মেহনতে আমার শরীরও অসুস্থ হইতে লাগিল, আমি একমাসের জন্য ছুটী চাহিলাম, তিনি অনেক জেদাজেদির পর ১৫ দিনের ছুটী দিলেন। আমি সেই ছুটীতে শরীর সুস্থ করিবার জন্য ৺কাশীধামে চলিয়া যাইলাম। কিন্তু সেখানে আমার অসুখ বাড়িল। সেই কারণ আমার ফিরিয়া আসিতে প্রায় এক মাস

হইল। এখানে আসিয়া পুনরায় থিয়েটারে যোগ দিলাম, কিন্তু শুনিলাম যে প্রতাপ বাবু আমার দুটীর সময়ের মাহিনা দিতে চাহেন না। গিরিশবাবু বলিলেন যে "দুটীর মাহিনা না দিলে বিনোদ কাজ করিবে না, তখন বড় মুস্কিল হইবে।" যদিও স্পষ্ট শুনি নাই, তবু এই রকম শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, বড় রাগ হইল। আমার একটুতে যেন মনের ভিতর আগুন লাগিয়া যাইত, আমি চোখে কিছু দেখিতে পাইতাম না। সেই দিনই প্রতাপবাবু ভিতরে আসিলে আমি আমার মাহিনা চাহিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "মাহিনা কেন? তোর তো কাজ নেহি—ফিরা!" আর কোথা আছে;—"বটে মাহিনা দিবেন না" বলিয়া চলিয়া আসিলাম। আর গেলাম না।

তারপর গিরিশবাবু, অমৃত মিত্র আমাদের বাটীতে আসিলেন। আমি তখন গিরিশবাবুকে বলিলাম যে "মহাশয়, আমার বেশী মাহিনা চাহি, আর যে টাকা বাকী পড়িয়াছে তাহা চুকি করিয়া চাহি, নচেৎ কাজ করিব না।" তখন অমৃত মিত্র বলিলেন, "দেখ বিনোদ এখন গোল করিও না, একজন মাড়োয়ারীর সন্তান, একটি নূতন থিয়েটার করিতে চাহে; যত টাকা খরচ হয় সে করিবে। এখন কিছুদিন চুপ করিয়া থাক, দেখি কতদূর কি হয়!"

এইখান হইতেই "ষ্টার থিয়েটার" হইবার সূত্রপাত আরম্ভ হইল। আমিও গিরিশবাবুর কথা অনুযায়ী আর প্রতাপবাবুকে কিছু বলিলাম না। শুধু ভিতরে ভিতরে সংবাদ লইতে লাগিলাম কে লোক নূতন থিয়েটার করিতে চাহে?

ষ্টার থিয়েটার সম্বন্ধে আমার কথা

পত্র।

মহাশয়!

এই সময় আমার অভিনয় গতটাপর অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। আমাদের ন্যায় পতিতা অসহায়া বারনারীদের টাল বেটাল তো সর্ব্বদাই সহিতে হয় তবুও তাহাদের সীমা আছে; কিন্তু আমার আসা চিরদিনই বিরূপ ছিল। একে আমি জ্ঞানহীনা অবলা স্ত্রীলোক, তাহাতে সুপথ কুপথ অপরিচিতা। আমাদের গন্তব্য পথ সতত্ই দোষনীয়, আমরা ভাল পথ দিয়া যাইতে চাহিলে, মন্দ আসিয়া পড়ে ইহা যেন আমাদের জীবনের সহিত গাঁথা। লোকে বলেন আত্মরক্ষা সতত উচিত, কিন্তু আমাদের আত্মরক্ষাও নিন্দনীয়। অথচ আমাদের প্রতি

মেহ চক্ষে দেখিবার বা অসময় সাহায্য করিবার কেহ নাই। যাহা হউক; আমার ধর্ম্ম রাখা শুরুন।

আমিও এই সময় ৺প্রতাপবাবু মহাশয়ের থিয়েটার ত্যাগ করিব মনে মনে করিয়াছিলাম। ইহার আগে আর একটি ঘটনায় দ্বারা আমায় কতক বাধিত হইতে হইয়াছিল। আমি যে সম্রান্ত যুবকের আশ্রয়ে ছিলাম, তিনি তখন অবিবাহিত ছিলেন, ইহার কয়েক মাস আগে তিনি বিবাহ করেন ও ধনবান যুবকদ্বয়ের চঞ্চলতা বশতঃ আমার প্রতি কতক অসৎ ব্যবহার করেন। তাহাতে আমাকে অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হয়। সেই কারণে আমি মনে মনে করি যে ঈশ্বর তো আমার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সামর্থ্য দিয়াছেন, এইরূপ শারীরিক মেহনত দ্বারা নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতে যদি সক্ষম হই, তবে আর দেহ বিক্রয় দ্বারা পাপ সঞ্চয় করিব না ও নিজেকেও উৎপীড়িত করিব না। আমা হইতে যদি একটি থিয়েটার ঘর প্রস্তুত হয় তাহা হইলে আমি চিরদিন অন্ন সংস্থান করিতে পারিব। আমার মনের যখন এই রকম অবস্থা তখনই ঐ "ষ্টার থিয়েটার" করিবার জন্য ৺গুপ্তমুখ দ্বার ব্যস্ত। ইহা আমি আমাদের একটাদলের নিকট শুনিলাম এবং ঘটনাচক্রে এই সময় আমার আশ্রয়দাতা সম্রান্ত যুবকও কার্য্যানুরোধে যুরোপে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। এদিকে অভিনেতারা আমাকে অতিশয় স্নেহের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে, "তুমি যে প্রকারে পার একটী থিয়েটার করিবার সাহায্য কর।" থিয়েটার করিতে আমার অনিচ্ছা ছিল না, তবে একজনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যায়রূপে আর একজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি বাধা দিতে লাগিল। এদিকে থিয়েটারের বন্ধুগণের কাতর অনুরোধ! আমি উভয় সঙ্কটে পড়িলাম। গিরিশবাবু বলিলেন থিয়েটারই আমার উন্নতির সোপান। তাঁহার শিক্ষা সাফল্য আমার দ্বারাই সম্ভব। থিয়েটার হইতে মান সম্ভ্রম জগদ্বিখ্যাত হয়। এইরূপ উত্তেজনায় আমার কল্পনা স্ফীত হইতে লাগিল। থিয়েটারের বন্ধুবর্গেরাও দিন দিন অনুরোধ করিতেছেন, আমি মনে করিলেই একটী নূতন থিয়েটার সৃষ্টি হয় তাহাও বুঝিলাম, কিন্তু যে যুবকের আশ্রয়ে ছিলাম, তাঁহাকেও স্মরণ হইতে লাগিল। অবশেষে অনুপস্থিত, উপস্থিত বন্ধুবর্গের কাতরোক্তি, মন থিয়েটারের দিকেই টানিল। তখন ভাবিতে লাগিলাম যিনি আশ্রয় দিয়াছেন, তিনি আমার সহিত যে সদ্ভাব আবদ্ধ ছিলেন, তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন, অপর পুরুষে যেরূপ প্রতারণা বাক্য প্রয়োগ করে, তাঁহারও সেইরূপ। তিনি পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিয়া

ছিলেন যে আমিই তাঁহার কেবল একমাত্র ভালবাসার বস্তু, আজীবন সে ভালবাসা থাকিবে। কিন্তু কই তাহা তো নয়! তিনি বিষয় কার্যের ছল করিয়া দেশে গিয়াছেন, কিন্তু সে বিষয় কার্য নয়, তিনি বিবাহ করিতে গিয়াছেন। তবে তাঁহার ভালবাসা কোথায়? এতো প্রতারণা! আমি কি নিমিত্ত বাধা থাকিব? এরূপ নানা দুঃখ হৃদয়ে উঠিতে লাগিল! কিন্তু মধ্যে মধ্যে আবার মনে হইতে লাগিল, যে সেই দুষার দোষ নাই, আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমি তাঁহার একমাত্র ভালবাসার পাত্রী তবে একি করিতেছি। রাত্রে এ ভাব উদয় হইলে অনিদ্রায় যাইত, কিন্তু প্রাতে বন্ধুবর্গ আসিলে অনুরোধ তরঙ্গ ছুটিত ও রাত্রের মনোভাব একবারে ঠেলিয়া ফেলিত! থিয়েটার করিব সংকল্প করিলাম! কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার মন আমার সহিত প্রতারণা করে নাই। ইহা যতদূর প্রমাণ পাওয়া সম্ভব তাহা পাইয়াছিলাম। কিন্তু দিন ফিরিবার নয়, দিন ফিরিল না। এ প্রমাণের কথা মহাশয়কে সংক্ষেপে পশ্চাৎ জানাইব!

থিয়েটার করিব সংকল্প করিলাম! কেন করিব না? যাহাদের সহিত চিরদিন ভাই ভগ্নীর ন্যায় একত্রে কাটাইয়াছি, যাহাদের আমি চিরবন্দীভূত, তাহারাও সত্য কথাই বলিতেছে। আমার দ্বারা থিয়েটার স্থাপিত হইলে চিরকাল একত্রে ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় কাটিবে। সংকল্প দৃঢ় হইল, গুর্মুখ রায়কে অবলম্বন করিয়া থিয়েটার করিলাম। একের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অপরের আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের চিরপ্রথা হইলেও এ অবস্থায় আমার বড় চঞ্চল ও ব্যথিত করিয়াছিল। হয়তো লোকে শুনিয়া হাসিবেন যে আমাদেরও আবার ছলনায় প্রতারণায় বোধ বা বেদনা আছে। যদি স্থিরচিত্তে ভাবিতেন তাহা হইলে বুঝিতেন যে আমরাও রমণী। এ সংসারে যখন ঈশ্বর আমাদের পাঠাইয়াছিলেন তখন নারী-হৃদয়ের সকল কোমলতায় তো বঞ্চিত করিয়া পাঠান নাই। সকলই দিয়াছিলেন, ভাগ্যদোষে সকলই হারাইয়াছি! কিন্তু ইহাতে কি সংসারের দায়িত্ব কিছুই নাই, যে কোমলতায় একদিন হৃদয় পূর্ণ ছিল তাহা একেবারে নির্মূল হয় না, তাহার প্রমাণ সন্তান পালন করা। পতি-প্রেম নাথ আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব? কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তে হৃদয় দান করিবে? লালসায় আসিয়া প্রেমকথা কহিয়া মনোমুগ্ধ করিবার অভাব নাই, কিন্তু কে হৃদয় দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে আমাদের হৃদয় আছে? আমরা প্রথমে প্রতারণা করিয়াছি, কি প্রতারিতা হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছি, কেহ কি তাহার

অনুসন্ধান করিয়াছেন? বিষ্ণুপরায়ণ প্রাতঃস্মরণীয় হরিদাসকে প্রতারিত করিবার জন্য আমাদেরই যাহাকে একজন প্রেরিত হয়, কিন্তু বৈষ্ণবের ব্যবহারে তিনি বৈষ্ণবী হন, এ কথা জগৎ ব্যাপ্ত। যদি হৃদয় না থাকিত, সম্পূর্ণ হৃদয় শূন্য হইলে কদাচ তিনি বিষ্ণুপরায়ণা হইতে পারিতেন না। অর্থ দিয়া কেহ কাহারও ভালবাসা কেনেন নাই। আমরাও অর্থে ভালবাসা বেচি নাই। এই আমাদের দেশাচারের অপরাধ। নাট্যাচার্য্য গিরিশবাবু মহাশয়ের যে "বারাঙ্গনা" বলিয়া একটি কবিতা আছে, তাহা এই দুর্ভাগিনীদের প্রকৃত ছবি। "ছিল অন্য নারীসম হৃদয় কমল।" অনেক প্রদেশে জল জমিয়া পাষাণ হয়! আমাদেরও তাহাই! উৎপীড়িত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া হৃদয় কঠোর হইয়া উঠে। যাহা হউক, এখন ও কথা থাকুক। এই পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থান্তর গ্রহণ করিতে আমাকে ও থিয়েটারের লোকদিগকে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। কেননা যখন সেই সম্ভ্রান্ত যুবক শুনিলেন যে আমি অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া একটি থিয়েটারে চিরদিন সংলগ্ন হইবার সংকল্প করিয়াছি, তখন তিনি ক্রোধ বশতঃই হউক, কিম্বা নিজের স্নেহ বশতঃই হউক, নানারূপ বাধা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে বাধা বড় সহজ বাধা নহে। তিনি নিজের জমিদারী হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া বাড়ী ঘেরোয়া করিলেন; গুর্খা বাবুও বড় বড় গুণ্ডা আনাইলেন, দারোগারি পুলিশ হাঙ্গামা চলিতে লাগিল। এমন কি একদিন জীবন সংশয় হইয়াছিল! একদিন রিহারসালের পর আমি আমার ঘরে ঘুমাইতে ছিলাম, ভোর ছয়টা হইবে, ঝন্ ঝন্ ঝস্ ঝস্ শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি যে মিলিটারি পোষাক পরিয়া তরওয়াল বাঁধিয়া সেই যুবক একেবারে আমার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন যে, "মেনি এত ঘুম কেন?" আমি চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিতে, বলিলেন যে,"দেখ বিনোদ, তোমাকে উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। তোমার জন্য যে টাকা খরচ হইয়াছে আমি সমস্তই দিব। এই দশ হাজার টাকা লও; যদি বেশি হয় তবে তাহাও দিব।" আমি চিরদিনই একগুঁয়ে ছিলাম, কেহ জোর করিলে আমার এমন রাগ হইত যে, আমার দিক্‌বিদিক্ কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকিত না! যাহা রোক্ করিতাম কিছুতেই তাহা টলাইতে পারিত না! মিষ্ট কথায় স্নেহের আদরে যাহা করিব স্থির করিতাম, কেহ জোর করিয়া নিষেধ করিলে, সে কাজ করিতাম না; জোরের সহিত কাজ করান আমার সহজ সাধ্য ছিল না। তাঁহার ঐরূপ উদ্ধত ভাব দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল, আমি বলিলাম, "না কখনই নহে, আমি উহাদের কথা দিয়াছি, এখন কিছুতেই ব্যতিক্রম করিতে

পারিব না।" তিনি বলিলেন "যদি টাকার জন্য হয়, তবে আমি তোমায় আরও দশ হাজার টাকা দিব।" তাঁহার কথায় আমার ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলিয়া গেল! ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, যে "রাখ তোমার টাকা! টাকা আমি উপার্জ্জন করিয়াছি, এই টাকা আমায় উপার্জ্জন করে নাই! তাগো থাকে অমন দশ বিশ হাজার আমার কত আসিবে, তুমি এখন চলিয়া যাও!" আমার এই কথা শুনিয়া তিনি আগুনের মতন জ্বলিয়া নিজের তরওয়ালে হাত দিয়া বলিলেন, "বটে!—জেবেচ কি যে তোমায় সহজে ছাড়িয়া দিব, তোমায় কাটিয়া ফেলিব! যে বিশ হাজার টাকা তোমায় দিতে চাহিতেছিলাম তাহা অন্য উপায়ে খরচ করিব, পরে যাহা হয় হইবে।" বলিতে বলিতে ঝাঁ করিয়া কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া, চক্ষের নিমিষে আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এক আঘাত করিলেন। আমার দৃষ্টিও তাঁহার তরবারির দিকে ছিল, যেমন তরবারির আঘাত করিতে উদ্যত আমি অমনি একটি টেবিল হারমোনিয়ম ছিল তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম; আর সেই তরবারির চোট হারমোনিয়মের তালার উপর পড়িয়া তালার কাঠ তিন আঙ্গুল কাটিয়া গেল। নিমেষ মধ্যে পুনরায় তরওয়াল তুলিয়া লইয়া আবার আঘাত করিলেন, তাঁর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, আমারও মৃত্যু নাই, সে আঘাতও যে চৌকিতে বসিয়া বাজনা হইত তাহাতে পড়িল, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি উঠিয়া তাঁহার পুনঃ উদ্যত তরওয়াল শুদ্ধ হস্ত ধরিয়া বলিলাম "কি করিতেছ, যদি কাটিতে হয় পরে কাটিও; কিন্তু তোমার পরিণাম? আমার কলঙ্কিত জীবন গেল আর রহিল তাতে ক্ষতি কি! একবার তোমার পরিণাম ভাব, তোমার বংশের কথা ভাব, একটা ঘৃণিত বারাঙ্গনার জন্য এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া সংসার হইতে চলিয়া যাইবে, ছি! ছি! শুন। স্থির হও! কি করিতে হইবে বল? ঠাণ্ডা হও।" শুনিয়াছিলাম দুর্দ্দমনীয় ক্রোধের প্রথম বেগ শমিত হইলে লোকের প্রায় হিতাহিত ফিরিয়া আইসে! এ তাহাই হইল, হাতের তরওয়াল দূরে ফেলিয়া দিয়া মুখে হাত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন! তাঁহার সে সময়ের কাতরতা বড়ই কষ্টকর! আমার মনে হইল যে সব দূরে যাউক, আমি আবার ফিরিয়া আসি। কিন্তু চারিদিক হইতে তখন আমায় অই বন্ধ দিয়া থিয়েটারের বন্ধুগণ ও গিরিশবাবু মহাশয় বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন; কোন দিকে ফিরিবার পথ ছিল না! যাহা হউক, সে হইতে তখন তো পার পাইলাম! তিনি কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন! এদিকে আমরা সে কয়জন একত্র হইয়াছিলাম সকলে প্রতাপবাবুর থিয়েটার ত্যাগ করিলাম। অর্দ্ধেন্দুবাবুও

বলিলেন যে আমি একান্ত তাঁর বশীভূত না হইলে তিনি থিয়েটারের জন্য কোন কার্য্য করিবেন না। কাজে কাজেই গোলযোগ মিটিবার জন্য পরামর্শ করিয়া আমাকে যাদবকে দূরে রাখিতে সকলে বাধ্য হইলেন। কখন বালীগঞ্জে, কখন এখানে তখানে আমায় থাকিতে হইল। ইহার ভিতর কেমন ও কিরূপ থিয়েটার হইবে এইরূপ কার্য্য চলিতে লাগিল। পরে যখন সব স্থির হইল, যে বিডন ষ্ট্রীটে স্থির মিত্রের বাড়ী লিজ্ লইয়া এত দিন থিয়েটার হইবে, এত টাকা খরচ হইবে; তখন আমি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আমি কলিকাতায় আসিবার কয়েকদিন পরে একদিন গুর্ম্মুখবাবু বলিলেন, যে "দেখ বিনোদ! আর থিয়েটারের গোলযোগে কাজ নাই, তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা আমার নিকট লও! আমি একেবারে তোমায় দিতেছি!" এই বলিয়া কতকগুলি নোট বাহির করিলেন। আমি থিয়েটার ভালবাসিতাম, সেই নিমিত্ত ঘৃণিতা বারনারী হইয়াও অর্দ্ধ লক্ষ টাকার প্রলোভন তখনই ত্যাগ করিয়াছিলাম। যখন অদ্ভুত মিত্র শুনিলেন, গুর্ম্মুখ রায় থিয়েটার না করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা আমায় দিতে চান, তখন তাঁহাদের চিন্তার সীমা রহিল না। যাহাতে আমি সে অর্থ গ্রহণ না করি, ইহার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইল না, কিন্তু এ সমস্ত চেষ্টা তখন নিষ্প্রয়োজন। আমি স্থির করিয়াছি থিয়েটার করিব। থিয়েটার ঘর প্রস্তুত না করিয়া দিলে আমি কোন মতে তাঁহার বাধ্য হইব না। তখন আমারই উদ্যমে বিডন ষ্ট্রীটে জমি লিজ্ লওয়া হইল, এবং থিয়েটার প্রস্তুতের জন্য গুর্ম্মুখ রায় অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। উক্ত বিডন ষ্ট্রীটেই বনমালী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটী ভাড়া লইয়া রিহার্সাল আরম্ভ হইল, তখন একে একে সব নূতন পুরাতন একটার এক্ট্রেস আসিয়া যোগ দিতে লাগিলেন! গিরিশবাবু মহাশয় মাষ্টার ও ম্যানেজার হইলেন এবং বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় এখনকার ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার অমৃতলাল বসু আসিলেন। ইহার আগে উনি বেঙ্গল থিয়েটার লিজ্ লন, তখন বোধহয় আমরা ৺প্রতাপ বাবুর থিয়েটারে; সেই সময় কোন কারণ বশতঃ জোড়া মন্দিরের পাশে ঐ সিমলাতে আমাদের একটি বাড়ী ভাড়া ছিল। সে বাড়ীতে ভূনীবাবুও প্রায়ই যাইতেন ও কার্য্যান্তরোধে কয়েকদিন বাসও করিয়াছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের সহিত বিবাদ থাকায় থিয়েটার হাউস দখল করিতে পারিতেছিলেন না। আমরাই দূরদেশ হইতে লাঠিয়াল আনাইয়া দিয়া ভূনীবাবুকে দখল দেওয়াইয়া দিই। পরে যখন আমাদের নূতন থিয়েটার হইল, তখন ভূনীবাবু

আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দেন! সেই সময় প্রকৃতপক্ষে জহরলাল ধর আমাদের ষ্টেজ ম্যানেজার হন! দাসুবাবু যদিও ছেলেমানুষ কিন্তু কার্য্য শিখিবার জন্য গিরিশবাবু মহাশয় উহাকে সহকারী ষ্টেজ ম্যানেজার করেন এবং হিসাবপত্র সব ভাল থাকিবে ও বন্দোবস্ত সব সুশৃঙ্খলে হইবে বলিয়া তিনি এখনকার প্রোপ্রাইটার বাবু হরিপ্রসাদ বসু মহাশয়কে আনিয়া সকল ভার দেন। হরিবাবু মহাশয় চিরদিনই বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান! গিরিশবাবু মহাশয় নূতন থিয়েটারের উন্নতি করিবার জন্য লিজ-কার্য্যে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন বলিয়া নিজে সকল কাজ দেখিতে পারিতেন না। সে জন্য সুযোগ্য লোক দেখিয়া দেখিয়া তাঁহাদের উপর এক এক কার্য্যের ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন। অতি উৎসাহের ও আনন্দের সহিত কার্য্য চলিতে লাগিল। এই সময় আমরা বেলা ২।৩টার সময় রিহার্সালে গিয়া সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া থিয়েটারে আসিতাম; এবং অন্যান্য সকলে চলিয়া যাইলে আমি নিজে বুকি করিয়া মাটী বহিয়া পিট, যাহা পিটের স্থান পূর্ণ করিতাম, কখন কখন মজুরদের উৎসাহের জন্য প্রত্যেক ঝুকি পিছু চারিকড়া করিয়া কড়ি কার্য্য করিয়া দিতাম। শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুতের জন্য রাত্র পর্য্যন্ত কার্য্য হইত। সকলে চলিয়া যাইতেন, আমি গুর্মুখবাবু আর ২।১ জন রাত্র জাগিয়া কার্য্য করাইয়া লইতাম। আমার সেই সময়ের আনন্দ দেখে কে? অতি উৎসাহে অনেক পয়সা ব্যয়ে থিয়েটার প্রস্তুত হইল। বোধহয় এক বৎসরের ভিতর হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার সহিত আমি আর একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না, থিয়েটার যখন প্রস্তুত হয় তখন সকলে আমায় বলেন যে "এই যে থিয়েটার হাউস্ হইবে, ইহা তোমার নামের সহিত যোগ থাকিবে। তাহা হইলে তোমায় মৃত্যুর পরও তোমার নামটি বজায় থাকিবে। অর্থাৎ এই থিয়েটারের নাম "বি" থিয়েটার হইবে।" এই আনন্দে আমি আরও উৎসাহিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কার্য্যকালে উঁহারা সে কথা রাখেন নাই কেন—তাহা জানি না। যে পর্য্যন্ত থিয়েটার প্রস্তুত হইয়া রেজেষ্ট্রী না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত আমি জানিতাম যে আমারই নামে "নাম" হইবে। কিন্তু যে দিন উঁহারা রেজেষ্ট্রী করিয়া আসিলেন—তখন সব হইয়া গিয়াছে, থিয়েটার খুলিবার সপ্তাহকয়েক বাকী; আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলাম যে থিয়েটারের নূতন নাম কি হইল? দাসুবাবু প্রফুল্লভাবে বলিলেন যে "স্টার।" এই কথা শুনিয়া আমি হৃদয়ে যেন অতিশয় আঘাত পাইয়া বসিয়া যাইলাম যে দুই মিনিট ভাল কথা কহিতে পারিলাম না। কিছু পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম

"বেশ!" পরে মনে ভাবিলাম যে উঁহারা কি শুধু আমার মুখে স্নেহ মমতা দেখাইয়া কার্য্য উদ্ধার করিলেন? কিন্তু কি করিব, আমার আর কোন উপায় নাই! আমি তখন একেবারে উঁহাদের হাতের ভিতরে! আর আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে উঁহারা ছলনা দ্বারা আমার সহিত এমনভাবে অসৎ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এত টাকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে আমার যে কষ্ট না হইয়াছিল তাঁহাদের এই ব্যবহারে আমার অভিমান মনোকষ্ট হইয়াছিল যদিও এ সম্বন্ধে আর কখন কাহাকেও কোন কথা বলি নাই, কিন্তু ইহা ভুলিতেও পারি নাই, ঐ ব্যবহার বরাবর মনে ছিল। আর থিয়েটার আমার বড় প্রিয়, থিয়েটারকে বড়ই আপনার মনে করিতাম, যাহাতে তাহাতে আর একটি নূতন থিয়েটার হো হইল: সেই কারণে সেই সময় তাহা চালাও পড়িয়া যাইত। কিন্তু থিয়েটার প্রস্তুত হইবার পরও সময়ে সময়ে বড় ভাল ব্যবহার পাই নাই। আমি যাহাতে উক্ত থিয়েটারে বেতনভোগী অভিনেত্রী হইয়াও না থাকিতে পারি তাহার জন্যও সকলে বিষিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন কি তাঁহাদের উদ্যোগ ও যত্নে আমাকে মাস দুই ঘরে বসিয়াও থাকিতে হইয়াছিল। তাহার পর আবার গিরিশবাবুর যত্নে ও স্বত্বাধিকারীর জেদে আমার পুনরায় যোগ দিতে হইয়াছিল। লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিলাম যে প্রোপ্রাইটার "এতো বড় অন্যায়, যাহার দরুণ থিয়েটার করিলাম তাহাকে বাদ দিয়া কার্য্য করিতে হইবে? এ কখন হইবে না। তাহা সব গুটাইয়া দিব।" সে যাহা হউক, একসঙ্গে থাকিতে হইলে ত্রুটী হইয়া থাকে, আমারও শত সহস্র দোষ ছিল। কিন্তু অনেকেই আমার বড় স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ মাননীয় গিরিশবাবুর স্নেহাধিক্যে আমার অভিমান একটু বেশী প্রশ্রয় করিত; সেইজন্য দোষ আমারই অধিক হইত। কিন্তু আমার অভিনয় কার্য্যের উৎসাহের জন্য সকলেই প্রশংসা করিতেন, এবং দোষ ভুলিয়া আমার প্রতি স্নেহের ভাবই অধিক বিকাশ পাইত। আমি তাঁহাদের সেই অকৃত্রিম স্নেহ কখন ভুলিতে পারিব না! এই থিয়েটারে কার্যকালীন কোন সুকার্য্য করিয়া থাকি আর না করিয়া থাকি প্রবৃত্তির দোষে বুদ্ধির বিপাকে অনেক অন্যায় করিয়াছি সত্য! কিন্তু এই কার্য্যের দরুণ অনেক ঘাত-প্রতিঘাতও সহিতে হইয়াছে। এইরূপ নানাবিধ টাল-বেটালের পর নূতন "ষ্টারে" নূতন পুস্তক "বলিদান" অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন সকলেরই মনোযোগিত্ব এক রকম ঘুরে গিয়াছিল। সকলেই জানিত যে এই থিয়েটারটী আমাদের নিজের। আমরা ইহাকে যেমন আত্মিক চাক্‌চিক্যময় করিয়াছি তেমনিই গুণময় করিয়া ইহার

সৌন্দর্য্য আরও অধিক করিব। সেই কারণে সকলে আনন্দে, উৎসাহে একমনে অভিনয়ের গৌরব বৃদ্ধির জন্য যত্ন করিতেন।

এখানকার প্রথম অভিনয় "দক্ষযজ্ঞ"। ইহাতে গিরিশবাবু মহাদেব "দক্ষ", অমৃত মিত্র "মহাদেব", ভূনীবাবু "বীরভদ্র"। আমি "সতী", কাদম্বিনী "প্রসূতি" এবং অন্যান্য সুযোগ্য লোক সকল নানাবিধ অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রথম দিনের সে লোকারণ্য, সেই ঘরখানি দেওয়ালে লোক সব ঝুলিয়া ঝুলিয়া বসে থাকা দেখিয়া আমাদের বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া কম্পন বর্ণনাতীত। আমাদেরই সব "দক্ষযজ্ঞ" ব্যাপার! কিন্তু যখন অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন দেবতার বরে যেন সভাই দক্ষালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইল। যজ্ঞের প্যারিক গিরিশবাবুর সেই গুরুগম্ভীর তেজপূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্ত্তি যখন ষ্টেজে উপস্থিত হইল তখন সকলেই চুপ। তাহার পর অভিনয় উৎসাহে, সে কথা লিখিয়া বলা যায় না। গিরিশবাবু "দক্ষ", অমৃত মিত্রের "মহাদেব" যে একবার দেখিয়াছে, সে বোধ হয় কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না। "কে—রে, সে—রে, সতী সে আমার" বলিয়া যখন অমৃত মিত্র ষ্টেজে বাহির হইতেন তখন বোধ হয় সকলেরই বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত। দক্ষের মুখে পতি-নিন্দা শুনিয়া যখন সতী প্রাণ ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিত তখন সে বোধ হয় নিজেকেই ভুলিয়া যাইত। অভিনয়কালীন ষ্টেজের উপর যেন অগ্নি উত্তাপ বাহির হইত। যাহা হউক, এই থিয়েটার হইবার পর গিরিশবাবু মহাশয়ের যত্নে ও অভিনেতা ও অভিনেত্রীবর্গের আগ্রহ উৎসাহে দিন দিন উচ্চলক্ষ্য উন্নতির পথে চলিতে লাগিল। এই থিয়েটারেই কার্য্যকালীন নানাবিধ গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত, সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট উৎসাহ পাইয়া আমার কার্য্যের গুরুত্ব আমি অনুভব করিতে পারিলাম। অভিনয়-কার্য্য যে রঙ্গালয়ের রঙ্গ নহে, তাহা শিক্ষা করিবার ও শীক্ষা দিবার বিষয়। অভিনয়-কার্য্য যে হৃদয়ের সহিত মিশাইয়া লইয়া সে কার্য্য মন ও হৃদয় এক করিয়া লইতে হয়; তাহাতে কতকটা আপনাকে ঢালিয়া মিলাইয়া লইতে হয় তাহা বুঝিতে সক্ষম হইলাম, এবং আমার ন্যায় ক্ষুদ্র-বুদ্ধি চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকদের যে কতদূর উচ্চ কার্য্য সমাধার জন্য প্রস্তুত হইতে হয় তাহাও বুঝিতে সক্ষম হইলাম। সেই কারণ সতত যত্নের সহিত হৃদয়কে সংযম রাখিতে চেষ্টা করিতাম। ভাবিতাম যে ইহাই আমার কার্য্য ও ইহাই আমার জীবন। আমি প্রাণপণ যত্নে মহামহিমান্বিত চরিত্র সকলের সম্মান রক্ষা করিতে হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করিব। ইহার পর গিরিশবাবুর লিখিত সব উচ্চ অঙ্গের

পুস্তক অভিনয় হইতে লাগিল। যথাস্থানে সমাজ শীঘ্রনে বা অন্য কারণে হউক গুর্খুখবাবু থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করিলেন। সেই সময় হরিবাবু, অমৃত মিত্র মাস্তবাবু কিছু কিছু টাকা দিয়া ও কতক টাকা স্বর্গগত মাননীয় হরিধন দত্ত মহাশয়ের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া ও তখন একৃজিবিশনের লম্বর প্রতাপ অভিনয় চালাইয়া সেই টাকার দ্বারা "ষ্টার থিয়েটার" নিজেরা ক্রয় করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসুও একজন প্রোপ্রাইটার হইলেন। এই সময় নানা কারণে ও অসুস্থ হইয়া গুর্খুখবাবু থিয়েটারের স্বত্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন ও বলিলেন যে, "এই থিয়েটার যাহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, আমি তাহাকেই ইহার স্বত্ব দিব, অন্ততঃ ইহার অর্দ্ধেক স্বত্ব তাহার থাকিবে, নচেৎ আমি হস্তান্তর করিব না।"

সেই সময় গুর্খুখবাবুর ইচ্ছায় আমারও সমান অংশ লইবার কথা উঠিল। লোক পরম্পরায় শুনিলাম যে গুর্খুখবাবু বলিয়াছিলেন যে ইহাতে বিনোদের অংশ না থাকিলে আমি কখন উহাদিগকে দিব না। এদিকে কিন্তু গিরিশবাবু মহাশয় তাহাতে রাজী হইলেন না, তিনি আমার মাকে বলিলেন যে "বিনোদের মা ও-সব ঝঞ্ঝাটে তোমাদের কাজ নাই, তোমরা স্ত্রীলোক অত ঝঞ্ঝাট বহিতে পারিবে না। আমরা আমার ব্যাপারি আমাদের জাহাজের খবরে কাজ নাই। তোমার মেয়েকে ফেলিয়া তো আমি কখন অন্যত্র কার্য্য করিব না; আর থিয়েটার করিতে হইলে বিনোদ যে একজন অতি প্রয়োজনীয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। আমরা কার্য্য করিব; বোঝা বহিবার প্রয়োজন নাই। গাধার পিঠে বোঝা দিয়া কার্য্য করিব।" গিরিশবাবুর এই সকল কথা শুনিয়া মা আমার কোন মতেই রাজি হইলেন না। যেহেতু আমার মাতাঠাকুরাণীও গিরিশবাবু মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার কথা অবহেলা করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। এই রকম নানাবিধ ঘটনায় ও রটনায় বহু দিবসাবধি লোকের মনে ধারণা ছিল যে "ষ্টারে" আমার অংশ আছে। এমন কি অনেকবার লোকে আমায় স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছে "তোমার কত অংশ?" সে যাহা হউক, এই থিয়েটার ইহাদের নিজের হাতে আসিবার পর বিগুণ উৎসাহে কার্য্য আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে একৃজিবিশনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তখনও একৃজিবিশন চলিতেছে, কত দেশ দেশান্তরের লোক কলিকাতায়। আমাদের উদ্যোগ, উৎসাহ, আনন্দ দেখে কে? এই সময় আবার আমরা সব ঐক্য হইলাম। যে যাহার কার্য্য করিতে লাগিল, তাহা যেন তা'রই নিজের কার্য্য! এই সময়

সুবিখ্যাত "নল-দময়ন্তী", "রুপচরিত্র" "শ্রীবৎস-চিন্তা" ও "প্রহ্লাদচরিত্র" নাটক প্রস্তুত হয়।

এই থিয়েটারের যতই সুনাম প্রচার হইতে লাগিল, গিরিশবাবু মহাশয় ততই যত্নে আমায় নানাবিধ সংশিক্ষা দিয়া কার্য্যক্ষম করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন। এইবার "চৈতন্যলীলা" নাটক লিখিত হইল এবং উহার শিক্ষাকার্য্যও আরম্ভ হইল। এই "চৈতন্যলীলা"র রিহারসালের সময় "অমৃতবাজার পত্রিকার" এডিটার বৈষ্ণবচূড়ামণি পূজনীয় শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু মহাশয় মাঝে মাঝে যাইতেন এবং আমার দ্বারা দীনার দ্বারা সেই দেব-চরিত্র যতদূর সম্ভব সুরুচি সংযুক্ত হইয়া অভিনয় হইতে পারে তাহার উপদেশ দিতেন, এবং বার বার বলিতেন যে, "আমি যেন সতত গৌর পাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করি। তিনি অধমতারণ, পতিত-পাবন, পতিতের উপর তাঁর অসীম দয়া।" তাঁর কথামত আমিও সতত ভয়ে ভয়ে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতাম। আমার মনে বড়ই আশঙ্কা হইত যে কেমন করিয়া এ অকূল পাথারে কূল পাইব। মনে মনে সদাই ডাকিতাম "হে পতিতপাবন গৌরহরি, এই পতিতা অধমাকে দয়া করুন।" যেদিন প্রথম চৈতন্যলীলা অভিনয় করি তাহার আগের রাত্রে প্রায় সারা রাত্রি নিদ্রা যাই নাই; প্রাণের মধ্যে একটা আকুল উদ্বেল হইয়াছিল। প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নানে যাইলাম; পরে ১০৮ দুর্গানাম লিখিয়া তাঁহার চরণে ভিক্ষা করিলাম যে, "মহাপ্রভু যেন আমায় এই মহাসঙ্কটে কূল দেন। আমি যেন তাঁর কৃপালাভ করিতে পারি"; কিন্তু সারা দিন ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া রহিলাম। পরে জানিলাম, আমি যে তাঁর অভয় পদে শরণ লইয়াছিলাম তাহা বোধহয় ব্যর্থ হয় নাই। কেননা তাঁর যে দয়ার পাত্রী হইয়াছিলাম তাহা বহুলোকের মুখেই ব্যক্ত হইতে লাগিল। আমিও মনে মনে বুঝিতে পারিলাম যে ভগবান আমায় কৃপা করিয়েছেন। কেননা সেই বাল্যলীলার সময় "রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী" বলিয়া গীত ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন একটা শক্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যখন মালিনীর নিকট হইতে মালা পরিয়া তাহাকে বলিতাম "কি দেখ মালিনী?" সেই সময় আমার চক্ষু বহির্বৃত্তি হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আমি হৃদয় মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম যেন দেখিতাম; আমার মনে হইত "ঐ যে গৌরহরি, ঐ যে গৌরাঙ্গ" উনিই তো বলিতেছেন, আমি সব ভুল দিয়া

শুনিতেছি ও মুখ দিয়া তাঁহারই কথা প্রতিধ্বনি করিতেছি! আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইত, সমস্ত শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া যাইত চারিদিকে যেন মোহার আবরণ হইয়া যাইত। আমি যখন অধ্যাপকের সহিত তর্ক করিয়া বলিতাম "প্রভু কেবা কার। সকলই সেই কৃষ্ণ" তখন সত্যই মনে হইত যে "কেবা কার!" পরে যখনই উৎসাহ উৎফুল্ল হইয়া বলিতাম যে,—

"গঙ্গাধামে হেরিলাম বিশ্বরূপ,
বিশ্বরূপে পশুতে করিতেছে মধুপান,
কত শত কোটী অসংখ্যরূপে প্রাপ্তি!"

তখন মনে হইত বুঝি আমার বুকের ভিতর হইতে এই সকল কথা আর কে বলিতেছে। আমি তো কেহই নহি! আমাতে আমি-জ্ঞানই থাকিত না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মাতা শচীদেবীর নিকট বিদায় লইবার সময় যখন বলিতাম যে—

"কৃষ্ণ বলে কাঁদ মা জননী,
কেঁদনা নিমাই বলে,
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকল পাবে,
কাঁদিলে নিমাই বলে,
নিমাই হারাবে কৃষ্ণে নাহি পাবে।"

তখন স্ত্রীলোক দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন যে আমার বুকের ভিতর গুর্‌গুর্‌ করিত। আবার আমার শচীমাতার সেই হৃদয়ভেদী মর্ম্ম-বিদারণ শোকধ্বনি, নিজের মনের উত্তেজনা, দর্শকবৃন্দের ব্যগ্রতা আমায় এত অধীর করিত যে আমার নিজের দুই চক্ষের জলে নিজে আকুল হইয়া উঠিতাম। শেষে সন্ন্যাসী হইয়া সঙ্কীর্ত্তন কালে "হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়। আমি অবে একা যাও যে দেখা প্রাণ সখা রাখ পায়।" এই গানটী গাহিবার সময়ের মনের ভাব আমি লিখিয়া জানাইতে পারিব না। আমার সত্যই তখন মনে হইত যে আমি তো অবে একা, কেহ তো আমার আপনার নাই। আমার প্রাণ যেন ছুটিয়া গিয়া হরি পাদপদ্মে আপনার আশ্রয় স্থান খুঁজিত। উন্মত্তভাবে সঙ্কীর্ত্তনে নাচিতাম। এক একদিন এমন হইত যে অভিনয়ের গুরুতায় বহিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতাম।

একদিন অভিনয় করিতে করিতে যথাস্থানেই অচৈতন্য হইয়া পড়ি, সেদিন অভিনয় লোকারণ্য হইয়াছিল। "চৈতন্যলীলার" অভিনয়ে প্রায় অধিক লোক

হইত। তবে যখন কোন কার্য্য উপলক্ষে বিদেশী লোক সকল আসিতেন তখন আরও রঙ্গালয় পূর্ণ হইত এবং প্রায় অনেক গণ্য লোকই আসিতেন। মাননীয় কালার সাহেব সেদিন উপস্থিত ছিলেন, ড্রপসিনের পরেই ষ্টেজের ভিতর গিয়াছিলেন; আমার ঐ রকম অবস্থা শুনিয়া গিরিশবাবু মহাশয়কে বলেন যে "চল আমি একবার দেখিব।" গিরিশবাবু তাঁহাকে আমার গ্রিণরুমে লইয়া যাইলেন; পরে যখন আমার চৈতন্য হইল, আমি দেখিতে পাইলাম একজন মস্ত বড় দাড়িওয়ালা সাহেব টিলা ইজের জামা পরা আমার মাথার উপর হইতে পা পর্য্যন্ত হস্ত চালনা করিতেছেন। আমি উঠিয়া বসিতে গিরিশবাবু বলিলেন, "ইহাকে নমস্কার কর। ইনি মহামহিমান্বিত পণ্ডিত "কালার সাহেব"।" আমি তাঁর নাম শুনিতাম, কখনও তাঁহাকে দেখি নাই! আমি হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনি আমার মাথায় খানিক হাত দিয়া এক গ্লাস জল খাইতে বলিলেন! আমি এক গ্লাস জল পান করিয়া বেশ সুস্থ হইয়া কার্য্যে ব্রতী হইলাম। অন্য সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে যেমন নিস্তেজ হইয়া পড়িতাম, এবার তাহা হয় নাই; কেন তাহা বলিতে পারিনা! এই চৈতন্য-লীলা অভিনয় জন্য আমি যে কত মহামহোপাধ্যায় মহাশয়গণের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। পরম পূজনীয় নবদ্বীপের বিষ্ণু-প্রেমিক পণ্ডিত মধুরানাথ পদরত্ন মহাশয় ষ্টেজের মধ্যে আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার পবিত্র পদ ধূলিতে আমার মস্তক পূর্ণ করিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমি মহাপ্রভুর দয়ায় কত ভক্তি-ভাজন সুধীগণের কৃপার পাত্রী হইয়াছিলাম। এই চৈতন্যলীলায় অভিনয়ে—শুধু চৈতন্যলীলার অভিনয়ে নহে আমার জীবনের মধ্যে চৈতন্যলীলা অভিনয় আমার সকল অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় এই যে আমি পতিতপাবন পরমহংসদেব রামকৃষ্ণ মহাশয়ের কৃপা পাইয়াছিলাম। কেননা সেই পরম পূজনীয় দেবতা, চৈতন্যলীলা অভিনয় দর্শন করিয়া আমায় তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিয়াছিলেন। অভিনয় কার্য্য শেষ হইলে আমি শ্রীচরণ দর্শন জন্য যখন আশিস ঘরে তাঁহার চরণ সমীপে উপস্থিত হইতাম, তিনি প্রসন্ন বদনে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতেন; "হরি গুরু, গুরু হরি", বল মা "হরি গুরু, গুরু হরি", তাহার পর উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপ দেহকে পবিত্র করিয়া বলিতেন যে, "মা তোমার চৈতন্য হউক।" তাঁর সেই সুন্দর প্রসন্ন ক্ষমার মূর্ত্তি আমার ন্যায় অধম জনের প্রতি কি করুণাময় মূর্ত্তি! পাতকীতারণ পতিতপাবন যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমায় অভয়

দিয়াছিলেন। হায়! আমি বড়ই ভাগ্যহীনা অভাগিনী! আমি তবুও তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই। আমার মোহে ভক্তিত হইয়া জীবনকে নরক সদৃশ করিয়াছি।

আর একদিন যখন তিনি অসুস্থ হইয়া শ্যামপুকুরের বাটীতে বাস করিতেছিলেন, আমি শ্রীচরণ দর্শন করিতে গেই রোগক্লান্ত প্রসন্নবদনে আমায় বলিলেন, "আয় মা বোস", আহা কি স্নেহপূর্ণ ভাব! এ নরকের কীটকে যেন ক্ষমার জন্য সতত আগুয়ান? কতদিন তাঁহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথের (পরে যিনি বিবেকানন্দ স্বামী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন) "সত্যং শিবং" মঙ্গলগীতি মধুর কণ্ঠে থিয়েটারে বসিয়া শ্রবণ করিয়াছি। আমার থিয়েটার কার্য্যকরী স্নেহকে এইজন্য বড় মনে করিয়াছি। জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাহেতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না। কেননা আমি জানি যে "পরমারাধ্য পরম পূজনীয় ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব" আমায় কৃপা করিয়াছিলেন। তাঁর সেই পীযূষ পূরিত আশাময়ী বাণী—"হরি গুরু, গুরু হরি" আমায় আজও আশ্বাস দিতেছে। যখন অসহনীয় হৃদয়-ভারে অবনত হইয়া পড়ি; তখনই যেন সেই ক্ষমাময় প্রসন্ন মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া বলেন যে, "বল—হরি গুরু গুরু হরি।" এই চৈতন্যলীলা দেখার পর তিনি কতবার থিয়েটারে আসিয়াছেন, মনে নাই। তবে "বঙ্গে" যেন তাঁর সেই প্রসন্ন প্রফুল্লময় মূর্ত্তি আমি বহুবার দর্শন করিয়াছি।

ইহার পর "দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা" অভিনয় হয়। এই দ্বিতীয় ভাগ চৈতন্যলীলা প্রথমভাগ হইতে কঠিন ও অভিনয় বড় বড় পাঁচ দ্বারা পূর্ণ! আর ইহাতে চৈতন্যের ভূমিকাই অধিক। এই দ্বিতীয়ভাগ চৈতন্যলীলার অংশ মুখস্থ করিয়া আমার একমাস মাথার যন্ত্রণা অনুভব করিতে হইয়াছিল। ইহার সকল স্থান কঠিন ও উন্মাদকারী; কিন্তু যখন সার্ব্বভৌম ঠাকুরের সহিত আকার ও নিরাকারবাদ লইয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে করিতে মহাপ্রভুর বড়ভুজমূর্ত্তি ধারণ, সেই স্থান অভিনয় যে কতদূর উন্মাদকারী আত্মবিস্মৃত ভাবপূর্ণ, তাহা যাঁহারা দ্বিতীয়ভাগ চৈতন্যলীলার অভিনয় না দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতেই পারিবেন না। সেই সকল স্থান অভিনয়কালীন মনের আগ্রহ যতদূর প্রয়োজন, আমার দেহের শক্তিও ততদূর দরকার। কেন না সেই লম্ফ হইতে উচ্চ, উচ্চ হইতে উচ্চতর স্বর সংযোগে একতানে মনের আবেগে মনে হইত যে আমি বুঝি এখনই পড়িয়া যাইব। আর সেই ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশকালীন "ঐ ঐ আমার

ক্যালাচাঁদ" বলিয়া আত্মহারা! উহা বলিতে যত সহজ, কার্যে যে কতদূর কঠিন ভাবিতেও ভয় হয়! এখনকার এই জড়, অপদার্থ দেহে যখন সেই সকল কথা ভাবি, তখন মনে হয়, যে কেমন করিয়া আমি উহা সম্পূর্ণ করিতাম। তাই মনে হয় যে, সেই মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত আমার সাধ্য কি? আমি রঙ্গালয় ত্যাগ করিবার পর এই "দ্বিতীয়বার চৈতন্যলীলা" আর অভিনয় হয় নাই! এই সময় অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন "বিবাহ বিভ্রাট" প্রস্তুত হয়। উহাতে আমি "বিলাসিনী কাঙ্কেরমার" অংশ অভিনয় করি! কি বিষম বৈষম্য! কোথায় জগতপূজ্য দেবতা মহাপ্রভু চৈতন্য চরিত্র; আর কোথায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিতা হিন্দু-সমাজ বিরোধী সভ্যা স্ত্রী বিলাসিনী কাঙ্কেরমার চরিত্র! আমি তো হয় মাস যাস ধরিয়া এক সঙ্গে "চৈতন্য" ও "বিলাসিনীর" অংশ অভিনয় করিতে সাহস করি নাই। যদিও পরে অভিনয় করিতে হইয়াছিল, কিন্তু অনেকদিন পরে তবে সাহস হইয়াছিল। অভিনয়কালীন কত যে বাধা বিপত্তি সহিতে হইত, এখন মনে হইলে ভাবি যে কেমন করিয়া এত কষ্ট সহিতাম। সময়ে সময়ে এত অসুস্থ হইয়া পড়িতাম যে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে প্রায় আমার অনিষ্ট হইত। মাঝে মাঝে গঙ্গার তীরের নিকট কোনো স্থানে বাসা লইয়া বাস করিতাম এবং শনি ও রবিবারে আসিয়া অভিনয় করিয়া যাইতাম। আমার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন হইত, তাহার ব্যয়-ভার থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা যত্নের সহিত বহন করিতেন।

এই সময়ের মধ্যে আর একটি পরিবর্তন ঘটে। অসুখে ও নানারূপ বাধা বিপত্তিতে আমার মনের ভাব হঠাৎ অন্য প্রকার হয়। মনে করি যে আমি আর কাহার অধীন হইব না। ঈশ্বর আমায় যে স্বকৃত উপার্জনের ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করিব। আমার এই মনের ভাব প্রায় দেড় বৎসর ছিল এবং সেই সময় আমি বড় শান্তিতে দিন কাটাইতাম। সন্ধ্যার সময় কার্যস্থানে যাইতাম, আপনার কার্য সমাধা হইলে ভূনীবাবু ও গিরিশবাবু মহাশয়ের নিকট নানা দেশ-বিদেশের গল্প বা থিয়েটারের কথা সব শুনিতাম, এবং কি করিলে কোন খানে উন্নতি হইবে, কোন্ কার্যের কোথায় কি ত্রুটী আছে এই নানারূপ পরামর্শ হইত। পরে বাটীতে আসিলে স্নেহময়ী জননী কত যত্নে আহার দিতেন। সেই গভীর রাত্রে উঠিয়া নিকটে বসিয়া আহার করাইতেন। আহারান্তে ভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতাম। কিন্তু পরিশেষে নানারূপ মনস্তাপ যাহা থিয়েটারে কার্য করা হইয়া উঠিল।

যাঁহারা একসঙ্গে কার্য্য করিবার কালীন সমসাময়িক স্নেহময় ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়, সখা ও সঙ্গী ছিলেন, তাঁহারা ধনবান উন্নতিশীল অবাক হইলেন। বোধহয়, সেই কারণে অথবা আমারই অপরাধে দোষ হইতে লাগিল। কাজেই আমায় থিয়েটার হইতে অবসর লইতে হইল।"

---

* বাংলা রঙ্গালয়ের আদিযুগের অভিনেত্রী বিনোদিনী নিজের বিচিত্র জীবন ও অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখেছিলেন তাঁর 'আমার কথা' বইতে। তার প্রথমাংশ গত সংখ্যা 'একল'-এ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এই সংখ্যায় তারপরের অংশ দেওয়া হলো। আগামী সংখ্যায় শেষাংশ ছাপা হবে। সম্পাদক।

প্রতিমা : নন্দলালের নূতন রূপকৃতি

কানাই সামন্ত

কবির ভাষায় বলতে গেলে : নির্জনে নিভৃতে 'আমি'তে 'আমি'তে মধুমধুর করতালি বাজছে। ...

'আমার বেলা যে যায় শীঘ্র বেলাতে' এ গান যখন সবে রচিত হয়েছে, তারই সুরের রেশে অবনীন্দ্রনাথকে গাইতে শুনেছি গুন্‌গুন্ স্বরে—

আমার বেলা যে যায় শীঘ্র বেলাতে
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে।
আমার একতারাটির একটি তারে
সুরের বেদন বইতে নারে
আমার তুলি সইতে নারে
নিখিল রঙের বেদন বইতে নারে—
ওগো, তোমার সাথে বারে বারে
আমি হায় মেনেছি এই খেলাতে।

কত যে দরদ, কত বিচিত্র আবেগ তা বলা যায় না। এ গান তো আসর মাতিয়ে পাঁচজনকে শোনানো নয়, হাতের তুলি হাতে থাকতেই নিজের মনে নিজেকে শোনানো হাতওয়ালা আয়নাকেদারাটিতে ব'সে— অন্য কে শুনল না-শুনল তাতো খেয়াল নেই— দক্ষিণের বারান্দায় সবে মাত্র চাপারঙ রোদটি এসে পড়েছে, চঞ্চল দুটি চড়ুই নাচানাচি করছে রেলিঙের উপর বা কার্নিশের ধারে, আর বাগানের গাছপালাগুলি দেখা যায় আলোছায়ার বাতাসে ঝিল্‌মিল্ করছে। কিন্তু, শুধু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিল্প নন্দলালের সর্বাঙ্গীণ তুলনা তো হয় না। তাই কবির অন্য একটি গানের ভাষায় বড়ো জোর বলতে পারি—

খেলার ছলে সাজিয়ে তোমায় ছলের বাঁধি
দিনে দিনে ভালাও দিনের তরীখানি।

না, তাও কি বলা যায়? শিল্পী নন্দলালের শিল্পসাধনায় চিরদিন ছিল একটি শুদ্ধসংযত আরাধনার ভাব, আর আজও আছে। অশীতিবর্ষের কাছাকাছি এসে

শারীরিক শক্তি আর, ইচ্ছামত খাটতেও পারেন না, আর মানসিক শক্তি সম্বন্ধে সংযমক্ষণ ক'রে দিন থেকে দিনে উজিয়ে চলেছেন। অথচ আজ এক বৎসরের বেশি হল সন্ত-আলো-ফুটে-ওঠা সকাল বেলায় নির্জন 'কাঁচের ঘরে', নিজের কাজের ঘরে, ব'সে একমনে তুলি ধ'রে দিনের পর দিন যে ছবিগুলি আঁকছেন— প্রত্যহ প্রভাতে একখানি ক'রে ছবি আঁকেন— 'খেলা' না ব'লে এ কথা বলাই ভালো যে, সে তাঁর পক্ষে প্রকৃতির পূজা, আরাধনা, প্রকৃতির অন্তর্লীন সর্বাস্থভূ যে চেতনসত্তা তাঁরই পূজা। এখানেই রবীন্দ্রনাথ বা অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিল্পী নন্দলালের চরিত্রগত প্রভেদ। পূজা যেমন বলা যায়, তেমনি বলা চলে 'আমি আছি এবং তুমি আছ, সব জুড়েই আছ' এই নিগূঢ় গভীর অবচন বোধ থেকেই একটি সুখ বা সন্তোষ— রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন হই 'আছি'তে 'আছি'তে অহরহ মধুর করতালির আওয়াজ—এই যেন রূপের পূজারি, রূপস্রষ্টা নন্দলালের নূতন এই চিত্রধারায় নিহিত তাৎপর্য। যে নিষ্ঠা-সহকারে, যেমন নিয়ম-পূর্বক, ভক্ত বা সাধক প্রতিদিন ইষ্টের ধ্যানধারণা আরাধনা করেন, বুঝি তারই সঙ্গে এর অন্তর্গূঢ় সাদৃশ্য।

এই হল শিল্পী-প্রকৃতির বিশেষ পরিচয়। এই চিত্ররূপের বিশেষ প্রকৃতি কী সেটিও প্রণিধানের বিষয় আর কোনো চমৎকারজনক। শ্রেষ্ঠ কাব্যে যেমন দেখা যায় নিরলংকৃত স্বভাবোক্তির ভাবলাবণ্য ও চমৎকারিত্ব। আমরা আলংকারিক নই, সংজ্ঞার্থ মিলিয়ে নির্দোষ উদাহরণ অবশ্যই উপস্থিত করতে পারব না। তবু নানা যুগের নানা কবির হৃদয়ক্ষক বাক্য অন্তরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত।—

যখন বল্লিকাবনে প্রথম ফুটেছে কলি
তখনি বন্ধু, তোমার লাগিয়া বেঁধেছিনু অঞ্জলি

এ উক্তিতে অলংকারের বাহুল্য কী আছে?—

আমি যে দইতে পারি নে,
মুখে রাখে মনের মাঝে সো,
কথা দিয়ে কইতে পারিনে

অথবা—

রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়

এই সব ছত্র কি সত্যই নিরলংকৃত নয়? আছে অনায়াস অব্যর্থ ছন্দ, অন্তর্নিহিত সুর, আর অনির্বচনীয় কত ভাবের অনুষঙ্গ। তাইতেই রসিকচিত্তের দূর-

মুহূর্তের পর্যন্ত শিহরণ জাগে, অন্তরাত্মার বুঝি উদ্‌বোধিত হয়ে ওঠে। জানকীর স্পর্শসুখে শ্রীরাম যখন বলেন—

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমুমদঃ।

সুখ বা দুঃখ বুঝি নে স্বপ্ন অথবা জাগরণ, বিষের না অমৃতের এই প্রতিক্রিয়া। নব অনুরাগে উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা বলেন—

আস্যাং তবীয় নবযৌবনপূর্ণিমায়াং
কালীয়মত্র ন ভবেদ্যদি নিমজ্জনেন্দুঃ।
ইচ্ছামি তং কমপি কালমলক্ষ্যমূর্তেঃ
আকম্পিতুং, সুমুখি, হা প্রিয় হা প্রিয়েতি।

নবযৌবনলাবণ্যে আপূর্ণ শ্যামসায়র আমার সামনে, আমার ভাগ্য হবে না সখি নিমজ্জনস্নানে নেমে যেতে, ঝাঁপ দিতে— ওরই নির্জন কূলে বসে 'হা প্রিয়' 'হা প্রিয়' বলে অলক্ষ্য উচ্চকণ্ঠে একবার কাঁদতেও কি পাব না? এখন ক্ষেত্রেও বুঝি অভিনয় নাগালিকে ভাষায় অতি গভীর আনন্দবেদনাকে ব্যক্ত করা হয়েছে —আলংকারিকেরাই বলতে পারেন সর্বনেশ দৃষ্টান্তে নাটকদৃশ্যের একটা অপূর্ব সুযোগ হেলায় হারানো হয়েছে কি না— আমরা জানি, অন্য কোনো কারু-কৌশলে ভাব ও ভাষার সুনিপুণ সহযোগ প্রয়োগে, বলোবলো ঐশ্বর্যে, যেন এর শতাংশের একাংশ সাড়া জাগানো যেত না রসিকহৃদয়ে। আমরা জানি, পরিপূর্ণ কলসের মতো অন্তঃকরণ যদি ভরা থাকে অলক্ষ্য রসাসারে বা রসে, একটু হাত ঠেকালেই, এতটুকু হেলানো হলেই, উছলে পড়ে রস। এই অলৌকিক রস শুকনো মাটিতে পড়ে শুষে যাবার নয়, নষ্ট হবার নয়—এ যে আপন আধার আপনি সৃষ্টি করে আর তখনই লজ্জাসোচর হয়ে রসিককে বিস্মিত পুলকিত করে। কবি বা শিল্পীর এই হল সিদ্ধ অবস্থা। অন্যায় অধিকারে দেহ হয়তো জীর্ণ এবং পুরাতন, কিন্তু আসক্তি-ক'রে-যাওয়া অনুরাগ-বোওয়া দৃষ্টির অবোধার মনে আছে যে জন, বালো কৈশোরে বা যৌবনে যেমন ছিল আজও সে তেমনি নবীন, হয়তো নবীনতর। দৃষ্টি হয়তো অন্তর্দৃষ্টিই হবে। চোখের দেখার যা কিছু অভাব বা অপূর্ণতা, মনের দেখায় সে সবই ঘুচিয়ে দিয়েছে। চীন-জাপানিরা এ তত্ত্ব বিশেষভাবেই বোঝেন। রূপকলায় পারদর্শী হতে হলে বিদিতের প্রতিভা তো চাই-ই, আরও চাই সুদীর্ঘ জীবনের একাগ্র এবং অনলস অনুশীলন —এ তাঁরা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলেই জানেন। তাই বুঝি রূপরচনার

জাহুকর হকুসাই বলেন অশীতি বৎসর বয়সে : রূপের মর্মে আজ আমার প্রবেশলাভ ঘটেছে মনে হয়, আরও আশি বৎসরের পরমায়ু পেলে এবনও হতে পারে 'চিত্রপটে যে কৌটাটি কেলব— যে রেখাটি টানব— সবই কথা কইবে, জীবন্ত হয়ে উঠবে।' আচার্য নন্দলালের রূপকলা-ব্যাখ্যানে এই চমৎকার উক্তিটি সংকলিত হয়েছে আর তাঁরই সাম্প্রতিক রসরূপ-সাধনার আলোচনায় এ উক্তির প্রাসঙ্গিকতা অল্প নয়।

অসুস্থ দেহের বাধা একটা আছেই এ কথা অস্বীকার করা চলে না। সে বাধা সত্ত্বেও আনন্দঘন সত্তার প্রকাশ নিরঙ্কুশ সহজ বেগে, বেশি বৈ কম নয় তার স্বভাবসৌন্দর্য। এই কথাটাই এ পর্যন্ত নানাভাবে বলতে চেষ্টা করা গেছে। শিল্পী বলেছেন, একটু বাড়িয়েই বলেছেন আমাদের সে বিষয়ে সন্দেহ নেই : বহুদিন ধরে তাঁর ছবিতে ছিল একটা লড়াইয়ের ভাব। ভারতের প্রাচীন রূপরচনার ভাব এবং আদর্শ, সাধনা এবং সিদ্ধি, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা চাই অতুল মহিমার উন্নত বেদীতে —মনে মনে এ আকাঙ্ক্ষা তাঁর সর্বদাই ছিল। তিনি বলেন, অবনীন্দ্রনাথে এ ভাব ছিল না বললেই হয়; তাই ফুল ফোটা আর আলো ফুটে ওঠার মতোই সহজ সুন্দর তাঁর অধিকাংশ ছবি —সে যেন ছবি করা নয়, ছবির হওয়া— আপনাকে আপনি যেন রচনা করেছে ছবি। স্বতঃই তুলনা মনে আসে : স্বামী বিবেকানন্দে যে যোদ্ধভাব ছিল সেটি ছিল না ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে। কিন্তু, শিল্পী যাই বলুন, আমরা জানি, নন্দলালের চিত্রকৃতিতেও উত্তরকালে এই তন্ময়তা এই স্বাভাবিকতা উপজাত এবং ক্রম-উপচিত হয়ে আজ তাঁর ছবিতেও সৃজন করেছে একটি অনির্দেশ্যের ভাবলাবণ্য, রূপদক্ষ শিল্পীর বশীকৃত বর্ণতুলির দান রূপলাবণ্য সেটি নয়। এই গুণ কালে কালে বিস্ময়করভাবে ফুটে উঠেছে— নটীর পূজায়, পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানে, প্রত্যাবর্তনে, গাছে-চড়া নবরীকন্যায়, কৃষ্ণকলিতে, আর শেষে নাচের ছবিতে গতিরাগের অপূর্ব গানে। বিস্তারিত তালিকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ কথাও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, ছাত্র নন্দলালের অতি পুরাতন চিত্র 'সতী'তে বা 'শিব-সতী'তে আত্মবিস্মৃত এই ভাবলাবণ্যের কিছুমাত্র ন্যূনতা নেই। গভীর গম্ভীর সৌন্দর্য আছে, লোক-দেখানো কোনো নৈপুণ্য সেখানে নেই।

তবে আজই যে তাঁর ছবি বিশেষভাবে সহজ হয়েছে, একেবারে ভূষণহীন হয়েই সুন্দর হয়েছে, কেউ ভালো বলে বা মন্দ বলে সে ভাবনা চিত্রপট আর চিত্রপট থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে, নিছক ইষ্ট-আরাধনার উৎসর্গ করেছেন শিল্পী

আপনার রঙ তুলি আর অবশিষ্ট শক্তি, প্রতিটি ছবি তার অন্তিম মূল্য পেয়েছে শিল্পীর 'বাকর' হৃদয়ে ধারণ ক'রে— শিল্পীর পূর্ণপরিণত ব্যক্তিসত্তার, নৈর্ব্যক্তিকতার সীমান্তে উপনীত ব্যক্তিসত্তার, নিগূঢ় পরিচয় বর্ণাঙ্কে বহন ক'রে— এজন্যই বিশিষ্ট হয়েছে, অন্যের অনুসরণের বা অনুকরণের অতীত হয়েছে— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কোনোরূপ তুলনার আলোচনার সুযোগ নেই, বিচার বিশ্লেষণ নিষ্ফল, বার বার শুধু এই কথাই মনে ওঠে—

যতো কঠিন সাধনা, যার
যতো সহজ সুর।

সেই সাধনার পরিণামেই এই সিদ্ধি। মনে হয়, যা সবচেয়ে সহজ তাই সব থেকে গভীর, গভীর, তাৎপর্যপূর্ণ। আকাশভুবনব্যাপী কত আয়োজনের পরিণামে ঘাসের ডগায় এক ফোঁটা শিশির দেখতে পাই! আর, ফুল?—

কত লক্ষ বছরের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।

নন্দলালের আলোচ্য ছবিগুলি, কদাচিৎ একটু আধটু রঙ-চৌয়ানো হলেও, মোটের উপর সবই প্রায় কালী তুলি দিয়ে আঁকা। চীনা কালী আর ভারতীয় তুলি। অর্থাৎ, চৈনিক কালো কালীর হাল্কা-ছোপে ও রেখায় আঁকা হলেও, সেই বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগকর্তা হলেন ভারতীয় শিল্পী, ভারতেরই বিশেষ ধ্যানে ও জ্ঞানে প্রবীণ, পরিণত। চীনারাই বলে থাকেন, কালীতুলির কাজে তুলিকারই প্রাধান্য, কালী তার সহকারী।' রঙ বা কালী সম্পর্কে চিত্রকরের অন্তিম সমবধার যাত্রেই যা অনুভব করেন সেটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে অবনীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায়, এখানে সংকলন করা যেতে পারে—

। বর্ণ মেশায় না চোখ, বর্ণ মেশায় মন। মন শরতের আকাশকে কতটা নীল দেখিতেছে বা কতটা উজ্জ্বল বা ম্লান দেখিতেছে তাহারই ওজনটুকু নীলে মেশানোই বর্ণকে ভঙ্গী দেওয়া। আমি কালী দিয়াও শরতের আকাশ দেখাইতে পারি, যদি মনের রঙটুকু সেই কালীতে মেশাই। কালী তখন আর কালী থাকে না, যদি মন তাহাকে মাতায় আপনার বর্ণে।

'কালী কি কালো ? (শ্রীকৃষ্ণ কি কালো ?)
ঘুরে তাই কালো।
চিনতে পারলে আর কালো নয়।' [১]

মন যতক্ষণ কালী হইতে পৃথক আছে, কালী ততক্ষণ কালো কালী যায়। আর মন আসিয়া যেমনি মিলিয়াছে অমনি কালী আর কালো নাই, সে যেন হরগৌরীর আলোর শিখার মতো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

চিত্রকারী শিল্পীর প্রকৃতি উপায় ও উপকরণ -স্বরূপ বর্ণ আর সর্ববর্ণাত্মক কালী সম্পর্কে এ থেকে অধিক আর কিছু বলবার নেই। এ যেমন চীনা-জাপানি শিল্পীগণের উপলব্ধির সঙ্গে মেলে, তেমনি দেখা যায় ভারতের যোগী বা ভক্তদের অপরোক্ষ দর্শনের সঙ্গে, সত্যদর্শনের সঙ্গেও মিলে। আর, শেষ বয়সে আই শিল্পী নন্দলালও চলেছেন উত্তরোত্তর কালোর সন্নিধিতেই আলোর অভিসারে —তারও বাইরে-বাইরে দুই বা অধিকৃত কার্যকারণের অতিরিক্ত অন্য আন্তরিক হেতু ও সার্থকতা অবশ্যই আছে। হয়তো সে বহু থেকে একের দিকে মুখ ফেরাবার ইঙ্গিতটিও ইঙ্গিত করছে। এই অন্তর চিত্রের ধারায় শিল্পীর বিশেষ একটি মানসিক অবস্থা, একটি আত্মিক স্থিতি, ফুটে উঠেছে। সেটি 'বোঝে বোঝ' করা যেমন সুনিশ্চিত, ব্যাখ্যা করা অথবা বর্ণনা করা তেমনি দুরূহ। বোধ করি শ্রেষ্ঠ সংগীতের সঙ্গে পৌঁছে যে ভাব অনুভব করা যায়, অন্তরের তেমনি সমরস বা শান্তি নিরুদ্ভূষণ রূপসৌষ্ঠবের আধারে আমাদের অনুভবগম্য হয়েছে। সংগীতজ্ঞ আমরা নই, তবু যেন আমাদের মনে হয় যে, ঐ সুরের অস্থির স্থিতিকালে মৌনের অন্তরেই সম্পূর্ণ সংগীতের ধ্রুব সুর ও ভাবসুষমা ধরা দিয়েছে, অলোকপ্লাবিত অতিদূর আকাশে একবার স্বর্গডানা দুটি সম্পূর্ণ মেলে দিয়ে ঈগল যেমন স্থির অচঞ্চল হয়ে থাকে। গতি ও স্থিতির নিত্যদ্বন্দ্বের ক্ষণিক অবসান।

দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই নিখিল সৃষ্টির প্রতি পদক্ষেপ। রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় না। অন্তর-বাহিরের অন্য অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ছাড়াও চিত্রে আছে রূপ ও রঙের বিচিত্র দ্বন্দ্ব, সংস্থিতি আর সমন্বয়। নন্দলালের বর্তমান চিত্রপর্যায়ে রঙগুলি সবই যখন সংহত হয়েছে কালো কালীতে, নিখিল রূপের উদ্ভব ও বিলয়ের অন্তর্বর্তী যে ধ্রুবটি বিশেষভাবে আমাদের নয়নসোচর সে হল গতি ও স্থিতি নিয়ে। তার যখনই নিহিত কায়ার ছন্দুল প্রহত করে ছুটেছে, তারই ছন্দোবেগের পদে পদে, দ্রুত বা দ্রুত লয়ের উত্থানপতনে, এ ধ্রুব চিরন্তন তাতে কোনো

সন্দেহ নেই, অথচ এমন ভাবে আর কখনো আমাদের চোখে পড়ে নি —কেননা, এমন রিক্ততার ভূমিকায় তা আর কখনো প্রকাশ পায় নি। গতি অপেক্ষা স্থিতির দিকেই শিল্পীর ঝোঁক বেশি, পরিণামে তারই বিশেষ ব্যঞ্জনা। মনে হয়, নদী পৌঁছল সাগরসংগমের মোহানাটিতে। অথবা পূর্বোক্ত উপমারই আর একবার উল্লেখ করে বলা চলে— গতি ও স্থিতির পরমান্তর একটি সাদা-অবস্থায় পৌঁছে এই চিত্ররূপ বিরাজ করছে অতিদূর আকাশের প্রসারিতপক্ষ গরুড়ের মতো। বিভিন্ন দৃষ্টান্তযোগে আমাদের বক্তব্যটি পরিস্ফুট করতে যত্ন করা যাক।—

'জলপ্রপাত' ছবিটির গতি হল প্রাণ। সমস্ত ছবিটি যেন, সর্বাঙ্গে সর্বতোভাবে চলিষ্ণু যে বারিরাশি তারই অবিরত অশ্রুত সংগীত। মাছগুলি চলেছে স্রোতের উজানে। কলরোলে প্রধাবিত শতধারার তরলস্বর কানে শোনা যাচ্ছে না সে কি শুধু এজন্যই যে ছবি স্বভাবতই নিঃশব্দ? ঘরে যখন ঝড় ওঠে, মহীরুহ নেচে গাছে, এমন কি ভূমিকম্পও হয়, সবই দেখায় বাস্তববৎ, শুধু কোনো শব্দ শোনা যায় না; প্রাণ খুলে আলাপ করা যায়, এমন কি হয়তো চীৎকার করা হয়, তবু সে যেন মনের সঙ্গে মনেরই অব্যবহিত সংযোগে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ছুটির কোনো কাজ থাকে না; আর ঘরে এমন ছুটে যাওয়ার বা উঠে যাওয়ার ব্যাপারও কি স্মরণ হয় না যাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনো প্রযত্নসাধ্য চালনার প্রয়োজন থাকে না:— সবটাই যেন অনায়াসে জেগে যাওয়া, যে ভাবে শরতের শুভ্রমেঘ ভাসে নীলাকাশে। আমরা শুনেছি, শান্তিনিকেতনের উত্তর সীমানায় নূতন খালের জলে যে প্রপাত সৃষ্টি করা হয়েছে সিমেন্ট-বাঁধানো 'ঢাল' বেয়ে তাই শিল্পী একদিন দেখে এসেছিলেন। শিশুর দৃষ্টি আছে বড়দের চোখে, তাই ভালো দেখেছিল সন্দেহ নেই, অথচ একটা 'কিন্তু' থেকে গিয়েছিল এই যে এ শুধু কৃত্রিম, লীলাময়ী প্রকৃতির অনায়াস ছন্দের রচনা নয়। কয়েক দিনের মধ্যেই শিল্পী যখন ছবি আঁকতে বসলেন তাঁর নিজস্ব ঘরে নিজের আসনে, বস্তুত তাই বুঝি রূপান্তরিত হল স্বপ্নে; এ শুধু জলপ্রপাত নয়, সেই সঙ্গে স্বয়ংপ্রপাতও বটে—'চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিখরে'। বিশেষ করেই বর্তমান পর্যায়ের ছবিতে শিল্পী দিনের পর দিন এঁকে যাচ্ছেন দূরের ছবি— দেশ কাল মানসিকতা সব দিক দিয়েই দূর, দূর অথচ মধুর। অতি নিকটের বাস্তবকেও তাই আপন মনের অনুকূলে, মূডের বশে, অতি দূরের করে নিচ্ছেন।

পাঁচটি পুঁটি মাছের ছবিতে মাছ ক'টির চোখের কোণে কোণে বা কানকোর একটু আধটু লালিমা ছোঁওয়ানো আছে, অল্প-ঢাকা এক আধ রত্তি বহ্নিদীপ্তির মতো। প্রাচীন চীনা চিত্রকরেরাও কালীতুলির ছবিতে রক্তের এমন ব্যবহার করেছেন এ না হয় প্রসঙ্গতঃ বলা গেল। ছবিটিতে দেখছি কী? জলতলের 'সৈবাল' বা উদ্ভিদ্ গতিশীল স্রোতে অধীরভাবে কাঁপছে অস্তিত্বের সুখে, আর সেই স্রোতে সেই একই নিতান্ত 'অস্তি'র আনন্দে ছোটো বড়ো মাছ ক'টি স্রোতের বিপরীত মুখে স্থির হয়ে রয়েছে। তারা চলছে না; যে তাদের জীবনের জীবন, আবাস ও আধার-স্বরূপ, অফুরন্তপ্রায় স্বচ্ছ প্রবাহে সেই চলেছে অবিরল স্পর্শসুখে তাদের সর্বাঙ্গ প্লাবিত ক'রে— স্থির মাছগুলির অপলক অক্ষিতারায়-তারায় চকিত বিকিমিকি অনুমান করলেও করা যায়।

গিরিসংকটে তিনটি হনুমান বা গিরিস্রস্থে লাল-সোপানে-অধিষ্ঠিত ওটি-তিন বাংলো ছাঁদের বাড়ি, এ যেন আর এক প্রকারের চিত্র। পরিবেশ আর পরিপ্রেক্ষিতের বদল আর সেই সঙ্গেই শিল্পীর আত্মপরিচয়ের নূতন দিকও যেন উদ্ঘাটিত। প্রথমোক্ত চিত্রে রুক্ষকঠিন তৃণতরুহীন পাষাণের সংহত স্থৈর্য আর তারই কোলে তিনটি প্রাণী— তাদের আকারে অবয়বে বা ভঙ্গীতে প্রাণচঞ্চলতা অল্পই। পাথরে আর প্রাণীতে রূপের বৈপরীত্য বা বিশিষ্টতা (character) ফোটাবার প্রয়োজনে, বর্ণনাপ্রয়োগে বা রেখাবিন্যাসে যেটুকু প্রভেদ না থাকলে নয় তাই ব্যবহার করেছেন শিল্পী; সে এতই অল্প যে মনে করা যেতে পারে এই পাথর ভেদ ক'রেই এই প্রাণ জেগেছে। রূপে ও ছন্দে দুয়ে নিয়েই আশ্চর্য একটি ঐক্য বা অবিমিশ্রতা দেখা যাচ্ছে। সমস্ত ছবিটির একটি স্বয়ংসিদ্ধ সম্পূর্ণতা ও অবিচল স্থিতি আছে। অন্য ছবিটিতে পাহাড়ের শ্রেণী চলে গেছে এক দিগন্ত থেকে না-দেখা আর এক দিগন্তের অভিমুখে। সেই অজ্ঞাত সুদূর থেকেই ঝাকোঁবাঁকা জলের ধারা বয়ে আসছে। এ দিকে নিকটের পাহাড়ে ক্ষুদ্র-দণ্ডায়মান দেওদার-বীথি আকাশে উন্নত বাহু তুলেছে, তাদেরই রহস্যচ্ছায়াশ্রিত বাড়িগুলি অনড় হর্ষ-সঘন। গতিশীল জীবনের কোনো চিহ্ন কোথাও দেখি নে, তাতে প্রকাশ পেয়েছে শিল্পীর নির্দেশ নিরাসক্ত বৈরাগ্য; জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্যে যিনি পূর্ণ, আকাশের নিঃসীম শূন্যতাতেও তাঁরই প্রকাশ, এই যেন বলতে চান নির্জন বাড়িঘর, স্থির দেওদার আর স্থিরতরঙ্গাকারে দিগ্‌দিগন্তে উত্থিত পর্বতশ্রেণী।

নূতন দৃশ্যপটের উদ্ঘাটনে দেখি 'শাবলী' মেয়েটি—কোথা তার ঘর, কী

ভাবে বসে আছে, কোনোদিন জানা যাবে না। শুধু জানি, আপনাতে আপনি সে ডুবে আছে : আপনাতে আপনি স্থিত, বিধৃত। সে আছে এইমাত্র, তার পরিচয়ের সীমা নেই, শেষ নেই।

চিরতুষারাবৃত ধবলগিরি, সেখানে কোনোদিন কোনো মানুষের পদপাত ঘটবে না : শান্ত সমাহিত যোগেশ্বর শিবের সে ধ্যানাসন। সেই ধ্যানলোকের সূক্ষ্মলোকে অভিমুখী হয়ে নিঃসঙ্গ কৃষ্ণকণ্ঠী কোন্ সৈব তপস্বী। নিঝরবাহিনী কোনো উৎসতল থেকে দিনান্তের ঘট ভ'রে নিয়ে শৈলসোপানে উঠছে ধীর মন্থর পদে দুটি পাহাড়ের মেয়ে, উপরের অধিত্যকাভূমে দেখা যায় একটি কুটীর। সমস্ত ব্যাপারটি ঘটছে অতিদূর অন্য কোনো জগতে। এখানে ঘটনাই যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তাও নয়। অস্থির জিজ্ঞাসার পরিবর্তে সুস্থির হওয়ায় মহিমাই রূপ ধ'রে জেগে উঠেছে এই চিত্রে— গিরীশের হিমমৌলি চিরন্তন কয়েকটি শিখর।

সব শেষে আর একটি মাত্র চিত্রের উল্লেখে অবর্ণনীয়ের নিষ্ফল বর্ণনচেষ্টা থেকে বিরত হব। জনশূন্য এক মরুশৈলের কঠিন পাষাণে মাথা কুটছে অহেতু আক্রোশে তরঙ্গায়িত স্ফুরিত ফেনায়িত মহাসিন্ধু, আকাশ থেকে আকাশে তখন বায়ু বৃষ্টির মাতামাতি, শ্রেণীবদ্ধ তালের বনে বনে তির্যক্ বারিবর্ষণ। আক্রোশ বলেছি বটে, হয়তো নয়— সার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে নেচে উঠেছে সমুদ্র তাণ্ডবমত্ত শঙ্করের পদপাতে। বিশেষ দ্রষ্টব্য দুটি ঝাঁকড়া, সমুদ্রের তরঙ্গদোলা থেকে উঠে পড়েছে ফেনার্দ্র শীতল শিহরণ পাষাণগাত্রে। জড় এবং জীব মিলে অস্তিত্বের একটি ছন্দ ও রেখার 'ছন্দ' (pattern) যেমন অন্য ছবিতেও দেখা গেছে। গাছ এবং প্রান্তি এক দিকে, আর এক দিকে অন্ধ জড়জীবনের, মৃত্যুমূঢ় ভূতসংঘের দুর্বার আবেগ ও বিপুল উল্লাস— পাষাণরূপিনী সর্বংসহা পৃথিবী, অস্থির সমুদ্র, বৃষ্টি, এবং বায়ু যা চোখে না দেখেও মনে প্রাণে অনুভব করা যাচ্ছে। আরও রয়েছে জানি সর্বত্র প্রসারিত, সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট, আকাশ— সেটি তো চিত্রীর চিত্ত বা চেতনারই নামান্তর মাত্র। সুতরাং এত যে আবেগ এবং গতি, তার অন্তরে রয়েছে অবিচল স্থিতি ও শান্তি এ আমাদের কবিকল্পনা নয়। এই হল শিল্পী নন্দলালের আয়াসহীন কৃতিত্বের পরম পরিসীমা, তাঁর নবতম চিত্র-পর্যায়ের বিশেষ গুণ।

রচনার দিক দিয়ে সমকালীন হলেও, রূপশৈলীর দিক দিয়ে পূর্বকালীন স্কেচ বা কার্ড, স্কেচের সমোত্র 'খেজুর রসের ভিয়ান' ছবিটি আমরা ঠিক এই

চিত্রপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করি নে। অন্যান্য ছবির তুলনায় এ যেন নিকটতর পরিচয়ে পরিচিত, অপেক্ষাকৃত বস্তুতান্ত্রিক বা বাস্তব। এর রস একটু আলাদা। সমতলে যে বাতাস আমরা নিশ্বাসে নিশ্বাসে গ্রহণ করি আর সূক্ষ্মতর শুদ্ধতর যে বায়ুমণ্ডল চিরবিহারত পিরিশিখরে, উভয়ের মধ্যে যে প্রভেদ বিদ্যমান অনুরূপ একটি পার্থক্য দেখা যায় শিল্পী নন্দলালের সেকালের এবং একালের চবিতে। ভালো মন্দের কোনো প্রশ্ন ওঠে না, রসাস্বাদের তবু ভিন্নতা বা বিশিষ্টতা আছে। এক কালের আঙ্গিনায় আর এক কালের রূপ, বিশেষতঃ ভাবীকালের "অপরূপ", তারই নিদর্শন হিসাবে নন্দলালের আর একখানি ছবির কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এক যুগ অতীত হয়েছে, খৃস্টীয় ১৯৪১ সনের শারদীয় অবকাশে, উড়িষ্যার সোণপালপুরে, রঙতুলি যোগে খুব কার্ডে নন্দলাল এঁকেছিলেন শ্যামলমুদ্রের কয়েকটি ঢেউ। শুধুই ঢেউ। মাঝলমুদ্রের ক'টি ঢেউয়ের এই প্রকার পরিচিতির রূপ বা ক্লোজ-আপ, এ ছাড়া অল্প পরিসরে আর কিছুই দেখানো হয় নি, দেখাবার প্রয়োজনও ছিল না। অপ্রাণ নিসর্গের যা-কিছু আত্মনিময় উদ্বেলতা, অকূল সমুদ্রের দিক্‌শূন্য আনন্ত্যের যা-কিছু সম্ভবপর ব্যঞ্জনা সবই অপূর্ব ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল ঐ চিত্রে— শিল্পীর কোনো সচেতন প্রয়াসে নয়, রঙতুলির কোনো নির্ধারিত কৌশলে নয়— কেমন ক'রে, তা কোনো শিল্প-সমঝদার বলতে পারবেন না আর শিল্পী নিজেও জানেন না। সাম্প্রতিক চিত্রপর্যায়ের যে গুণে আমরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট, মনে হয়, সে গুণেই ঐ কার্ডখানিও দীপ্তিমান। কাব্যের রসধ্বনি যেমন সকল বিচার বিশ্লেষণের অতিরিক্ত, রূপের এ জাতীয় ভাবব্যঞ্জনাও অরূপ।

প্রাচীন বয়সের এই একটা সুবিধা আছে যে, যথাকালের যথোচিত কৃত্যগুলি সমাধা হয়ে থাকলে মানুষকে অনেই সে মুক্তি দেয় সকল দায়িত্ব থেকে, 'বিষয়'-চিন্তা বা দুশ্চিন্তা থেকে। এটি স্বভাবতঃই বৈরাগ্যের কাল আর ব্যাপ্ত অনুরাগের কালও বটে। প্রায় নৈর্ব্যক্তিক অনুরাগ। তেমনি স্থির অনুরাগ থেকে, সর্বব্যাপিনী 'জীবন্মুক্তাসনাতন্ত্রী' প্রকৃতি-পূজার নিষ্ঠা থেকে, নন্দলাল আজ যখনই কাল যে ছবিগুলি আঁকছেন তার বিষয়বৈচিত্র্য আছে অনেক, প্রকরণের ভিন্নতা ঘটেছে মাঝে মাঝে, অথচ মতি বা মনোভঙ্গীর অভিন্ন একটি বিন্যাস প্রায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। এ কথাও বলাই বাহুল্য যে, এই অজস্র চিত্রকৃতির ভিতর থেকে আটখানি বা নখানি ছবি বেছে নেওয়া চলে কেবল চোখ বুজে—

চোখ চেয়ে প্রায় দিশেহারা হতে হয় দিকে দিকে চেনা-অচেনার হাতছানিতে। চেনার অন্তরেই ছিল অচেনা।

প্রাচ্য ছবি সহজেই হয় স্মৃতি থেকে, কল্পনা থেকে। নন্দলাল বলেন, সুজাতার ছবি অংকিলেন একাসনে ব'সে। গুরু অবনীন্দ্রনাথ বেহারে দেখেছিলেন সন্ধ্যাবেলায় খোলার ঘর থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, পিতলের বোক্‌নোয় সুগন্ধদ্রব্যের শব্দ— তাঁর বলার গুণেই শিল্পের মনে ছবি ফুটে উঠেছিল। তেমনি মুঘলের কাটনির জঙ্গলে, দূরে কোথাও বাঘুনের হাম্বারব আর গাইয়ের হাম্বানো তা থেকেই ছবি হয়েছে উৎকণ্ঠিতা পরিবিনী গাভীর। শিল্পী উপস্থিত যে ছবিগুলি আঁকছেন সেগুলিও স্মৃতিচিত্র বলা যায়, তবে সে স্মৃতি বহু দূরের স্মৃতি, যেন বা আর এক জগতের আর এক জন্মের। তবে কাছারি বাড়ির দুয়োরে বাঁধা ছিল ধূসর পাহাড়ের মতো বিশাল রাজহস্তী, তবে দেখেছিলেন টীলাবাজারের খোড়ো ঘরে ঘোর-ঘোর অন্ধকারে আর প্রদীপের আলোয় নিরিবিলি ব'সে পান সাজছে একটি বউ, স্বাধীন লক্ষ্ণৌ মধুর চেয়ে বেজাচ্ছে ঘনে পাহাড়ে, জাহ্নবীর পরিচিত বাঁকে অতিপরিচিত এক টীমার-ঘাট, জটা-পাকানো বুড়ো বটের তলায় জলসত্রে আসীন আদি কালের এক বুড়ো— দেশ বিদেশের পথ ঘাট, গাছপালা, মানুষ পশু, পাহাড় বন, নদী সায়র সমুদ্র— জনের নয়নে একের পর আর এক ভেসে ওঠে—কিছুই লুপ্ত হয় নি, তবে সূক্ষ্মভাবে রূপান্তরিত হয়েছে সে তো সত্যই আর সেই তার বিশেষ সার্থকতা।

আমরা পূর্বেই বলেছি, শিল্পীর মনের একটি দৃষ্টিপরায়ণ, মানসিকতার ঈষৎ একটি পরিণতি বা পরিবর্তন, এজন্যই তাঁর চিত্রের অঙ্কন ধারাতেও নূতন রূপগুণ, নূতন লক্ষণ ফুটে উঠেছে— শারীরিক অসাধ্য বা দুর্বলতা এর মূলকারণ নয়। প্রকরণের দিক দিয়ে এই পরিবর্তন দেখছি যে, যৌলিক রূপ, আর অনেক সময় যৌলিক রূপও নয় —যৌলিক ভাব, সেইটি ফুটিয়ে তোলার দিকেই শিল্পীর যা কিছু অভিনিবেশ। মনের দিক দিয়ে প্রায় সব ছবিতেই দেখি একটি শান্তি, স্থিতি, বিরতি, সুরভি এবং "পরম" অর্থাৎ এক প্রকার বস্তুতন্ত্র নৈর্ব্যক্তিকতা। যেন আর-এক জগতের আর-এক জন্মের সব দেখা। আমার বা তোমার বা বিশেষ ক'রে মানুষের বসবাসের জগৎ যেন নয়, পরন্তু "ঈশাবাস্য"—সর্বগত ঈশ্বরের আবাস। এক ভাবে বলা যায়— যা স্থূল তাই সূক্ষ্মে, যা বিশেষ তাই নির্বিশেষে, যা আকার তাই নিরাকারে ঘন এবং বিধৃত। এ হয়তো দেশে দেশে আর যুগে যুগে উৎকৃষ্ট চিত্রের অন্যতম লক্ষণ, কিন্তু আমাদের চোখের সামনে

একই কালে এমন প্রাচুর্যে ও প্রবলতায় আর কখনো প্রকটিত হয় নি। নিকট কখনো এমন দূরে বিলীন হয় নি।

দূর শব্দেই কী যাদুমন্ত্র আছে জানি নে। সেই সুরে শোনা যায় অশ্রুত কুহকরব—

breaking the silence of the seas
among the farthest Hebrides.

ভূগোল বিবরণে যদিও কোনো ঠিকানা পাই নে। সেই সুরে নাইটিঙ্গেলের গানে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী নিভৃতঘরে চকিতে অরোধা খুলে যায় পরীলোকের। সেই দূর সুরান্তরের আকাশই অলক্ষ্যে শিউরে ওঠে সহসা অনাহত অশ্রুতগভীর এই মন্ত্ররবে—

হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!

অথচ এই 'সুর' আমাদের কবিকে যদি বা আকুল ক'রে থাকে, যে কবি আপনার 'সুদূরের পিয়াসী', শিল্পীকে করেছে শান্ত, বিবিক্ত, স্থিতধী।

ছবি যখন কবিতার ছন্দ স্বতই মনে এনে দিল এখানে আরও এইটুকু বলা দরকার— কবি ওআর্ড্‌সওআর্থের মনে সুরের ইন্দ্রজাল বিছিয়ে দিয়েছে অতি নিকটের অতিসাধারণ একটি দৃশ্য; কীট্‌সের স্বপ্নচারী বিমুগ্ধতরও যুগে-যুগান্তরে দেশে-দেশান্তরে ফিরেছে একান্ত কাছের শ্যামান্ধকারে প্রচ্ছন্ন সুধাবর্ষী এক বিহগকণ্ঠস্বরে; আর কবি রবীন্দ্রনাথের সুদূরতম প্রয়াণের সূত্রও কিছু সুরে নয়। অর্থাৎ, দিব্য ভাবে ভাবিত কবি ও শিল্পীর নয়নে মনে নিকটই সুরের আবির্ভাবে পরমাশ্চর্যের আধার হয়ে ওঠে, পরিচিতই হয়ে ওঠে সকল পরিচয়ের অতীত। বস্তুতঃ শিল্পী নন্দলালের এই ছবিগুলি দেখার অভিজ্ঞতার পরে চেয়ে চেয়ে দেখেছি এক শরৎসন্ধ্যায় ধান-ক্ষেতের শান্ত শিহরিত শ্যামলতার পরপারে বেণুবনে প্রচ্ছন্ন শীতভাঙা পল্লীটি, আর ছা ঘুমলেখা উঠছে অথবা অকালমেঘ শুভ্র ফেনায় উপ্‌চে পড়েছে দিগ্‌বলয়ের কোলে "—চেয়ে দেখেছি ফাল্গুনের কোনো সোনালি বিকালবেলায় চিক্কন-কচি পাতায় পুলকিত অশথ দেবদারু আর আমলকী আর নারিকেল সুপারির জটলা— কিছুই মনে হয়নি নিঃশেষিত অথবা পুরাতন-পরিচিত ব'লে। বরং মনে হয়েছে, যেখানে যা দেখছি সবই কোন্ অরূপ বা অপরূপ লোকের সীমান্তরক্ষী যেন, বক্ষে ও বাহুতে তরুণা-তাম্বিজে নানা অদৃষ্ট অক্ষর— গাছ নয়, মানুষ নয়, পশু নয়— অরণ্য অথবা পর্বত, নদী অথবা সমুদ্র নয়— আমি বা তুমি নয়— সে-সবই বিচিত্র ছদ্মবেশ ধারে। বুকে

না-বুঝে মন কেমন উদাস হয়ে গেছে। অনির্দেশ বিষণ্ণ এই উদাসের অপূর্ব রূপ দেখেছি কবির 'যেতে নাহি দিব' কবিতায়। যেতে নাহি দিব? তবু তো যেতে দিতেই হয়। সবই তবু চলে যায়।—

কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তর-মাঝে। শুনিয়া উদাসী
বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রসিক্ত ছিন্নতা-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে ন্যস্ত; মুখে নাহি বাণী।

শান্ত মুখশ্রী। নিষ্পলক চাহনি! একি নন্দলালেরই শিল্পীমানসের এক নিভৃত ছবি নয় আজ— এক অপূর্ব প্রতিমা?*

---

[১] ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি।

[২] ইংরেজিতে বলা যায়: essential as opposed to accidental and superficial।

[৩] বেলা তিনটা। মাস্টার মশাইয়ের দক্ষিণের বারান্দা। শান্তিনিকেতনের সীমানার পরে দক্ষিণে প্রায় দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত শান্তনিথর সবুজ ধানক্ষেত— শান্ত অথচ লক্ষ লক্ষ বর্শাফলার মতো পাতায় পাতায় আর শিষে শিষে শিউরে রয়েছে। আলোকে উদ্ভাসিত। আকাশে বেকার মেঘ, তারই এক কালি ছায়া এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত সমস্ত আলোক-ক্ষেত্রটিকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে। ডান দিকে শীতলালি গ্রাম প্রচ্ছন্ন আছে দূরবর্তী বাঁশবাগানের শ্যামান্ধকারে, তার সম্মুখভূমিতে একটি মাত্র একচালা ঘর দেখা যায়— মাঠের মধ্যে দূরে দূরে বিচ্ছিন্নবাহী তারের দু-একটা দীর্ঘাকার খুঁটি। প্রচুর আকাশ। অলস নিস্তব্ধ বেলা। পাখ-পাখালির ডাক মনোযোগ না দিলে শোনাই যায় না। আকাশে অলস শ্রাম্যমান মেঘ। এই সবুজ, শ্যাম, পাণ্ডুর, ধূসর, শুভ্র *—যেন-তেন

* ছায়াছবির দেখার এটুকু যোগ করা চলে: ধানগুলি এখন যে সময় চৈতালি, অর্থাৎ সাধারণতঃ বিভিন্ন পর্যায়, অনুধিক হয়েছে, যাচনা পেয়েছে।

মাঠ, বনলেখা, একটি কুটীর, অনেকটা আকাশ— এই হল মাস্টারমশাইয়ের এখনকার significant ছবি, বিশেষ ছবি। প্রকৃতি। প্রকৃতির আশ্রিত জীবন কিভাবে আছে? গভীর জলের মধ্যে যেমন মাছ— একটি মাছ নয়, মাছের ঝাঁক— যেন তাদের গমনাগমনের চঞ্চলতামাত্র নেই, যেন একটিও ঢেউ উঠছে না।

—চিত্রলিপি। ১৬ অক্টোবর ১৯৪১

*প্রবন্ধশেষে এই কথাটি বলবার আছে যে, আলোচ্য চিত্রাবলীর সম্যক্ পরিচয় পেতে হলে সেগুলি স্বচক্ষে দেখা দরকার। 'বক্তৃ কঠিন সাধনা যার মর্মে সহজ সুর' —কথাটা প্রতিচিত্র-গ্রহণের ব্যাপারে অবাধিতভাবে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে সার্থক হয়েছে। দাবলীল তুলির টান-টোন, প্রতিরূপগ্রহণের প্রকরণগত দুরূহতায়, একটির ধার হয়ে গিয়েছে ভোঁতা আর অন্যটির ক্রমবিন্যস্ত আঁচড়গুলি সর্বত্র যথাযথ ফুটে ওঠে নি বা মোলায়েম হয় নি (যেখানে যেখানে তুলি আদপে কাগজ ছোঁয় নি সেখানেও একটা সূক্ষ্ম ছোপ ধরে গিয়েছে)— ফলতঃ মূলে যে টোনের লীলাবৈচিত্র্য অভিজাত প্রণব সঙ্গীতের মতো, তার মীড় মূর্ছনার বহু অপরূপতা নষ্ট হয়েছে। আরও সহজগ্রাহ্য উপমায় বলা চলে যে, টাটকা তাজা যুক্তির মুচ্‌মুচে ভাবটা নেই, প্রতিরূপ হয়ে পড়েছে ঈষৎ মিয়োনো যুক্তির মতো। কাজেই মূলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় না হওয়া অবধি, জানতে হবে, এ ছবিগুলির পরিচয় পূরো হল না।

প্রবন্ধে আলোচিত ছবিগুলির মধ্যে চারখানি মাত্র শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর অনুমতিক্রমে ও বিশ্বভারতীর সৌজন্যে এই সঙ্গে ছাপা হল— ছবিগুলি কিছু কাল পূর্বে ত্রৈমাসিক বিশ্বভারতী পত্রিকায় ও Visva-Bharati Quarterlyতে মুদ্রিত। যে ছবিগুলি এখানে মুদ্রিত হল না, তাও V.B.Q. পত্রে পূর্বে মুদ্রিত।

রুশ-পঙ্কজ

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

শোকগীত : আলেক্‌সান্দর পুশ্‌কিন

সুরার উৎসবশেষ যেমন সে বিষণ্ণ খোয়ারি,
প্রলাপী দিনের মৃত মুখরতা তেমনই করুণ,
বয়সক্রমে যথা বাড়ে মত্ততার ক্রিয়া—মতো ভারি
ক্রমশ দুর্ভার লাগে গত দিন, হায়রে অতরুণ!
যাত্রাপথ আবছায়া, ভবিষ্যৎ সমুদ্রউর্মিল
পুঞ্জীভূত ভ্রম, শোকই লিপিলিপি—আভাসে জানায়।
হে বন্ধু, তবুও আমি ছাড়িবারে চাহি না নিখিল!
চাহি আরো, আরো আয়ু, আরো স্বপ্ন, আরো বেদনায়।
দুশ্চিন্তার আতঙ্কের দুঃখের কেন্দ্রেই কী অগাধ
সুখ, আছে সুখ—জানি, পাবো আমি সে-সুখের স্বাদ!
আবার মাতাল হবো পান করি' দিব্য সুরনদী,
স্বকপোলকল্পনায় বিচলিব, অজ্ঞ নামে যদি।
অকস্মাৎ যেইদিন শেষ ঘণ্টা ঘনাবে স্বকাশ,
বিষাদমুহূর্তে মৃদু হেসে প্রেম রাঙাবে আকাশ।

ক্রোধে বিদ্বেষে রাত্রি অন্ধকার : ফেদর তিউত্‌চেভ

ক্রোধে বিদ্বেষে রাত্রি অন্ধকার,
আকাশের মুখ মেঘের ঘোমটা-ঢাকা;
এ তো নয় ভয়, নয় ঘোর চিন্তায়,
এ-কেবল আধো-ঘুমে বুঁদ হয়ে থাকা।

এ-যে বিদ্যুৎগর্ভ গ্রীষ্মলীলা,
থেকে থেকে উল্লাস নভ-অঙ্গন,
মূক ও বধির শয়তান রঙ্গিলা
যেন বসায়েছে পাপের সম্মেলন।

একটি মাত্র ইঙ্গিতে যেন তার
অন্ধিকাণ্ড দাউদাউ মহাকাশে,
নিঃসীম কালো বিদীর্ণ একবার—
দূর বনরেখা একবার চোখে আসে।

মুছে যায় কের ঘুচে যায় ছায়াছবি ;
স্তব্ধ আঁধারে জগৎ প্রতীক্ষায়—
ও-মহাশূন্যে যেন কোনো এক ভবি
স্থির, ভয়াবহ মহৎ প্রতিজ্ঞায়।

মারী, তোমার মনে-কি পড়ে, মারী : আলেক্‌সি তলস্তোই

মারী, তোমার মনে কি পড়ে, মারী।
কতকালের পুরানো সেই বাড়ি,
ঘুমিয়ে-পড়া পুকুর, চৌদিকে
চিরস্মরণ লাইম সারি সারি ?

পুরানো সেই পোড়ো বাগান, তার
বিজন পথ, গাছগাছালি-ঘেরা,
ষড়ভুজের টানা বনাত, নিচে
ছবির সারে পূর্বপুরুষেরা ?

মারী, তোমার মনে পড়ে কি, মারী।
ভরসন্ধে-আকাশ,
মাঠের শেষে মাঠ মাঠের সারি,
দূর গাঁয়ের ঘণ্টা বারো মাস ?

বাগান রেখে পিছনে নদীতীর,
ধীর নদীর শান্ত মৃদু গতি,
কলমক্ষেতে দুলছে আলোছায়া
ঝুমকো ফুল সেই রঙিন অতি ?

সেই-যে বন, যেথা তোমায় আমি
বলেছিলুম—তুমি আমার হবে ?
মারী, তোমার পড়ে কি মনে, মারী !
সেই সে দিন, হারিয়ে গেছে কবে !

অথচ আশ্চর্য : আবুনা আখমাতোভা

সকলই বিক্রীত, হৃত, প্রবঞ্চিত, সর্বস্ব লুণ্ঠিত ;
ডানার ঝাপট রেখে কুকুরায় মৃত্যু যায় উড়ে।
তিলে তিলে ক্ষুরে ক্ষুরে খায় শোক, সর্বগ্রাস শোক—
তবু আলো। কেন আলো ? এত আলো নিকটে সুদূরে ?

দিনমানে জনপদ সুবাসিত সৌগন্ধ্যে চেরির—
কোন্ বাগানের চেরি ? কে জানে তা। প্রকাশ, নিশ্বাসে।
আলোয়-আলো যে রাত্রি—হীরাপান্না কলমল করে
নূতন নক্ষত্রপুঞ্জ দূর স্বচ্ছ বসন্ত-আকাশে।

তার জীর্ণ জঞ্জালের রূপে তবু বাড়িতে বাড়িতে
সুন্দরের আবির্ভাব-লগ্ন, ছাখো, আজ ঘনায়েছে—
অথচ, আশ্চর্য, কেউ জানে না কো, জানে না তা কেউ,
প্রত্যাশা যদিও এরই আশে এতকাল কাটায়েছে।

স্বরগ্রাম : উঁচু পর্দায় : ভুলাদিমির মায়াকভ্‌স্কি

১

আমার কাব্য পৌঁছবে তোমার দ্বারে
যুগযুগের সিরিশৃঙ্গ ডিঙিয়ে
যতো সব কবি আর মুখ্যমন্ত্রীদের
মাথা টপকিয়ে টপকিয়ে
তোমার কাছে পৌঁছবে আমার কাব্য।
না-না। সেভাবে নয়, সেভাবে নয় :
কামবৃত্তিকে সুলভ সুড়সুড়ি দেবার পালক নয় সে,
মুদ্রাবিশারদের হাতে যেভাবে পৌঁছয় করে যাওয়া টাকা—
সেভাবে নয়,
না, সেভাবে নয়—যেমন চোখে পৌঁছয় কতকালের মৃত
তারার আলো,
আমার কাব্য
ঘর্মে, ভ্রমে
সুরঙ্গ কাটুক পর্বতপ্রমাণ সময়ের বুকে,
আর মোহান ক্রীতদাসদের হাতে-গড়া
এক-আধটি পয়ঃপ্রণালী
যেমন এসে পৌঁছল আমাদের কালে,
তেমনি দেখা দিক যুগে যুগান্তরে—
দৃষ্টিগ্রাহ্য,
স্পর্শবহ,
বৃহদাকার
আমার কাব্য।

আর প্রত্নাগারে বইয়ের স্তূপে
(যেখানে কবর-চাপা থাকে কাব্য !)
যদি সেদিন হঠাৎ সাক্ষাৎ পাও এই লৌহদৃঢ় পংক্তিগুলির,
এদের স্পর্শ কোরো তুমি
শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে
পুরানো অথচ সাংঘাতিক অস্ত্রশস্ত্র হাতে তুলে নাও যেভাবে।

স্বাচ্ছন্দ্যহীন বিধবার মতো
পিছু পিছু হাঁটুক খ্যাতি,
প্রতিভাবানদের শবযাত্রায়
পিছু পিছু হাঁটুক খ্যাতি ;
আমার কবিতা !
মরতে যদি হয়, মরিস সামান্য সৈনিকের মতো—
আক্রমণের মুখে আমাদের ফৌজী জওয়ান
যেমন বরণ করে নেয় অনাদী মৃত্যুকে।

মণ-মণ ব্রোঞ্জের মুখে থুথু দিই,
থুথু দিই মূল্যহীন শ্বেতপাথরের স্তূপে।
আর যদি খ্যাতির কথাই বলো,
পরস্পরের মধ্যে হোরাপড়া করে নেব আমরা,
অংশীদার হবো সবাই একটিমাত্র কীর্তিস্তম্ভের :
লড়াইয়ের ময়দানে
বুকে বুক দিয়ে গড়ে-তোলা
সমাজতন্ত্রের সেই এক কীর্তিস্তম্ভ !

দ্বৈত-ইতালির

অশোক মুখোপাধ্যায়

দালভাদোর কোয়াসিমদো।

যেখানে বৃক্ষরাজি
সন্ধ্যাকে আরও নির্জন করে তোলে
সেখানে তোমার শেষ পদধ্বনি
কি মন্থরভাবে হারিয়ে যায়,
যখন প্রকাশ-পরাঙ্মুখ টগলিও পুষ্প
আপনাকে নিয়তির হাতে সমর্পণ করে।

তুমি আবেগের জন্য উদ্দেশ্য অন্বেষণ কর,
অভিজ্ঞতা তোমার জীবনে নৈঃসঙ্গ।
দর্পণে বিম্বিত সময়
তোমার কাছে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা বহন করে,
মুখান্তরে আভাষিত সৌন্দর্য
আমাকে মৃত্যুর মত বিষণ্ণ করে দেয়।

আমি প্রতিটি শুভ্র বস্তু হারিয়েছি
এমন কি কণ্ঠ থেকেও,
বেঁচে আছি কেবল
আনন্দকে অনুসরণ করার জন্যে।

ওসেশ উদারেভি

বহু মরীচিকার পেছনে ছুটে ক্লান্ত
পিপাসার্ত;চাতকের মত মরব,
কিংবা সেই কোয়েল পাখির মত
যে দীর্ঘ সমুদ্র পাড়ির শেষে
শ্রান্ত ডানা গুটিয়ে
প্রথম পাওয়া কোপের ওপর বসেছে
আর ওড়ার সাধ নেই বলে।

কিন্তু উদ্ভাসিতচক্ষু চড়াইয়ের মত
সোচনার দিনযাপন করতে করতে মরব না।

শিল্পীর ত্রিমূর্তি

অসীম রায়

প্রত্যেক দিনের বাসায় ঘুরতে ঘুরতে যখন উপর্যুপরি শ্বাস ওঠে, যখন খিটি-মিটিতে আমরা প্রায় পাগল কিংবা বোধের দিক থেকে রাজনীতি ও পাঠ্য দাঁড়ায় একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ হয়ে, ভগবানের কাছে যেতে যখন ভয় লাগে অথবা হাসি পায় সামাজিক জীবন দাঁড়ায় দাঁতমুখ খিঁচানো একটা বেয়াড়া মুখোসের বীভৎসতায় আর ব্যক্তিগত জীবন যেন গর্ভসঞ্চারী তাকিত ইঁদুর—এক কথায় চিত্তের প্রসারতায় নয় চিত্তবিক্ষেপে আমরা প্রায়শ ছুটে যাই শিল্পের কাছে।

আর সেই প্রকাণ্ড বেকায়দায় আমাদের কাতর বিহ্বলস্বরের চাপা আর্তনাদে আমরা শিল্পীর কাছে এসে বলি, 'কি মশাই, কি করছেন? আমাদের এই সব সমস্যা সমাধান করতে পারেন তো বুঝি আপনার দুরোদ।' কিংবা, 'ওসব আর্টফার্ট করে কিছু হবে না। মানুষই বাঁচছে অমানুষের মতো। সে সম্পর্কে তো কই আপনারা আর্টিস্টরা একটি কথাও বলছেন না। অথচ রোলাঁ রবীন্দ্রনাথ—তাঁরা ঠিক উল্টো কথা বলেছেন। আর মশাই, আপনি একটা ভাল উপন্যাস লিখলেন কিংবা কবিতায় বই বার করলেন তাতে আমাদের কি এল গেল?'

বস্তুত শিল্পীর ভূমিকা ভাবতে গেলে মেটো কেন, খদ্দরের কাপড়ের কার্তিমান সম্পাদক কিংবা পণ্ডিত প্রবন্ধকার কেন, আমাদের মতো সাধারণ পাঠক সঙ্গত-ভাবেই বিচলিত বোধ করে। আর সেই ভাবখানা যখন ভয়ানক চেপে ওঠে তখন উত্তেজনার আগুনে পুড়তে পুড়তে শিল্পীর সাধনাকে নেরোর নাটকীয় বংশীবাদনের সঙ্গে তুলনা করি, তখন আমরা নির্বিকারভাবে শিল্পীদের গলদস্ত বিনয়ে চালান দিয়ে সৎ হবার দীক্ষার সাধনা পাই।

আর যেহেতু আমাদের মত সাধারণ পাঠকের অথবা নির্বাচনবিলাসী রাজ-নৈতিকদের চেয়ে শিল্পীদের দীক্ষা অথবা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা কিছুকম নয় কাজেই তাঁরাও অনুপ্রাণিত হয়ে 'আনন্দমঠ' লিখে ফেলেন, গান বাঁধেন, 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়' কিংবা 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে, অথবা 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে', বা ভেরকর-এর 'দানবের

মৌন'-র মত উপন্যাস লেখেন, সোইয়ার 'বন্দীদের ওপর গুলিচালনার দৃশ্য' বা পিকাসোর 'গের্নিকা' আঁকেন, তখন আমরা হাত বাড়াই শিল্পীদের দিকে, আমাদের গলা বুজে আসে বন্ধুত্বের আবেগে,আমরা তাঁদের ডাক দিই—কমরেড।

কিন্তু তাঁদের আমার সব ওলোটপালোট হয়ে যেতে থাকে। সোফোক্লিস একটা অত্যন্ত প্রণয়ঘটিত ঘটনা নিয়ে একখানা নাটক লিখে ফেলেন, উইলিয়াম শেক্সপীয়র তাঁর 'ওথেলো'র একেবারে যুক্তিহীন ঈর্ষার ছবি জাঁকালোভাবে আঁকেন, আর সনেটে প্রেমের ওপর কিরকম সব কথা বলেন, ঘবিলদ্রুশ তলস্তয় আনার অবগাহনের দৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করেন, বঙ্কিমচন্দ্র 'ইন্দিরা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চোখের বালি' 'নষ্টনীড়' লেখেন আবার বুড়ো বয়সে আজন্তাবি রং আর রেখায় অনেকগুলো মেয়েমানুষের ছবি এঁকে ফেলেন, পিকাসো আবার মেয়েমানুষদের নগ্নদেহে ঘোরেন। আর আমাদের সন্দেহ যাকতে থাকে, আমাদের প্রসারিত বন্ধুত্বের হাত গুটিয়ে ফেলি। আর সন্দেহের দোটানায় আমরা দুলতে থাকি—'ওরা আসলে কি? মানুষ না দেবতা না শয়তান?' ঠিক এইভাবে হয়ত সামনাসামনি বলি না, কিন্তু ভাবি।

তার ওপর আমাদের চোখের কানের এবং সর্বোপরি মনের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। রাজনৈতিক নেতা 'আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আপনাদের সেবা করতে প্রস্তুত' বলেন এবং বক্তৃতা না করেই কেউ কেউ সাধারণ কর্মী লাঠি গুলি কিংবা লাঠির আঘাতে প্রাণ দেন, ছবিবাম ক'রে ছবি ছাপা হতে থাকে কোন কিভাবে বোতাম টিপে টিপে অতিকায় কারখানা চালু করবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে, অতি নগণ্য লোকজন মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনসদৃশ হয়ে পড়েন, একখানা চিঠি লেখার প্রয়োজন নেই এ রকম শার্ট পরবার হিড়িক পড়ে যায়, তার ওপর সিনেমায় সিনেমায় দেশ একেবারে ছয়লাপ—এ অবস্থায় যাঁরা একেবারে সাহিত্যে মেতে আছেন তাঁদের যদি আমরা একটু নেকনজরে দেখি তাহলে বোধহয় আমাদের খুব একটা দোষ বর্তায় না।

অবশ্য সাহিত্যিকদের আমরা সহ্য করতে পারি মাত্র একটা শর্তে। যদি তাঁদের আমরা সচরাচরবিক্ষোভে রচিত রচনায়'তাই কবি গাহিয়াছেন'-এর মতো ব্যবহার করতে পারি। সাহিত্যিকদের আমরা সংখ্যা দিতে পারি যদি তাঁরা আমাদের ইচ্ছাপূরণের খাঁচামাল হন। যেমন আমাদের জন্যে যাঁদের ধারণা যে ভগবদ্বিশ্বাসই সমস্ত মানুষের বাঁচার উদ্দেশ্য তাঁরা অনতিবিলম্বে হাতে থেকে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত লেখকদের যাচাইবাছা লাগসই উদ্ধৃতি ব্যবহার করবেন, অথবা যাঁরা ভাবেন সাহিত্য আসলে সামাজিক ব্যাধির 'সিম্‌টম' তাঁরা চলার ঊইলিয়াম শেক্সপীয়র থেকে এলিয়ট পর্যন্ত আক্রান্তদের খুঁজে বেড়াবেন, কেউ হয়ত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের যুক্তিতে কোন একটি বিশেষ লেখককে খাতির যত্ন ভালো বলাতে চান তিনি হয়ত বঙ্গলেয়ারকে নিয়ে পড়বেন, আবার কেউ ধনতন্ত্রের অন্তর্ধানের ওপর একটা থিসিস লিখতে গিয়ে খুঁজে খুঁজে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' বা 'উর্বশী', 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীসের' নাটাশার চরিত্র বা বিষ্ণু দে-র 'পদধ্বনি'র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন,—এইভাবে আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণের চেষ্টার সতীর দেহের মতো খণ্ড খণ্ড ভাবে সাহিত্য আমাদের কাছে হাজির হতে পারে।

কিন্তু বেশীর ভাগ সময় এক প্রবল অনিবার্যতার মানুষের প্রায় নিঃশ্বাস নেবার যুক্তিতে সাহিত্য আমাদের সামনে আসে না। ত্রিশের বছরের রবীন্দ্রনাথের কাছে এই রকম যৌবনভার সংপ্রবযুক্ত হয়ে সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। পয়লা পারে ছেলেরা যেমনভাবে জাল ফেলে, হাটুরে হাটে যায়, কবি তেমনি অনিবার্যতায় কবিতা লেখেন, সাহিত্যসাধনায় আত্মনিবেশ করেন। এই যুক্তি ক্ষেত্র করে বলা যায় যেভাবে সৌরজগতের সম্পর্ক আবিষ্কারে পদার্থ-বিজ্ঞানী মেতে ওঠেন তেমনি উৎসাহে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক (যার গতি বাবিত বিদ্যুৎ ইলেকট্রনের মতই দুর্জ্ঞেয়) আবিষ্কারে শিল্পী অনুপ্রাণিত হন। এটাই তাঁর স্বধর্ম।

শিল্পীদের এই যে দ্বৈত রূপ, তাঁদের এই দ্বৈত সত্তা, কখনও আমাদের মিছিলের পুরোভাগে পতাকাবাহী নেতা কখনও পলাতক বিদগ্ধ বা স্পর্শ-কাতরতায় প্রায় আসামীদের মতো আতঙ্কগ্রস্ত মানুষ, তাঁদের এই সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে গলায় গলায় মিলে যাওয়া আবার তাঁদের ঊর্ধ্বে একটা নিরাসক্ত রাজত্বে আসন করে নেওয়া, তাঁদের একই সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে এই মর্তলোকের সঙ্গে নিজেকে বাঁধবার চেষ্টা আবার তাঁদের কোন অনিশ্চিত অলোকের সন্ধান, তাঁরা যে একই সঙ্গে বহু এবং অনন্ত একা, খণ্ড বিক্ষিপ্ত ও সামগ্রিক, তাঁদের এই শিল্পসত্তার ব্যাপারটা আমাদের মতো সাধারণ পাঠকদের ভাল মন্দ যাই লাগুক, তা বোধ হয় আরও একটু বোঝার চেষ্টা করা ভাল।

আর এ চেষ্টার ফলে হয়ত শিল্পীদের লেখনী-বর্ণিত আমাদের ভাগ্যবিধাতা কিংবা বংশীবাদনরত নেত্রো ভাববার ভাগিদ আমাদের থাকবে না। কিন্তু তা

থেকে অনেক কম নাটকীয় কিন্তু আরও প্রয়োজনীয় ভূমিকায় শিল্পীদের দেখবার ইচ্ছে হতে পারে। জেলে এবং ছাটুরেদের মতো তাঁদের বিশিষ্ট কাজের জন্যেই যে তাঁদের প্রয়োজন এ কথাটা হয়ত আমাদের মন থেকে সরে নাও যেতে পারে।

শিল্পীদের এই কাজ ও সত্তার প্রশংসিত সামাজিক ও অসামাজিক রূপ, তাঁদের এই স্রষ্টা, ধর্তা ও সংহারের ত্রিমুখে একই সঙ্গে ভ্রমণ—আমাদের ভারতীয় ভাস্কর্যের একটা বিখ্যাত রূপের কথাই স্মরণে আনে—এলিফেন্টার শিবের ত্রিমূর্তি। এই ত্রিমূর্তির মধ্যের মাথাটা পরম সত্তার স্বরূপ। এই ঐশ্বর্যময় স্বর্গীয় সত্তা থেকে প্রসারিত হয়েছে আরও দুটি মুখ। এঁর ডান কাঁধ থেকে উৎসারিত পুরুষের মুখ যিনি মহাদেব—অষ্টই শক্তি, সংকল্প এবং স্পর্ধা বিচ্ছুরিত এঁর ধারাল মুখের আদলে, এঁর চিলুকে তেজ, ক্রোধ ও বেপরোয়া অনোভাব, এঁর পাকানো গোঁফের রেখায় পুরুষোচিত দৃঢ়তা। আবার মধ্যবর্তী মূর্তির ঠিক বাঁয়ে আত্মাশক্তির ফেরানো মুখ অবিস্মরণীয় আকর্ষণ, প্রকৃতির ছলনা, ভুল ও ফল, মানুষের ফলে পূর্ণ সৌন্দর্য। স্ত্রীলোকের এই ছলনাময়ী রূপে নিহিত সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ। কিন্তু মধ্যের মাথাটি এক বহির্মাধিত স্বয়ম্ভূর একাকিত্বে সমাহিত। এই সমাহিত রূপ ডান ও বাঁয়ের গতিকে দুদিকে সরিয়ে দেয়, তাদের দুই বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্বের দিকে ফিরেও তাকায় না। এই দুই বিপরীতধর্মী প্রোফাইল ক্রমাগত এই মধ্যবর্তী রূপ থেকে উৎসারিত এবং ত্রিলিকে খোদিত কিন্তু মাঝের মাথাটি স্থাপিত ফুলের মতো পরিপূর্ণ ভাস্কর্যের রূপে। এই রহস্যময় সর্বগামী স্বর্গীয় স্তব্ধতায় সমাহিত মধ্যবর্তী মূর্তিটি পাশের দুই মূর্তির যাজনাময় স্ফটিশীল আকৃতি বা টেনশানকে সম্পূর্ণ শান্ত করে দেয়। এই মাঝের মাথাটি যেন অনন্তকালের মুখ। এঁর নিরেট স্তব্ধতার মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত কাল ও জীবন। কিন্তু এই অনন্তকালের মহান রূপের সামনে দুদিকের যাজনাময় দুটি মুখের প্রোফাইল প্রায় মেকদৃশ। স্থান ও কালের রঙ্গমঞ্চে এই দুটি মুখের নাটক আলোছায়ার খেলার মতো অবাস্তব।

এইভাবে অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত ভারতীয় ভাস্কর্যটির বর্ণনা দিয়েছেন জীমার তাঁর মূল্যবান বই, 'মিথস্ এ্যাণ্ড সিম্বলস্ ইন্ ইণ্ডিয়ান আর্ট এ্যাণ্ড সিভিলাইজেশান্'-এ। তাঁর লেখার প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ এক্ষেত্রে আমাদের শিল্পীসত্তার স্বরূপকে বুঝতে হয়ত সাহায্য করতে পারে। শিল্পীর প্রধান সমস্যা মানুষের সম্পর্ক উদ্ঘাটনে, নিশ্চয়ই অনন্তের ধ্যান নয়। মহাদেব ও শক্তির বিচিত্র উদ্ভাস এবং ক্রমাগত পরিবর্তনশীল নাটক যা বিভিন্ন রূপে কালে মানুষের

জীবনে যাত্রা, তার অনুধাবনে তিনি ব্যস্ত। বস্তুত এটাই তাঁর একমাত্র কাজ যেমন ছেলের কাজ জাল কেলার, পদার্থবিজ্ঞানিকের কাজ পরমাণুর পরিক্রমা আবিষ্কার। কিন্তু এই নাটকে যা ত্রিমূর্তির ডান দিকের ও বাঁ দিকের মূর্তির মুখের মাঝখানে একেবারে আচমকা থেকেও তাঁকে আবার চোখ ফেরাতে হয় সেই অবিকল্প, শুদ্ধ কালাতীত মধ্যবর্তী মূর্তির দিকে।

যেমন ধরা যাক একজন লেখকের চরিত্র সৃষ্টির সমস্যা। তাঁর প্রত্যক্ষ, হয়ত কিছু পরিমাণে চেনা অথবা সে সম্পর্কে কিছু পরিমাণে শোনা কোন মানুষকে তিনি তাঁর বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করেন। তার কোন বিশেষ কাজটা হয়ত তাঁকে পীড়া দেয় কিংবা তার বিক্রম তাঁকে মুগ্ধ করে কিন্তু লিখতে লিখতে তিনি এমন একটা অবস্থায় এসে যান যখন তিনি তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে আর চেনেন না। তা বলা যায় তাঁর হাতের বাইরে। কবিতার এই ঐশী শক্তি সম্পর্কে আমরা শুনতে অভ্যস্ত কিন্তু কবিতা কেন, সমস্ত শিল্পের এটা মূল কথা, প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষে বা খণ্ড থেকে সমগ্রের সন্ধান।

শিল্পের এই দ্বৈত সমস্যা অর্থাৎ সাম্প্রতিকের সঙ্গে অনন্তকালের যোগাযোগ আবিষ্কার, কোনো একটি বিশেষ লেখাকে সমগ্রতা দানের চেষ্টা আমাদের মূলে ফিরে এলিফেন্টায় নিয়ে যায়। মুস্কিল হচ্ছে শিল্পীর পক্ষে শুধুমাত্র মধ্যবর্তী রূপের ধ্যান মানে আত্মিক মৃত্যু যে জন্যে ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক কোন অনড় রূপের মাঝখানে এসে শিল্পী ঠাঁওায় জমে যান। যা দার্শনিকের একমাত্র লক্ষ্য অর্থাৎ এলিফেন্টার সেই সমাহিত ব্রহ্মক, সে দিকে চোখ ফিরিয়ে শিল্পী কেবল পাথর হয়েই থাকেন। তাঁকে একই সঙ্গে ডান দিকে বাঁ দিকে চোখ ফিরিয়ে এই মর্ত্যলোকের অপরূপ নাটকের সামনে দাঁড়াতে হবে আবার চোখ ফেরাতে হবে অনন্তকালের দিকে, সমাহিত স্তব্ধতার দিকে।

ধ্রুপদী সাহিত্য

রাজেশ্বর মিত্র

'ধ্রুপদী সাহিত্য' আখ্যাটি বর্তমানে বিশেষ জনপ্রিয়। এটি কার পরিকল্পনা বলতে পারি না কিন্তু কথাটা যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তার পক্ষে কতটা উপযুক্ত সে বিষয়ে বিবেচনা করা দরকার। ধ্রুপদের সাঙ্গীতিক কৌলীন্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কথাটা সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু ধ্রুপদের চেয়ে মার্গসঙ্গীত আরও প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা; অতএব ধ্রুপদী অপেক্ষা মার্গসাহিত্য বলাই তাহলে সমীচীন বোধ হয় কিন্তু সাহিত্যিকরা তাতে রাজি হবেন কি? ধ্রুপদ— এই শব্দটির অর্থ সম্যক জেনে কি এটি সাহিত্যে ব্যবহার করা হচ্ছে? ধ্রু-শব্দের অর্থ ধ্রুবা (ধ্রুবা) অর্থাৎ পাঁচজনে একসঙ্গে সঙ্গীতের যে অংশটা গেয়ে থাকে তাই; এর সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। 'পদ' শব্দটি সঙ্গীত বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই হিসাবেই ধ্রুপদ শব্দটি রচিত হয়েছে। গানের পক্ষে এই শব্দটি উৎকৃষ্ট কিন্তু সাহিত্যের প্রকৃতি বোঝাবার জন্য এই শব্দ ব্যবহারের কোন তাৎপর্য আছে বলে মনে হয় না। যিনি এই শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেছেন তাঁর বোধহয় ধারণা এই যে ধ্রুপদ যেহেতু গম্ভীর এবং মর্যাদাসম্পন্ন সঙ্গীত সেহেতু অনুরূপ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই শব্দটি খুব সানানসই হবে। সাহিত্যিকগণও এই শব্দটি সানন্দে লুফে নিলেন কিন্তু যাঁরা সঙ্গীত সাহিত্যিক তাঁদের কাছে এই শব্দটি একটি উৎপাতের মত এসে পড়েছে এবং অবধা বিনা অনুমতিতেই ধ্রুপদের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছে। আজ একজন 'ধ্রুপদী সাহিত্য' ব্যবহার করছেন কাল আর একজন রম্যরচনা বোঝাবার জন্য ঠুংরী-সাহিত্য বললে তাঁকে নিরস্ত করা যাবে না এবং আশঙ্কা হয় শেষ পর্যন্ত বর্তমান অলঙ্কার সাহিত্য নিছক খেয়ালী সাহিত্যে পর্যবসিত হতে পারে। অতএব সংজ্ঞানিরূপণে কিছু চিন্তা করা প্রয়োজন যাতে শব্দের একটা সঙ্গত অর্থ থাকে।

ধ্রুপদ শব্দটি আসলে ধ্রুব-পদ। ধ্রুব নামক এক প্রকার সঙ্গীত আমাদের দেশে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল। এই ইতিহাস স্বতন্ত্র ব্যাপার; কিন্তু 'ধ্রুব' শব্দের 'নিত্য' অর্থ মেনে নিয়েও যদি আমরা একে সাহিত্যে আরোপ করি তাহলে অতিরিক্ত আর একটি 'পদ' শব্দকে গ্রহণ করি কেন? অবশ্য 'পদ' বলতে 'পর্যায়'ও বুঝিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ধ্রুব পর্যায়ের সাহিত্য বলতে 'ধ্রুপদী সাহিত্য'

বলা যেতে পারে। এটা কি সাহিত্যের দিক থেকে খুবই কষ্টকল্পনা হল না? যাই হোক, 'ধ্রুবপদী সাহিত্য' ব্যবহৃত হয় না— ব্যবহৃত হয় 'ধ্রুপদী সাহিত্য' —যার অর্থ ধ্রুব বা ধুয়া পর্যায়ের সাহিত্য। সেই সাহিত্যটি কি? যদি বুঝিয়ে বলি তাহলে আমার সাহিত্যিক বন্ধুগণ আমার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন; কিন্তু হিত ও মনোহারী বাক্য দুর্লভ। হিতবাক্য যেহেতু হিতকারী সেহেতু হিতবাক্যই বলব। সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করলে 'ধ্রুপদী সাহিত্য'-এর অর্থ হল পাঁচজনের গলাবাজি নিয়ে যে কোলাহল হয় তার সাহিত্য। মন্তব্যটা অনেকের কোষ উদ্রেক করবে কিন্তু ধুয়া-সাহিত্যের অপর কি অর্থ হতে পারে? এর চেয়ে যদি 'ধ্রুব সাহিত্য' বলা হত তাহলে আখ্যাটা অনেক যুক্তিপূর্ণ হত যদিচ এটিও আমার মত যাঁরা ভাবেন তাঁদের মতে ঠিক নয়।

যাই হোক, কোন্ সংজ্ঞাটা উপযুক্ত হবে সেটা আলঙ্কারিকদের বিচার্য কিন্তু 'ধ্রুপদী সাহিত্য'— এই আখ্যাটির ব্যবহার যত শীঘ্র লুপ্ত হয় ততই ভাল। কথাটা শুনতে চমকপ্রদ এবং গভীর ঠেকে বটে কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় এর কোনও তাৎপর্য নেই।

কয়েকটি কবিতা

রণজিৎ সিংহ

এখানে এই নোনালাগা দেওয়ালের ঘেরাওয়ে
ডাকছি, এস কড় এস বিরাম।

এমন খেলায় এত ক'রে মাতিনি
আজ সমানে দুলছি
এই মেঘে ওই খরায়।

ভাঙুক ভেঙে যাক অবরোধ
দলি প্রহর মাড়ানো ভয়
জোয়ালো পায়ে বুকভর সোহাগে ঘা মারি
ঘা মারি রক্তমাংসের শরীরে।

বলি আমাকে গড়নের যাদু দেখাও,
বয়সের ভাঙনে ভাঙনে
সমস্ত জীবন জুড়ে যে মহিমা ফোটে
তার খোঁজ দাও,
মন্ত্র দাও কোন উচ্চারণে
শরীরে অথই পৃথিবীকে দেখা যায়।

এই ঘরও দিশেহারা হয়
চমকা ঝ'রে পড়ে এতদিনের গুমোর।
ভেপান্তরের উতলা ডাকে
মরুভূমি টলে সমুদ্র দোলে।

তাকেই

ভালোবাসা চলে গেল দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ায়।
দু বারে উধাও মাঠ ফেলে
বসতি অরণ্য ফেলে
কোলাহল স্তব্ধতা ফেলে
চলে গেল সূর্যোদয় সূর্যাস্তে রাঙা হয়ে।
নিস্তব্ধ মাঝরাতে
আমাকে রেখে গেল একা।

এখানে অদ্ভুত দিন কাটে ;
কথার ভারে ক্লান্ত দিন
বাবুয়ানায় কড়ুর শহুরে দিন।
ওখানে কাজের জোয়ার ;
শীত আর খরায় ঝলসানো মানুষ
অভাব আর বিদেয় বেঁধা মানুষ
খোঁজে দুরমণের আস্তানা।
আমি একা
শুধাই একে ওকে
তাকে দেখেছ কেউ হে ? জান পথের নিশানা ?
ফিরে আসি বিদ্রূপ বয়ে,
নির্জন ভ'রে যায় কান্নায়
ঘর চলে কান্নায়
দিগন্তের বাঁধে ভাঙে ব্যথিত আকাশ।

তোমাদের তবু বলি,
শোনো আকাশ পৃথিবী মানুষেরা,

আমি তাকেই চাই
যে স্বপ্ন আর সাধ দিয়েছিল
যে মুগ্ধতা আর ঘৃণা দিয়েছিল
যে শরীর-জুড়নো লাবণ্য আর তেজ দিয়েছিল।

তাকেই খুঁজি উদয়াস্ত তোমাদের উদাসীনতায়।

বিদ্রোহের শিখরে জড়ো করি ক্ষোভ
শত্রুকে দিই ধিক্কার ঘৃণা
তারা দেখুক বাসনা জাগে
আমার বাসনা জাগে সুপ্তিতে স্বপ্নে আর
কোলাহলে ;
সে কেবলে ভালোবাসার মুখ।

ছুতোর

ভালোবেসে আজ জীবন আমার বন্ধ।
সমঝেছি এই দুনিয়া নেহাৎ ঠাট্টা।
স্বজন-দরদী কন্দি আঁটছে ঘৃণা ;
ভালোবেসে আজ জীবন আমার বন্ধ।
এবার লড়ছি প্রেমের বিষাণে বন্ধু
ভ্রাতা বন্ধু মিলেছে সবাই খাট্টা।
ভালোবেসে আজ জীবন আমার বন্ধ।
সমঝেছি এই দুনিয়া নেহাৎ ঠাট্টা।

সাঙ্গ হয়েছে আজ্ঞে-হুজুর-পালা,
এবার পরেছি বুদ্ধজয়ের বেশ।
বুকের গভীরে পরম পিরিতি আলা—
সাঙ্গ করেছি আজ্ঞে-হুজুর-পালা।
ভীষণ শত্রু মানছে না কোনো ক্লেশ,
বুকেছে আমার পাওনা বিজয়মালা।
সাঙ্গ হয়েছে আজ্ঞে-হুজুর-পালা
এবার পরেছি বুদ্ধজয়ের বেশ।

এই তো সময় অসমসাহসে রুখবার।
অবয়বে জ্বলে দিব্য দাহন দীপ্তি।
পরোয়া কিসের ঘোষণা ধিক্কৃত লোভার—
এই তো সময় অসমসাহসে রুখবার।
তোমার দু চোখে আমার অপার মুক্তি,
ওদিকে বাচাল নায়কীর ফেরে ভোলপাড়;
এই তো সময় অসমসাহসে রুখবার।
অবয়বে জ্বলে দিব্য দাহন দীপ্তি।

অসীম রায়ের উপন্যাস

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের বয়সকাল শতবৎসরের সীমা অতিক্রম করেছে। তাই কেবলমাত্র গৃহিণীদের দিবানিদ্রার প্রস্তুতিপর্বে ও নিদ্রাযানের চলচ্চিত্রের উপাদান সরবরাহে ইদানীং এই বিশেষ সাহিত্যকলাটির নিরোজন লক্ষ ক'রলে মূলের ভীষণতি হচ্ছে বলে ভয় হতে পারে। আসলে প্রাবীণ্যের অভিজ্ঞতাকে স্মরণ রেখে তার পরিবর্ধনের সম্ভাবনাকে প্রশস্ত ক'রতে খুব অল্প আধুনিক ঔপন্যাসিককেই সাহসী হ'তে দেখেছি। পূর্ণবয়স্ক বাংলা উপন্যাসের ঘননশীলতা প্রকাশের ক্ষমতা ও প্রয়োজন স্বীকার করে নিয়ে যে মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক দুঃসাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসেছেন শ্রীঅসীম রায় তাঁদের একজন।

"রক্তের হাওয়া" সম্প্রতি প্রকাশিত হলেও অসীমবাবুর উপন্যাস রচনায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জোরে আত্মপ্রতিষ্ঠা আরও আগে থেকে। প্রায় দশবৎসর পূর্বে, তাঁর প্রথম উপন্যাস "একালের কথা"র প্রকাশকাল থেকেই। যথাবর্তী ও সাম্প্রতিক উপন্যাসগুলিতে যে স্বাধিকারী চিন্তনের গজেন্দ্রগমন আজ আমাদের বিস্মিত করে তার প্রথম সুনিশ্চিত পদক্ষেপ "একালের কথা"য়। সুতরাং অসীম রায়ের উপন্যাস প্রসঙ্গে যে-কোন আলোচনাই এই বইটির উল্লেখে সূত্রপাত হওয়া উচিত।

১৩৬০ সালে প্রথম প্রকাশিত "একালের কথা", অল্প গুণাবলী যাদ দিলেও, বাংলাদেশের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের আন্তরিক ও অকপট দলিল-রূপে স্বীকৃতি পাবে। উপাখ্যানে ধৃত 'একাল' ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৮ সাল। এই কয়টি বৎসর কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের ভাবনাজগতের রূপপরিবর্তনের একটি স্মরণীয় সময়কাল। এই পটভূমির আশ্রয়ে বহু গল্প ও উপন্যাস রচিত হ'লেও, "একালের কথা"র আবেদনটা কিছুটা স্বতন্ত্র। আন্দোলনের উদ্ভাসিত বিবরণী, প্রণয়-প্রসঙ্গে কিছুকথাবার্তা ভাবপ্রবণতা, তত্ত্ব-প্রচার এবং অবশেষে হিতোপদেশে পরিসমাপ্তি—এ জাতীয় উপন্যাসের সুপরিচিত এইরূপ ছকের প্রতি অসীমবাবুর অনাস্থা সুস্পষ্ট। তদানীন্তন সমাজের অন্তর্নিহিত চরিত্র ও তার ছন্দহারানো মানুষের সম্পর্কস্থাপনের সমস্যার আবিষ্কারেই লেখক সমধিক উৎসাহী।

নিতাগোপাল চৌধুরীর, তথা চরিত্রের সঙ্গে অধ্যায়িত যুবকদের, মানসিকতা সজনের ইতিহাস আশ্চর্য সংবেদনশীলতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। ২৯শে জুলাইর ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে সাকলো শুরু হ'য়ে, কয়েকদিনেরই পরবর্তী ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার রক্তাক্ত পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির উদ্ভাসিত উদ্যাপনায় এসে থামা,-ও স্বাধীনতা-উত্তর আশাভঙ্গ, ঘামশ্রী আন্দোলনের ব্যর্থতার পর্যবসানের এই সদাপরিবর্তনশীল ঘটনাস্রোতের প্রবাহে নিতাগোপালের ব্যক্তিত্বের ক্রমবিবর্তন।

কলকাতার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানকারী, ও অনেক সময় নেতৃত্বের একটা বিরাট অংশ, এ শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্ভূত। স্বভাবতই আন্দোলনও তাদের শ্রেণীপ্রসূত দুর্বলতাদ্বারা সংক্রামিত হয়। হঠাৎ উচ্ছ্বাস ও সেই পরিমাণ ভগ্নোৎসাহিতে হতাশা তাই আমাদের রাজনৈতিক জীবনের ক্রমাগতকে সদাদোদুল্যমান করে রেখেছে। মধ্যবিত্তস্বার্থপ্রধান আন্দোলনের এই সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে নিতাগোপাল শুরু থেকেই সচেতন। ২৯শে জুলাই ময়দানের বিরাট সমাবেশের আনন্দের ফাঁকেও তাকে এই চিন্তাটা খোঁচা দেয়, মনে প্রশ্ন জাগে ভবিষ্যতে কি হবে? "সেই আবার আপিস, সিনেমা আর ফুটবল। কলকাতার প্রত্যেক দিনকার জীবনের কোথাও তো পরিবর্তন কিছু নেই। একদিন রাস্তায় গিয়ে গুলি খেয়ে মরে যাওয়া এক কথা, আর তিল তিল করে জীবনকে পালটান যে আর এক ব্যাপার।" আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সাহসিকতা ও সহীদের পবিত্র স্মৃতিকেও যখন ছাপিয়ে ওঠে পরবর্তী দিনগুলির উদাসীন ক্রমাগতকতা তখন বিপ্লবী মানসিকতা লোপে মধ্যবিত্তের এই অক্ষমতা সর্বাধিক পীড়িত করে বুদ্ধিবাদীকে। বুদ্ধিতর্কের মানদণ্ডে এই ব্যর্থতাকে বিচার করার মাঝেই অমীম রায়ের বৈশিষ্ট্য। পরে রচিত "গোপাল দেব"-এও নায়ককে ঘাবিত করে তার সমসাময়িকদের উদাসীন "যখন মাত্র তারা কয়েকজন ভারতবর্ষে নতুন সরকার স্থাপন করবার জন্য রাস্তায় নেমে পুলিশের ঠ্যাঙানি খেয়েছিল আর দিনের পর দিন সিনেমার ভিড় বেড়েছিল, ব্যাগে কমলালেবু পাউরুটি নিয়ে দলে দলে লোক খেলার মাঠে ভিড় করেছিল।" এটা ১৯৪৯।৫০ সালের বর্ণনা। পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আজকেও প্রতিক্রিয়ার বিশেষ বদল হ'য়েছে বলে মনে হয় না।

যাই হোক, অমীমবাবুর কথাসাহিত্যের বিশ্লেষণের জন্য, তাঁর অকপট আপোষহীন বুদ্ধিবাদ। তাই অপ্রত্যাশিত মনে হয় না যখন ২৯শে জুলাইর সভায়

আবেগময়ী বর্ণনার পরই পাঠক এসে থমকে দাঁড়ায় দাদার শতবর্ষের কলকাতার দমবন্ধের সামনে। আসলে সমগ্র মধ্যবিত্ত মানসিকতাতেই একটা ফাঁকি হয়ে গেছে—কি রাজনীতিতে কি সমাজবোধে। কোনো আন্দোলনের মুখে এ ফাঁকিটা আরও স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয়। "একালের কথা"র একটা বর্ণনা এই সামগ্রিক পচনকে প্রায় চুম্বকের আকারে ধরেছে অপূর্ব ভাবে। ভিয়েৎনাম দিবসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সভায় নানা ধিক্কার প্রকাশের পর মিছিল করে রাস্তায় বেরিয়েছে। "আচমকা লাঠির চোটে একটা পচা কাপড়ের মত ফরফর করে ছিঁড়ে যায় মিছিলটা।" উপমাটি কি নেহাৎই আকস্মিক?

নিতাগোপালের মনের কথা—"আমি চাই আরো মানুষের কাছে যেতে, আরো ভালো করে বুঝতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ। তা না বুঝলে, না জানলে আমি তাকে ভালবাসতে পারি না।" রাজনৈতিক আন্দোলনের কোঠরির মধ্যে এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগের সীমাবদ্ধতা তাকে পীড়িত করে। সে প্রমিকদের উদ্ভাসিত মুখ দেখে ২৯শে জুলাই সে উৎসাহিত হয়েছিল, স্বাধীনতা-পরবর্তী আন্দোলনে তাদের অনীহায় সে মর্মাহত হ'য়ে ভাবে, কোথায় যেন একটা ভুল আছে। '৩৯'৪০ সালের আন্দোলনকারীদের আদর্শ-নিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও তাদের সম্বন্ধে নিতার আক্ষেপ: "আগামীর মনোবর্ষের বিহ্বলতায় তাদের স্মরণে ছিল না, মানুষের মুক্তির পথে কোন শর্টকাট নেই।"

অবশেষে রাজনীতির ঘাসলুকারী জগতের বাইরেই নিতাগোপাল মুক্তির আস্বাদ পায়। যৌবন-অতিক্রান্তা পুষ্পর নতুন করে বাঁচার ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রত্যয় তাকে চমকে দেয়, জীবনের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। ক্যানিং অঞ্চলের কোন অজ্ঞাত গ্রামে এক সাধারণ ইস্কুলকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য অনিল মাইতির প্রচণ্ড ধৈর্যশীল সংগ্রাম, হঠাৎ নিতার মানসিকতাকে নাড়া দেয়। পুষ্পর সমস্যা চল্লিশ বৎসর পরে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পথে পদক্ষেপের—আর অনিল মাইতির সমস্যা সামাজিক, গ্রামের শত বাধা বিপত্তিকে মাথায় তুলে নিয়ে নিজের কর্মক্ষেত্রের সীমাবদ্ধ কাঠামোর মানুষের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের। রাজধানী রাজনীতির বাইরে যারা অবস্থিত তারা হয় নির্বোধ নয় প্রতিক্রিয়াশীল, এই জাতীয় সরল বিভাগকরণে অমীম রায় নিতান্ত নিরুৎসুক। পরে রচিত "দ্বিতীয় জন্ম"-এর একস্থানে মানবসেবাকে অনুরূপ কুঠরি-মুক্ত করার রীতিতে সুস্পষ্টপ্রকাশে অমীমবাবুর নায়ক আরও স্পষ্ট: "মানুষের কাছে আসতে গেলে কি চিরকালই ভগবানের কথা বলতে হবে কিংবা কোমর বেঁধে দল গড়তে হবে,

সংগঠন সাজাতে হবে? কেন, মানুষের তালস্ব কি যথেষ্ট নয়? পাদরী পুরুত না হ'লে কিংবা রাজনৈতিক নীতায় না বললে কি মানবতার কোন ভবিষ্যৎ নেই?"

হয়তো যথাবিত্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বলেই সমাজ-পরিবর্তনের বহুর পথ এদেশে আরও কঠিন হ'য়েছে কপটতা ও কার্পণ্যের দোষে দুষ্ট হ'য়ে। সমষ্টির কর্মক্ষেত্রে তাই দলাদলির সহস্র বাধা। অপরপক্ষে ব্যক্তি মানুষের সংগ্রামের পথে, নিজস্ব চারিত্রিক দৃঢ়তাগুণে, সামাজিক বাধা সত্ত্বেও শ্রেণী দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠে সুস্থ ভাবে বাঁচা সম্ভব। "মানুষ তো অন্ধকারেও বাঁচে আলোতেও বাঁচে— এ কথাটা বলতে তার কি?"—গোপাল দেবের এই বেপরোয়া বিশ্বাসবোধেই অসীমবাবুর সার্থক প্রতীতি। বাস্তবিকই, সুস্থ জীবনের জন্য সাহসী সংগ্রাম ব্যক্তিমানুষ পৃথিবীর জন্ম থেকেই শুরু করেছে, সমষ্টিগত আন্দোলনের পদ্ধতি আবিষ্কারের বহু পূর্ব থেকে তার সূত্রপাত; বর্তমান সমাজে রাজনৈতিক যুদ্ধের ব্যাপকতা ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব সংগ্রামের নিত্য প্রয়োজনকে কিছুতেই লাঘব করতে পারে না। রাজনীতির বাইরেও যে কিছু কিছু মানুষ বাঁচার সংগ্রামে, ব্যক্তিগত সম্বন্ধ-বন্ধনের সমস্যায় পীড়িত হ'য়েও এগিয়ে যাচ্ছে, তাদের সাহসিকতাকে স্বীকার করে নিয়ে ও উপযুক্ত স্থান দিয়েই রাজনৈতিক বিপ্লব সার্থক হ'তে পারে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের প্রতি আস্থা রাখার সমস্যায় জর্জরিত নিতাগোপালের একাকিত্ব, যথাবিত্ত বুদ্ধিবাদীরই মানসিকতার প্রতিরূপ। অপর দিকে সমস্যা থেকে দূরে সরে গিয়ে সবকিছু মেনে নেবার সহজ পথে পা বাড়িয়ে দেওয়াটাও এই সমাজেরই শতকরা নব্বইজন লোকের প্রবণতা। খুশির কথাগুলি স্মরণীয়: "আমরা অত্যন্ত সাধারণ, নিত্যদা। সাধারণ থাকতেই ভালবাসি। কেউ ভগবান চাইলে, আমি তার দূর থেকে পালাই।" তার যুক্তির মধ্যে বাঙালী মেয়েদের দীর্ঘকালের আশাভঙ্গের কাহিনীরই ছায়া মেলে: "...আপনাদের একদম চিনি না। ভয় হয়, যদি ভালো ভালো কথা বলে ঠকিয়ে যান। ...আমি আর ঠকতে রাজি নই।" "গোপাল দেব"-এর অন্তও ঠিক একই ভাবে তার স্বসমাজভুক্ত অধিকাংশ মানুষের মনের কথাটা জানিয়ে দেয় যখন বার বার বলে: "আমরা কাদার মানুষ, কাদায় গড়াছি।" নিতাগোপালের রাজনীতি-বিমুখতা রাজনৈতিক পাঠককে মর্মাহত করলেও, কলকাতার আন্দোলন ও বিশেষ করে দাদার সংবেদনশীল বর্ণনা, অসীম রায়ের "একালের কথা"কে সর্বজনগ্রাহ্য ক'রে তোলে। খুশির আলী দিবস,

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দ্বিতীয়মহাযুদ্ধের দ্রুতপরিবর্তনশীল ইতিহাস পার হয়ে কলকাতার মানুষ যেদিন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টে এসে পৌঁছল, তখন তার মানসিক পটের চেহারাটা আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। মানিকের সঙ্গে আনন্দমুখরিত কলকাতা ভ্রমণরত গুজারাবের কথাগুলোতেই কলকাতাবাসীর সেদিনের মনোভাবটা ধরা পড়ে: "কেতনা দেখে গা সাব, সব দেখ লিয়া। আভি ঘর যায়েগা।"

আর অপূর্ব বর্ণনা কলকাতার ছাত্র সমাজের, ভাবুক বাঙালী যুবকদের। বিশ বৎসর পরেও হয়তো মূলত কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই একই ভাবে তারা প্রেম করে, কফি-হাউসে বসে এক নিশ্বাসে নারী, রাজনীতি ও সাহিত্য আলোচনা করে।

"একালের কথা"য় ব্যক্তি মানুষের সংগ্রামের প্রতি সশ্রদ্ধ আস্থার যে চিত্তার শুরু হয়েছিল, "গোপাল দেব"-এ তারই পরিণতির ছবি পাই। স্বয়ংসম্পূর্ণ উপন্যাস হ'লেও তাকে "একালের কথা"র পরবর্তী কাহিনী বলা যেতে পারে। শুরুতেই দেখি পূর্বপরিচিত নিতাইগোপাল চৌধুরী তার নামের আগা ও গোড়া কেটে 'দেব' ছুড়ে দেয় শেষে। পূর্বোক্ত উপন্যাসের পুষ্প এখানে নয়ন।

ধর্মবিত্ত সংসারের গতি অনুসারে গোপালদের ছাত্রাবস্থার উত্তেজনাপূর্ণ দিন কাটিয়ে এবার চাকুরির সন্ধানী। সহরে সমাজে যৌবন কাটিয়ে, তার প্রাত্যহিক ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থেকে গোপাল তার মানুষগুলোর ইতিহাস ভাল করতে শিখেছে—"একদিকে এক প্রচণ্ড মানসিক অন্তর্ভেদতা আর একদিকে প্রচণ্ড অভিকর্ষণ।" বন্ধুমহলে সে বিচিত্র; কখনও "হাইব্রাউ" কখনও "সন্ন্যাসী" নামে উপহাসাস্পদ। আসলে "একদিক থেকে যেমন জীবন তাকে আকর্ষণ করে তেমনি আর একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। একেবারে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করে যৌ যৌ না করলে, একেবারে ছাপোষা মেজাজ না বানিয়ে ফেললে মানুষের সঙ্গে কি মেশা যাবে না?" এই বিবদমান প্রবণতার থেকে গোপাল মুক্তি পায় নয়নকে ভালবেসে।

"একালের কথা"-র পুষ্প স্বামীকে বাদ দিয়ে, ছেলের স্মৃতিকে ভুলে গিয়ে একবার অন্তত নতুন করে জীবন শুরু করার কথা ভেবেছিল। কিন্তু জীবনের পথে মানবিক সম্পর্ককে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে বাঁচা সম্ভব নয়। তাই "গোপাল দেব"-এ নয়নের নতুন জীবন গোপালকে আশ্রয় করে সার্থক হ'য়ে ওঠে। স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে পতিতেরীর আশ্রমে স্বাধীন জীবন শুরু করতে গিয়ে নয়ন ব্যর্থ

হ'য়ে দিয়ে আসে। অবলম্বনশূন্য, সম্পর্কহীন নয়ন তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু পায় গোপালের মধ্যে।

আর গোপালের কাছে, তার বিদেশী সংবাদপত্র অফিসের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও মধ্যবিত্ত সমাজের কৃপমণ্ডুকতা ছাপিয়ে নয়ন সুস্থ জীবনবোধের প্রতিরূপ হ'য়ে দেখা দেয়। বাঁচাটাকে তার কাছেই একটা কুলকিনারাহীন রহস্য ব'লে মনে হয়। গ্লানিময় সামাজিক জীবনযাত্রার বর্তমান অন্ধকারে মানবীয় সম্বন্ধগুলি, বিশেষতঃ নরনারীর প্রেম, মানুষের বাঁচার একমাত্র তাগিদ হ'তে পারে; মনের অজ্ঞাত দ্বারগুলো অপ্রত্যাশিত ভাবে খুলে গিয়ে কোন রহস্যময় জগতের সন্ধান দেয়।

গোপাল ও নয়নের ভালবাসা তাদের বেঁচে থাকার পথে সবচেয়ে বড় পাথেয় ব'লেই, তাদের সম্পর্ককে কোন সংক্ষিপ্ত পরিণতির দিকে টানবার প্রয়োজন বোধ করেন নি লেখক। তাই উপাখ্যানের শেষে, গোপালের চিন্তাসাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি বালুচরি হোট নীড়ে বাঁধা প'ড়ে ফুরিয়ে যাবে, এই আশংকা করে নয়ন যখন তার কাছ থেকে বিদায় নেয়, তখনও নয়নের শেষ কথা—"আগে হলে হয়তো আর বাঁচতে ইচ্ছে করত না। কিন্তু তুমি ওসবের চেয়ে বড় আমার কাছে।...এখন আমার কাছে সব নতুন ঠেকছে, আবার নতুন করে চিনছি নিজেকে, কেন ম'রতে যাব?" বিশ বৎসর বয়সে নারীকে বৃহত্তর পরিণত করার রেওয়াজ যে দেশে, সেখানে চল্লিশ বৎসর বয়স্কার স্বামী-পুত্র ত্যাগ করে স্বাধীন অস্তিত্বের চিন্তাটা অকল্পনীয় পাপ হলে অভিহিত হ'তে পারে। নয়নের চরিত্রের অনুরূপ চরিত্র শুধু আধুনিক বাংলা উপন্যাসেই নয়, হয়তো বাস্তব জীবনেও প্রায় অনুপস্থিত। "গোপাল দেব"-এ উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে নয়নের চরিত্রায়ণ পাঠকের কাছে অবাস্তব মনে হ'তে পারে। কিন্তু বাঁচার পথে বাধাস্বরূপ পুরাতন পারিবারিক সম্পর্ককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেও এ যুগের নারীর পক্ষে নয়নের প্রাচীর ঠেলেও, নতুন জীবনযাত্রা ও নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব— এই বলিষ্ঠ চিন্তাটাকে দুঃসাহসের সঙ্গে উপস্থিত করার মধ্যেই অসীম রায়ের কৃতিত্ব।

খুব সঙ্গতভাবেই নয়নের বর্ণনায়, নয়নের মুখের ভাষায় একটা শুধু বলিষ্ঠ ভঙ্গী অবলম্বিত হয়েছে। যদিও উপন্যাসের কোন চরিত্রেরই সবিশেষ দৈহিক বর্ণনা পাওয়া যায় না, নয়নকে লেখক বহুবার গোপালের চোখ দিয়ে দেখিয়েছেন। "শ্যাম বারান্দো কঠিন মুখের ওপর স্পষ্ট দৃঢ় লাইনে আঁকা ঠোঁটের বাহার, ক্ষীণ বাজু আর লম্বা হাত পায়ের গড়ন দেখে গোপালের কেন, যে কোনও

মানুষেরই খট্‌কা লাগতে পারে তিরিশ পার হয় নি বলে। বিশেষ ক'রে তার চোখদুটি। সোপালের মনে হয় সে চোখে আগ্রহ আছে কিন্তু কোন ব্যাকুলতা নেই।'

অমীয়বাবুর কলম আরও সংযত নয়ন-সোপালের প্রেমের বর্ণনায়। ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত না হ'য়েও প্রণয়কাহিনী রীতিভাষাধর্মী হ'তে পারে, তার প্রমাণ "সোপাল দেব"। একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনার উদ্ধৃতি দিতে প্রলুব্ধ হ'ছি: "সোপাল অতি সন্তর্পণে সরে আসে নয়নের কাছে। সে যেন ভয় করে একটা ফুলের গায়ে হাত বুলোচ্ছে এমনি ভাবে তার মুখখানা নয়নের ঘাড়ে চুলে গালের ওপর রাখে। নয়ন চমকালো না। ধীরে ধীরে বললে, "আমায় তুমি একটা বুড়ীকে ছুঁই আদর করছিস? কী পেলি আমায় বলো?" এই ঘটনা তথাকথিত নবাগীতিধর্মী কোন আধুনিক সাহিত্যিকের কলমের তলায় পড়লে, তা কি রূপ পরিগ্রহণ করত তা সহজেই অনুমেয়।

তবে "সোপাল দেব"-এর তত্ত্বের বাহুল্য গল্প-রসলোলুপ পাঠকের কাছে ক্লান্তিকারক হ'তে পারে। আসলে "একালের কথা"-র রাজনীতি, সমাজনীতি বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার নিত্য যে বন্ধুদের সঙ্গী ছিলেবে পেয়েছিল, ছাত্রজীবন পার হ'য়ে তারা এখন বিক্ষিপ্ত। সুতরাং একাকী সোপাল দেবের চিন্তা নিজের মনের মধ্যেই। এবং একথা অনস্বীকার্য যে উপাখ্যানটির আখ্যানভাগ চিন্তাকর্ষক হ'লেও, তাকে অবলম্বন ক'রে যে চিন্তারাজ্য গড়ে উঠেছে তার ব্যাপ্তিতেই লেখক বেশী উৎসাহী। তাই কোনারকের ছবিসম্বলিত দিনপঞ্জিকা বা পলাতক রেলের খোকার সেইটের মত আপাতদৃষ্টে সামান্য ঘটনা, সোপালের মানসিকতায় ভাবনার ঢেউ তোলে। এবং সোপাল দেব সৎ বুদ্ধিবাদী হলেই নিজের প্রেমের সার্থকতাতেও স্থির থাকতে না পেরে, মধ্যবিত্ত সমাজের সমবেত অস্তিত্বের প্রয়োজনের কথা ভাবে, এবং হয়তো খুব সঠিক ভাবেই সিদ্ধান্ত করে আরামে চির-অভ্যস্ত মধ্যবিত্তদের সামনে কোনো প্রকাণ্ড সর্বব্যাপী সংকট এসে দেখা দিলেই, তাদের সমবেত বেদনাবোধ ও সংগ্রাম সম্ভব।

বহুবিধ চিন্তার সমাবেশ ও তাদের স্পষ্টতর করার প্রয়োজনেই বোধহয় "সোপালদেব" কিছুটা অতিবিলম্বন দোষে দুষ্ট। পুনরুক্তির দুরাদোষ থেকে "একালের কথা" সম্বন্ধে মুক্ত। অল্প কথায় একটা পুরো সমাজের চিত্রাঙ্কনে অমীয়বাবু তাঁর প্রথম উপন্যাসে যেমন সার্থক, তার অনুরূপ তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাসে বিরল। দাদা চরিত্রের বর্ণনা, যেমন: "তিনবাড়ি ছিন্নির অনেকগুলো কলকব্জা ছেড়ে।

যখন এরা ছোট থাকে, তখন নীচে থেকে তবলা ও ঘুঙুরের আওয়াজ আসে। আরও বড় হলে সেতারের পিং পিং সোনা যায়। প্রায় সকলেই ভোর না হতে স্নান করে বেশ ম্যাচ করে শাড়ী ব্লাউজ পরে কলেজ করতে যায়। কেউ আই-এ, কেউ বি-এ, কেউ এম-এ পাশ করে একে একে। এমনি ভাবে এরা রোজ সকালে আদতো ভাবে পাউডার মেখে ক্লাসে উদাসভাবে লেকচার শুনে অনেকগুলো বছর কাটিয়ে দেয় নিরুদ্বেগে।.....তারপর অবশ্য যথাসময়ে তিনটি বাড়ির প্রায় প্রত্যেক বছর একটি না একটিতে হোমলতা ওঠে, ডিয়েন বলে, মাংস আর চিংড়ি মাছের মালাইকারির গন্ধে ভুরভুর করে বাতাস।" বা স্বতীর মেজাজের বর্ণনা—হাসেমের মৃত্যুর দৃশ্য প্রায় অতুলনীয়।

অবশ্য "গোপালদেব"-এ এ-জাতীয় স্বপ্নপরিকল্পনার অভাবের ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে পরিণত চিন্তাশীলতার উপস্থিতি দ্বারা।

অমীমবাবুর চিন্তাপ্রবণতা তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে প্রায় একজাতীয় বিবৃতিকরণের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। "দ্বিতীয় জন্ম" ও "রক্তের হাওয়া"র আখ্যানভাগের অকিঞ্চনতাকে ছাপিয়ে উঠেছে কয়েকটি বিশেষ ধ্যান-ধারণা। এবং প্রকাশিত চিন্তাগুলি পূর্বের অপেক্ষায় অনেক বেশী সমাজ-নিরপেক্ষ, বলা যেতে পারে চিরায়ত সমস্যার সঙ্গে তা জড়িত।

"দ্বিতীয় জন্ম"এর সোনা একটা আস্ত ভাজা ফুলফুলের অভাবে ব্যাকুল। যক্ষা রোগে প্রায় মৃত্যুর সীমানা পর্যন্ত এগিয়ে সে ফিরে এসেছে। সুতরাং জীবনের প্রতি মুহূর্ত তার কাছে নতুন মূল্য নিয়ে দেখা দিচ্ছে। "কেবল মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েই সম্ভব একেবারে সম্পূর্ণ উদ্বেগবিহীন হয়ে মাত্র বাঁচার প্রতি প্রবল আকর্ষণেই মানুষের দ্বিতসাধনা করা।" উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও রাগাকৃতি-ক্রিয় ভক্ত সোনার, মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে যে মহত্ত্ব তার বন্ধুকে আচ্ছন্ন করে, সোনার আরোগ্যলাভের পর সেই মহত্ত্ব থেকে সে যেন তার বন্ধুর চোখে নেমে আসে সাধারণের স্তরে, চাকরি ক'রে সামান্যের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে।

সোনা সম্বন্ধে মোহভঙ্গের পর তার বন্ধু যায় সমুদ্রের ধারে বেড়াতে। প্রকৃতির মহত্ত্বের কাছে ব্যক্তিমানুষের সংগ্রামী সত্তা লীন হ'য়ে যায়। একদিন নির্ঘাত সমুদ্রডুবি থেকে বাঁচিয়ে তুলল একটা সামান্য ঝিনুক। "ছোট ভাইয়ের মতো বুকে টেনে নিলাম। তার পরিত্রাণ আঁশটে গন্ধে ভরা বুকখানায় হাত রেখে মনে হল আমি সোনার সেই অতি সাধারণ জীবনের গায়ে হাত রাখলাম।

ভাবলাম বাড়ি ফিরেই সোনাকে চিঠি লিখব।" অবশ্য তার পূর্বেই সোনার মৃত্যুর বার্তা নিয়ে বাড়ি থেকে চিঠি এলো।

উল্লিখিত সংক্ষেপসাধন, "দ্বিতীয় জন্মের" উৎকর্ষকে নিশ্চয়ই অনেকখানি ক্ষুণ্ণ ক'রল। কিন্তু আমার কাছে উপন্যাসটির মূল বক্তব্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব'লে মনে হয়েছে। "আনন্দকে কোন আকাশচুম্বী মনস্তত্ত্বে ঠেলে না দিয়ে এই রক্তমাংসের রোজকার প্রত্যক্ষ জীবনেই" তাকে পাওয়া যায়। এবং এ অনুভূতিটা বেশ স্পষ্ট হ'য়ে ধরা দেয় আদিম প্রকৃতির মধ্যে বাঁচতে গিয়েই, যখন মোটা সুখই বাঁচার উৎসাহের প্রধান কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়ায়। আমাদের সমাজের প্রাত্যহিক সমস্যা, যার অনেকগুলিই শিক্ষিত বুদ্ধি-সংক্রান্ত,—এ সময়ই ম্লান হ'য়ে যায়, ব্যক্তিত্বের গর্ব অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে যায় বিশাল পর্বতমালার ধ্যান-গম্ভীর শান্তির মধ্যে বা অসীম সমুদ্রের সদাপরিবর্তনশীল উত্থান-পতনের সামনে।

অবশ্য এ সত্ত্বেও "দ্বিতীয় জন্মের" আখ্যানভাগ সুখপাঠ্য; আশ্চর্য গতির সঙ্গে এগিয়ে চলে। তার লিপিচাতুর্য ও চরিত্রায়ণ পাঠককে বিস্মিত না করে পারে না। বিশেষতঃ সোনার মা'র শান্ত মূঢ় চেহারাটা ও সমুদ্রের উন্মত্ত নৃত্যের বর্ণনা বহুকাল মনে থাকবে।

"হৃদয়ের হাওয়া"র বক্তব্য-বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে কোন বাংলা উপন্যাস রচিত হ'য়েছে ব'লে জানা নেই। শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর তার প্রভাব—এই বিবিধ সমস্যার ঘাতায় শিল্পীর জীবন নিয়ে হয়তো নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে বহু উপাখ্যানে, কিন্তু তার শিল্পী-সত্তার সংকটকে আন্তরিক ও অবিচলিত তন্ময়তে উপস্থাপনার চেষ্টা এই বোধহয় প্রথম।

এডগার আলেন পো'র একটি নাতিদীর্ঘ গল্প প'ড়েছিলাম কোন এক চিত্রকর সম্বন্ধে। সুন্দরী ভার্যাকে সম্মুখে বসিয়ে তার মুখাবয়বের নিখুঁত চিত্র রচনার দীর্ঘকালব্যাপী উন্মত্ত সাধনার ইতিহাস। তুলির শেষ টানে ছবিকে সজীববৎ ক'রে, আত্মতৃপ্তির আস্বাদ পেয়ে শিল্পী যেদিন তাঁর মডেলের দিকে পুনরায় স্বাভাবিকরূপে তাকাবার অবসর পেলেন, তখন দেখলেন—অনায়াসে একাধিকবার একতন্ময়তে অবস্থানের ফলে মহিলার দেহে আর জীবনের সাড়া নেই।

"হৃদয়ের হাওয়া" প'ড়তে প'ড়তে একাধিকবার এই গল্পটির কথা মনে প'ড়েছে। উপন্যাসের শুরুতে অমলের সঙ্গে যখন পরিচিত হই, তখন তার সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাসে সে রমার সঙ্গে নিজের দীর্ঘদিনের প্রণয়-ইতিহাসের

সবকিছু উজাড় করে ঢেলে দিয়ে মানসিকভাবে প্রায় সম্পূর্ণ নিঃস্ব। অন্য দিকে অমরের উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্রের স্বচ্ছ বর্ণনার নীচে মোকে সহজেই সনাক্ত করার সুযোগের ফলে, সমাজে রমা সদাবিব্রত। অমর তাকে নিজের শিল্পকর্মের কাঁচামালরূপে এতদিন ব্যবহার করেছে—এই সন্দেহটা রমাকে যতই আঘাত করে অমরের সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্রটা ততই দুর্বল হ'য়ে পড়ে। অমীম রায়ের উপন্যাসের সংক্ষেপদীর্ঘিত এই আখ্যানবস্তুর সমস্ত পটভূমি জুড়ে রয়েছে অমরের যুক্তিনির্ভর আত্মবিশ্লেষণ। তার রক্তের ছাওয়া পালটাতে শুরু করেছে : রমার আলিঙ্গনের মধ্যে বন্দী হ'য়ে থাকা আর সম্ভব নয়। বিধবা রমাকে বিবাহের ফলে নৈতিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার আশংকা, না শিল্পীজীবনের পরিবর্তমান গতি অনুযায়ী রমা থেকে বিকর্ষণ? শিল্পীর ভালবাসা কি শুধু কেবলমাত্র তার শিল্পী-সত্তা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত? সাধারণ মানুষের প্রণয়ে আসক্তি থেকে কি শিল্পীজীবনের অমানুষিক স্বার্থান্বেষণ বড়?—এই জাতীয় প্রশ্নের দ্বন্দ্বনে অমরের মন কেমন ক্ষত-বিক্ষত হয়, সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের চিন্তাও এক চিরকালীন সমস্যার ঘূর্ণাবর্তে আন্দোলিত হয়।

অমরের সমস্যা জটিলতর হ'য়ে উঠেছে আরও একটি কারণে। বকুল-বাগান রোডের বাড়ির প্রতি তার আসক্তি, যেটাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা ও রমার প্রতি মানবিক দায়িত্বপালনে তার অক্ষমতা—এ দু-এর সমন্বয়সাধনে অমর তার সমস্ত যুক্তিবুদ্ধি ছাতড়িয়ে ফিরছে। তার নিজস্ব মত—"বিদ্যির ছক্কা ছেড়ে পারে বাইশে, তিরিশে এসে নয়।.....বাইশে মানুষ প্রতিষ্ঠিত হয় না, তার পারিপার্শ্বিকের আকর্ষণে সে অনেকটা নিরালম্ব. তিরিশে এসে একটা মানুষ দাঁড়ায়।"

এ জাতীয় আপোষ, শিল্পীজীবনের সততায় কতটা পরিচায়ক তাতে সন্দেহ থাকে। বিশেষ করে যখন মনে পড়ে গল সোর্দার প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে অতীতের সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে শিল্পসৃষ্টির সুখে স্বাধীন যাত্রার কথা।

অবশ্য সোর্দার উন্মত্ত আবেগপ্রবণতায় অমর বিশ্বাসী নয়। "শিল্পী মানে ক্ষ্যাপা বাউল উদাসী, কোন কিছু হিসেব না করে যারা অজানার পথে পা বাড়ায়, নিজেদের নিয়েই এমন মশগুল যে কতখানি তা'রা দাগ রেখে গেল অন্য মানুষের চৈতন্যে সে বিষয়ে নির্বিকার, সেই খরদী মরমী উদাসীন অজাতশত্রু শিল্পীদের পদ্ধতিতে দাঁড়াতে অমর রাজী নয়।" তাই আগাগোড়া অমরের প্রতি পদক্ষেপ যুক্তিনির্ভরশীল। ফলে তাকে কিছুটা নিরাসক্ত নিরুত্তাপ মনে

হ'তে পারে। নন্দনের প্রতি গোপালদেবের ভালবাসার যে ধরণের ব্যাকুলতা ও পরিপূর্ণতা রয়েছে, রমার জন্য অমরের প্রণয়ে তার অভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এ পার্থক্য কি বাইশ বৎসর থেকে তিরিশের মানসিকতার তফাৎ?

অভিনেতা চার্লস চ্যাপলিন একবার বলেছিলেন, শিল্পস্রষ্টা ও ধ্বংসকারীর মনস্তত্ত্ব প্রায়শই এক। উভয়েরই চরিত্রে পাওয়া যায় প্রবৃত্তির প্রবল অভিশিখা, কল্পনাশক্তি ও গভীর বিশৃঙ্খলাবোধ। অমরের উপন্যাস রচনাকল্পে নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত করে নিংড়িয়ে নেবার উৎসাহে এই চরিত্রেরই সন্ধান মেলে। রমার জন্য তার একদা চঞ্চল চিত্তের বর্তমান তাটা ও অন্য 'এক্সপেরিমেন্টের' সন্ধানে "অনিশ্চিত জগতে নিজেকে ছুঁড়ে" দেওয়া এই মানসিকতারই লক্ষণ। কিন্তু এগুলির সঙ্গে, তার ঐতিহ্য-মণ্ডিত বকুলবাগান রোডের বাড়ির ছেলে হবার প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে যুক্তিপ্রধানের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া কিছুটা দুষ্কর হ'য়ে পড়ে।

তবু "রক্তের হাওয়া"র রূপপরিকল্পনায় বৈচিত্র্যের চমক আছে। মহাভারতের পার্থের দ্রৌপদী ভাগ ও স্বতন্ত্রার প্রতি চিত্তবিক্ষেপের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যাকে সমান্তরাল রেখে আখ্যানভাগ এগিয়েছে। দ্রৌপদীতে আটক থেকে আত্মিক মুক্তির আপংকাল অর্জুনের রক্তের হাওয়া পরিবর্তন ও সুভদ্রার আধারে নতুন জলছবি দর্শনের মধ্যে, গ্রন্থ থেকে গ্রন্থান্তরে তাঁর অস্থির মন প্রমাণেই শিল্পীমানসের সদাসন্ধানমুখী চরিত্রের লক্ষণ ধরা পড়ে। অবশ্য পার্থের দুঃসাহসিক অভিযানের ব্যাপক বহির্জগত, আধুনিক মধ্যবিত্ত শিল্পী অমরের কাছে তার নিজের ব্যক্তিত্বের জটিল অন্তর্জগতে রূপান্তরিত হবার ফলে, পার্থের মহাকাব্যধর্মী উদ্দাম ও উদার ছন্দ-সমুদ্র এখানে স্বভাবতঃই অনুপস্থিত। তবু অমরের চিন্তাজগতের জটাজুটে, শিল্পী ও মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার সমস্যায়, মহাভারতের কৌন্তেয়র অন্তরাত্মাই মৃদু প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

চরিত্র রচনায় ও পরিস্থিতি-পরিকল্পনায় অমীম রায়ের পূর্বপরিচিত ক্ষমতার পুনর্সাক্ষাতে আনন্দিত হ'লাম। অমরের যা প্রসন্নময়ীর মানসিকতা বর্ণনা ও বিশেষ করে নিমন্ত্রিত সন্তোষ-দূতের উপস্থিতিতে রমা-প্রসঙ্গের অবতারণা ও পরে তাঁর আশাভঙ্গের পরিচ্ছেদটির রচনাপ্রণালী পাঠককে বিস্মিত না ক'রে পারে না। বিস্ময়-বোধ করার মত আরও অনেক কিছুই আছে, যেমন রমার সঙ্গে অমরের শেষ সাক্ষাৎকার বা প্রসন্নময়ীর পূর্বস্মৃতি রোমন্থনের কাহিনী।

"একালের কথা" থেকে "রক্তের হাওয়া"র যাত্রাপথ দীর্ঘ ও বহু বাঁক

সম্বলিত হওয়া সত্ত্বেও, অসীম ধাতুর প্রবণতা, মননশীলতা প্রকাশের সমর্থনেই মূলতঃ বলবতী হয়ে গেছে। যুক্তিনির্ভরশীল হলেও তাঁর উপন্যাস অবশ্যই যুক্তিসর্বস্ব নয়। মানবিক অনুভূতির ধারায় তাঁর চরিত্রেরা সাড়া দেয়: আধুনিক কিছু পাশ্চাত্য উপন্যাসের নায়কদের মত তারা হিমশীতল ছলনা নিয়ে বিমূর্ত যুক্তির পূজারী নয়। তাই তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস, ঘটনার বাহুল্যবর্জিত ও তত্ত্বের বহুবিধ আলোচনায় ভারাক্রান্ত হয়েও, চিরায়ত আবেগ-উপলব্ধির প্রতি সংবেদনশীলতা গুণে আজুক পাঠকের রসগ্রাহ্য হতে পেরেছে।

এরেনবুর্গ-আত্মচরিত

অজয়কুমার সিকদার

ইতিহাস রচনা করা কঠিন। যে নৈর্ব্যক্তিকতা ঐতিহাসিকের প্রয়োজন তা ঐতিহাসিক কোনদিন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন না বোধ হয়। যথাসাধ্য নৈর্ব্যক্তিকতার অতিরিক্ত কিছু ঐতিহাসিকের কাছে দাবী করা যায় না। যে দেশে তার বাস, যে কালে ও যে শ্রেণীতে তার জন্ম তার বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী যে ঐতিহাসিককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এ কথা এখন সর্বজনস্বীকৃত। কেউ বহুল পরিমাণে সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন, কেউ পারেন না। তাছাড়া আদালতের বিচারকের মত ঐতিহাসিককেও নির্ভর করতে হয় প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের উপরে। অথচ বিচারকের মত ঐতিহাসিকও জানেন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়, তার সাক্ষ্যও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অভিলাষের দ্বারা অনেক পরিমাণে রঞ্জিত। প্যারী নগরীতে নির্বাসিত লেনিনকে দেখে সরল বলে মনে হয়েছিল : যে সারল্য একমাত্র মহাপুরুষের থাকে সেই সারল্য লেনিনের মধ্যে আছে—এরেনবুর্গ মনে করেছিলেন। এই বর্ণনার কতখানি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, কতখানি পরবর্তীচিন্তন তা অনুমান করা কঠিন। আজ যখন সোভিয়েট নেতৃবর্গ স্ট্যালিনের প্রতিমাপূজক হতে অব্যাহতি দিয়ে লেনিনের উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত, তখন এরেনবুর্গ তার দ্বারা কি কিঞ্চিৎমাত্রও প্রভাবিত হন নি? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা না করে, মনে করা যাক এই লেনিন সম্বন্ধে অন্য একজন মানুষের প্রতিক্রিয়া। অসংখ্য কুলাকের হত্যার বিবরণ শুনে যখন উরালে লেনিন ক্ষেপে উঠেছিলেন তখন বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখছেন যে তাঁর রক্ত জমাট হয়ে গিয়েছিল সেই পৈশাচিকতায়। এই রকম পূষক সময়ের বিবরণে শুধু নয়, অন্য ঘটনার বিবরণেও দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীতে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।

ইতিহাসের অন্যতম উপকরণ যে আত্মচরিতাবলী সেই আত্মজীবনী লেখাও কঠিন ব্যাপার। ইতিহাসের মত নৈর্ব্যক্তিকতা আত্মজীবনীতে কেউ আশা করে না, আশা করে অবৈকল্য, অকপটতা। আত্মজীবনীতে ইতিহাসের আপেক্ষিক নৈর্ব্যক্তিকতাও আশা করা যায় না কারণ আত্মজীবনী,

সংজ্ঞানুযায়ী, একজন মানুষের ব্যক্তিগত দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখা ; আর অধিকাংশ আত্মজীবনীর উদ্দেশ্য পরবর্তীকালের বিচারশালায় আত্মপক্ষ সমর্থন। নিজের অতীত আচরণের জন্য উত্তরকালে যখন আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা প্রবল হয় এবং সেই প্রয়োজনের বশে যে আত্মচরিত রচিত হয় তাতে যে জীবনের নির্বাচিত অংশকে গোপন করার ও নির্বাচিত অংশকে প্রকাশ করার প্রবণতা কাজ করবে, তা স্বাভাবিক। যে রুশো আত্মজীবনের প্রারম্ভে আত্মস্তরী ঘোষণা করেছিলেন যে নিজেকে এমন সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার দাবির ইতিপূর্বে আর কেউ নেয় নি, তিনিও যে জীবনের কয়েকটি মসীলিপ্ত অধ্যায় সৌজন্যে এড়িয়ে গেছেন তা পরবর্তী গবেষকদের কাছে ধরা পড়ে গেছে।

এরেনবুর্গ যে দেশে বাস করেন, যে মতবাদে তিনি বিশ্বাস করেন, সেই দেশের ব্যবস্থা ও মতবাদ আত্মজীবনী রচনায় অবৈকল্য ও অকপটের পক্ষে সহায়ক বলে আমি মনে করি না। মার্কসবাদী বা সোভিয়েট নাগরিক মাত্রেই মিথ্যাবাদী এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য এই কথা বলা যে, যে দেশের ইতিহাস বারবার পুনর্লিখিত হয়, কোন সংস্করণে একজন প্রাধান্য পায়, অন্য কোন সংস্করণের নির্ঘণ্টে তার নাম পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না সে দেশে আত্মজীবনী-রচনার সততা বজায় রাখা কঠিন কর্ম যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষত রাষ্ট্র যখন বিশেষ মতবাদে বিশ্বাস করে এবং সেই মতবাদে দীক্ষা নেওয়া যখন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে আন্তরিক না হলেও আবশ্যিক হয়ে ওঠে তখন আত্মচরিত-রচয়িতার কাজ শুধু আত্মপক্ষ সমর্থন করেই ক্ষান্ত হয় না, তার কাজ হয়ে ওঠে দেশের ব্যবস্থা ও মতবাদকেও সমর্থন। শুধু আত্মপক্ষ সমর্থনেই যেখানে কাপট্যের সম্ভাবনা, সেখানে রাষ্ট্রনীতি বা বিশিষ্ট মতবাদকে সমর্থন করতে গেলে সততার সম্ভাবনা আরো সীমাবদ্ধ হয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, আত্মজীবনী সাহিত্যের অন্যতম শাখা। সাহিত্যের জনক স্বাধীনতা। সাহিত্যিক নিজের উপলব্ধিকে প্রকাশ করার সময় দুটি শব্দের মধ্যে সব চেয়ে সঙ্গত শব্দটিকে নির্বাচন করার সম্পূর্ণ স্বাধিকার দাবী করেন। দুটি শব্দের মধ্যে এই নির্বাচনের স্বাধীনতা আসলে সত্য ও অর্ধ-সত্য বা মিথ্যার মধ্যে নির্বাচনের স্বাধীনতা। যেখানে সেই স্বাধীনতা নেই সেখানে সত্য অপ্রকাশিত থাকে, সুন্দর সাহিত্যও রচিত হয় না। স্বাধীনতার এই তাৎপর্য এরেনবুর্গ জানেন— সুতরো বয়স বয়সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি প্রথম এবং চিরদিনের জন্যে বুঝেছিলেন স্বাধীনতার অর্থ ভাইনে-বাঁয়ে যেদিকে খুশি যেতে পারার অধিকার। অথচ স্টালিনশাসিত

কর্তৃপক্ষ এই অধিকার দিতেই অরাজি ছিলেন। এখনো যে সম্পূর্ণ রাজি তার কোন প্রমাণ নেই। অথচ ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকে খুশি যেতে পারার অধিকার আর দুটি সভ্যতা শব্দের মধ্যে একটিকে নির্বাচনের অধিকার আসলে একই অধিকার। শুধু যে ডাইনে-বাঁয়ে যাবার অধিকার ছিল না তাই নয়, কোনটি ডান কোনটি বাম চেনাও কঠিন ছিল— আজ যেটা ডান প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে দেখা যেতে পারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সেটা বাম হয়ে গেছে। এই দুঃস্বপ্নময় ত্রাসরোধকারী পরিবেশে বাস করে মহৎ আত্মজীবনী রচনার উপযুক্ত অবৈকল্য ও সততা বজায় রাখা কঠিন। এবং সে কথা প্রকারান্তরে এরেনবুর্গ স্বীকার করেছেন। সম্পূর্ণ সততা যে এ বিষাক্ত পরিবেশে সম্ভব নয় এই কথা স্বীকার করে এরেনবুর্গ যে সততার পরিচয় দিয়েছেন তাতেই তাঁর আত্মচরিতের এই প্রথম খণ্ড অনেক পরিমাণে মর্যাদা পেয়েছে।

আত্মচরিত রচনায় স্মৃতিকে সাহায্য করে পুরোনো চিঠি, বিগত দিনগুলির রোজনামচা ইত্যাদি। কিন্তু এরেনবুর্গের ক্ষেত্রে 'letters tended to be destroyed rather than preserved'। যদিও এই বাক্যটিকে লেখক ব্যাখ্যা করেন নি, শুধু এই অব্যাখ্যাত পংক্তিটির মর্ম অনুমান করে নেওয়া কঠিন নয়। নানাদেশে ভ্রাম্যমাণ এরেনবুর্গের যাযাবরবৃত্তির জন্যই যে শুধু বন্ধুদের পুরোনো চিঠিগুলি নষ্ট হয়েছে তা নয়, কেননা মহাগুম্ফির তাণ্ডবের দিনে যে সব বাড়ন সরকারী কোপদৃষ্টিতে পড়েছে তাদের চিঠিপত্র রক্ষা করা বিপজ্জনক। কে জানে কোন চিঠি কার বিরুদ্ধে কখন দলিলরূপে ব্যবহৃত হবে, কে জানে কোন চিঠি রাখার জন্য ভোর রাত্রে কার দরজায় গোপন পুলিসের কালাঙ্গুক করা নেড়ে উঠবে। সুতরাং স্মৃতি-সহায়ক সেই চিঠিগুলি নেই, রোজনামচাও নেই। অথচ স্মৃতিও অসৎ। অসৎ শুধু এইজন্য নয় যে দুর্বল স্মৃতি অর্ধ-শতাব্দী পরে অনেক কিছুই ভুলে বসে আছে, অসৎ এই কারণেও যে স্মৃতি মেজাজ প্রয়োজনে অনেক কিছুকে ভুলে যেতে অর্থাৎ গোপন করতে বাধ্য হয়েছে—'Forgetfulness was sometimes dictated by a sense of self-preservation'। আত্ম-রক্ষারও প্রয়োজনে স্মৃতি বিস্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সেইজন্যই বোধহয় বিপ্লবাত্মক প্রচারকর্মে লিপ্ত থাকার জন্য সত্তরো বছর বয়সে যখন তিনি গ্রেপ্তার হন তখন তাঁর সহকর্মীদের অনেকের নাম উল্লেখ করলেও তিনি নিকোলাই বুখারিনের নাম উল্লেখ করেন নি— বোধহয় ক্রুশ্চেভ-তন্ত্র এখনো সেই মৃতের পুনর্বাসনের কোন বন্দোবস্ত করে নি বলে। এরেনবুর্গ নিজেই স্বীকার করেছেন

এখনো সমস্যের কথা বলার সময় আসে নি। স্মৃতি আবশ্যিক প্রয়োজনে বিশ্লেষণাত্মক, চিঠিপত্র রোজনামচা নেই : এই স্মৃতিকে সাহায্য করেছে সরকারী মহাফেজখানার দলিল, ভারতবর্ষের আদলের ওপরের রিপোর্ট। আত্মচরিতের প্রথম খণ্ডে বিপ্লব-পূর্ব রুশদেশের কথা আছে. দ্বিতীয় খণ্ডে যখন বিপ্লবোত্তর রুশ দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের কথা এরেনবুর্গ লিখবেন তখন তিনি যে মহাফেজখানার দলিল থেকে তৎকালে সমস্যে ঐ পরিমাণে সাহায্য পাবেন এরকম মনে হয় না। তখন এরেনবুর্গের শিথিল-বিবেক স্মৃতিকে সাহায্য করবে কে?

আত্মচরিত রচনা করা কঠিন। কোথায় আত্মচরিত শেষ হয় আর উপন্যাস আরম্ভ হয় তার সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা অসম্ভব। এরেনবুর্গের পরিবেশে আত্মচরিত রচনা আরো কঠিন। শিল্পতীর্থ ইটালিতে প্রথমকালে তরুণ এরেনবুর্গ উপলব্ধি করেছিলেন বহৎ শিল্পীর শিল্পরচনার পথে বিস্ত প্রয়োজন— সেই বিস্ত থেকেই অনেককিছুর কথার মহাব্রতে শিল্পীর যাত্রাযাত্রার সূত্রপাত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এরেনবুর্গ বহৎ শিল্পী নন, বিস্ত তাকে পীড়িত করেছে কিন্তু বিস্তকে জয় করার মত অসামান্য শক্তি তাঁর ছিলো না। সোভিয়েট-উত্তর যুগের কোন রুশ শিল্পী এখনো পর্যন্ত পরিবেশের বিস্তকে অতিক্রম করার মত বহৎ সামর্থ্যের পরিচয় দিতে পারেন নি—মায়াকভস্কি না, পাস্তেরনাকও না। বিস্তকে অতিক্রম করতে পারেন নি, কখনো কখনো বিস্তকে তিনি মেনে নিয়েছেন, জেনেও এই আত্মচরিতের জন্য আমরা লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ হতে পারি। অন্য একজন আত্মচরিত-রচয়িতার সম্বন্ধে এরেনবুর্গ যেকথা বলেছেন সে কথা তাঁর সম্বন্ধেও খাটে : It is a good thing that he wrote a book of memories : history is full of gorges and abysses and men have need of bridges, however fragile, to link one epoch with another'। এরেনবুর্গের আত্মচরিতও দুই যুগ, দুই সমস্যের মধ্যে স্মৃতির ভঙ্গুর সেতু রচনা করে। দুই যুগের প্রথম যুগের বর্ণনা এই খণ্ডটিতে পাই—কোন যুদ্ধের স্মৃতি তাদের বিস্তৃত করে নি. ফরাসী ইমপ্রেশনিস্টদের পুনা কলকেতে আন্তর্জাতিক নব্যশিল্পী-সম্প্রদায় নূতন শিল্প-আন্দোলনের নান্দীপাঠ আরম্ভ করেছিলেন— এমন সময় প্রথম মহাযুদ্ধের গোলাবর্ষণের শব্দে ও রুশ-বিপ্লবের ঘনঘোরে সেই যুগ সমাপ্ত হলো। অন্য খণ্ডগুলির জন্য রইলো যুদ্ধে-যুদ্ধে-রাষ্ট্রবিপ্লবে ক্ষতবিক্ষত আমাদের শতাব্দী, সার্বভৌম কলের সমস্যাকীর্ণ আমাদের পৃথিবী। কৃতজ্ঞতার দ্বিতীয় একটি কারণও আছে। এক-

নায়কতন্ত্রের শাসনে, এক মতবাদের [redacted], শেষাগত স্বাধীনতার অভাবে, শিল্পীর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, যে সংশয়, যে আত্মবিরোধ, যন্ত্রণা তার একটি নির্ভুল দলিল এই আত্মচরিত— যদিও প্রথম খণ্ডে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবনকথা রয়েছে। বর্তমান শতাব্দীতে শিল্পীর সংকট সম্বন্ধে যিনি পর্যালোচনা করবেন তাঁর কাছে এই গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান বলে মনে হবে।

দুই

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, যখন আমার অধ্যে রক্তকণিকার অধিকা ছিল তখন এরেনবুর্গের পারীর পতন ও পরবর্তী উপন্যাসগুলি আমি পড়েছিলাম। অবশ্য যখন তাঁর বয়কলার গল্প বেরুলো তখন আমি রক্তাল্পতায় ভুগতে শুরু করেছি। যাবতীয় সব কয়টি উপন্যাসেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম এরেনবুর্গ যখন রুশদেশের ছবি আঁকেন তখন তা সাংবাদিকতার উর্ধ্বে যায় না, কিন্তু ফরাসীদেশ, বিশেষত পারীর বর্ণনায় সহসা যেন তাঁর লেখনী প্রাণ পায়। আত্মচরিতের প্রথম খণ্ডে নবম পরিচ্ছেদ থেকে পারী নগরে লেখকের নির্বাসিত জীবনের বর্ণনা। এবং সতেরো থেকে ছাব্বিশ বছর, জীবনের সব চেয়ে মূল্যবান সময়ে পারী নগরী যে প্রণয়চিহ্ন এই লেখকের উপর মুদ্রিত করে দিয়েছিল তা এরেনবুর্গ কোনদিন মুছে ফেলতে পারেন নি।

যে শিল্পী সংশয়ের মধ্য দিয়ে সামঞ্জস্য অর্জন করেন তিনি বড় শিল্পী, কিন্তু একেবারে অসংশয়িত শিল্পী হওয়ার চেয়ে বোধহয় সংশয়গ্রস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বপীড়িত শিল্পী হওয়া ভালো। এরেনবুর্গ সেই অন্তর্দ্বন্দ্বপীড়িত শিল্পী যিনি মহৎ শিল্পীর সামঞ্জস্য পরিণামে অর্জন করতে পারেন নি। তাঁর আত্মবিরোধের রশ্মিঃপ্রতীক একদিকে মস্কো নগর, অন্য দিকে পারী নগরী। একদিকে তাঁর রুশদেশের প্রতি আনুগত্য, অন্যদিকে তিনি ইহুদি পরিবারের সন্তান— যে ইহুদিদের উপর নিষ্ঠুর উৎপীড়নের ইতিহাসে রুশদেশও বিরল নয়। একদিকে বিপ্লবী মতবাদ ও কর্মের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিল্পসাহিত্যের প্রতি অনুরাগে তাঁর আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। একদিকে রুশ জাতীয়তাবোধ, অন্যদিকে শিল্পীর সর্বজাতীয়তাবোধ। এমন কি যুক্তি দিয়ে যে সাম্যবাদকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন সেই সাম্যবাদের প্রতি আনুগত্যেও তাঁর অভাব দিখা আছে। রুশ নির্বাসিতদের, লাল বা সাদা যাই হোক, মত এরেনবুর্গ একদিকে পারী নগরীর স্বাধীনতাকে বাতাসের মত আকণ্ঠ

পান করেছেন, অন্যদিকে জন্মভূমির জন্য তীব্র নস্টালজিয়া অনুভব করেছেন।

প্যারী নগরীতে প্রথম দিনে শিল্পীসত্তার দরিদ্র তরুণ ফল মুরকের মনে হয়েছিল সে যেন এক উৎসব-মুখর রঙ্গশালায় এসে উপস্থিত হয়েছে। অর্ধ-শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও প্যারীর যৌবনে দেখা রাস্তাগুলির প্রতি এয়েন-মুরের মমতা এতটুকুও হ্রাস পায় নি। সেই মুরক শুচিতর-পরিপূর্ণ সন্দেহসংকুল মন্ত্রো থেকে প্যারীতে এসে অবাক হয়ে গিয়েছিল, এখানে সহজেই অজ্ঞাতবাস করা যায়, কারো কথা নিয়ে অন্য কেউ মাথা ঘামায় না। কাফে-তে আড্ডা দিয়ে, অনাহারে, কবিতারচনার চেষ্টায় যৌবনবেদনাহুলের দিনগুলি কেটে গিয়েছিল। হঠাৎ যেদিন টাকা পাওয়া গেছে বন্ধুবান্ধবদের সংগ্রহ করে দীর্ঘকাল পরে গেটপুরে খেয়ে সে টাকা মুহূর্তে উড়িয়ে দেওয়া গেছে— সকাল না হলে ব্যাঙ্কের চেক ভাঙানো যাবে না, সুতরাং সারারাত ধরে পানাহার চালাও, সকালে একজন গেয়ে চেক ভাঙিয়ে দাম শোধ করে দেবে। রোডেঁাদে নামক তাদের আড্ডার কেন্দ্র কাফেতে সমকালের শিল্পীরা সব স্থির করে— পিকাসো আপোলো-নেয়ার, পিকাসো, মদিগ্‌লিয়ানি, মারাক্স্‌ভি, কক্‌তো, লেগার, শাগাল ইত্যাদি। কাফের গল্প আড্ডা রাজনীতিতে কেটে যায় যৌবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলি—কখনো বিপ্লবের, কখনো অন্তকালের স্বপ্ন দেখে। প্যারীর স্বাধীনতার কোন সীমা নেই —যে কোন পোষাকে যে কোন জায়গায় যাওয়াতে কোন নিষেধ নেই, বিশেষ দিনে আনন্দ শিল্পী নায়িকা অভ্যাগতকে নিয়ে পথে শোভাযাত্রা করতেও দুর্বৃদ্ধি করে না।

প্যারীনগরীতে এয়েনমুর্ণ মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন শিল্পে-সাহিত্যে, মস্কোতে তিনি মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন রাজনৈতিক কাজকর্মে। স্কুলের সেই ছাত্রটি, যে-প্রস্রাবাগারের নির্জনে ধূমপানের মৌলিক গঠনতান্ত্রিক অধিকার চর্চা করতো, দ্রুতপরিবর্তনশীল ক্ষণিক প্রেমিকাদের কাছে হৃদয় নিবেদন করতো এবং অন্ত-হৃদয়ের অভিনয়ে নিরতিশয় কাতর হতো, সে ইসথেটিক-বিলাসের দিনগুলি পিছনে ফেলে পরিণামে বলশেভিক দলে যোগদান করেছিল। তার কাজ ছিল সৈনাদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা, সৈনানিবাসে দলের সংগঠন গড়ে তোলা। এমনিভাবে এয়েনমুর্ণ হলেন বলশেভিক সংগঠক, প্রচারক, সাংবাদিক অথচ তিনি প্যারীতে এসে হলেন শিল্পী সাহিত্যিক। এই দুই সত্তার বিরোধ এয়েনমুর্ণ কোনকালে কাটে নি। স্বদেশী কেউ কেউ তাঁকে সমালোচনা করে

বলেছিলেন এরেনবুর্গের পক্ষে বাঁচা উচিত যে তিনি পারীর চেস্টনাট খাচ্ছেন না, খাচ্ছেন বাশিরান রুটি। আমার তো মনে হয় পাঠক হিসাবে আমাদের পরম সৌভাগ্য তিনি পারীর চেস্টনাট কিছু খেয়েছেন। এখন যদি কোনদিন আমি এরেনবুর্গের বহাকার উপন্যাসগুলি দ্বিতীয়বার পড়ি তবে বেছে বেছে পারীর বর্ণনার অংশগুলোই পড়বো, মস্কোর অংশগুলো অবশ্যই বাদ দিয়ে যাবো। পারী থেকে মস্কো এই ভৌগোলিক পরিবর্তনে মাত্র যিনি ছিলেন শিল্পী তিনি হয়ে যান প্রচারক; যিনি ছিলেন লেখক, তিনি হয়ে যান লেখকসংঘের সদস্য। 'I grew up in a dual light and have lived in it all my life, into my old age.'। তিনি উনিশ শতাব্দীর মানুষ, বিশ শতকের সঙ্গে বোঝা পড়া করতে চেয়েছেন, তিনি ইউরোপীয় হতে চেয়েছেন, তিনি সর্বজাতীয় কিন্তু জাতীয়তাবাদী হতে চেয়েছেন, মস্কো ও পারীতে একই সঙ্গে বাস করতে চেয়ে দুই নগরেই প্রবাসী জীবন যাপন করেছেন, একই সঙ্গে কম্যুনিস্ট ও শিল্পী হতে চেয়েছেন, কম্যুনিস্ট আচরণ সম্বন্ধে নানা সময়ে প্রতিবাদ করেছেন, কোন সময়ে মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি, লেনিন-স্ট্যালিন-ক্রুশ্চেভ স্তরের পরিবর্তনের রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে অক্ষত দেহে উত্তীর্ণ হয়েছেন সমসাময়িকের সঙ্গে সব সময় অল্পই পরিমাণে বোঝা-পড়া করে— এমনি ভাবে স্বৈতন্ত্রালোর বিরোধী প্রতাপ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এরেনবুর্গ অগ্রসর হয়েছেন। এই সব আত্মবিরোধ যত দুঃখজনকই হোক, এই আত্মবিরোধ মহান স্ট্যালিনের আশীর্বাদপুষ্ট নির্বিকল্প নির্বিরোধের চেয়ে অনেক ভালো।

সাহিত্যচিত্রভাস্কর্যে যে ঋতুপরিবর্তন যে রুচির রূপান্তর ঘটেছিল এই শতাব্দীর প্রথম দিকে তার আবর্তনের মধ্যে, সেই পরিবর্তনের নায়কদের সাহচর্য পাবার সৌভাগ্য এরেনবুর্গের হয়েছিল। পারী ও ইটালির চিত্রশালায় ঘুরে ঘুরে বহুৎ শিল্পের সঙ্গে তিনি স্পর্শাতুর তরুণ বয়সে পরিচিত হয়েছিলেন। ইটালির গির্জায় গির্জায় অতীতের মহান চিত্রাবলী দেখে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শিল্পের অমরত্বের একমাত্র অভিজ্ঞান উত্তরকালের ভালোবাসা— উত্তরকালের ভালোবাসাই সেই অপ্রাপ্ত উদ্ধারকর্তা যে যুগের চিত্রাবলীকে পুনরায় তাদের প্রাক্তন দীপ্তি ফিরিয়ে দেয়। শুধু প্রাচীনের শ্রেষ্ঠ অতীত সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নয়, পৃথিবীর শিল্পরাজধানী পারী নগরীতে বসে শিল্পী-সাহিত্যিক বন্ধুদের সাহচর্যে তিনি শিল্পের মৌলিকত্বের সঙ্গে, শিল্প-সাহিত্যের নূতন রুচির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে, সত্তা

সাংবাদিকতা রাজনৈতিক প্রচারের মোহে নিজেও কখনো কখনো মুগ্ধ হলেও তিনি সোভিয়েট সাহিত্য-শিল্পের নিষ্প্রাণ জড়ত্ব ও যান্ত্রিকতাকে সব সময় সহ্য করতে পারেন নি। সোভিয়েট সমাজ-বাস্তববাদী শিল্পের, ঝ্দানভ্-পন্থার পন্থী শিল্পের মৃঢ় দুরবস্থার দিকে তাকিয়ে এরেনবুর্গ তাই সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রথম যুগের শিক্ষামন্ত্রী শিল্পরসী লুনাচারস্কির উক্তি উদ্ধৃত করেন— 'So far as questions of form are concerned, the taste of the People's Commissar and all other representatives of authority must be left out of account. All persons and groups in art must be given freedom of development.' কিন্তু বিষয় আঙ্গিক সর্ববিষয়ে হস্তক্ষেপ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বেড়েছে, তার ফল হয়েছে শিল্প-সাহিত্যের যান্ত্রিচার। যদিও স্বয়ং গোর্কি বালশেভিকের রচনার মর্যাদা বুঝেছিলেন তবু নিতান্ত যান্ত্রিক মতবাদগত কারণে সোভিয়েট কোষগ্রন্থ তার প্রতি অবিচার করে। এবং এই হস্তক্ষেপ ও অবিচার যে আজো বন্ধ হয়েছে তার প্রমাণ নেই।

মনে পড়ে আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেই সময়ের কথা। যুক্তি-মতার প্রভাবে সেদিন সোভিয়েট উপন্যাস-কবিতার ইংরেজি অনুবাদ কম পড়ি নি। আজ সে সব উপন্যাসের নাম পর্যন্ত মনে নেই, সে সব কবিতার একটি ছত্রও মনে পড়ে না। তখনও সেই বর্ণহীন, নিষ্প্রাণ, অঙ্গহীন, সংগীতহীন, সমস্তাযুক্ত, যান্ত্রিক আশাবাদী রচনা পড়ে অভ্যস্ত হয়েছি, বিরক্ত করেছি, ঐ সব রচনার সমর্থকদের সঙ্গে তর্ক করেছি। লেডি মেবোর্ণ কলেজে সোভিয়েট চিত্রাবলীর প্রদর্শনী দেখে বিমূঢ় হয়েছিলাম— ক্যালেণ্ডারের মত মহলেপা সেই ছবিগুলোকে চিত্রকলার নিদর্শন বলে মনে হয় নি; আধুনিক ফোটোগ্রাফিতেও ওর চেয়ে বেশি শিল্পকৌশল থাকে। সুতরাং ঐ অবস্থায় যখন এরেনবুর্গের 'The Writer and his Craft' নামক পুস্তিকা আমাদের হাতে পড়লো তখন আমরা যে নিরবধি আনন্দ পেয়েছিলাম তা স্বাভাবিক ছিল। আমরা যে যে কারণে সোভিয়েট সাহিত্য ও শিল্পকে আক্রমণ করতে চেয়েছিলাম তার সব কয়টির সমর্থন পেলাম ঐ বিদ্রূপকুশলতায় পুস্তিকাটিতে। তিনি ঠাট্টা করে বললেন, সম্পাদক কিছু রুবল নতুন লেখকের হাতে গুঁজে দিল, চলে গেল লেখক তুষারাবৃত অঞ্চলে কিংবা সাইবেরিয়ার পতিত জমির উদ্ধারকার্য দেখতে, ছ-মাস পরে এনে হাজির করলো এক উপন্যাস, অভিজ্ঞতায় এবং বাস্তবতায় অভি-ষিক্ত। তিনি প্রশ্ন তুললেন কেন কাপড়ের কলের কর্মীরা এখনো আনা

কারেনিনা পড়ে চোখের জল ফেলে, কিন্তু আমরা সহকর্মিণীকে নিয়ে লেখা আধুনিক সোভিয়েট উপন্যাস পড়ে ফেলে না। কী সেই শক্তি যা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সত্ত্বেও টলস্টয়ের রচনাবলীকে বাঁচিয়ে রেখেছে? সেই শক্তি সেই উত্তরকালের শাশ্বতকালের প্রেম যা ইটালির চিত্রাবলীকেও যুগের পর যুগ উজ্জ্বল করে রেখেছে। লেডি ব্রেবোর্ণ আলেজের প্রদর্শনীতে যে সব ছবি আমরা দেখেছিলাম বোধহয় সেই সব ছবি দেখেই এরেনবুর্গ-বন্ধু ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য পিকাসো সোভিয়েট শিল্পীকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'you ought to rationalise the production of paint. At your factories they should manufacture mixed colours and label the tubes 'for the face', 'for hair', 'for military uniform'. That would be much more practical.' আত্মচরিতে পিকাসোর এই উক্তিটিকে উদ্ধৃত করে সোভিয়েট চিত্রকলার প্রতি পিকাসোর সমালোচনাকে এরেনবুর্গ সমর্থন করেছেন। 'What I love today is not the machine but that unique, unrepeatable living quality that distinguishes one tree from another.'

কিন্তু এরেনবুর্গ যখন শিল্প সম্বন্ধে নিজের উপলব্ধির কথা বলেন, যখন তিনি সোভিয়েট শিল্পসাহিত্য সম্বন্ধে বিরূপ-প্রখর সমালোচনা করেন তখন আমাদের তিনটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। প্রকৃত শিল্পী ও শিল্পের পরিবেশ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সত্ত্বেও, সোভিয়েট শিল্পের অন্ধ যান্ত্রিকতাকে সমালোচনা করা সত্ত্বেও পারীর পত্তন থেকে এরেনবুর্গের উপন্যাসে সেই যান্ত্রিকতা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। যে অপরাধে তিনি অন্যকে সমালোচনা করেন সে অপরাধে তিনি নিজেও অপরাধী। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের বা দলের সঙ্গে যখন শিল্পমত কোন কারণে কোন শিল্পীর বিরোধ দেখা দিয়েছে, শিল্পীর উপর যখন সামূহিক ক্রোধের খড়্গ নেমে এসেছে তখন প্রায়শই এরেনবুর্গ দায়িত্ব এড়িয়ে স্বীয় গাত্রচর্ম বাঁচিয়েছেন। তৃতীয়ত, সোভিয়েট শিল্পের যান্ত্রিকতা সাম্যবাদী দর্শনের অনিবার্য ফল, না এই যান্ত্রিকতা একটি সাময়িক দুর্ঘটনা এ প্রশ্ন এরেনবুর্গ উত্থাপিত পুস্তিকাটিতে বা আত্মচরিতে কখনো উত্থাপন করেন নি। এই মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন তিনি না করায় এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি কী বলতেন তা জানার সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। ব্যক্তিপূজা, স্ট্যালিনের আমলের অকথ্য অত্যাচার, হত্যাকাণ্ড, শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে নির্মম অসহিষ্ণুতা, এ সবই কি সাম্যবাদী রাষ্ট্র-

ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী অনুধাবনীয় হল, না ঐসব দুঃস্বপ্ন নিতান্ত সাময়িক উন্মার্গ-গামিতা, শুভবুদ্ধির প্রভাবে যা অবশেষে দূরীভূত হয়ে যাবে। এরেনবুর্গের আত্মজীবনী পাঠকের মনে বারবার এই প্রশ্ন জাগায়, কিন্তু এরেনবুর্গ সে প্রশ্ন তোলেন না, উত্তরও স্বভাবতই দেন না।

তিন

এই আত্মজীবনী রচনায় এরেনবুর্গের উদ্দেশ্য শুধু নিজের জীবনের পরিচয় দেওয়া নয়, অতীত-বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করা নয়, শুধু আত্মপক্ষ-সমর্থন করাও নয়, তার আরো উদ্দেশ্য 'to bring to life some petrifications of the past with loving eyes'। সব কিছু ব্যর্থতা ও অপচয় সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করেন— কেননা, এই শতাব্দীর চেহারা পরিবর্তিত করে দিয়েছেন যে সব কীর্তিমান মানুষ তাঁদের অনেকেই তাঁর পরিচিত, কেউ কেউ তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধব ছিলেন। সেই মানুষের জীবন্ত চরিত্র-চিত্রশালা রচনা করাও এই আত্মচরিতের অন্যতম উদ্দেশ্য। কেউ কেউ তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাতনামা, কেউ কেউ তত্তো পরিমাণে বিখ্যাত নন।

অ্যালেক্সি টলস্টয়— তাঁরও কাছে প্যারী নগরী এরেনবুর্গের মতই প্রিয় ছিল। সামান্য পরিচয়েই এই রহস্যময়ী নগরীর মর্মস্থানের কম্পন তিনি ধরতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অকস্মাৎ দেখে পড়ে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করার চিত্র এরেনবুর্গের লেখনী জীবন্ত করে তুলেছে। প্যারীর শিল্পকেন্দ্রে মেক্সিকো-দেশীয় শিল্পী রিভেরা এনেছিলেন দূর পৃথিবীর এক বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের স্বাদ। স্বরলক্ষরণরত রিভেরা কবিতাপংক্তি-উচ্চারণে রত টলস্টয়ের মতোই বিরলরেখার জীবন্তরূপে চিত্রিত। ফরাসীশিল্পী লেগার, ইটালিদেশীয় শিল্পী মদিগ্লিয়ানিও এখানে উপস্থিত। মদিগ্ল্ আল্প্স প্রদেশের ভবিষ্যৎবাণী ঘোষণা করে, কাফের সিঁড়িতে বসে গাছে বা বোদলেয়ার বা র‍্যাঁবোর কবিতা আওড়ায়। মদিগ্লের অবক্ষয়ী জীবন, তার মৃত্যু, প্রেমিকার আত্মহত্যা সব আশ্চর্য অনুকম্পার সঙ্গে এরেনবুর্গ বর্ণনা করেছেন। আজ মদিগ্লের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ হয় পৃথিবীর যত খ্যাতনামা চিত্রশালায়, মুখোমুখি। একই কাফেতে এসে জোটে স্পেনদেশীয় শিল্পী পিকাসো। পিকাসোর চিত্ররচনায়, এরেনবুর্গের মার্কিনতা কম, কেননা সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে এই শতাব্দীর সব চেয়ে বিপ্লবী ও বিস্ময়কর এই শিল্পীকে মাপা যায় না, তাঁর জটিলতা আত্মবিরোধে পূর্ণ বলে

প্রতীয়মান হয়। অপর পক্ষে জোলেশিনের অপূর্ব চিত্রটি দামান্ত রেখায় অসামান্ত ভালোবাসায় আঁকা। যে এরেনবুর্গ জীবনে অনেক কলুষ, বিষ্ঠার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন তিনি যৌবনের এই বান্ধবটির চরিত্রচিত্র অঙ্কন করতে বসে বলেন, আমরা যারা তাকে জানতাম, তারা যখন তার কথা ভাবি তখন কখনো কৌতুক বোধ করি, কখনো অভিভূত হই, কিন্তু কখনো কলুষিত বোধ করি না— এটা কম কথা নয়।

শুধু শিল্পী বন্ধুবান্ধবের ছবি নয়। রুশ দেশের শৈশব ও নারীর নব-যৌবনকালের পরিমণ্ডল এই আত্মজীবনীতে এরেনবুর্গ সুস্পষ্ট লেখনীতে রূপায়িত করেছেন। বাবা ও মায়ের কথা, সেই কাকার কথা যার আচরণ অভিভাবকসুলভ ছিল না, আনন্দ যেন যার ছবি যে এই বালককে দেখাতো; সেই মদ তৈরীর কারখানা যেখানে তাঁর বাবা কর্মচারী ছিল, মস্কোর পথঘাটের কথা। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানেরা প্রচণ্ড শীতের মধ্যে অপেরার বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করতো অপেরাদীর আশায়। এরেনবুর্গের রচনায় যখন ফেরিওয়ালার ডাকের কথা বা ঘোড়ায়-টানা ট্রাম গাড়ির কথা পড়ি তখন অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির কথা মনে পড়ে যায়। সমবয়সী স্কুলের বন্ধুদের কথা, লম্বা চুলওয়ালা আদুথালু পোষাক পরা সেই সব তরুণদের কথা যারা অতি-প্রগতির কথা বলে মেয়েদের স্তম্ভিত করে দিতে ভালো বাসতো, তর্ক করতো, বন্ধুত্ব করতো।

প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভকালে এরেনবুর্গ ইতালীতে ছিলেন। সেই ইতালী থেকে প্যারীতে তাঁর প্রত্যাবর্তনের বিবরণ পাই। মহাযুদ্ধ-আরম্ভে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখি তাতে সেই যুদ্ধের ঘটনা কত সুদূরের ব্যাপার বলে আজ মনে হয়— মনেই হয় না, মাত্র অর্ধশতাব্দীর দূরত্বের ব্যাপার। কাফেতে, থিয়েটারে গান শোনা যেতো সর্বক্ষণ— যুদ্ধের স্বরূপ তখনো কেউ বুঝতে পারে নি। এই পৃষ্ঠাগুলি পড়ার সময় আমার চার্চিলের আত্মচরিতের প্রথমে মহাযুদ্ধের আরম্ভকালের বর্ণনা মনে পড়ছিল। দুই জনের বিবরণের মধ্যে নিকট সাদৃশ্য আছে। সৈন্যদের বেল্জিয়মে ছিল ডালিয়া আর অ্যাস্টার ফুল। পঞ্চাশ মাইল দূরে যুদ্ধ চলছে কিন্তু প্যারী নগরীর জীবন তাতে বড় বেশি বিচলিত নয়। পরে সাংবাদিক হিসাবে এরেনবুর্গ যখন যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি উপস্থিত হয়েছিলেন তখনই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তার বীভৎসতা, অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। ট্রেঞ্চের মধ্যে বন্দুকের নির্মম সঙ্গীন তাঁকে অভিভূত করেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলো, রুশবিপ্লবের খবর এসে পৌঁছুলো ; নয় বছর পশ্চিমে বাসন করার পর লণ্ডন, এবারডিন, স্টকহোম হয়ে এরেনবুর্গ স্বদেশে ফিরলেন। এখানেই প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হলো।

চার

আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি, দেকার্তের এই বিখ্যাত সিদ্ধান্তকে উল্টে নিয়ে এরেনবুর্গ বলেন চিন্তা করতে পারার আগে বেঁচে থাকা দরকার। যে দশকগুলি ঘষা দিয়ে এরেনবুর্গের সমসাময়িককালের মানুষদের জীবন কেটেছে সেই দশকগুলিতে অস্তিত্ব বজায় রাখাই এক দুরূহ সমস্যা ছিল সমস্ত পৃথিবীতেই। রুশদেশে, জারতন্ত্রের আমলে, গৃহযুদ্ধে, অন্তর্বিপ্লবে, নেকড়ের সংগ্রামে, ষ্ট্যালিন-পন্থী শুদ্ধির তাণ্ডবে সেই অস্তিত্বের সমস্যা ছিল দুরূহতর। রাষ্ট্রশক্তির পেষণে বা সেই পেষণ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আত্মহত্যার পথে এরেনবুর্গ যত বন্ধু হারিয়েছেন অন্য কোন শিল্পী তত বন্ধু হারিয়েছেন কিনা সন্দেহ। সেই সমস্ত দুর্ভাগা বন্ধুর তালিকা পড়লে এরেনবুর্গকে শ্রীস্টাবেল তবিতার সেই একক নিঃসঙ্গ বাতাসে মৃদু আন্দোলিত পিঙ্গল পত্রটির সঙ্গে তুলনীয় মনে হয়, যার সকল সঙ্গী শীতের আঘাতে বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই আত্মজীবনীর পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে প্রায়ই একটি বাক্য পাই—'I never saw him again'। যে হারিয়ে গেল সে শুধু জনারণ্যে হারিয়ে গেল না, কোন এক সর্বগ্রাসী অমানুষিক ক্ষুধার গ্রাসে সে চিরকালের জন্য শূন্যতায় তলিয়ে গেল। এই মৌন-শূন্যিক বাক্যটি একটি বিশ্ব গানের ধুয়ার মত বারবার ফিরে এসে পাঠককে বিষাদগ্রস্ত করে দেয়।

এই সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষুধার স্বাপিত মুখের সামনে দাঁড়িয়ে, এরেনবুর্গ নিজেই স্বীকার করেছেন, পোষাক বদলানোর মত অসংখ্যবার তাঁকে গায়ের চামড়া বদলাতে হয়েছে, কোন কোন প্রাণীর মত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে হয়েছে। তিনি অবশ্য দাবী করেন পোষাকের মত গায়ের চামড়া যতোই তিনি পরিবর্তন করুন—'still he does not change his heart : he has but one'. কিন্তু এরেনবুর্গের বিরুদ্ধে পোষাক পরিবর্তনের অভিযোগ, মৌনের এবং প্রয়োজনমত চালাকির আশ্রয় নেবার অভিযোগ করার সময় আমাদের সেই ওস্তের-অনুষিত সংশয়সঙ্কুল পরিবেশের কথা স্মরণে রাখা দরকার, যে পরিবেশে মৃত্যু বা নির্বাসন অতর্কিতে সামনে এসে দাঁড়াতে পারে। এরেনবুর্গের গায়ে প্রথম যিনি ঢিলটি ছুঁড়ে

মানুষের তাঁর নিজেকে এই প্রশ্ন করা দরকার যে অনুরূপ অবস্থায় তিনি কি অধিকতর সাহসের পরিচয় দিতে পারতেন। বিবেকবান মানুষের পক্ষে এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া খুবই কঠিন।

একথা নিশ্চিত যে চিন্তা করার জন্য যাঁহার প্রয়োজনে এরেনবুর্গ কখনো কখনো মৌন বা অর্ধসত্যের আশ্রয় নিয়েছেন, বিবেকের বিরুদ্ধে, প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করেছেন ; বেশ কিছু কালিমায় যে তাঁর হাত লিপ্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেখানে তাঁর বুদ্ধিজীবী বান্ধবেরা কেউই প্রায় বাঁচেনি সেখানে কী করে তিনি বেঁচে গেলেন। কারো মতে স্ট্যালিনের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ তাঁর জীবনরক্ষার জন্য দায়ী। কিন্তু বহুজনের মৃত্যুতে যে স্ট্যালিন বিচলিত হননি তিনি সহসা এরেনবুর্গের জন্য এতো উৎকণ্ঠিত হলেন কেন ? একি স্ট্যালিনের কোন রাজকীয় খেয়াল, একজনকে বাঁচিয়ে রেখে ঘুষিয়ে দিলেন বাঁচিয়ে না রাখা তাঁর পক্ষে কতোই সহজ, অথবা স্ট্যালিনের রক্ষাকবচ অর্জনের বিনিময়ে এরেনবুর্গ আত্মবিক্রয় করেছিলেন। যদি দ্বিতীয় সম্ভাবনা সত্য হয় তবে এরেনবুর্গ শুধু প্রাণের দায়ে গায়ের চামড়া পাল্টান নি— তিনি তাঁর হৃদয়, একমাত্র হৃদয় পর্যন্ত বদল করেছেন। বিবেক হারিয়ে বেঁচে থাকার মত অসম্মান আর কিছুতে নেই। তাই অন্য সকলের যেখানে মৃত্যু হলো সেখানে তিনি কেন এখনো জীবিত তার জন্য এরেনবুর্গকে কৈফিয়ৎ তৈরি করতে হয়— এর চেয়ে করুণ আর কী হতে পারে। তাঁর সেই কৈফিয়ৎ— "there are times when the fate of a man is not like a game of chess played according to rule but like a lottery." যারা যারা গেছে তারা জীবন লুয়ার ভুল নম্বর কিনেছিল, এরেনবুর্গ সেই লুয়ার ঠিক নম্বরটি কিনেছিলেন তাই তিনি আজ জীবিত। উপমাটি যদিও চমৎকার তবু বোধহয় এইটিই শেষকথা বা সার কথা নয়। তাঁর বিবেক যদি সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক হতো তবে তিনি মহৎ মানুষ এবং বোধহয় মহৎ শিল্পী হতেন কিন্তু সেক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, তিনি বোধহয় বেঁচে থাকতেন না, এবং তিনি বেঁচে না থাকলে আমরা এই আত্মচরিতটি পেতাম না। আত্মচরিতটি হস্তগত না হলে বর্তমান শতাব্দীতে শিল্পীর, বিশেষত কমিউনিষ্ট শিল্পীর যে সংকট, যে শেষহীন আত্মপীড়া তার অনেকটা আমাদের অজ্ঞাত থেকে যেত।*

* মাকসীবাদ ও কী-অর্থে তিনি এরেনবুর্গের আত্মচরিত People and Life-এর অনুবাদ করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও বাংলাদেশ

সুধীর চক্রবর্তী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের দু বছর পরে জন্মেছিলেন কিন্তু বিদায় নিয়েছিলেন রবীন্দ্রতিরোধানের আটাশ বছর আগে। রবীন্দ্রপ্রতিভার বিচিত্র ও বহুমুখী সূচনাটুকু তিনি দেখে গিয়েছিলেন, তাঁর বিশ্বতোমুখ মূর্তি দেখে যান নি। অথচ রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী মন দ্বিজেন্দ্রলালের জীবিতকালেই দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার স্বকীয় সৌন্দর্য সম্পর্কে মুখর হয়েছিল। কিন্তু আজ, উভয় কবির তিরোধানের অনেকদিন পরে, বাংলাদেশের লোক এই দুই বাগ্বিভাবককে এক অলীক অন্তর্যুদ্ধের মুখোমুখি প্রতিপক্ষ হিসাবে জানেন। আর যেহেতু বর্তমান বাংলাদেশের জনচিত্ত রবীন্দ্রনাথের ঘরে আন্তর ও উদ্বুদ্ধ অতএব দ্বিজেন্দ্রলালের ভূমিকা সেখানে বৃহৎ সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত একটি অমার্জনীয় কলঙ্করেখার মত। কিন্তু এই মন্তব্যগোর ভবিষ্যৎ বোধহয় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাপ্য ছিল না। কারণ তাঁর বাগ্বিসাধনা ছিল বঙ্গ-ভারতীর পূজার নামান্তর, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধের তিনি ছিলেন তেজস্বী প্রচারক এবং সবচেয়ে বড় কথা তাঁর এমন অনন্যতা প্রতিভা ছিল যা রবীন্দ্রনাথের বাগ্বিলাসকে নিষেধিত না-করে অহংবাদী স্বকীয়তার এক স্থায়ী পরিমণ্ডল পরবর্তীকালের বাঙালীদের জন্য রেখে গেছে। রবীন্দ্রনাথের সন্ন্যাসাটী মূর্তির পাশে দ্বিজেন্দ্রলালকে তাই একলব্য বলতে ইচ্ছে করে এবং আশ্চর্য, একলব্যের মতই তিনি একনিষ্ঠ কিন্তু চরমপন্থী, প্রতিভাবর কিন্তু সকরুণভাবে অর্থপথে নিঃসেবিত। তাঁর কবিমানসের গভীরে কোন পূর্বসূরী সাহিত্যকর্মীর প্রভাব ছিল কিনা তার কোন প্রত্যক্ষ খবর পাওয়া যায় নি। একটি বিশেষ দেশকালের রহস্যময় নির্জনতায় এক চিরন্তন সৌন্দর্যদেবতাকে তিনি গুরু বলে হৃদয়ে নিরুচ্চারে রেখেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের কোন সাহচর্যের সঙ্গে তাই দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবরীতি ও রচনারীতির কোন মিল নেই। এই বক্তব্যের অনুসরণে তাঁর লেখা একটি কাব্যাংশ দেখা যাক :

চল যাই প্রিয় সখে চল যাই বনে।
জীবনের যত জ্বালা জুড়াব বিজনে।

আহরিব বন-ফলে, বল্কল পরিয়ে যে
স্বভাবের শোভা যত হেরিব নয়নে।

কাননসুখ | আর্যগাথা

এই চারটি পংক্তির অন্তরাল থেকে বিহারীলাল চক্রবর্তীর মুখ অনেক কাব্যোৎসাহী হয়ত সহজেই আবিষ্কার করবেন। কিন্তু তিনি অচিরেই প্রতারিত হবেন কেননা আর্যগাথার প্রকাশিত আরেকটি কবিতায় হয়ত পাওয়া যাবে হেমচন্দ্রের অনুরণি কিংবা হিন্দুমেলার গানের আক্ষরিক সংবাদ। কিন্তু সে সব প্রভাব থেকে নিস্তার করা যাবে না যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিমানসে সত্যিই ঐসব কবির কোন প্রভাব আছে। কেননা এর পরেই কাব্যোৎসাহী দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় দেখবেন :

কি গো! তুমি কে আবার! বলি কোথা হতে?
কি চাও?—কি মনে ক'রে এ বিশ্বজগতে?
এই ধর্ম, এই অন্ধ অর্থলোলুপতা,
এই স্বার্থ; এই মায়া, এই মিথ্যা কথা,
এই ঈর্ষা-দ্বেষ-ভরা নীচ মর্তভূমি
মাঝখানে বলি—ওগো কে আবার তুমি? আলেখ্য | মন্ত্র

এইসব ব্যঞ্জনাহীন প্রত্যক্ষত অকাব্যিক শব্দ, এমন স্থিতিস্থাপক ছন্দ সর্বোপরি রহস্যময় এক মুখভঙ্গী এই কাব্যাংশে পরিষ্কার দেখা যায়, যার সঙ্গে আমাদের বাংলা সাহিত্যের কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই এর উপভোগ্যতা। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন ওঠা অবশ্য স্বাভাবিক যে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কাব্যভাষাকে এমন ব্যঞ্জনাহীন ও গদ্যাত্মক করলেন কেন? বর্তমান কালের একজন প্রাবন্ধিক এ প্রশ্নের সংগত উত্তর দিয়েছেন: 'তাঁর ভাষায় ব্যঞ্জনাশক্তির অভাব আছে এবং সে-অভাবকে অভাব না বলে স্বভাব বলাই সঙ্গত'। (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা: ভবতোষ দত্ত। দেশ, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৬৩) আসলে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্বভাবের দাস। শুধু নিজস্বভাবের নয়, সব কিছুর, পৃথিবীতে যা কিছু Natural। কৃত্রিমতার এত বড় শত্রু আর দেখা যায় না। তিনি নিজেই তো একটি কবিতায় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, 'স্বভাবের শোভা যত হেরিব নয়নে'। স্বভাবের এই শোভাময় মূর্তি তাঁর কবিতায় ও গানে বেশ ফুটেছে। 'তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে'— এর চেয়ে স্বাভাবিক অথচ শোভাময় বর্ণনা আর কোথায় আছে?

কিন্তু মুস্কিল যে, কাব্যক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার অনুগান বেশিক্ষণ চলে না। কারণ কাব্য-পাঠক কবিতার মধ্যে চান উত্তরণ, স্বাভাবিকতা থেকে উত্তরণ। হয়ত অতীন্দ্রিয়তার বিচিত্র স্বপ্নাচ্ছন্নতায়, কিংবা অনুভূতির অবচ্ছ কান্তারে। শুধু বর্ণনায় মন ভরে না, শুধু উচ্ছ্বাসে হৃদয় শান্ত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন :

ফুল ফুটেছে চাঁদ উঠেছে আসছে ভেসে মলয় বায়
সাদা সাদা মেঘগুলি ঐ যাচ্ছে ভেসে নীলিমায়।

পাঠক পড়তে পড়তে ভাববেন, এ আর এমন কি! বর্ণনা তো চিত্রময় নয়। চিত্র তো আবেগময় নয়।

আরেক কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিসর্গদৃশ্যের অভিভূত হয়ে লিখেছেন :

পড়েছে ঐ সূর্যরশ্মি গিরিচূড়ায়—মনোহর!
পড়েছে ঐ সূর্যরশ্মি তরুশিরে—কী সুন্দর!
মাঠের উপর রাঙামাটি, সবুজ—গাছের চারিধার,
আকাশে এক রঙের খেলা খেলে যাচ্ছে—চমৎকার!

প্রবাসে। ত্রিবেণী

পড়তে গেলে মনে হয়, এমন এক স্বতঃস্ফূর্ততায় অজস্র কবির চোখে যে, আনন্দে তিনি তলিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পাঠককে সে আনন্দের ভাগ তিনি দিতে পারছেন না। মনোহর, সুন্দর, চমৎকার—এসব বিশেষণ এমন সাধারণ, ব্যঞ্জনা-হীন এবং বহুব্যবহারে ক্লিনভাগ যে পাঠকের সঙ্গে কবিতার কোন সাধারণীকরণ ঘটে না। যদিও কবিতায় এ বর্ণনাটুকু সত্যিই কবির সহজ হৃদয়ের শস্য, এ মুহূর্তায় কল্পিতায় স্পর্শমাত্র নেই। অথচ যে-গুণে বর্ণনা ইমেজ হয়ে ওঠে, সেই অনুভূতির সঙ্গে কল্পনার সাযুজ্য এখানে কী করুণভাবে অনুপস্থিত! গিরিচূড়া ও তরুশিরে উদ্ভাসিত সূর্যরশ্মির স্বাভাবিক দৃশ্য কবিকে কোন গভীরতার দৃশ্যান্তরে নিয়ে যেতে পারেনি। পাশাপাশি মনে পড়ে, সদ্যপ্রকাশিত বাড়ি-থেকে-দেখা এক প্রত্যুষসূর্যের অপরূপ রহস্য কেমন করে রবীন্দ্রনাথকে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে, দৃশ্যান্তর থেকে ধ্যানের কল্পনাবৈভবে পৌঁছে দিয়েছিল। বস্তুত, দ্বিজেন্দ্রলালের আবেগানুভূতি ছিল, কল্পনার দ্যুতির ছিল কিন্তু সবকিছুকে অতিক্রম করে ছিল এক স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পমন। যা দৃশ্যতেই মুগ্ধ। বহিঃসৌন্দর্যেই প্রীত। কিন্তু সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করতে হয়। অনেক সময় স্বভাবের বাইরে কিংবা স্বাভাবিককে অতিক্রম ক'রে সৌন্দর্য সন্ধান করতে হয়, তাতে কাব্যে অতিলৌকিক ছোঁয়া লাগতে পারে কিন্তু তা পাঠককেও অনেক ঊর্ধ্বে তুলে

যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন : 'নীলদিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগলো / আজ বসন্তে দোয়েলের শিস্ জাগলো', তখন অতিশয়োক্তির বহিরাবরণ সত্ত্বেও অনুভবের যে যাদুরীকরণ ঘটে, পাঠকের স্বাভাবিক মনকে তা অনেক দূরযানী করে।

দ্বিজেন্দ্রলাল সম্ভবত কাব্যের রসাভিব্যক্তি সম্পর্কে সচেতন থেকে রচনা করতেন না ; বরং স্বভাবের আলেখ্যপ্রতিম বর্ণনায় উৎসাহী ছিলেন। 'আলেখ্য' কাব্যে এই স্বভাবসৌন্দর্য বেশ ধরা পড়েছে কিন্তু অক্ষুণ্ণ নয়। একই গানে তিনি লিখেছেন :

আমি, চেয়ে থাকি দূর শান্ত গগনে
ধীরে দিবা হয় অবসান।
আমি, নিভৃতে নয়ননীরে করি অভিষিক্ত নৈশ-উপাধান।

একজন বিরহীর বর্ণনা হিসাবে এটি স্বাভাবিক কিন্তু সুন্দর নয়। একজনের কথা ভাবতে ভাবতে বেদনায় উপাধান অশ্রুসিক্ত হচ্ছে, এ ঘটনা এত স্বাভাবিক যে কাব্যে রসাভিব্যক্তির পক্ষে অচল। কিন্তু স্বাভাবিকতার প্রতি রক্তগতভাবে আসক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে এ বর্ণনার প্রলোভন জয় করা অসম্ভব এবং সম্ভবত অনুচিত। সেজন্য 'উপাধান' এই ভুল শব্দটিকেও এমনকি তিনি ছাড়তে রাজি নন।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে এ সিদ্ধান্ত অচল যে, তাঁর কল্পনাশক্তি ছিলনা। যিনি অনায়াসে নাটকী নায়িকার মুখে লিখতে পারেন, 'আয়রে বসন্ত, ও তোর কিরণ মাখা পাখা তুলে,' তাঁর ঐশ্বর্যময় কল্পনাশক্তিকে, চিত্রকল্পরচনায় নিপুণ প্রতিভাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যত, এই শক্তিকে তিনি কাজে লাগাননি। তারফলে, তাঁর সাহিত্যে ভূরিপরিমাণ উচ্ছ্বাস আছে কিন্তু মনে রাখবার মত কবিতা নেই। গানগুলির মত গাওয়া যায় এমন দেশবর্ণনার গান আছে কিন্তু এমন একটি অভিনব শব্দচিত্র নেই যা পরবর্তী কবিরা হরণ করে নেবে। এমনকি তাঁর উচ্ছ্বাসের মোহ এমন মাত্রাতিরিক্ত যে তাঁর নাটকের সংলাপে নাটকীয়তার চেয়ে বাচালতা বেশি। ফলত, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাভিনয়ে অভিব্যক্তির চেয়ে স্বরক্ষেপ বেশি দরকারী।

সেইজন্য মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যের স্থায়ীফল বিস্ময়, ভুল সুর উচ্ছ্বাস এবং উদ্দীপন বিভাব হ'ল স্বাভাবিকতা। এই স্বাভাবিকতা ক্বচিৎ সৌন্দর্যের ভুল ছুঁয়েছে, যেমন—'এমনি চাঁদের আলো / যদি যদি সেও আলো / সে

মরণ 'মরণসমান' কিন্তু প্রায়শই চটকদার চমকে শেষ হয়েছে, যেমন, 'আজকে যদি মরতে না পাই তবে আমার মরণ ভালো'। এই চটকদার বাক্‌রীতি সত্যিই কি আমাদের অনুভবের কোন গভীরতম তলদেশে নিয়ে যায়? না, বরং এসব বাক্‌বিচক্ষণতার অন্তরাল থেকে ফুটে ওঠে উনিশ শতকের সেইসব অগভীর নারীত্বভাবের প্রতিধ্বনি, যাঁরা বলতেন: 'যাও পাখি বলো তারে / সে যেন না ভোলে মোরে'। এসব পংক্তি পড়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝি সত্যিই এ অনুনয়ের কোন মূল্য নেই। আর আজকের দিনে কে না স্বীকার করবে, বাংলা কবিতার ভাবরস রবীন্দ্রনাথের দাবাবে অনেক এগিয়ে গেছে।

কিন্তু তবু মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের সচেতনভাবে আচরিত এই উচ্ছ্বাস ও সাধারণ আবেগের উৎস নির্ণয় করা করা দরকার। তিনি 'ভাবুকতাবিরোধী বস্তুগত কল্পনার কবি, একথা সত্য কিন্তু কেন তিনি বস্তুগত কল্পনার প্রতি আসক্ত তার উত্তর খুঁজতে হ'লে 'আলেখ্য' কাব্যের ভূমিকায় তিনি যা লিখেছিলেন তা লক্ষ্য করা দরকার:

'এ পদ্যগুলি পদ্য না হোক, প্রহেলিকা নয়, এ গ্রন্থের কোনো কবিতা প'ড়ে তার মানে দশজন দশরকম বের ক'রে তাদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবার প্রয়োজন হবে না। কবিতাগুলির মানে যদি থাকে তবে এক রকমই আছে।... পরিশেষে এও বলে রাখি, যে, আমার বর্ণিত বিষয়গুলি পার্থিব। আমি যে-ভাবের ধারণা করতে পারি, সেই ভাব সম্বন্ধেই লিখি— আর আমি নিজের কবিতার মানে নিজে বেশ বুঝতে পারি'।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই বক্তব্যের বহিরঙ্গে ঘটিত রবীন্দ্রবিদ্বেষের একটু স্পর্শ আছে কিন্তু তাহলেও মৌলিক হ'ল, এ-বক্তব্যের অন্তর্গত তাঁর কবিস্বভাব বা কাব্যপ্রত্যয় সম্পর্কে বিবৃতি। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের কবিতা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিযোগ ছিল দুর্বোধ্যতার। বলাবাহুল্য, দ্বিজেন্দ্রলালের মতে রবীন্দ্রকাব্যের যে-অংশটুকু দুর্বোধ, সে-অংশটুকু আসলে কবির উদ্বেলিত ছন্দরাশির এক অনতিস্ফুট রহস্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রোমান্টিক কবিতার সেই মর্মকথাই অনুধাবন করতে পারেন নি কিন্তু তাই বলে কবিতার বিপরীত পদ্য যে প্রহেলিকা এ তাঁর ব্যক্তিমনের আশ্চর্য প্রতিফলন। যে-কোন শ্রেষ্ঠ শিল্পের নানা রকম ব্যাখ্যা হয়ে থাকে যুগভেদে, ব্যক্তিভেদে; নইলে শিল্প কালজয়ী হয়না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের অহংকার যে, তাঁর কবিতার অদ্বৈত অর্থ এবং সে অর্থ তিনি বেশ বোঝেন। এই বক্তব্যের ধৃষ্টতায় কবিতার বিচিত্র রহস্যের

কোমল স্পর্শটুকু যেন পাপড়ির মত ঝ'রে পড়ল আর আমাদের চোখে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। বেশ বোঝা গেল,ঈশ্বর গুপ্তের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল বিশিষ্টভাবে Incidental, Topical কবি। বারো বছর বয়স থেকে তিনি চোখের সামনে যা দেখেছেন, কানে যা শুনেছেন তারই উচ্ছ্বসিত স্তবগান লিখে গেছেন। কখনও 'দেবতরে দন্তা দেখিয়া' কখনও 'নিশীথে গান শুনিয়া'। ফলে তাঁর সারাজীবনের বিচিত্র ঘটনার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের এমন এক যৌগসূত্র আবিষ্কার করা যায় যা সাময়িকতা ও তাৎক্ষণিকের স্পর্শে স্পন্দিত। শৈশবের দেশধ্যান ও প্রকৃতিপ্রেম রূপ পেয়েছে আর্য গাথায়। বিলেত গিয়ে স্বদেশচেতনার চিহ্ন রেখেছেন Lyrics of Ind-এ। দেশে ফিরে যখন স্বজনের দ্বারা পরিত্যক্ত হলেন তখন সৃষ্টি হল 'একঘরে' প্রহসন। পত্নীবিয়োগের পর অসহায় জীবনের ছবি ফুটল 'আলেখ্য' কাব্যে। অনুকরণপ্রিয় সমাজের কপটতায় গ্লানি ফুটে উঠল হাসির গানে। টডের 'রাজস্থান' পাঠের উদ্দীপনায় ও সমকালীন জাতীয়তার অভিমন্ত্রে জেগে উঠল ঐতিহাসিক নাটক ও স্বদেশীগান। আর শেষ জীবনে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত আত্মবিস্মৃত আকুতি রূপ নিল ঈশ্বর বন্দনার স্তোত্রে। 'কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে' রবীন্দ্রনাথের এই স্মরণিত উক্তি দ্বিজেন্দ্রলালে ব্যর্থ। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যধারা আত্মজৈবনিক এবং সে আত্মরত বহির্জীবনের পরিবর্তমানতায় কম্পিত। এই বহির্জীবন আবার পারিষদ বিদগ্ধ সমাজের।

এই বহির্জীবননির্ভরতাই তাঁকে স্বভাবের প্রতি আসক্ত করেছে। আর স্বভাব তাঁকে পথ দেখিয়েছে অবাধে সাবলীল, অনায়াস উচ্ছ্বাসে।

যাঁরা সাধনা যাঁরা করেন কাব্যভাবনা বা কাব্যপ্রত্যয় তাঁদের পরম নয়: আরেক চেতনা অনুস্যূত থাকে তাঁদের মানসক্রিয়ায়। যাকে এক কথায় বলা যায় প্রকাশভঙ্গি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায়, বাংলা কবিতার শব্দ ও ছন্দের যথার্থ আদর্শ সন্ধানে তিনি শেষ পর্যন্ত অক্লান্ত ছিলেন। কীভাবে বাল্মীকির মনের যাবতীয় আবেগকম্পন তাঁর হাতে রূপ পেল, কোন্ প্রতিভায় ছন্দার ছন্দের সঞ্চারে তিনি বাঙালী পাঠককে গভীরতায় পৌঁছে দিলেন, আবার কোন্ নির্মোহ প্রবর্তনায় অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন-মুক্তি ঘটিয়ে গদ্যকে করলেন কাব্যের বাহন তার রোমাঞ্চিত ইতিহাস সকলের জানা। দ্বিজেন্দ্রলালও এমনি প্রকাশভঙ্গির কিছু অনন্যতা দেখিয়েছেন। এবং তাঁর

কাব্যভাষা ও কাব্যছন্দের পরিবর্তন খুব দ্রুতহালে ঘটেছে। উদাহরণ সামনে রাখলে এই বক্তব্য পরিস্ফুট হবে।

আর্যগাথা-রচনার সময় তাঁর কাব্যভাষা ও ছন্দের উদাহরণ :

> যায় অযুত বিটপীপ্রহত শীত অপাখির উচ্ছ্বাসি রে ;
> কল্লোলে জলরাশি ; মেঘমন্দ্রে মুরজভাষী রে ;
> সহসা দশদিক্ গভীর মধুরস্বরমুখরা রে।
>
> এ মধুর আজ অন্ধকারে আ' রে সখি হৃদিমন্দিরে এ ;
> হয়দিন শুধু যাবে দৃঢ়তর প্রণত মুকুলপ্রণয়িহৃদয়ে ;
> গরজুক ঘন, পবন ঈর্ষী ; হাসি হেরিব মোরা রে।

ঘন্ত-রচনার সময় :

> দিন যায়, দিন আসে, নব অনুরাগে
> আবার সে জাগে ;
> বসন্ত চলিয়া যায়, সমর বাতাসে
> আবার সে আসে।

আলেখ্য-রচনার সময় :

> সঙ্গে হ'লে দিনের খেলা, খেয়ে চারটি তাড়াতাড়ি,
> সন্ধ্যাটি না হতে হতেই, গাঢ় ঘুমের ঘোরে,
> ঘুমোচ্ছিস্ রে মাণিক আমার, মাতৃহারা ওরে !
> পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে পেছিস্, নেতিয়ে পেছিস্,
> বাছা আমার আদুরে।
> ওরে আমার বাদুরে।

মননশীল কাব্যপাঠক এই তিনটি উদ্ধৃতির মধ্যে শব্দ ও ছন্দযোজনায় কবির যে দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্য করেন তা স্মরণীয়। দৃঢ় গাঢ় সমাসবদ্ধ তৎসম থেকে যুক্তস্বরহীন অনিময় বাংলা শব্দ এবং তার থেকে একেবারে বাংলা লৌকিক শব্দ ও বাক্‌রীতি— প্রকাশভঙ্গির কী বিচিত্র বিবর্তন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের বাক্‌রীতির বই স্বকীয়তা প্রথম লক্ষ্য ক'রে লিখেছিলেন : 'দ্বিজেন্দ্রবাবু বাংলা ভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ভাষাবিশেষের মধ্যে যে কতটা ক্ষমতা আছে, তাহা তাঁহারাই দেখাইয়া দেন— পূর্বে যাহার অস্তিত্ব কেহ সন্দেহ করে নাই, তাহাই তাঁহারা

প্রমাণ করিয়া দেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা ভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি।'

ভাষার এই গতিশক্তির সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল যোগ করেছিলেন ছন্দের স্বাভাবিক স্থিতি-স্থাপকতা। অর্থাৎ তাঁর হাতে শব্দের বশ্যতা করেছে ছন্দ, আর পাঁচজনের মত তিনি ছন্দের একটা নির্ধারিত বন্ধনের মধ্যে শব্দ সাজাননি। তারফলে তাঁর কবিতার একটা বাড়তি আকর্ষণ এই সৃষ্টি হয়েছে যে, ছন্দবদ্ধতার ধারে যে সব শব্দ তাদের উচ্চারণকালের মাত্রা রেখে ইতিপূর্বে বাংলা কাব্যে ব্যবহার করা যায়নি দ্বিজেন্দ্রলাল সেগুলি অনায়াসে শুনিয়েছেন। যেমন :

না: ! এ জীবনটা কিছু না: !

শুধু একটা 'ই:'; আর একটা 'উ:' ! আর একটা 'আ:' !

চারটি মাত্র অব্যয় প্রয়োগ ক'রে কেমন চমৎকার রসসৃষ্টি করেছেন। এ রস খাঁটি বাঙলা এবং বাঙালীর পক্ষেই একমাত্র আস্বাদ্য। এর অনুবাদ করা সম্ভব নয়। তাতে দুঃখ নেই। কেননা দ্বিজেন্দ্রলালের আন্তর্জাতিকতার প্রতি কোন আসক্তি ছিল না। এই দেশে জন্মে তিনি এই দেশেই মরবার আকৃতি জানিয়েছিলেন।

শব্দের গতিশক্তি আর ছন্দের স্থিতি-স্থাপকতা দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল কেন কিছু মজার কিন্তু আকর্ষণীয় চিত্র ও বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন :

বৃষ্টি পড়িতেছে টপটাপ
বাতাসে পাতা করে ঝুলঝাপ
প্রবল ঝড় বহে আর কাঁঠাল সব
পড়িছে চারিদিকে দুপ দাপ।

কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দকে বাজিয়ে যে চিত্র তিনি আঁকলেন তাতে দৃশ্যসৌন্দর্য এবং শ্রাব্যসৌন্দর্য একত্র হয়েছে। পরবর্তীকালে এমনি ধ্বনির তুলি বুলিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত অনেক ভাল কবিতা লিখেছেন।

একটা বিয়ে বাড়ির বর্ণনা চমৎকার ফুটে উঠেছে শুধু সংলাপের অসামান্য ব্যঞ্জনায় :

'সিঁদুর ?' 'আহা বাক্সটাকে বাজাতে বলো যাদু।'
বাহিরে সোর 'সেলাম কৈ ?' কর্তা কৈ ? কেন ?
'করো না চুপ' 'মিষ্টি কই ?' 'বৃষ্টি হবে বেন।'
'আরে ও মতি ছেড়ের ছেড়ে।' 'চেঁচাও কেন দাদা ?'

'কয়াস বিছা।' 'মরিয়ে রাখ গাভার এই গাল।'
'তামাক কৈ?' 'আলছে খুড়ো, খাবাও না এ-গোলে।'
'এখনো ঘর এলোনা?' 'আহা এই যে এলো ব'লে'।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যপ্রত্যয়ের মূল কথা স্পষ্টোক্তি ও অকপট প্রকাশভঙ্গি। সেইজন্য চিত্রকল্প রচনার চেয়ে বস্তু বর্ণনায় তাঁর মনোযোগ বেশি। কাব্যের ভাবগভীরতার চেয়ে তাঁর অনেক বেশি কাম্য সুখের ও হৃদয়ের পারস্পরিক নিরপেক্ষতা। কোন অনাগত ভবিষ্য কল্পনার রোমান্টিক বেদনার চেয়ে প্রত্যক্ষ পার্থিবের রসসম্ভোগ তাঁর অধিক স্পৃহনীয়।

কাব্যক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল ভাষার একটি নতুন শক্তি পরীক্ষা করেছেন আর নাটকীয় সংলাপে সৃষ্টি করেছেন এক মেদুর ঔদাস্য। দ্বিজেন্দ্রনাটকের সুশীলদের ভাষা মুখের নয়, হৃদয়ের। তারা ঘটনার সঙ্গে সংগতি রেখে কথা বলে না বরং কথা দিয়ে কথার আড়ায় ঘটনাকে অতিক্রম ক'রে যায়। তার ফলে লক্ষ্মী করি চন্দ্রগুপ্ত নাটকের উদ্‌বোধনী দৃশ্যে সেকেন্দারের মুখে বিচিত্র দেশের বর্ণনার সঙ্গে 'ঘনঘাস্ত পুষ্পেকরা' গানের ভাষাগত কোন পার্থক্য নেই। দ্বিজেন্দ্রনাটকে সংলাপ ও গানের এক সার্থক যোগাযোগ ঘটেছে তার কারণ এই সব নাটকের পাত্রপাত্রীর মুখের ভাষা ও গানের ভাষা একই। দুটি ভাষাই হৃদয়-মথিত, আবেগজাত এবং উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে বড় দান রঙ্গশালার হিসাবে। এমন সৌকর্য-সম্পন্ন সুরকার এদেশে আর কেউ নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের গান বাংলা গানের ইতিহাসে সবচেয়ে নাটকীয়। তার কারণ তাঁর গানের একটি বড় অংশ মঞ্চের চাহিদার রূপ নিয়েছে এবং জনতার মনকে উদ্বুদ্ধ করেছে। খাঁটি Incidental Song যাকে বলে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে তার কিছু উদাহরণ আছে। সে সব গান কখনও নাটকীয় দৃশ্য পরিবর্তনের মত আকস্মিক, যেমন—'ঘনতমসাবৃত অম্বরধরণী'। কখনও স্মৃতির মত সকরুণ, যেমন—'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কী সংগীত ভেসে আসে'। কখনও বন্ধুর গীতিকাব্যের মত উদাসী, যেমন—'আমি সারা সকালটি ব'সে ব'সে আমার সাধের মালাটি গেঁথেছি।' বাংলা নাটকের জন্য খাঁটি বাংলাসুরে ও তালে একক ও সখীদের সমবেত কোরাস তিনিই প্রথম রচনা করেন। যেমন, আড়খেমটা তালে—'সে কেন দেখা দিল রে,' ঝুপালি এক-তালায়—'তুমি যে হে প্রাণের বঁধু' আবার খাম্বাজ, একতালায় সাধারণ বিদেশী

সুরের ওঠানামা ছুঁয়ে—'আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই'—নাটসংগীতের এসব চিরস্মরণীয় উদাহরণ।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের গানে উনিশশতকের জ্ঞানময় অপরাহ্নের সকরুণ বিরহবেদনা মর্মরিত। বাড়ির ছাদে বসে, বেলফুলের মালা হাতে, ঊর্ধ্বাকাশ বসন্তচাঁদনীর সন্ধ্যায় বাগেশ্রী, বেহাগ, খাম্বাজ আর ঝিঁঝিটের আর্তি যেন দ্বিজেন্দ্রলালের গানে স্মৃতিচিহ্নের মত মর্মস্পর্শীভাবে সংযুক্ত।

বাংলা গানের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কারকের ভূমিকা নেন নি। কেননা বাংলাদেশের আবহমান গানের ধারাগুলি তিনি মেনে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানের সাধনা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, তিনি বাংলার আবহমান গানের ধারাগুলিকে সার্থক ভাবপ্রকাশের বাহন ব'লে মেনে নেননি। সেই জন্যই বাংলার উপেক্ষিত লোকসীতির সুরসম্পদ, বিদেশী সুরের বৈচিত্র্য এবং ভারতীয় মার্গসংগীতের বিস্তার— এই সবের সমন্বয়ে তিনি এমন এক গানের ধর্ম তৈরি করেছেন, যাকে আজ আমরা বিশিষ্টভাবে রবীন্দ্রসংগীত বলে জানি। এই বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতে কোন বিশেষ গীতধারার প্রভাব আলাদাভাবে আবিষ্কার করা শক্ত, কারণ সব কিছুর স্বীকরণে রবীন্দ্রনাথের গান এক অনন্য রূপ নিয়েছে। এতে ধ্রুপদের মত চারটি কলি আছে, আবার মাঝে মাঝে টপ্পার সূক্ষ্মকাজ মিশে আছে, কোন একটি বিশেষ রাগের সঙ্গে অভিনব উপায়ে আরেকটি রাগকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সব কিছুকে অতিক্রম ক'রে আছে গানের বাণীর অংশটুকু —যা এক একটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা। গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধি দীর্ঘদিনের (প্রায় পঞ্চাশ বছরের) সাধনালব্ধ। দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতসাধনায় একাধিক বিরুদ্ধতা দেখা যায়। প্রথমত, সংগীত অনুশীলন তিনি বেশিদিন করতে পারেননি ; দ্বিতীয়ত, তাঁর অধিকাংশ গান নাটকের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে লেখা— ফলে সুরের অনুশীলনের চেয়ে সে সব গানে বেশি নজর দিতে হয়েছে জনচিত্তজয়ী উপাদানের দিকে ; তৃতীয়ত, তাঁর গানের বাণী রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় পরিণত হয়নি, শব্দযোজনায় অনেক ত্রুটি আছে। কারণ, দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের মত গানের ক্ষেত্রে কথার আভাসকে সুরের সাহায্যে পরিস্ফুট করতে চাননি বরং সুর কম্পোজিশনের অসামান্য পারঙ্গমতায় কথাগুলিকে ভূষিত ক'রে দিয়েছেন। এই সব কারণে, বাংলাদেশে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বিশিষ্ট সুরসমৃদ্ধ তথা কম্পোজার হিসাবে তাঁর যোগ্য ভূমিকা আজো নির্ধারিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গান, পাঠ্য গীতিকবিতার মত বেশ চলে আধুনিক বাংলা-

দেশে, অনেকেই 'গীতবিতান' পড়ে আনন্দ পান। পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি সম্পূর্ণভাই সুরনির্ভর তথা প্রতিসুখকর। পড়তে গেলে পদে পদে বাধা পেতে হয়। অথচ, সুরনির্ভর দ্বিজেন্দ্রলালের গান যে-পরিমাণে প্রচারিত হওয়া উচিত ছিল, স্বীকার করতে লজ্জা হয় যে, তার এক দশমাংশও হয়নি। এবং যেহেতু, তাঁর অনেকগুলি প্রেমগান রবীন্দ্রনাথের মত লিরিকাল ও আত্মগতানিক নয় বরং ড্রামাটিক অতএব সেগুলি অপ্রচল ; কেননা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক বড় একটা অভিনীত হয় না।

কিন্তু তাই বলে সুরকার দ্বিজেন্দ্রলালের মূল্যায়ন করতে যেন ভুল না করি। বাংলার চলার বিলম্বিত চালের সূক্ষ্মভাব আর উত্তরভারতীয় খেয়ালের সংযোগে তিনি যে টপ্‌খেয়াল নামক গানের কর্মকে নিজস্ব ভাবধারার প্রকাশক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তা বাংলাগানকে মুক্তি দিয়েছে। এবং একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালই বাংলাগানে য়ুরোপীয় সুরের উদাত্ত মরিয়াটুকু কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর হাতেই বাংলা কোরাস প্রকৃত রূপ নিয়েছে। বাংলা ও ভারতীয় গানে সুরের একটি স্থায়ীরূপ ও সেই রূপেরই বিস্তার দেখানো হয়। তাতে গাম্ভীর্য আছে, গভীরতা আছে কিন্তু লঘুচপল গতি নেই। মনের বিচিত্র সূক্ষ্ম ওঠাপড়া, বর্ণার মত আনন্দের চকিত চাপল্য ভারতীয় গানের অন্তঃপ্রকৃতিতে নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা গানে বিদেশী গানের এই দিকটি যোগ ক'রে ভাবী সুরকারদের সামনে আদর্শ রেখে গেছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক সুরের চকিত ওঠানামার, বিদেশী গানের পরিভাষায় যাকে বলে Crescendo ও Decrescendo। (পাঠক, স্বরলিপির জন্য প্রস্তুত চাইছি।)

সা সা ॥ না সা ধা। সা ধা পা। ধা পা মা। পা মা ধপা।
আমি রা অ রু প ক ন ক কি র পে চ ক্ষি য়া•

মপা মা-া। -া পা পা। র্সা নর্সা পধা। পা ধপা ধপা। ধা পধা পপা।
না• মি• • আ ময়া পা •• ধা য় বি য়• কি র পে

পা ধপা পপা। পা ধা -া।
অ • ন্ত পা নী •

এই রকম অনেক উদাহরণ দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ছড়িয়ে আছে। 'ঘনতমসাবৃত অম্বরধরণী' একটি ধ্যানের গাঢ় অন্ধকার, তারপরে কয়েকটি আর্ত অন্বেষণ,

সূত্রপাতের শুরু হাহাকার ও পরিশেষে রক্তনিপাতের দারুণ নির্ঘোষের বাহুনায় একজনের পক্ষে এইসব নাটকীয় দৃশ্য শুধু স্বল্পোক্তিসহনের অসাধারণতার ধ্বনি-চিত্রের মেজাজ এনে দেয়। এমনি সব নানা নতুনত্ব দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলাদেশে এনেছিলেন বিদেশ থেকে, যা বাংলাদেশের আধুনিক মানুষদের না-শুনিয়ে শুধু নীরস আলোচনা ক'রে লাভ নেই। কিন্তু, এ প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, বিদেশ থেকে সম্পদ এনে তিনি কেন তাঁর সাধনায় মেশালেন? মনে হয় উগ্র দেশাত্মবোধ এ ব্যাপারে তাঁকে সর্বদা প্রবর্তিত করেছে। 'আমরা মুচাব না মোর কালিমা'— তাঁর শুরু অঙ্গীকার নয়।

উনিশ শতকের রাশিয়ান সংগীতকার পিটার ইলিচ চৈইকভ্‌স্কির ছেলেবেলার একটি গল্প বিশেষ স্মরণীয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বুকে ছিল জাতীয়তাবাদের উষ্ণ স্রোত। একদিন সকালে ফরাসি গভর্ণেসের কাছে পড়তে বসে বিশ্বের মানচিত্র দেখছিলেন চৈইকভ্‌স্কি। হঠাৎ কী হল, রাশিয়ার মানচিত্রের দিকে একদৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে দেশপ্রেমের প্রবল আবেগ তাঁকে উন্মাদ ক'রে দিল। মুহূর্তের মধ্যে ফরাসি গভর্ণেসের উপস্থিতি অগ্রাহ্য ক'রে বিশ্বমানচিত্রের মধ্যে রাশিয়ার অংশটুকু চুম্বনে ভরিয়ে দিলেন; তারপরেই সেই অংশটুকু হাত দিয়ে ঢেকে প্রচণ্ড বিদ্বেষে পৃথিবীর সমস্ত অংশে ঘুঁষি দিতে লাগলেন।

কালে এই উগ্র দেশপ্রেমিক রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় সুরকার হতে পেরেছিলেন। তাঁর তীব্র প্রখর জাতীয়তাবোধ রাশিয়ার সমস্ত লোকসীতির ধারাকে পুনর্জীবিত করে, নতুন কালের নতুন রাশিয়ান সংগীতকে জগতের কাছে তুলে ধরেছে। সুতরাং উগ্র দেশপ্রেম যে সর্বক্ষেত্রে বৈনাশিক নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দেশের পরিধাকে বিশ্বসকাশে তুলে ধরে চৈইকভ্‌স্কি তার সুন্দর প্রমাণ। বাংলাদেশে দ্বিজেন্দ্রলালের এই ভূমিকা। তাঁর মত উগ্র দেশপ্রেমিক বঙ্গজননী উনিশ শতকে অনেক পেয়েছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র অনেক নাম করা যায়। কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের ভুবে আপন আপন ব্যক্তিগত বহুৎ কর্মশক্তিতে দেশকে নীরবে উদ্বোধিত করেছেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলালের ভূমিকা এমন বহুৎ স্বাতন্ত্র্যের নেপথ্য প্রয়াসে অবসিত হয়নি। এঁদের জাতীয়তাবোধ প্রত্যক্ষতার পরিবর্তমান জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। হেমচন্দ্রের 'ভারত বিলাপ' বিলাপ মাত্র, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য জাতীয়তাবোধের

অঙ্গীকারে মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। যা কিছু ভাল, তা বিদেশী হলেও ক্ষতি নেই, দেশের এই মরা মানুষগুলোকে দিতে হবে। এই দেশের একটা গৌরবর্ণ আলেখ্য এঁকে যাবার জন্য তিনি প্রাণপাত করেছেন। তাই বিদেশী স্মেকস্পীয়রের মুখে ভারতবন্দনার সংলাপ জুড়ে তিনি যেন আমাদের চোখে নতুন ক'রে স্বদেশকে চেনালেন। বিনা দ্বিধায় অত্যুক্তি সত্ত্বেও গাইলেন :

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার ?
কোথায় এমন ধূম্র পাষাণ ?
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে ?
কোথায় পাখির ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি পাখির ডাকে জেগে।

সত্যিই কি এত অনুকূলনীয় ছিল দ্বিজেন্দ্রলালের সমকালীন আমাদের দেশ ? সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিসংস্থান নিলে বিপরীত চিত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের বন্দিত এই স্বপ্নের স্বদেশ তো বিশেষ কালের নয়, এ গানে চিরন্তন স্বদেশের শুভ্র গরিমা। সবচেয়ে বড় কথা, এই দেশের মানুষ পরম বিশ্বাসে গভীর শান্তিতে দ্বিজেন্দ্রলালের এই দেশধ্যানকে বুকে নিয়ে মানুষ হয়ে উঠেছে। একটা পুরো দেশকে জাগিয়েছেন যিনি তাঁর সাহিত্যবিচারে সমালোচকের বিদ্রোহী অহংকার নীরবে দূরে দাঁড়ায় ; আর সব রকমের শৈল্পিক ত্রুটি ও অসংবৃত আবেগকে অতিক্রম ক'রে সামনে যে দ্বিজেন্দ্রলাল এসে দাঁড়ান তিনি মানুষ দ্বিজেন্দ্রলাল।

মনুষ্যত্বের সাধনায় উপ্রতার রেশ থাকেই। রাশিয়ার রাজা পিটার দি গ্রেট তাঁর দেশকে মধ্যযুগীয়তা থেকে উন্নত করবেন বলে, মনুষ্যত্বে দীক্ষিত করবেন বলে এমন সব কর্তব্যভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন যা রাজোচিত নয়। কিন্তু তাতে তাঁর মহত্ত্ব খর্ব হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালেরও সমগ্র জীবনে ও বাণীসাধনায় এই সংস্কারপ্রচেষ্টা বড় হয়ে উঠেছে। বাংলা নাট্যমঞ্চের শৈশবদশা ঘোচাবার জন্যে, পরিমার্জন করবার জন্যে, গিরিশচন্দ্র নাটকের পর নাটক লিখেছিলেন। আজকে গিরিশ নিরিখে তাদের হীনতা প্রমাণ ক'রে লাভ কি ? দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র শিল্পজীবন এই আলোকে দেখলে ভাল হয়। সকলের কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর নিজের কথাটুকু ভাবা হয়ে ওঠেনি। আর বর্তমানে খুব বিশেষভাবেই নিঃসঙ্গ আত্মকথনের স্বপক্ষে, তাই দ্বিজেন্দ্রলাল উপেক্ষিত। তিনি যে-জাতীয়তার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর গান গেয়ে এদেশের লোক যে-জাতীয়তা অর্জন করেছেন আজকের আত্মকেন্দ্রিক, আন্তর্জাতিক বাঙালীর কাছে সে জাতীয়তা বাঙালার

প্রাক্তন প্রাক্তিবিলাস বলে নিন্দিত। সেইজন্যই লক্ষ্য করি, দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা দেশকে অনেক কিছু দিয়েছিলেন— তেজস্বিতা, নির্ভীকতা, যুক্তিবত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা, জাতীয় সংগীত, উদ্দীপনার নাটক প্রভৃতি অগণ্য সম্ভার ; কিন্তু আমরা তার বিনিময়ে তাঁকে কী দিলাম ? উপেক্ষা, অনাদর, অপ্রচার, অপপ্রচার। এ সব কালিমা না হয় মোচানো যাবে কিন্তু যে জাতীয়তার দীক্ষা দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের দিয়ে গিয়েছিলেন তা আমরা বিনষ্ট করেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের পুনরুজ্জীবন করতে হ'লে সর্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের আত্মশুদ্ধি।

দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র পঞ্চান্ন বছর বেঁচেছিলেন। শেষের দিকে, বিশেষত পত্নীর মৃত্যুর পর প্রায় মানসিক বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। সাহিত্যকর্মে, হাসির গানের বাজে, নাটকের প্রত্যক্ষ উদ্দীপনায় তাঁকে আর পাওয়া যায় নি। শুধু এক পরম ভক্তিমার্গ এবং তার থেকে উৎসারিত কতকগুলি ভক্তির গানে দ্বিজেন্দ্রলালের এক সাধক মূর্তি ফুটে উঠেছে। ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদিত সেই আহুতির মধ্যে আমি রণক্লান্ত সৈনিকের শীর্ণতা খুঁজে পাই। কিন্তু এই পর্বে তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে এক নতুন চেতনা উদ্ভাসিত হতে আরম্ভ করেছিল। বস্তু থেকে ভাবে পৌঁছানোর ছবি ফুটছিল। তার প্রমাণ একটি ভক্তিসংগীতে :

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে ?
এ বিশ্বনিখিল তোমারই প্রতিমা।
মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো
মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা।

পড়লেই বোঝা যায়, স্পষ্টোক্তি থেকে রহস্যের আড়ালোকে কবিমন উত্তীর্ণ হ'তে সবে সুরু করেছিল, বৃক্ষ থেকে ধ্যানে। এমন সময় মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নিল।

ভটওলা

অমিয়ভূষণ মজুমদার

লাইট রেলওয়ের গাড়িটা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, অর্থাৎ শীতের সকালের কুয়াশা উঠে যাওয়ার আগেই, তার সীমান্ত স্টেশনে পৌঁছে গেলো। পাঁচ ছটি সাধারণ এবং একটি উচ্চ শ্রেণীর কামরা, দেখলে ম্যাচবক্সের কথা মনে পড়ে, তা নিয়েই গাড়িটা। এই ছোট গাড়ির রেলপথ একটা জংশনে সাধারণ চোদ্দোগজ গাড়ির রেলপথে সংযুক্ত। পথের স্টেশনগুলোতে কোন-না-কোন চা বাগানের নাম লেখা ছিলো। বিরলযাত্রী সে সব স্টেশন চা বাগানের প্রয়োজনে তৈরী। কিন্তু এই স্টেশনে আসবার আগে পরপর দুটো স্টেশন দেখে তা মনে হয় নি। একটায় কাছাকাছি কাঠের গুদাম দেখা গিয়েছিলো অবশ্য। আর এটা? প্ল্যাটফর্ম বলতে কিছুই নেই, যদি পাথর কুচি ছড়ানো কয়েক হাত জায়গাকে সে সম্মান দিতে না হয়। তারপরেই অ্যাসবেস্টসের ছাদ দেওয়া দুখানা কাঠের ঘর, তার একটির সামনে ঘন্টা দেয়ার একখণ্ড রেল ঝুলছে। কিছু দূরে চারটে রেল খাড়া করা। সেগুলোর মাথায় একটা জলের ট্যাঙ্ক।

একটা অসাধারণ ব্যাপার এই যে উচ্চশ্রেণীর কামরাটায় এখনও তিনজন যাত্রী আছে। স্টেশন দেখে এবং এই স্টেশনে পরস্পরকে দেখে তারা বিশ্মিতই হ'লো।

যাত্রী তিনজনের মধ্যে একজন প্রৌঢ়। মাথায় চুল সামনের দিকে বিশেষ-ভাবেই ফাঁকা। গোল সোনালি ফ্রেমের চশমার আড়ালে গোল গোল চোখ। দাড়ি নেই, সিগারের ধোঁয়ায় লাল এক ছোবা গোঁফ আছে। তাকে দেখে, বিশেষ করে তার চোখ পাকিয়ে তাকানোর ভঙ্গি থেকে, বুঝতে পারা যায় সে একজন সরকারী কর্মচারী। অবশ্য খুব উঁচুদরের কেষ্ট নয়, কারণ তেমন কেষ্ট কোন অবস্থাতেই এমন জায়গায় আসবে না। তাকে ইনস্পেক্টার শ্রেণীতে ফেলা যায় বরং।

দ্বিতীয়জন ব্যারিস্টার। তার পোশাক, তার চালচলন, তার বিরাটের বোতল, তার সিগারেট, এসবের মধ্যে ছাত্র-শ্রেণীর ভাবটা, অথবা অ্যালবিনোদের দেশে ইনে পড়ার সময়ে অর্জিত ব্যানার্সের ছায়া যা মুক্তাদোষে পরিণত হয়েছে

তা প্রকাশ পাচ্ছে। বয়সও পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি হবে না। আজকাল আভিজাত্যের চলন হয়েছে। তাকে দেখলে জমিদারির সঙ্গে সংযুক্ত একটু বিশেষ রকমের অনধিকৃত আভিজাত্যের কথা মনে পড়ে যাদের সংখ্যা আজকাল বিরল হ'য়ে আসছে।

তৃতীয় যাত্রী বয়সের দিক দিয়ে এদের মাঝামাঝি হ'লেও বয়ং প্রৌঢ়ের দিকেই ঝোঁকা। তার চেহারা, পোশাক এবং হাবভাবে এমন একটা অকর্মণ্যের সাধারণতা ছিলো যা দৃষ্টি আকর্ষণ না ক'রে পারে না। এমন কি বাঙ্কের উপরে তার যে ছোট চামড়ার ব্যাগটি আছে তার গায়ে, সাধারণত ভ্রমণকারীদের ব্যাগে যেমন থাকে, অনেক এয়ার লাইনের লেবেল সাঁটা। সে যে ভ্রমণকারী এ রকম একটা ভাবই যেন ফলাও ক'রে দেখাতে চায় সে। আর তা দরকারও কারণ সে পোলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের একজন সেক্রেটারি।

তিনজনের মুখেই বিস্ময়ের ছাপ পড়লো। এদিক ওদিক চেয়ে ইনস্পেক্টার দেখতে পেলো একজোড়া রেলওয়ের গাড়ির নিচের থেকে বেঁকে বেরিয়ে গিয়ে একটা লাইন সৃষ্টি করেছে, আর তার উপরে পাথরের টুকরো বোঝাই দু একটা ছাদখোলা মাল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এটা, সুতরাং এই রেল কোম্পানীরই পাথর সংগ্রহ করার জন্য তৈরি একটা ছট— এই ভাবলো সে।

ব্যারিস্টার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সে এদিক ওদিক চেয়ে পোর্টার বা কুলি কাউকে দেখতে না-পেয়ে নিজেই তার ভারি ব্যাগটাকে টেনে নামালো। তারপর স্টেশনের ঘর দুখানার দিকে এগিয়ে গেলো। স্টেশন-মাস্টারকে খুঁজে পেয়ে সে বললো তার ভারি ব্যাগটাকে সে রেখে যেতে চায়। পরে লোক পাঠাবে। স্টেশন মাস্টার রাজি হ'লে সে সিগারেট ধরালো, স্টেশন ঘর দুখানার এদিক ওদিকে অনির্দিষ্টভাবে সে পায়চারি করলো একবার। তারপর ফিরে গিয়ে স্টেশন মাস্টারকেই জিজ্ঞাসা করলো তটওলার পথ জানে কি না। স্টেশন মাস্টারের মুখ দেখেই বোঝা গেলো এরকম কোন নাম সে এর আগে শোনে নি। চিন্তা করার জন্যই তখন ব্যারিস্টার বারান্দায় রাখা কাঠের বেঞ্চটায় বসলো।

ব্যারিস্টার যখন স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কথা বলছে, প্রথমে ইনস্পেক্টার পরে টুরিস্ট নামলো গাড়ি থেকে। ইনস্পেক্টারের সঙ্গে তার আর্দালি ছিলো। ইনস্পেক্টার তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। আর্দালি তার বিছানা বাক্স ইত্যাদি নামালো। ততক্ষণে ইনস্পেক্টার আর একবার চুরুট ধরালো।

আর্দালি বললো, 'জায়গাটার নাম ভটওলা তো? স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলে হয় গাড়িটাড়ি কিছু পাওয়া যায় কি না।'

তার মনিব বললো, 'জিজ্ঞাসা করতে পারো কিন্তু লাভ হবে ব'লে মনে হয় না। বরং পুরনো কাঠগুদামের কথা জিজ্ঞাসা ক'রো। সেখানে পৌঁছাতে পারলে উত্তর দিকে যেতে হবে, এই রকমই শুনেছি।

আর্দালি চ'লে গেলে ইনস্পেক্টার তার গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে চিন্তা করলো। এই স্টেশন থেকে তিন মাইল পশ্চিমে গেলে বনমহলের পুরনো কাঠগুদাম যা এখন পরিত্যক্ত হয়েছে। তারপরে রেলের পাথরডাঙ্গা আড্ডা থাকার কথা, যদি পরিত্যক্ত না হ'য়ে থাকে। আরও উত্তরে ভটওলার মালভূমি পাওয়া যাবে। অফিসের নির্দেশ থেকে বনমহলের আইন মেনে চলছে না। কিন্তু তার আগে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার মালভূমিটার কোন কোন অংশ বনমহল এবং খাসমহলের এক্তিয়ারে পড়েছে এবং গ্রামের লোকেরা কাকে খাজনা দিচ্ছে, আদৌ দেয় কি না।

আর্দালির সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন মাস্টার এলো। সে দরিশের যাবতে গিয়েছে তার স্টেশনে এই যাত্রীদের নামতে দেখে। সে বললো, ভটওলার নাম সে কোনদিন শোনে নি। তবে কিছুদিন আগে কয়েকজন লোককে সে এই স্টেশনে আসতে দেখেছিলো। চামড়ার কিতে দিয়ে মাথায় বাঁধা কিন্তু পিঠের উপরে ঝ'রে পড়া ঝুড়িতে তারা কমলা এনেছিলো, চা বাগানের দিকে বিক্রি করতে গিয়েছিলো। তারা বলেছিলো তাদের বস্তি কাঠগুদামের ওপারে পাহাড়ে। যদি হয় তবে সেটাই ভটওলা নইলে এদিকে আর বস্তি কোথায়?

এ কথার পর ইনস্পেক্টার দেরি করা অযৌক্তিক মনে করলো। কাঠ-গুদামের পরে রেলের পাথরডাঙ্গা খুলিয়া ভটওলা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারবে ব'লে আশা করলো।

টুরিস্ট, অন্যদিকে, গাড়ি থেকে নেমে সোজাসুজি স্টেশনের সেটের কাছে উপস্থিত হ'লো। সে ভাবলো, এই দুজন যাত্রী যখন এ স্টেশনেই নেমেছে তখন তারা ভটওলার সঙ্গে সংযুক্ত হ'তে পারে। তা যদি হয় তবে তার কাজ এখান থেকেই সুরু হবে এবং তাকে বিশেষ সতর্ক হয়েই চলতে হবে। এ চিন্তাটা তার মুখে একটা সাময়িক উদাসীনতার ভাব ফুটিয়ে তুললো। কারণ পোলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের যে রিপোর্ট সম্বন্ধে সে তদন্ত করতে যাচ্ছে তা যদি আংশিক সত্য হলেও প্রমাণ পাওয়া যায় তবে সতর্ক হওয়ার মূলেই কারণই

আছে। ভটওলা সম্বন্ধে তার রিসিং বক্তব্য সম্ভব নিষ্পত্তি। যথা, তাকে জানানো হয়েছে ভটওলা গ্রামটা বর্তমান অবস্থায় রেকর্ডে এসেছে ত্রিশ থেকে পঁচিশ বছর আগে। এ অঞ্চলটাকে আন্তরিন তেরাই বলা যেতে পারে। এই তেরাই অঞ্চলে একটি বড় মালভূমির উপরে এই গ্রামে যেমন কল্পনা করা যায় না তেমন সুখস্বাচ্ছন্দ্যে একজন লোক বাস করে। গুজব এই, একজন বিপ্লবী পালিয়ে এসেছিলো এখানে ত্রিশ বছর আগে। সেই এই গ্রামের উন্নতি ঘটিয়েছে। কিন্তু পোলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট কিছুদিন থেকে সন্দেহ করছে এটা একটা স্পাইং সেন্টার। এটা বিশ্বাস করাই যায় না সহর থেকে এতদূরে অরেকজন সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত নাগরিক-রুচি সম্পন্ন মানুষ বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছাড়া বাস করতে পারে।

টুরিস্ট সেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই আর্দালি এবং তার ইনস্পেক্টারও এগিয়ে এলো সেদিকে এবং কিছুপরে ব্যারিস্টারও।

চার পাঁচ ঘন্টা একই কামরায় ব'সে এসেছে তারা। সুতরাং প্রথম আলাপের দ্বিধা ছিলো না। তখন তাদের নিম্নলিখিত আলাপ হ'লো।

ইনস্পেক্টার টুরিস্টকে সরাসরি বললো, 'অনেকক্ষণ একসঙ্গে এসেছি কিন্তু কে কোথায় যাবো তা জিজ্ঞাসা করা হয়নি।'

'তা হয়নি।' টুরিস্ট বললো, 'আপনিও কি ভটওলায় যাবেন?'

'ঠিকই ধরেছেন। আপনি?'

টুরিস্ট হেসে বললো, 'আমার কোন গন্তব্য স্থির নেই। বেশ কিছুদিন থেকে একটা গুজব শুনছি এদিকের এই ভটওলার। কিন্তু তা মগডুঙ্গির মতো মায়াত্মক ভুল কি না কে জানে?'

ইনস্পেক্টার বললো, 'গ্রামটা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু পথটা খুঁজে পাওয়াই কথা। ভুলপথই মায়াত্মক হ'তে পারে।'

এই ব'লে সে চোখ তুলে দিগন্তের দিকে চাইলো। যতটুকু কুয়াশা কেটেছে সেখানেই বন দেখা দিয়েছে, বন এবং মাঝে মাঝে ছাড়া পাহাড়।

ইনস্পেক্টার বললো, 'আমি এ পথে কোনদিন আসি নি, আপনি?'

টুরিস্ট বললো, 'এগোনো যাক, চলুন।'

এই সময়ই ব্যারিস্টার এসেছিলো। ইতিমধ্যে সে তার ব্যাগ খুলে নতুন এক বোতল বিয়ার বার ক'রে নিয়েছে। সেটা তার কাঁধ থেকে চামড়ার স্ট্র্যাপে ঝোলানো।

তাকে বরং অপ্রতিভই দেখালো। সে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনারা কি, বাই এনি চান্স, ভটওলার দিকে যাবেন?'

ইনস্পেক্টার বললো, 'আমরা চারজন হলাম। এটা একটা যোগাযোগ যা গল্পে ঘটে না, জীবনে বরং ঘটে।'

'তা হ'লে আপনারাও ভটওলায় যাচ্ছেন?' ব্যারিস্টার আবার জিজ্ঞাসা করলো।

'হ্যাঁয়।' ট্রিস্ট মুখে একটা হাসি টেনে আনলো।

এই যোগাযোগের ফলেই তারা একটা পার্টির মতো রওনা হ'লো। পথের চিহ্ন একেবারেই নেই তা নয়। হাত দুয়েক চওড়া লাল মাটির পথ, অসমান এবং কোথাও কোথাও আগাছায় ঢাকা। পথের দু পাশেই শাল গাছের সারি। পুরনো কাঠগুদাম পর্যন্ত এই পথেই চললো তারা।

গুদামটা বেশ কিছুদিন আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে তা বোঝা গেলো। ঘরগুলোর কাঠের ভক্তার দেয়ালের দু একখানাই মাত্র আছে ভাঙা চাকা অবস্থায়। ছাদ কোনটারই সম্পূর্ণ নেই। এখানে তারা কিছুক্ষণের জন্য থামতে বাধ্য হ'লো। কারণ পথটা এখানেই শেষ হয়েছে। ব্যারিস্টার তার বিছানার বোঝা খুললো। ইনস্পেক্টারও তার অসংখ্য চুরুটগুলোর আর একটিকে ধরালো।

ট্রিস্ট কপট আশঙ্কা জানিয়ে বললো, 'এর পরে আমাদের বনের মধ্যে পথ খুঁজতে হবে।'

ইনস্পেক্টার বললো, 'ঠিক তা নয়। আর খানিকটা পথ আমাদের জানা আছে। বরং উত্তরপূর্ব দিকে যেতে হবে আমাদের। সেখানে রেলের পাথর-ভাঙা কুলিদের বস্তি থাকার কথা।'

ব্যারিস্টার বললো, 'তারপর বুঝি আর পথ নেই?'

ট্রিস্ট তার রিফিং থেকে জানে ইনস্পেক্টারের পথ সম্বন্ধে ধারণাটা মোটামুটি ঠিক। কিন্তু সে চিন্তা করলো। ইনস্পেক্টার বিনা দ্বিধায় ভটওলার পথের কথা বলছে। ব্যারিস্টার কিছুই বলে নি। এটা কি এক্ষেত্রে ব্যারিস্টারের জান? তা সত্য হ'লে ব্যারিস্টারের উপরেই বেশি ক'রে চোখ রাখতে হয়। অবশ্য, এর অন্য সিদ্ধান্তও হ'তে পারে যে ইনস্পেক্টারের সহজ ভাবটাই সন্দেহকে নিরস্ত রাখার কৌশল।

তারা আবার চলতে শুরু করলে টুরিস্ট ব্যারিস্টারের পাশে জায়গা ক'রে নিলো।

চলতে চলতে সে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি কি, কিছু মনে করবেন না, ওটওলা এস্টেটের আইনের পরামর্শদাতা। তা হ'লে ওদের চিঠি লিখলেই পারতেন, খোঁজা কিম্বা লোক আসতে পারতো।'

ব্যারিস্টার হাসলো, বললো, 'আমি ওটওলাকে আইনের সাহায্য করি না। কিন্তু খোঁজা পাঠাতে লিখেছিলাম।'

টুরিস্ট এই সংবাদটাকে আদায় করতে পেরে খুব খুশী হ'লো কিন্তু মানসিক চঞ্চলতাকে সে অত্যন্ত ঔদাসীন্যে ঢেকে দিলো। বললো, 'তা হ'লে?'

'ওদের পোস্ট অফিস আছে এটা ভাবাই ভুল হয়েছিলো।'

টুরিস্টের কাছেও এটা একটা আবিষ্কার, অল্পকথায় এ উত্তরটার জন্য সে প্রস্তুত ছিলো না। সংবাদটাকে নিজের মনে বসিয়ে নিতে সময় লাগলো। সে স্থির করলো ব্যারিস্টার আইনের পরামর্শদাতা নয় তা ধ'রে নেওয়াই ভালো। ব্যারিস্টারের উত্তর দেয়ার ভঙ্গিই তা বলে। এর পরে, কিছু সময় পার ক'রে দিয়ে, জানতে হবে তা হ'লে সে ওটওলায় যাচ্ছে কেন।

কিন্তু ইনস্পেক্টার বললো, 'ওটওলার এস্টেট ব্যারিস্টার রাখবে আইনের পরামর্শ দিতে এমন বড় নয়।'

টুরিস্ট বললো, 'এর আগেও তা হ'লে এদিকে এসেছেন, বলুন।'

ইনস্পেক্টার হাসলো, সে হাসিতে অবশ্যই অফিসের গুমোর ছিলো, বললো সে, 'কিছু খবর দিতে পারি আপনাদের।'

টুরিস্ট স্বভাবতই আগ্রহ দেখালো। কারণ ইনস্পেক্টার এবং ব্যারিস্টারের ওটওলা সম্বন্ধে জ্ঞান যদি আলাপে প্রকাশ পায় তবে তার কর্তব্য পালনে সহায়তা করবে।

ইনস্পেক্টার বললো, 'এই মালভূমিতে একটা পুরনো গ্রাম ছিলো। সেটা বিশের দশকে ইনফ্লুয়েঞ্জা কিম্বা তেমন কিছুতে কোৎ হ'য়ে যায়। তারপর ত্রিশের দশকে আবার গ্রামটা গ'ড়ে উঠতে শুরু করে। এখন মুস্কিল হচ্ছে বনবহুল বলে মালভূমিটা তাদের, আর গ্রামের লোকেরা বলছে মালভূমিটা তো তাদের বটেই, বনবহুলের অধিকার করা অনেক জায়গা তাদের গ্রামের অংশ ছিলো আগে।'

টুরিস্ট বললো, 'আপনি অনেক খবর রাখেন, আশ্চর্য!'

তার এই কপট বিস্ময় আর কারো লক্ষ্যে এলো না। ব্যারিস্টার বললো,

'বনমহল দখল করতে এলেই তো হ'লো না। তাদের, মানে গ্রামবাসীদেরও, স্বত্ব থাকতে পারে যা আদালতে প্রমাণ করা যায়।'

টুরিস্ট আবার হেসে বললো, 'আইনজ্ঞের মতোই বলেছেন, যদিও ভটওলার সঙ্গে আপনার আইনজীবীর সম্বন্ধ নয়।'

ব্যারিস্টার বললো, 'কিন্তু আত্মীয়তার সম্বন্ধ থাকতে পারে।'

'আচ্ছা!' টুরিস্ট মনে মনে বিস্মিত হ'লো এই সংবাদে। এতটা আকস্মিক উদ্ঘাটন সে আশা করে নি।

ইনস্পেক্টার বললো, 'বলেন কি? তা হ'লে তো—'

রেলের পাথর যেখানে ভাঙা হ'তো সেখানে লোকজন নেই, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে মানুষের হাতুড়ির দাগ আছে। সেখানে তারা একটু থেমে দাঁড়ালো। কারণ তাদের বাঁদিকে বনের মধ্যে সরু সরু পায়ে চলা পথ চোখে পড়লেও সে-গুলোর কোনটি কতদিন হ'য়ে বনের মধ্যেই শেষ হয়েছে তা বলা কঠিন, এবং টুরিস্টও স্থির করলো পথ দেখানোর ব্যাপারে তার পক্ষে এখানে কৃপণ হওয়াই স্বাভাবিক হবে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই টুরিস্ট বুঝতে পারলো পথ সম্বন্ধে ইনস্পেক্টার এবং ব্যারিস্টারের অজ্ঞতার মধ্যে সন্দেহ করার কিছু নেই, তখন সে তার পোলিটিক্যাল অফিসের ব্রিফিং কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত হ'লো। বললো, 'আমি যখন টুরিস্ট আমাকেই পথ খুঁজে নেয়ার ভার নিতে হবে।'

কিন্তু ঘণ্টাখানেক চলার পরে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিলো যে তারা ভুল পথে চলে এসেছে। এই আশঙ্কায় চাপেই ইনস্পেক্টার এবং ব্যারিস্টার পরস্পরকে দোষারোপ করলো একবার ভুল পথে চ'লে আসার জন্য যদিও কেউ অন্য কাউকে পথ চলার দায়িত্ব দেয় নি। টুরিস্ট সে আশঙ্কাকে উপেক্ষা করেই আগে আগে চললো কারণ সে তখন মনে মনে বিচার করছিলো এর পরে আলাপটাকে আবার কোথায় সুরু করা যায়।

এরপরে তারা শুকনো চওড়া একটা নদীখাতে এসে পৌঁছালো। কোথাও কুচি পাথরের খোলা ছড়ানো, কুচিপাথরের সঙ্গে মিশানো বালি, অন্য কোথাও কাউএর খোঁপ। সে বালিতে এখানে তখানে অন্য জানোয়ারের পায়ের ছাপ। এখানে টুরিস্টকে বিলক্ষণ চিন্তিত দেখা গেলো আর সেটা কপটও নয়। কারণ তার ব্রিফিংএ এমন কোন নদীর কথা ছিলো না। তারও কারণ এই যে তার ব্রিফিং তৈরি হওয়ার পরে পাহাড়ী বন্যায় এ নদীটা তৈরি হয়েছে।

সেই নদীটাকে পার হ'য়ে যাওয়াই উচিত মনে করলো তারা। আর তা ক'রে ভালো হ'লো। নদীটা পার হ'য়ে আর আধ ঘণ্টা চ'লে পাহাড়ের গায়ে এক সময়ে চাষ করা হয়েছিলো এমন চিহ্ন তারা দেখতে পেলো। এটাকে তারা আবিষ্কারের মতো গুরুত্ব দিলো।

তাদের এ আন্দাজটা মিথ্যা হ'লো না। সামনের চড়াইটার চূড়ায় উঠতেই বাঁ দিকের উৎরাইএর খাঁজে খাঁজে বস্তিটাকে তারা দেখতে পেলো। রং করা দেয়ালের দশ বারোটা বাড়ি অন্তত তাদের চোখে পড়লো।

আর কিছুদূর যাওয়ার পর ছবিটা আর একটু স্পষ্ট হ'লো। একটা বড় বাংলোর চারিদিকে উপরে-নীচে, পাহাড়ী মালভূমিতে যেমন হয়, আরও কয়েকটি ছোট ছোট বাংলো। কাঠের দেয়াল, খড়ের ছাদ, কোন কোন জানলায় কাচের সার্সি যার উপরে দিনের আলো চমকে উঠছে।

তারা লাল পাহাড়ী মাটির খাড়া পথ বেয়ে উঠতে সুরু করলো। পথটার এ বাঁকে ও বাঁকে ছোট ছোট বাংলো ধরনের বাড়ি। কাঠের পাটাতনের বারান্দায় টিনের কৌটায় ফুলের গাছ। অন্য একটি বাংলোর খড়ের ছাদ বেয়ে লাল ফুল লতাও একরকম লতা উঠেছে। অন্য আর একটির ছাদে একরাশ পায়রা। তারা গলা ফুলাচ্ছে, খুঁটি নাড়ছে, আকাশে পাক খেয়ে আবার বসছে এসে নিজের জায়গায়। ওদিকে খানিকটা সমতল জায়গা। নাশপাতি গাছে ফল ধরেছে। গাছের গোড়াতেও তার কিছু ছড়িয়ে প'ড়ে আছে।

কিন্তু এতক্ষণেও একটা ঘুঘু কুকুর ছাড়া আর কোন জীবিত প্রাণিকে তারা দেখতে পায় নি। অবশেষে দেখতে পেলো। পাকদণ্ডির মোড় ঘুরতেই তারা দেখতে পেলো একটি পাহাড়ী যুবতী— পিঠের কোমর ফল নিয়ে চড়াইটাতে উঠছে থেমে থেমে। তাদের দেখেই সে হাসলো। ময়লা মোটা পশমে বোনা হাঁটুঢাকা গাউনের মতো জামা পরা, কিন্তু হাসিটা তার বুকির ফলগুলোর মতো টাটকা।

অবশেষে তারা চড়াইএর মাথায় বড় বাংলোটার সামনে পৌঁছালো। কাঠের মেঝে, কাঠের খাদ, কাচের জানলা দরজা, খড়ের ছাদ, কিন্তু মনে হয় কোন এক সময়ে খড়ের উপরে পাথর-চুটি বিলানো সিমেন্টও দেওয়া হ'য়ে থাকবে। গড়ন দেখে চা বাগানের বাংলোর কথাই মনে হ'লো।

ভটওলায় বৃদ্ধ ম্যানেজার তাদের অভ্যর্থনা করলো। পাহাড়ীদের মতোই

তাদের মুখাবয়ব. শুধু নাকটা সোজা এবং উঁচু. কান দুটো অস্বাভাবিক রকমের লম্বা যেমন বৌদ্ধমূর্তির মূর্তিতে দেখা যায়। মুখের রং তামার নতুন পয়সার মতো। পরনে সাদা পশমের লঙ্গরাল, আর মোটা সোকটি কাপড়ের পাহাড়ী পিরহান। কোমরে বাঁধা কাঠের খাপে ভরা বেঁটে সোজা কিরিচ।

রুচির দিক থেকে চা বাগানে এক রকমের আধুনিকতা থাকে যাকে সহর থেকে অতদূরে গিয়ে দেখতে পেয়ে একটু বিস্ময়েরই বোধ হয়। এখানেও তেমন একটা আধুনিকতার ভাব আছে। টেবলে যে কাপড় পাতা হ'লো তা ঘরে বোনা মোটা কাপড় হ'লেও পরিচ্ছন্ন এবং সাদা, চীনে মাটির পাত্রগুলোতে কোন নক্সা ছিলো না, দামী পাত্রের মতো হাল্কাও নয় সেগুলো, কিন্তু সাদা এবং উজ্জ্বল ছিলো। মোটা মোটা মিষ্টি মুলকা রুটি, শুকনো মাংসভাজা, নানপাতি আর আঙুর, আর দুধহাড়া এলাচগন্ধী চা দিয়ে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করলো ম্যানেজার।

পথ নিশ্চয়ই ক্লান্তিকর ছিলো। পাঁচ ছ ঘণ্টা একটানা চ'লে শীত সত্ত্বেও ঘর্মাক্ত হ'তে হয়েছিলো। কাজেই ইনস্পেক্টার স্থির করলো দুপুরের বিশ্রামের পরেই কাজের কথা হবে। ব্যারিস্টার তার উদ্বেগ সম্বন্ধে কিছু বললো না। প্রথমে মনে হ'লো তার সামনে যে আহার্য দেয়া হয়েছে তাতে সে বিতৃষ্ণা বোধ করছে, কিন্তু পরে স্বাস্থ্যবান যুবকের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক সে আহার্য এবং পানীয়র সদ্ব্যবহার করলো। তারপর সে সিগারেট ধরিয়ে ম্যানেজারকে বললো সে তখন বিশ্রাম করবে। ট্যুরিস্টের কিছুই করার ছিলো না। ম্যানেজার হাসিমুখে বিশ্রামের প্রস্তাব করতেই তা গ্রহণ করলো সে।

ট্যুরিস্টের অভ্যাস নেই তবু সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ক্লান্তি ছাড়াও অন্য একটি কারণ ছিলো। অনেকদিন এমন পরিচ্ছন্ন শয্যায় সুযোগ পাওয়া যায় নি এরকম আবহাওয়াই সে দেখালো। তা ছাড়া কোন বিষয়েই সে এখন তাড়াতাড়ি করতে চায় না।

তাকে একটু লজ্জিত হ'তে হ'লো। ঘুম ভাঙতে সে দেখলো ইনস্পেক্টারের আর্দালি তাকাডাকি করছে। তখন বিকেল হয়েছে।

আর্দালির সঙ্গে ভটভটায় যে লোকটি এসেছিলো, সে জিজ্ঞাসা করলো, 'চা দেয়া হবে নাকি এখন?'

ট্যুরিস্ট বললো, 'তোমাদের যেমন সুবিধা।' লোকটি চ'লে গেলো এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে জানালো চা দেয়া হয়েছে।

বাংলোর বারান্দায় চা-এর টেবল। সামনের দিকে কাঠের রেলিং। টেবলটা

আসবাবপত্র কিন্তু রুচিপূর্ণ। বারান্দার নিচে খানিকটা ঘাসে ঢাকা জমি। তার একধারে বিচুলির স্তূপ। হঠাৎ তার পাশে একটা মযূর উঠে এলো। টেবিলের পাশে পাঁচখানা চেয়ার। টুরিস্ট গিয়ে দেখলো ম্যানেজার এবং ইনস্পেক্টার অপেক্ষা করছে। নিজেদের মধ্যে কিছু আলাপও করছে।

টুরিস্ট সেখানে পৌঁছানোর কিছু পরেই একজন মহিলা এলো সেখানে।

কোন চেহারা আছে যা প্রথমে সাধারণ মনে হ'লেও পরে ধীরে ধীরে তার স্বকীয়তার জন্যই বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে। এই মহিলাটির ক্ষেত্রেও সে রকম হ'লো। গলায় একছড়া লালপলার কারিয়ার। হাত দুখানা নিরাভরণ। রুক্ষ চুল এলো খোপায় জড়ানো। বয়স অনুমান ত্রিশ। রূপের কথায় বলতে হবে— মুখের গড়ন নিখুঁত ছিলো না, গালে বয়ঃ ব্রেকেতার দাগ ছিলো। কিন্তু তার চোখ দুটোর আশ্চর্য বিশালতা এবং ঔজ্জ্বল্য, এবং চিবুকের অপূর্ব গঠন— এ দুয়ের জন্যে একটা অসাধারণত্বই ছিলো তার আকৃতিতে।

সে ঈষৎ হেসে নমস্কার করলে, ম্যানেজার তার পরিচয় দিলো, এই বাংলোর অধিকারিনী বলে। নাম সুনয়নী দেবী।

তখন টেবিলের পঞ্চম লোকটিকে অপেক্ষা করা হচ্ছিলো বোধ হয়। কারণ একজন চাকর এসে বললো— ব্যারিস্টার সাহেব ঘরে চা চেয়েছেন, তাঁকে ঘরে চা দেয়া হয়েছে। তিনি শীকারে যাবেন বলছেন, বন্দুকের ঘরের চাবি চাইছেন।

সুনয়নী এবং ম্যানেজার বিব্রত বোধ করলো। ম্যানেজারের মুখে বিভ্রমের একটা ছায়ার মতো ফুটলো। সুনয়নীর চোখ দুটোতে একটা পরিবর্তন দেখা দিলো এক মুহূর্তের জন্য। তারপর সে হাসলো।

ম্যানেজার টুরিস্ট এবং ইনস্পেক্টারকে জিজ্ঞাসা করলো তারাও শীকারে যেতে চায় কি না। টুরিস্ট সে বিষয়ে তার অনভিজ্ঞতার কথা জানালো। ইনস্পেক্টার বললো সে তার কাজগুলোকেই আগে শেষ করতে চায়।

সুনয়নী উঠে গেলো, কিছুক্ষণ বাদে ফিরেও এলো। সে বন্দুকের ঘরের চাবি দিয়েই গিয়েছিলো। ফিরে এসে সেই চা বানালো। গৃহকর্ত্রী হ'য়েও ইনস্পেক্টার এবং টুরিস্টের সঙ্গে একই টেবিলে বসতে দেখে ইনস্পেক্টার কতজ্ঞই বোধ করলো।

চায়ের আসরেই ইনস্পেক্টার কাজের কথা তুললো।

সিগার ধরিয়ে সে খানিকটা নিবিষ্ট হ'য়ে ধোঁয়ার দিকে চেয়ে রইলো। তারপর ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনাদের গ্রামের কতটুকু গ্রামের

লোকজনের দখলে আছে আর কতটুকু বনজঙ্গলের সেটা আগে ঠিক করা দরকার। আপনি বললেন যেটুকু আপনারা চাষ ক'রে থাকেন তার বাইরেও এই গ্রাম আছে?'

ম্যানেজার বললো, 'পথে যে শুকিয়ে যাওয়া নদীটা দেখে এসেছেন গ্রামটা সে পর্যন্ত ছিলো।'

টুরিস্ট বললো, 'কিন্তু এখন তো গ্রাম নয়, অরণ্য।'

'সে বন আমাদের গ্রামের জন্যই দরকার। মনে করুন মাংস— ও বন না থাকলে মাংস কোথায় পাবো আমরা? কিছু না-খেয়ে তো বাঁচা যায় না।' এই ব'লে হাসলো ম্যানেজার। 'তা ছাড়া আপনারা সেটলমেন্ট থেকে যে খাজনা ধার্য করবেন তাও দিতে আমরা রাজী আছি।'

টুরিস্ট চিন্তা করতে লাগলো।

এই সুযোগে টুরিস্ট আলাপটাকে চায়ের আসরের দিকে নিয়ে এলো। সে বললো, 'শুধু খাদ্যে তো মানুষ বাঁচে না। গান-বাজনা, সংবাদ, এ সবও দরকার।'

ম্যানেজার বললো, 'আমাদের গ্রামে একটা গানের সুর আছে। অন্য সব পাহাড়ী গ্রামের মতোই। তবে একেবারে পৃথক থেকে কিছু পৃথকও হয়ে পড়েছে। কাল দিনের বেলায় ওদের ব'লে দেবো। শুনবেন।'

টুরিস্ট চিন্তা করলো, খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হ'লো তাকে। সে স্থির করলো সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করাই ভালো, বললো, 'রেডিও নেই আপনাদের?' টুরিস্ট অত্যন্ত দৃষ্টিতে, কথাটা ব'লেই, এদিক ওদিক খুঁজলো ওয়ারলেস টেলিফোনের গুঁড়োর জন্য। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজারের চোখ দুটোকেও সে খুব ভালো ক'রে দেখে নিলো। কারণ এরা যদি বাইরের কাউকে সংবাদ পাঠায় তবে ওয়ারলেসই হবে কম কষ্টসাধ্য উপায়।

ম্যানেজার লজ্জিত হ'লো যেন এই রুচিহীনতার লক্ষণ প্রকাশিত হওয়ায়। সে বললো, 'হ'য়ে ওঠে নি।'

কিন্তু এ আলাপে বাধা পড়লো। আপাতত দেখতে গেলে তার কারণ হ'লো ঘরটা। হঠাৎ সে একটা কর্কশ শব্দ ক'রে উঠলো। ইনস্পেক্টার টেবল থেকে বরং বাইরের দিকে চাইলো।

তখন চারিদিকে যে আলোটা দেখা দিয়েছে তার রং হাল্কা খয়েরি, কিন্তু নাট্যশালায় আলো ফেলার মতো কেউ যেন তা ফেলেছে, আর সেই আলোয় গুণ এই যে তার অন্তর্লোকনে সব কিছুই যেন হাল্কা খয়েরিতে আঁকা মনে হচ্ছে।

ইনস্‌পেক্টার বললো, 'আমি সুন্দর তো। এদিকে এমন গোপুলি হয় নাকি?' ম্যানেজার বললো, 'হাঁ।'

ততক্ষণে টেবলের উপরে পোর্সেলেনের সাদা চায়ের সেটেও তখন হাল্কা খয়েরি রং লেগেছে।

এই পটভূমিতেই ব্যারিস্টারকে দেখতে পাওয়া গেলো। বাংলোর বারান্দার নিচে ঘাসে ঢাকা জমিটা পার হ'য়ে গেলো সে। তার হাতে বন্দুক, কাঁধে চামড়ার খাপে ঝোলানো বোধ হয় বিয়ারের বোতলই। সঙ্গে যে লোকটি চলেছে তার হাতে আর একটি বন্দুক এবং টর্চ। বুঝতে পারা গেলো শীকারে চলেছে সে।

রেলিং-এর উপরে ঝুঁকে প'ড়ে কিন্তু ম্যানেজারকে লক্ষ্য ক'রে সুনয়নী বললো, 'বেশি রাত করা কি ভালো হবে?'

ব্যারিষ্টার কিছু বললো মুখ তুলে। তার মুখে সেই খয়েরি রঙের আলো পড়লো। কিন্তু কি বললো তা বোঝা গেলো না।

সুনয়নী এবং ম্যানেজার আবার পরস্পরের দিকে চাইলো। ম্যানেজার তারপর বললো, 'আপনাদের একটু চা দেয়া হ'ক।'

ইনস্‌পেকটার বললো চায়ের আর প্রয়োজন নেই।

টুরিষ্ট বললো, 'উনি তো আপনাদের এষ্টেটের ব্যারিষ্টার নয় শুনলাম। কিন্তু মনে হ'লো এদিকের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত।'

মনে হ'লো ম্যানেজার যেন শুনতে পায় নি। আসলে সে উত্তর দেয়ার আগে চিন্তা ক'রে নিলো। একটু হেসে বললো, 'না। কিন্তু আপনারা কি ঘরে গিয়ে বসবেন?'

টুরিষ্ট বললো, 'বরং লনটায় গিয়ে বসি।'

ম্যানেজার একজন চাকরকে ডেকে ব'লে দিলো। সে খান কয়েক বেতের চেয়ার পেতে দিলো লনটার বিচুলির স্তূপটা যেদিকে দেখা গিয়েছিলো তার কাছাকাছি। একটা বেতের নিচু টেবলও রাখলো সে চেয়ারগুলোর সামনে আর তার উপরে সিগারেটের পরজাম।

ইনস্‌পেক্টারের মনে হ'লো একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে। ফুলের নয় কোন ফলের হওয়ারই স্বাভাবিক।

ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বললো, 'আঙুরের কথা বলছেন?'

তখন বিষয়টা ওদের লক্ষ্যে এলো। যেখানে বসেছিল তারা তার কিছু দূরেই

টিলাটা কয়েক ধাপ নেমে গিয়ে খানিকটা সমতল হয়েছে আবার। সেখানে কেয়ারি করা। থলো থলো আঙুর সেই কেয়ারিতে। গাঢ় খয়েরিতে আঁকা একটা ছবি।

নিচের দিকে দৃশ্যান্তর ঘটলো। নিচের বাড়িগুলোর কাচের সার্সিতে ডুবন্ত সূর্যের আলো পড়ায় মনে হ'লো সে সব বাড়িতে আলো জ্বালানো হয়েছে। এই দৃশ্যের অনুকরণ করে বাঁয়ের দিকে চাইতেই সমস্ত পটটা চোখে পড়লো ইনস্পেক্টারের। হঠাৎ দেখে মনে হ'লো বনে আগুন লেগেছে, গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে তারই শিখা উঠে পড়ছে। কিন্তু সেটা সূর্যাস্তের চিহ্ন। মুহূর্তে দৃশ্যটা বদলেও গেলো। বন যেন বন নয়, যেন তা কাঞ্চনের সমারোহ। অস্ত কখনও এমন দেখালো যেন বনের সবগুলি গাছই পলাশ কিম্বা হাতিম। লাল ফুলে পাতা দেখা যাবে না। বনের মধ্যে সেই শুকনো নদীর কঙ্কালটাকে মনে হয় লাল দাগের মতো দেখায় তার গায়েও রং লেগেছে।

ইনস্পেক্টার বললো, 'এ জন্যই তীর্থযাত্রীদের আসা উচিত।'

ট্যুরিস্ট বললো, 'আর আসেও তারা, কি বলেন?'

এই ব'লে সে ম্যানেজারের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো। ম্যানেজারের মুখে একটা পরম পরিতৃপ্তি হাসির মতো ফুটে আছে তা দেখতে পেলো।

ট্যুরিস্ট বললো, 'ব্যারিস্টার যেখানে শীকারে গেলেন সে সব জায়গাও নিশ্চয় এমনি? কিন্তু সে সব জায়গা কি আপনাদের গ্রামের মধ্যেই?'

ম্যানেজার বললো, 'আমরা তাই মনে করি। আগে যখন পুরনো গ্রামটা ছিলো তখনও তার অধিবাসীদের কিছু বন ছিলো। নতুন গ্রামটা কি ক'রে হ'লো তা বলতে পারি।'

ট্যুরিস্ট বললো, 'বলুন। শুনতে ভাল লাগবে।'

ম্যানেজার বললো, 'বাসদেব ভট্ট থেকেই এই গ্রামের নাম ভট্টটোলা। এখন নাম হয়েছে ভটওলা।'

'বাসদেব ভট্ট বলছেন?'

'তাই নাম ছিলো।' ম্যানেজার বললো, 'দু বছর আগেও জীবিত ছিলেন তিনি। বছর ত্রিশেক আগে সমতল থেকে এই অঞ্চলে এসেছিলেন। তাঁরও আগে তিনি রাজনৈতিক ছিলেন।'

ইনস্পেক্টার বললো, 'বিপ্লবী ছিলেন? তখন অনেক বিপ্লবী আত্মগোপন করতো।'

ম্যানেজার ছেলে বললো, 'তা জানি না। বোধ হয় বিদ্রোহী বলা যায়।'

'তারপর।'

'এক এক ক'রে অন্যেরা এলো। যারা এসেছিলো ফিরে যায় নি।'

কিছুক্ষণ ইনস্পেক্টার যেন এই কথাগুলোই ভাবলো।

সে বললো, 'তখন কি আপনাদের এই গ্রামের সীমা ঠিক করা হয়নি।'

'না। প্রয়োজন হয়নি। এখন বনবিভাগ এই টিলাটা ছাড়া আর সব কিছু দাবি করছে। আপনি দেখুন যদি কিছু করা যায়।' ম্যানেজার বললো।

টুরিস্ট বললো, 'বন থেকে মাংস পান ঘটে, কিন্তু সমতলের উপরে তা হ'লেও আপনাদের অনেক ব্যাপারে নির্ভর করতে হয়। তাই নয়?'

ম্যানেজার বললো, 'খাওয়া পরার জন্য বিশেষ নয়। কেরোসিন, কুইনাইন, বারুদ— এমন কিছু কিছু না কিনলে চলে না।'

'বারুদ?'

'হ্যাঁ, বন্দুকে এখনও ব্যবহার হয়। কিন্তু এখন এখানে চাঁদা পড়বে। ঘরে গিয়ে বসা ভালো। বরং আলোর বন্দোবস্ত করি।'

ম্যানেজার চ'লে গেলো।

সে উঠে যাওয়াতেই যেন বোঝা গেলো সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে। আকাশের কোথাও কোথাও লাল মেঘ আছে বটে, বনের ধারা থেকে আলো নিবে যাচ্ছে।

ইনস্পেক্টার বললো, 'অদ্ভুত নয়?'

টুরিস্ট কিছু ভাবছিলো। বললো, 'কি?'

'রাজনৈতিক নেতার এই পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকা?'

টুরিস্ট বললো, 'এখন তো হ'তে পারে পুলিশের হাত থেকে পালানো দরকার ছিলো।'

'কিম্বা বিপ্লব আর ভালো লাগছিলো না।'

টুরিস্ট বললো, 'সেটাও শুনেছি প্রশংসার নয়। এসকেপিজম্ বলে।'

ইনস্পেক্টার আর একটি চুরুট ধরালো কাদা ক'রে দেশলাই জ্বেলে।

বাংলোর সিটিং রুম। ইতিমধ্যে আলোর বন্দোবস্ত হয়েছে। ইলেকট্রিক্ নেই, কাজেই ল্যাম্প জ্বলছে। টুরিস্ট এবং ইনস্পেক্টার যেতে যেতেই ম্যানেজারও এলো। একটা টিপয় টেনে তার উপরে চুরুটের কেসটা রাখলো সে।

ইনস্পেক্টার হেসে বললো, 'এ চুরুট কিন্তু আপনাদের সমতল থেকে আনতে হয়।'

'তা হয়।'

'ম্যানেজার বাবু, বামদেব ভট্ট সম্বন্ধে আর যদি কিছু বলেন শুনি।'

ম্যানেজার বললো, 'ওটা একটা ওয়ে অব লাইফ।'

ম্যানেজারের মুখে এই প্রথম ইংরেজি শুনে একটু বিস্মিত হ'লো টুরিস্ট। খুশীও হ'লো কারণ এটাকে সে ম্যানেজারের একটা অসতর্ক আত্মপ্রকাশ মনে করলো। একটা কপট হাসি মুখে এনে বললো, 'কিন্তু কি তার বিশেষত্ব?'

'যা দেখছেন তার বেশি কিছু নয়।' বললো ম্যানেজার। 'দুটার রুটি, আলু, আর মাংস এই নিয়েই এখানকার জীবন। এটুকু যোগাড় করতেই সন্ধ্যা হ'য়ে যায়।' সন্ধ্যার পরে, যাদের চোখের দৃষ্টি আছে, তারা পনর থেকে হতো বোনে।'

ইনস্পেক্টার আবার বললো, 'আমার কিন্তু কৌতূহল হচ্ছে জানতে আপনাদের এখানে কি চা বাগানের মতো ব্যবস্থা— মানে এখানকার যত কিছু সবই কি একজন বা একটি কোম্পানীর সম্পত্তি।'

ম্যানেজার বললো, 'সব কিছুই ভট্ট বাবুর। তিনি আসবার আগে কিছুই ছিলো না।'

ইনস্পেক্টার বললো, 'তখন বলছিলেন এ সবই এখন মূল্যবান।'

'হ্যাঁ। একটা ডীল ক'রে তাকেই সব দিয়ে গিয়েছে ভট্টবাবু।'

'ইনি? মানে—'

ম্যানেজার একটা চুরুট ধরালো। তারপরে বললো, 'ওয়ারিশ।'

ইনস্পেক্টার বললো, 'কিন্তু তাঁর তো আরও ওয়ারিশ থাকতে পারে সমতলে। তাঁর বংশের লোক। তারা তো দাবী করতে পারে?'

'ডীল আছে।' ম্যানেজার বললো, একটু হাসলো সে। তারপর আবার বললো, 'তাতে বলা আছে, এখানে বাস না করলে ভটএলার সঙ্গে কারো কোন সম্বন্ধ নেই।'

একটু ভাবলো ম্যানেজার। তারপরে বললো, 'দাবি করতে পারে। আপনাদের সঙ্গে ব্যারিস্টার এসেছেন।'

টুরিস্ট ভাবলো ব্যারিস্টার যেখানে এই বাড়িতে শীকার করছে সেখানে

পরিকল্পনা করা তার কর্তব্যের অঙ্গ হবে। কাল দিনের বেলায় স্বীকারের প্রস্তাব যদি আসে তবে তা সুবিধারই হবে।

ইনস্‌পেক্টার চিন্তা করলো। জিম্মের দলকের বিপ্লবীদের কে কোথায় শেষ পর্যন্ত গিয়েছিলো তা পুলিশের লোকরা অনেক চেষ্টা করেও সব সময়ে জানতে পারে নি। বাসুদেব ভট্ট হয়তো তেমন কেউ হবে কিম্বা বিপ্লবীদের গোপন কচিৎ প্রকাশিত এবং কুলিখিত ঘটনাপঞ্জীতে হয়তো তাকে মৃত বলা হয়েছে। তারপর তার মনে পড়লো ম্যানেজারের মুখের সেই ইংরেজি মন্তব্যটা— ওয়ে অব লাইফ। তার অর্থ দাঁড়ায় বিজির এই মালভূমিতে ছুট্টার কটি, আলু, মাংস, আর ঘরে বোনা রেশমের মধ্যে জীবন যাপন করা! কিন্তু এরকম জীবনে অনেক বাধা আছে। এখানে ধনবহুল তার অধিকার ছাড়বে ব'লে মনে হয় না আর ব্যারিস্টার যদি উইল নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করে তবে সেটা হবে ভিতর থেকে আক্রমণ।

কিন্তু তার এই চিন্তার উপরে কিছু একটা এসে পড়লো। মনে যা রাখার থাকলে ব্যাপারটা আগে চোখে পড়তো, সূচনা থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে দেখা যেতো। এখানে হঠাৎ নজরে এলো। বাতাসের ঝাপটায় ঘরের আলোটা কেঁপে কেঁপে উঠলো। দরজা জানলার শব্দ হ'লো। দূরের অন্ধকার দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠলো কয়েকবার।

ইনস্‌পেক্টার বললো, 'ঝড় উঠবে?'

ম্যানেজার বললো, 'বিকেলের মেঘ দেখে বোঝা উচিত ছিলো।' এই বলে সে ভাবলো।

ইনস্‌পেক্টার বললো, 'অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেলো না। আপনার কি মনে হচ্ছে।'

'এদিকে নাও হ'তে পারে। দূরের পাহাড়ের গায়ে হচ্ছতো। শীতকালের বৃষ্টি।'

এ সময়ে সার্সির গায়ে ছোটা ছোটা বৃষ্টি এসে পড়তে লাগলো।

একজন চাকর এসে ঘরের জানলার পাশে একটা বাড়তি আলো রেখে গেলো। আর তার পিছন পিছন সুনয়নী এলো। কিন্তু সে বিব্রতও হ'লো। সে যেন দুএক মুহূর্তের জন্য ইনস্‌পেক্টার ও ট্রাস্টের কথা ভুলে গিয়েছিলো।

ফিরে যেতে যেতে দরজার কাছে দাঁড়ালো সে। ইতস্তত করলো। তারপর বললো, 'কয়েকটা কাচের সার্সির পাশে আলো রাখতে ব'লে দিয়েছি।'

'কেন?' ম্যানেজার তার দিকে দু এক মুহূর্ত চেয়ে রইলো। উত্তরটা যেন সে নিজের মনেই খুঁজে পেলো। পরে বললো, 'তা ভালোই করেছ। কিন্তু অনেক কিছু নেই বোধ হয়।'

কিন্তু তার অস্বস্তি প্রকাশ পেলো যখন সে তার অ্যাশট্রেতে রাখা আলানো সিগারেটটা ফেলে দিয়ে নতুন ক'রে সিগারেট ধরালো।

তার এই অস্বস্তি থেকেই ইনস্পেক্টারের মনে পড়লো— তারা ঘরে থাকলেও ব্যারিস্টার এই কক্ষটি এবং অন্ধকারের মধ্যে মনে শীকার করছে। এই দুর্যোগে নিশ্চয় সে অসুবিধায় পড়েছে।

এ থেকেই তার কথা উঠলো আবার।

ইনস্পেক্টর বললো, 'আপনারা কি ব্যারিস্টারকে এর আগে কখনও দেখেছেন?'

ম্যানেজার বললো, 'না। আপনারা যখন বিশ্রাম করছিলেন তখনই তার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছে। তিনি পরিচয় দিয়েছেন।'

'সে কি ভটওলার সম্পত্তি দাবি করবে ব'লে মনে হয়? কিম্বা তার আত্মীয়তার দাবি সম্বন্ধে কি আপনি পরীক্ষা করেছেন?'

'জানি না।' ম্যানেজার বললো, 'কিন্তু ভটুবাবুর চেহারার সঙ্গে ব্যারিস্টারের চেহারার এমন একটা মিল আছে যা থেকে ধ'রে নেয়া যায় একই বংশের লোক তারা।'

এই সময়ে একজন চাকর আবার ঘরে ঢুকলো। সার্সির কাছে যে আলোটা রাখা হয়েছিলো সেটাকে শার্প ক'রে উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে গেলো।

ইনস্পেক্টার বললো, 'ব্যারিস্টার তো এদিকে এই প্রথম?'

কিন্তু এ প্রশ্নটা অবান্তর। আগেই এ সম্বন্ধে জানা গিয়েছে।

ইনস্পেক্টারই আবার বললো, 'ব্যারিস্টারের কোন বিপদ হবে না তো?'

'সাধারণত হয় না। সঙ্গে যে লোকটি আছে সে ভটওলারই লোক। মাঝে মাঝে সপ্রেয় ক'রে ফিরতে কখনও কখনও রাত্রি হয়। ঝড় বৃষ্টিও হয়। তা ছাড়া এটা বর্ষাকাল নয়।'

ম্যানেজার ঠিকই বলেছিলো। মেঘটা ভটওলার উপর থেকে দক্ষিণে ধরং দক্ষতলের দিকে স'রে গেলো। টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগলো।

ম্যানেজার বললো, 'একটু কফি দেয়া হবে?'

ইনস্পেক্টারের কফির দরকার ছিলো না।

সে বরং বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। আর সেখানে গিয়ে সে দাঁতানোর কিছুক্ষণের মধ্যে দরজার কাছে সুনয়নীকে দেখা গেলো। বারান্দার নিচেও কিছুদূর পর্যন্ত ঘরের আলো গিয়ে পড়েছে। তারপরে অন্ধকার।

সুনয়নী অস্ফুটস্বরে বললো, 'আমাদের কিছু করা উচিত?'

'আলো দিয়ে লোক পাঠানো যেতে পারে যদি বলো।' ম্যানেজার বললো।

কিন্তু রাত তখন প্রায় আটটা। বাংলোর নিচের পথে দু একটা কুকুর ডাকলো— পথে অস্বাভাবিক কিছু দেখলে যেমন ডাকে। তারপর অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখা গেলো কেউ যেন উঠে আসছে।

ক্রমে ব্যারিস্টার বাংলোর আলোর সীমায় এসে পড়লো। এই বর্ষায় বাইরে থাকলে যেমন হয় তেমন হয়েছে তার অবস্থা। তার পোশাক জলে ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। হাঁটু পর্যন্ত কাদা।

ম্যানেজার হেসে বললো, 'শীকার হ'লো?'

ব্যারিস্টার এই কথায় পিছন ফিরে চাইলো আর তখন বাংলোর লোকেরা দেখতে পেলো কারণ তার সঙ্গের লোকটিও ততক্ষণে আলোর সীমায় এসে পড়েছে। শীকার তার পিঠে। বোঝার ভারে সে চলতে পারছেনা। বারান্দার অবশেষে সে শীকারটা নামালো।

ব্যারিস্টারই বললো, 'নিজের মাংসই হরিণীর বৈরী।'

কিন্তু তখন শীতের বৃষ্টিতে ভিজে তার যে অবস্থা পোশাক না বদলালে চলে না।

ম্যানেজার বললো তাই।

একটা তত্ত্ব এই যে বাঘমারার পরে বাঘের গল্প বলতে তীব্র একটা আগ্রহ হয় মনে। আর সে গল্পের শ্রোতার সামাজিক অবস্থিতি বিচার ক'রে দেখা হয় না। শীকারের বেলাতেও বোধ হয় তা হয়, কারণ ব্যারিস্টার তার কফির পেয়ালা হাতে নিজেই ইনস্পেক্টারদের কাছে এসে বললো। চাকরই বরং তার কফির ট্রেটা ব'য়ে আনলো।

সুনয়নীও এসেছিলো। উৎকণ্ঠার পরে সেও তখন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলো।

ব্যারিস্টার বললো, 'বাংলোর আলো দেখে পথ খুঁজে পেতে সুবিধা হয়েছিল।'

তখন ইনস্‌পেক্টার হঠাৎ বুঝতে পারলো সাদির পাশে কেন বাতিটি আলো রাখা হয়েছিলো।

ব্যারিস্টার তার শীকারের গল্প যা বললো সেটা কিছু নয়। কিন্তু মনে যে কত উঠেছিলো তার কথা উল্লেখ করতেই ইনস্‌পেক্টার বললো, 'বিপদ হতে পারতো।'

সুনয়নী কিছু না ব'লে একটা কাপে কিছুটা কফি ঢেলে নিলো।

ব্যারিস্টার হেসে বললো, 'ভার শীতও। আমার মনে হচ্ছিলো বরফও পড়ছে।'

ম্যানেজার বললো, 'তা হওয়ারই কথা। শীতের বৃষ্টি।'

ব্যারিস্টারকে ভিজে পোশাকে যেমন দেখেছিলাম সে দৃশ্যটা ইনস্‌পেক্টারের মনে পড়লো।

হয়তো সুনয়নীরও মনে প'ড়ে থাকবে। সে সামান্য হেসে চেয়ারের পিঠে রাখা তোয়ালেটা এগিয়ে দিলো। তখন লক্ষ্য করলো ইনস্‌পেক্টার ব্যারিস্টারের কাঁধের কাছে চুলের গোড়ায় তখনও জল লেগে আছে।

রাত্রিতেও খাওয়ার ব্যবস্থা টেবলে হ'লো। ডিনারের কায়দায় টেবল সাজানো হয়েছে। ম্যানেজার, ইনস্‌পেক্টার, টুরিস্ট এবং সুনয়নীও বোধ হয়। কিন্তু ব্যারিস্টারও এলো। বিকেলে ঘরে যা দিতে বলে যে পার্থক্যটার সূচনা করেছিলো সে— সেটাকে আর রাখলো না। তখনও সেই শীকারের গল্প করার ঝোঁকটাই তার মনে আছে।

সুনয়নীর একদিকে ম্যানেজার, অন্যদিকে ব্যারিস্টার, সামনে ইনস্‌পেক্টার এবং টুরিস্ট। গোল টেবলটায় উজ্জ্বল হ্যালোজেনের আলো। একজন বুড়ো চাকর পরিবেশন করছে।

ম্যানেজার, দেখা গেলো, এক সময়ে শীকার-পটু ছিলো। আর সে ভালো গল্প বলতেও পারে। ব্যারিস্টারও তার শীকারের গল্প বললো আবার। কেমন ক'রে ঝড় উঠলো বনে। কেমন ক'রে হরিণের দল সেই ঝড়ের সঙ্গে দিশেহারা হ'য়ে পড়লো।

সুনয়নী বললো, 'দিশেহারা ব'লেই শীকার হয়েছে।'

ব্যারিস্টার বিব্রত হ'লো।

কিন্তু ম্যানেজার কথাটা থেকে সেই দ্বন্দ্বপরিহাস দূর ক'রে মধুর ক'রে দিলো। 'কারো কারো সাহসে সন্দেহ করা যায় না।'

সুনয়নীর পরনে গাঢ় লাল রঙের সিল্কের শাড়ি। চুলগুলো উঁচু করে বাঁধা। এত উঁচু যে তার সোনালি রঙের ব্লাউজের অনেকটা চোখে পড়ছে। গলায় স্কটকের মালা। কানে লাল কাচের দুল। নিরাভরণ বাঁ হাতখানা কাঁধ পর্যন্ত নিরাবরণও বটে।

সে হাসল।

'পুরুষের সাহস আর মেয়েদের রূপ আজকাল দুষ্প্রাপ্য।' এই বললো ইনস্‌পেক্টার। সুনয়নী তার মেটের দিকে মুখখানা নামালো। চুরিস্ট বললো, 'এ উক্তিটাকে আমি সমর্থন করি।' সে ভাবলো: আপাতত দেখা যাচ্ছে, এক নম্বর এদের বন্দুকের লাইসেন্স নেই, দ্বিতীয়ত ওয়াইন তৈরির একসাইজ ডিউটি দেয় না। তিন নম্বর বনমহলে বেআইনী শীকার করছে। এসবও তার রিপোর্টে যাবে। রূপের কথাই তাকে মনে করিয়ে দিলো। পোলিটিক্যাল সোরেন্সাগিরি ছাড়াও, স্মাগলিংও হ'তে পারে যেন কোকেন। সেখানেও রূপ থাকে।

সুনয়নী বললো, 'ওরোর শীকার কিন্তু সব চাইতে উত্তেজনার ব্যাপার হ'তে পারে।'

'ওরোর?'

'হাঁ। জেওলিন কিম্বা শিয়ারে।'

ব্যারিস্টার একটু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকালো তার দিকে।

সুনয়নী হাসলো। সে কাচের জাগটা থেকে জল ঢেলে নিলো আর সেই আগ থেকে একটা আলো ঢেউএর মতো তার ডান হাত বেয়ে কাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে গেলো তার বক্ষল ভেদ করে করে।

ব্যারিস্টার বললো, 'বনে?'

সুনয়নী হাসলো মুখ টিপে টিপে। সামনের বক্ষল জাগটার গায়ে হাত বুলালো সে।

ম্যানেজার বললো, 'ঘোড়ায় চ'ড়ে শীকার করতে হয়।'

ব্যারিস্টার বললো, 'এখন থাকে?'

সুনয়নী খোঁপা খোলালো। তার চোখ দুটোতে আলো পড়লো যেন।

ওয়াইন দিয়ে গেলো চাকর। ব্যারিস্টার বোতল খুললো। নিজেই সুনয়নীর গ্লাসটাকে পূর্ণ ক'রে দিলো।

সুনয়নী বললো, 'ধন্যবাদ।'

ব্যারিস্টার ওয়াইনের স্বাদ নিয়ে বললো, 'জেতলিনে ওরোত পাওয়া যায়।'

সুনয়নী হেসে বললো, 'আজ রাতে নয়।'

পীকারের নেশার ব্যাপারে এরা খুব কাছাকাছি যেতে পারে সন্দেহ নেই।

টুরিস্ট বললো, 'এ ওয়াইন কি ভটওলায় তৈরী?'

ম্যানেজার বললো, 'তেমন ভালো হয় না। হাঁ।'

ইনস্‌পেক্টার বললো, 'নিস্বার কিছু নেই।' উক্ত আহার্য এবং উক্ত পানীয়র জন্য গোল সোনালি চশমার পিছনে তার চোখ দুটোকে উজ্জ্বল দেখালো। সে লক্ষ্য করলো সুনয়নীর গালে এখন একটা বড় তিল দেখা যাচ্ছে। আগে সেটা দেখা যায় নি।

টুরিস্ট বললো, 'কখনও কখনও আপনারা কি ওয়াইনও আনান দক্ষতল থেকে।'

ম্যানেজার বললো, 'অকেশান হয়নি।'

ব্যারিস্টার আবার তার গ্লাস পূর্ণ ক'রে নিলো। সুনয়নী গ্লাসের দিকে হাত বাড়াতেই সে ছেলে গ্লাসের উপরে হাত রাখলো। মাথা দুলিয়ে বললো আর চাইনা।

ব্যারিস্টার বললো, 'শীত লাগছেনা।' সুনয়নী কি মাথা দোলালো?

তার নিরাবরণ ঘাড় দুটোই লক্ষ্যে এলো।

ম্যানেজার বললো ইনস্‌পেক্টারকে, 'এর পরে কি বলবেন? কাগজপত্র দেখাতে পারি।'

ইনস্‌পেক্টার বললো, 'আপনার অসুবিধা নেই তো?'

ম্যানেজার বললো, 'বরং সুবিধাই হবে। কাল অন্য কাজ আসতে পারে।'

ব্যারিস্টার আর একটু ওয়াইন ঢেলে নিলো।

সুনয়নী হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালো। হাঁই তুললো সে। হাত দিয়ে সেটাকে আড়াল করলো। সেটা একটা কিকবিক হাসিতে শেষ হ'লো। 'আপনারা এখন কাজের কথা বলবেন' এই বলে সে বিদায় নিলো। সে যখন চ'লে যাচ্ছে তখন তাকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া গেলো। তার সম্বন্ধে সুনিতম্বনী বিশেষণটাই তখন প্রযোজ্য হ'লো।

ম্যানেজার বললো, 'আমরা এখন চরুট ধরাতে পারি।'

ইনস্‌পেক্টার চুরুট ধরালো।

টুরিস্ট বললো, 'এসব দেখে আমারই আগ্রহ হচ্ছে পীকারে যাওয়ার।'

ম্যানেজার বললো, 'এ অত্যন্ত ভালো প্রস্তাব। কাল হয়তো স্থনয়নী ওয়োর শীকারে যাবে।'

ব্যারিস্টার বললো, 'নিশ্চয়। যোড়াও দরকার হবে।'

ম্যানেজার বললো, 'বলে দেব। কিন্তু সেখানেই ইনস্পেক্টার সাহেবের এক্তিয়ারে মাস্থি আমরা। ওই অঞ্চলটাকে বনমহল বিশেষ ক'রে দাবি করছে।'

ব্যারিস্টার বললো, 'আপনাদের কি কাগজপত্র নেই? সেগুলো আনিয়ে নিন। দেখা যাক। বন ব'লেই বনমহলের হবে এমন কথা নেই। রাইট অব পজেসন বলেও একটা কথা আছে।'

ইনস্পেক্টার বললো, 'তা আছে। কিন্তু সেটা তো প্রমাণসাপেক্ষ।'

এই ব'লে সে চশমা মুছে মুছে নিয়ে আবার পড়লো যেন তখন সে কাগজ দেখার জন্ত প্রস্তুত হয়েছে।

টুরিস্ট ভাবলো: সে এদের এই আলাপের মধ্যে ঢুকবার কোন পথ পাচ্ছে না। শীকারের কথায় তার বরং সুবিধা হ'তো। অন্তত ব্যারিস্টার আজ কোথায় শীকারে গিয়েছিলো তা জানতে পারলে পথঘাট সম্বন্ধে ধারণা করা যেতো।

কিন্তু ব্যারিস্টার আলাপটাকে সেদিকে যেতে দেবে কি?

ব্যারিস্টার বললো হেসে, 'প্রমাণ, দেখুন, প্রমাণের কথায়, সেটা যে কখন কোন দিক থেকে এসে যাবে, তাও আমরা জানি না।'

ম্যানেজার আলাপের ধারায় এই নতুন গতি দেখে খুশী হয়েছে বোঝা গেলো।

সে বললো, 'ওয়াইন আনতে বলি।'

ব্যারিস্টার বললো, 'অবশ্যই যদি তাতে অসুবিধা না হয়। বরং কাগজ দেখার কাজটা দিনের বেলার জন্ত থাক। কারণ আমার ক্লায়েন্ট, আমি তটতলাকে আমার ক্লায়েন্ট বলতে চাই যদি ম্যানেজার বাবু আপত্তি না করেন, নিশ্চয়ই আশা করতে পারে অন্ত কাউকে কাগজ দেখানোর আগে আইনের পরামর্শ নেবে।'

ব্যারিস্টার সিগারেট ধরালো হাসি মুখে।

ম্যানেজার চাকরকে ডেকে ওয়াইন আনতে বলে দিলো।

টুরিস্ট বললো, 'এমন সুন্দর একটি রাত্রি।'

ম্যানেজার বিস্মিত হ'লো, তার মুখের দিকে চাইলো। তারপর সে যেন

ব্যাপারটাকে আন্দাজ করলো। বললো সে, 'আমরা বোধ হয় ভুলে যাচ্ছি, এখানে এমন একজন আছেন যাঁর কাছে আমাদের এই কাগজ নিয়ে কথাবার্তা বিবেচনার।'

ব্যারিস্টার লজ্জিত হ'লো। বললো, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আমাদের বরং সাধারণ আলাপেই থাকা উচিত।'

ওয়াইন এলো। ম্যানেজার বোতলটা খুললো।

পরিবেশন করলো সেই। বললো, 'এ ওয়াইনটা খুব ভালো হবে ব'লে মনে হয় না। কাল আমি নিজে খুঁজে দেখবো।'

টুরিস্ট চায় নি এভাবে সকলেই তার দিকে মনোযোগ দিক্। সে এতে বরং বিব্রতই হয়েছিলো। সে লজ্জার একটা অভিনয় ক'রে বললো, 'আমি কিন্তু আপনাদের আলাপে কোন অসুবিধা বোধ করছিলাম না। বরং এই রাত্রিটার প্রশংসা করছিলাম।'

ব্যারিস্টার বললো, 'সে কিছু নয়। ওটা আমাদেরই কর্তব্য ছিলো। ম্যানেজারবাবু, বরং কাল কি হবে তাই বলুন।'

ইনস্পেক্টার ভাবলো: ব্যারিস্টার যা বলছে সেটা মিথ্যা নয়। আর যদি বনমহলের কাছে থেকে এরা যদি কিছু আদায় করতেই পারে তবে তার ব্যক্তিগত ক্ষতি নেই। তবে রিপোর্টটা সে ঠিকঠাকই দেবে।

আলাপটা তখন আগামী সকালের শীকারের দিকে গড়িয়ে গেলো।

টুরিস্ট চেষ্টা করলো সংবাদ সংগ্রহ করতে কিন্তু যা ফল হ'লো তাতে সে স্থির করলো পদ্ধতিটাকে বদলে নিতে হবে। ইনস্পেক্টার ভাবতে গিয়ে একটা নিশ্চিন্ততাই বোধ করলো। তার ফলে তার মুখে যা ততক্ষণে মনে আবছায়া হ'য়ে উঠেছে একটা শান্ত ভাব দেখা দিলো। সে ভাবলো: এই তদন্তের ব্যাপারে একজন আইনজ্ঞ থাকায় ভালোই হবে। রিপোর্টে আইনের দিকটা আলোচনা তাকে করতেই হ'তো। এখন সেটা সহজ হবে।

ম্যানেজারই বেশির ভাগ কথা বললো। যেমন হওয়া স্বাভাবিক, দেখা গেলো, ছুট্টার রুটি, মাংস, আঙুর এবং ঘরে বোনা পশমের এই পাহাড়ী গ্রাম ভটভলাকে সে ভালোবাসে। যদিও জীবনটা সব দিক দিয়ে খুব সুখের নয়। যা নিয়ে বনমহলের সঙ্গে বিবাদ হ'তে পারে সে বিষয়েও কখনও কখনও অসুবিধা দেখা দেয়। দু বছর আগে ঘণিদের এক সংক্রামক ব্যাধিতে এদিকের জঙ্গলে মাংসের অভাব বিশেষ ভাবেই হয়েছিলো।

অবশেষে ব্যারিস্টার বললো, কাল খুব সকালেই সে রওনা হ'য়ে যেতে চায় শীকারে। সুতরাং এখন সে বিদায় নেবে।

ম্যানেজার হাই তুললো। বললো, 'তাহ'লে আপনাদের শোবার ঘর দেখিয়ে দিক।' সে চাকরকে ডাকলো।

ব্যারিস্টার তার শোবার ঘর জানতো। সে চ'লে গিয়েছিলো। ম্যানেজারও বিদায় নিলো।

ট্যুরিস্ট এবং ইনস্পেক্টার চাকরের পিছন পিছন নিজেদের ঘরের দিকে চ'লে গেলো।

সে সময়ে কথাটা হঠাৎ মনে হ'লো ট্যুরিস্টের। সে ভাবলো : এ রকমও হ'তে পারে হয়তো এরা তাকে চিনে ফেলেছে। এবং ব্যারিস্টারের এটা একটা অভিনয় যাতে ম্যানেজার সাহায্য করছে। আর তা যদি হয় তবে তার সব পরিকল্পনাই নষ্ট হবে। তার মনে তখন বিশেষ অস্বস্তি দেখা দিলো।

সে এটাকে দূর করার জন্য বললো, 'নতুন জায়গায় আপনার ঘুম কেমন হয়।'

'তা হয়।'

রাত্রিতে ঘুম যেমনই হ'ক, ট্যুরিস্ট সকালেই উঠেছিলো। কিন্তু সে প্রস্তুত হ'য়ে বাইরে এসে দেখলো তার আগেই অনেকে উঠেছে। সে ঘুমানোর আগেই ভেবেছিলো ব্যারিস্টারের সঙ্গেই সে যাবে। কিন্তু বারান্দায় পৌঁছেই সে দেখলো ছটা পনির পিঠে ব্যারিস্টার এবং খুনয়নী রওনা হচ্ছে। তাদের হাতে ছোট বর্শা আছে মনে হ'লো।

ঘুমানোর আগে যা মনে করা যায় ঘুম ভাঙার পরে সেটাকেই সব সময়ে ধ'রে রাখা যায় না। ব্রেকফাস্টে কালকের শীকারের রোস্ট চিবোতে চিবোতে ট্যুরিস্ট মনঃস্থির করলো। ব্যারিস্টার শীকারে গিয়েছে, ম্যানেজার এবং ইনস্পেক্টার খুব সম্ভব জমির খাসকোষ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এ অবস্থায় সে একা একা বনে ঘুরে বেড়াতে পারে যদি না ইনস্পেক্টারের জমি মাপার কাজে উৎসাহ দেখায়। নতুবা বাংলোয় থেকে কিছুখবর সংগ্রহ করাকেই কর্তব্য ব'লে স্থির করে সে। অনেক ভেবে শেষেরটিকেই সে উপযুক্ত বোধ করলো। এবং ব্রেকফাস্ট চৈবলেই সে ঘোষণা করলো কোমরে ব্যথা বোধ করছে। ব্রেকফাস্ট শেষে যখন ম্যানেজার এবং ইনস্পেক্টার রওনা হচ্ছে ট্যুরিস্ট, সুতরাং, তখন মনে মনে ঘোড়ার এই সুযোগ নষ্ট হওয়ার জন্য নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিলো।

ম্যানেজার বললো, 'কাল হবে। কালও বেরোনো যাবে।'

ম্যানেজার এবং ইনস্‌পেক্টার পায়ে হেঁটেই রওনা হ'লো।

কিছুক্ষণ টুরিস্ট বারান্দাতেই ব'সে রইলো। তারপর সে চাকরদের সঙ্গে আলাপ করতে সুরু করলো। পুলিশের দারোগা যেভাবে সকলকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে সে রকম অবশ্যই নয়। বরং তাদের কাছে গিয়ে ঘটনা সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ ক'রে যতটুকু জানা যায় তার চেষ্টা করলো। বারান্দায় ব'সেই সে তার লাঞ্চ খেলো যখন ম্যানেজার এবং ইনস্‌পেক্টারের ফিরতে দেরি হ'তে লাগলো। কিন্তু সে বিস্মিত না হ'য়ে পারলো না চাকর এবং কিসেরও বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে। অভাবের কথা বললো একজন, অভাবের তাড়ায় যে অভিযোগ থাকে তা নয়। কিন্তু অন্য কেউ যে কখনও এখানে আসে এ রকম সংবাদ কোথাও পেলো না সে। বরং যে চাকরদের কথায় বিশ্বাস করতে হ'লে এটা একটা পাহাড়ী গ্রাম যা সমুদ্রের ট্রাক রুট থেকে পথের ধারে পড়ে গিয়েছে। অন্য কথায় সভ্যতার কাছে হারিয়ে যাওয়া একটা দ্বীপ। সকাল থেকে সন্ধ্যা ফুটার ক্ষেত, নারপাতি, আপেল, কমলার তদ্বির করা। মাংস ফুরিয়ে গেলে শীকার করা : পাহাড়ী ছাগলের দোষ থেকে মোটা পশম বোনা। এছাড়া আর কিছু নয়।

অবশেষে ম্যানেজার এবং ইনস্‌পেক্টার ফিরলো। তখন লাঞ্চের সময় পার হ'য়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। এবং ঠিক এই সময়েই টুরিস্টের মনে হ'লো ইনস্‌পেক্টারের উপরেও তার নজর রাখা দরকার।

কিন্তু ব্যারিস্টার এবং সুনয়নী ? টুরিস্টের মনের মধ্যে এ দুটি নাম যেন ঝিক্ ঝিক্ ক'রে কাঁপতে লাগলো। লক্ষ্য করার বিষয় এই লাঞ্চে তারা আসে নি এমন কি এখন বিকেলের চায়ের সময়ও পার হ'য়ে যাচ্ছে।

কালকের মতোই গোধূলি নামলো। বারান্দায় ইনস্‌পেক্টার এবং ম্যানেজার এবং টুরিস্ট তখন সারাদিনের কথা আলোচনা করছে সুনয়নী এবং ব্যারিস্টারকে আসতে দেখা গেলো। সারাদিনে তাদের ক্লান্ত হওয়ারই কথা। কিন্তু ক্লান্তি সত্ত্বেও তাদের সুখী মনে হ'লো এবং সেটা একটি কঠিন বিপজ্জনক কর্তব্য ভদ্রলোকভাবে শেষ করতে পারার তৃপ্তি হ'তে পারে।

টুরিস্ট ভাবলো এখন বাকিটুকু কালকের মতোই ঘটবে। সেই ডিনার টেবল, এবং ওয়াইন। অবশেষে হয়তো ইনস্‌পেক্টার এবং ব্যারিস্টারের ধন-মহলের দাবি নিয়ে অভিনয়। (অভিনয় হওয়াটা অন্তত অসম্ভব নয়।) আর

তখন মনে হবে কাল রাত্রিতে যে ডিনার সুরু হয়েছিলো আজ রাত্রিতেও সেটাই চলেছে। কাল কখন শেষ হয়েছে আজ কখন সুরু হ'লো তা বোঝা যাবে না।

এমন সময়ে একজন চাকর এসে বললো ইনস্পেক্টার স্নান করবে কি না। গরম জল দেয়া হয়েছে। রাত্রির খাবার সকাল সকাল দিলে তাঁদের আপত্তি আছে কিনা তাও জানতে চেয়েছেন স্থানীয়। ।

টুরিস্ট ভাবলো: সে আজ একটা কাজই করতে পারে। পথ একটা নিশ্চয়ই আছে। সে পথে তারা এসেছে তা ছাড়াও। এবং সে পথে ব্যারিস্টার আজ কতদূর গিয়েছিলো তা জেনে নিতে হবে। আর কাল সকালে সেই পথের খোঁজেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কারণ পোলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের খবরে খুব মারাত্মক ভুল কখনও থাকে না।

ডিনারের খানিকটা সময়ে ইনস্পেক্টার বললো, 'কিন্তু ভটওলার বর্তমান মালিক স্থির ক'রে নেয়া দরকার হবে।'

ম্যানেজার বললো, 'তা হবে।'

'প্রমাণ করা দরকার জমিগুলো এখন যাদের দখলে আছে বন হ'য়ে যাওয়ার আগেও তাদের কিম্বা তাদের পূর্বপুরুষের দখলে ছিলো।'

ব্যারিস্টার বললো, 'এখানে একটা চা বাগানও হয়।'

ম্যানেজার বললো, 'চা বাগান? সে সুস্থভাবে বিস্মিত হয়েছে বোঝা গেলো।

ব্যারিস্টার বললো, 'সুরাড এ জায়গা আমার ভালো লেগেছে।'

টুরিস্ট বললো, 'কিন্তু চা চালান দেয়ার সহজ পথ একটা দরকার।'

ব্যারিস্টার একটু থামলো। (যেন অযোধ্যা বন্দরে টুরিস্টের এই অনুপ্রবেশে সে বিস্মিত হয়েছে।) তারপর ডিনার টেবলের আলাপের মতোই সহজ ক'রে নিলো সে। বললো, 'পথ আছে। পথ আরও ভালো করা যেতে পারে।'

টুরিস্ট তার আনন্দ গোপন করার জন্য তার প্লেটের দিকে মুখ নামালো। এমন অসতর্ক উত্তেজনার সময়েই প্রকাশ পাওয়ার কথা। পথ না থাকলে রোমাঞ্চও থাকে না।

স্থানীয় ছেলে বললো, 'চা বাগান করতে হ'লে থাকতে হয়।'

ইনস্পেক্টার বললো, 'তা দীর্ঘদিনই।'

'অযোধ্যা।' বললো ব্যারিস্টার।

ডিনার শেষ হওয়ার আগেই ব্যারিস্টার বললো, 'ওয়াইন আসুক।'

ইনস্‌পেক্টার বললো, 'কিন্তু আজ রাত্রিতে কাগজগুলো দেখবেন ?'

'নিশ্চয়। এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে রাজী আছি।'

ওয়াইন এলো।

টুরিস্ট চিন্তা করলো : ইনস্‌পেক্টার বারবার বনবিভাগের দলিল কথাতেই ফিরবে। আলাপটাকে বরং চা বাগানের কথায় রাখলে সুবিধা ছিলো। সে সুযোগের অপেক্ষা করবে এই স্থির করলো।

অবশেষে কালকের মতোই ওয়াইনের শেষটুকু ঢেলে নিলে ব্যারিস্টার আর তখন সুনয়নী উঠে দাঁড়ালো।

ম্যানেজার চুরুট ধরালো। ইনস্‌পেক্টার চেয়ারে পিঠ ঠেলে দিয়ে প্যান্টের বোতাম একবার খুলে ভুঁড়িটাকে আলগা ক'রে দিলো।

টুরিস্ট বললো, 'চা বাগান বোধ হয় এখানে ভালোই হয়। কিন্তু এর আগে কেউ করে নি কেন ভাবছি। বন্দরে যাওয়ার পথ নেই হয়তো।'

ব্যারিস্টার বললো, 'নিশ্চয়ই আছে, কিম্বা ছিলো। এ জেলার বন্দরে কি গ্রামের লোকরা যেতো না ?

টুরিস্ট মনে মনে নিজের পিঠ চাপড়ে দিলো।

ম্যানেজার বললো, 'কাগজপত্রগুলো আনি এখানেই।'

'ওয়াইনও।' বললো ব্যারিস্টার।

ইনস্‌পেক্টার বললো, 'উইলটাও।'

ব্যারিস্টার বিস্ময় প্রকাশ করলো, 'উইল ?'

ম্যানেজার বললো, 'তা আছে। ভট্টবাবুর উইলের কথাই।'

'কনটেষ্ট করা যায় ?' ব্যারিস্টার নতুনরে বললো। 'আসুন, তাও আসুন।'

ম্যানেজার কাগজপত্র আনতে গেলো। কিন্তু কাগজ দেখার প্রস্তাবটা সংশোধিত হ'লো। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো সুনয়নী। তার ম্যানিকিওর করা নখের আঙুলগুলো সে রাখলো দরজার চৌকাঠে। বললো সে 'তাস খেলবে ব্যারিস্টার ?'

ব্যারিস্টার বললো, 'নাথিং বেটার।'

দরজার রাখা সুনয়নীর আঙুলের ফাঁকে একটা সিগারেট জ্বলছে, আর তা একটা মণির মতো।

'আসবে ?' সুনয়নী হাসলো।

ব্যারিস্টার চ'লে গেলো।

ইনস্‌পেক্টার সিগারেট ধরালো। আর টুরিস্ট তখন ভাবলো তর্কের শেষ বলে কিছু একটা সে নিশ্চয় পেয়ে যাবে। যদি ওদের ম্যাপ থাকে আর অভিনয়ের অতি নাটকীয়তার ঝোঁকে যদি সেটাকে বার করে তবে ভালো ক'রে দেখে নিতে হবে। অবশ্য এমনও হ'তে পারে সে ম্যাপটা ভুল কিছু।

ম্যানেজার কাগজপত্র নিয়ে ফিরলো। কিন্তু তারা কিছু আলোচনা করার আগেই করিডরের ও পারে একটা ঘরের জানলা খুলে গেলো.কিম্বা হয়তো কমিয়ে রাখা আলোটা উজ্জ্বল করা হ'লো কাচের শার্সির ও পারে। সামনে টিপয়ে তাস। নিচু একটা সোফায় বসেছে ব্যারিস্টার। অন্য একটি সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে সুনয়নী।

ম্যানেজার কাগজপত্রগুলো একটা টিপটের উপরে রাখলো। একটা একটা ক'রে নিয়ে ইনস্‌পেক্টারের সামনে মেলে ধ'রে তাদের পরিয়ে দিলো। এটা উইল, এটা পরিচা, এটা তেরিজ ইত্যাদি। ইনস্‌পেক্টার উঠে গিয়ে আলোটাকে বাড়িয়ে দিয়ে এলো। বললো, 'ব্যারিস্টার থাকলে সুবিধা হ'তো।'

ব্যারিস্টার তখন তবুও তাসগুলো সাফ্‌ল করলো। সুনয়নী ফ্রেঞ্চিং টেবলটার পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে সোফায় বসলো। ব্যারিস্টার তাস বাঁটলো।

ম্যানেজার বললো, 'আপনি দেখুন, পরে না হয় ব্যারিস্টারের সঙ্গে আলোচনা করা যাবে।' চুরুটের ছাই ঝাড়লো সে।

ইনস্‌পেক্টার একটা কাগজ পড়তে শুরু করলো। পড়তে পড়তে গোঁফের প্রান্ত আঙুলে নিয়ে খেলা করার মুদ্রাদোষ আছে তার।

ম্যানেজার বললো টুরিস্টকে, 'আমরা একটু স্বার্থপরের মতো কাজ করছি। আপনাকে ডরাইন আনিয়ে দেবো?'

'তা দরকার হবেনা।' বললো টুরিস্ট, 'আমিও আপনাদের কাগজপত্রের আলোচনায় যোগ দিতে পারি যদি তাতে আপনাদের আপত্তি না থাকে। তাতে এ প্রশ্নটা সম্বন্ধে আমার ধারণাটা পরিষ্কার হবে।'

ম্যানেজার বললো, 'স্বচ্ছন্দে স্বচ্ছন্দে, এগিয়ে আসুন।'

টুরিস্ট মনের তলায় হাসলো; ওলড্ ফক্স্। খেলোয়ানার গায়ন আর তোমার মধ্যে দূরত্ব খুব দূর নয়। বোঝা যাচ্ছে ব্যারিস্টার এবং সুনয়নীর পরিচয় অন্তত দু চার বছরের পুরনো যতই তুমি বলো এই প্রথম এসেছে ব্যারিস্টার। নতুবা ব্যারিস্টার রাত্রিতে একা শীকারে যায় না, নতুবা সুনয়নী এবং সে সকাল থেকে সন্ধ্যা সূর্যের শীকারে কাটিয়ে আসেনা। আর এখনও দেখো।

মুখের সামনে তাস মেলে ধরেছে সুনয়নী। ধনো হ'লো দাঁতের ব্যথা পড়েছে তাসের ভগায়।

তাস ফেলে অ্যাসট্রে থেকে সিগারেট তুলে নিলো ব্যারিষ্টার। ধোঁয়াটা পাক খেয়ে আলোটার দিকে এগিয়ে গেলো।

তাস ফেলে খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠলো সুনয়নী। তাসগুলো গুছিয়ে ধ'রে আবলো ব্যারিস্টার। হাতের তাস ফেলে আয়নোতা তাকলো সুনয়নী।

চাকর এলো ও ঘরে। ট্রেতে মদের বোতল এবং গ্লাস। সুনয়নী সোফাটায় হেলে বসলো। আর তার ফলে তার বুকে আলো পড়লো। বোতলের সিলটা খুললো ব্যারিস্টার। সুনয়নী সোফাটার হাতলে হাত বুলাচ্ছিলো। নিজের গ্লাসটা ভরে নিলো ব্যারিস্টার, তারপর তাস বিলি করলো। সুনয়নী গ্লাসে ওয়াইন নিলো।

টুরিষ্ট ভাবলো : এইসব তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যেই অদ্ভুতভাবে কোন কোনটি অসরাষের প্রমাণ হবে তা এখনই বলা যায় না। কাজেই এরা কাগজ দেখুক এবং ওরা তাস খেলুক। নিঃশব্দে লক্ষ্য ক'রে যাওয়াই কাজ হবে তার। এবং যদি সম্ভব হয় ব্যারিস্টারের সঙ্গে ফটগুলার কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে ম্যানেজারকে দিয়ে আরও কিছু মিথ্যা বলিয়ে নিতে হবে।

সে একটু স'রে বসলো। তার ফলে তার মুখটার আধখানা অন্ধকারে পড়লো। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলো সে।

উইলটা পড়লো ইনস্পেক্টার : আমি যখন পালিয়ে এসেছিলাম তার পরে অনেকদিন গিয়েছে। আমার বয়স হয়েছে। এখন ঘুমের ঘরে গেলে বিশ্রান্তি অনুভব করি। পরপর কয়েকদিনই এই রকম অনুভব করলাম। আগামী বসন্তে কি নতুন লাল পাতা দেখে ঈর্ষা হবে? লক্ষ্য করলাম মহুয়া গাছটিকে। পাতা ঝরে গিয়েছে। আবার নতুন হবে। কিন্তু মানুষ?

তাস তুলেই হাতের তাস ফেলে দিয়ে হেসে উঠলো সুনয়নী। ব্যারিস্টার অবাক হ'য়ে তার দিকে, তার তাসের দিকে তাকালো। সুনয়নী গ্লাস থেকে লালাভ মদ ঢেলে নিলো। তার চোখ দুটো টানাটানা দেখালো।

ইনস্পেক্টার বিব্রত হয়েছে বোঝা গেলো। উইলটা নামিয়ে রেখে সে চুরুট টানলো দু এক মিনিট। তার লাল গোঁফগুলো তখন আরও লাল দেখালো। উইলটা পড়লো সে আবার : মানুষের তেমন উপায় নেই। গাছের অভিজ্ঞ বৃদ্ধ অংশ থেকে নবীন অংশে আশ্রয় নিতে পারে। আমাদের এখানকার

জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্যকে আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছি। আমার সে ভালোবাসা কোথায় আশ্রয় পাবে ?

ম্যানেজার হাই তুললো। হ্যাঙ্গারে আলোটা লাল হ'য়ে আসছে। ম্যানটেলে তেল আসছে না। টুরিস্টের মনে হ'লো কালও এমন হয়েছিলো।

সে রাত্রিতে টুরিস্ট নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারলো না। ম্যানেজার এবং ইনস্‌পেক্টার স্থির করলো বাকি কাগজ কাল দিনের বেলায় পড়া যাবে। ওরা তাস সামনে রেখে গল্প করছে এখন।

কিন্তু রাত্রিতে টুরিস্ট উঠে বসেছিলো বিছানায়। তার মনে হয়েছিলো কারা কথা বলছে। কম্বিউরে দাঁড়িয়ে সে অনুভব করলো এখনও যেন ওরা তাস খেলছে। কিন্তু আলোটা যেন বদলেছে। এটার চিমনি বোধ হয় নীল রঙের। নীল আলোটা কাঁপলো। মশারির পাশ থেকে ছপা হেঁটে গিয়ে ড্রেসিং টেবলটার সামনে দাঁড়ালো সুনয়নী। মাথার উপরে হাত উঁচু করে চুলগুলোকে এলো খোপায় জড়ালো সে। তার মুখে হাসি দেখা দিলো যেন। তারপর দরজা খুলে সেটাকে বাইরে থেকে ঠেলে দিয়ে সে বেরিয়ে গেলো।

*

এ গল্পটার কথা লোকে জানতো না যদি ইনস্‌পেক্টার এবং টুরিস্ট চার পাঁচ বছর পরে তাদের অভিজ্ঞতাকে সেই ওয়েটিংরুমে আলোচনা না করতো।

ওল্ডার ফুলকা কটি, হরিণীর র‍্যাংএর রোস্ট, আর, একটু হালকা কিন্তু মিষ্টি ওয়াইনের এবং শেষে উইলের কথা বলে ইনস্‌পেক্টার টুরিস্টকে জিজ্ঞাসা করলো সে আর কখনও গিয়েছে কিনা ভটওলায়।

টুরিস্ট বললো, 'না! পোলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট ঠিকই ছিলো। কাছাকাছি এক চা বাগান থেকেই সে সব ব্যাপার হ'তো। নিজেদের আজ্ঞাকে গোপন করার জন্য ভটওলার নাম ব্যবহার করতো। বলা যেতে পারে, যে ভটওলায় আমরা গিয়েছিলাম সেটা নয় পোলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ভটওলা। কিন্তু সেই উইলের কি হ'লো ?'

'এই পাঁচ বছরে কেউ কনটেষ্ট করে নি। একটা ইচ্ছাকে কেই বা কনটেষ্ট করতে পারে।'

টুরিস্ট আবার জিজ্ঞাসা করলো, 'তা হ'লে ব্যারিস্টার ?'

ইনস্‌পেক্টার তার চায়ের কাপে চুমুক দিলো।

কাপটা নামিয়ে রেখে অবশেষে সে বললো, 'বছর দুয়েক আগে বার লাইব্রেরীতে তাকে দেখেছিলাম হলুদে, রোগা। পোশাক ছেঁড়া এবং ময়লা। ফ্রিজের সিঙ্কনে ঘোড়ার ছবি আঁকছিলো।'

Silpa Sree Works
Manufacturers & Exporters
Quality Leather Purses,
Wallets, Ladies Hand Bags
Etc.
7 Shama Charan Dey Street
CALCUTTA 12

এক্ষণ

পত্রিকা মুদ্রণ :
ব্যবসা-ও-
বাণিজ্য প্রেস

চিত্র মুদ্রণ :
বেঙ্গল
অটোটাইপ
কোম্পানী

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
নিউ প্রাইমা
প্রেস

ব্যবসা-ও-
বাণিজ্য প্রেস,
৯।১০, মহাত্মা
গান্ধী রোড স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯
হইতে শ্রীবীর
ঘোষ কর্তৃক
মুদ্রিত এবং
৯, মাহাত্মা
গান্ধী রোড,
কলিকাতা-১২
হইতে
শ্রীবসন্ত
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় বর্ষ

পরিক্রমা

চতুর্থ সংখ্যা

সূচীপত্র

পুনর্মুদ্রণ

আমার কথা

প্রবন্ধ

এক নয়, বহু — শঙ্খ ঘোষ

অনুবাদ

ওথেলো — সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়

শেক্সপিয়রের সনেট — অমীন্দ্র রায়

চিত্ত ঘোষ

জগন্নাথ চক্রবর্তী

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

অমীন্দ্র রায়

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

গল্প

স্বপ্ন-নৌকা — কমল কুমার মজুমদার

কবিতা

কয়েকটি কবিতা — শক্তি চট্টোপাধ্যায়

গল্প

দু'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়ি — অতি নন্দী

সম্পাদকীয়

আমাদের কথা

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্মাল্য আচার্য

এক্ষণ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক দ্বিমাসিক পত্রিকা। দুই মাস অন্তর বছরে মোট ছয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। গ্রাহক-মূল্য (বার্ষিক) ছয় টাকা।
ডাক খরচ আমাদের। পত্রিকা 'সার্টিফিকেট অব পোস্টিং'-এ পাঠানো হয়।
প্রতি সংখ্যার দাম এক টাকা। পত্রিকা ভি. পি. করা হয় না।
পুরক সংখ্যা বা গ্রাহকের জন্য টাকা মনিঅর্ডারে পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

কলকাতা ও বাইরে সর্বত্র এজেন্সীর জন্য যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পত্রিকায় যাঁরা লেখা পাঠাতে ইচ্ছুক তাঁরা পাণ্ডুলিপি রেখে লেখা পাঠাবেন।
উপযুক্ত ডাক টিকিট না দিলে সব সময়ে চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

পত্রিকা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে যোগাযোগের ও টাকা পাঠানোর ঠিকানা:
ম্যানেজার, এক্ষণ ; ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

কার্যালয়ের নতুন ঠিকানা
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রকাশক
দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ১৩১১

আমার কথা

বিনোদিনী দাসী .

শেষ সীমা।

গল্প

মহাশয় !

আপনাকে আর কত বিরক্ত করিব ! এ ভাগ্যহীনার কলঙ্কিত জীবনের পাপকথা দ্বারা আপনাকে আর কত জ্বালাতন করিব ! কিন্তু আপনার দয়া ও অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া এ পাপ জীবনের ঘটনা মহাশয়কে নিবেদন করিতে সাহস করি। সেই কারণে নিবেদন এই যে, যদি এতদিন দয়া করিয়া ধৈর্য্যসহকারে আমার যন্ত্রণাময় কথা শুনিয়াছেন তবে শেষটাও শুনুন।

মানুষ যদি আপনার ভবিষ্যৎ জানিতে পারিত, তাহা হইলে গর্ব্ব অহঙ্কার সকল পাপই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইত ! কি ছিলাম, কি হইয়াছি ! তখন যদি বুঝিতাম যে সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর দিতেও পারেন এবং নিতেও পারেন, তাহা হইলে কি মান অভিমানের খেলা লইয়া বৃথা দিন কাটাইতাম ! এখন দিন গেছে, কথাই আছে, আর আছে স্মৃতির জ্বালা ! পাপের অনুতাপ ! কিন্তু ঈশ্বর দয়াময় তাহাও নিশ্চয় ! জীব যতই অধঃপতিত হউক না কেন, তাঁর দয়াতে বঞ্চিত নহে। তিনিই যেন, তিনিই দন, ইহাও তাঁহার করুণা, ইহাতে আক্ষেপ নাই। সেই অসীম করুণাময় এই নিরাশ্রয়া পতিতা ভাগ্যহীনাকে একটী সুশীতল আশ্রয়স্থল দিয়াছেন। সেখানে বসিয়া এই দুর্ব্বিসহ বেদনাপূর্ণ বুক লইয়া একটু শান্তিতে ঘুমাইতে পাই ! ইহা তাঁহারি করুণা ! এখন শেষ কথাগুলি শুনুন।

আমি যে সময় থিয়েটারে কার্য্য করিতাম, সেই সময়ের দু'একটী কথা বলি। আমি এত বালিকা বয়সে অভিনয় কার্য্যে ব্রতী হইয়া ছিলাম যে, আমি যখন "সুরোজিনী"তে "সুরোজিনী"র অংশ অভিনয় করিতাম, তখন এখনকার "ষ্টারে"র সুযোগ্য ম্যানেজার মহাশয় ঐ নাটকে "বিজয়সিংহে"র অংশ অভিনয়

করিতেন। তিনি এখনও বলেন, "সে সময় তোমার সহিত আমার বিজয়সিংহের ভূমিকা লইয়া প্রেমাভিনয় বড় লজ্জা হইত। কিন্তু অভিনয় এত উৎকৃষ্ট হইত যে একদিন অভিনয়কালীন "ভৈরবাচার্য্য" যখন "সরোজিনী"কে বলি দিতে যায়, সেই সময় দর্শকমণ্ডল এত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়া ছিল যে ফুটলাইট ডিঙাইয়া ষ্টেজে উঠিতে উদ্যত। তাহাতে মহা গোলযোগ হইয়া অনেক অভিনয় কার্য্য বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। ইহা তোমার মনে আছে কি?"

"বিল্বমঙ্গলে" আমি "কুসুমের" অংশ অভিনয় করিতাম। আমাদের মতন চঞ্চলস্বভাবা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সেই ভীরুস্বভাবা, শান্ত, শিষ্ট, এতটুকু হৃদয়মধ্যে অসীম ভালবাসা লুকাইয়া আত্মীয় স্বজন বর্জ্জিত হইয়া পরগৃহ প্রতিপালিতা হইয়া তাহার উপর দুর্গতি যেমতেই হউক, আর যতই দোষেই হউক, সেই প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ রূপে, গুণে, সহায় সম্পদে, মনে প্রাণে উচ্চ সেই আশ্রয়দাতাকে দান করিয়া, অভিমান সহিষ্ণুতার সহিত সেই বেদনা ভরা বুকখানিকে, বুকের মধ্যে লুকাইয়া সেই আশ্রয়দাতাকে আত্ম-সমর্পণ করিয়া সশঙ্কিত হৃদয়ে কত দিন কাটান! উপায় নাই, অবলম্বন নাই, আপনার বলিবার কেহ নাই, আত্মনির্ভরতাও নাই, এই ভাবে অভিনয় করিতে যে কত ধৈর্য্য প্রয়োজন, তাহা সমভাবি অভিনেত্রী ব্যতীত অন্যতর করিতে পারিবেন না! এই সময় মাননীয় গিরিশবাবু মহাশয় আমার সহিত "নগেন্দ্রনাথে"র অংশ অভিনয় করিতেন।

"বিল্বমঙ্গলে"র "কুসুমে"র অভিনয়ের পরই "পথবাসী একাদশী"র "কাঞ্চন"! কি স্বভাব সম্বন্ধে, কি কার্য্য সম্বন্ধে কত প্রভেদ! অভিনয়কালে আপনাকে যে কত ভাগে বিভক্ত করিতে হইত তাহা বলিতে পারি না। একটী কার্য্যপূর্ণ ভাব সম্পূর্ণ করিয়া অমনি আর একটী ভাবকে সংগ্রহ করিতে হইবে। আমার এটী স্বভাবসিদ্ধ ছিল। অভিনয় ব্যতীত আমি সদাসর্ব্বক্ষণ এক এক রকম-ভাবে মগ্ন থাকিতাম।

"দুর্গাদিনী"তে "মনোরমা"র চরিত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা যে কতদূর কঠিন, তাহা যাঁহারা না দুর্গাদিনীর অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন না! একাধারে বালিকা, প্রেমময়ী যুবতী, পরাধর্ম্মপালী মন্ত্রী, অবশেষে পরম পবিত্র চিত্ত স্বামী সহমরণ অভিলাষিণী ধৃতচেতা সতী রমণী! যে কেহ "মনোরমা"র অংশ অভিনয় করিবে, তাহাকেই একাধারে এতগুলি ভাব সর্ব্বতোভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে! গাম্ভীর্য্যের সহিত "পশুপতি"র সঙ্গে কথা

করিতে করিতে হঠাৎ খালিকাবুদ্ধি ধরিয়া "পুকুরে হাঁস দেখিসে," বলিয়া চলিয়া যাওয়া যে কত অভ্যাস ও চিন্তাসাধ্য তাহা ধারণা করাই কঠিন। সাধীর্য্য ভাব পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ অবিকল খালিকাভাব ধারণ যদি স্বাভাবিক না হয় তাহা হইলে দর্শকের নিকট অতি হাস্যজনক হইয়া উঠে; "ভাকাব" বলিয়া অভিনেত্রী উপহাসাস্পদ হন! সেই কারণে বঙ্কিমবাবু মহাশয় নিজে বলিয়াছিলেন যে "আমি মনোরমার চিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, স্বচক্ষে যে প্রত্যক্ষ দেখিব এমন আশা করি নাই; আজ বিনোদের অভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল।"

আমার অভিনয় সম্বন্ধে কাগজে-কলমে যে বিস্তর সমালোচনা হইত, তাহা বলা বাহুল্য! সমালোচনায় অবশ্যই নিন্দা প্রশংসা উভয়ই ছিল, কিন্তু তাহাতে নিন্দা বা প্রশংসার কথা কি পরিমাণে ছিল তাহা যাহারা আমার অভিনয় দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। আমি সমালোচনা বড় দেখিতাম না! তাহার কারণ এই যে, যদি প্রশংসার কথা শুনিয়া আমার দুর্ব্বলচিত্তে অহঙ্কার আসে তবে তো আমি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইব। যাহা হউক ভগবানের উপর ঐ স্থানটীতে আমার শ্রদ্ধা করিয়াছেন। আমার এখন যেমন নিজেকে হীন ও জগতের ঘৃণিতা বলিয়া ধারণা আছে, তখনও তাহাই ছিল। আমি সুখিলবের ভিখারী ছিলাম। তখনকার আমার অভিনয় সম্বন্ধে পরম পূজনীয় স্বর্গীয় পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় তাঁহার "বিল এণ্ড বায়ং" পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার এক সপ্তাহের একখানির একটুকু লেখা আমি তুলিয়া দিতেছি—

"But last not least shall we say of Binodini? She is not only the Moon of Star company, but absolutely at the head of her profession in India. She must be a woman of considerable culture to be able to show such unaffected sympathy with so many and various characters and such capacity of reproducing them. She is certainly a Lady of much refinement of feeling as she shows herself to be one of inimitable grace. On Wednesday she played two very distinct and widely divergent roles, and did perfect justice to both. Her Mrs. Bilasini Karforma, the girl graduate, exhibited so to say an iron grip of the queer phenomenon,

the Girl of the Period as she appears in Bengal society. Her Chaitanya showed a wonderful mastery of the suitable forces dominating one of the greatest of religious characters who was taken to be the Lord himself and is to this day worshipped as such by millions. For a young Miss to enter into such a being so as to give it perfect expression, is a miracle. All we can say is that genius like faith can remove mountains."

ইহার তাৎপর্য্য এই—

ষ্টার থিয়েটারের অভিনেত্রীবর্গের মধ্যে শ্রীমতী বিনোদিনী চতুরা স্বরূপা। বলিতে কি তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত অভিনেত্রীবৃন্দের শীর্ষস্থানীয়া। বিশেষ শিক্ষিতা ও অভিজ্ঞা বলিয়া তিনি বহুবিধ চরিত্রের স্বাভাবিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তৎ চরিত্র প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবং তিনি বিশিষ্টরূপ ব্যক্তিত্বশালিনী বলিয়া, কোন অভিনেত্রীই এ পর্য্যন্ত তাঁহার মনোহারিত্ব অনুকরণ করিতে পারেন নাই। বিগত বুধবার (৭ই অক্টোবর ইং ১৮৮৫) তিনি দুইটী বিভিন্ন ও পরস্পর সম্পূর্ণরূপ বিসদৃশ চরিত্রের অভিনয় করিয়া, উভয় চরিত্রের সম্যক সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। শিক্ষিত ব্রহ্মী প্রাকুরেড্ বিলাসিনী কায়করঘার চরিত্র অভিনয়ে তিনি আধুনিক বঙ্গ সমাজের শিক্ষিতা মহিলার আদর্শস্বরূপা, অদ্ভুত দৃশ্যের কঠোর ভাব প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্যা হইয়াছেন।

আর যে চৈতন্যদেবকে ভগবান জানিয়া লক্ষ লক্ষ লোক পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়েন, তাঁহার চরিত্রাভিনয়ে ইনি যে প্রকৃতির বহুবিধ সঙ্কট শক্তির উপর আধিপত্য রাখিয়া থাকেন তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। কুমারী বিনোদিনীর পক্ষে এরূপ মহাপুরুষের চরিত্রাভিনয়ে সেই চরিত্রের সম্যক বিকাশ প্রদর্শন, একপ্রকার অনৈসর্গিক ব্যাপারই বলিতে হইবে, তবে ঐশী প্রতিভা ও বিশ্বাস পর্ব্বতসদৃশ বাধাও অতিক্রম করিয়া থাকে!

আমার কত লোক নিন্দাও করিত, সে নিন্দা অভিনয় সম্বন্ধে নহে। বলিত যে এইরূপ লোকযাত্রা একটী উচ্চ অঙ্গের চরিত্র অভিনয় করাই দোষ। যাহার যাহা মনের ভাব বলিত। আমাদের সময়ে যেমন প্রশংসা ছিল তেমনি কোনরূপ ত্রুটী হইলে নিন্দার জোরও তদধিক ছিল। অতি সামান্য ত্রুটী হইলে অজস্র কটু কথাদ্বারা গালাগালি দিতেন।

আমার থিয়েটারে কার্যকালীন, সময়ে সময়ে কত দৈববিপাকে পড়িতে হইয়াছিল। একবার প্রবীলার চিতা-আরোহণ সময়ে পরিহিত ধাবার কাপড় ও চুল একেবারে জ্বলিয়া উঠে। একবার ষ্টেনিয়া লাফিয়া পড়ে তারের উপর হইতে নীচে একেবারে পড়িয়া যাই। এইরূপ দৈববিপদে যে কতবার পড়িয়াছি কত আর বলিব! অভিনয়কালীন যেমন আমার পার্টের দিকে মন থাকিত, তেমনি পোষাক পরিচ্ছদের সম্বন্ধেও যত্ন ছিল। ভূমিকা উপযোগী সাজিবার ও সাজাইবার আমার সুখ্যাতি ছিল। যখন নলদময়ন্তীর নূতন অভিনয় হয়, সেইসময় "নল"কে রং ও ড্রেস করিয়া দিবার জন্য কোন সাহেবের দোকান হইতে এক সাহেব আসিয়াছিল। যেহেতু অমৃতলাল মিত্র মহাশয় কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, রং ও পরচুলা অনেক টাকার আসিল। আমাকেও অনেকে বলেন যে "তুমিও রং করিয়া লও।" আমি বলিলাম যে আগে নল মহাশয়ের রং হউক দেখি। পরে "নলে"র রং করা দেখিয়া আমার মনঃপূত হইল না, বরং হাসি পাইল। যেন তেলচিটা তেলচিটা মনে হইতে লাগিল। আমি তখন বলিলাম যে "না মহাশয় আমার ড্রেস ও রং আমি আপনি করিতেছি দেখুন!" তখন আমি পোষাক ও রং সম্পূর্ণ করিলাম, সকলে দেখিয়া বলিলেন যে এই রং বেশ হইয়াছে। সেই অবধি অমৃতবাবু যতবার "নল" সাজিতেন ততবারই আমি রং করিয়া দিতাম। অন্য কেহ রং করিয়া দিলে তাঁর পছন্দ হইত না। ইহার দরুন অন্য এক্‌ট্রেসরা সময়ে সময়ে অসন্তুষ্ট হইত। আমার একদিন তাড়াতাড়ি থাকাতে বনবিহারিণী (বুনী-) নাম্নী একজন অভিনেত্রী বলিয়াছিল যে, "আসুন অমৃতবাবু, আমি রং করিয়া দিই।" অমৃতবাবু তাহার উত্তরে বলেন যে "রং ও পোষাক সম্বন্ধে বিনোদের পছন্দ সকলের হইতে উত্তম।" আমি সকল সময়েই নিজে নিজের পোষাক ও রং করিতাম, ড্রেসারেরা শুধু সংগ্রহ করিয়া দিতেন। আমি এখন স্বরুচিসম্পন্নরূপে ড্রেস করিতে পারিতাম যে আমার পোষাকের কেহই প্রায় নিন্দা করিত না। আমার মাথার চুলগুলিকে যখন যেভাবে প্রয়োজন হইত সেই ভাবেই বিন্যস্ত করিতে পারিতাম। আমার চুলের কার্লিংগুলি এত সুন্দর হইত যে গিরিশবাবু মহাশয় আদর করিয়া বলিতেন যে, "একজন ইটালিয়ান কবি বলিতেন তাঁহার পুস্তকের একটী সুন্দর বালিকার মুখের এক স্থানের একটী ছিলের জন্য তাঁহার জীবন দিতে পারিতেন; তোমার এই চুলের কার্লিংগুলি দেখিলে ইহার কত দাম ঠিক করিতেন বলিতে পারি না।" হইতে পারে গিরিশবাবু আমায় স্নেহ করিতেন বলিয়া খুব বেশী বলিতেন, কিন্তু আমার

ক্লেসের কেহ কখন নিন্দা করেন নাই। একণকার "ষ্টার থিয়েটারের" সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ও আমার ক্লেস করিবার অতিশয় সুখ্যাতি করিতেন। থিয়েটারের অভিনেত্রীগণের নিজ নিজ পোষাকের উপর বিশেষ মনোযোগ রাখা প্রয়োজন। যেহেতু একজন লোককে বালা, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য সকল দশা অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়া দর্শকসমীপে উপস্থিত হইতে হয়। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, শান্তি, গম্ভীর নানারূপ মনের অবস্থা দেখাইতে হইবে, তখন একই জনকে সুখের ভাব ও অন্তরীয় ভাবও নানারূপ দেখাইতে হইবে। সেইজন্য পোষাকেরও পরিবর্ত্তন চাই। কেননা "আগে দর্শন ভালি, পিছে:ড় গুণ বিচারি।"

যে সময় আমি থিয়েটারের কার্য্যে জীবিকা অতিবাহিত করিয়াছিলাম, পূর্ব্বে বলিয়াছি তো যে সুকার্য্য কিছু করি আর না করি বুদ্ধির বিপাকে প্রবৃত্তির অনেক মন্দ কর্ম্ম করিয়া থাকিব। "ষ্টার থিয়েটার" প্রতিষ্ঠা করিবার কালীন এত ঘাত-প্রতিঘাত সহিতে হইয়াছিল যে ইহার ক্লেস থিয়েটার হইতে অবসর লওয়ার পরও শেষ হয় নাই। কোন এক রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করিতেছি। আমার গুপ্ত মুখ বাবুর আশ্রয় লইবার সময় আমার পূর্ব্ব আশ্রয় দাতা সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত অতিশয় দাঙ্গা-হাঙ্গামার উপক্রম হওয়ায় আমাকে লুকাইয়া থাকিতে হয়। পরে সর্ব্বকার্য্য সমাধা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ হইলে একদিন পূর্ব্বোক্ত সম্ভ্রান্ত যুবক আমার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, যে "বিনোদ, তুমি আমার প্রতারণা করিয়া তোমার স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইলে; কিন্তু এ তোমার ভুল! তুমি কতদিন লুকাইয়া থাকিবে? আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন তোমার শত্রুতা করিব। আমার কথার কখনই ব্যতিক্রম হইবে না। তুমি ঠিক জানিও আমার কথা মিথ্যা হইবে না। মৃত্যুর পরও তোমায় দেখা দিব জানিও।" আমি তখন একথা বিশ্বাস করি নাই, বোধহয় আমার মুখে একটু অবিশ্বাসের হাসিও দেখা দিয়াছিল; কিন্তু ১২৯৬ সালের ৩রা অগ্রহায়ণ যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন আমি ইহার সত্যতা অনুভব করিতে সক্ষম হই। তখন আমি থিয়েটার হইতে অবসর লইয়া ঘরে বসিয়াছিলাম। উক্ত রবিবারে সবেমাত্র আমার ঘরে সন্ধ্যার আলো দিয়া গিয়াছে। আমি সেদিন আলস্য ভাবে বিছানায় সন্ধ্যার সময়ই শয়ন করিয়াছিলাম। আমার বেশ মনে আছে যে, আমি নিদ্রিত ছিলাম না। তবে মনটা কেমন অবসন্ন ছিল, সেইজন্য সন্ধ্যার সময়ই শুইয়াছিলাম, কোন কারণ না থাকিলেও যেন দেহ মন অবসন্ন

হইয়া আসিতে ছিল। আমি অর্দ্ধ নিমীলিত দৃষ্টিতে আমার ঘরের প্রবেশদ্বারের দিকে চাহিয়াছিলাম, এমন সময় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে সেই বাবুটি ধীরে ধীরে আমার ঘরের সম্মুখের দ্বার দিয়া অতি ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর আসিয়া আমার মাথার দিকে খাটের ধারে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন। এবং আমায় সম্বোধন করিয়া অতি ধীর ও শান্ত ভাবে বলিলেন, যে "মেনি, আমি আসিয়াছি!" তিনি প্রায়ই আমায় "মেনি" বলিয়া ডাকিতেন। আমার বেশ মনে আছে যে যখন তিনি ঘরের মধ্যে আসেন তখন আমার দৃষ্টি বরাবর তাঁর দিকেই ছিল। তিনি খাটের নিকট দাঁড়াইবামাত্র আমি চমকিত ও বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "একি! তুমি আবার কেন আসিয়াছ?" তিনি যেন কাতর নয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি যাইতেছি তাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।" তাঁহার কথা কহিবার সময় কোনরূপ চঞ্চলতা বা অঙ্গ চালনা কিছুই ছিল না; যেন ধাতীর তৈয়ারী পুতুলের মতন মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছিল। আমার একবার মাত্র মনে হইল যে তিনি একটু দরিয়া আমার দিকে হাত তুলিলেন। একটু ভয়ও হইল আমি ভয়ে কিছু পশ্চাৎ সরিয়া গিয়া বলিলাম, "সে কি! তুমি কোথায় যাইতেছ? আর এত দুর্ব্বল হইয়াছ কেন?" তিনি যেন আরও বিষণ্ণ ও স্থির হইয়া বলিলেন, "ভয় পাইও না আমি তোমায় কিছু বলিব না; আমি বলিয়াছিলাম যে আমি যাইবার সময় তোমায় বলিয়া যাইব, তাই বলিতে আসিয়াছি, আমি যাইতেছি?" এই কথা বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় সেই দরজা দিয়াই চলিয়া যাইলেন!

ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি চমকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম, কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন উপর হইতে উচ্চৈঃস্বরে আমার মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া বলিলাম, "মা উপরে কে আসিয়াছিল?" মা বলিলেন, "কে উপরে যাইবে? আমি তো এই সিঁড়ির নীচেই বসিয়া রহিয়াছি।" আমি বলিলাম, "হাঁ মা অমুক বাবু যে আসিয়াছিলেন!" আমার মা হাসিয়া বলিলেন, "দরজায় খিলির বসিয়া আছে, আমি সদর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি; কে আসিবে? তুই স্বপ্ন দেখ লি নাকি? (খিলির আমাদের দরওয়ান) কোন ব্যক্তি বাহির হইতে আসিলে অগ্রে সে খবর দেয়।" তখন আর কিছু না বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে ঘরে চুপ করিয়া শুইয়া মনে করিতে লাগিলাম, যে কি হইল? সত্য কি স্বপ্ন দেখিলাম নাকি? তাহার পর দিবস সন্ধ্যার আমি বাটীর ভিতর বারান্দায় বসিয়া আছি, আর আমার মাতা

কি কার্যবশতঃ নগর ময়দানে গিয়াছিলেন। এমন সময় রাস্তার নীচ হইতে এক ব্যক্তি একখানা ঠিকাগাড়ীর ভিতর হইতে বলিয়া উঠিলেন, "ওগো গিন্নি! শুনিয়াছ, গত কল্য সন্ধ্যার সময় বাবুর মৃত্যু হইয়াছে।" সেই লোকটা মৃত ব্যক্তির একজন কর্মচারী! তাহার কথা রাস্তা হইতে আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম।

আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলাম সত্যই কি তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি সত্তাপালন করিয়া গেলেন। পূর্ব্ব দিনের স্মৃতি আসিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার শরীর যেন বরফের মত শীতল অনুভব হইতে লাগিল।

এই ক্ষুদ্র ঘটনা লিখিবার উদ্দেশ্য অন্য কিছুই নহে, মৃত্যুর পর মানুষ যে স্বচ্ছন্দে কোন জীবিত ব্যক্তির নয়নগোচর হইতে পারে, ইহা আমার ধারণার অতীত ছিল। কিন্তু অন্য কেহ কখন যদি এমন অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মনের বিশ্বাসকে আরও একটু বলবান করিবার জন্য ইহা লিখিলাম।

আর একটী ঐরূপ ঘটনা ঘটে, তাহা আমার একজন আত্মীয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যদিও সে ঘটনার সঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনার কোন সম্বন্ধ নাই; তথাপি সামঞ্জস্য রেখে লিখিলাম।

আমার কনিষ্ঠা কন্যার যখন মৃত্যু হয়, সেইদিন ঠিক সেই সময়ে আমার সেই কন্যা অথবা তাহার ছলনাময়ী মূর্ত্তি সেই আত্মীয়টীর প্রত্যক্ষীভূত হয়। আমিও যেমন আলস্য-জড়িত দেহে শুইয়াছিলাম মাত্র, তিনিও সেইরূপ সুষুপ্তি হইতে অন্তরে ছিলেন। আমার কন্যা-মূর্ত্তিকে দেখিয়া বলেন, "একি! কালো! তুই এখানে?" তিনি তখন কলিকাতায় বাহিরে বাহিরে বাস করিতেছিলেন। মূর্ত্তি উত্তর করিল, হাঁ!" আত্মীয় তাহাতে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি! এত অসুখ শরীরে তুই এলি কি করে মা?" ছায়াময়ী উত্তর করিল, "এসুম!" দুটী তিনটী কথা কহিয়া তিনি যেমন উঠিয়া বসিলেন, আর দেখিতে পাইলেন না। নিমেষে অদৃশ্য হইল। মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিণাম মৃত্যু। কিন্তু তাহার শেষ গতি কি তাহার মীমাংসা কে করিবে? বহু দার্শনিকের বহু প্রকার সিদ্ধান্ত। কাজেই লেখনী এখানে মূক। তবে মৃত মনুষ্য যে কথা কহিতে পারে ইহাও আশ্চর্য্য। হইতে পারে আমার ভ্রম এবং অনেকেও তাহা বলিতে পারেন। যদি কেহ কখন মৃত আত্মার সাক্ষাৎ পাইয়া থাকেন, তবে তিনিই আমার কথা সত্য বলিয়া মানিতে পারেন। কিন্তু আত্মা যদি অবিনাশী হয় এবং ইচ্ছাশক্তিতে যদি দেহের গঠন হয় তবে এইগুলি বোধ হয় অবিশ্বাস্য নয়।

আমার এই ক্ষুদ্র কথার ভিতর ইঁহার বিয়েটার সম্বন্ধে লিখিবার অত্ত উদ্দেশ্য নাই ; তবে, যে ইঁহার বিয়েটার স্বদেশে, বিদেশে, সুখে, দুঃখে পরিপূর্ণ ছিল—আমি এক্ষণে সে ইঁহার বিয়েটার হইতে বহু দূরে ; হয় তো আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত এক্ষণে তাহার নিকট হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কেননা সে বহু দিনের কথা। চিরদিন কখন সমান যায় না। আজ জগৎ জোড়া যশের বোঝা লইয়া সংসার ক্ষেত্রে যে "ষ্টার থিয়েটারে"র নাম উচ্চ বক্ষে অবস্থান করিতেছে, সেও একদিন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে বিশেষ আত্মীয়া বলিয়া মনে করিত। এক্ষণে শত আরাধনায় যাহাদের একবারমাত্র দেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু এমন দিন গিয়াছে যে এই অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি আত্মত্যাগ না করিলে হয় তো কোন্ আঁধারের কোণে কাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত! তাই বলি চিরদিন কখন সমান যায় না। লোকে দিন পায়, আবার সেদিনও চলিয়া যাইতে পারে। ছলনা শোকে তাপে বিজড়িত হইলে, যাতনায় অস্থির হইলে, যাহাদের আপনার মনে করা যায় না যাহারা এক সময় অতিশয় আত্মীয়তা জানাইয়াছিল, তাহাদের নিকট সহানুভূতি পাইতে আশা করে, তাই আপনা হইতে পূর্ব্ব স্মৃতি মনে আসে। সেজন্য পূর্ব্ব কথা তুলিলাম। ইহার মধ্যে অতিরঞ্জিত কিছুই নাই। আর আমার মত ক্ষুদ্রপ্রাণা স্ত্রীলোকের একপক্ষের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি কোন অতিরঞ্জিত কথা বলিবার সাহস কেন হইবে, আর আমি গর্ব্ব করিয়াও কোন কথা বলি নাই! যে স্বার্থ আমি নিজে ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহার জন্য অপরে দায়ী নহে। শুদ্ধ বুদ্ধিহীনা স্ত্রীস্বভাবের দুর্ব্বলতা বশতঃ একথা উঠিল, নচেৎ এ ক্ষুদ্র কথা উল্লেখ যোগ্যও নহে এবং ইহা বহুদিনের কথা বলিয়া হয়তো কোন কোনটা গোলও হইতে পারে, ইহার জন্য এখন যাঁহারা আমার সহিত মৌখিক সদ্ভাব রাখিয়াছেন তাঁহারা না বিরূপ হয়েন। বহুদিনের ঘটনা মনে করিয়া লিখিতে গেলে হয় তো তাহার দু' একটী গোলও হইতে পারে।

এই ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে জীবনের প্রথম উদ্ভাসিত অধ্যায় দিন কাটিয়া গিয়াছিল। বাহ্যিক অবস্থা তো বরাবর ঘৃণিত, পতিত। কিন্তু যাঁহারা এই ক্ষুদ্র লেখা দেখে ঘৃণা বা উপহাস করিবেন, তাঁহারা যেন এ পুস্তক পাঠ না করেন। কেন না রমণী জীবনে যাহা প্রধান কত স্থান তাহাতে লবণ দিয়া নাই বিরক্ত করিলেন। যাঁহারা দুঃখিনী হতভাগিনী বলিয়া একটুখানি দয়া করিয়া সহানুভূতি দেখাইবেন তাঁহারা যেন এ হৃদয়ের মর্ম্ম যথা বুঝেন। এই ভাগ্যহীনা হতভাগিনীর হৃদয় যে কত দীর্ঘশ্বাসে গঠিত, কত মর্ম্মভেদী যাতনায় বোঝা হাসি-

মুখে চাপা, কত নিরাশা, হা-হুতাশ, দিবানিশি আকুলভাবে হৃদয় মথো খুঁড়িয়া বেড়াইতেছে—কত আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুর বাসনা, যাতনায় অনন্ত জ্বালা লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে—তাহা কি কেহ কখন দেখিয়াছেন? অবস্থার গতিকে নিরাশ্রয় হইয়া স্থানাভাবে আশ্রয়াভাবে বারাঙ্গনা হয় বটে; কিন্তু তাহারাও প্রথমে রমণী হৃদয় লইয়া সংসারে আসে। যে রমণী স্নেহময়ী জননী, তাহারাও সেই রমণীর জাতি! যে রমণী অনন্ত অনলে পতি মনে পুড়িয়া মরে, আমরাও সেই একই নারী-জাতি। তবে লোহা হইতে পাষাণে পড়িয়া আছাড়, পিছাড় খাইতে খাইতে একেবারে চুম্বক ঘর্ষিত লৌহ যেরূপ চুম্বক হয়, আমরাও সেইরূপ পাষাণে ঘর্ষিত হইয়া পাষাণ হইয়া যাই! আরও একটী কথা বলি, সকলেই সমান নহে; যে জীবন অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তাহা এক রকম নির্জীবভাবে জড় পদার্থের মত চলিয়া যায়। কিন্তু যে জীবন দূরে দূরে উজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি করিতেছে অথচ পতিত হইয়া আত্মীয়, স্বজন, বন্ধন-বন্ধন হইতে বঞ্চিত তাহাদের জীবন যে কতদূর কষ্টের, যন্ত্রণাদায়ক তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই অনুভব করিতে পারিবে না। বারাঙ্গনা জীবন কলঙ্কিত ঘৃণিত বটে। কিন্তু সে কলঙ্কিত ঘৃণিত কোথা হইতে হয়? জননী জঠর হইতে তো একেবারে ঘৃণিতা হয় নাই? জন্ম মৃত্যু যদি ঈশ্বরাধীন হয়, তবে তাহাদের জন্মের জন্য তো তাহারা দোষী হইতে পারে না? ভাবিতে হয় এ জীবন প্রথম ঘৃণিত করিল কে? হইতে পারে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় অন্ধকারে ডুবিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করে? কিন্তু আবার অনেকেই পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া চির কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্ত নরক যাতনা সহ্য করে। সে সকল পুরুষ কাহারা? যাহারা সমাজ মধ্যে পূজিত আদৃত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নয় কি? যাহারা লোকালয়ে ধর্ম্ম দেখাইয়া লোকচক্ষুর অগোচরে পরম প্রণয়ীর ন্যায় আত্মত্যাগের চরম সীমায় আপনাকে লইয়া গিয়া ছলনা করিয়া বিশ্বাসবতী অবলা রমণীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন, হৃদয়ের ভালবাসা দেখাইয়া আত্ম-সমর্পণকারী রমণী হৃদয়ে বিষের বাতি জ্বালাইয়া অসহায় অবস্থায় দূরে ফেলিয়া অন্তর্হিত হন, তাঁহারা কিছুই দোষী নহেন! দোষ কাহাদের? যে সকল হতভাগিনীরা সুধাবোধে বিষপান করিয়া চিরজীবন জর্জ্জরিত হইয়া হৃদয়-জ্বালায় জ্বলিয়া মরে, তাহাদের কি? যে ভাগ্যহীনা রমণীরা এইরূপে প্রতারিতা হইয়া আপনাদের জীবনকে চির শ্মশানময় করিয়াছে, তাহারাই জানে

যে যাতনা জীবন কত যন্ত্রণাদায়ক! যাতনার তীব্রতা তাহারাই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। আমার এই বিপন্নাদের পদে পদে দলিত করিবার জন্ত ঐ অবলা-প্রতারকেরাই সমাজপতি হইয়া নীতি পরিচালক হন! যেমন ভাগ্যহীনা-দের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহারা যদি তাহাদের সুকুমারমতি-বালক-বালিকাদের সৎপথে রাখিবার জন্ত কোন বিদ্যালয়ে বা কোন কার্য্য শিক্ষার জন্ত প্রেরণ করে, তখন ঐ সমাজপতিরাই শত চেষ্টা দ্বারা তাহাদের সেই স্থান হইতে দূর করিতে বদ্ধপরিকর হন। তাঁহাদের নীতিজ্ঞতার প্রভাবে অভাগা বালক-বালিকারাও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্ত পাপ পথের পথিক হইতে বাধ্য হইয়া বিষ-দৃষ্টির দ্বারা জগতের দিকে চাহিয়া থাকে। সুকুমারমতি-বালিকাদের পবিত্র সরলতা হৃদয় হইতে যাইতে না যাইতে, তাহাদের হৃদয়ে মধুরতা সমাপ্ত হইতে না হইতে, তাহাদের কচি হৃদয়খানি অবিশ্বাস অনলদের আলায় জ্বলিয়া উঠে। এমন পুরুষপ্রবর অনেকে আছেন, যে নিজের নিজের প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, আত্মদমনে অক্ষম হইয়া, একজন অবলার চিরজীবনের শান্তি নষ্ট করিয়া—সমাজে ঘৃণিত, স্বজনে বঞ্চিত, লোকালয়ে লাঞ্ছিত, মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত করিয়া পৌরুষ জ্ঞান করেন। হায়! ভাগ্যহীনা রমণী, কি ভুল করিয়াই আত্মবিনাশ কর! পথে যে পদ্ম ফুল ফুটে তাহা দেবতা মস্তক পাতিয়া লন; কেননা তিনি ঈশ্বর! আর মানুষেরা সুকুমারমতি বালিকাগণকে লতা হইতে বিচ্যুত করিয়া পথে দলিত করেন, কেননা ইহারা মানুষ! থাক্। যে ভুল সারাজীবনকে বিষময় করে, তাহা যে কি ভয়ানক ভুল, তাহা এই ভাগ্যহীনারাই বুঝে! শত দোষ করিলে পুরুষের ক্ষতি নাই; কিন্তু "নারীর নিস্তার নাই টলিলে চরণ।"

এক্ষণে নানাকারণ বশতঃ থিয়েটার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখময় জীবন নির্জ্জনে অতিবাহিত করিতেছিলাম। এই নানা কারণের প্রধান কারণ যে আমায় অনেকরূপে প্রলোভিত করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া আমার সহিত যে সকল ছলনা করিয়াছিলেন, তাহা আমার হৃদয়ে বড় লাগিয়াছিল। থিয়েটার বড় ভালবাসিতাম তাই কার্য্য করিতাম। কিন্তু ছলনার আঘাত ভুলিতে পারি নাই। তাই অবসর বুঝিয়া অবসর লইলাম। এই দুঃখময় জীবনের একটী সুখের অবলম্বন পাইয়াছিলাম। একটী নির্ম্মল স্বর্গচ্যুত কুসুমকলিকা শাপভ্রষ্টা হইয়া এ কলঙ্কিত জীবনকে শান্তিদান করিতেছিল। কিন্তু এই দুঃখিনীর কর্ম্মফলে তাহা সহিল না। আমায় শান্তির চরমসীমায় উপস্থিত করিবার জন্ত সেই অনাঘ্রাত স্বর্গীয় পারিজাতটী আমায় চিরদুঃখিনী করিয়া এই নৈরাশ্যময় জীবনকে আলায়

অসহ্য পাবকে ফেলিয়া স্বর্গের জিনিষ স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। সে আমার বড় আশা ও আদরের ধন ছিল। তাহার সরল পবিত্র চক্ষু দুটীতে স্বর্গের সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িত! সেই স্নেহময় নির্ভর পরায়ণা হৃদয়টীতে দেবীর পবিত্রতা, ফুলের অমীয় সৌন্দর্য্যরাশি, জাহ্নবীর পবিত্র কুল কুল ধ্বনি, বিকশিত পদ্মের ন্যায়, মধুময় হৃদয়ের পবিত্রতা রাশি সদাই উথলিয়া আমার জীবনকে আনন্দময় করিয়া রাখিত। তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা-রহিত নির্ম্মলতা কত উচ্চে আমাকে আকর্ষণ করিত। এ দেবতার দয়ার দান, অভাগিনীর ভাগ্যদোষে দেবতার দান রহিল না। আমার সকল আশা নির্ম্মূল করিয়া আমার অন্ধকার হৃদয়ে বিষময় বাতি জ্বালিয়া দিয়া সে আমায় চলিয়া গিয়াছে! এখন আমি একা পৃথিবীতে, আমার আর কেহই নাই, শুধুই আমি একা। এখন আমার জীবন শূন্য মরুময়। আমার আত্মীয় নাই স্বজন নাই, বন্ধু নাই, কর্ম্ম নাই, কার্য্য নাই, কারণ নাই। এই শেষ জীবনে তমসাবৃতে আলোময়ী প্রাণ লইয়া অসীম যন্ত্রণায় তাপ সহিয়া আমি মৃত্যু পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছি।

আশা, উদ্যম, তরলতা, উৎসাহ, প্রাণময়ী সুখময়ী কল্পনা, সকলই আমায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে! অহরহঃ শুধু যন্ত্রণার তীব্র দংশন! এই আমি—অসীম সংসার প্রান্তরে একটী সুশীতল বটবৃক্ষের একটু ছায়ায় বসিয়া কতক্ষণে চির শান্তিময় মৃত্যু আসিয়া দয়া করিবে তাহারই অপেক্ষা করিতেছি। সেই প্রবিশাল সুশীতল তরুই আমার এই জীবন্মৃত অবস্থার আশ্রয় স্থান। আমার অন্তর ব্যথা অন্যের নিকট হাস্যাস্পদ হইলেও আমি ইহা লিখিলাম। কেননা লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইবার আর আমার ভয় নাই। লোকই সে ভয় দূর করিয়াছে। তাঁহাদের নিন্দা বা সুখ্যাতি আমার নিকট সকলই সমান! গুণী, জ্ঞানী, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা লিখেন লোকশিক্ষার জন্য, পরোপকারের জন্য, আমি লিখিলাম, আমার নিজের সান্ত্বনার জন্য, হয়তো প্রতারণা বিমুক্ত নরক পথে পদবিক্ষেপোদ্যতা কোন অভাগিনীর জন্য। কেননা আমার আত্মীয় নাই, আমি ঘৃণিতা, সমাজবর্জ্জিতা, ধারবর্ণিতা; আমার মনের কথা বলিবার বা শুনিবার কেহ নাই! তাই কালি-কলমে লিখিয়া আপনাকে জানাইলাম। আমার কলুষিত কলঙ্কিত হৃদয়ের ন্যায় এই নির্ম্মল সাদা কাগজকেও কলঙ্কিত করিলাম। কি করিব! কলঙ্কিনীর কলঙ্ক ব্যতীত আর কি আছে?

প্রথম খণ্ডের শেষের দুটী কথা

এতদিনে আমার কর্ম্মভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে ফলফুলে পূর্ণ হইয়া আমার অদৃষ্টাকাশে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। এইবার সব ঠিক্!

কারণ কি তাহার কৈফিয়ৎ দিতেছি। অনেক দিবস হইল শশিভূষণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে আমার নাট্যজীবনী লিখিতে আরম্ভ করি; তিনি ইহার প্রতি ছত্র, প্রতি লাইন দেখিয়া শুনিয়া দেন; তিনি দেখিয়া ও বলিয়া দিতেন মাত্র, কিন্তু একছত্র কখন লিখিয়া দেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে আমি সরলভাবে যাহা আমার যাহা লিখি তাঁহার নিকট সেই সকল বড় ভালই বলিয়া মনে হয়।

এইরূপে আমার জীবনী লিখিয়া আমার কথা নাম দিয়া ছাপাইবার সঙ্কল্প করি। তিনিও এবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হন। কিন্তু তিনি যখো যখো রোগ যাতনা ভোগ করিবার জন্য ও নানা ঝঞ্ঝাটে কতদিন চলিয়া যায়। পরে তাঁহার পরিচিত বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছাপাইবার জন্য কল্পনা করেন। কিন্তু আমার কতক অসুবিধা বশতঃ হাঁ—না, এইরূপ নানা কারণে তখন হয় নাই। তাহার পর আমি মরণাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া চারি মাস শয্যাগত হইয়া পড়িয়া থাকি; আমার জীবনের কোন আশাই ছিল না: শত শত সহস্র সহস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, নানাবিধ চিকিৎসা শুশ্রূষা দৈবকার্য্য করিয়া, প্রায় অনাহারে, অনিদ্রায় বহু অর্থ ব্যয়ে দেবতাস্বরূপ আমার আশ্রয়দাতা দয়াময় মহিমান্বিত মহাশয় আমায় মৃত্যুমুখ হইতে কাড়িয়া লইলেন। ডাক্তার, সন্ন্যাসী, ফকির, যোষ্ণ, দৈবজ্ঞ, বন্ধু বান্ধব সকলে একবাক্যে বলিয়াছিলেন, যে "মহাশয় শুধু আপনার ইচ্ছার জোরে (Will force) ইনি জীবন পাইলেন।" সেই দয়াময় তাঁহার ধন সম্পত্তি, তাঁহার মহজ্জীবন একদিকে: আর এই ক্ষুদ্র পাপিয়সীর কলঙ্কিত জীবন একদিকে করিয়া দারুণ ব্যাধির হস্ত হইতে আমায় রক্ষা করিলেন। আমি ব্যাধির যাতনায় বিগত নাড়ী হইয়া জ্ঞান হারাইলে, তিনি আমার মস্তকে হাত রাখিয়া স্নেহময় চক্ষুদুটী আমার চক্ষের উপর রাখিয়া, দৃঢ়ভাবে বলিতেন, "শুন, আমার দিকে চাও: অমন করিতেছ কেন? তোমার কি বড় যাতনা হইতেছে? তুমি অধৈর্য্য হইও না! আমি জীবিত থাকিতে তোমায় কখনও মরিতে দিব না। যদি তোমার আয়ু না থাকে তবে দেবতা সাক্ষী, ব্রাহ্মণ সাক্ষী, তোমার এই মৃত্যুতুল্য দেহ সাক্ষী, আমার অর্দ্ধেক পরমায়ু তোমায় দান করিতেছি, তুমি সুস্থ হও। আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুমি কখনই মরিতে পাইবে না।"

সেই সময় তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অমৃতময় স্নেহপূর্ণ জ্যোতিঃ বাহির হইয়া আমার রোগক্লিষ্ট যাতনাময় দেহ অমৃতধারায় স্নাত করাইয়া শীতল করিয়া দিত। সমস্ত রোগ-যাতনা দূরে চলিয়া যাইত। তাঁহার স্নেহময় হস্ত আমার মস্তকের উপর যতক্ষণ থাকিত আমার রোগের সকল যাতনা দূরে যাইত।

এইরূপ প্রায় দুই তিনবার হইয়াছিল; দুই তিনবারই তাঁহারই হৃদয়ের দৃঢ়-তায় মৃত্যু আমায় লইতে পারে নাই। এমন কি শুনিয়াছি অক্সিজেন গ্যাস দিয়া আমায় ১২।১৩ দিন রাখিয়া ছিল। যাঁহারা সে সময় আমার ও তাঁহার বন্ধুবান্ধব ছিলেন, তাঁহারা এখনও সকলে বর্ত্তমান আছেন। সেই সময় স্বাননীয় বাবু অমৃতলাল রুদ্র মহাশয়, উপেনবাবু, কালীবাবু প্রভৃতি প্রতিদিন উপস্থিত থাকিয়া আমায় যত্ন করিতেন; সকলেই এ কথা জানিত।

বুঝি এইরূপ সুকঠোর অসীম যাতনার বোঝা বহিতে হইবে বলিয়া, অতি হৃদয়শূন্য ভাবে লোকের নিকট উপেক্ষিত হইতে হইবে বলিয়া, অবশ্যার বিপাকে এইরূপ দুশ্চিন্তায় পড়িতে হইবে বলিয়া, অসহায় অবস্থায় এইরূপ অসীম যাতনার বোঝা বুকে করিয়া সংসার সাগরে ভাসিতে হইবে বলিয়া, আমার হৃদয়ই তাঁহার বাসনার সহিত যোগ দিয়াছিল! বোধহয় তাহাতেই সেই সময় আমার মৃত্যু হয় নাই। অথবা ঈশ্বর তাঁহার পরম শুভের বাক্যের ও কামনার সাফল্যের জন্যই আমায় মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া দিলেন। কেননা আমার হৃদয়-দেবতা ছিলেকে শতবার বলিতেন, যে "সংসারের কাজ করি সংসারের জন্য শান্তি তো পাইনা; তাই বলিতেছি যে তুমি আমার আগে কখন মরিতে পাইবে না।" আমি যখন তাঁহার চরণে ধরিয়া কাতরে বলিতাম, "এখন আর ও সকল কথা তুমি আমায় বলিও না। ত্রিসংসারে এ হতভাগিনীর তুমি বই আশ্রয় নাই। এ কলঙ্কিনীকে যখন সংসার হইতে তুলে আনিয়া চরণে আশ্রয় দিয়াছিলে তখন তাহার সকলই ছিল। মাতাবন্ধী, মাতা, জীবন জুড়ান কন্যা, বন্ধুবর্গের সুখসৌভাগ্য, সুযশ, আশাতীত সম্মান, বহু হৃদয়ের সমসাময়িক বন্ধুগণের অপরিসীম স্নেহমমতা সকলই ছিল, তোমারই জন্য সকল ত্যাগ করিয়াছি; তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইও না। তুমি ফেলে গেলে আমি কোথায় দাঁড়াইব।" তিনি হাসিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেন, যে "সেজন্য ভেবনা, আমার অভাব ব্যতীত তোমার অন্য কোন অভাবই থাকিবে না। এমন বংশে জন্মগ্রহণ করি নাই যে এতদিন তোমায় এত আদরে, এত যত্নে আশ্রয় দিয়া, তোমায় এই রুগ্ন অসমর্থ অবস্থায় তোমায় শেষ জীবনের দারুণ অভাবের মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া যাইব। তাহার প্রমাণ

দেখ যে আমার আত্মীয়দিগের সহিত একত্রাবে তোমায় আশ্রয় দিয়া আসিতেছি। এত জেনে শুনে যে তোমায় রক্ষিত করিবে—আমার অভিশাপে সে উৎসন্ন যাইবে।"

তাঁহার মত সহজের সরাসর যাহা বলিবার তাহা বলিয়া নাস্তনা দিতেন, কিন্তু কার্য্যকালে আমার অদৃষ্ট তীক্ষ্ণ অসি হস্তে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমার জীবনব্যাপী সমস্ত আশাকে ছেদন করিতেছে! আজ তিন মাস হইল এই অসহায়া অভাগিনী কাহারও নিকট হইতে তিন দিনের সহানুভূতি পাইল না; অভাগিনীর ভাগ্য! দোষ কাহারও নয়—কপাল! প্রাক্তনের ফল!! পাপিনীর পাপের শাস্তি!!!

এই রোগ হইতে মুক্ত হইয়া আমি বৎসরাধিক উত্থানশক্তিহীন হইয়া জড়বৎ ছিলাম। পরে আমার চিকিৎসকদিগের মতানুযায়ী বহুস্থানে, বহু জল-বায়ু পরিবর্ত্তন করাইয়া, ভগবদেবতা আমার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে দান করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ নানা অসুবিধায় এই পুস্তক তখন ছাপান হইল না। পরিহিসবাবুও দারুণ ব্যাধিতে স্বর্গে গমন করিলেন। তিনিও আমায় বলিয়াছিলেন, যে "বিনোদ! তুমি আমার নিজের হাতের প্রস্তুত, সচীব প্রতিমা! তোমার জীবন-চরিতের ভূমিকা আমি স্বহস্তে লিখিয়া তবে মরিব"; কিন্তু একটা কথা আছে, যে "মানুষ গড়ে, আর বিধাতা ভাঙ্গে". ("Man proposes but God disposes") আমার ভাগ্যেই তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

পরে ভাবিলাম যে যাহা হয় হইবে; বই হউক আর নাই হউক, আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা বড়ই ছিল যে আমি আমার অন্তরতম আত্মীয়-স্বজন সুশীতল সুধাধারা শান্তি ছায়ায়াইয়া এই বেদনাময় ব্যথিত বুকের উপর প্রলেপ দিয়া চির নিদ্রায় ঘুমাইয়া পড়িব; ঐ নিঃস্বার্থ স্নেহ ধারার আচরণে আমার কলঙ্কিত জীবনকে আবরিত রাখিয়া চলিয়া যাইব। তথা! কথায় আছে কিনা? যে "আমি যাই বলে, আমার কপাল যায় সঙ্গে।" একটি লোক একবার তাহার অদৃষ্টের কথা গল্প করেছিল, এখন আমার তাহা মনে পড়িল। গল্পটী এই :—

উপযুক্ত লেখাপড়া জানা একটী লোক স্বদেশে অনেক চেষ্টায় কোন চাকুরী না পাইয়া বড় কষ্ট পাইতেছিল। একদিন তাহার একটী বন্ধু বলিলেন, যে "বন্ধো! এখানে তো কোন সুবিধা করিতে পারিতেছ না, তবে তাই একবার বিদেশে চেষ্টা দেখনা।" তিনি অনেক কষ্টে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করিয়া বেহুন

চলিয়া গেলেন। সেখানেও কয়েক দিন বিবিধমতে চেষ্টা করিয়া কিছু উপায় করিতে না পারিয়া, একদিন দ্বিপ্রহর রৌদ্রে ঘুরিয়া এক মাঠের উপর বৃক্ষতলায় বসিয়া আছেন। এমন সময় তাঁহার মনে হইল যে রৌদ্রের উত্তপ্ত বাতাসের সহিত পশ্চাৎ দিকে কে যেন হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতেছে। সচকিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা?" উত্তর পাইলেন, "তোমার অদৃষ্ট"। তিনি বলিলেন, "বেশ বাপু। তুমিও আমাকে তাড়া করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছ? তবে চল দেশে ফিরিতেছি, সেইখানেই আমায় লইয়া যন্ত্রণা দিও। এখানে নয়।"

আজিও একদিন চমকিত হইয়া দেখি যে আমার অদৃষ্টের তাড়নায়, আমার আশ্রয় স্বরূপ সুধামাখা শান্তি-স্তর, মহাকালের প্রবল ঝড়ে কাল-সমুদ্রের অতল জলের মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া যাইল। আমার সম্পূর্ণ ঘোর ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে দেখি যে আমি এক মহাশ্মশানের তপ্ত চিতাঙ্গারের উপর পড়িয়া আছি। আবহকাল হইতে যে সকল হৃদয় অসীম যন্ত্রণার জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া চিতার ছাইয়ে পরিণত হইয়াছে, তাহারাই আমার চারিধার ঘেরিয়া আমার বুকের বেদনাটাকে সহানুভূতি জানাইতেছে। তাহারা বলিতেছে, "দেখ, কি করিবে বল? উপায় নাই! বিধাতা দয়া করে না যা দয়া করিতে পারে না। দেখ, আমরাও জ্বলিয়াছি, পুড়িয়াছি, তবুও যায় নাই দেখ! সে সব জ্বালা যায় নাই! শ্মশানের চিতা ভস্মে পরিণত হয়েও সে স্মৃতির জ্বালা যায় নাই। কি করিবে? উপায় নাই।"

তবে যদি কোন দয়াময় দেবতা, মানুষ হইয়া বা বৃক্ষরূপ ধরিয়া সংসারে আসেন, তাঁহারা কখন তোমার মত হতভাগিনীকে শান্তি-সুধা দানে সান্ত্বনা দিতে পারেন। তাঁরা দেবতা কি না? পৃথিবীর লোকের কথায় যাঁর যান না। আর কুটিল লোকের কথায় তাঁহাদের কিছু আসে যায় না। সূর্য্যের আলোক যেমন দেব-মন্দির ও আস্তাকুড় সমভাবেই আলোকিত করে—ফুলের সৌরভ যেমন পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সমভাবে গন্ধ বিতরণ করে—ইহারাও তেমনি সংসারের হিংসুক, নিন্দাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর লোকদিগের নিন্দা বা সুখ্যাতির দিকে ফিরেও চাহেন না।

তাঁহারা দেবলোক হইতে অপরিসীম স্নেহপূর্ণ সুধামাখা আত্মাভিমান ছদয় লইয়া মর্ত্যভূমে দুঃখীর প্রতি দয়া করিবার জন্য, আত্মীয় স্বজনের প্রতি সহৃদয়তা দেখাইবার কারণ, বন্ধুর প্রতি সমভাবে সহানুভূতি করিবার ইচ্ছায়, সন্তানের

প্রতি পরিপূর্ণ বাৎসল্য স্নেহ প্রদানে লালন পালন করিতে, পত্নীর প্রতি সতত প্রিয়ভাবে প্রেমদানে তুষ্ট করিতে, আজ্ঞাকারীর ন্যায় সকল অভাব পূর্ণ করিবার জন্য সতত প্রস্তুত। প্রেমময়ীর নিকট অকাতরে প্রেমময় হৃদয়খানি বলি দিতে —ভালবাসায় আকাঙ্ক্ষিতাকে আপনাকে ভুলিয়া ভালবাসিতে—আশ্রিতকে সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিপালন করিতে—পাত্রাপাত্র অভেদ জ্ঞানে আকাঙ্ক্ষিতের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য অযাচিতভাবে লুকাইয়া দান করিতে (কত সঙ্কুচিত হ'য়ে যদি কেহ লজ্জা পায়) ভগবানে অটল ভক্তি রাখিবার বাসনাকে হৃদয়ে স্থান দিতে—আত্মসুখ ভুলিয়া দেবসেবা ব্রতে সুখী হইতে—প্রাণ ভরিয়া অকাতর হৃদয়ে পরোপকার করিতে আইসেন। ওগো তোমাকে আর কতই বা বলিব! তাঁহাদের তুলনা শুধু তাঁহারাই—যাহা লইয়া দেবলোকে দেবতা গঠিত হইয়া থাকে, তাঁহারা সেখানকার সেই সকলই লইয়া এই যন্ত্রণাময় মর্ত্যলোকে অতি দুঃখীকে দয়া করিতে আইসেন। সংসারের গতিকে ক্রুর হৃদয়ের বিষদৃষ্টিতে যখন সেই মানবরূপ দেবতা বা তরুবর অবসন্ন হইয়া পড়েন, তখনই চলিয়া যান। যে অভাগা ও অভাগিনীরা সেই পবিত্র ছায়ার কোলে আশ্রয় পাইয়া চিরদিনের মত ঘুমাইয়া পড়ে, সংসারের যাতনাময় কোলাহলে আর না জাগিয়া উঠে, তাহারাই হয় তো সেই দেবহৃদয়ের পবিত্রতার স্পর্শে শান্তিধামে যাইতে পারে; আবার যাহারা অদৃষ্টের দোষে সেই শান্তি সুধাময় তরুচ্ছায়া হইতে বঞ্চিত হয়; তাহারাই এই তোমার মত যাতনার পোড়া শ্মশানের চিতাভস্মের উপর পড়িয়া গড়াগড়ি যায়। তোমার মত দুর্ভাগিনীদের আর উপায় নাই গো! যাহারা অমূল্য রত্ন পাইয়াও হারাইয়া ফেলে, তাদের উপায় নাই। আর তোমাদের মত পাপিনীদের হৃদয় বড় কঠিন হয় ও হৃদয় শীঘ্র পুড়েও না, ভাঙ্গেও না, এত আগুনে লোহাও গলিয়া যায়। তোমার মত হতভাগিনী বুঝি আমাদের মধ্যেও নাই, ও রকম কঠিন পাষাণ হৃদয়ের কোন উপায় নাই; তা কি করিবে বল? এই সকল কথা বলিয়া সেই আলা যন্ত্রণায় পোড়া হৃদয়ের চিতাভস্মগুলি হায়! হায়! করিয়া উঠিল। তাহাদের সেই শব্দ হইতে হায়! হায়! শব্দ শুনিয়া আমার তখন খানিকটা চৈতন্য হইল। মনের মধ্যে একটা বৈদ্যুতিক আঘাতের মত আঘাত লাগিল, মনে পড়িল যে আমিও তো ঐরূপ একটী সুধাময় তরুর সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়াছিলাম। তবে বুঝি সে তরুবরটি ঐ সকল দেবতাদের জীবনীশক্তি দ্বারা পরিচালিত "দেবতরু!" ঐ চিতাভস্মগুলি যে সকল গুণের কথা বলিলেন, তাহা অপেক্ষাও শত সহস্রগুণে সেই দেবতার হৃদয়

পরিপূর্ণ ছিল। দয়ার সাগর, করুণার আধার, আনন্দের উচ্ছ্বাসপূর্ণ ছবি, আত্মসমর্পণে সরলতার প্রিয়বাদিতা, সতত হাস্যময়, প্রেমের সাগর, আপনাতে আপনি বিভোর, কমনকোমল বরণ সুন্দর; রূপে মনোহর, বিনয় নম্রতা বিভূষিত, সুধামাখা শুকবর! শুনিয়াছিলাম যে দেবতারাই সময়ে সময়ে দয়া করিতে বৃক্ষ বা মানবরূপ ধরিয়া সংসারে আসেন। সেইজন্য শ্রীরামচন্দ্র, গুহক চণ্ডালকে মিত্র ব'লে স্নেহ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাসীপুত্র বিদুরের ঘরে খুদ খেয়েছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও যবন হরিদাসকে দয়া করিয়াছিলেন। গুণী অনাথকে দয়া করিতে কি দোষ আছে? কাঙালকে আশ্রয় দিলে কি পাপ হয় গা? সৌরের স্পর্শে কি পরশ পাথর মলিন হয়? না করুণার সংস্রবে হীরকের উজ্জ্বলতা নষ্ট করে?

স্বর্গের চাঁদ যে পৃথিবীর কলঙ্কের বোঝা বুকে করিয়া সংসারকে সুশীতল আলোক বিতরণে সুখী করিতেছেন, পৃথিবীর লোক তাহারই আলোকে উৎফুল্ল হইয়া "ঐ কলঙ্কি চাঁদ ঐ কলঙ্কি চাঁদ" বলিয়া যতই উপহাস করিতেছে, তিনি ততই রজত ধারায় পৃথিবীতে কিরণ-সুধা ঢালিয়া দিতেছেন; আর স্বর্গের উপর বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন।

আমিও তো তবে ঐ দেবতাদের শুকবরের আশ্রয় পাইয়াছিলাম! কৈ সেই আমার আশ্রয়স্বরূপ দেবতা? কৈ—কোথায়? আমার হৃদয়-বক্ষভূমির শান্তি প্রস্রবণ কোথায়? হু হু করিয়া শ্মশানে চিতাভস্মমাখা বাতাস উত্তর করিল, "আঃ পোড়া কপালি, এখনও বুঝি চৈতন্য হয় নাই? ঐ শুন চৈত্র মাসের শ্বাসন্তী পূজার নবমীর দিনে, মহাপুণ্যময় শ্রীরাম নবমীর শুভতিথির প্রভাতকালে ৭টার সময় সূর্যদেব অরুণ মূর্তি ধারণ করিয়া, ধরণে নামিলেন কেন, তাহা বুঝি দেখিতেছ না? পবিত্র ভাগীরথী আনন্দে উথলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, সাগর উদ্দেশে কেন ছুটিতেছে, তাহাও বুঝি দেখিতেছ না? শ্রীশ্রী গোপাল-মন্দির হইতে ঐ যে পূজারি মহাশয় শ্রীশ্রীর মঙ্গল-আরতি সমাধা করিয়া প্রদীপ পঞ্চপ্রদীপ লইয়া ঐ কাহাকে মঙ্গল-আরতি করিয়া দিয়া যাইতেছেন, চারিদিকে এত হরিসঙ্কীর্তন, হরিনাম ধ্বনি, এত ব্রহ্মনাম ধ্বনি, কেন গা? একি? সুরধুনির তীরে দেবতারা আসিয়াছেন নাকি? প্রভাতী-পুষ্পের সৌরভ বহিয়া বায়ু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? দেবমন্দিরে এত শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি কেন? কিরণছটা অবলম্বন করিয়া সূর্যদেব কাহার জন্য স্বর্গ হইতে রথ লইয়া আসিয়াছেন? তাহাও কি বুঝিতেছ না?"

চমকিত হইয়া দেখি, ওমা! আমারই আজ ৩১ বৎসরের সুখ-স্বপ্ন ভাঙিয়া যাইল! এই দীনহীনা দুঃখী প্রাণী আজ ৩১ বৎসরের যে রাজেশ্বরীর সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিল, মহাকালের ফুৎকারে ১২ ঘণ্টার মধ্যে তাহা কালসাগরের অতল জলে ডুবিয়া গেল! অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া মস্তকে প্রস্তরের আঘাত পাইলাম, শত সহস্র জোনাকি-ফুল যেন চক্ষের উপর দিয়া ঝরঝরিয়া চলিয়া গেল।

আমার যখন চৈতন্য হইল, তখন মনে পড়িল যে আমি "আমার কথা" বলিয়া কতকগুলি যাথামুণ্ড কি লিখিয়াছিলাম। তাহার শেষেতে এই লিখিয়াছিলাম যে "আমি মৃত্যুমুখ চাহিয়া বসিয়া আছি। মৃত্যুর জন্য তো লোকে আশা করিয়া থাকে, সেও তো দুরাশার শেষের আশা।"

ওগো! আমার আর সেসব নাই, আমারও নাই গো! ১৩১৮ সালের চৈত্র মাসের ১৪ই বুধবারের প্রাতঃকালে সে আশাটুকু গেল!

মরিবার সময় যে শান্তিটুকু পাইবার আশা করিয়াছিলাম তাহাও গেল, আর তো একেবারে মৃত্যু হবে না গো হবে না। এখন একটু একটু করিয়া মৃত্যুর যাতনাটি বুকে করিয়া চিতাতলের হায়-হায় ধ্বনি শুনিতেছি। আর দেবতারূপ তরুবরের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া এই মহাপাতকিনীর কর্মফলরূপ দুর্বিপাক শাখা প্রশাখা মূল ও ফলে পূর্ণ তরুতলে বসিয়া আছি গো।

পৃথিবীর ভাগ্যবান লোকেরা শুন, শুনিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইও। আর ওগো অনাথিনীর আশ্রয়তরু, স্বর্গের দেবতা, তুমিও শুন গো শুন! দেবতাই হোক, আর মানুষই হোক, মুখে যাহা বলা যায় কার্যে করা বড়ই দুষ্কর! ভালবাসায় ভাসা দেবে না গো, ভাসা দেবে না!! ঐ দেখ চিতাতলগুলি ঘুরে ঘুরে চলে যাচ্ছে, আর হায়-হায় করিতেছে।

এই আমার পরিচয়। এখন আমি আমার ভাসা লইয়া শ্মশানের যাতনাময় চিতাতলের উপর পড়িয়া আছি! এখন যেমন অযাত্রার জিনিস দেখিলে কেহ রাম, রাম, কেহ শিব, শিব, কেহবা দুর্গা, দুর্গা, বলেন, আবার কেহ মুখ ঘুরাইয়া লইয়া হরি, হরি বলিয়া পবিত্র হয়েন। যাঁহার যে দেবতা আশ্রয়, তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এই মহাপাতকীর পাপ কথাকে বিস্মৃত হউন। ভাসাহীনা, পতিতা কাঙ্গালিনীর এই নিবেদন। ইতি—১১ই বৈশাখ, ১৩১৯ সাল, বুধবার।

সম্পূর্ণ।

বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী বিনোদিনী দিনের বিচিত্র জীবন ও অভিজ্ঞতার বিবরণ বিশেষরূপ তাঁর 'আমার কথা' বইতে। ইতিপূর্বে 'এখন'-এর দুটি সংখ্যায় সেই বইয়ের প্রথমাংশ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এই সংখ্যায় শেষাংশ ছাপা হলো। সমগ্র বইটি আরও অনেক তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে এবং বিনোদিনীর ছবি ও অন্যান্য চমকপ্রদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। সম্পাদক

হ্যাম্‌লেট : এক নয়, বহু

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগভেদে লোকচৈতন্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই লোকচিন্তায় হ্যামলেট-মূর্তির তাৎপর্যের রূপান্তরের দীর্ঘ ইতিহাস হয়ত কোনদিন সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হ'তে পারে। আপাততঃ যোগ্যতা, স্থান ও কালের প্রতিকূলতায় সে প্রয়াসে স্পর্ধা হয় না। চিন্তার ইতিহাসের পটভূমিকায় শেক্‌স্‌পীয়রের এই কালজয়ী নায়কের অনেকটি বিভিন্ন ইমেজ্‌ আরেকবার তুলে ধরে এই চরিত্রের তাৎপর্যের অনন্ত গভীরতার আভাস দেবার সাধেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। যে-হেতু এই নায়ক দুর্বোধ্য, যেহেতু এই নায়ক সহজ সাধেকী ক্যাটেগরি-র ব্যাখ্যায় ধরা পড়ে না, সেইহেতু শেক্‌স্‌পীয়রের নাটককেই বাতিল ক'রে দিয়ে একদা যিনি নিজে মানসিক শান্তি পেয়েছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অর্ধশিক্ষিত অপরিণতবয়স্কদের উচ্ছ্বসিত সাধুবাদ কুড়িয়েছিলেন, আজ বার্ধক্যে তিনি স্বয়ংতত্ত্ব, সেদিনের অপরিণত মানসিকতা স্বীকারেও কুণ্ঠিত নন ('এলিজাবেথান ড্রামাটিস্টস্‌' গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ ১৯৬২ সালের জুনে রচিত এলিয়টের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। [মনে পড়ে, ম্যালতোদিরো ব'লেছিলেন, "বার্ধক্যের স্থবিরতা প্রাজ্ঞকে দুর্বল করে, কিন্তু মূর্খকে সুবুদ্ধি দেয় !"] প্রত্যেক পাঠকের কাছে যদি হ্যামলেটের অর্থ স্বতন্ত্র হয়, তাতে নাট্যকারের দুর্বলতা প্রমাণিত হয় না, বরং চরিত্রের জটিলতাই প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং সাহিত্যে এই জটিলতাই লভ্য কাম্য। একটি চরিত্রের মধ্যে এই অনেকগুলি চরিত্রই সত্য হ'তে পারে, যে কোন একটি ব্যাখ্যা গ্রহণে আপত্তি নেই ; কিন্তু এই তাবৎ তাৎপর্যের অস্তিত্বের চেতনাতেই বোধ হয় হ্যামলেট সবচেয়ে মূল্যবান হ'য়ে উঠতে পারে। নয়তো একটি কম্পোজিট ইমেজ্‌ রচনায় চেষ্টা করা যেতে পারে, এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরেও সেই চেষ্টা থাকবে।

সপ্তদশ শতক।

সপ্তদশ শতকের চেতনায় হ্যামলেট অভিনীত নাটকের নায়ক। কেবলমাত্র (বা প্রধানত) মঞ্চেই তার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের

ঘটনাবলী ও বিভিন্ন উক্তি বা চিত্রকল্পের ছায়া সমকালীন নাটকে বা লেখায় যথেষ্ট ধরা পড়ে। নাটক বা চরিত্রের জনপ্রিয়তার এই রাশি রাশি প্রমাণের মধ্যে উত্তরকালের দার্শনিক বা চিন্তাশীল হ্যামলেটকে তেমন পাওয়া যায় না। বরং এই কালের বিভিন্ন চলতি ধারণার সঙ্গেই হ্যামলেটের যোগাযোগ দেখা যায়।

সমকালীনদের কাছে হ্যামলেট প্রতিশোধাত্মক নাটকের পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গেই যুক্ত। ব্যক্তিগত প্রতিশোধস্পৃহার বিরুদ্ধে খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বের অনুশাসন এবং লোকচেতনায় যথাযথীয় পৃথিবীর উত্তরাধিকারস্বরূপ এই স্পৃহার বাস্তব উপস্থিতি, সম্ভবত এই দুয়ের সংঘাতেই নাটকের যে ধারা শুরু হয়েছিল, 'হ্যামলেটের' আদিরূপ সেই ধারারই অন্তর্গত। অথচ ১৬০২ সাল নাগাদ এই ধারার প্রতিষ্ঠিত গঠন ভেঙে পড়তে শুরু করেছে। টুর্নিয়র, ওয়েবস্টার, চ্যাপম্যান এবং বোমন্ট ও ফ্লেচারের নাটকে সেই আদি সংঘাত আবার এসে দেখা দিচ্ছে। হ্যামলেনিয়োর মত এই স্পৃহাকে মেনে নিয়ে কেবলমাত্র সুযোগ সন্ধানেই কালক্ষেপ আর সম্ভব নয়। 'এথেইস্টস্ ট্র্যাজেডি'-তে (টুর্নিয়র) দ্বিতীয় অঙ্কে মৃতের বিদেহী আত্মা পুত্র আর্শেনজকে সতর্ক ক'রে দেয়: "ধৈর্যে অপেক্ষা কর; দেখ, ঘটনা কী মোড় নেয়। রাজাদেরও যিনি রাজা, প্রতিশোধের ভার তাঁরই হাতে ছেড়ে দাও।" শেষ অঙ্কে আর্শেনজ এই উপদেশের যাথার্থ্য স্বীকার করে। দ্বিতীয় কোয়ার্টোর বছরেই শেক্সপীয়রের সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত মার্স্টনের "দি ম্যালকন্টেন্ট" নাটকে মালেভোলি (অর্থাৎ দুষ্টবেশী ম্যাকিয়াভেলী) মেণ্ডোজাকে শেষ মুহূর্তে ক্ষমা করে। সমকালীনদের চোখে হ্যামলেট-পিতার নির্দেশের ভারে পর্যুদস্ত হ্যামলেটের মানসিক সংকট দুর্বোধ্য মনে হয়নি! সমকালীন উল্লেখগুলি বিচার ক'রলে, প্রতিশোধ, মৃতপিতার আবির্ভাব এবং নায়কের ভূমিকা একই পরিস্থিতির অন্তর্গত, এই বোধের প্রমাণ মেলে। হ্যামলেটের চরিত্রে জটিলতার যোগ ঘটিয়ে শেক্সপীয়র প্রতিশোধাত্মক নাটকের ঐতিহ্যের নতুন পর্বের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত ক'রলেও লোকচিত্তার কিন্তের 'উর-হ্যামলেটের' প্রতিশোধের স্বয়ম্ভু শক্তির ধারা তখনও কাটেনি; এবং সেই একই ধারণা শেক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে মিশে গেছল। ১৬৩০ অবধি যাবতীয় উল্লেখেই এই দ্বৈধী ধারণার ছায়া। ১৬৮২, ১৬৯৮, ও ১৭০০ সালে যে তিনটি উল্লেখ পাওয়া যায়, সেগুলি তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষে ঈশ্বরের কলের সাহায্যে উৎক্ষিপ্ত হ্যামলেটের বাপীয় মূর্তিরহ—অর্থাৎ সরলতম

প্রতিশোধাত্মক পরিস্থিতির পরিমণ্ডল ছেড়ে সেক্সপীয়রীয় ভাষের বৈশিষ্ট্যে এবার দৃষ্টি পড়ছে (৮)।

প্রতিশোধে সঙ্কল্পবদ্ধ নায়কের চরিত্রের সঙ্গে পরম্পরাগতভাবে যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিও হ্যামলেটের চরিত্রের সঙ্গে মিশে যায়। হায়েরোনিমোর মত হ্যামলেটও পাগল সাজে, ম্যালেভোলির মত 'ম্যালকন্টেন্ট' টাইপের গুণসম্পন্ন। হ্যামলেটের ব্যঙ্গাত্মক, তিক্ত, নিষ্ঠুর, যেন দায়িত্বহীন, ও সময়ে সময়ে অশ্লীল উক্তি এই ম্যালকন্টেন্ট টাইপেরই বিশিষ্ট বাচনরীতির অঙ্গ। শাইতাণের যে তিক্ততায় হ্যামলেট পোলনিয়াস্‌কে আঘাত করে, মার্স্টনের ম্যালেভোলি সেই একই রীতিতে পিয়েট্রোকে আক্রমণ করে (৯)। রাজসভার চাটুক্তি ও অবিশ্বাসিনী নারীকুলের প্রতি বিদ্বেষ এবং 'মেমেকো মোরি'-র শুদ্ধভাবে উত্তরের চিন্তাই কলুষিত। নবজাগৃতির কালের নতুন মানবিক চেতনা ও মহামূল্যবান সৌন্দর্যের সৌঠা শিকার টানাপোড়েনেই বোধহয় এই অতৃপ্ত ম্যালকন্টেন্ট টাইপের উদয়। নবজাগ্রত মানবিকবাদের স্বাধীন আত্মজিজ্ঞাসার পরিণতিস্বরূপ বাস্তবের জ্ঞান ও শক্তির সীমিত পরিধির চেতনা এসে পড়ে। তাই যে হ্যামলেট মৃত্যু ও সর্বব্যাপী পাপের চিন্তায় বিভোর : সেই হ্যামলেটই প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বাসে মুখর হ'য়ে বলে : "আহ্‌ব, সে কী আশ্চর্য রচনা!" (১০) বিশ্বলোক দর্শনে এই দুই চিত্তের বিরোধেই ম্যালকন্টেন্টের মানসিকতায় বিহ্বলতা তথা তীব্র অসহ্যের জোর। ডেকারের "দি অনেস্ট হোর", জন রেনল্ডস্-এর কবিতায়, এবং

---

(৮) Paul S. Conklin, *A History of Hamlet Criticism, 1601—1821*, Routledge, 1957.

(৯) "You are a fishmonger" (*Hamlet* II ii 174) "Duke, thou are a bawd, a coward" (*The Malcontent*, I. iii. 93). এই দুইবারে ব্যবহৃত কথার সাদৃশ্যের তালিকা দীর্ঘ হ'তে পারে।

(১০) H. J. C. Grierson, *Cross-currents in English Literature of the 17th Century*, Chatto and Windus, 1958 : "Christianity was not dead, far from it ; and the dominant note of the 17th century was to be the conflict of the secular and the spiritual, the world, the Flesh, and the spirit, a conflict which troubled every sphere of life." কোরেলিয়েরের 'সিয়েডো' আজও, সিয়েনাজেলোর অবশেষ স্যাভোনারোলার মূর্তি,' কিংবা সিয়েরাবার্দোর সেই কাহিনী—ফ্রেডমুণ্ডের রাজত্বকে বাঁচাবার সাধিকে ছেড়ে দেওয়ার গল্প—নবজাগৃতির সেই ব্যক্তিত্বের ভেতে অটিলতর অভিজ্ঞতারূপ এই কালকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা গ্রীনার্ড ও ওটর টিলিয়ার্ডের কথায় ফিরব।

টার্নিয়রের "দি রিভেঞ্জার্স ট্র্যাজেডি" ও "দি এথেইস্ট্স ট্র্যাজেডি"-তে কয়েকটি হাতে মৃত্যুচিন্তার নিদর্শন ম্যালকন্টেন্ট হ্যামলেটের প্রতিষ্ঠার প্রমাণ স্বরূপ।

সমকালীন ধারণায়, ম্যালকন্টেন্ট টাইপের মধ্যেই পাগলামীর ক্ষীণ রেশ থাকে। সোলনিয়স ও গার্ট্রুডের প্রথম ব্যাখ্যায় (প্রেমের কারণে কিংবা পিতার মৃত্যু ও মাতার সহসা বিবাহের কারণে) হ্যামলেট বিকৃতমস্তিষ্ক ; ওফেলিয়ারও সেই ধারণা।(৭) ডেনমার্কের সাধারণ মানুষের মতই (৮) এলিজাবেথীয় দর্শক সমাজও হ্যামলেটের মধ্যে ম্যালকন্টেন্টের স্বভাবজ পাগলামী দেখতে পান। হ্যামলেট সময়ে সময়ে যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্র প্রকাশ করে, তাতে এই ধারণা আহত হয় না, কারণ ম্যালকন্টেন্টের পাগলামী ঠিক ব্যাধি নয়, বরং নিউরসিস্ বা তীব্র স্নায়বিক উত্তেজনা ও বুদ্ধিলোপের সীমান্তরেখায় অবস্থিত। ১৬০৪ সালে অ্যান্টনি স্কলোকরের "ডাইক্যাক্টাস ইন্ লাভ" কবিতায় প্রেমে পাগল নায়কের চিত্রে হ্যামলেটের স্মৃতি আসে। ১৬১৮ সালে রিচার্ড বারবেজের মৃত্যুতে রচিত এক কবিতায়, চেকারের "দি ডেড্ টার্ন" ও "ল্যান্ডগর্ন অ্যাণ্ড্ ক্যাণ্ডল্-লাইট", চ্যাপম্যান, জনসন ও মার্স্টনের "ইস্ট্ওয়ার্ড হো" নাটকে এই একই চিত্র পাওয়া যায়। কখনও কখনও এই হ্যামলেটীয় প্রেমিক আতিশয্যদোষে হাস্যকর হ'য়ে ওঠে। এই পাগলামীর সুচতুর চালেই হ্যামলেট প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে, তাই দর্শকও হ্যামলেটের সফলতায় আশ্বস্ত হ'য়ে এই পাগলামীতে সহানুভূতির হাসি হাসে।

এই শতাব্দীর চিন্তায় আরো একটি প্রদেশে হ্যামলেটের স্থান আছে। মানব চরিত্রে বিষাদের ভূমিকা সম্পর্কে এলিজাবেথীয় সমাজের ভাবনা ঐতিহ্যগত জটিল স্তরে পৌঁছেছিল। মানবদেহের মাইক্রোকস্মসে চারটি হিউমরের মধ্যে বিষাদ অন্যতম (বিষাদ যেহেতু ক্ষিতির সঙ্গে যুক্ত, সেইহেতুই বোধহয় মানুষের পার্থিব জীবনে প্রায় অনিবার্য)। বিষাদের প্রাবল্যে মানুষ বিষণ্ণ, ভিক্ত অসংলগ্ন ও কুটিল হ'য়ে পড়ে। এই অবস্থারই নাম স্বাভাবিক বিষাদ। অস্বাভাবিক

(৭) স্যর গার্ট্রুডের, "Mad as the sea and wind" (IV. i 7 ff) কিন্তু এখানে গার্ট্রুডের মত স্পষ্ট নয়। তিনি হয় (ক) একথা একমাত্র সত্যিই বিশ্বাস করেন, নয়তো (খ) পুরানো ভাবের ছেলেমানুষ হ্যামলেটকে আড়াল করছেন, নয়তো (গ) নিজেকে দোষ মুক্ত রেখে হ্যামলেটের 'দুঃখলাভ' আঘাত থেকে নিজেকে আড়াল ক'রছেন. cf "Mother, for love of grace, Lay not that flattering unction to your soul, That not your trespass but my madness speaks.

(৮) V. i.160 ff.

বিষাদ বা কৃষ্ণ বিষাদের (*) উৎস অন্তরূপ। যে কোন হিউমর অস্বাভাবিক উত্তেজনায় আপনাকে দহন ক'রলে এই অস্বাভাবিক বিষাদের জন্ম হয়। স্যর টমাস এলিয়ট বলেন, "সর্বশ্রেণীর কৃষ্ণ বিষাদই মানুষের বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে ক্ষতবিক্ষত করে।" ( ) টিমথি ব্রাইটের "ট্রিটিজ অভ্ মেলাংকলি" গ্রন্থে (*) এই মত প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে যে, "অস্বাভাবিক বিষাদ মস্তিষ্কের যাবতীয় শক্তি ও অঙ্গের ইন্দ্রিয়কে অবশ করে" ; বিষণ্ণ ব্যক্তি "প্রথমেই সন্দিহান হয়, দীর্ঘকাল চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, সঙ্কিতচিত্ত থাকে, অধ্যয়ন ও চিন্তায় গভীরভাবে প্রবেশ করে", বিষণ্ণজনের এই হিউমর "তাদের মধ্যে কর্মে অবহেলা, এবং অধ্যবসায়ের স্থলে লিপ্সার চঞ্চলতা এনে দেয় : কর্মে তাদের অনীহা, বস্তুলোকের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনেই তাদের আনন্দ ; আবেগের তীব্রতায় তারা সহজে ধরা পড়ে না, অথচ ধরা পড়লে চরমবিন্দু অবধি চ'লে যায় ; "বিষাদের অন্ধকারে……চন্দ্রসূর্য ঢাকা পড়ে, ……তারৎ গ্রহ নক্ষত্র…অন্ধকারে হারিয়ে যায়, কালো কুয়াশায় ধরাপ্রস্থ হয়" ; এই বিষণ্ণ হিউমরে কল্পনায় মানসচক্ষে বীভৎস সব চিত্র উদ্ঘাটিত হয়, সাধারণ বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি আহত হয়, নিজের বাসস্থানও বন্দীশালা মনে হয় ; কিছুৎকালের জন্য যাবতীয় গুরুত্ববহ বিষয় লঘু ও হাস্যকর বোধ হয় ; দুঃখেও নাচগান আসে। (*) হ্যামলেটকে এমনি এক বিষণ্ণ চরিত্ররূপে চিনতে এলিজাবেথীয় দর্শকের কষ্ট হ'ত না।

৩. অষ্টাদশ শতক।

অষ্টাদশ শতকের চিন্তায়, হ্যামলেটের চরিত্র অন্তত প্রথমে বেটারটন ও গ্যারিকের অভিনয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুগের অভিনেতারা ও নাট্যরসিকেরা হ্যামলেটের বস্তুরূপীয়ন ভাব-পরিবর্তনে মুগ্ধ হন। শিল্পমাত্রই যে যুগে মহত্তী সেন্টিমেন্টের ধারক, সে যুগে সেন্টিমেন্টের রাজ্যে হ্যামলেটের মুক্তপক্ষ বিচরণই যে সবচেয়ে মূল্যবান মনে হবে, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। আরন হিল্ 'দি প্রম্পটার' পত্রিকায় লিখিল করেন – উইল্কুসের অভিনয়ে হ্যামলেটের

(*) Melancholy adust.

(*) *Cassel of Health*, 1547.

(*) সেক্সপীয়র এই বইটি পড়েছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি তাঁর মোকেথে। ডাইডেন থেকে শুরু ক'রে জোসার উইলসন প্রায় সকলেই এই প্রমাণ মেনে নিয়েছেন।

(*) Lily B. Campbell, *Shakespeare's Tragic Heroes*, Cambridge, 1930. M. I. O' Sullivan, *Hamlet and Dr. Timothy Bright* (PMLAA, XLII. 3.) J. D. Wilson, *What Happens in Hamlet*, 1950. Appendix B.

"উন্মাদ" দিককে পাওয়া যায়, বৃদ্ধের অভিনয়ে তার 'গম্ভীর' দিক—অর্থাৎ "অর্ধমাত্র রাজপুত্র হ্যামলেট"। হ্যামলেটের চরিত্র ব্যাখ্যায় হিল্‌ লক্ষ্য করেন : "আত্মনিমগ্ন, অথচ সৌজন্য স্নিগ্ধ মানবতা ; স্বভাবত বিষাদ মগ্ন, কিন্তু তত্ত্ব শিকার প্রয়াসে তাঁর মনের অন্ধকার দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে ; বুদ্ধিদীপ্ত যে মানের সকালের মত তাঁর বিষাদ আলোকস্নাত ; দুঃখে তিনি ক্লিষ্ট নন, ছেলেখেলাতেও লঘু নন ; একাকীত্বে গাম্ভীর্যে গভীর, জনসঙ্গে স্নেহার পরিবর্তনশীল ; যা চান তাই হ'তে পারেন ; কিন্তু যা হওয়া উচিত, তিনি কেবল তা-ই— নিহত পিতার শোকে সন্তপ্ত, মাতার লঘুতায় ক্ষুব্ধ, ভূত্যতাতের হীনতায় ক্লান্ত।" অভিনয়ে এই বিচিত্রপক্ষম চরিত্র রচনাই বেটারটন ও গ্যারিকের কৃতিত্ব।

গ্যারিকের অভিনয়ে পূর্ব শতাব্দীর হ্যামলেটের জড়তা কেটে যায়। হ্যামলেটের বিষাদ এবার দার্শনিকের তন্ময় চিন্তা হ'য়ে উঠেছে। তার দৃঢ় চিন্তাও সমকালীন কবিতার ক্ষীণপ্রাণ স্টাইলাইজড্‌ মৃত্যুচিন্তারই অনুরূপ। "পিতৃহত্যা" ও সঠিক রহস্য নিয়ে তর্ক, এই দুই অনুভূতিই গ্যারিকের হ্যামলেটের বিষাদের উৎস। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী টম ডেভিসের সাক্ষ্যে জানা যায়, "গ্যারিক আশ্চর্য প্রয়াসে আবেগের স্পর্শে সেক্সপিয়রের বিপুল ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে দেন।" প্রত্যেকটি অনুভূতিকে বিশিষ্টভাবে মুখর ও স্নেহজ অভিনয়ে পুনঃসৃষ্টি করার জন্য নিষ্ঠা গ্যারিকের ছিল ব'লে মনে হয়। এই অনুভূতিপ্রবণ রাজপুত্রকে রচনা ক'রে তার উপর 'ডেকোরাম্‌'-এর ঔচিত্যবোধ চাপিয়ে দিতে গ্যারিক দ্বিধাবোধ করেননি। ব্যক্তিগত পত্রে গ্যারিক লেখেন, "আমি 'হ্যামলেট' প্রযোজনা কালে পরিবর্তনের স্পর্ধা দেখিয়েছি। জীবনে এমন অপরিণামদর্শী কাজ আর করিনি ; কিন্তু আমি তার আগেই প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম, পঞ্চম অঙ্কের জঞ্জাল থেকে এই মহৎ নাটককে মুক্ত না ক'রে মঞ্চ থেকে আমার মুক্তি নেই। প্রেত ভিগাথের চতুরালি ও কেন্‌সিং ম্যাচ বর্জন ক'রে আমি এই নাটক নামিয়েছি। আমার এই পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত জনসমর্থনও লাভ ক'রেছে।"(১০)

মঞ্চের বাইরের চিন্তাতেও আরো পরিচ্ছন্ন, আরো সংস্কৃত এক হ্যামলেটকে

(১০) ১০ জানুয়ারি, ১৭৭৩ তারিখে Sir W. Youngকে লেখা চিঠি। Quoted by J. Scott, *The Georgian Theatre*. Westhouse, 1946. সেক্সপীয়রের অনুবাদ বলে সেক্সপীয়রের নামে চালিয়ে দেওয়ার যুক্তিহীন রীতি 'ডিসিমিট্রেশন'-এর শুরু খোধহয় এখান থেকেই।

রচনা করা হয়। আর্ল অব্ শাফ্‌টস্‌বেরির বিচারে, হ্যামলেট "গভীর চিন্তার" প্রবক্তামাত্র। নিকোলাস রো দেখান হ্যামলেট অয়েষ্টিদের চেয়ে মানবিক। স্বভাবতই মানবিক মহিমায় মহিমান্বিত যে হ্যামলেট-মূর্তি রচিত হয়, লিউইস টেবল্‌ড তাতে হ্যামলেটের অশ্লীলতা ও অসৌজন্যকে ক্ষমা ক'রতে পারেন না। তাঁর পরে জ্যান্‌সার ও ডক্টর জন্‌সনও হ্যামলেটের "নিষ্ঠুরতায়" আহত হন। এই যুগের হ্যামলেট-চিন্তায় স্পষ্টতম চিত্র আছে স্যর টমাস হানমারের রচনা ব'লে কথিত একটি প্রবন্ধে। হাউস অব কমন্‌স্-এর স্পীকার হানমারের কাছে হ্যামলেটের 'বীরোচিত চরিত্র', 'পিতৃভক্তি' ও 'গুণান্বিত মানসিকতা'-র সঙ্গে তার পৌনঃপুনিক লঘুচিত্ততা, পাগলামী, অভদ্রতা, ওফেলিয়ার সঙ্গে কথায় অশ্লীলতা এবং প্রার্থনারত রাজার প্রতি নিষ্ঠুরতা কিছুতেই খাপ খায় না।

নাটকের সাক্ষ্য প্রমাণের ঊর্ধ্বে হ্যামলেটের মহত্ত্বকে স্থাপন করার এই ব্যাপক চেষ্টার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৭৪৭ সালে হ্যামলেটকে 'এণ্ড্রিয়্যান' ব'লে প্রমাণ ক'রে দেন, অর্থাৎ কথিত হ্যামলেটের 'বীরোচিত' চরিত্র সাধারণতম দিনানুদৈনিক জীবনের একটি সাধারণ মানবচরিত্র ব'লে প্রতিপন্ন হয়। "হ্যামলেটে দেখি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন, বুদ্ধিমান একটি যুবক, সঙ্কল্প স্থির ক'রেও সে তার সন্দেহ-দোটানা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তার চরিত্রে এমন কিছুই নেই যা মানবজাতির মধ্যে অহরহ মেলে না।" গার্ণিয়ার বিচারে, হ্যামলেটের সংকট যে কোন সাধারণ শিক্ষিত যুবকের সংকট।

১৭৭৬ সালে গ্যারিক মঞ্চ থেকে বিদায় নেন, ঐ সঙ্গেই শেক্‌সপীয়রীয় অভিনয়ের একটি বিরাট যুগের অবসান হয়। জর্জিয়ান থিয়েটারের অবসানের মধ্যেই শেক্‌সপীয়রের নাটক মঞ্চের সীমা পেরিয়ে সমালোচকদের এক্তিয়ারের মধ্যে এসে পড়ে। অভিনেতাদের অভিনয়ে রচিত হ্যামলেট-মূর্তির আভাস ক্রমশই ঝাপসা হ'তে থাকে, এবং হ্যামলেট-চিন্তা নতুন খাতে বইতে থাকে। ১৭৭০ সালে ফ্রান্‌সিস্ কেটল্‌ম্যান এবং ১৭৭২ এ ডক্টর জেম্‌স্ বীটি হ্যামলেটের চরিত্রের জটিলতা এবং পরস্পরবিরোধী অনুভূতির টানাপোড়েন সম্পর্কে অবহিত হ'য়ে ওঠেন। হ্যামলেটের চরিত্র ব্যাখ্যার এই নতুন ধারার প্রথম পরিণত কীর্তি উইলিয়ম রিচার্ডসনের প্রবন্ধে (১৭৭৪) হ্যামলেটের মানসিকতার ব্যাখ্যা। রিচার্ডসন বলেন, "একটি প্রোথিত অনুভূতিকে উচ্ছেদ ক'রে প্রেমের স্থলে ঘৃণাকে, এমনকি উদাসীনতাকে, প্রতিষ্ঠা ক'রতে গেলে মানব-প্রকৃতি বিপর্যস্ত হয়।—হ্যামলেটের দশাও অনুরূপ। নৈতিক সৌন্দর্য ও বিকৃতি সম্পর্কে সুস্থ-

বোষেলস্পর হ্যামলেট গুরুজনের মধ্যে বিচ্যুতি লক্ষ্য করেন।...ক্ষুব্ধ বিক্ষোভ অপরাধীকে শাস্তি দিতে এগিয়ে আসে। কিন্তু এই বিক্ষোভ যখন নৈতিক বোধের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার প্রকৃতি ও ধারা ভিন্ন হ'তে বাধ্য। অন্তর্বৃত্তির প্রবল ধাক্কায় হয়তো তীব্র ও ত্বরিত প্রতিশোধের স্পৃহা আসে। কিন্তু শুচিতানোচিত্যবোধ এবং বিচারশক্তি এই সহিংস তীব্রতাকে খর্ব করে। সংঘর্ষলিপ্ত বলিষ্ঠ নীতিসূত্রের সংঘাতে বিপর্যস্ত চিন্তাশীল মন তাই অনিশ্চিত ও দোলাচলচিত্তবোধ হয়।" রিচার্ডসন হ্যামলেটের চরিত্রে 'আত্মপ্রতারণার' ঝোঁক লক্ষ্য ক'রেছেন। প্রার্থনারত ক্লডিয়াস প্রসঙ্গে হ্যামলেটের তথাকথিত 'নিষ্ঠুরতা' এবং সময়ে সময়ে লঘুচিত্ততা ও পার্থিব জীবন সম্পর্কে অনীহা রিচার্ডসন 'আত্মপ্রতারণা' ব'লে ব্যাখ্যা করেন। (১১) হার্টলির অ্যাসোসিয়েশনিজম্-এর ধারায় সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিচারে হ্যামলেটের এই পুনর্মূল্যায়নে তার নাটকীয় চরিত্রের পরিবর্তে সামাজিক চরিত্র আরোপিত হ'ল। টমাস রবার্টসন ও হেনরি ম্যাকেঞ্জি রিচার্ডসনের ব্যাখ্যার মূল ধারা অনুসরণ করেন। "পাপপুণ্য সম্পর্কে সূক্ষ্ম স্পর্শকাতরতা," "অপার প্রাণময় কল্পনাশক্তি" এবং "জ্ঞানের পরিবর্তে স্বপ্ন," আসন্ন রোম্যান্টিক জীবনধর্মের পূর্বাভাস, অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্বে নব হ্যামলেট মূর্তিতে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। "ভিল্‌হেল্‌ম্ মাইস্টারে" গ্যয়টের হ্যামলেট-বিচারেও এই একই মৌলিক মনস্তত্ত্বকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর 'বীরোচিত' হ্যামলেটকে গ্যয়টে সম্পূর্ণ বর্জন করেন—তিনি হ্যামলেটকে দেখেন : "সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক, মহান, নীতিনিষ্ঠ চরিত্র, অথচ বীর হ'য়ে উঠবার মত স্নায়বিক শক্তি নেই—দুঃসহ অথচ অনিবার্য ভারের চাপে সে হারিয়ে যায়; প্রতিটি দায়িত্বই তার আছে পবিত্র দায়ভার।" "শেক্‌সপীয়র দেখালেন অক্ষম নায়কের উপর গুরুভার দায়িত্বের ভার।...এ যেন বহুমূল্য পাত্রে রোপন করা গুল্ম গাছ; যে পাত্রে কেবল ফুলের গুচ্ছই শোভা পায়, তাতে গুল্ম গাছের শিকড় ছড়ালে পাত্র ভেঙে চুরমার হ'য়ে যেল।" (১২) অতিরঞ্জনার নিষ্ঠুর রোষ ও পুষ্পপ্রতিম রোম্যান্টিক কবির সংঘাতজাত রোম্যান্টিক বিষাদ ও হ্যামলেটের বিষাদ এবার অভিন্ন হ'য়ে যায়। এই হ্যামলেটের প্রতি করুণা বোধ করা যায়, বীরোচিত মর্যাদায় শ্রদ্ধা থাকে না।

(১১) New Variorum Hamlet. Ed. H.H. Furness. Dover reprint, 1963. Appendix (Volume II). ১৭৭৪এর মূল প্রবন্ধের পরিবর্তে ১৮৮৪ সালের বর্ধিত ভাষ্যটি ব্যবহার ক'রেছি।

(১২) আল ইঁলের অনুবাদ থেকে।

৩. রোমান্টিক—২।

শেক্‌স্‌পীয়রের হ্যামলেট রোমান্টিক পর্বে খুব সহজেই রোমান্টিক কবির প্রতীক হ'য়ে দাঁড়ায়। মৃত্তর ও পূর্ণতর জীবনের আর্তি এবং সঙ্গে সঙ্গেই পার্থিব জীবনের যন্ত্রণা—নাইটিঙ্গেল হবার কামনা—এর সঙ্গে হ্যামলেটের আত্মীয়তা আছে। একটি পত্রে কীট্‌স্ হ্যামলেটের সঙ্গে স্রষ্টা শেক্‌স্‌পীয়রের আত্মীয়তা লক্ষ্য করেন. ফ্যানি ব্রনকে লেখা শেষ পত্রে (আগস্ট ১৮২০) লেখেন: "আমারই মত যন্ত্রণায় হ্যামলেট ওফেলিয়াকে ব'লেছিল—নানারিতে যাও, যাও, যাও! আমিও সব কিছু এই মুহূর্তেই ছেড়ে দিতে চাই—আমি ম'রতে চাই। যে বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে তুমি হাসছ, আমি সেই পৃথিবীকে দেখে অসুস্থ বোধ করি। আমি পুরুষকে ঘৃণা করি, নারীকে আরো বেশি।" হ্যামলেটের ব্যর্থতার সঙ্গেই কীট্‌সের যোগ। চার্লস্ ল্যাম্ব "দলজ্ঞ, উদাসীন, নিঃসঙ্গ হ্যামলেটের" যে চিত্র রচনা করেন, মঞ্চের বাস্তবতায় তার প্রাণহানি হবার আশঙ্কায় 'হ্যামলেট'-এর মঞ্চায়নের বিরুদ্ধেই মত রাখেন। "হ্যামলেটের যা কিছু কর্ম, তার দশ ভাগের নয় ভাগ নিজের সঙ্গে নীতিবোধের মত বিনিময়, তার নিঃসঙ্গ চিন্তার বাস্তবরূপ···কেবল পাঠকের জন্যেই···।" "চারশো লোকের ভিড়ে" অভিনেতা কেমন ক'রে এই অন্তরঙ্গ চিন্তাকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা ক'রবেন? শেক্‌স্‌পীয়রীয় হ্যামলেটের 'সী-চেঞ্জ' এই পর্বেই সম্পূর্ণ হ'ল—মঞ্চ থেকে একেবারে ঘরের কোণে।

রোমান্টিক হ্যামলেটের স্পষ্টতম বিশ্লেষণ কোলরিজের। হ্যামলেটের মনে চিন্তা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভবের মূলমন্ত্র সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে কেবল চিন্তার প্রাধান্যহেতু তার স্বভাবজ কর্মপ্রেরণা ভেঙে পড়ে। হ্যামলেটের চিন্তা ও কল্পনা তার বাস্তব অনুভূতির চেয়ে অনেক জীবন্ত। হ্যামলেটের দৃষ্টিতে স্বভাবতই বস্তুলোকের ঘটনাদি কাপ্‌সা হ'য়ে গেছে; মনের দর্পণে যা কিছু প্রতিফলিত হয়, কেবল তারই যা কিছু দায়বত্তা। পৃথিবী থেকে এই দূরত্ব ও নিঃসঙ্গতা, এবং তার যন্ত্রণা রোমান্টিক কবিদের সকলেরই কাম্য। হেগেল হ্যামলেটের মানসিকতাকে 'মেটাফিজিক্যাল' ব'লে বর্ণনা করেন, এবং উইটেন-বার্গের শিক্ষার সঙ্গে এই মানসিকতার যোগসূত্র লক্ষ্য করেন।

তেইনের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসেও এই রোমান্টিক হ্যামলেটকেই দেখি: "হ্যামলেটের কল্পনাশক্তি সুচিন্তিতভাবে কারো বুকে ছুরি বসাবার শক্তি ও আত্মপ্রত্যয় থেকে তাকে বঞ্চিত করে। অতর্কিত কোন অনুভবের ইঙ্গিত

যাত্রেই সে অমন একটা কাজ ক'রতে পারে। হ্যামলেটের প্রয়োজন মুহূর্তের প্রেরণা : ওকে ভাবতে হয়, অ্যাবাসের আড়ালে রাজা লুকিয়ে আছেন, নয় তো বিষপ্রয়োগে নিজের মৃত্যু অবধারিত জেনে শত্রুকে তরবারির আঘাতে চাই। হ্যামলেট নিজে তার কর্মের নিয়ন্তা নয়, পরিস্থিতিই তাকে কর্মে টেনে আনে : সে হত্যার পরিকল্পনা আঁটতে জানে না ; হত্যাই যদি ক'রতে হয়, তবে তাও অনুযোগে। অত্যন্ত আবেগ কল্পনাশক্তি অসংখ্য কল্পচিত্র সৃষ্টি ক'রে শক্তিকে ব্যাহত করে, অতিনিবেশের তন্ময়তায় শক্তিকে হ্রাস করে। হ্যামলেটের মধ্যে দেখবেন কবির আত্মা, যে আত্মা স্বপ্ন দেখতে জানে, কাজ ক'রতে জানে না, আপনার কল্পনায় রচিত অশরীরী সৃষ্টির মায়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে, সেই কল্পলোককে এত স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করে যে বাস্তবে নিজেকে স্থাপন ক'রতে পারে না : অদৃষ্টের ফেরে কবি না হ'য়ে সে হ'য়েছে রাজকুমার, আরো জটিল অদৃষ্টের খেলায় তাকে হতে হল অপরাধের দণ্ডদাতা : প্রকৃতি যাকে প্রতিভার আধার করতে চেয়েছিল, ভাগ্যলক্ষ্মী তাকে উন্মাদনা ও দুঃখের অভিশাপে অভিশপ্ত ক'রল। হ্যামলেট স্বয়ং শেক্‌স্‌পীয়র···।" (১৩)

রোমান্টিক চেতনায় সুন্দরের সঙ্গে বীভৎস ও অসুন্দরের যে যোগ স্বীকৃতি পায়, হ্যামলেটকে সেই অসুন্দর সৌন্দর্যের প্রতীক মনে করা যেতে পারে। মোতালিস থেকে জিদ অবধি অনেকেই আনন্দ ও যন্ত্রণার যে সম্পর্ক লক্ষ্য ক'রেছেন, বোদল্যার 'ফ্লিউর্‌ ছ বিউটি'-তে সেই একই মেডুসা সৌন্দর্যকে যখন আরাধনা করেন, তখন হ্যামলেটের চিত্র বার বার মনে আসে। বোদল্যার প্রশ্ন তোলেন : সুন্দরের জন্ম কোথায়, অনন্ত স্বর্গধামে, না অতল পাতালে ? তিনি বলেন : "আশ্চর্যরিক অথচ স্বর্গীয় তোমার চাহনিতে আশীর্বাদ ও পাপ একই সঙ্গে জন্ম নেয়—তাই লোকে বলে, তুমি যেন সুরা।" বোদল্যার আবার বলেন : "তুমি কি পাতালের অন্ধকার থেকে উদয় হও, না নক্ষত্রলোক থেকে নেমে আসো ? অভিশপ্ত অদৃষ্ট মুহূর্তের মত তোমার পায়ে পায়ে ঘোরে। তুমি নির্বিচারে বীজ বুনে যাও—আনন্দের অথবা বিষাদের। তোমার শক্তিতে এখানে সবই বল, তুমি অধিপতি, অথচ কখনও জেরার জবাব দেবে না। সুন্দর, তুমি ভয়ঙ্করকে মাড়িয়ে যাও, তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ফেলে। বীভৎসও তোমার সাধারণী সখা : হত্যা তোমার সাধের খেলনা, তোমার উদ্ধত বুকের পরে সে-কী

(১৩) New Variorum Hamlet, Appendix.

লাভে নাচে।" (১৪) মর্ত্যলোক সম্পর্কে হ্যামলেটের তিক্ত ঘৃণা, অথচ মর্ত্য-প্রেমেই সে-ঘৃণার উৎস : অন্যান্যে পোলনিয়াসকে হত্যা ক'রে সে ওফেলিয়ার মৃত্যুর কারণ হয় : প্রতিশোধের মুহূর্তে হ্যামলেট পূর্ণতায় পৌঁছায়, কারণ এই মুহূর্তের অভিমুখেই সে পদে পদে এগিয়েছে, অথচ হ্যামলেটের এই একমাত্র কীর্তিতেও আনন্দ ও বিষাদ মিশে একাকার হ'য়ে যায়। রোমান্টিক রূপকল্পে বিরোধী শক্তিবর্গের সমাহার রচনার মধ্যে জীবনের জটিলতর তাৎপর্য সন্ধানের চেষ্টা আছে, এবং বিরোধী শক্তিবর্গের সম্মিলন সৃষ্টিই কোলরিজের 'এজেম্-প্লাস্টিক ইম্যাজিনেশন'-এর লক্ষ্য। এই সমন্বয়ের মধ্যে (১৫) রোম্যান্টিকের আদর্শলোকের অসীমকে খুঁজতে চান—সসীম পৃথিবীর সংঘাতকে পেরিয়ে কোন চরতর ঐক্যের মধ্যে লোকান্তরে অসীমের স্বাক্ষর আছে। ঘ্যাঁয়োর 'ওফেলিয়া' কবিতায় সেই আভাস আছে, "নদীর স্রোতের টানে তোমার মৃত্যু হল। নরওয়ের গিরিরাজি থেকে বাতাস এসে তোমার কানে কানে তিক্ত স্বাধীনতার কথা বলে গেল।...প্রবল বাতাসের কণ্ঠস্বর, প্রচণ্ড গর্জন, তোমার শিশু হৃদয়কে ভেঙে দিয়ে গেল—যে হৃদয় কোমল, একান্তভাবেই মানুষের। এপ্রিলের সকালে সেই বিষণ্ণ সুরভি অভিজাততম, তোমার পায়ের কাছে, সেই হতভাগা নীরব পাগল। স্বর্গ! প্রেম! মুক্তি! সেকী স্বপ্ন, আরে বোকা পাগল মেয়ে! আগুনের কাছে বরফ যেমন গলে, তুমিও তেমনি গ'লে গেলে। তোমার আশ্চর্য স্বপ্ন তোমার কণ্ঠ রোধ ক'রল; অতঃপর সেই অসীম তোমার নীল চোখে মায়া বুলাল।"(১৬) "লারা", "ম্যানফ্রেড", "কর্সেয়ার" প্রভৃতি রচনায় এবং ব্যক্তি জীবনে বায়রন যে সেটানিক নায়ককে রচনা ক'রেছিলেন, ঘ্যাঁয়োর হ্যামলেটের সঙ্গে তার আত্মীয়তা আছে—নিষ্ঠুরতা ও বিপুল শক্তির (যে শক্তি সমাজ বন্ধনের ঊর্ধ্বে, সেইহেতু অসামাজিকও বটে) যোগেই অসীমের মূর্তি রচিত হয়। হ্যামলেট ম্যানফ্রেডের মত ব'লতে পারে, "আমার আলিঙ্গন মৃত্যুর বার্তা। ...আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম, তাকে বিনাশ ক'রলাম।" (১৭) হ্যামলেট যাদের ভালোবাসে তাদেরই উপর তার আঘাত সবচেয়ে নিষ্ঠুর। গার্ট্রুড ও ওফেলিয়া সেই নিষ্ঠুরতার সাক্ষী।

(১৪) অবোধ মার্জিন ও ব্রান্ডিস কার্ডের দুটি বক্তব্য ইংরেজি অনুবাদ থেকে নিয়ে ভাষান্তর। বিদেশী কবিতা পাঠের ক্ষেত্রে এই সতর্কতা বোধহয় আদর্শ।

(১৫) কোলরিজের ভাষায়, "La grande synthese."

(১৬) আলিস্তার মার্শালের ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণে।

(১৭) Manfred, Act II. (বাক্যটির প্রায় সবটুকুই উদ্ধৃত)

৫

৮. আধুনিক কাল : বিংশ শতাব্দী।

ভিক্টোরীয় যুগে এবং আমাদের শতকেও একাডেমিক সমালোচনা হয় হ্যামলেট চরিত্র ছেড়ে নাটকের দিকেই সন্ধানী দৃষ্টি ফিরিয়েছেন : বস্তুতো গ্যেটে ও কোলরিজের ধারেই হ্যামলেটের কালক্ষেপ ব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে নাটকের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও চরিত্রধর্ম, এবং নাট্যকারের সমকালীন চিন্তালোকের সঙ্গে হ্যামলেট-চরিত্রের জটিল সম্পর্ক নির্দেশ ক'রেছে। প্রথম ধারায় স্কৌল্, কোল্‌সে, স্লাজিন্সন, গ্র্যানভিল বার্কার, ডিক্টর, ব্র্যান্ডেস্ক্, হেমেল প্রমুখ এবং দ্বিতীয় ধারায় ডাউডেন, ব্র্যাড্‌লি, ডোভার উইল্‌সন, হার্ডিসন প্রমুখেরা আছেন। এঁদের কীর্তি প্রথমত সুপরিচিত, এঁদের মতামত বহুপঠিত, দ্বিতীয়ত এঁরা কেউই হ্যামলেটের নতুন কোন মূর্তি রচনা করেন নি। তাই এবার একাডেমিক সমালোচনার বাইরেই আমরা নিদর্শন খুঁজব।

হ্যামলেটের ক্রয়েডীয় মূর্তি রচনা করেন স্বয়ং ক্রয়েড ও আর্নেস্ট জোন্‌স্ (১৮)। হ্যামলেটের কালক্ষেপকে এঁরা 'হিস্টিরিকাল প্যারালিসিসের' লক্ষণ ব'লে বিবেচনা করেন। হ্যামলেট চিন্তায় তন্নিষ্ঠ বলেই যে-কোন কর্মের পূর্বেই আত্মজিজ্ঞাসায় লিপ্ত হয়, এবং কর্মে অক্ষম হয়, এই যুক্তির প্রতিবাদ ক'রে ক্রয়েড দেখান যে, হ্যামলেট সহসা উত্তেজনায় পোলনিয়াসকে হত্যা করে, এবং পরে সুপরিকল্পিতভাবেই কুটচক্রে রোজেনক্রাউজ্ ও গিল্ডেন্‌স্টার্নের মৃত্যু ঘটায়। কেবলমাত্র ক্লডিয়াসকে হত্যার প্রশ্নেই হ্যামলেটের টালবাহানা। হ্যামলেটের যাবতীয় যুক্তিকেই জোন্‌স্ ভিত্তিহীন বিবেচনা করেন। জোন্‌স্ দেখান যে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দায় হ্যামলেটের কাছে স্পষ্ট, কিন্তু মাতার অনাচারের প্রশ্নেই হ্যামলেটের মানসিক যন্ত্রণা সবচেয়ে দুর্বিষহ। মনস্তাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত,শৈশবে মাতার সঙ্গে হ্যামলেটের সম্পর্কে গোপন কামের ভাব ছিল। পিতৃভক্তির আড়ালে পিতা সম্পর্কে প্রেমিকোচিত হিংসা চাপা প'ড়েছে। মাতাপুত্রের এই সম্পর্কের অস্তিত্ব সন্দেহে গার্ট্রুডের ইন্দ্রিয়পরবশ প্রকৃতি এবং পুত্রের প্রতি ভালোবাসা (১৯) ও পুত্রের কাছে দুর্বলতায় জোন্‌স্ সমর্থন পেয়েছেন। গার্ট্রুডকে শুনিয়ে ওফেলিয়ার কাছে অশ্লীল উক্তি উচ্চারণ হয়ত এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—এ যেন বঞ্চিত প্রেমিকের প্রতিশোধ

(১৮) Sigmund Freud, *The Interpretation of Dreams.* Ernest Jones, *Hamlet and Oedipus.*

(১৯) "The Queen his mother Lives almost by his looks", IV. vii.

স্পৃহার অন্ত নারীর উপর নিজের শক্তির প্রদর্শন। হ্যামলেটের অশ্লীল উক্তিকে কোন যৌন সঙ্কটের প্রতিফলন বলে বিচার না ক'রলে হ্যামলেটের শিক্ষিত ও মার্জিত প্রকৃতির সঙ্গে এই অশালীনতাকে মেলানো যায় না। এই যুক্তির জের টেনে জোন্‌স্ বলেন, মায়ের প্রেমে পিতার স্থান দখল করার দীর্ঘকাল অবদমিত সাধ ক্লডিয়াসের কর্মে নিজেরই অপূর্ণ সাধের বাস্তবায়ন দেখে অচেতন উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়। নিজের মনে যে অনাচারের সাধ ছিল, অন্য অনাচারে তাকেই প্রত্যক্ষ ক'রেই হ্যামলেট এমন বিপর্যস্ত হয়। এই যৌন সঙ্কটই অবদমনের বিশ্লেষণে তীব্র নারীদ্বেষের ছদ্মবেশে প্রকাশিত হয়। নিজের অপরাধ-বোধ ও মাতার স্বামীকে হত্যার প্রমে আবার সেই পুরনো শৈশবসাধের অবদমিত জ্বালা হ্যামলেটকে বাধা দেয়। হ্যামলেটকে এইভাবে ঈডিপাস কম্‌প্লেক্স্ নামধেয় বিকারের শিকার ব'লে প্রমাণ করা যায়।

ডি. এচ্. লরেন্স্ হ্যামলেটকে ঘৃণা করেন। (১০) এই চরিত্রের ভিত্তি আত্মঘৃণা ও প্রচণ্ড ভাঙনের এক অনুভূতি। শেক্‌স্‌পীয়রে এই আত্মগ্লানি যেন "শরীরে অনাচারের অনুভূতি ও তারই বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিক্রিয়া।" হ্যামলেট নিজেরই মধ্যে এই অনাচার উপলব্ধি ক'রে আত্মধিক্কারের পরিবর্তে আত্মগরে আত্মগ্লানিকে চাপা দেয়। তাই অশালীন নিষ্ঠুরতায় হ্যামলেট চারিদিকে কেবল অনাচারের রূপকে নগ্ন ক'রে তুলে ধরে। এতেই তার পাশবিক আনন্দ। "সমগ্র নাটকটিই মেয়েদিগের বিরুদ্ধে মনের প্রতিক্রিয়া, আঙ্কল্-এর বিরুদ্ধে আত্মার প্রতিক্রিয়া, অভিজাততান্ত্রিক নীতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক নীতির প্রতিক্রিয়া।"(১১) যন্ত্রণাময় চিন্তার উত্তরফলস্বরূপ হ্যামলেট আঙ্কল্‌কে পিতা বা রাজার মূর্তির মধ্যে উপলব্ধি করে। এই আঙ্কল্ পিতৃহত্যায় আহুত হ'য়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নতুন রাজার মূর্তির মধ্যে মিশে গেছে। নারীর স্থান এই চিন্তায় সর্বদাই পুরুষের নীচে : সেই নারী অজ্ঞাত পরোক্ষেও এই আঙ্কলের বিনাশে সহযোগী থেকেছে। তাই সমগ্র নারীজাতির প্রতি হ্যামলেটের ঘৃণা ; অথচ ক্লডিয়াস সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া অত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় না। মধ্যযুগে আঙ্কলের প্রাধান্যে মানুষ নিজের দেহকে সম্মান দিয়েছে, কারণ এই দেহে আঙ্কল্ আশ্রয় নেয়, এই আশ্রয়ে নিজেকে বিকশিত করে, নিজেকে বহুতে

(১০) And Hamlet how boring, how boring to live with,/So mean and self-conscious, blowing and snoring,/His wonderful speeches, full of other folks' whoring."

(১১) Twilight in Italy : The Theatre.

রূপান্তরিত করে। রাজা রাজা, পরিবারে পিতা, এবং নিজের মধ্যে এই দেহ-পিণ্ডে আত্মন্ তার শক্তিকে উপলব্ধি করে। কিন্তু মধ্যযুগের এই বোধ নতুন খৃষ্টীয় ধর্মের আক্রমণে আহত হ'ল। খৃষ্টের রাজরূপকে ছাপিয়ে ওঠে যেশুর স্নেহের সন্ন্যাস শিশুরূপ এবং পরে ক্রুশবিদ্ধ অসহায় রূপ। আত্মনের মধ্যে মনকে গ্রহণ ক'রে আত্মনকে সর্বশক্তিমান সর্বগৌরবময়ীয়ান ক'রে অসীম হ'য়ে ওঠার যে আদর্শ এতদিন ছিল সেই আদর্শে দ্বন্দ্বের এল। খৃষ্টীয় ধর্ম-যাজক এলেন, ব'ললেন : আত্মন্ তথা দেহকে বিনাশ ক'রেই আত্মা অমরত্ব ও অসীমতার প্রকাশ পেতে পারে। নীমিত অহংকে অতিক্রম ক'রেই অসীমের উদয় হ'তে পারে। হ্যামলেটের মনেও এই নতুন বোধ এসে ধাক্কা দিয়েছে। আত্মনের মহত্বে সন্দেহ জেগেছে ব'লেই রাজা ক্লডিয়াসের রাজরূপ তাকে ভোলাতে পারে না, সে প্রতিশোধের সঙ্কল্প নেয়; অথচ রাজা-আত্মন্ অভিজ্ঞতার অবসেষ তাকে ছাড়ে না। এতেই হ্যামলেটের দোটানা। ক্লডিয়াসকে হত্যার সঙ্কল্পে ও সেই সঙ্কল্পসিদ্ধির মধ্যে হ্যামলেট আত্মনকে হত্যা করে, সেই কারণেই এই হত্যাকে ঘিরে ন্যায় ও নীতির এত প্রশ্ন, আত্মনকে ছাড়িয়ে মহত্তর অসীমে পৌঁছবার প্রয়াস। মনস্তাপ্তিক এই সঙ্কটেই মাতার সঙ্গে বা ওফেলিয়ার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের চিন্তায় হ্যামলেটের মনে এমন প্রচণ্ড ঘৃণা আসে : দেহজ সম্পর্কমাত্রই যেন অবর্ণনীয় কলঙ্ক। প্রবৃত্তি ও স্বভাবের শাসন থেকে আত্মিক-মানসিক চেতনার অভ্যুদয়ের সঙ্গেই হ্যামলেটের সঙ্কটের যোগ। এই প্রথম মানুষ নিজের দেহকে ও বিশেষত তার যৌনসত্তাকে ভয় ক'রতে শিখল, সর্বশক্তি দিয়ে নিজের স্বাধীন স্বভাব-প্রবৃত্তিগত চেতনাকে গলা টিপে মারতে গেল। ঔডিপাস্ যৌনসত্তাকে ভয় করে না, যৌনতাকে ভয় করে না, ঘৃণাও করে না : সে ভয় করে নিয়তিকে। হ্যামলেট নিয়তিকে জানে না, যৌনতার জন্যতরতায় সে কাতর।[১১] 'অ্যানিমেস্টো' কবিতায় হ্যামলেট-এর 'টু বী অর নট টু বী' প্রশ্নের জবাবে লরেন্স্ বলেন : "অস্তিত্বের এই তীব্র কামনাই চরম মূল্য।" নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে "এ যেন একরকম মৃত্যু অথচ মৃত্যু নয়", আত্মনকে অতিক্রম ক'রে অন্যের সঙ্গে যোগরচনা।

হ্যামলেটকে ঘিরে রোম্যান্টিক সমালোচকেরা যে অলোকসামান্য মহত্ত্বের চিত্র রচনা ক'রেছিলেন, এই শতাব্দীও তার মায়ার আচ্ছন্ন। তাই বার্ণার্ড শ বলেন,

(১১) *Puritanism and the Arts.* (D. H. Lawrence, *Selected Literary Criticism*, Viking, 1956)

"বাবাই ইতর লোভ বা উচ্চাশা কিংবা হীন বিদ্বেষের উর্ধ্বে, তারাই তাদের প্রভাবকদের কাছে দুর্বল ও ভীরু ব'লে প্রতিপন্ন হয়। কখনও কখনও তারা নিজেরাই নিজেদের সম্পর্কে ঐ ভুল ধারণা করে। এটুকু যে বোঝে, তার কাছে হ্যামলেটের চরিত্রে কোন অসঙ্গতি নেই।"[১০] এমনকি এলিয়ট্‌ও যখন 'লাভ্‌ সঙ্‌ অব্‌ প্রুফ্‌রক্‌'-এ প্রুফ্‌রকের বিপরীতে প্রিন্‌স্‌ হ্যামলেটকে দাঁড় করান, তখনও প্রুফ্‌রক প্রভুদের হাতের খেলনা, বিনয়ী, পরের কাজে লাগলেই খুশ, কৌশলী, সাবধানী, অতিসতর্ক, আক্ষরপ্রিয়, কিঞ্চিৎস্থূলবুদ্ধি, কখনও কখনও প্রায় হাস্যকর—কখনও কখনও প্রায় 'ফুল'।[১১] এলিয়ট স্পষ্টতই পোলনিয়স্‌কে স্মরণ করেন ; হ্যামলেট পোলনিয়সের এই বৈপরীত্যে হ্যামলেটের গুণাবলী স্পষ্টতর রেখায় ফুটে ওঠে। আধুনিক জর্মন কবি হল্‌থুসেন 'ব্যালাড্‌ আব্‌ট্যার শেক্‌স্‌পীয়র' কবিতায় হ্যামলেট প্রসঙ্গে বলেন : "এই সব কিছু তাকে চক্রান্তে ঘিরে ধরে : সিংহাসন, সিঁড়ি, দর্পণ, মোড়ো পর্দা। আমরা শুনি, সে ডাকে প্রেতাত্মাকে, নিদ্রাকে, মৃত্যুকে, সমাধিকে।" "শুধু ছায়ের জন্য" হ্যামলেট নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দেয়। "তার চিন্তা, তার ভয়ঙ্কর বিলম্বিত পৌরুষ, রোষ, সংযম, অভিজ্ঞতা, অন্তর্গর্ভ রক্ত, যাকে সে কী প্রচণ্ড ভেঙে বিক্ষত করে।"[১২] অভিজাত ভেঙে হীন নারকীয় পরিবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হ্যামলেটের এই চিত্রে তার অন্ত আত্মপ্রত্যয় ও নিষ্কলঙ্ক নিষ্ঠা ; তার সহচর সাথী গ্লানি, শ্রান্তি, মৃত্যুকামনা, চিন্তার দুঃসহ ভার। বিংশ শতাব্দীর সর্বব্যাপী কাপুরুষতা, নৈতিক দৌর্বল্য ও লঘুচিত্ত-পলায়নপরতার বিপরীতে প্রিন্‌স্‌ হ্যামলেট তার অষ্টাদশ শতকের বীর্যও নিয়ে পাশে। হ্যামলেট আজ শুধু বিষণ্ণ অক্ষম কবি নয়।

পাস্তেরনাকের 'হ্যামলেট' কবিতায় হ্যামলেট জীবনের জটিলতার প্রতীক হ'য়ে দাঁড়ায়—যে জটিলতা আবার নিয়তির দুর্ভেদ্য রহস্যের সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে যায়। নিঃসঙ্গতা ও মিথ্যার কূলপ্লাবী অন্তরঙ্গও এই জটিলতারই অন্তর্গত : "আমি একা। চারিদিক মিথ্যায় ডুবে যায়। জীবন তো আর যাই দেখিয়ে যাবার মত সরল নয়।" এই সঙ্গেই আসে মুক্তির জন্য প্রার্থনা ("আমার

(১০) Letter to Alfred Cruikshank, October 4, 1918. (Shaw on Shakespeare, Ed. Edwin Wilson. Dutton, 1961).

(১১) নাইটক্লব প্রসঙ্গে পোলনিয়স্‌ fool হ'য়ে দাঁড়ায়, তবে শেক্‌স্‌পীয়রের fool নয় ; তাই এলিয়টও বলেন, "Almost, at times, the Fool."

(১২) পাট্রিক ম্যাকগ্রাথের ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণে।

কল্পনায় বিবশ্বাস টেনে নাও") এবং নত মস্তকে দায়িত্ব গ্রহণ[৫৬]। এই কবিতায় হ্যামলেটকে যুগের সঙ্গে এক ক'রে পাস্তেরনাক হ্যামলেটের যে মূর্তি সৃষ্টি করেন, অন্যত্র তিনি সেই মূর্তি আরো স্পষ্ট ক'রে আঁকেন : "প্রেতাত্মার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই হ্যামলেট তার স্রষ্টার সাথ পূর্ণ ক'রবে ব'লে নিজের সাথ বিসর্জন দেয়। এ নাটক স্পষ্টার দুর্বলতার নাটক নয়, কর্তব্য ও আত্মত্যাগের নাটক। আপাতদৃষ্ট ও বাস্তবের মধ্যে যখন অতল গহ্বরের ব্যবধান দেখা দেয়, তখন যে পৃথিবীর মিথ্যাচারের আবরণমোচন ক'রতে অশরীরী প্রেতাত্মা এগিয়ে আসে, প্রতিশোধ দাবী ক'রে, তার অন্য কোন বিশেষ গুরুত্ব নেই। বরং সত্যিই যা গুরুত্বপূর্ণ, হ্যামলেট তার নিজের কালের বিচারেই নির্বাচিত হয় এবং প্রাচীনতর কালের সেরক ব'লে স্বীকৃত হয়।"[৫৭] হ্যামলেটের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে মিথ্যার সকল আবরণ মিথ্যা হ'য়ে যায়; সত্যদ্রষ্টা হ্যামলেটের ভিক্ত বাণীও অনাবৃত সত্যের রুক্ষতা নিয়ে এসেছে, আর কিছু নয়। হ্যামলেটের নিঃসঙ্গতাও সত্যদ্রষ্টার নিঃসঙ্গতা, এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠার গুরুভার দায়িত্ব তার একার স্কন্ধেই, সেই হেতুই বিষাদ ও যন্ত্রণায় বেদনা।

আরো একটি ব্যাখ্যা।

"No one is likely to accept another man's reading of *Hamlet*"—E. M. W. Tillyard.

কলিন্ উইল্সন্ যাকে 'আউটসাইডার' বলেন, হ্যামলেটের সঙ্গে তার আত্মীয়তা আছে। উইল্সনের মাপকাঠিতে ফেলে হ্যামলেটকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা না ক'রে বরং হ্যামলেটের চরিত্র থেকেই এই আউটসাইডারকে খুঁজতে গেলে বেশি লাভের সম্ভাবনা। হ্যামলেটের সঙ্গে আমাদের শতাব্দীর চিন্তার ধারার সম্পর্ক নির্ণয় হয়ত এই পথে সম্ভব।

এ কথা বোধ হয় মনে রাখা বিশেষ যে, হ্যামলেটের চিন্তার উৎসমূল উইটেনবার্গ, এবং এই উইটেনবার্গ রেনেসাঁসের অনেক বাঙ্ময় মুখারের নাম ও কীর্তির সঙ্গে যুক্ত। ধর্মীয় গির্জার ব্যাখ্যা ও অনুশাসনের নিরাপদ আশ্রয় থেকে ব্যক্তিকে মুখার যে-মুহূর্তে মুক্তি দিলেন, সেই মুহূর্তেই তার উপর সত্যকে

(৫৬) লাঁচিয়া পাস্তেরনাক প্রেমার, হেমলি কাহেন এবং হ্যারল্ড হেওয়ার্ড ও মারিয়া হ্যারাবির তিনটি স্বতন্ত্র ইংরেজি অনুবাদ থেকে।

(৫৭) Pasternak, On Translating *Shakespeare* (Soviet Literature, Sept. 1946; July 1956.)

বুঝে নেবার সম্পূর্ণ ভার এসে পড়ে। সেই ভার নিয়েই হ্যামলেট ডেনমার্কে ফেরে, এসে দেখে ডেনমার্ক 'বন্দীশালা'। অসত্যের আবরণ ভেদে সত্যকে বুঝে তবেই তার মুক্তি সম্পূর্ণ হ'তে পারে। হ্যামলেটের সম্মুখে যুগপৎ যে অসত্য দেখা দেয়, সে-অসত্য আত্মীয়স্বজনের সত্যকে অস্বীকার ক'রেছে। যে-স্বজনে হ্যামলেট নিজেও যুক্ত, সেই স্বজনেরই এক প্রান্তে পচন ধরেছে, সেই ব্যাধির সংক্রমণ থেকে হ্যামলেট কেমন ক'রে নিজেকে বাঁচাবে? এলিজাবেথীয় ইংরেজিতে 'কাইণ্ড' কথাটির অর্থ 'কিন্'-এর সঙ্গে যুক্ত, 'নেচার' বা জন্মগত প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত নীতিবোধের সূচক। 'কাইণ্ড্‌নেস্' দয়া বা করুণা নয়, জন্মমুহূর্তে আত্মীয়স্বজনবন্ধনে স্থাপিত জীবনধর্মে; সেই জীবনধর্ম ও মূল্যবোধ থেকে ক্রডিয়াস ও গার্ট্রুড বিচ্যুত হ'য়েছে। তাই তাদের চরিত্রও সেই মূল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে; তারা আজ যথাক্রমে 'আঙ্কল্-ফাদার', 'আণ্ট-মাদার'। এই পরিপ্রেক্ষিতে হ্যামলেট যখন ক্রডিয়াসকে 'কাইণ্ড্‌নেস্ জিলেন্' ব'লে ঘর্ণনা করে, কিংবা বলে, "I must be cruel only to be kind" কিংবা "more than kin and less than kind," তখন আত্মীয়স্বজনের পবিত্র সূত্রে যে শৈথিল্য এসেছে, তাতেই হ্যামলেটের চাপা ক্ষোভ ধরা পড়ে (রেটরিকের বৈচিত্র্যে এই অংশগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও লক্ষণীয়)। একই কারণে এই নাটকে রোগব্যাধির ইমেজ-এর প্রাচুর্য। এই ইমেজগুলি প্রায়ই আবিলতার সঙ্গে যুক্ত [৭৮]। হ্যামলেটের মনের পরিচ্ছন্নতা যে সহসা কলুষিত হ'য়ে গেছে, ওফেলিয়ার কথায় তার আভাস আছে। ঐ কুৎসিত রোগের সাক্ষাতে এসে, সংক্রমণের আতঙ্কে, রোগ থেকে পালাবার প্রাণান্ত চেষ্টায় রোগের বীভৎস রূপ তার চিন্তায় এমনভাবে ভর ক'রে থাকে যে, হ্যামলেটের ভাষাও কুৎসিত হ'য়ে উঠতে থাকে। ডোভার উইলসন যখন হ্যামলেটের প্রথম স্বগত ভাষণে 'সলিড্' বদলে 'সালিড' করেন, তখন এই সমগ্র চিন্তার ধারা স্পষ্টতর হয়—মাতার অনাচারে হ্যামলেটের নিষ্কলঙ্ক দেহপিণ্ডে মালিন্যের কলঙ্ক লেগেছে। এতেই হ্যামলেটের অসহ্য যন্ত্রণা। এই সম্পর্ক থেকে সে নিজেকে সমূলে বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলতে চায়, ঐ অসুস্থ মানুষগুলির সংস্পর্শেই তার ভয়। ক্রডিয়াস তাকে পুত্র ব'লে সম্বোধন করা মাত্রই হ্যামলেট যেন ঘৃণায় শিহরিয়ে আসে—সে যেন "টু ম্যাচ্ ইন্ দি সান্"—ধনিগুণে

(৭৮) শ্যাডিয়মের অ্যাবালিসিস্ থেকে আমি নিজস্ব উপসংহারে পৌঁছেছি। ইমেজের প্রকৃতির ইঙ্গিতটুকুই কেবল শ্যাডিয়মের ধার।

পুত্রের সম্পর্ক ও সূর্যের খরতাপ তথা তার যাতনা অভিন্ন হ'য়ে যায়। আরো বলা যায় যে, যেহেতু দেহের এক সম্পূর্ণের তাড়নায় ক্রডিয়াস ও গার্ট্রুড প্রকৃতির বিধিকে অমান্য ক'রেছে, সেইহেতুই দেহ ও দেহের দাবী সম্পর্কে হ্যামলেটের এত তয়—'মানারি' দৃশ্যের ব্যাখ্যা এইভাবেই সম্ভব।

ম্যাক্রোকস্‌ম্‌-মাইক্রোকস্‌ম্‌-এর জটিল সম্পর্কে আত্মাবীল এলিজাবেথীয় হ্যামলেট সমাজদেহেও আল্‌কাইও.নেস্‌-রূপ ব্যাধির লক্ষণ দেখতে পায়। হ্যামলেট-পোলনিয়াসের বৈপরীত্য কোল্‌রিজ লক্ষ্য ক'রেছিলেন, এলিয়টও তাঁর কবিতায় ক'রেছেন। হ্যামলেটের তাবৎ গুণের বিপরীত গুণের আধার পোলনিয়াস্‌—শঠতা, গুপ্তচরবৃত্তি (পুত্রকন্যা কেউই বাদ যায় না), স্বার্থসার দাসবৃত্তি, এবং সততার বহিরঙ্গলের সঙ্গে তার ক্রূরতার অসঙ্গতি (১৮) তার অশ্রদ্ধ জীবনযাত্রা। তাই হ্যামলেটের হাতে পোলনিয়াসের মৃত্যুতে যেন নিয়তির হাত আছে। যে ব্যাধিকে স্পর্শ ক'রতে হ্যামলেট প্রথম থেকেই ঘৃণা বোধ ক'রেছে, সহসা সেই ব্যাধির একটি শিকারকে নিজের অজান্তে হত্যা ক'রেই তার ঐ রোগাচের তয় কেটে যায়। তারপর হত্যার আর হ্যামলেটের হাত কাঁপে না, রোজেন্‌ক্রাউজ, গিল্ডেনস্টার্ন ও ক্রডিয়াসের বিদায় দিতে বেশি সময় লাগে না। পোলনিয়স্‌ হত্যার পর ঐ দোটানা প্রায় কেটে গেছে; পোলনিয়স্‌কে হত্যার পরই ছুরিকাসম বাগ্মিতে মাতাকে আক্রমণ করাও সহজ হয়। হ্যামলেট এইবারই এ্যাক্তোর হ'য়ে ওঠে। আউটলাইভার অবশেষে কমিট্‌মেণ্ট্‌-এ আসে।

(১৮) cf. "By indirections find directions out." "Trail of Policy." "Leave wringing of your hands."

উইলিয়ম
শেক্সপীয়রের
বাইবেল
অনুবাদ

ওথেলো

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—প্রাসাদের সম্মুখে।

[কেসিও—কয়েকজন বাদকের প্রবেশ]

কেসিও। বাজাও বাজনদার বাজাও বাজাও : আমি
খুশী হয়ে বখশিস দেবো
ছোট্ট একটা গৎ, বলে যেন, সেনাপতি,
সুপ্রভাত।

[ভাঁড়ের প্রবেশ]

ভাঁড়। ওহে ওস্তাদ, তোমাদের বাদ্যিগুলো কি নাকপুরে গিয়েছিল যে এগুলো নাকিসুরে কথা কইছে?

প্রথম বাদক। কেন, কেন বাবু একথা বলছেন?

ভাঁড়। ওগুলো কি বাদ্য যন্ত্র?

প্রথম বাদক। আজ্ঞে, হ্যাঁ বাবু।

ভাঁড়। তাই বুঝি এই পুচ্ছ?

প্রথম বাদক। কি পুচ্ছি বাবু?

ভাঁড়। যে পুচ্ছ অনেক বাদ্য-যন্ত্রে আছে, আমি জানি, কিন্তু ওস্তাদ এই বখশিস নাও; সেনাপতি মশাই আমাদের বাজনা শুনতে এত ভালবাসে যে তাঁর মনের ইচ্ছে এগুলো দিয়ে একটুও যেন আওয়াজ না হয়।

প্রথম বাদক। তাহলে হুজুর বাজাব না।

ভাঁড়। যদি ওস্তাদ এমন বাদ্যি বাজাতে পার যা শোনা যায় না, তবে তা বাজিয়ে যাও : তবে, লোকে বলে, যে বাজনা শোনা যায় তা শুনতে সেনাপতি মশাই বড় একটা ভালবাসেন না।

প্রথম যাযক। এ রকম বাজনা আমাদের কাছে কিছু নেই।

ভাঁড়। তাহলে ঐ খোল-নলচেগুলো খোলার মধ্যে পুরে ফেল, কারণ আমি কেটে পড়ছি: যাও · যাও—বায়ু হয়ে মিলিয়ে যাও।··· [যাযকদের প্রস্থান]

কেসিও। বন্ধুর একটা কথা শুনবে?

ভাঁড়। বন্ধুর কথা? কৈ না? আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি।

কেসিও। এখন ওসব বন্ধরা রাখ। তোমার জন্য সামান্য একটা মোহর রেখেছি, নাও, সেনাপতির স্ত্রীর যিনি পরিচারিকা তাঁকে যদি দেখতে পাও, একটু বলবে কি, যে কেসিও নামে একজন লোক তাঁর সঙ্গে দুটো কথা বলতে চায়।

ভাঁড়। মহিলা আসছেন: যদি তিনি এতদূর আসেন, তবে তাঁরা হইলে এই সংবাদ তাঁহাকে নিবেদন করিবে।

[ভাঁড়ের প্রস্থান]

[ইয়াগোর প্রবেশ]

কেসিও। যাও ভাই।

ইয়াগো, সময়মত দেখা হয়ে গেল।

ইয়াগো। আপনার দেখছি তো শোয়াই হয় নি।

কেসিও। না, হয়নি। ভোর হয় আমাদের দেরার আগেই।
ইয়াগো, করেছি আমি কিছুটা ধৃষ্টতা
আপনার স্ত্রীকে ডেকে; তাঁর কাছে আরজি আমার
গুণবতী ডেসডিমোনার সঙ্গে বারেক আমার
যেন সাক্ষাৎ ঘটান।
এখুনি পাঠাচ্ছি তাকে;
কোন কিছু বলে আমি দূরকেও সরিয়ে রাখছি
যাতে আপনারা খোলা মনে
কারবারটা চালাতে পারেন।
আন্তরিক ধন্যবাদ।

[ইয়াগোর প্রস্থান]

এঁর চেয়ে সদাশয় ভালো
ভেনেসনিবাসী কেউ আছে বলে শুনিনি কখনো।

[এমিলিয়ার প্রবেশ]

এমিলিয়া। নমস্কার কৌঁসলীর, আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আমি
খুবই দুঃখিত ; তবে শিগ্‌গির সব মিটে যাবে।
সেনাপতি ও তাঁর স্ত্রী একথাই বলছেন ; কর্ত্রী
আপনার হয়ে লড়ছেন খুব ; ঘুষের জবাব
এই : মেরেছেন যাকে তাঁর লাইসেন্স ছোঁড়া নাম,
সজ্ঞান বহুদে গতি ; এই সব ভেবে, বাধ্য হয়ে
আপনাকে নাকচ করেন ; তবে, আছেন এখনো
তাঁর প্রিয়, আর কারো মধ্যস্থতা অবান্তর তাই,
যখনি সুযোগ হবে তাঁর স্নেহ আপনাকে ফের
আনবে ফিরিয়ে।

কেসিও। তবু অনুরোধ আপনার কাছে।
অবশ্য ভাবেন যদি সমুচিত অথবা সম্ভব,
ডেসডিমোনার সঙ্গে একাকী সামান্যক্ষণ
আলাপের দিন অবকাশ।

এমিলিয়া। বেশ, ভেতরে আসুন ;
নিজের মনের কথা যেখানে অবাধে বলা যায়
সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।

কেসিও। ধন্যবাদ চিরঋণী হয়ে।

দ্বিতীয় দৃশ্য—প্রাসাদের সম্মুখে।

[ওথেলো, ইয়াগো ও অন্যান্য ভদ্রলোকের প্রবেশ]

ওথেলো। ইয়াগো, এই চিঠিগুলো কাপ্তেনকে দিও,
ব'লো, সে জানায় যেন সেনেটে আমার শ্রদ্ধা :
এরপরে যাচ্ছি দুর্গে, থাকব সেখানে,
কাজ সেরে চলে এসো।

ইয়াগো। যে আজ্ঞা, হুজুর।

ওথেলো। এ দুর্গপ্রাকার আপনারা দেখবেন নাকি।

ভদ্রলোক। আপনার অনুগামী আমরা সর্বদা।

তৃতীয় দৃশ্য—প্রাসাদের সম্মুখে।

[ডেসডিমোনা, এমিলিয়া ও কেসিওর প্রবেশ]

ডেসডিমোনা। কেসিও, নিশ্চিন্ত হন, আপনার হয়ে আমি
করব যা সাধ্যে কুলোয়।

এমিলিয়া। করুন তা মহীয়সী : এ নিয়ে আমার স্বামী এত
বেশী মর্মাহত, যেন এ বিষয় তাঁরই।

ডেসডিমোনা। সত্যি বড় খাঁটি লোক। ..ভাববেন না, কেসিও,
আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার যে সদ্ভাব ছিল
তা আবার ফিরিয়ে আনব।
দয়াময়ী।
যাইহোক কেসিওর ভাগ্যে যাই থাক,
আপনার সেবক ছাড়া কিছুই সে নয়।

ডেসডিমোনা। ধন্যবাদ, সে কি কথা। কত ভালোবাসেন স্বামীকে,
কতদিন থেকে জানাশোনা ; জানবেন
আপনার থেকে তিনি থাকবেন ততটুকু দূরে
যেটুকু না হলে নয় নীতিগতভাবে।

কেসিও। কিন্তু দেবী,
সে নীতি হয়ত এত দীর্ঘস্থায়ী হবে,
এত তুচ্ছ কারণে তা পরিপুষ্ট হবে, কিংবা আমি
নেই বলে, অথবা আমার স্থান পূরণ হওয়ায়,
সে নীতি অবজ্ঞা ফেরে এতখানি বদ্ধমূল হবে,
যে আমার অনুগত্য সেনাপতি ভুলেই যাবেন।

ডেসডিমোনা। ঘিড়িঘিড়ি ভাবছেন : সাক্ষী এমিলিয়া, কথা দিচ্ছি
আপনাকে ফিরিয়ে আনবই ; জানবেন বন্ধুতায়
দায় যদি মেনে নিই, সে দায় পালন শেষ'যদি
করে যাব : দেবনা স্বামীকে স্বস্তি, করব নজর-
বন্দী, কথায় কথায় তাঁকে করব পাগল,
সভা হবে পাঠশালা, আসন যাজন বেদী তাঁর,
প্রত্যেকটি কাজে তাঁর মেলাব মেশাব

কেসিওর আবেদন ; তাই বলি, আনন্দে থাকুন,
জানবেন আপনার এ উকীল মরবে তবুও
ছাড়বে না আপনার আরজি।

[ইয়াগো ও ওথেলোর প্রবেশ]

এমিলিয়া। দেবী, ওই আসছেন প্রভু।

কেসিও। দেবী, আমি যাই তবে।

ডেসডিমোনা। থাকুন না, শুনুন কি বলি।

কেসিও। না দেবী, এখন নয় : আছি আমি বড়ই উদ্বেগে
নিজের স্বার্থও আমি বুঝতে অক্ষম।

ডেসডিমোনা। বেশ, যা ভালো বোঝেন।

[কেসিওর প্রস্থান]

ইয়াগো। না, না, এতো ঠিক নয়।

ওথেলো। কি বললে ?

ইয়াগো। কিছু না, কিছু না, প্রভু : হয়ত—জানি না···থাক।

ওথেলো। ওর কাছে কে ছিল, কেসিও না ?

ইয়াগো। কে, প্রভু, কেসিও ? না, না এ যে ভাবাই যায় না
যে তিনি, আপনি আসছেন দেখে, চোরের মতন
চুপিসারে পালিয়ে যাবেন।

ওথেলো। আমার বিশ্বাস সেই।

ডেসডিমোনা। এই যে এসেছ ?
এই কথা কইছিলাম এঁকজন প্রার্থীর সঙ্গে ;
তোমার বিরাগ ফলে মরমে সে মরে আছে।

ওথেলো। কার কথা বলতে চাইছ ?

ডেসডিমোনা। বুঝছ না, সে তোমার কৌজদার কেসিও ;
তোমাকে টলাতে পারি, এ মাথা যা নাথা থাকে যদি
এবারের মত তার ত্রুটি ক্ষমা কর ;
সে তোমাকে সত্যি ভালোবাসে, ভুল যদি করে থাকে,
না জেনে, তা জেনে নয়, তা যদি না হয় তবে
মুখে যে সারলা দেখি নেহাতই তা ভুল।
তাকে তুমি ডেকে নাও।

ওথেলো। এইমাত্র সে গেল কি ?

ডেসডিমোনা। হ্যাঁ, সে : এত দুঃখ হয়ে গেল
যে তার দুঃখের কিছু আমাতেও রেখে গেছে,
তার দুঃখে দুঃখী আমি : তাকে ডেকে নাও নাগো।

ওথেলো। থাক এখন ডেসডিমোনা পরে হবে।

ডেসডিমোনা। কখন ? কিগ্‌গিরি ?

ওথেলো। চাও যদি, তাই হবে।

ডেসডিমোনা। রাত্রে খাবার সময়ে ?

ওথেলো। আজ রাতে ? না, না,

ডেসডিমোনা। কাল দুপুরে যখন খাবে ?

ওথেলো। কাল খাচ্ছিতে খাচ্ছি না,
কৌজী নেতাদের সঙ্গে কাল দুর্গে দেখা করতে হবে।

ডেসডিমোনা। বেশ, তবে কাল রাত্রে : না তো, সকালে মঙ্গলবারে,
দুপুরে, নাহলে রাতে ; বুধবারে সকালে, তাহলে :
বল, কখন সময় হবে : দেখো যেন
তিনদিনের মধ্যে হয় ; সত্যিই সে অনুতপ্ত :
যদিও তার যা ত্রুটি, আমাদের সরল বুদ্ধিতে
এত তুচ্ছ, (অবশ্য একথা শুনি সেরা সৈনিকেই
যুদ্ধের নজীর দেয়) যাই বল, তাই নিয়ে তাকে
আড়ালেও শাসন চলে না ; কখন সে আসবে বল।
বল সো ওথেলো ; আমি ভাবছি অবাক হয়ে
তুমি কী চাইতে পার আমি যা দেব না ?
যা এত করে বলতে হবে ? আশ্চর্য্য, কেসিও
এসেছে তোমার সঙ্গে কতবার বিয়ের আগেতে,
তখন, যখনি আমি বলেছি তোমার নামে কিছু,
সে তোমার পক্ষ নিয়েছে, তাকেই ফিরিয়ে
আনতে সাধ্য সাধনা এত ? জেনে রেখো, সব পারি—

ওথেলো। হয়েছে, হয়েছে চের ; আসুক সে যখন খুশি :
তোমার যা সাধ তাই দেব।

ডেসডিমোনা। সেকি, এতো দামী নয়;
এ যেন তোমার কাছে অনুরোধ দস্তানাটা পর,
কিংবা ভাল খাদ্য খাও, কিংবা গায়ে জামাটা জড়াও,
অথবা এমন কিছু বলা, যাতে তোমার নিজের
কিছুটা সুরাহা হয়; যে চাওয়া আমার চাওয়া,
যা দিয়ে তোমার প্রেম সত্যি সত্যি করব পরখ,
জেনো তা কঠিন হবে সাধন দুষ্কর,
তা মেটাতে ভয় হবে।

ওথেলো। সব সাধ মেটাব তোমার।
বদলে আমাকে শুধু এটুকু মঞ্জুর কর,
আমাকে থাকতে দাও কিছুক্ষণ একা।

ডেসডিমোনা। বেশ না তুমি যা চাও? সে কি? আমি চললাম।

ওথেলো। এস ডেসডিমোনা, আমি যাচ্ছি এখনই।

ডেসডিমোনা। এস এমিলিয়া তোমার যা মন চায় ক'রো।
তুমি যাই হও, আমি তোমাকেই যানি।
[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান]

ওথেলো। খারাবিনী, যদি তোকে ছুঁয়ে ফেলি কভু
রসাতলে যাই যেন, ভালোবাসব না যেদিন তোকে
প্রলয় আসবে ঘিরে।

ইয়াগো। হুজুর, একটা কথা।

ওথেলো। ইয়াগো, বলছ কিছু?

ইয়াগো। আমার কর্ত্রীর সঙ্গে আপনার আপনাই-এর কথা
জানতেন কি মাইকেল কেসিও?

ওথেলো। জানত সে আদি অন্ত সব;.....এ প্রশ্নের কারণ?

ইয়াগো। তেমন কিছুনা, মনে একটা কৌতূহল ছিল,
কতিকর কিছু নয়।

ওথেলো। কৌতূহল কিসের ইয়াগো?

ইয়াগো। জানতাম না ওঁর সঙ্গে আগে তাঁর ছিল পরিচয়।

ওথেলো। ছিল বৈকি, যোগাযোগ আমাদের সেইত' বাধত।

ইয়াগো। তাই নাকি?

অথেলো। তাই নাকি? হাঁ, তাই-ই: এতে কিছু অদ্ভুত দেখছ কি?
সে কি সৎ লোক নয়?

ইয়াগো। কি বলেন? সৎ লোক?

অথেলো। সৎ লোক? হাঁ, সৎলোক।

ইয়াগো। আজ্ঞে তাই: আমি যতদূর জানি।

অথেলো। তোমার কি মনে হয়?

ইয়াগো। আজ্ঞে, মনে হয়?

অথেলো। আজ্ঞে মনে হয়? যা বললি তার প্রতিধ্বনি?
হা ঈশ্বর, যেন কোন দানব চিন্তার আছে ওর,
এত খুঁজি, দেখানো যায় না: ভেবেছ নিশ্চয় কিছু.
কানে এল এইমাত্র বললে তুমি 'এ তো ঠিক নয়'
কেসিওকে চলে যেতে দেখে: ঠিক নয় কিসে?
যখন শুনলে তুমি, সে আমার পূর্বরাগে
বরাবর অন্তরঙ্গ ছিল, 'তাই নাকি' বলে তুমি
কপাল ও ভুরু দুটো কুঞ্চিত করলে,
তোমার খুকিতে যেন বন্ধ করে রেখে দিলে
বীভৎস চিন্তা কিছু। আমাকে আপন ভাবো যদি
খুলে বল তোমার মনে কি আছে।

ইয়াগো। আপনি তো জানেন, আপনি কত আপনার।

অথেলো। এবং যেহেতু জানি সৎ তুমি, সদা হিতব্রতী,
এবং প্রতিটি কথা আগে ভেবে বল, মাঝে মাঝে
তোমার হঠাৎ থামা এত বেশী তাৎপর্যময় তাই।
যে শঠ বেইমান তার এরকম ভাব
স্বভাব চাতুরী; কিন্তু যে ব্যক্তি বিবেকী,
যে আবেগে ধৃত নয়, এরা তার অন্তরে ঈষৎ
কোন রহস্য আভাস।

ইয়াগো। যাইকেল কেসিও, তুমি,
বলা যেতে পারে, মানে, মনে হয়, সৎলোক।

অথেলো। আমারো ধারণা।

ইয়াগো। মানুষ কে—মন মুখ এক যার,
নয় যার, বাইরের ভেখটা সে না রাখত যদি।

ওথেলো। ঠিকই তো, মনে মুখে মিল রাখা সবারই উচিত।

ইয়াগো। তা হলে ত' মনে হয় কেসিও সজ্জন।

ওথেলো। না, না, এর মধ্যে আরো কিছু আছে।
তোমাকে মিনতি, বল তোমার যা মনে হচ্ছে,
খুলে বল যা ভাবছ, কুৎসিততম চিন্তা
বলে যাও কুৎসিত ভাষায়।
প্রভু, যদি করবেন,
যদিও কর্তব্য কাজে আমার বাধ্যতা আমি মানি,
তবু আমি বাধ্য নই গোলামেও বাধ্য নয় যাতে,
জানাতে মনের কথা। বন্ধন তা অকথা মিথ্যা;
কোথা সে সুহৃদ হর্ম্য যেখানে কদর্য কোন কিছু
কখনো দেয়না হানা? কার মন এত নিষ্কলুষ
যেখানে মলিন কোন ভাবনা সন্দেহ
বিচারে সোপর্দ নয়, লিপ্ত নয় যার প্রতিবাদে
সঙ্গত চিন্তায় সঙ্গে?

ওথেলো। ইয়াগো, বন্ধুর সঙ্গে করছ শঠতা
যদি তার অনিষ্ট জেনেও তুমি না জানাও তাকে
তোমার মনের কথা।

ইয়াগো। অনুরোধ শুধুন আমার,
হয়ত চিন্তায় আমি কিছুটা কুটিল,
(স্বীকার করছি আমি, অপরের ছিদ্রানুসন্ধান
আমার মনের রোগ, আমার সন্দিগ্ধ মন
সোজাকে প্রায়ই দেখে বাঁকা) আমার মিনতি ভাই,—
মনে যার এ সংশয়, তাকে যেন আমল না দেন,
কিংবা তার এদোমেলো অনিশ্চিত চোখে দেখা থেকে
নিজে যেন না অলেন মনের আলায়;
আপনার সুখ শান্তি আপনারই ভালোর জন্যে,
আমারও মনুষ্যত্ব সততা ও বিবেচনা বোধে
আমার মনের কথা মনেতেই থাক্।

ওথেলো। ন্যায়তোষ।

ইয়াগো। নারীই বলুন, প্রভু; পুরুষই বলুন,
সুনাম দেবার কাছে অন্তরের ধন :
যে আমার গাঁট কাটে জঞ্জাল কাছে সে, তা কিছু না,
আমার যা তার ছল, করেছে তা হাজার গোলামি :
কিন্তু যে সুনাম কাড়ে আমাকে ঠকিয়ে,
কাজে সে এমন কিছু যাতে তার লোলুপ থাকে না,
অথচ আমাকে করে নিঃস্ব একেবারে।

ওথেলো। স্বর্গের দোহাই, আমি জানবই তুমি কি ভেবেছ ?

ইয়াগো। পারবেন না, এ জান্ আপনার মুঠোয় থাকলেও,
পাবেনও না, যতক্ষণ আমার আয়ত্তে আছে তা :
হুঁসিয়ার এ সন্দেহ থেকে :
বাঘ-চোখো এই সে দানব যা, যে খাচ্ছে পুষ্টি তার
তাকেই ব্যঙ্গ করে। সুখে থাকে বৈরিণীর স্বামী,
বিবিলিপি মেনে নিয়ে পাপিনীকে যে ভালোবাসে না ;
কিন্তু, আহা, কি কষ্টের মুহূর্ত গোণে সেই জন যায়
প্রাণ কাঁদে, ঘৃণা তবু, তীব্র প্রেম অথচ সন্দেহ।

ওথেলো। কী দুর্ভাগা আহা।

ইয়াগো। যে দীন অথচ তৃপ্ত সেই ধনী, অতি বড় ধনী,
অনন্ত সম্পদ কিন্তু নিঃস্ব যেন সর্বস্বান্ত শীত
তার কাছে, নিঃস্ব হবে এই ভয় নিত্য যার মনে।
ভগবান, পিতৃলোকবাসীরা আমাকে
বাঁচান এ সন্দেহ থেকে।

ওথেলো। কেন, কেন, এই সব কথা ?
ভেবেছ কি আজীবন অমন ঈর্ষায় ?
চাঁদের কলায় যত নিত্য নব সন্দেহের
ক্ষয় বৃদ্ধি হবে ? কখনো না, একবার সন্দেহ হলে
একবারই নিয়সন তার ; কেনো আমি ছাগের অযশ,
যখন আমার এই মনোবৃত্তি হত হবে
তোমার যাবতীয় শূন্যগর্ভ অনর্থ চিন্তায়

আনন্দ বিকারে : হবে না আমার ঈর্ষা, যদি শুনি
সুন্দরী আমার স্ত্রী, সুগৃহিনী, সব ভালোবাসে,
আলাপে স্বচ্ছন্দ, নাচে, গান গায়, বাজায় সুন্দর ;
গুণের আকরে এরা আরো বেশী গুণের প্রকাশ ;
অথবা অযোগ্য আমি, এ কারণে বিন্দুমাত্র ভয়
কিংবা দ্বিধা নেই মনে, সে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে,
কারণ সে নিজে দেখে আমাকে নিয়েছে ; না, ইয়াগো,
আগে দেখে করব সন্দেহ, সন্দেহে প্রমাণ চাই,
প্রমাণের পরে আর কিছু নয়, শুধু এই,
ভালোবাসা কিংবা ঈর্ষা যাবে রসাতলে।

ইয়াগো। শুনে খুশি হলাম, কারণ যে প্রীতি কর্তব্যসূত্রে
আপনার সঙ্গে বাঁধা আছি, এবারে তা অকপটে
আপনাকে দেখানো সম্ভব। তাই বাধ্য হয়ে বলি
যা শুনুন ; আমার এখনো কিন্তু নেইক প্রমাণ :
যেমন নিজের স্ত্রীকে, তেমিওর সঙ্গে দেখে যান ;
বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কিছুই না থাকে যেন চোখে।
আপনি উদার, তাই পূত শুভ্র চরিত্রে আপনার
কালি লেপা হবে, আমি তা দেব না ; নজরে রাখুন ;
জানি আমি খুবই ভালো আমার দেশের হালচাল ;
ঈশ্বরের সামনে ওরা তেমিলে যা করে, স্বামীকে তা
দেখাতে সাহস নেই ; সতী শিরোমণি, সে ও
সেরে যায় ঠিক, তবে সাথে চুপিসারে।

ওথেলো। এ সব কী বলছ তুমি ?

ইয়াগো। আপনাকে বিয়ে করে ঠকায় সে নিজের পিতাকে;
যখন আপনাকে দেখে ভয়ে সারা, আসলে তখনি
মজেছে আপনার রূপে

ওথেলো। সত্যিই তো।

ইয়াগো। তাহলে বুঝছেন।
এত অল্পবয়সে যে এতখানি অভিনয়ে পটু,
নিজের বাপের চোখে কি মোক্ষম ধুলো দিল, যাতে

তিনি ভাবলেন, এইসব বাজে ; কিন্তু অন্যায় করছি,
আপনাকে অত্যধিক ভক্তি করি, এই অপরাধে
ক্ষমা চাইছি।

ওথেলো। তোমায় করছি চিরঋণী আমি।

ইয়াগো। দেখছি কিছুটা যেন এর ফলে বুঝতে পেরেছেন।

ওথেলো। না, ও কিছু না, কিছু না।

ইয়াগো। ভয় হচ্ছে, সত্যিই পেয়েছেন।
আশা করি যা বলেছি তা ধরে নেবেন
অন্তরের টানে বলা। দেখছি আপনি বিচলিত ঃ
আপনাকে বলে রাখি, আমার কথার থেকে
কেবল সন্দেহ ছাড়া বেয়াড়া যেচাল কোন কিছু
আনবেন না মনে।

ওথেলো। না, আনব না।

ইয়াগো। যদি তা আনেন, প্রভু,
আমার কথায় তবে যে অনিষ্ট সাধিত হবে
তা আমার চিন্তাতীত ঃ কেসিও আমার অন্তরঙ্গ ঃ
দেখছি আপনি বিচলিত।

ওথেলো। না, না, তেমন কিছু না,
ভাবতেই পারি না আমি ভেনিসিয়ানা সতী ছাড়া কিছু।

ইয়াগো। তাহলে সে বেঁচে থাক, তা ভেবে আপনিও বাঁচুন।

ওথেলো। কিন্তু তবু মানুষের কি রকম মতিভ্রম হয়—

ইয়াগো। ঠিক তাই ঃ এই যথা, কিছু যদি মনে না করেন,
নিজের দেশের জাতি বর্ণ থেকে
এসেছে সবাই যত কিছুতে মন না ওঠা,
অথচ এদের দিকে স্বভাবত সকলেই ঝোঁকে ঃ
ছি, ছি! এ বিকট ইচ্ছা থেকে কে না বুঝতে পারে
বীভৎস অসঙ্গতি, চিন্তার বিকৃতি।
কিন্তু ক্ষমা করবেন ঃ স্পষ্টই তাকেই লক্ষ্য করে
এ সব যে বলছি তা নয়, তবুও এমন হতে পারে,
হয়ত কামনা তার শুভবুদ্ধি ফিরে পেয়ে

স্বজাতির যানদণ্ডে আপনাকে মিলিয়ে দেখছে,
তারই ফলে হচ্ছে অনুতাপ।

ওথেলো। যাও তুমি, যদি দেখ
আরো কিছু জানাবে আমাকে, ব'লো তোমার স্ত্রীকে
লক্ষ্য রাখতে ; ইয়াগো, এখন যাও।

ইয়াগো। [যেতে যেতে] প্রভু, তবে চলি।

ওথেলো। কেন বিয়ে করলাম ? নিঃসংশয়ে এ সাধু লোকটি
যা জানালে তার চেয়ে দেখেছে ও জানে বহু বেশী।

ইয়াগো। [ফিরে এসে] হুজুর, আপনার কাছে এইটুকু উপরোধ শুধু,
এ নিয়ে ভাববেন না আর ; ছেড়ে দিন সময়ের হাতে :
কেসিওকে বহাল করা সমীচীন বটে,
কারণ, এ কথা ঠিক, যথেষ্ট সে দক্ষ তার কাজে,
শুধু তাকে কিছুদিন কাজটা না দেন যদি, তবে
তা থেকে তাকে ও তার হাবভাবও জানবেন ;
খেয়াল রাখুন, তার ছলে আপনার স্ত্রী
আপনাকে অতিরিক্ত সাধাসাধি করে কিনা,
অনেকটা বুঝবেন তাতে ; ইতিমধ্যে, জানবেন,
সন্দেহবাতিকগ্রস্ত আমি—(যথার্থই
আমি তাই ভাববার কারণও আছে) ; শুধু
অনুরোধ, আপনার স্ত্রীকে যেন নির্দোষ ভাবেন।

ওথেলো। আমার সংযমে সংশয় রেখো না।

ইয়াগো। আমার বিদায় নিচ্ছি। [প্রস্থান]

ওথেলো। এ লোকের সততায় তুলনা হয় না।
মানুষের চরিত্রের যত ছেয়কের, তাও
জানে নিজের মত ; ও শিকারে যদি না দোষ মানে,
যদিও সে বাঁধা থাকে আমার হৃদয়তন্ত্রী দিয়ে,
তবু তাকে ছেড়ে দেব, ভেসে যাক্ শূন্যে হাওয়ায়,
যেখানে যেমন খুশি। হতে পারে, আমি কালো,
আমার কথায় নেই লৌকিক নাগরের
ললিত ভাব, সেইজন্যে, কিম্বা আমি কালের অতলে

অযোগ্যাবী,—যদিও সামান্যমাত্রে—সেইজন্যে সেকি
ছেড়ে গেল, আমি প্রতারিত, তাকে শুধু ঘৃণা
হল দাক্ষনা আমার ! বিবাহের কি এ অভিশাপ,
এ সেলব জীবদের আমাদের বলে গণ্য করি,
করি না তাদের ঘৃণা ! অন্যের ভোগের জন্যে
ভালোবাসি যাকে তার আংশিক সত্বিক হয়ে থাকা,
—এর চেয়ে শত ভালো বহুজনার ভোক্ত হয়ে
পৃথিবীতে বাঁচা। তবু যারা বড় এ আলা তাদেরই
নগণ্যের চেয়ে যেন তাদেরই দুর্ভাগ্য বেশী,
অনিবার্য এ নিয়তি, অমোঘ দৈবের মত ;
মনে হয় আমাদের হতভাগ্যে কুলটায় লেখা
জন্মমুহূর্ত থেকে বুঝি। আসছে ডেসডিমোনা।

[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রবেশ]

ও যদি অসতী হয়, স্বর্গ মিথ্যে প্রতারক তবে।
না, না, কিছুতেই নয়।

ডেসডিমোনা। কী খবর তোমার অথেলো ?
তোমার খাবার তৈরী, এ দ্বীপের ভদ্রলোক যাঁরা
তোমার অতিথি আজ, তোমার অপেক্ষা করছেন।

অথেলো। আমারই এ অপরাধ।

ডেসডিমোনা। এত আস্তে কথা বলছ কেন ? অসুখ করেনি ?

অথেলো। কপালে, এখানে বড় ব্যথা করছে।

ডেসডিমোনা। বুঝেছি, ও সাহারার ফল, এখুনি চলে যাবে ;
কপালটা বেঁধে দিই, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে
ঠিক সেরে যাবে।

অথেলো। তোমার রুমালটা আমি ছোট।

[ডেসডিমোনার হাত থেকে রুমালটা পড়ে গেল]

থাক গিয়ে, চল, সঙ্গে যাই।

ডেসডিমোনা। তুমি ভাল নেই শুনে ভীষণ খারাপ লাগছে।

[অথেলো ও ডেসডিমোনার প্রস্থান]

এমিলিয়া। ভাগ্যি ভালো, রুমালটা আমিই পেলাম,
ওঁকে দেওয়া মূরের প্রথম এ উপহার :
আমার খেয়ালী স্বামী কতবার সেধেছে আমাকে
যাতে এটা চুরি করি, কিন্তু এটি এত প্রিয় ওঁর,—
ওঁর স্বামীও বলেন এটি সাবধানে রেখে দিতে,—
এটিকে সর্বদা তাই কাছে কাছে রেখে তিনি
কথা কন, আদর করেন ; কাজটুকু ভুলে নিয়ে
ইয়াগোকে এটা দিয়ে দেব ; এ নিয়ে সে কী করবে,
জানি না কো আমি, ভগবান জানে,
হয়ত খেয়াল কোন, কিংবা কি জানি কি মানে।

[ইয়াগোর প্রবেশ]

ইয়াগো। কি ব্যাপার, একা তুমি এখানে যে ?

এমিলিয়া। বোকো না ; তোমার জন্তে একটা জিনিস আছে।

ইয়াগো। জিনিস আমার জন্তে ? জিনিসের আছা কিবা ছিরি—

এমিলিয়া। মানে ?

ইয়াগো। বলা এই হাবাগোবা গৃহিণী আমার।

এমিলিয়া। বলছ ত ? আচ্ছা, আগে বল কি আমাকে দেবে
সে রুমালটা যদি দিই ?

ইয়াগো। কোন রুমালটা ?

এমিলিয়া। কোন রুমাল ?
সেই যে গো, ডেসডিমোনাকে মূর প্রথমে যা দেন,
আমাকে যা খালি খালি চুরি করতে বলতে তুমি ?

ইয়াগো। তাঁর কাছ থেকে চুরি করলে নাকি ?

এমিলিয়া। না না, অসতর্কে এটা তাঁর হাত থেকে পড়ে যায়,
আমি সেখানে ছিলাম, চট করে তুলে নিই,
এই দেখ।

ইয়াগো। লক্ষ্মীটি, আমাকে দাও।

এমিলিয়া। এটা নিয়ে কি করবে শুনি ; যাতে এটা চুরি করি
তাই জন্তে তোমারই বা কেন এত আগ্রহ বল ত ?

ইয়াগো। [কেড়ে নিয়ে] সে কথায় তোমার কি কাজ ?

এমিলিয়া। যদি কোন গুরুতর দরকারে না লাগে
আমাকে ফিরিয়ে দিও, আহা, বেচারী শাসল হবে
যখনই পাবে না এটা খুঁজে।
জানিও না তুমি জানো, আমার দরকার আছে;
যাও এখন।

[এমিলিয়ার প্রস্থান]

ডেসিডেমনা বাড়িতে এই রুমালটা ফেলে আসতে হবে
যাতে তার হাতে পড়ে: তুচ্ছ যা হাওয়ার মত
সংশয়ীর কাছে তাই অকাট্য প্রমাণ
যেন শাস্ত্রের বচন; এতে কিছু ফল হতে পারে।
আমার বিষের ফলে মুর আর সেই মুর নেই:
ভালবাসার চিন্তাগুলো স্বভাবত নিজেরাই বিষ,
প্রথম আঘাতে তার বিষাদটা বোঝাই যায় না,
কিন্তু রক্তে আর একটু জিয়া হলে পরে
সেই বিষ জলে যেন গন্ধকের খনি: যা বলেছি:

[ওথেলোর প্রবেশ]

ওই সে আসছে দেখ, আকিঞ্চনে মাখানো কিংবা
জগত উজাড় করা খনির নির্যাসে
তোমার সুচোখে আর আসবে না সে-মধুর ঘুম
কাল রাতে যা এসেছে।

ওথেলো। এঁ্যা, এঁ্যা, আমাকে ঠকান? ঠকান আমাকে?

ইয়াগো। আর কেন সেনাপতি? ছেড়ে ফেলে দিন।

ওথেলো। নিকালো, দূর হ. তুই আমাকে শূলে বিঁধেছিস।
ভগবান, একটু জানার চেয়ে ঢের ভালো
বঞ্চনার প্রতারিত হওয়া।

ইয়াগো। সেকি, প্রভু?

ওথেলো। কে জানত চুরি করা কারুকে প্রহরগুলো তার?
দেখিনি তা, ভাবিনি তা, তা আমার ক্ষতিও করেনি,
সে রাতের পরে সুখে ঘুমিয়েছি, খেয়েছি, খেলেছি,
আমার কি ওঠে তার ডেসিডেমনা চুম্বন দেখিনি;

যে দুষ্টিত, সে যদি না বোধ করে ক্ষতির অভাব,
তবে তা না জানে যেন, না জানলে দুষ্টিত সে নয়।

ইয়াগো। এই শুনে দুঃখ লাগায়।

ওথেলো। থাকতাম সুখে যদি সামান্য নিশাই থেকে
জনে জনে ও হলাল দেহ তার করত আস্বাদ,
আমাকে তা না জানিয়ে : উঃ, এধারে চিরতরে
দুষল মনের শান্তি, শেষ হল আনন্দ আমার,
শিখীশীর্ষ সেনাবৃহ বিদায়, বিদায় মহারণ,
তীর্যাঞ্জন উচ্চাশায়! যাও, যাও, সব,
চলে যাও রেষী অশ্ব, উত্তার সুতীব্র তূর্য।
যশোমাদী জয়ডঙ্কা, কর্ণভেদী শিঙা,
রাজসজ্জা, যতকিছু গুণ ও গরিমা,
মহাগর্ব আড়ম্বর, সামরিক মহিমার ঘটা।
আর তোরা যন্ত্রদানব, যাদের পরুষ কণ্ঠে
বিশ্বত্রাস বজ্রনাদ অমর্ত্য ইন্দ্রের,
তোরাও যা চলে, ওথেলোর সাঙ্গ সব কাজ।

ইয়াগো। এও কি সম্ভব, প্রভু?

ওথেলো। দুরাত্মা, প্রমাণ দিতে হবে, আমার প্রেয়সী বেশ্যা,
মনে যাকে যেন, আমি চাক্ষুষ প্রমাণ চাই, তা না
পেলে অনন্ত আত্মার নামে ধলে রাখছি,
আমার সে কোপানলে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে তোর
কুকুর জন্মও হত ভালো।

ইয়াগো। সেবকালে এই?

ওথেলো। দেখা, দেখা, আমাকে তা : নয়ত এমন প্রমাণ দে,
যে-প্রমাণ স্বতোসিদ্ধ, সংশয়ের অবকাশ যাতে
তিলমাত্র নেই ; নইলে নিস্তার নেই তোর।

ইয়াগো। সদাশয় প্রভু—

ওথেলো। যদি তাকে অপবাদ দিয়ে আমাকে যন্ত্রণা দিস
ঈশ্বরকে ডাকিস না আর, অনুতাপ ত্যাগ কর ;
অথবা কর বিভীষিকা ভয়ংকর থেকে ভয়ংকর ;

করে যা দুষ্কীর্তি যাতে স্বর্গ কাঁদে, পৃথিবী চমকায়,
এ দুষ্কর্মের বাড়া পাপ কিছু নেই, যা বাড়াতে পারে
তোর নরক যন্ত্রণা।

ইয়াগো। ভগবান, দয়াময়, রক্ষা কর!
আপনি কি মানুষ? মন প্রাণ কাণ্ডজ্ঞান কিছু আছে?
বিধাতা সহায় হোন! আমায় ইস্তফা দিন্। হা রে
হতভাগা, সততা যে পাপ তাই জানলি জীবনে;
বিকট সংসার ওরে, জেনে রাখো, সংসার, জানো,
সৎ ও সরল হওয়া নিরাপদ নয়,
এ জ্ঞান দানের জন্য বহু ধন্যবাদ; আজ থেকে
বন্ধুপ্রেম আর নয়: প্রেমে যদি এত অপরাধ।

ওথেলো। দাঁড়াও, দাঁড়াও; মনে হচ্ছে তুমি সৎ।

ইয়াগো। যেন আমি বিজ্ঞ হই, সততা তো মূঢ়তা দাবিল,
যার জন্যে করে মরে তাকেই হারায়।

ওথেলো। হা দুনিয়া,
মনে হয় স্ত্রী আমার সতী, মনে হয় সে তা নয়।
মনে হয় তুমি ঠিক, মনে হয় ঠিক নও;
প্রমাণ, প্রমাণ চাই; যে নাম আমার ছিল শুভ্র
যেন পূর্ণিমার চাঁদ, এখন তা কলঙ্কিত কালো
আমার এ মুখ যেন; দ'ব না দ'ব না আমি—
বিষে বা আগুনে কিংবা অস্ত্রাঘাতে, ফাঁসীতে লটকিয়ে,
ডুবিয়ে, যা করে হোক; যদি শুধু নিশ্চিত হতাম।

ইয়াগো। দেখছি অনুভব আপনি মনের আলায়,
দুঃখ হচ্ছে, আমি কিনা এর জন্যে দায়ী:
নিশ্চিত হতে চান?

ওথেলো। চাই, না, হবই।

ইয়াগো। তা হয়ত হতেও পারেন, তবে কি করে হবেন?
আপনি কি চোখের সামনে বড় বড় চোখ করে
দেখবেন সে মজা লুটছে?

ওথেলো। খুন, খুন, আহাহমে···ত:।

ইয়াগো। মনে হয় দুজনকে এইভাবে দেখতে পাওয়া
খুবই কঠিন ; আমাদের পাঠাবেন,—ঠিক কথা,
যদি কেউ চর্মচোখে কখনো তাদের দেখে থাকে
দুজনকে এক বিছানায় ; কি হবে উপায় ?
কি বলি বলুন ? কিসে নিশ্চিত প্রমাণ মিলবে ?
রাগছাড়া মত তারা ছাগলা হলেও, বাঁদরের
মত কামী, নেকড়ের মত ক্ষ্যাপা, মাতাল বোকার
মত বেহেড হলেও, এইভাবে দেখতে পাওয়া
আপনার পক্ষে অসম্ভব ; তবে কিনা অনুমান,
যদি তার ভিত্তি হয় অব্যর্থ ঘটনা সংযোগ,
তার থেকে সরাসরি সত্য কী তা আঁচ করা যায়,
যদি তাতে খুশি হন, তা হলে পেতেও পারেন।

ওথেলো। ও যে অসতী—তার জাজ্বল্য প্রমাণ চাই।

ইয়াগো। এ কাজ আমার ভালই লাগে না, কিন্তু
যেহেতু বোকার মত দয়া আর শ্রদ্ধার খাতিরে
এ ব্যাপারে এতখানি জড়িয়ে পড়েছি,
চালিয়ে যেতেই হবে : হালে শুতে হয়েছিল
আমাকে কেসিওর সঙ্গে, দাঁতের ব্যথায় চোটে
ঘুমোতে পারিনি আমি।
এমন হালকা মন আছে এক ধরণের লোক
যে তারা ঘুমের ঘোরে নিজেদের কথা বকে চলে,
কেসিও তাদেরই একজন :
শুনলাম ঘুমন্ত বলছে সে "সাবধান ডেসডিমোনা,
সাবধান, আমাদের প্রেম কেউ জানতে না পারে।"
তারপর প্রাণপণে আমার হাতটা চেপে ধরে
বলে উঠল "সোনামণি," তারপরে শুরু চুমু খেল,
যেন সে উপড়ে নিল চুমুগুলো সোজাসুজি টেনে
আমার ঠোঁটের থেকে, তারপরে পা'টা তার
আমার উরুতে রেখে, চুমু খেয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে
বলল, "হায়রে, শেষে ঘুমের ভোগ্য হলে তুমি !"

ওথেলো।

ইয়াগো। এ তার স্বপ্ন শুধু।

ওথেলো। তবু, তবু এতে আছে পূর্বকার সত্যের আভাস।

ইয়াগো। তোখোড় সন্দেহ বটে, যদিও এ স্বপ্ন শুধু :
এর থেকে আর যা প্রমাণ, যা ক্ষীণ সংকেতমাত্র,
জোরদার হতে পারে।
ও নারীকে ত্রিকূল টুকরো করে।
স্থির হন, কিছু যে ঘটেছে—এখনো জানিনা কিন্তু।
মহিলা হয়ত সৎই ; আচ্ছা বলুন দেখি,
একটা রুমাল, তাতে লতাপাতা আঁকা,
আপনার স্ত্রীর হাতে কখনো কি দেখেছেন ?

ওথেলো। এ জিনিস আমিই তো দিই, আমার প্রথম দান।

ইয়াগো। আমি তা জানি না, তবে এরকম রুমাল দিয়ে—
নিঃসন্দেহে আপনার স্ত্রীরই—দেখলাম আজ
কেসিও মুছছে মুখ।

ওথেলো। ওটা যদি সেটা হয়,—

ইয়াগো। সেটা বা কোনটা যদি আপনার স্ত্রীর হয়,
অন্য প্রমাণের সঙ্গে তা তার বিরুদ্ধে যাবে।

ওথেলো। চল্লিশ হাজার জন্ম নেই কেন বাঁদীর বাচ্চার !
একটা নগণ্য, তুচ্ছ, আমার এ আকোশ মেটাতে ;
সব সত্য, বুঝেছি এখন ; ইয়াগো, এবারে দেখ,
স্নেহপ্রেম যা ছিল আমার উড়িয়ে দিলাম শূন্যে,...
ওই তা মিলিয়ে গেল।
ঘোর কালো প্রতিহিংসা উঠে এসো শূন্য গুহা থেকে,
ভালোবাসা, দিয়ে যাও মুকুট ও হৃদি সিংহাসন
অমর্ষ ঘৃণাকে ; বিষভারে জ্বলে ওঠো
সর্পাজিহ্ব এ বক্ষ আমার।

[নতজানু হল]

ইয়াগো। স্থির হন, শান্ত হন।

ওথেলো। উঃ, রক্ত, রক্ত। রক্তের পিপাসা।

ইয়াগো। ধৈর্য ধরুন, মন তো বদলাতেও পারে।

ওথেলো। না, ইয়াগো, কখনো না। কুলসাগরে যেমন
স্থিরেল প্রবাহবেগ উন্মথিত অনিবার্যগতি,
পিছুটান জানে না কখনো, ধ্রুব লক্ষ্য স্থির রাখে
দূর মহাসাগরের প্রশান্ত সম্বন্ধে,
তেমনি আমারও এই রক্তচিত্ত আক্রোশে উদ্যম,
কখনো চাইবে না ফিরে, নোয়াবে না মমতা মায়ায়,
যতদিন প্রতিহিংসা সর্বগ্রাসী বিপুল কমলে
বিলীন না করে তাকে। সাক্ষী তাই মর্মর আকাশ,
পবিত্র শপথভোরে নতশিরে ভক্তিভরে আমি
যাচনার প্রতিজ্ঞা আমার।

[ইয়াগো নতজানু হল]

ইয়াগো। থামুন, উঠবেন না।
সাক্ষী হন আকাশের নিত্য দীপ্ত আলোকশিখারা,
সাক্ষী হন ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম,
সাক্ষী হন, আজ থেকে উৎসর্গ করছে ইয়াগো
মন প্রাণ বল বুদ্ধি যা কিছু সামর্থ্যে আছে তার,
লাঞ্ছিত ওথেলোর কাজে : তিনি আদেশ করুন,
সে-আদেশ বৈরাগ্যেও মেনে নেব আমি,
হোক কাজ রক্তাক্ত ভীষণ।

[উত্তরে উঠে দাঁড়াল]

ওথেলো। নিলাম তোমার প্রীতি ;
নয় শুধু মুখের কথায়, সাদর আগ্রহে নিচ্ছি ;
তোমাকে এ মুহূর্তেই দিচ্ছি কাজের ভার,
আজ থেকে তিন দিনে আমাকে শোনাবে তুমি,
কেসিও জীবিত নেই।

ইয়াগো। নিশ্চয় আমার বন্ধু :
আপনার ধলাই হওয়া, কিন্তু ও নারী বাঁচুক।

ওথেলো। আহাম্মুখ যাক সে কাদুকী, যাক্ সে, চুলোয় যাক।
এস তুমি একান্তে আমার সঙ্গে, চল দূরে গিয়ে

ওই যেন পিশাচীর নিধনের ত্বরিত উপায়
করি স্থির : আজ থেকে তুমি হলে সহকারী।

ইয়াগো। চিরদিন আপনার ক্রীতদাস আমি।

[প্রস্থান]

●

চতুর্থ দৃশ্য—প্রাসাদের সম্মুখে

[ডেসডিমোনা, এমিলিয়া ও ওঁথেলোর প্রবেশ]

ডেসডিমোনা। কৌজদার কেসিওকে জানো তুমি, কোথা তার ঠিকানা ?

ওঁথে। মাপ করবেন, তাঁর কথা ঠিক-না, আমি বলতে পারব না।

ডেসডিমোনা। কেন, এ কথা বলছ ?

ওঁথে। তিনি কৌজী লোক, কৌজদারের কথা ঠিক না বললে তো জান চলে যাবে।

ডেসডিমোনা। ভুলোয় যাও, বলতে পার, তিনি কোথায় থাকেন ?

ওঁথে। তিনি কথায় থাকেন বলাও যা, আমার কথা না থাকা বলাও তাই।

ডেসডিমোনা। এর থেকে যাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছ ?

ওঁথে। তাঁর কোথায় ঠিকানা আমার জানা নেই, তাঁর যা হোক একটা ঠিকানা ঠিক করে, যদি বলি হেথায় ঠিক না, হোথাও ঠিক না, তাহলে বুঝতে হবে আমার কথাও ঠিক না।

ডেসডিমোনা। তাঁর অবস্থিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে' চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করবে ?

ওঁথে। তাঁর জন্যে এই বিশপ্রপঞ্চ নিয়ে আমি কেনোপনিষৎ রচনা করব। অর্থাৎ কিনা প্রশ্ন করব এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে জবাব আদায় করব।

ডেসডিমোনা। তাঁকে খুঁজে বার করে এখুণি এখানে আসতে বলবে, বলবে আমি তাঁর হয়ে আমার স্বামীকে বলেছি, আশা করি সব ঠিক হয়ে যাবে।

এই কটা কথা যে কোনো একজন পুরুষ মানুষের এক্তেয়ারের
মধ্যে, অতএব আমি তা করার চেষ্টা করছি।

[প্রস্থান]

ডেসডিমোনা। এমিলিয়া, রুমালটা কোথায় ফেললাম বল দেখি?

এমিলিয়া। আমি তো জানি না, দেবী।

ডেসডিমোনা। আমাকে বিশ্বাস কর, এর চেয়ে যদি থলি ভরা
মোহর হারাত, হত ভাল; নেহাৎ আমার মুর
উদার প্রকৃতি, সন্দিগ্ধ লোকদের মত
তাঁর মনে কোন খল নেই, তাই, নইলে এ থেকে
ভাবতেন কত কি খারাপ।

এমিলিয়া। তাঁর কি সন্দেহ নেই?

ডেসডিমোনা। কার, তাঁর? মনে হয় জন্ম লগ্নের রবি
তাঁর হাতে এ ভাব রাখেনি।

[ওথেলোর প্রবেশ]

এমিলিয়া। তিনি আসছেন।

ডেসডিমোনা। এখানে ছাড়ছি না; কই, আসুক কেসিও, ওঁর সঙ্গে
করুক সে দেখা। এখন কেমন আছ তুমি?

ওথেলো। ভালই, ভালই আছি। [জনান্তিকে] অভিনয় কি কঠিন!
ডেসডিমোনা, তুমি ভালো আছ?

ডেসডিমোনা। বেশ ভাল আছি।

ওথেলো। তোমার হাতটা দেখি, হাতটা দেখছি ভিজে।

ডেসডিমোনা। শোকতাপ বয়সের ছাপ এতে পড়েনি এখনো।

ওথেলো। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে উর্বরতা, দরাজ হৃদয়;
গরম, গরম আর ভিজে; এ হাতের দাওয়াই,
নিরালায় নির্বাসন, উপবাস সাধন পূজন,
অত্যধিক নিজেকে নিগ্রহ, সর্বক্ষণ জপতপ;
এখানে রয়েছে এক ঘিটঘিটে শেয়ানা শয়তান
যে কেবলি খেপে ওঠে; হাতখানা দেখছি ভালই,
বেশ খোলামেলা।

ডেসডিমোনা। তুমি তা ত' বলতেই পার,
এ হাত যে তোমাকেই সঁপে দেয় হৃদয় আমার।

ওথেলো। বেশ যুক্তহস্ত : আগে আগে হৃদয় মেলাত হাত,
কিন্তু হাদের কেতায় শুধু হাত, হৃদয়টা নেই।

ডেসডিমোনা। ও সব জানি না আমি : কই, এস, কথা রাখো।

ওথেলো। কোন কথা, সখী ?

ডেসডিমোনা। কেসিওকে ডাকিয়েছি যাতে সে তোমাকে এসে ধরে।

ওথেলো। তরল নদিতে বড় কই পাল্লি,
তোমার রুমালটা দেখি।

ডেসডিমোনা। এই নাও।

ওথেলো। না, না, সেটা আমার দেওয়া।

ডেসডিমোনা। এখন তা আমার কাছে নেই।

ওথেলো। নেই ?

ডেসডিমোনা। সত্যি বলছি নেই।

ওথেলো। অস্তায়, অস্তায় ; ও রুমাল
মিসরীয় এক নারী আমার মা'কে দিয়েছিল ;
সে নারী জানত যাদু, লোকের মনে কি আছে
সে যেন দেখতে পেত : মাকে বলে, যদি এটা কাছে
থাকে স্বামী মোহাগিনী হয়ে আমার বাবাকে তিনি
করবেন বশ : কিন্তু যদি খোয়া যায় অথবা তা
হয় হাতছাড়া, তবে আমার বাবার কাছে তিনি
হবেন চোখের বিষ, এবং বাবার মতিগতি
মজবে নতুন মেয়ে ; মা আমার অন্তিম সময়ে
বলেন আমাকে, যদি ভাগ্যগুণে স্ত্রী আমার জোটে
তাকে যেন এটা দিই : দিয়েছিও ; এটি যত্নে রেখো
বুকের উল্লাস করে, তোমার চোখের মণি যেন ;
হারালে বা দিয়ে দিলে এমনি সর্বনাশ হবে
যে তার তুলনা নেই জেনো।

ডেসডিমোনা। এও কি সম্ভব ?

ওথেলো। সত্যি, এর পরতে পরতে আছে যাদু :

এক সিন্ধা কাপালিনী ছ'শবার পৃথিবীকে ঘিরে
সৌর পরিক্রমা দেখেছে সে ভীষণভাবে,
দৈবাদিষ্ট হয়ে এই কাজটা সে করে :
মৃতঃপুত কীটদাত এই তন্তুগুলো,
অতি দক্ষ কারিগর কুমারীর হৃদয় নির্যাসে
এ রুমাল করেছে রঞ্জিত।

ডেসডিমোনা। সত্যি বলছ ?

ওথেলো। পুরোপুরি সত্যি, তাই সাবধানে রেখো।

ডেসডিমোনা। তাহলে আমার চোখে না পড়াই ছিল ভালো।

ওথেলো। তার মানে ? কি হয়েছে ?

ডেসডিমোনা। অমন চমকে অত রুক্ষভাবে কথা বলছ কেন ?

ওথেলো। হারিয়েছ ? গেছে ? আর পাওয়া যাবে না তা ?

ডেসডিমোনা। হায় ভগবান !

ওথেলো। বল, বল ?

ডেসডিমোনা। না, তা হারায়নি, কিন্তু যদি হারাতাই ?

ওথেলো। কী !

ডেসডিমোনা। বলছি তো, হারায়নি।

ওথেলো। নিয়ে এস, আমি দেখতে চাই।

ডেসডিমোনা। কি আর, এখনি আনতে পারি, কিন্তু আনব না তো,
জানি, আমাকে এড়াবে বলে তোমার এ ছল,
শোন না গো, কেসিওকে তার কাজে আনো না ফিরিয়ে।

ওথেলো। রুমালটা আগে আনো, খটকা লাগছে মনে।

ডেসডিমোনা। অনেক হয়েছে, থামো।
এমন চৌখস লোক কখনো পাবে না।

ওথেলো। রুমালটা কই ?

ডেসডিমোনা। হ্যাঁ গো, কেসিওর কি হবে, বল।

ওথেলো। রুমাল, রুমাল কই ?

ডেসডিমোনা। যে তোমার স্নেহের ছায়ায়
ভালোমন্দে চিরদিন পেয়েছে আশ্রয়,
নিজেছে তোমার পক্ষে বিপদের ভাগ,—

অথেলো। রুমালটা কই ?

ডেসডিমোনা। যাই বল, তোমারই দোষ।

অথেলো। হায়রে জাদ্।

[প্রস্থান]

এমিলিয়া। এ লোকের ঘাতে স্থির নেই ?

ডেসডিমোনা। এর আগে এরকম কখনো দেখিনি :
নিশ্চয় রুমালের অদ্ভুত শক্তি আছে।
তা হারিয়ে আজ আমি বড় হতভাগী।

এমিলিয়া। দু এক বছরে আমরা পুরুষকে চিনতেই পারি না :
তারা শুধু পেটভরা লোভ, আমরা শুধুই খাদ্য :
হাভাতেরা আমাদের খেলে, পরে, পেটপুরে খেলে
দেয় উগরিয়ে।

[ইয়াগো ও কেসিওর প্রবেশ]

আসছেন কেসিও আমার স্বামীর সঙ্গে।

ইয়াগো। কোনই উপায় নেই : তাঁকেই এ করতে হবে,
কি সৌভাগ্য, ওই তো তিনি, যান, যান, বলুন গে।

ডেসডিমোনা। এই যে কেসিও ! কি খবর আপনার ?

কেসিও। দেবী আগে যা বলেছি, তাই : এইটুকু অনুরোধ,
আপনার শুভ চেষ্টা আমাকে ফিরিয়ে এনে দিক
আগের জীবন, এনে দিক স্নেহের আশ্রয় তাঁর
যাঁকে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে
শ্রদ্ধা করি ; আর দেরি সইছে না :
এতই জীবন যদি অপরাধ করে থাকি যাতে
অতীতের সংকাজ, উপস্থিত এই অনুতাপ,
ভবিষ্যতে প্রাণপণ সেবাব্রত সংকল্প আমার,
ফিরিয়ে না আনতে পারে তাঁর স্নেহ প্রীতি,
তবে তা জানতে দিন, সে-জানাই হোক পুরস্কার :
তারপরে জোর করে মুখে হাসি টেনে
অন্য পথে চলে যাব ভাগ্যের দুয়ারে
ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে।

ডেসডিমোনা। হায়, ধীর বিনত কেসিও,
এখন আমার কথা বাজছে বেসুরো।
আমার স্বামীতে নেই আমার যে স্বামী ; তাঁকে আমি
চিনতাম না, যদি তাঁর রূপে আসত মনের আগল।
পুণ্যাত্মারা আমার সহায় সাক্ষী,
আপনার জন্যে আমি যতদূর বলার বলেছি,
আর মন খুলে বলার লক্ষণ, আমি তাঁর
বিরাগ কেড়েছি ; কিছুদিন ধৈর্য ধরুন ;
আমার যা সাধ্য, করব, নিশ্চিন্তে থাকুন,
যা পারি না নিজের জন্যেও, তাও করব আমি।

ইয়াগো। প্রভু রাগ করেছেন নাকি ?

এমিলিয়া। এতগুলি এখান থেকে
গেলেন কী অদ্ভুত অধীরভাবে !

ইয়াগো। তাঁর রাগ ? আমার স্বচক্ষে দেখা কামানের গোলা
তাঁর সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করেছে যুদ্ধে,
ছিনিয়ে নিয়েছে (যেন শয়তান) তাঁর বুক থেকে
নিজের ভাইকে,—সেই লোকে রাগ ?
সাংঘাতিক হয়েছে কিছু তবে। যাই তাঁর কাছে,
সত্যি যদি ক্রুদ্ধ হন, গুরুতর কারণ ঘটেছে।

[প্রস্থান]

ডেসডিমোনা। তাই যান ; নিশ্চয় রাজ্য সংক্রান্ত কিছু
এসেছে ভেনিস থেকে, অথবা এই সাইপ্রাসেই
জেনেছেন গুপ্ত কোন চক্রান্তের কথা, তার ফলে
শান্ত স্বভাব তাঁর এত বিচলিত ; এই ক্ষেত্রে
ছোটখাটো জিনিসেই চটে ওঠা পুরুষ স্বভাব,
যদিও আসল লক্ষ্য গুরুতর কিছু।
সবক্ষেত্রে এই হয় ; আঙুলে বেদনা হলে পরে
শরীরের আর আর সুস্থ অঙ্গগুলো
কি রকম টন্‌টন্ করে ; না, না, ভাবা দরকার
পুরুষ দেবতা নয়।

তাছাড়া তাদের কাছে উচিত না সে-সোহাগ চাওয়া
যানায় যা বাদশেতে : এমিলিয়া, আমাকে বিদায় দাও।
আমি যেন অবাধ্য সৈনিক (জানি না সমরনীতি —
সেবেছি নিষ্ঠুর বলে মনে প্রাণে তাঁকে,
অথচ এখন দেখছি আমি হাত করেছি সাফীকে
তাই তিনি মিথ্যা দায়ে দায়ী।

এমিলিয়া। আপনার কথামত দেশের বিষয়ই যেন হয়,
আপনাকে নিয়ে কোন সন্দেহ বা বিষ
না হলেই হল।

ডেসডিমোনা। হা কপাল! আমি করিনি ত' সেরকম কিছু!

এমিলিয়া। কিন্তু যায় সন্দবাদ, এতে শান্ত সে হবার নয়:
কারণের জন্যে তারা সন্দেহ করে না,
সন্দ-বাদ্ আছে তাই সন্দেহ তাদের: এ রাক্ষস
নিজের ভেতর থেকে জন্ম দেয় নিজেকে নিজেই।

ডেসডিমোনা। ঈশ্বর রাক্ষসটাকে রাখুন ওথেলো থেকে দূরে।

এমিলিয়া। তাই হোক, দেবী।

ডেসডিমোনা। আমি যাই খুঁজি তাঁকে, কেসিও, এইখানে থাকুন,
যদি তাঁকে ভালো দেখি, বলব আপনার কথা,
যাতে কাজ হয় তাও দেখব সাধ্যমত।

কেসিও। আন্তরিক ধন্যবাদ, দেবী।

[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান]

[বিয়াঙ্কার প্রবেশ]

বেঁচে থাকো, প্রাণের কেসিও।

যাচ্ছি ছেড়ে—কি ব্যাপার?

আমার নয়নমণি বিয়াঙ্কা, খবর কি, বল?

প্রেয়সী, তোমারই বাড়ি এই আমি যাচ্ছিলাম।

আমিও তো যাচ্ছিলাম তোমার বাড়িতে।

পেরেছ কি, এথেলোর পাত্তা নেই? সাত রাত সাত দিন?

আটচল্লিশ আট ঘণ্টা, যখন বিরহী-ঘণ্টা
ঘড়ির ঘণ্টায় থেকে কটকর আটচল্লিশ গুণ?

কি জ্বালা যে মনে কাল সোনা!

কেলিও। বিয়াঙ্কা, ক্ষমা কর,
এ কদিন ঘরে খুব দুশ্চিন্তায় আছি,
কথা দিছি, সুবিধা পেলেই আমি কড়ায় গণ্ডায়
না-আসার হিসেব চুকিয়ে দেব ; বিয়াঙ্কা লক্ষ্মীটি,
[ড্রেসিংগাউনের কমাপটা দিয়ে]
কাজটুকু তুলে দেবে ?

বিয়াঙ্কা। কেলিও, এ কোত্থেকে পেলে ?
উপহার বুঝি কোন নতুন বন্ধুর ;
না আসার কী কারণ এবারে বুঝেছি,
শেষকালে এই হাল হল ?
থামো, আর আলিও না।
শয়তানের কাছে পাওয়া শয়তানী চিন্তাগুলো
তাকেই ফিরিয়ে দিও ; তোমার সন্দেহ হচ্ছে
আমার প্রেমিক কোনো স্মৃতিচিহ্ন দিয়েছে আমাকে !
সত্যি, শোন, বিয়াঙ্কা, তা নয়।

বিয়াঙ্কা। তবে, কার ?

কেলিও। আমিও জানি না, এটা দেখলাম পড়ে আছে ঘরে :
কাজটা লাগল ভালো ; ফিরে চাইবার আগে,—
চাইবেই কেউ ঠিক,— কাজটা তুলিয়ে নিতে চাই ;
নাও, এ কাজটা তুলে দিও, তাহলে এখন যাও।

বিয়াঙ্কা। যাব ? কেন যেতে যাব ?

কেলিও। সেনাপতি আসবেন, তাই আমি রয়েছি এখানে ;
আমাকে তোমার সঙ্গে দুজনে দর্শন
আমার ইচ্ছাও নয়, সৌহৃদ্যও বাড়বে না।

বিয়াঙ্কা। মানে ?

কেলিও। মানে নয়, তোমাকে বাসি না ভালো।

বিয়াঙ্কা। অর্থাৎ বাসো না ?
চল না, আমাকে একটু রাস্তায় এগিয়ে দেবে ;
আজ রাতে তাড়াতাড়ি আসবে তো, বল।

কেলিও। তোমাকে এগিয়ে দিতে বেশীদূরে পারবো না যেতে,
আমাকে এখানে থাকতে হবে, তুমি যাও, আমি আসছি।

বিয়াঙ্কা। তাই ভালো, চলতে হবে অবস্থা বুঝেই। [প্রস্থান]

শেক্‌সপিয়রের সনেট

29. *When in disgrace with Fortune and men's eyes,*

বিতাড়িত হ'য়ে ভবে ভাগ্য আর মানুষের চোখে
একাকী শোচনা করি পরিত্যক্ত দশায় আমার,
বধির স্বর্গের কানে ডাকি নয় দারিদ্র্যের শোকে,
এবং নিজেকে দেখে নিরর্থকে জানাই ধিক্কার :
তখন সৌভাগ্যে ধনী অন্য কারো ভবিষ্যৎ বাঞ্ছি,
মুখশ্রীতে এর মতো, ওর মতো বন্ধুভাগ্যে ধনী,
এ ব্যক্তির গুণপনা, সে ব্যক্তির সম্ভাবনারাজি,
নিজের যা-কিছু তাতে খুশি নয় কিছুতে আপনি ;
অথচ এ চিন্তাজালে যখনি নিজেরে ছেয় করি
হঠাৎ তোমার কথা ভাবি, আর দেখি যেন আমি
উষঃপ্রত্যুষে এক বিহঙ্গের বুকভরা ধরি'
বিষণ্ণ ধূসর ভূমি ছেড়ে স্বর্গে গাহি গানের প্রণামী।
তোমার মধুর প্রেম মনে হলে যে-ঐশ্বর্য আনে
সে-ভাগ্য বদলাতে আমি তুচ্ছ গণি রাজার সম্মানে।

মণীন্দ্র রায়

35. *No more be griev'd at that which thou hast done :*

সন্তাপ রেখো না মনে আপনার কৃতকর্ম হেতু :
গোলাপে কণ্টক আছে, পদ্ম আয়ে শৈবাল নির্ঝরে ;
চন্দ্র সূর্য উদ্ভাসের মেঘ ও গ্রাহ করে কলঙ্কিত,
ঘৃণা কীট বাসা বাঁধে মনোরম কুঁড়ির ভিতরে।
মানুষ অচ্যুত নয়, সহযোগী আমিও পতনে,
অসঙ্গত অধিকার দিয়াছি তো, সে নজির আছে,
নিজেকে করেছি ভ্রষ্ট ; তব ব্যথা, প্রলেপি সেখানে,
যত না তোমার ছাতি অপরাধিক আমার ক্ষমা যে ;

স্নেহেতু আমিই তব কামাচারে আনি যৌক্তিকতা—
তোমার বিরোধী, তবু তোমারই কৌতূলি হতে হয়—
নিজের বিরুদ্ধে বলি, বলে যাই বিধিনিষিদ্ধ কথা :
অন্তরে যে গূঢ়মুক্ত ভালবাসা এবং ঘৃণার
আমি তাই প্রকৃতির নিরুপায় সহায়ক, তারই
সে বহুর অন্তরের—যে নির্মম, সর্ব-অপহারী ॥

চিত্ত ঘোষ

Is it thy will thy image should keep open

চাও কি তোমার ছবি জাগরিত রাখুক আমারে
আমার নিদ্রালু ক্লান্ত চোখের পাতা দুটি খুলে ?
চাও কি আমার ঘুম ভেঙে ভেঙে যাক বারে বারে
তোমারই সদৃশ ছায়া দেখি পোড়া এ চোখের ভুলে ?
অপরীরী আমাকে কি পাঠায়ে দিয়েছো তুমি বলো
গৃহ থেকে বহুদূরে ছুপে ছুপে ত্রুটির সন্ধানে,
আমার কলঙ্কীর্তি এবং খেয়ালী দিনগুলো
খুঁজে খুঁজে বের ক'রে ঈর্ষার যাতনা পেতে প্রাণে ?
যদিও তোমার প্রীতি অনেক, তবুও তাতো নয়,
আমারই এ ভালবাসা চোখ থেকে ঘুম নেয় কেড়ে,
আমারই একান্ত প্রেম আমার বিশ্রাম করে ক্ষয়,
প্রহরীর মতো আমি রাত জাগি, ভাবি যে তোমারে।
আমি জাগি এইখানে, অন্যখানে তুমি জাগো রাত,
আমি আজ বহু দূরে, অন্য লোক তোমার সাক্ষাত।

জগন্নাথ চক্রবর্তী

137. *Thou blind fool, Love, what dost thou to mine eyes*

হে অন্ধ হে মূঢ় প্রেম, চক্ষে মোর কী ঘোর লাগালি
কেন দৃষ্টিবিদ্ধ শুদ্ধ যা ভাখে তা আসলে ভাখে না ?
রূপরঙ্গ চেনে ওরা, জানে তার নিবাস নাগালই
তথাপি নিকৃষ্টবোধে প্রকৃষ্টকে প্রকট রাখে না।
অতীব খণ্ডিত দৃষ্টি কলুষিত যদি চক্ষু মম
সে-ভ্রমে মোহের রাখে যথা সর্ব মানুষের থানা
অযুত বানালি কেন দিয়ে তবে চোখের বিভ্রম
কেন তা'তে গাঁথা প'ল হৃদয়ের প্রেমোবোধখানা ?
স্বীয় ভূমিখণ্ডজ্ঞানে মন তারে কেন মিলে যেনে
হৃদয় আমার যারে জানে ব্যাপ্ত জগতসকাশে ?
অথবা, আমার চোখ দেখে কেন চিরন্তন না-চেনে
হেন কালামুখে সত্য ঈশ্বরের আরোপণ-আশে ?
আমার হৃদয় মম চক্ষুর্দ্বয় আজি বাক্যচ্যুত
নিশ্চিত ভ্রমের পথভ্রান্ত, মিথ্যা সর্বনাশকৃত।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

140. *Be wise as thou art cruel ; do not press*

যেমন নিষ্ঠুর তেম্‌নি বিজ্ঞ হও ; অতি ব্যবহারে
ক্ষুব্ধবাক ধৈর্যে তুমি বিতৃষ্ণার এনোনা বিকৃতি :
পাছে দুঃখে কথা ফোটে, কথা দিয়ে ভাষার আকারে
জানায় অসহ্যব্যথী বেদনার আত্মপরিচিতি।
যদি বা তোমাকে আমি বুঝি দিতে পারি, দেওয়া ভালো,
প্রেমে-পড়া নয় ঠিক, তবু প্রিয়া ব'লো সে-রকম ;
যেমন চিকিৎসে রোগী, হত্যা যার নিকটে ঘনালো,
বৈদ্যের বাচনে শোনে কেবলি ব্যাধির উপশম।

কেননা নৈরাশ্য পেলে হব আমি নিতান্ত উন্মাদ,
যদি সে উন্মত্ত ক্ষণে ছেড়ে যাই তোমার সন্ধানে ;
রাহুগ্রস্ত বিশ্বে আজ হীনভাব এতোই অবাধ
উন্মাদ নিন্দা যা বলে তাই সত্য উন্মাদের কানে।
যাতে আমি তা' না-হই, না হও তুমিও বিদায় যাতে,
অচঞ্চল সাম্যনে চাও, তাতে বুক ভাঙুক আঘাতে।

মণীন্দ্র রায়

148. *O me, what eyes hath Love put in my head.*

হায় বিধি ! একী দৃষ্টি দিলো প্রেম ললাটে আমার
প্রকৃত দৃষ্টির সাথে নেই যার বিন্দুমাত্র যোগ ;
যদি বা সাদৃশ্য থাকে, পলাতক কোথা সে বিচার—
যে তর্কে নাকচ করে চোখ যারে মেনেছে অযোগ।
যদি ভবিষ্যৎ তাহা ভ্রান্ত দৃষ্টি যা করে মোহিত,
সমাজ কেন বা তার অসারত্ব বোধে ভারস্বরে,
যদি তা' অসার হয়, প্রেম তবে করে প্রমাণিত,
প্রেমের দৃষ্টিই ভ্রান্ত সবাকার থেকে ; না, কী করে,—
প্রেমের দু'চোখ পাবে সুস্থ দৃষ্টি, স্বচ্ছ ও নির্মল,
কিন্তু তার আঁখিতারা ব্যর্থ প্রতীক্ষার অশ্রুজলে :
কুয়াশা না কেটে গেলে সূর্যের দৃষ্টিই হীনবল
কিছুই আশ্চর্য নয় আমারও চোখের ভুল হলে :
ওরে ধূর্ত প্রেম। অশ্রুজলে অন্ধ করে দিস্, আমি
পাছে স্বচ্ছ চোখে দেখে কেলি তোর জারত্ব নষ্টামি।

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

শ্যাম-নৌকা

কমলকুমার মজুমদার

'তুমি দীনবন্ধু' এ কথা বলিবার কারণে ছেলেমানুষ, সাধারণতঃ, যে এ পর্য্যন্ত এখনও, কচিৎ সরল মনোচোরা সঙ্গীত খেলাযাত্র, কতটুকুই বা ঘোর উহা চাহে. সুদীর্ঘতম অন্ধকারেও যাহা, যাহার কোনই ব্যতিক্রম নাই, অন্তরতম দিবা কথাগুলই পূর্ণীর, লীলার অন্তর : কালাচাঁদের ওষ্ঠদ্বয় যদিও এ সময় বড় শীত, মাখমাস, অবশ্য কদাচ সে জন্য নহে, কম্পিত হয় ; প্রতি পদক্ষেপেই সে বারম্বারই উচ্চারণ করিয়াছে : তাই তাহার কণ্ঠস্বর আল্লাদ-ভরা, তাই তাহা অনধীন, উহা বালুকাস্তূপের উপর রক্তমাখি পদচ্ছের অথৈ নিবাদ অন্তরহস্যের পশ্চাদ্বর্তী নিদ্রাউত্থিতের চরণধ্বনি যেমত, আর যে, 'তুমি দীনবন্ধু' বলিবার মত, সত্যই, এ-প্রান্তর গম্ভীর, শ্যাম, শাস্ত্ররসাস্পদ।

ইসানীং যাহার দূরত্ব এখানে নিকট, সেখানে নিশ্চিত, ঐখানে এলেবেলে ; এই হেতু যে সর্ব্বত্রই, এখন ঐরাবৎ পদচ্যুত মেঘমালা সদৃশ কুয়াশায় হাবা মোহাগহীন ; কুয়াশা কোথাও ছত্রছাতা, কোথাও অতি বৃদ্ধ জল কাহিল জন্তুর মতই বড় মন্থরে গমনোদ্যত ; তবু, এখানে, অঘোষ শূন্যতা আছে, নিঃসঙ্গতা যাহার বন্ধুবান্ধু, ইহা শাস্ত্ররসাস্পদ এবং এই স্থানে, 'তুমিই দীনবন্ধু' এ-বাক্যে, যাহা আর বক্তব্য নহে, কালাচাঁদ, যাদব দিনের খেলাযাত্র যে, সন্ন্যাসী যেমন, আপনকার প্রারব্ধগত মৃত্যুকে অঞ্জলি ভরিয়া উৎসর্গ করিয়াছে এবং এ-প্রান্তরে, যেখানে, জলবাস আকীর্ণ নীলিমা আভাস বালিরাশি, যাহা এখন সে পায় হয় ; এখন, উহাদানে না চাহিয়াই—কেন না এখানে অমর, উর্দ্ধতম অবস্থায় সঞ্জিত সৌন্দর্য্য, সূক্ষ্মতা, 'তুমি দীনবন্ধু' বলিয়াছে।

কালাচাঁদ আপনার হস্তদ্বয়, মুষ্টিবদ্ধ আঁটার সতাটি অনুভব করিয়াছিল, একাকে যাহার একটি গতিশীল লিপি গোবর্দ্ধন, মহিষটির গলে উহার গ্রাস বাঁধা : কুয়াশা জল, মহিষ যেন নবল —সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত তথাপি তাহার শিংদুটি যাহা বেতালের প্রশ্নের মত, গল্পের মত বাঁকা এবং সম্মুখের অবকাশে কুয়াশা তাহার মৃদু নিঃশ্বাসে বিরক্ত, পদশব্দরত আর যে মাঝে মাঝে আলেয়া-চোখ দুইখানি প্রত্যাবর্তমান : ইচ্ছামত একদা যে চক্ষুদর্শনে কালাচাঁদের সহসা মনে হয়

এক ঐশ্বর্য—মহিষের চোখের মণি, গুলফর ঘাস, বংশলোচন, বেলগুটি খয়ের নূতন হাঁড়িতে দুঁটের আগুনে এবং ইহা ঘৃতকুমারী, অবশ্য মহিষটির চোখের জন্য তাহার তৎক্ষণাৎ কষ্ট হয়, সহসা-ই এহেন মানসিকতা শুধু যে এখনই, এমন নহে, দিনের পর দিন, এমনতর সিদ্ধাইএর নিয়ত প্রেরণা পায়—পরক্ষণেই সে অসহায় কারণ কখনই ফলবতী হয় না—কেননা তাহার পিতার কারণেই এবং এই মহিষ যাহার জন্য, ঐশ্বর্যের নিমিত্ত নহে, অপহরণ করা। মহিষটির কণ্ঠলগ্ন সত্তার একান্ত অনেকক্ষণ যাবৎ একইভাবে দুঠো করার হেতু আর পলক্ষয়ের দুঁতেতেল, কারণ এ জলে জোঁক আছে, তেল করিয়া জটিল কাটারি-ঠাণ্ডা অনুভবের যে যন্ত্রণা তীব্র শোভা যন্ত্রণা—, দিবে অনেক আগের, রহমতপুরের মাঠের খেজুর কাঁটার মত খড়কুটি ইহার তুলনায় কিছু নয়—তাহাকে পীড়িত করে নাই, অন্তপক্ষে তাহাকে, কালাচাঁদকে, নক্তজলের যন্ত্রণা মান করে, ফলে এ যন্ত্রণা তাহার ডাকের মধ্যে আসে নাই : কেন না সে হয় গভীর এবং এখন জলরাশির পানে অবলোকন করত সে বলিয়াছে, ইতঃপূর্বে ঊর্ধ্বে চাহিয়া, যখন সে মাঠে, একটি হাত আপনার বক্ষে স্থাপন করত ডাকিয়াছে, 'তুমি দীনবন্ধু।' কাহারও নিমিত্ত সে হয়ত ডাকে নাই।

প্রথম এ হেন ঘোর কান্তারে সে একাকী যখন, ঠিক সম্পর্কে সঠিক আস্থাবান নহে, কিয়ৎপরিমাণে অসহায় মন, যেমন রহতপুরের হাটের মহাদেব চাবিওয়ালা বাদাম গাছের তলে বসিয়া যে গান গায় আর তালা বেয়াদব করে, তাহারই ডান হাতের কাটা বুড়ো আঙুলের মতন, যাহার হারভাব বুঝা অঙ্কে আসে না, হইলেও কালাচাঁদ তাহা অর্থাৎ আপনার মনকে খাতে আনিতে তথা আপনাকে উৎক্ষিপ্ত করিবার মানসে গীত গাহিতে চেষ্টা করে, যদিচ এ কথা সত্য যে, সে, তাহার এই মহিষ লইয়া যাত্রার পূর্বক্ষণে দুকড়ির অন্তর সে পায়, তবু হয়ত, সে বালকমাত্র স্নেহেতু, তাই তাহার মনে আর বয়স ছিল না ; বহুবারই দুকড়ির শালুক-লাল নয়ন দুটি তাহার সম্মুখে ভাসিয়াছে আর তাহারই চোখ, যাহার চোখে ভাদ্রবতীর খেলা, মা-হারকের, ইহাদের দুইজনকে—সূর্য যখন গা ধরিয়া মানুষের আর কিছুক্ষণ থাকিতে চায়, তখনই তাহাদের দুইজনকে শেষ দেখিয়া চলিয়া আসে, উহারা দুইজনে নগরঘাটির রাস্তার উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া জমাদার হস্ত সঞ্চালনে তাহাকে দ্রুত যাইতে ইঙ্গিত এবং নির্ভাবনা দিয়াছে।

এ সময়ের আরও আগে, অপরাহ্ণ বেলা নগরঘাটি ছাড়াইয়া পর্বতপুর

তাহারই কোলে নাবাল জমির আবাদ, দক্ষিণে খেলাতলক ইতিমধ্যে যে তাহা রাঙা; ইহার মাঝ বরাবর, কালচাঁদ আর প্রায় দুই রশি পশ্চিমে এক বেল ও অশ্বত্থের জোড়, দুরদৃষ্ট. এখানে বনবিবির থান জোড় গাছের গুঁড়ির নিম্নে সিন্দুরলেপা, আশপাশের মরা এবং ছোট ডাল ডালে চুল টিল দিয়া বাঁধা. ছাওয়ায় বৃশ্চিকের মতই, নীচের মাটি নিকোন সেখানে কয়েকটি পোড়া মাটির যোড়া দ্বারা সাজান ঘরা এবং দুয়েকটী ভাঙ্গা ঘট আর বিস্তর ফুলমালা. অপরাহ্ণ বেলার আলোয় সকল জিনিষ ছায়ার উত্তর বিশেষ বড় ঘোর, আরও যে, শুকনা পাতা যখন ঘর ঘর শব্দ করত এ স্থানের উপর দিয়া চলিয়া যায় তখনই বিশেষত, আর ডালে বাঁধা চুলগুলি মনে হয় এখন শনিবারের অমাবস্যার বিষময়ী রাত্র।

মহিষ অপহরণ কার্য্য যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় সেই মানসে তাহারা দুইজনে, সে এবং মা-রসকে, এ কারণ যে দুকড়ি তখনও অনুপস্থিত, প্রথমে আসে : বনবিবির পূজা দিতে হইবে, বনবিবি আতুরের মনস্কামনা পূর্ণ করেন. তাঁহার পুণ্য নামে বাঘ যোগ ছাড়িয়া জালে পড়ে, এমন কি বাঘে দোকে লাগে না; মা-রসকে অতীব নিষ্ঠার সহিত পূজার যোগাড় করে, বেতেলী সুলভ কেয়াপাতে কয়েকটি কচুপাতা দুইয়া, একটির উপর মুড়কী পয়সা খানেকের. একধারে পাঁচটি বাতাসা, আধপাতায় তেল সিন্দুর, তাহারই পাশে একটি পয়সা চারেকের পাঁজা-ঠাসা কদ্দে, যেমন যেমন দুকড়ি বলিয়াছে. একান্তে একটি মুড়ুরী ঘট জলপূর্ণ; সমস্ত কিছু গোছাইয়া একটি বড় কচুপাতা চাপা দিল। সে, কালাচাঁদ, নিকটের একটি গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়া আনমনে এ সকল কিছুই দেখিতেছিল। শুধু ভাবিয়াছিল, মা-রসকের কি প্রয়োজন ছিল. কাজটা ত' তাহার নহে. এইটুকু ভাবিতেই বুকে ভুবারের তীব্রতা বোধ হইল, তাহার দৃষ্টি এখন বহুদূরে, যেখানে ভেড়ির উপর সুদুইস. পাইপথ. এমত সময়ে তাহার কানে আসিল—'ওগো বাবু এত উতলা হলে কি সো চলে, তুমি না পুরুষ মানুষ।'

কালাচাঁদ ধীরে উর্দ্ধ চুলওয়ালা মাথাটি নামাইল, দেখিল, কাছেই মা রসকে মাটিতে একটি হাতের ভর রাখিয়া 'এতল-বেতল' খেলে : এ খেলা নয়, কোন খেলাই তাহার ভাল লাগে না, তবু কালাচাঁদ মা-রসকের সুন্দর সুডৌল মুখখানির. যে মুখে সরলতার মাধুর্য্য, প্রতি অবলোকন করিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। মা-রসকে অর্থাৎ রসিক মণ্ডলের মেয়েরাটি ভারী সুন্দর, এই কারণেই সে চণ্ডী অঞ্চলেরার মালিকের, চণ্ডী শাস্ত্রীর, বড় প্রাণের. উহাদের মধ্যে এক অপূর্ব্ব সম্বন্ধ

বর্তমান, ফলে ফলের সন্ধানেই রসিক-কে 'যা' আন করে, তাই আড়ালে সে যা-রসিক। সত্যই, রসিকের মধ্যে এক বিস্ময়কর মোহিনীমায়া আছে, বিশেষত তাহার সুদীর্ঘ পক্ষ্মযুক্ত চোখে ভাবপ্রবণতার খেলা, নাকটি ছোট, মাথার সমস্ত পাত কাটা, সর্বাঙ্গে বালিকাভাব আশ্চর্য, অদ্ভুতভাবে সে নিঃস্বার্থ হেসিতে জানে; গায়ে একটি লাল গামছা, ঠোঁটে একটি পেনসেনের (এক প্রকার মুখশুদ্ধি) কালো! যদিও, এত সত্ত্বেও কালাচাঁদের মনে হয় এইমাত্র রসিক কান্না থামাইয়া চোখ মুছিয়াছে: এইহেতু, সে তাহার এতদ-বেতদ খেলায় অন্য কিছু বলে নাই: বিশেষ করিয়া রসকে, তাহারই কারণে—চণ্ডী পাত্রী জানিতে পারিলে মনো-ক্ষোভের বিষয় হইবে—নিজেকে স্থির, সকল কিছু জানিয়া শুনিয়াও, রাখিতে সক্ষম হয় নাই, অন্য সকালে তিনটি টাকা তাহার বাবাকে সে কল খাইতে দিয়াছে; বিশেষ করিয়া, আর একদিনের কথা, তখন কালাচাঁদও চণ্ডী অপেরায় নিযুক্ত, শরৎকাল, গিরিশচন্দ্রপুরে পালা গাহিয়া সন্ধ্যায় ট্রেন ধরিয়াছে, রসকে-কে সে 'তাসানে'র গান গাহিতে বলে, গানটি বিলাসখানি টোড়ীতে বাঁধা; যদিও এ রাগ এ সময়ের নহে, তথাপি কালাচাঁদের বালক মনকে এ গীত এক রহস্যময় সময়ের মধ্যে লইয়াছে, যে সময় পদ্মপত্রে জলের ন্যায় ক্ষণিক নয়; ট্রেনের একটানা অদ্ভুত শব্দ এ গীতকে অন্তরতম করে, মাহাত্ম করে নাই এবং এই প্রথম তাহার বাবার জন্য এক অভ্রভেদী খেদ, বড় যন্ত্রণা, উপস্থিত হইল; আর যে ছেলের মায়াত্মক মর্মান্তিক সিটি, বাঁশী, শ্রবণে ঘটিতি তাহার মনে হইল তাহার বাবা যেন এক সুখ স্বপ্নের আজব রেলগাড়ীর···এই অবধি কল্পনার পরক্ষণেই সে একীভূত: স্নেহে বিস্ফারিত নয়নে, যে নয়ন আকর্ণবিস্তৃত, দক্ষিণা রায়ের মূর্তিতে যেমন এবং এ সময় তাহার প্রতুপ অন্ধাত্মী, দেখিল, এক ঝাঁক ফড়িং: একদা তদ্দর্শনে মনে হয় যে—তখন, প্রায়ই সব সময় ছাপটো থাকিত, কাপড় কোথায়—যে আর সকল কিছুর খবরই, তাহার ধারণায়, উহাদের থাক বা আছে: সমগ্র শরীর উলঙ্গ দুই হাত মস্তকের পিছনে স্থাপন করত চুপ, এ হেন ভাবনায় তাহার যেমন ভাব লাগিয়াছে, এখন, সে যেমন পরকলা, সবুজবর্ণ ক্ষমাসত বিদ্যুৎরিক্ত আর পশ্চাতে অসংখ্য ধানক্ষেত্র—তারপর আকাশ নামিয়াছে সম্ভবত, কাহাদের ঘাটে হয়ত পা ঝোর: হয়ত, উহাদের, ফড়িঙদের, রেলগাড়ী কি আছে? হয়ত উহাদের আছে; এবং কেন যে সংক্রান্ত হয় যাবা এক আজব রেলগাড়ীর সিটি, আর এ পর্যন্ত গমনায় সে, তাহার অভ্যন্তর মুগপৎ চাউল তখনই রোদা, ওটছ: পিয়া উপনিয়া অতেক, বুকে আসিয়া ছপাছয়িত, পক্ষীর্ঘ

সর্প দংশন করে, আহড়ায়, ফলে কালাচাঁদ আপনকার ঘটিতি চমকান দীর্ঘ-শালকে - বয়সী, পোক্তখাওয়া, মরিয়া, মাঝির তুল্য সাহসেই—চোয়ালে, সব দাঁত এখন উঠে নাই, ঘর্ষণ করে, নির্ঘাত করিতে সমর্থ হইল অথবা এখন চলতি ট্রেনের কলাপাতা ছেঁড়া হাওয়ায় তাহার গাল কম্প, হাওয়াই জন্ম করে. এ কারণ যে, ইহা ভাল নয় ইহা ভাল নয় ইহা ভাল নয়! তাহারই বিপরীত দিকে রসিক, জানলায় একটি হাত রাখিয়া তাহার উপর স্বীয় সুন্দর সোনাপড়ন্তবর্ণী-সম গাত্তকোটা মুখমণ্ডল, কোন তারকা যেমন পুণ্যক্ষয়ে ধরাধামে আগত—জন্ম করত গীত বলে, জানলার গান. আর অন্য হাত উহার উপর গীতের যান রক্ষা নিমিত্ত তাহার অঙ্গুলি সকল তৎপর আর সে, কালাচাঁদ. জানালায় হাতে হাত রাখিয়া, সেখানে হুঁহাম আত্রবীজ-চিবুক স্থাপিত, এ গান শোনে : সম্মুখে, খাল বিল ক্ষেত ঘাটে গ্রাম গাঁকো সকল কিছুর মধ্যেই এখন হইতে 'এনেখ' দূরত্বে, তাহার পিতাকে দেখিয়া সে চকিতে কতুর, জলের তলে মৎস্য যেমত শুতোশ্রোত তেমনই তেমনই, একবার সে, বোধহয়, নাসিবার পাশপাশি করে। বার বার যাহাকে মনে হইয়াছিল ধীমীর, সিটির, সব বৈ অন্য নহেন : কেন যে এ কথা. অর্থ সিটি, তাহা সে জিজ্ঞাসা করে নাই এই হেতু যে এ কল্পনা তাহার মধুময় বলি ভাল লাগিয়াছে. যদিও তাহার মন সিটির সুখে বিদ্যাদার জড়িত আয়ত্তিম সাদা পরোধর। তথাপি, অন্তপক্ষে, রসিকের চোখের তাম্র-মতীর খেলা তাহার ভাল লাগে।

ইহা ব্যতীত আর এক হেতু রসিকের খেলা দর্শনে কিছু বলে নাই. যে রসিকের বালাকাল নাই. আঁচল, যাহা প্রাচীনতম বটপত্র, তাহার নিরবচ্ছিন্ন আয়ু হইতে সে ঠকিয়াছে এবং এই সূত্রে যিনি সতত জর্জরিত তাঁহাকেই পুনরায় বাহুবে, বেচারী, আহত করিবার যানসে ঔদ্ধত্য লাভ করিয়াছে ; যে বসন্তের যা তাহাকে কেলিয়া আনমুক্ত করে. এখন সে যে কোথায় ভগবান জানেন। মাঝে মাঝে খবর পৌঁছয় কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে পিছনে বালপটির পাশে বসিয়া সে ঝুঁকো ভাব ভাবিল. যাইতেছে ; কেহ বলে, 'না গো না, বাঈকে দেখেছি' . খুব ভোর. রাস্তায় সবে জল দেওয়া হয়, একটি মোটর হইতে মাঝেরঘাট পুলের উপর তাহাকে নামাইয়াছিল, তাহার অঞ্চল—যাহা বটপত্র হয়ত—মাটিতে লুটায়, চুল আলুথালু, চোখে নেশার ঘোর, গতর বেসামাল. আঙুলের ফাঁকে সিগারেট. মৃদু মৃদু হাত তালি দিয়া গাহিতেছে,'তাই বুঝি পালিয়া কেঁদে ঘরে সখী, তাই বুঝি পালই কেঁদে ঘরে সখী'. মুখে ছিল হাসি—যাত যেন এখন গভীর তাই কেবারের

গান—সে পুল বন্ধিয়া নাচে, ছেলেরা ট্রাম লাইনে, ভোরের ট্রামে—আলো-লাল—নিয়ত ঘন্টি দেয়—এ খবর সত্ত্বেও রসিকের চোখে তাহুমতীর খেলা অক্ষিয়। অবশেষে আর এক বিশেষ সত্য আছে যাহা কালাচাঁদকে জানিয়াছে, তাহা হয় এই যে, গোপালসঙ্গের আলয় ফকির যেমন, যে কোন বৃক্ষতলে যদ্বা সমতায়, বিশ্রাম নিমিত্ত, তাহার ছেঁড়া চট পাতে, অবিকল তেমনতর সমতায় রসিকই প্রথমজন যে পরিচয়ের অর্থে বলে, 'ওসো ভগবান আছে' এ বাক্যনিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীয়মান শূন্যতায় মধ্যাহ্নিত খালিস্ব কি অদ্ভুতভাবে কাটিয়া যায়!

ফলে, এখন রসিকের এতল-বেতল খেলা দর্শনে যেহেতু তাহার রক্তস্থিত অসহিষ্ণুতা নিশ্চিত ছিল, তথাপিও যাহা প্রশ্নের, শুধু মাথে মধ্যে নাসিকা কুঞ্চিত হয়, কালাচাঁদ কোন কথা বলে নাই। ঘটিত, অবশ্য ইতিমধ্যে একদা রসকের কোমরে ঘুন্সী বাঁধা চাবির দিকে তাহার নজর পড়ে, রসিকের একটি ছোট তোরঙ্গ আছে, যাহার সম্মুখে রসিক অদ্ভুত ভাবে বসে, খোলে, তাহার নিজের পছন্দসই অনেক কিছু : কাঁচ ঢাকনা বাক্সতে কাঁচ পোকা, পুঁথী, ভালার ভিতরে একটি শ্রীশ্রীকালীর ছবি, তাহারই পার্শ্বে একটি নাছস শিশুর ছাপা ছবি, যা পাশে একটা বিয়ের পত্র। অনেক কিছু আছে—ছুঁচ সুতো, অনেক কাঁচের চুড়ি-ভাঙা শিকল করিবার মানসে সংগৃহীত,বাক্সর মধ্যে তাহাকে স্পষ্ট দেখা যায়। নিজের তার কত সহজেই, অবলীলাক্রমেই, সে গ্রহণ করিয়াছে ; ফলে সকল সময়ই সে, রসকে, তার কাজল বর্ণ, বস্তুত সে বৃদ্ধ যদিও সে বালিকাপ্রতিম, চোখের নিমেষে তাহুমতী, এখনও কপোলে অঙ্গুলি স্পর্শ করত অবাক হয়—অনায়াসে বলিতে পারে স্মিত হাস্য করত, 'জাদুমান কর'—তথাপি সে বৃদ্ধ, তাহার আপৎকাল নাই—এই বৃদ্ধতার অভিজ্ঞতায় জন্য কালাচাঁদ নিশ্চিত অন্যমনা অর্থাৎ দৃষ্টিতে আত্মস্থভাব, তাহার মনে পড়ে হয়ত রসিক, যে এখন এতল-বেতল খেলে, রসকে যাহার মাইএর, স্তনের, বোঁটা আছে—এক মতে যে, যাহারই মাইএর বোঁটা আছে সে-ই রমণী—তবু সে বড় মানী রাশভারী। একবার চণ্ডী শাস্ত্রী, যিনি সুরমা কণ্ঠে 'হে মাধব' বলিয়া উঠেন, রসকে-কে কি যেন বলিয়াছিলেন, রসকে তখনই তাহার তোরঙ্গ বাক্সর ডালিয়া নিজ গামছার ছিঁড়ের উপর রাখিয়া ধান ক্ষেত ধরিল। পৃথিবী উহার অতীব চেনা চেতন জায়গা, যেখানে বীজ রোপন করিবে সেখানেই ছায়া দেখা দিবে। ফলে কালাচাঁদ নিমেষশূন্য, তখনও চুপ।

কালাচাঁদ নিমেষ লাভ করিল, দেখে, রসকে একটি শুষ্ক ঘাস মুখে স্থাপন অর্থাৎ

হস্তে ধারণ করিয়া সুন্দর চোখে তাহারই প্রতি নিবিড়ভাবে চাহিয়া আছে. কালাচাঁদ অসহিষ্ণু হইলেও তবু এ যেন বৈচিত্র্যে অবাক, তাহার প্রশ্নের পূর্বেই কম-জোর কণ্ঠে রসকে কহিল, 'এর মানে কি বলত দা ?'

কালাচাঁদ বলিতে যাইতেছিল,'তোদের গঙ্গার ওতে শকুন বসেছে'. কিন্তু কিছুই সে বলে নাই, কারণ যে, তাহার বেলা গণনার ঘরে কাঁক কই, সে ধীরে বলিয়া পড়িল, মাঠের পানে তাকাইয়া কহিল, 'কে জানে !'

রসকে মুটোটি দাঁতে দাঁতে চাপিয়াই বলিল, 'এর মানে বৈষ্ণবীয় দীনতা:— স্বয়ং যখন নীলাচলে প্রভুর কাছে এলেন. তাঁর ঠোঁটে-বহাপ্রভু' বলিয়া মুটোটি অপসারণ করত স্মিত হাস্যে ধীরে বলিল, 'এখন তুই যদি আমার দীনতার. কাতরতা দেখে তোর পাষাণ হৃদয় গলে' বলিয়া ওষ্ঠের সেনসেনে লাল জিহ্বা বুলাইয়া অল্প স্বরে গান ধরিল—'চিকণ কালা গলায় মালা বাজন নূপুর পায়— ধনি চিকণ কালা !' এই গীতে কালাচাঁদের কেমন যাতনা হইল, সে আরও ছেলেমানুষ শিশু. তাহার হাত ধরিয়া দণ্ডায়মান করত রসকে গাহিতেছে, তাহার পদদ্বয় চলিতেছে—আর যে এই সুললিত পদদ্বয়ের গীতের আদ্যন্ত পরম আনন্দময় উক্ত অভিমান এবং কণ্ঠ ধ্বনি কটিতি চতুর চাহনিসকলের মুষ্টে কালা-চাঁদ খুব সম্ভব মোহিত, এ কারণে যে তাহারই নিমেষের আদরের ঘাকে রসকের সুন্দর দুইখানি হাত—যাহার তালু নিত্য যাত্রা করায় ফলে, স্নেহেতু তালুতে আসক্তা রেখা—বিশেষ রক্তিম, এত লাল যেন শ্রীশ্রীমা লক্ষ্মীর হস্তদ্বয়—গীতের সহিত অপূর্ব ভঙ্গিমা-শালিনতায় সুরে—তাহাকে বরাভয় দিয়াছে ; রসকে এই অল্প বয়সেই স্ত্রী-ভূমিকা অভিনয় দক্ষ তথাপি এখন. এক্ষেত্রে. নিঃসন্দেহে, অভিনয় করে নাই ; শুধু কালাচাঁদ, যে এখন আসীন, তাহাকে উহার পাষাণ ভাবিতে ভাল লাগে, তাই এ গীত !

রসকের প্রতি. যাহার মুখে এখন চাপা-রোষ,চাহিবার পূর্বে কালাচাঁদের উহার রক্তিম হাত দুইখানিকে যার পর নাই সম্ভোগময় বলি মনে হয়, ফলে ধারণা করে যে যদি তাহা, হস্তদুইখানি. তাহার কপোল স্পর্শ করে, তবে নিশ্চিত. নির্ঘাত, পরক্ষণেই যে যে গাছ, যে গুল্ম লতাদি দেখিবে, তাহা সমূহ আপনার পিত্তায় ব্যাধির, শিবের অসাধ্য যাহা, অব্যর্থ ঔষধ, এবং এই জন্যই নিয়ত এখানে থাকিয়াও সে অন্যত্রে. নিমেষশূন্য, ঘুরে তাকাইয়াছে—অবশ্য দুষ্কৃতির প্রতীক্ষায় এক আধবার বটে—কেমন যেমন মেয়ে রসকের ভাবকে তাহার কাকা চিঁড়ের হলায় বলি বোধ হয় নাই, কারণ রসিক পরম গম্ভীর। তবু কালাচাঁদের মন

অহরহ পরিবর্তমান বাস্তবতায় ; তবুকের আওয়াজ এইমাত্র সে পায়, যে পথে তাহার বাবার জুতার নালের শব্দ সে শোনে, যে জুতা সে একদা পায় দিয়াছিল, তাহার পায়ের পরেও জুতার অনেকটা অন্ধকার,সম্মুখের গাছপালার ফাঁকে অন্ধকার অন্ধতর—এ অন্ধকারে সেই অন্ধকার, সে নিরীক্ষণ করিয়াছে ইত্যাকারে বুঝে কালাচাঁদ একমন : প্রকৃতির মানসিকতা, লাল নীল জগত. সেখানে তাহা অন্তত সুন্দরী কৃষ্ণটিকা, ইহা, তাহার জ্ঞান আছে যেহেতু ক্রুর আগ্রত চেতনায় দৈবাৎ বস্তুসিদ্ধির জন্য সে আশা। বহুবার সে হোঁচট খাইয়াছে, এই সূত্রে একবার তেঁতির কথা মনে পড়ে—প্রতিভা তাহার নাই, শুধু হঠাৎএর উপর, কাহে, সে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। এইটুকু বিশ্বাস, তাহার মন বলে, যে মন তাহার আবাল, মনের সহিত সে কথা কয়, মন বলে, বলে, যে এক অভ্রান্ত ঔষধ মিলিবেই এবং তাহার বাবা পূর্বেকার মতই সুস্থ হইবে, বৃক্ষাদির ছায়া পুনরায় তাহার দেহে আরাম আনিবেই ; এ কারণ যে, অর্থাৎ এ হেন মনোভাব. যেহেতু, সে আপনার পিতাকে দেখিয়াছে : তাহাদের চালার উত্তরে যে জেয়েতা গাছ তাহারই পার্শ্বে ছোট চালা বড় যত্নে তাহার বাবা নির্মাণ করে, সেও সাহায্য করিয়াছিল ; তাহার মা দাওয়ায় বসিয়া এ দৃশ্য সবটাই আনন্দে দেখিয়াছে—এই নবনির্মিত চালায় তাহার, কালাচাঁদের, ভাই জন্মিবে। উহার অপরিসর দাওয়া হইতে হাত চারেক অন্তরে, সম্মুখে খুঁটি পুঁতিয়া বেশ আড়াল—এখানে প্রসূতির কাপড় বেলাও হয়—সেদিন ঘোর বাদিনী,জন্মাইমী,সখন বাদিনাত,কাজে-কাট-দাওয়া,জন্মাসত বাত তাকিতেছে ; অন্ধ রাত্র ভেদ করিয়া তড়িৎ রেখা দেখা যায়, চালায় মধ্যে আছার মা, পাশে কাশিয়া ডোমের দাসী ; মার বহুইবার হইয়াছে ; জলে স্থলে আকাশমার্গে যত প্রকার জন্তু আছে, তাহাদের আর্ত বর্ষাস্তিক স্বর, এমন কি তৈলহীন চাকার আওয়াজ পর্যন্ত ; হায় স্ত্রীলোক শুধু মাত্র মর্মন্তুদ আর্তনাদই সম্প্রয় করে—ঐ ছোট আড়ার মধ্যে হইতে আসিতেছে, সে দাওয়ায়, অন্ধকারে, দাওয়ার ব্যাঙ লাফাইয়া উঠে, চকিতে অদৃশ্য : এমত সময় মনে হইল, কে যেন বিকট অন্ধকারে, বিকৃত অন্ধকার,কালাচাঁদ থাকিয়া গিয়া চীৎকার করিতে চাহিল —চোর চোর ! হয়ত বলিয়াছিল, মুগপৎ দেখিল তাহার বাবা চর্মাক্ত বৃষ্টিতে বড় ছোট হইয়া গিয়াছে, পরণের বস্ত্রখণ্ড শতগ্রন্থি, লম্বা ভাবে—বহুরে - ঝোঁড়া দিঁটি দেওয়া—ফলে কোমর হইতে উরু সবটাই প্রতীয়মান, এক মনে কি যেন গুনিতে গুনিতে মাথাটি ঘুরাইয়া অনড় ; চালার সম্মুখের আড়ালে, প্রসূতির কাপড় প্রসারিত ; সেখানে, কেন না এখন ঝাঁপটি পড়িয়া গিয়াছিল, তাই

বিস্ময়ে হাস্য হর্ষে হইয়া উঠে, প্রসূতির পাত্রবয় নাই কিন্তু নাই—কৌপীন মাত্র থাকে—অসংখ্য বৃষ্টির রেখার মধ্যে প্রদর্শিত সিক্ত কাপড়ের উপর, বিরক্ত ক্ষীত ক্রোধ উন্নত মার্জারের ন্যায় বন্ধুকের মত বক্র হইয়া উঠে ঐ স্থান ; তাহার পিতা এ স্থান দর্শনে অভিভূত, বস্ত্রাভাবহীন, তথাপি তাহার চোখালে গাম্ভীর্য্য অটল : নিমেষ পরেই তাহার মস্তক ধীরে আন্দোলিত হয় 'জানি জানি' সূচক ভাষা, তার অল্পকাল পরেই বলিয়াছিল···'ভাক্তার বদ্যি দেখুম না রে !' এই শেষোক্ত 'রে' বাক্যটির উপর হাত বুলান যায়—কালাচাঁদ বহুবার এই 'রে' কথাটি স্মরণে 'আহা' বলিয়া উঠিয়াছে।

এখন কালাচাঁদ আপনার মনকে আঁখি ঠারিয়া মুখমণ্ডল আনত করে, চাপা রোষে রসিকের ভিস্তাকৃতি মুখের খানিকটা রক্তিম, লাউএর ডালির মত মুখের সূক্ষ্ম রোঁয়া দেখা যায়, কালাচাঁদ উহার মাথায় চামেলীর তৈলের সুবাস পাইয়া আপনার আয়ত আকর্ণবিস্তৃত চোখ দুইটি তুলিতেই দেখিল রসিক তাহার দিকে চাহিয়া আছে, তাহার চোখের শিরা উপশিরা আশ্চর্য্য লাল—যেন দেবীর চক্ষু পূজা কর্ত্তৃক অর্চিত—কষায়ত রাত্রি জাগরণের জন্যেই প্রনিশ্চিত এবং রসের দুই পাশে আশ্চর্য্য মদনের প্রলেপ চক্ চক্ করিতেছে ; মদনের কর্পূর মিশ্রিত অদ্ভুত গন্ধে কালাচাঁদ উধাও : আশ্চর্য্য মদন রেণেই বিক্রয় হয় তাই তাহার মন কেমন বিগ্নি আঁচড় দিয়া উঠিল, রসিককে ভাল করিয়া দেখিতে চেষ্টা করে, রসিক যাহার চক্ষুদ্বয় আফিমের মত কালো,লাল লাল শিরা-যুক্ত কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে দেখে রসিক যেন ছোট এক ইষ্টিশন অথবা ঘন্টার পাটিতে গাল বুলাইতেছে, ছোট ইষ্টিশানে দাঁড়াইয়া অন্ত পাশে লাল লাল কলস বসান কিলটারের তাক্, তাহার নিকটে ওজন কলে একটি সাগর কুড়ো পাখী বসিয়াছে। রসিক একটি ইষ্টিশান ! তদ্দর্শনে সে বিমূঢ়, আর লোক চরাচর, প্রবর ও হৈচৈধ্বনি বিরহিত সুবৃহৎ পরবনের ন্যায় সমাহিত, স্তব্ধ। আর রসিক, যাহার নাম আপনার হাতে ঊর্দ্ধী করিয়াছে যাহাকে সে পাইয়াও হারাইয়াছে—তাহাকে এত নিকটে পাইয়া সত্যই উন্মত্ত, অন্তঃপক্ষে রসিক আপনার নাসায় যেমন, যাহা কল্পমান, তাহা স্বাভাবিক করিতে বিবেক খুঁজিয়া পাইল, এলাচ-দানার মত দাদা রঙ্গ পঙ্ক্তি অল্প দেখা যায়, কারণ সে বলিয়াছিল—'দেবীর খান' আপশোষ চাপিয়া ধীরভাবে বলিল, 'জমা রইল কিন্তু'।

কালাচাঁদ বাপসা চোখে চাহিয়া একটি ছোট নিঃশ্বাস ত্যাগ করত দীনস্বরে অনুরোধ করিল, "রসকে, তুই ওই গানটা গা না লক্ষীটি 'আমার ভাঙ্গা কপাল

যে যা' ভাসানের…" আনত এ কথা কেমনে সে যে বলে তাহা তাহার মনে হয়।

রসিক তাহার আপনকার ওষ্ঠের মেনলেনে জিহ্বা বুলাইয়া কহিল, "হাৎ ক্ষ্যাপা" বড় বিরক্ত হইয়া তবু শান্ত কণ্ঠে আপন অন্তরকে প্রকাশ করিয়াছিল।

ইহাতে কালাচাঁদ বিচারহীন অপ্রস্তুত, কেননা নিজের উক্তির হেতু নিশ্চয় যদি অপোল-স্পর্শ-করে এই আশা অগ্রাহ্য হয়, ঈষৎ বিমর্ষ এবং তাহার দৃষ্টিতে গভীর শূন্যতা, এ শূন্যতার মধ্য দিয়া কেবলমাত্র বৎসহারা গাভীর স্বর শ্রবণ করিতে পারে, তৎক্ষণে রসিক বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, 'কি যে তোর পোড়া মুখ-চেটে গান শোনা যাই' এবং একটু দারুণ শান্ত করত পরক্ষণেই আড়াইয়া বিকৃত উচ্চারণ করিল, 'আমার তাল্লে কপাল যে যা…অমন গানের মুখে ছুড়ো জ্বেলে দি…বাপের অশ্রদ্ধ ঠাকুরের কৃপায়… ঐ কথা ক না, আমার বুকের দিকে ঠায় অমন হাবার মতন হাঁ করে কি দেখছিস বল ত?' উত্তর না পাইয়া পুনরায় বলিল 'মন করেছি…বুকে হরিনাম উল্কি করে লিখে রাখব তোর পুণ্যি হবে…

কালাচাঁদ আসিয়া উঠিতে চাহিল, কি যে উত্তর করিবে তাহা তাহার তখনই মনে আসে নাই; অল্পদিন যাত্রার দলে থাকিয়া সেও অনেক কথা শিখিয়াছে: উহা আশ্চর্যজনক উহা মর্মগ্রাহী, ফলে মনে হয়, সে, তাহারা, ভাব-বেসাতি জানে; এখন এ-সূত্রে, তবু একটি যজার কথা ভাবিতে চমক দিয়াছিল যে, 'যেমন তোর শুনেছি পিছনে যা দেখা আছে' এরূপ কথার অন্ত, যেহেতু তাহা যজার, ওষ্ঠে স্মিত হাস্য পর্যন্ত বিলিক মেরে নাই, চমক মাত্র দিয়াছে, মুখে বলিল, 'বুকেই তো তোর সব গন্ধ যমুনা…'

রসিক আপন নয়নে আড় চাহনির, সে কথা শুনিতে পাইয়া, তাই, ছিনিমিনি খেলা দিয়া কহিল, 'কেন মুখটা কি আমার…'

'বুক যদি সব নয় তবে তোর বুক ছুঁয়ে দিব্যি করতে বলিস কেন'

'দায় পড়েছে, তুই কি আমার ধন্তর বর' বলিয়া রসিক এমন ভাণ করিল, যে তাহাকে নিকটস্থ পত্রপল্লবরাজি দেখিয়া আহ্লাদিত।

'বাঃ কত্তমায়…সেই যখন কুয়া খেলি…তখন মনে পড়ে…'

রসিক তাহার মুখ হইতে এ গল্প শুনিতে চাহিয়াছিল—যদিও তাহার এখনই-ঘটার মত মনে আছে, নিজের পাটের মত মুখস্থ। এই হেতু যে তাহার হ্যাংলা আগ্রহের সে সকল ঘটনা স্মরণে আছে কিনা নয়, উহার স্বীকৃতি পাইবে।

রসিক একদৃষ্টে, বিগত দিনের প্রতি তাকাইয়া, কহিল, 'তুই তখন খুব মেলেমানুষ ছিলি, হরিমুক্তোর সেন্ট্রোমাক্স আলা দেখার জন্ত হেদিয়ে মরিস।'

এ কথা শ্রবণে কালাচাঁদের, বালক বয়সেই এরূপ ঘরে, দৃষ্টি যে কোথায় স্থির থাকিবে তাহার জন্ত ব্যস্ত, এবং একটি খুশী তাহার বক্ষস্থল ভেদ করিতে গিয়া আহত হইল : অসহিষ্ণুতা সেখানে এখন কিন্তু হইয়াছিল, ফলে পলকে চকল, নিমেষে সকল কিছুই আপুনি বোধ হয়। কেমন যেন সংস্কার হইল, বিশ্বাস জন্মে : বাবা নহে, পিতা বলিয়া চীৎকার করিলে ইহার আশু শান্তি হইবে। ঠিক এমত সময় সে 'ঘট-কথা-কও' ধ্বনি শোনে, অতএব ঊর্ধ্বে, পক্ষাদির দিকে চাহে, পলকেই রসিকের দিকে চাহিতেই দেখিল, রসিকের চোখ টিপিয়া টুকড়ি পুনরায় 'ঘট,-কথ,-কও' ডাকিল।

টুকড়ির পরণে মুখে শিল কাটা দাগ, চোখ দুটি কটা, মাথায় একরাশ ঘাসাবী চুল, গলায় রুমাল বাঁধা, সহাস্তে কহিল, 'প্রাণেশ্বরী কে বল ত ?'

রসিক তাহার হাত দুটি সহজে খুলিয়া, আপনার মস্তকে ঈষৎ ঘর দিয়া, কপট রাগে বলিল, 'খবরদার আমায় ছুঁবি না।'

'কেন কেষ্টবিলাসের দেহ নাকি—ছুঁলে আয়াস নাই যাবে ...'

'কেষ্টবিলাসের দেহই তো' বলিয়া কালাচাঁদের প্রতি চটুল নয়নে চাহিয়া কহিল, 'না বলবে না, সাত ঘাট খুঁজিস, ঘড়ায় বৈ পয়সা কুড়োস—তোর জাত জন্ম কিছু আছে ?'

'না সই তোমায় প্রাণ যন সঁপে সে বালাই নেছে...'

'মরণ দশা কোথায় ছিলি, তর বাপ ওদিকে...কোথায় ছিলি এখন'

'বকরী হুঁদোতে গিয়েছিলুম রে লালা' বলিয়া হাসিয়াই এহেন দুত্যবঞ্জন উত্তরকে সম্যক ব্যক্ত করা মানসে, আপনকার মিহি আলতা-জিহ্বাকে সহজ কৌশলে ভাঁজ করত দ্বিজতে-উচিত জনন কারণায় অতীব কদর্যভাবে স্ফীত ওষ্ঠদ্বয়, যাহার দুই কোণ চড়াই পাখীর ডানা লাগা, যেহেতু যা আছে, তাহা সবেগে ঠেলিয়া, সর্প ফণী যথা, ভিতর বাহির করে ; সিক্ত জিহ্বা এক অধৈর্য্য কাত্তিক মাসের ভূমিকা ; এবং এ সময় অল্পবয়সী গৃহস্থ-কন্যার মত চোখ-যারে, তাহার পরণাগুড় রঙ চোখে, যাহার কতিপয় পক্ষ-কেশ বৈ।

কালাচাঁদ, বিশেষত, উত্তরের পরটি স্মরণে, যাহা টুকড়ি প্রমুখাৎ প্রচারিত, যে ঘোষ পাড়ায় যখন শীতল ঠাকুরঝীকে মেলা-বরাতে লইয়া যায় তখন ইটাগড়ের বস্তিতে এক বিয়ারী স্ত্রীলোককে একটি বকরী লইয়া ঐভাবে হাঁকিয়া

দিয়িতে দেখে, স্ত্রীলোকটির কজলীলতার, সঘনে মুহুর্মুহু আড়মোড়া দেয়, চোখে কাজল, একটি হাত মাথার তাই সুন্দর বগল দেখা যায়, অন্যহাতে কাঁঠালপাতার বাত এবং মকরীর ঘড়ি। এবং এখন, সম্মুখে ঐ অসংযত যুবমণ্ডল, তদুপরি তাহার অল্প দেহ ঢাকা, চোখ অন্যত্র লইবার সময়—এ কারণ যে ছকড়ির উপস্থিতির মুহূর্ত হইতেই সে নিজে এক অস্বিস্তি, নিশ্চিত, মনতোষ চন্দির গন্ধ পাইতেছিল—তাই বিরক্তস্বরে প্রকাশ করিল, 'কি হচ্ছে তো কি লাজ লজ্জা···' এবং শঙ্কিতচিত্তে এক নিমেষ রসিকের প্রতি দেখে।

রসিকের ভ্রূবিরহিত চলচলে মুখখানি পলকেই নীল, কোন অপরিচিতের ঘর্মাক্ত জামায় হাত লাগিলে তাহার যেমন মুখবিকার দেখা দেয় তেমনই বিকৃত এবং ক্রমে তীক্ষ্ণ তাহার তীব্র উক্তি শোনা গেল, 'থাকবে কি করে, পনতাল পার বাবাসীর নেংটি-নাড় এখন ওর থেকে ছকুড়ি বয়সে বড় শীতল ঠাকুন্দীর হাকভাতায়, রোজ ষোলা চাপালে মন ত মন···পুরুষ জন্মের পাপ···'

কালাচাঁদের চোখে সেই কদর্য স্ত্রীলোকটি ভাসিয়া উঠিল যাহাকে দেখিয়া সরমুপায়েন, সে চণ্ডী অপেরার ঘরতে ভূমিকাগুলি করে, বলিয়াছিল, 'দোকুতে মেয়েমানুষ কচ্চিস এই বয়েসে, তার উপর শীতল ঠাকুন্দী, বাসুনের কোঁচে ঢাঁটী বাঁচচোবা সাপকানা ঘরে যাবি চাইলিস ঘরে···কি বলবো···কলিউর্ত্তা ছোলা খাস···' স্ত্রীলোকটির ভয়ঙ্কর ভাষা··· এই স্ত্রীলোকটি ভিন্ন উপায় ছিল না, এই বয়সেই তাহাকে বয়সী হইতে হইয়াছে ; স্ত্রীলোকের রহস্য তাহার নখদর্পণে : মেয়েছেলে কি চায় সে জানে, এই তাহার জানা হইয়াছে।

ফলে রসিকের গঞ্জনা তাহাকে, ছকড়িকে, প্রেরণা দিল, অবশ্যতায় সে ধনী, কুলি, ইংরাজ, স্ত্রীলোক, যে-কোন গাড়ী চালকের মত দুর্ধর্ষ, এবং দাঁতে দাঁতে আমোদে রসিকের চিবুক ধরিয়া কহিল, 'বল বল নায়কোল মুচি' এবং পরক্ষণেই, হাত ঘুরাইয়া, যে হাতে লোহার বালা, সম্ভবত পিতল রিঙ্গ, আর যে হাতটা পরী উহি—ছড়া কাটিল, 'নায়কোল মুচি, ফুলকো ঘুঁচি,—সৈতন গাছের ফল : আঁচল পেতে শুনতে দিব—কি দিবি তা বল ? : হাতে তাগা, পায় মল—আর তালে তালে ·· : টাক ঝুমুর ঝুমুর।' শুধু এই কুৎসিত ছড়াই নহে, কটিতি রসিকের কোথাও স্পর্শ করত আহ্লাদে বলিল, 'ঘাটরী তোর যো ঘরে চুমু খাই···আগ কচ্ছিস'

রসিক, যে আকাশের তারাকে দেব-দেবী ভাবে, সে ইত্যাকার ইংরাজ-পরশ রক্তসম্বন্ধে অসভ্যতা, যেহেতু সে সবুজে পাতা কাটে আর যেহেতু ইহা দেবীর

যান, অমনই ক্রুদ্ধ হয়, কোন কথাই তাহার ভাল লাগে নাই বলে সে অগ্র-পশ্চাত কোন কিছুই না বিবেচনা করিয়া, যে হাতে ঢাকনা দিয়া আচার খায় এবং বগলে হাত দিয়া ভাত খাইতে বসে, সে, প্রচণ্ড জোরে পর পর কয়েকটি চড় হুকড়ির গালে বসাইয়া দিল, চড়ের শব্দে বৃক্ষস্থিত পাখীরা ত্রস্ত, বিত্রাস্ত, উধাও। কালাচাঁদ খ, নিস্তির কাঁচার প্রতি বেমত মানুষে একনিষ্ঠ, সে তদ্রূপ, মুহূর্তমাত্র চোখে হুকড়ির দিকে চাহিল, উহার শিল কাটা সাল কালচে রক্তিম, যে হুকড়িকে দর্শনমাত্র অদ্ভুত এক চর্বির গন্ধ, সে এতাবৎ, অনুভবে ছিল—কেন যে চর্বির গন্ধ এ কথা নিশ্চয় তাহার স্মরণে ছিল না। বাদামতলা স্বয়ম্বরণি চ্যালেঞ্জ সিল্ডের ফোর্থ রাউণ্ড খেলার দিন সে হাট হইতে এক আদলার চর্বি খরিদ করে; বাসওয়ালা অসিম বিশ্বাস বলিয়াছিল, 'সে কি তুই বাবুনের ছেলে···'এবং সে অনুপাতাম্বে লালা চর্বি ও'কিয়াছিল, ইহার পর সবুজে বলটিতে চর্বি মাখায়, তাহার পর সবুজ মাঠ, হুইসিলের শব্দ, হাই ইস্কুলের খোলা-মাঠার, কোমরে গামছা, সাইকেলের পাম্পটি, নিজস্ব, পায়ে চুবি যায় সেজন্ত তাহার মধ্যে চুকান, এবং বাঁ হাতে ল্যাম্প; সারা মাঠ ছুটিয়া রেফারইসিরি করে, মরশুম খেলা আরম্ভ হয়। সেদিনকার চর্বির গন্ধ আজও, এখনও; ঘটিতি-উড়া পাখীর উদরস্থিত হাড়া পালক খসি বীজে জমে নামে, কালাচাঁদ ঈষৎ কম্পমান, যেদিন হুকড়ি কোন স্বপ্নের, ক্যাম্পের, অন্বেষে অবসন্ন, যেমন যাহার উপর দিয়া সন্ধ্যা-রাত্রি-দিন-ঘনঘটা আসা যাওয়া করে, আরও নৈরিক হয়: হুকড়ি নির্জীব, তবু সে, কালাচাঁদ, আপনার মুষ্টিবদ্ধ করত প্রস্তুত, যদি কিছু হয়! এবং অতি সহজভাবে এ কথা বুঝিয়া লইয়াছিল যে, হুকড়ির ক্ষমতা নাই, শীতল ঠাকুজী একাদশী অমাবস্যা-পূর্ণিমার দিন দুধের চাঁচিটুকু দিয়া বলে, 'খেয়ে সে গায়ে গত্তি লাগবে'; গায়ে গত্তি লাগে নাই, লাগের খোপলের মত সে মৃদু-ভঙ্গ; এখন অনেকদিন পরে আপনার বাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে—যাহাকে দেখিয়া তাহার ধারণা হয়, হইত, যে সে হয় একটি অচিন গাছ, কেন না এই হুকড়ি একদা উহাকে কাঠঠোকরা গল্পটি বলে: "কাঠঠোকরার বিবাহ, টোপর মাথায় পাখী প্রস্তুত, এমন সময় কাঠঠোকরার বাপ বলিল, 'আরে সব তো যোগাড় হয়েছে কাঠ তো নেই'; বাপের কথায় সে কাঠ আনিতে বার হল: বরের সাজ, মাথায় টোপর—কাঠ যোগাড়ের জন্ত ফেরে" এ গল্পের পর কালাচাঁদ কাঠঠোকরাকে বড় আপনার করি দেখে।

এইটুকু পুরাতন অসরাত্রের কথায় সে জলের সৈকত হয়ত, তুলিয়াছিল, এখন অনেকটি যাত্রের দরবড়ি লক্ষ দেখিয়া, সে স্থির, একদা মহিষটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কেমন একটি ভয় তাহার বুকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করে, প্রথম আপনাকে একাকী স্পর্শ করত মনে সে ভয়, আর এক ওয়াসার-বিনা পাশ্চের মত প্রথমে জমাগত মুখ খারাপ গান করিতে চেষ্টা করে, 'ময়রাঠাকুরজি তোমার বুকের মাঝে কি' এ গানটি অতীব কুৎসিত ভঙ্গীতে গাহিতে পারে, পারে নাই ; ফলে আরও নোংরা গান 'ভবদা এঁড়েটাকে আসে দিও না আমার নাগাল পাবে না' ; কিন্তু আশ্চর্য্য এসকল পদবন্ধন তাহার কানের কাছে অল্পেরা গাহিয়াছিল, অন্ততঃ সে ছারকা পালার গান গাহে, 'মন গো মন বাসরীর শবদে তোর মরণ' এগীত গাহিয়া দু'পাঁচ খানায় সে, যখন বলে ছিল, নাম জেনে, এ সুর তাহার কণ্ঠে আসে নাই—কারণ নির্ম্মম অন্ধকার, মনে হয় তাহার, একমাত্র সৈব্যাই এ অন্ধকারকে ভয় পায় নাই ; কালাচাঁদের বড় আশা ছিল, বড় হইয়া সৈব্যার ভূমিকায় অভিনয় করিবে।

তমসাচ্ছন্ন রাত্র, উন্মাদিনী সৈব্যার দুঃখ, তাহাকে, অন্নবয়সী কালাচাঁদকে বটীতি সাহস দেয়, মন অসম্ভব নিশ্চিন্ত, সে কেমন যেমন বিকল, প্রাচীন একটি বীজ, এখন আপনার যমনীতে চলা-ফেরা করে, এবং সে, যে পীর মনের সহিত কথা কহিতে পটু, সে শুনিল, ঈষৎ বিস্ময়কর বোধ হয়, নিজেই বলিতেছে, 'তুমি দীন বন্ধু'। ইদানীং কণ্ঠস্বর ক্রমে মলমধিকেতার মত কেঠো নাটকীয়, পুনরায় সঙ্কেত করত উচ্চারণ করে, আর যে সেইক্ষণে সমস্ত আকাশ বাতাস তন্মাত্র প্রতিধ্বনি করি উঠে—জমাগত আবৃত্তিতে মেঘমন্দ্রে, যেন স্বর গভীর নিস্তব্ধ এবং শব্দাবলীতে আপনকার মুখ যাহা ব্যাপময়, ইহা যথার্থ, উহাতে একলোবার তীব্র চমকিত আনন্দ রোমাঞ্চ প্রকাশ করিয়াছে, এমত যে তাহার খাসা চিকণ মুখখানি, যাহাতে মুনিদের মতিভ্রম হয়, যে কোন পুরুষ স্রষ্ট হইতে আগ্রহশীল, সেই মুখমণ্ডল সে আনন্দে জাগর তাহার দক্ষিণা হয় প্রতিম আয়ত নয়নযুগলও প্রভাবান্বিত ; বিশেষতঃ সে পূর্ণাঙ্গ উজ্জ্বল মুখর আনন্দিত সম্যক্ বুঝায়, যেহেতু তাহার কুন্দপুষ্পশুভ্র দন্ত পঙ্ক্তির একস্থানে সেখানে তপ্ত এটিয়ের কৃষ্ণবর্ণ দাগিলে তাহাকে বড় আদরের মনে হয়, খেলা মনে হয়—যদ্যে উপরিভাগে সম্মুখের দিকে একটি পার্শ্ববর্তী দন্ত নাই ; সে দন্ত এ বয়সেও কালাচাঁদ সেদিন সাত সকালে একটি ঘুঘুর পাতায় বহন করত ইঁদুরের গর্ত্তে দিতে গিয়া—পিতার বিষাক্ত কাশির শব্দ শোনে, জমায় কাশি; ইহাতে তাহার

ভক্ত হুকিত, একারণে যে সম্মুখের মাঠ ঘাটের মতো পরিষ্কার দেখে তাহার বাবার কঙ্কাল বাহুলি কিভাবে চলিতেছে এবং তাহাতে রক্তের ছিটা। ফলে আশ্চর্য! বন্দুক ছুড়ুরপক্ষসহ পক্ষিরা যায়, সে দেখিল বন্দুকটি ইঁদুরের গর্তে চলিয়া গেল; সে নির্বোধের মত চারিদিকে অসহায়ভাবে নিরীক্ষণ করে, শুধু মনে পড়ে হুকড়ির কথা, সে নিশ্চয় ইহার অর্থ বলিতে পারিবে. যে হুকড়িকে তাহার অচিন গাছ বলি বিশ্বাস, যে গাছ সমাধিস্থ অবস্থায় দর্শনের বাস্তবতার বিস্তমানতার হেতু স্বরূপ ধরিত্রীর উদ্ভূত: পাখীরা এ গাছ জানে, আর কালাচাঁদ তদীয় বাপের কাছেই উহা ইদানীং দর্শনে সমর্থ; এমন অচিন গাছের গল্প আমরা এক উজান বালক চক্ষে দেখি যাহা প্রাচীন, যাহা নিরালা, যাহা বড় হিম, যেখানে এক দেহী অন্যকে প্রশ্ন করে. 'আমার নামে কি তোমার বুক আজও আঁচড়ায়?' কালাচাঁদ হুকড়িকে স্মরণ করিয়াছিল, একারণে যে হুকড়ি অনেককিছু জানে: সাত সকালের ইত্যাকার দুর্ভোগ, একটি নির্বোধ রক্তকণ তাহার রক্তে চলাফেরায় পক্ষম, ইহার কিছুক্ষণ পরে ইঁদুরের গর্ত হইতে, সুবিশাল অনন্ত মাঠ হইতে আপনকার মস্তক ধীরে সরাইয়া লইয়া সন্তা-ব্যাহত তাহাদেরই ইঁদুরের দিকে চায়, কাশির ঘমকে সারা হুঁকেটি থরহরি, পাতা হইতে এমন যে শিশির বিচ্যুত: কি ভাবে, সে ঘটিতি পিতার কাছে, সত্য ধরিবার নিমিত্ত ফিরিয়া যাইবে, সে বিবেচনা কালো; অজানিত নহে, সম্যক অপরাধ ভাবনায় সে অর্থাৎ পিতা যাহার এরূপ আর্ত, আর সে নূতন হাত যাহাতে হয়, তাহার জন্য অস্বাভাবিক; এ চাওয়া আমোদ মাত্র; এ ভাবনায় সে তাঁর দংশন করে, আপনার গণ্ডে একটি চপেটাঘাত করিতে যাইয়া থমকিয়া নিজের পদন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করে; নিম্ন ঘাসের শীতে পা অবশ, শুষ্ক ঘাসের শীর্ষ পায়ে যে তাহা আছে তৎক্ষণে সে যারপরনাই বিস্তৃত; ঈষৎ-সন্ধানী চোখ মুহূর্মান, ঘর যে এরূপ ভীতিপ্রদ হইতে পারে তাহা ইতঃপূর্বে তাহার জানা ছিল না, যে ঘরে সে পাশ ঘেঁষিয়া বনচারী সকালের মুখ চাহিয়া ঘুমায়, এতদিন পরে মনে হইল সে বালকমাত্র, কি সে করিতে পারে, উপায় যে নাই তাহা ভাবিতে সাহস পাইল, ভাল লাগিল, অথচ এই কালাচাঁদ পৃথিবীকে আপন আন্তরিকতা সহকারে ঘৃণা বিশ্লেষণ করিয়াছে, এমন ঘনস্তরী সত্তা লাভ করিবে যাহার ঘ্রাণ যাবা অচিরেই ভগ্নায়মান হইবে এবং তাঁহার ছর্ণ অক্ষ তাহার, কালাচাঁদের, মাথায় পড়িবে।

হুকড়ি নিশ্চিত, এই দৈবাৎ ঘটনার অর্থ বলিতে পারিবেই নিশ্চয়; কালাচাঁদ বিপ্রহরে যখন বন্ধুবান্ধবদের ট্রেনদের ওভারব্রিজ বহিয়া উঠিতেছে তখন

২টা ৫৭র ট্রেণ সিটি দিয়া ধূম নির্গত করত হাজির দিল, বোঁয়ায় ওভারব্রিজ পরিপূর্ণ, পাছে হারাইয়া যায় সেইজন্য ঘরকিয়া দাঁড়াইল, সিটির শব্দ তাহার গা ছুটা করিয়াছে, তীব্র ব্যাকুলতায় সে ভগবানের নাম করিতে গিয়া নামতা পড়িতে লাগিল, কেননা সিটির এক বিশেষ বর্ণ আছে ; বোঁয়া উধাও হইতেছে, ইহার মধ্য দিয়া দেখে টেলিগ্রাফের তারে একটি নীলকণ্ঠ, যাহা শুভতা বিদীর্ণ করিয়া উড়িয়া গেল এবং নীচে ছোট জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার মুখখানি, বাঁশী বাজাইয়া একটি ছোট খানর কপালের, যাহা মাটি ছিত, চারিপাশে চক্রাকারে ঘুরিয়া হঠাৎ দাঁড়াইয়া যায় দেখাইতে আরম্ভ করিল, 'এক পয়সাকে অনেক জরে হাত সাফাই', আর এক মুখে জয়াগত বলিতে লাগিল, 'এক পয়সা দশ করতে পারি কিন্তু খাতি (খেতে) পাই না' ; উহার বিষাদ কণ্ঠস্বর, স্পষ্ট শোনা যায় ; ছকড়ির ফাকাসে মুখমণ্ডল কালাচাঁদকে মনমরা করে, বেচারী ছকড়ির জন্য তাহার বড় কষ্ট হইল, উহার কেহ নাই, শীতল ঠাকুমা থাকিয়াও নাই ; রাত্রে তাহার ঘরে মিনষেরা আসে, ফলে হাটখোলাতে ঘুরায় ; এই শীতে যেদিন হাট বসে সেদিন একটু আরাম কারণ তেলেভাজার নেতা উনুনটির আশপাশ তাহার উক্তিতে 'ভগভগ' ছুঁচীর উরুতের মত, ছুঁচির ওপা যেমন মুখে গরম'। কালাচাঁদের মনে হইল তবু ঠাকুমা ভাল বলিতে হইবে ; একথা সকলেই জানে ইতিপূর্বের সেই পনুতাল্লর বয়সী মাগীর অত্যাচারে ছকড়ি যখন পালায় এবং সে মাগী যখন ছকড়ির নামে থানা-পুলিশ করে চোর বদনামে, চুরির দায় অবশ্য ছকড়ির ছিল, দিনকয়েক হাজতে বাস করার পর শীতল ঠাকুমা প্রায় কুড়ি টাকা খরচ করিয়া তাহাকে ছাড়ায় ; জন্মে দেখা সেল রক্তচোষা তবু মনের ভাল। ছকড়ির খেলা দেখান শেষ, কেহ একটি আধলাও দেয় নাই, আধলা ত দূরের কথা বিড়ি ধরাবার জন্যও দেশলাই পর্যন্তও দিবে না ; ছকড়ি চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল : যাদু দেখাইয়া সে পয়সা করিবে, কেন না সে কাশী যাইবে, সেই গল্প সে কালাচাঁদ এবং রসিককে করিয়াছে। তখন পৌষ সংক্রান্তির স্নানের সময়ের অনেক সাধু ফিরিতেছে ; তাহাদের দিকে চাহিয়া কালাচাঁদদের বলিল, 'ব্যাঙ্কিক খেলিয়ে যখন ট্রেণ ভাড়া হবে তখন কাশীতে যাব। সেখানে একটা কুয়ো আছে সেই কুয়োতে যে যা ব'লে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে যায়, আসছে জন্মে তাই হয়। আকবর শা তার পূর্ব্ব জন্মে ওতে ঝাঁপ দেয়...গরীব ছিল, আমি দেব···কি হলে দেবো বলত, রাজা ? উহু শালা মুটে মজুরের চুলকে ওঠে রাজা হয়লে··· বোঝ'...বলিয়াই সম্মুখের রাস্তায় সন্ন্যাসীর স্রোত দেখাইয়া কহিল, 'এই হলে

ঝাঁপ দেবো যেন সন্ন্যাসী হই' কথার শেষে সে রহস্যময়ভাবে হাসে, আর দুই বন্ধু রসিক ও কালাচাঁদ অপলক সন্ন্যাসী দেখিতে লাগিল। এখন এই শুভারম্ভের উপর হইতে, সে, কালাচাঁদ, দেখিল ঢুকড়ি যেখানে ব্যাঙ্কিক দেখাইতেছিল সেই স্থানে বসিয়া...আধপোড়া বিড়ি ধরায়; কিন্তু কালাচাঁদকে রেলের বাঁশীর শব্দ এমত বাগ মারিয়াছে যে তাহার এক পা নড়িবার ক্ষমতা ছিল না, আপন যেমনা যেয়েটির শব তাহার নিকট আর এক অর্থ লইয়া এখানেই যে অচল, সিগনাল যখন পা তাবিক তখন সে ডাকিল। ঢুকড়ি এখানে আসে, এক নিঃশ্বাসে কালাচাঁদ তাহাকে সকল কথা বলিল। সমস্ত বুদ্ধি তাহার, ঢুকড়ির।

ঢুকড়ির চোখ দুটি মৃতমৎস্যের চোখের মত, চক খাইয়া সে জ্বলুজ্বল্, প্যাঁটাপুনে যোতাম না থাকিলেও সে কোনক্রমেই অসভ্য নয়; রসিক তাহার দিকে এমন ভাবে চাহিয়া বসিয়াছে যে কোথায় উহার বেমনা-ও বটেই কোথায় উহার পা চুলকায় তাহাও সে জানে, ধীরে ধীরে মনোভাব প্রকাশ করিল, 'মনে পড়ে, আমার দিকে চেয়ে দেখ···চণ্ডীবাবুর বাথান তোমরা মনে পড়ে···তুই আমার পাশে বসে কি বলেছিলি তুই আমাকে চাস না-চাস জানবি আমি তোর; ···আমি বলেছিলুম তুই প্রস্তুত সন্ন্যাসী...তোর কত মেয়েছেলে...তুই বলেছিলি ওটা তোর প্রারব্ধ ···"

ঢুকড়ি গভীরভাবে তাহার প্রতি চাহিল। রসিক ক্ষণপর বলিতে লাগিল, 'আর কথা দিয়েছি কখনও খারাপ কথা···' ঢুকড়ি উত্তর করিয়াছিল, 'সে তোর বুক ছোঁবার লোভ' রসিক সুন্দর ভবয় কুঞ্চিত করত প্রশ্ন করিল, 'মানে কেন বুকে কি আছে···'। ঢুকড়ি এবার হাসিয়া কহিল, 'বুকপুকি' রসিক কহিল, 'সে উঁ দেরী'

ঢুকড়ি উত্তর করিল, 'সব খাঁসিল হয়েছে···এখন কালা'

'মানে ···'

'মহিষ পেয়েছি, ওই যে খেজুর গাছ ওই যে ঝুমুর গাছ সেখানে আমি বেঁধে রেখেছি—এখন ফটপট সেরে নি'

কালাচাঁদ ঢুকড়ির ব্যবহারে বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু সহসা ঢুকড়ির হাতে শাঁখের আংটি দেখিয়া মনে হইল এরই কারণে, পাছে ঢুকড়ির বাহুবল হয় তাই রসকে উহাকে প্রথমে এক বোতল 'সালসা' নিজের নামে আনাইয়া দিয়াছিল; শাঁখের আংটিতে নাকি 'ধ্বজী' রোগ হয় না, তাহাও সেই দিয়াছে। ঢুকড়ি গাঁজা তৈয়ারী করিয়া অদ্ভুতভাবে দম মারিল, শাঁপিটা পকেটে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই

সমস্ত পাতার ছায়া তাহার গায়ে, তাহাকে রহস্যময় বলি ধারণা হইল, সে পুজা করিতে সুরু করে, সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ইহার পর তাহারা তিনজন, এই রাস্তায় তখন প্রায় সন্ধ্যা, একমাত্র আগার সহিত দেখা। কালাচাঁদ আগাকে দেখিয়া আড়ালে লুকাইয়া পড়িল, কারণ এই আধ-পাগলা কাবুলিটা দেখিয়া তাহার আপনা বলি মনে হয়, কারণ আগার মুখে একটি কথা সর্বক্ষণ শোনা যায়, 'আপ্ তা হায়'—বাস-চলা রাস্তার পাশে তাহার বাড়ী : সব যদি যায়—সে ফটি হাতিয়া উঠিয়া আসিয়া বলিবেই 'কোন-তাগতা হায়' : তাহাকে বলা হয় : আগা মস্তার দিকে চাহিয়া, যেন পাহাড়ের প্রতি অবলোকন করে, বলে, 'তাগতা হায় ইসকো বাপকা বাপ-কো হাম দাদি দিয়া থা - দাদি দিয়া থা—বিশ-পচাশ বাস-বাচ্চা পয়দা কিয়া—তাগতা হায়—; তাগতা হায়'; কালাচাঁদ আগার জুতার মস মস ধ্বনি শুনিয়াছে।

রুকিয়া এই যাত্রার মধ্যে একদা বলিয়াছিল, অন্তরঙ্গ পরামর্শদানকালে, 'গরুর গাড়ী হলে ভাল হত, এখন সৌখ বাস পায়—কেউ কি গাড়ী ছাড়ে? বাস দেখে ও গাড়ী দেবে না...তোর বাবাকে - আমি গেলে ভাল হত কিন্তু চৌকিদার আটকাতে হবে...রসকে তুই তার কমরুয়ে ধাক্কিতে হাত বুলোবি তাহলেই সে কাৎ...তুই নির্ভাবনায় যা, কুয়াশা...এখন রাত কিছু পরে চোখের গাঁয়ে দেবে...'

'আমায়! তুই কি এ ছাড়া কথা..

এখন কালাচাঁদ অন্ত দুইজনের মুখোমুখি, ইতিমধ্যে ছোট দরিদ্র সন্ধ্যা, কোন অন্তের গণনায় যখন নাই, সে সন্ধ্যাটিকে শুধুমাত্র সমর এমত সংস্কারে দেখিতে চাহিয়াছিল, কেননা উহার, রসকের, ভাসুমতী চোখ আর রুকিয়ার প্রতি চাহিবার মত, যাহা সহজাত বর্ণ বর্ণ সৌরভান্বিত সে সৌন্দর্যবোধ অন্ত কোন, ভাবনা নয় শূন্যতাদ্বারা বিলুপ্ত। রুকিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, 'কি ভাবছিস, বুঝি ধরা পড়ি...?' রুকিয়ার এহেন প্রশ্নে কালাচাঁদ সমস্ত দিক নিরীক্ষণ করে, সে সত্যই 'ধরা পড়ার' কথা ভাবিতেছিল কিনা তাহা, এখন, আপন মনকে শুধায় নাই। সম্মুখে উহারা দুইজন, রসকে রুকিয়া গলা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া, পিছনে মাথার (মাথায়) গাছ, লাল ফুল, রক্তিমতাকে দ্বিগুণীকৃত করা নিমিত্ত এখন আলো ছিল, সবুজতা নিশ্চিহ্ন। রুকিয়া সহসা আপন পাতঁটে ছোট মুখমেহতুলা শরীরকে দীর্ঘায়ত করিয়া ঘোষণা করিল, 'আমাকে জড়াবি, আমায় নাম বলবি' তাহার হাতে পড়িটা দিয়া...'আমার নাম আমি করেছি' এবং এ সময় সে নিজ

শরীরকে রসকের বন্ধন হইতে মুক্ত করে। রসিক উহার প্রতি বড় চোখে তাকাইয়া শিশুর মত প্রশ্ন করিল, 'তোর কিছু হবে না' আর যে তাহার বারম্বার স্মরণ আসিল যে হুকড়ির দেহ অতীব বল, যে কোন মেয়েকে, স্ত্রীলোককে, বর-লাভে সুখী করিবার শক্তি আছে।

রসকের প্রশ্নে আপন দেহকে হুকড়ি চামরের মত দুলাইয়া বলিল, 'হবে না মহিষ চুরি গরু চুরি...লোকে ধেরে আমার কলনা কাটিয়ে দেবে' বলিয়া মেহরুর স্ত্রীলোক, অল্প বয়সী, যেমন স্তীত পুনরায় আপনার মনগড়া আইন জানি, —যেহেতু উহা চল্লিশ পরগণা, প্রকাশ করিল,'তারপর খানা পুলিশ কোর্ট হাকিম শালা এক বিয়োন ছাগীর মত কুশ্চিতে বসে হাই তুললে তুলতে বলবে—তিনশো পাঁচ ধারা সাতাশ ধারা, চারশো আটাশো ধারা কৌজদুরী...দোয়াতের ইসেতে কলমের...চুবিয়ে এক বছর ঠুকে দেবে : আমি জেল-ফেল তোয়াক্কা করি না।' হুকড়ির এইরূপ বিশদ বিবৃতিতে কৃতজ্ঞতার কোন, নূতন করিয়া প্রশ্নের আয়োজন উহাদের মনে আসে নাই। অন্যপক্ষে, হুকড়ির নিকট যাহা স্বাবর, যাহা জঙ্গম আর যাহা নরনারীর অঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু নহে, ইত্যাকার ধনী, কেরাণী, বুটে বহুর স্ত্রীলোক, যে কোন গাড়ী চালকের ন্যায় বৃষ্টিতন্ত্রী রসকের নক্তজল স্বচ্ছ মনকে ব্যাহত করে নাই, একারণ যে তাহাতে রস ছিল না। একারণ যে উহারা প্রত্যেকেই রসকের আর একান্তে আপন অস্তিত্ব অনুভবের বর লাভ করিয়াছিল। পক্ষী শাবকের গাত্রে মেষত সন্তর্পণে, হাতে নোনা আছে জানিয়া, হাত বুলায়, তেমনি মনে, এই প্রথম, কারণের, উপর, আদর কথার ছলে হাত বুলাইবার অবার্থ সুযোগ লাভ করে। যে তাহারা সকলেই বীজ, তাহারা পুত্র। নিয়তির বশে তাহারা মেয়ানো ভাগর, এতাবৎ উহা ভ্রম বৈ অন্য নহে।

কালাচাঁদকে নিরীক্ষণ শেষে হুকড়ি উহার বক্ষে আঙুল দিয়া কি এক অক্ষর বা যন্ত্র আঁকিয়া বলিল, 'লে যেখানে ইচ্ছে যা, তোর হাত তলে কুবীর সব বেঁচে, যেখানে ইচ্ছে যা...'

কালাচাঁদ হুকাদত, প্রায় বিলীয়মান আশা সাহেবের অতি নজর লইয়া কহিল, 'যাই তাহলে...'

রসকে সজল চোখে উত্তর দিল, 'যাই কি রে, আসি বল' এবং এ সময় লাবণ্যময় সোহাগে তাহার গাল টিপিয়া দিল। পুনরায় যোগ করিল, 'ভয় কি, ঠাকুর আছেন, যাস তোর ভাল হয়ে যাবে দেখিস পাঁঠা দেব কালীকে ...'

হুকড়ি এই এক রহস্যময় শব্দের বিপুল জোয়ারে তচনচ. নিজেকে পৃথক জানিতে পারিয়া সে উঠিল, একটা উর্ধ্বে আকাশের দিকে, যেখানে আধো অন্ধকার ছায়া, তাহা আছে—চাহিয়া নিমেষেই কালাচাঁদকে জড়াইয়া সজোরে চুম্বন করিল এবং আলিঙ্গন অবস্থায় সে রসিককে অবলোকন করে, এই ছেড়া যে তাহার মনে হইয়াছিল রসিক বলিল, 'হুঁ'তী বুড়ী উঁহুতে বহুতে পাস্ অ্…' এ উক্তি হুকড়ির সম্পূর্ণ মনের কথা। রসিক, কেবলমাত্র মুখমণ্ড হাসিতে ছিল, তাহার ওষ্ঠের সেনসেন এখনও প্রতীয়মান। হুকড়ি কালাচাঁদকে ছাড়িয়া. বীর, ধাধা উঠাইয়া কহিল, 'অদের খেলে কাম হয় এখানে তা হয় না. তোর বুক-ধুকির শব্দ শোনা যায়' তাহার একথার অর্থ সরল, আরও সরলতর হইল যখন তাহার চোখে জল দেখা গেল। তাহার পর রসিক ও হুকড়ি 'হুস্ গা হুস্ গা' বলে।

কালাচাঁদ দ্রুতপদে আপনার ছায়ার উপর পদক্ষেপ করত চলিতে থাকে. …যখন অনেক দূর, নিঃশ্বাস চঞ্চল, তখন পিছন পানে তাকাইল, হুকড়ি ও রসিক দুজনেই পথের শেষ পর্যন্ত, হয়ত. দেখে. তাহাদের পশ্চাতে মাদার গাছ: সে নিজ কানে শুনিতে যেমত পাইয়াছে উহারা অনবরত দুর্গা নাম জপ করিতেছে : 'জয় জয় মা তারা' এ শুদ্ধ নাম উচ্চারণে পুনর্বার পৃথিবীকে নিজপীঠরূপে অভিষেক করিতে আরম্ভ! তৎপরে বালক কালাচাঁদ, আঁধারে, দ্রুত গতিতে পদসঞ্চালনায় পথ অতিক্রম করে, হয়ত একই ভাবে হস্তদ্বয় দুলাইয়া চলায় ক্রম অবস্থি কিংৎ পরিমাণে অনুভব হয়, ফলে সে আপনকার হাত দুইখানি, ঘাড়া-হওয়া অন্য অপ্রথিত পদযুগ যেমন অনুভবভাবে রাখে, তদ্রূপ রাখিয়াছিল এবং এইভাবে অনেক পথ অগ্রসর হয়, ফলে কখন যে আঠরা লতা হাত হইতে খসিয়া পড়ে তাহা জানিবার অবকাশ হয় নাই, যখন, এখন, হয়ত উহার ঠিক দিবার নিমিত্ত দৃষ্টি সম্পাৎ করার মুহূর্তে দেখিল, বুঝিল যে তাহারই হস্তদ্বয়ের উপর কে যেন শায়িত, পলকেই মনে হইল সে নিজে সৈব্যা, ঘাওয়ার যাহার চুলগুলি উড়ে. শায়িত পুত্র যোহিতাশ নহে তাহার পিতা, সে…যাহাকে বহন করে এবং ইহার পরক্ষণেই সে সৈব্যার মত ডাকিয়াছিল, 'দীনবন্ধু।' এ কথায় তাহার বিশ্বাস ছিল যে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি সাড়া দেন। কিন্তু ক্রমে এ ডাকা আর জপ ধারণ করে।

এই অপূর্ব যাত্রা যে কখন শেষ হইয়াছে, যে যাত্রায় মধ্যে তাহারা তিনজন ক্রমে এক হইয়াছে, ক্রমে কালাচাঁদের মধ্যে বল লাভ করে, উহা তাহার খেয়ালে

ছিল না। এখন সে আপনার খুটিবাবে, দৌড়াইয়া সে দরজার নিকটে আসিল, দেখে, তাহার বাবা শীতে কুঞ্চিত হইয়া ঘুমাইতেছে, সে নরম তৎপর বোকার মত হাসাগুড়ি দিয়া, কেন যে কে জানে, খানিক দিয়া ধীরে আপনার কান বাপের বুকের নিকট লইল ; অদম্ভব বিস্ময়কর তরাজ্ঞ-প্রসূত স্পন্দন-শব্দ, কালাচাঁদ এ শব্দ শোনে এবং অন্ত পাশে প্রজ্বলিত লাম্পটি দর্শনে আশ্চর্য্য হয় : কে জ্বালাইল ? নিশ্চয় টগরের মা ; মনে আসিতেই সে লাফ দিয়া উঠিল, টগরের মা ছাড়া চোর, তাহার টাকা যে টাকা রসিক অন্ত সকালে দেয় ! সে টাকা কই ? মহা অধীরতায় বাবাকে উঠাইল।

কালাচাঁদের বাবা কোন মতে চোখ চাহিল, সে ক্ষণ স্থির বাপকে বলিল, 'টাকাগুলো'। উহার প্রতি অদ্ভুতভাবে চাহিয়া আপনার ওষ্ঠ দংশন করত, কেমন যেমন এক আর্ত্ত অভিমানে বাপ টাকা তিনটি ফেলিয়া দিল। কালাচাঁদ ইহার জন্ত প্রস্তুত নিশ্চয়ই ছিল না, সে টাকা কয়েকটির প্রতি পর পর লক্ষ্য করত কি যেন, অর্থাৎ বাপের মনোভাব বুঝিতে প্রয়াস পাইল, বলিল, 'তুমি কি সে ? টগর মা চোর...সে এসেছিল...আলো মানে অন্ধকারে দেখে মনে সন্দ হল তাই' কালাচাঁদের কথা তাহার বাপ এক দৃষ্টে শুনিয়া কহিল, 'সেই কখন সেছিল আমার বিছে পেয়েছে···।'

'ও তাই বল, দাঁড়াও ভাত ত ছিল···দাঁড়াও ; কিন্তু খেয়ে দেওয়া হতে হবে, খুব চুপচাপ, পাখি না হওয়া পর্য্যন্ত কাকপক্ষে টাকপক্ষে না বুঝলে।'

বহিখটিকে দাওয়ার নিকট লইয়া আসিয়া সন্তর্পণে কালাচাঁদ তাহার উপর ছেঁড়া মাদুর চট গুছাইয়া চাপাইয়া ধীরে বাপকে দাওয়া হইতে উহার পৃষ্ঠে আরূঢ় হইতে সাহায্য করে ; লাম্পটি নিভিল, দরজায় তালা পড়িল ; কালাচাঁদ দাওয়া হইতে দেখে বহিষের পৃষ্ঠে তাহার বাবা বসিতে পারে নাই কেমন একভাবে শুইয়া আছে, যে কোন নিষ্ঠুর লোক এ দৃশ্য দেখিলে কাতর হইবেই : বড় বেচারী দৃশ্য ; কালাচাঁদ এ ছবি দেখিতে দেখিতে একমাত্র কথা স্মরণ করে, মা'র বহুউপকারের বীভৎস ছায়া বেরূপে, সেই ঘোর বর্ষণমুখরিত রাত্রে, সম্মুখের টানান কাপড়ের উপর পড়ে, তখন তাহার পিতা যেন আকাশে হেলান দিয়া, অসহায় নহে, পুরুষের মত সে ঘটনা দেখে ; ইহার জন্ত বালকের এক মুহূর্ত্ত গর্ব্ব উপস্থিত ; সে বাপের দিকে চাহিল ; পুনরায় আর দিনের কথা তাহার মানস-পটে ভাসিয়া উঠিল।

তাহার বাবা যে এখন মরণাপন্ন, বহিষপৃষ্ঠে কাঁদিল, অনেকদিন আগে সুখ-

গ্রহণের দিন কোথা হইতে একটি কাঁচ যোগাড় করিয়া আনিয়া, দিনে ল্যাম্প জ্বালাইয়া কাঁচটি শিখে কালো করত তাহাকে 'গ্রহণ' দেখিবার নিমিত্ত দেয়। এই বৈজ্ঞানিক তর্কের জন্ম আজও মনে পড়ে সে তাহার বাপের দিকে কিভাবে চাহিয়াছিল, যে পিতা পূর্বকুলের অন্তঃস্থিত লৌকিকতা, মহাশীল : ঠোঁট অবধি নাই, সে, জ্যাংটো লিচি ও তুলসীমঞ্চের ইতঃমধ্যে ছাতা খানটি, কাঁচ হস্তে পদচারণা করে, যেন সভালনে অভিনেতার সকলার ইঙ্গিতের কিন্তু, এবং অর্থপূর্ণ সাহসে, চকিতে দিনমণির প্রতি তির্যক কটাক্ষে দেখিল, সূর্য কি প্রচণ্ড! নিমেষেই হস্তস্থিত কাঁচে পূতুতম উর্ধতম আকাশের বিহ্বল নীলায়িত রূপ নেহারি বটিতি সে বোকা, চমক লাগা, ওষ্ঠ এখন কাঁপে. অর্থ এই যে, বিরাট ব্রহ্মাণ্ড কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া, মধ্যপথে না পাইয়া কেহনে, এই অপ্রাকৃতিক আয়না যাহা তাহার কোটী যোজন দূরত্ব বহনে বালখিল্য তাই আপন রূপকে. যেহেতু জ্যাবিতি আচারী. বিকলাঙ্গ না করিয়া, বিনীত এবং এখানে প্রতিফলিত : তখন কাঁচটি হইতে মুখ তুলিয়া, যাহা অহংতা নষ্ট, বাপের প্রতি— যে এহেন বৈজ্ঞানিক তথ্যটি তাহাকে অবিচারিত চিত্তে দিয়া এখন একনিষ্ঠ, কাঠ চেলা করে : গ্রহণের পূর্বে ঠেঁসেল তোলার প্রয়োজন,—দৃষ্টিপাত করা মাত্রই সে, বাপ, মৃদু হাসিয়াছিল। কালাচাঁদ তদুত্তরে হাসিতে গিয়া খ, এ কারণে যে উহার মনে হয় অভিদূর নভমণ্ডল হইতে স্মিত হাস্যরেখা আসে. যে নভমণ্ডল কাঁচে, ফলে সে সূক্ষ্ম হইতে উৎসুক, সে-জগতে প্রবণ করিতে অভিলাষী ; এখন সেই বাপ, সে নিজে আর্ত, ছিটকে-পড়া বাঘের মত, দেহটি বহিবের পৃষ্ঠে বেলান. বহিবের পিঠে অনেক খড়, উপরে এক জীর্ণ চট, সেখানে অথল-বদীর, গায় শতগ্রন্থির কাপড়ের খুঁট ; আর চারিদিকে আবখাওয়া অন্ধকার. বীভৎস ; পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হইল, এ পথের কোথায়ও পত্রবন নাই, ছায়া নাই. শুধু কর্ষণহীন প্রান্তর আর প্রান্তর! আপন গৃহ এবং পল্লিকে সে বাইবেল প্রদান করে।

বাপের শতগ্রন্থির খুঁট তাহাকে বিব্রত করে, হাসপাতালের লোকেরা কি ভাবিবে, নিজবস্ত্র যে ঠোঁট মাত্র ইহা স্মরণ না করিয়া তাহা খুলিতেই ধমকাইল, কণ্ঠস্বর সরল করি নিজেকে এক চতুর নিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করে, যাহাতে পলকেই দশাসই পুরুষে পরিবর্তিত ; কহিল 'দীনবন্ধু' কিন্তু আপন কণ্ঠস্বর শ্রবণে মনে হইল, উহা রসিকের ; পুনর্বার ডাকিল, শুনিল উহা মুকড়ির, তাহার নহে : তাহাদের একজন যাত্রার তোড়জ আছে, অন্য যে বিপথগামী ট্রেনে মূল-টিকিট

লাগিলেও যাহারা সত্যই—যাহারা ভিড়ে হারাইয়া উচ্চস্বরে কাঁদিতে প্রস্তুত —বালকমাত্র, দলের আদরণীয় তীরে বিস্ময় আছে। অবশ্য ইহাদের বর্তমানতা কালাচাঁদের বড় সুখকর মনে হয়। মহিষ মন্থরগতিতে চলিয়াছে, তাহার মনে ভয় হয় নাই, এখন বাঘ আসে, হুকড়ির কথায়—যখন তাহারা আশা দাহেবকে দেখিয়া চুকায়—'বাঘ আসে, বাঘেরা তাতারের খেজুর কলসীর মত ঝুলছে, টপ টপ করে ঘাম...' তথাপি বাঘকে তাহাদের মহিষচুরির গল্প এবং অত পথ অতিক্রম করার নৈসর্গিক অভিজ্ঞতা, 'দীনবন্ধু' সম্বোধনের অধৈর্যের আলাপ, তাহার বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হয়; এমত সময় কুসুর সায়কের মত ক' ক' শব্দে তৎক্ষণাৎ চারিদিকে ইতস্তত অবলোকন করত বুধিল মহিষের পৃষ্ঠ হইতে আসিতেছে, সে সময় বাঘার মুখের নিকট আপন কর্ণ লইয়া যাইতেই শুষ্কিত বিকৃত স্বরে সে শুনিল, 'হারামী-বান্...ছেলে.. দেখতে পাচ্ছ না গায়ে কাপড় নেই...'

বহুদী পুরুষের মত চোয়ালে সে-গর্জনা সহিয়া, বীরে বাঘের পিঠে কাপড়টি ঢাকা দিয়া চলিতে লাগিল, এ সময় তাহার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে। বাঘ সেখানেই চুপ করে নাই, আরও অনেক তীব্র কথা বলিতেছিল, 'জানি না আমাকে যাবতে নিয়ে যাচ্ছ, ঠাকুর আমাকে নাও, নাও...এই মহিষের পিঠে' ঠিক এমত সময় এক শেয়ালের অস্বাভাবিক ডাক শ্রুত হয়। কালাচাঁদ ঘটিতি কহিল, 'বাঘ চুপ কর, ক্যাপা শেয়াল' বলিয়া চারিদিকে ভীত চোখে দেখিবার চেষ্টা করে; সে বুঝিয়াছিল এ শেয়াল খেজুরতলার ডিটেয়ল-চাটা শৃগাল, জলে যাতাল, উন্মত্ত: কালাচাঁদ প্রমাদ গণিল! সে এই ঝরেক মুহূর্তে কত কি ভয়ঙ্কর ভাবিল, মানসচক্ষে দেখিল শৃগাল উন্মত্ত হইয়া প্রায় তাহার পিতার হাত, যাহা প্রদর্শিত, দংশন করিতে উদ্যত, সে যারপরনাই হুঙ্কার দিল, জন্তুকে খেদাইল, খেদাইতে খেদাইতে বহুদূরে; শৃগালের স্বরও অনেক দূর হইতে আসে, সে একটি নিঃশ্বাস লইয়া মহিষের নিকট আসিতে গিয়া ভীত, বিন্দুমাত্র। চারিদিকে ঘোর কুয়াশা, কোথাও তাহারই পদবিক্ষেপে বিলিয়ব ছাড়া, ক্বচিৎ প্যাচার আলাময়ী ডাক ছাড়া কিছু নাই, কুয়াশা নিবিড়—কোথাও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ধোঁয়াইয়া। তাহা ধরিতে গিয়া কাঁটায় জর্জরিত, সে প্রাণপণে এ প্রান্তরে ডাকিল, 'বাবা, বাবা'—এমত সময় এক কাশির শব্দ।

শৃগালের ডাক এখন অনেকদূরে; শুধুমাত্র মহিষের পদশব্দ, সম্মুখে সমগ্র দৃশ্য নৈকটের সহিত মিশ্রিত হইয়া মহাবিকারে স্থির, কালাচাঁদ তাহার কল্পনার

উন্নত স্বরের রেশের আন্দিকো বড়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করে : পৃথিবীর, মানুষজনের অনাগত 'কালের' ভাবনা—যাহা যোষণ যাহা দৃষ্টিক্ষম—তাহা উহার হাতে অধৈর্য হইয়া উঠে, এবং এই হস্তদ্বারা পিতার গায়ে বুলাইতে গিয়া বিদ্যুৎ আহত, কেন না পিতা সে হস্ত স্পর্শ মাত্রই, বীভৎস-স্বরে বলে—'উঁ, মরে গেলাম কি ঠাণ্ডা', বালক অপবিত্র নিষেধেই, অপ্রতিভ তখনই ; মর্মাহত হইয়া ভাবিল, 'বাবা বড় দুঃকৃষী' এবং এই সঙ্গে একটা ইচ্ছা হইয়াছিল, এই উপায়টি কেমনে সম্ভব হয়, সে গল্প বলে ; কিন্তু সাহস পায় নাই, অপহরণ কথাটি ছিল, মিথ্যা করিয়া বলা যাইত যে মহিষটি চাহিয়া আনিয়াছে কিন্তু ইহাতে কোন ঘরসানা নাই, বলে নাই কারণ অপহরণ মহাপাপ, হয়ত সে-কথা শুনিয়া বাবা এই মাঠেই মরণাপন্ন শরীর লইয়া তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া; একবার নিশ্চয় তাহার ভাঙা দেহ কল্পমান করি চীৎকার করিবে, নিষেধেই অদৃশ্য হইয়া যাইবে এ কারণে যে, চৌর্যের পাপে কুষ্ঠ হয়, গলিত কুষ্ঠ ! কিন্তু হুকড়ি বলিয়াছিল, অপরাহ্ণ সূর্য্য সন্ধান করত, 'ইস নো ডেফীওরেল, নো ব্রাণ্ডি পাপ্' এই উক্তিতেই এ বুদ্ধি হয় যে পাপ বলিয়া কিছু নাই, হসিক বলে, 'ভগবান আছেন' অর্থাৎ ভগবান আছেন বলিয়া পাপ করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই, অবশেষে সে জোর দিয়াছিল, 'তুই তো তোর বাপের কারণেই করছিস, আর সত্যিই তো এটা চুরি নয়...' হুকড়িত যোগ দিয়া বলে, 'ম্যাজিস্ট্রেট, হাকিম, বাপের দায় হতে পারে, বোকা নয়' এবং কালাচাঁদের নিজের মনে হয়,—'পেট্রোম্যাক্স তো আছে'

অন্তত কথার স্রোত তাহার ভিতর আনাগোনা করে, এইভাবে, কিভাবে, যে, সে দুস্তর প্রান্তর পার হইয়া, যাহা শীত আর অন্ধকার মোহিত, বিদ্রুপ খালের সম্মুখে আসিয়া অদ্ভুত নিশ্চিন্ত অনুভব করে, জলে আকাশ মার্গের জ্যোতি তাই সাদা, ওপাশে কেওড়া আর বেত গাছ : অনেক বেলোইস, সে, অকারণে মনে হয়, পিছনের দিকে তাকাইল ; মহিষের পৃষ্ঠে তাহার বাপ তেমনি পাষিত আর যতদূর চোখ যায়, যদিও কুয়াশা আবৃত, মাঠ ; সে অন্তর্মুক্ত হইয়াছে, এ উপলব্ধির পরক্ষণেই—রক্তাবরি গালাগাল এক সঙ্গে উচ্চারণ করিতে গিয়া অদ্ভুত আহারত পশুর শব্দ করিতে গিয়া রোষাকিত হইয়া বিদ্রুপ খালের পাড় আছিয়া তৎপর দৌড়াইল ; যেখানে সেখানে দৃষ্টিপাত করে, এমন নৌকার আবছায়া ছবিটি দর্শনে ছুটিয়া আসিয়া, বেগ সামলাইতে অপারগ, বলে, লগী ধরিয়া একটু ঘুরিয়া ঘাটটি নৌকার গলুই ধরিয়া ফেলিল,

নৌকাকে, সেই অবস্থায় বলবে বারবার মাথা ঠুকিয়া প্রণামান্তে, চক্ষুর—যাহা বিশাল, তুলিতেই নৌকার গর্ভস্থিত জলে, যাহা এখন স্থির, আপন প্রতিবিম্ব দেখে, এবং অতীব ধীরে আপন প্রতিবিম্বের দিকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিবার নিমিত্ত তাহার অভিমান ছিল। এ মোহে ক্ষণেক, মুখমণ্ডল তুলিয়া সে পুনরায় গভীর-ভাবে উচ্চারণ করে,'তুমি দীনবন্ধু' আর যে এক পল অপেক্ষা না করিয়া নৌকায় শক্তি তুলিতে যত্নবান, বুঝিল, অতিমাত্রায় স্থিরে তাহার অঙ্গুলি অবশ,-শক্ত নাই, ফলে যন্ত্রটি তাহাকে নিষ্ফল বাতিব্যস্ত করে, সে বোকার মত খানিক জল তুলিয়া প্রতি ভিজাইল, বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় এখন বুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে—এত শীতেও তাহার গাত্র ঘর্মাক্ত, ক্রমে সে প্রতি তুলিতে সমর্থ হইল, শুধু টানিয়া, ধীরে নৌকাটি লইয়া যে স্থানে একটি বাবলা গাছের তলে বিশ্রাম্যমাণ মহিষের পিঠে বাপ এখনও তেমনিভাবে শায়িত, সেখানে আসিল। ভাবিল, 'মহিষের বাবা না জানি কত ভাবছে!'

মুহূর্মান বাপকে কালাচাঁদের কেমন যেন মায়া হইল, সে নিশ্চয় অনেক কথা মনে সাজাইয়াছিল, যে সকল বাক্যের মধ্যে আপনকার বাহ্যদৃষ্টিই সঠিক বিষয়, কিন্তু কোন কথাই সে বলিল না, বাপকে ধীরে উঠাইয়া অতি সন্তর্পণে, শিশু-জ্ঞানে, নৌকায় উঠাইয়া বাপের পা দুইয়া, পরণের ঠোঁট খুলিয়া সযত্নে মুছাইয়া, সযত্ন মহিষ পৃষ্ঠ হইতে খড় চট আনিতে গেলাইল ; এক আঁটি খড় মহিষকে দিয়া তাহাকে নমস্কার অন্তে নৌকায় ফিরিল। নৌকায়, বেশ প্রশস্ত, খড়ের বিছানায় বাপ সত্যই আরামে আপনাকে জড়াইয়া আছে ; এ দৃশ্য দেখিয়া তাহার, কালাচাঁদের, শরীর পর্যন্ত শীত, পাঁচ পীর স্মরণ করত, দুর্গা নাম করিয়া নৌকা ছাড়িল, খানিক দড়ি দিয়া আসিয়া বৈঠা ধরে। অনেকক্ষণ এইভাবে বহিবার পর, বাপ যেখানে শেষ হইতে আর কয়েক রশি বাকি, সেখান হইতে দেখিল, বিরাট গঙ্গা! শুধু বলিল, 'বাবা, মা গঙ্গা...'

আপাদমস্তক চটে ঢাকা পড়ে নাই, বাপের পা দুইখানি বাহির হইয়া আছে, সে পদদ্বয় শীতে কম্পিত, বাপ কহিল, 'তুই আর একটু লো।' কালাচাঁদ দূর অভিমুখে চাহিয়াছিল, কেন না এসময় এক পদ্মরাজা ওষা আহাজ গঙ্গাবক্ষ দিয়া যাইতেছিল, তথাপি এ উক্তি তাহার মর্মস্পর্শ করে। সে ভাব করিল যেমন সে শোনে নাই, শুধুমাত্র নৌকার দিকে চাহিয়া ভাবে, 'এত বাপ মা বড় ভাববে, ভাববে বৌকা যে কোথায় গেল।' আর একবার বাপের কণ্ঠস্বর শুনিবার মানসে সে একমনা হয়, শব্দ না করিয়া হাঁড় বহে ; সম্মুখের পাটাতনের উপর

খড়ের বিছানায় তাহার বাপ নিষ্পন্দ ; সে শুধু বলিয়াছে 'বেচারী'...জলে নৌকা গঙ্গায় আসিয়া পড়িল, কালাচাঁদ নামিয়া উহার নিকটে লগী পুঁতিয়া নৌকা বাঁধিয়া, গঙ্গাজল আপন মাথায় দিয়া, বাপের মুখের উপর ছিটাইতে গিয়া থমকাইল, শায়িত জনকে মনে হইল এভাবে গঙ্গোদক সিঞ্চন করা নিষেধ রহিয়াছে—যাহা তাহার কল্পনামাত্র—এমত সময় বাপ বলিল, 'ওরে আমায় একটু গঙ্গাজল দে'। কালাচাঁদ অতি ভক্তিভরে অঞ্জলিবদ্ধ করত গঙ্গাজল পিতার নিকট আনিল, বাপ তাহার চট হইতে মুখমণ্ডল বাহিরে আনিয়া কিছুটা হস্তদ্বয়ের উপর ভর দিয়া মস্তক তুলিয়া প্রাণের পরিতোষিণী, দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গা দর্শন করিল, রহস্যময় কণ্ঠস্বরে, নিরবধি কাল যে আবেগকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয় নাই, আরবার আবৃত্তি করিল, 'মা মা মাগো'।

এহেন মাতৃসম্বোধনে কালাচাঁদের সর্ব্বসহারা অসহায় শিশু হইয়া গেল ; তাহার বাপ কোনমতে কিঞ্চিৎ গঙ্গোদক ব্যবহার করিয়া শুইতে শুইতে বলিল, 'কালা তুই একটু সো না রে ··আমার কাছে···' কালাচাঁদ আহ্বান বচন আপনকার রোষকষ দ্বারা শ্রবণ করে ; পীর মনক্ষোভ, যাহা এই যাত্রায় শুরু হইতে লক্ষিত হইয়াছে তাহা এড়াইবার নিমিত্ত, অন্যমনস্ক হইবার বাসনে সে দাঁত দিয়া নখ কাটে, তাহার পৌরুষ অনেক মাথৎ আহত. এখন চোখ কাটিয়া জল আসিতে চাহিল, চোয়াল ঘর্ষণ করত তাহা সামলাইতে বাধ্য হয় কেন না তাহার বাপ পুনরায় উহাকে স্মরণ করে। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া সে বাপের পাশে প্রায় ঈষৎ হামাগুড়ি দিয়া আসে। এরূপ ভাবে আসিতে তাহার বড় ভাল লাগিয়াছিল, খুব আনন্দ হয়! একদা শুধু বলিল, 'ইকি আমায় চট দিলু কেন ঠাণ্ডা আমার লাগে না...' বলার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঘাড়ের কাছে শীতল স্পর্শ পাইয়া সে কিরূপ বাঁকিয়া গেল, বহু হাত শুনিল, অবশেষে তাহার বাপের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল, 'তবে যে বড় বল্‌লি ঠাণ্ডা লাগে না?' ইহার পরক্ষণে ক্রমাগত মনের কথা, 'জানিস তুই খুব যখন ছোট ছিলিস আমি আর তোর মা'র মধ্যে ঠিক যেন ভাঙ্গার মাছ ··তুই আর জমে যাস ছিলি ঝাঁকপাক করে খেলা করতিস·· কত খেলা করতিস···'

প্রথম বাপের রসিকতায় এবং ইত্যাকার বহু পুরাতন স্মৃতি উল্লেখ করিতে শুনিয়া ছেলেমানুষ কালাচাঁদ ভারী খুসী হইল, তাহার দন্তপঙ্‌ক্তি, একটি নাই, এখানকার, এখনকার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিল ; সে চোখ মেলিয়া উৎগ্রীব ; শুনিল, 'তোর কি এসব কথায় কথা প্রায়শ···মিথির লিখন···কিন্তু একটা জানিস

উপরে যিনি আছেন, যিনি সকলের, সকলে যাঁর বড় আদরের—সেই ভগবান জগৎপিতা তোকে যত ভালবাসবেন' এই উক্তির পর বাবার নিঃশ্বাসের শব্দ শ্রুত হয়; এই সূত্রে, প্রসঙ্গে, কালাচাঁদ তাহার পিতার কোল ঘেঁষিয়া আসিল। যে সকল মুহূর্তে, এমনত যে তুলসীপাতার ছায়ায় বসিবার ছোট তাহার শরীর, সভাই সে ছোট, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে-সকল গল্প শুনিতে, সে প্রতি পলে যখন পুত্র, উদাসী; কেন না এ সম্বন্ধের সূত্র সমস্ত বাস্তবতার আয়োগ করিয়াছে, যে সমগ্রাক্ত সৌন্দর্য্য তাহারই মত কোন না কোন পুত্র আকাশ নক্ষত্রমণ্ডলে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, যাহাতে নিবিড়ে যায়, সে কারণে, এবম্প্রকার অনন্ত শূন্যতার আয়োজন! কালাচাঁদ কি বলিবে তাহা স্থির করিতে পারে নাই, যাহে, মনে হয়, আহা যদি রসকে ছুঁইছি...এইটুকু ভাবিয়া সে অহঙ্কার, কিন্, নির্ভাবনা, বস্তুত রসকের উপস্থিতির জন্য তাহার আনন্দ ছিল, কিন্তু ছুঁইবে। যে ত্রিভুবনের সমস্ত কিছুকে সে পেট করে। তথাপি মনে হইল এক্ষেত্রে সে নিশ্চিত শান্ত হইবে; সহসা তাহার বাবা বলিল, 'কালা ঘুমুলি'

'না বাবা, কেন?'

'একটা গান বল...'

কালাচাঁদ গাহিল, 'মা আমাকে দয়া করে শিশুর মত করে রেখ' কালাচাঁদের সুললিত কণ্ঠস্বর পার্থিব আশ্রিত অবস্থাকে, যাহা ধূলিকণায় অন্ধে, সুখী করে। কালাচাঁদ সুচারুরূপে গাহিবার নিমিত্ত বসিয়াছিল, গীত শেষ; কুয়াশাচ্ছন্ন ছাড়া নভস্থলে আপন জনের মুখমণ্ডল দেখিতে পাইল, তাহার মন দেহ সুচাগ্র, আর যে চরাচরসমূহ নিজ বক্ষস্থল, তাহার অত্যাগ্র ইচ্ছা হইল, এখনই এখানে, যেখানে হউক, কোথাও একটি বীজ রোপন করে, পলকেই তাহা বিশাল মহীরুহে দেখা দিক; ইচ্ছা হয়, সম্মুখে যে বর্তমান, ঐ দেবীপাদান তারকা বসাইয়া আনিয়া দেয়; ক্রমে অধৈর্য্য উত্তরোল, কেবলমাত্র ভয় ছিল, অকথা ভাষা না স্ফুট হয়; আগামী কথার কর্মধারা ঘটিতি নির্ভারণ করি পরক্ষণেই কথা কহিতে চাহিল, কিন্তু বেচারী কি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবে, বিস্ময় তাহার নাই, বিস্ময় লইয়া সে অনেক কসরত করিতে প্রণাম্ত করিয়াছে, শুধু এক্ষেত্রে অনুরোধ করিল, 'রামের বনগমন পালা...বাবা বল, সীতার কথা'

প্রত্যুত্তরে বাপ আস্তে আস্তে কহিল, 'সীতা বলতে নেই—মা জানকী বল' বলিয়া নিজে প্রণাম করিল, কালাচাঁদও তদ্দর্শনে অতীব শ্রদ্ধায় আপন মস্তকে করযোড় স্পর্শ করে। ইহার পর সুন্দর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আজ পুষ্যানক্ষত্র

সমন্বিত বৃহস্পতিবার...'আর বেশী বলিতে হইল না তাহার বাপের কাশি আরম্ভ হয়, ছেলেমানুষ কালাচাঁদ বড় দুঃখ হইয়া গেল, এক হাতে সৈতা ও মাদুলী কণ্ঠ হইতে অনায়াসে করে যাহা উহার বাপের কণ্ঠে ঝুলাইয়া ছিল, এবং অন্য হাতে সন্তর্পণে বক্ষ বুলাইতে থাকে। দুরাগত জাহাজের বাঁশীর শব্দে সে নিজের সমগ্র দেহ দিয়া তাহাকে, বাবাকে, আড়াল করিবার মারাত্মক বালসুলভ প্রকাশ করিল।

সকালের গঙ্গা দর্শনে কালাচাঁদ আত্মহারা, কি এক অপূর্ব্ব রূপ, একবার মনে হইল বাবাকে জাগায়, কিন্তু বাপ রাত্রব্যাপী শীতকাতর ফলে এখন রোদে অঘোর ঘুমে নিশ্চেষ্ট। যোগী-আরাধ্য গঙ্গাকে বড় আপনার করিয়া দেখিতে লাগিল, এসময়, সেপলাইএর বাক্সে যে রবিবর্ম্মার ছবি দেখিয়াছে তাবিতেই সেও তাই, রূপান্তরিত। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে থাকার পর কোন সৌর্য্যাভিমানে তাহার ছোট শরীর উদ্বেলিত হয়, আপন কর্ণে সে বিবিধ, পাকচক্র দেবদত্ত ঘোরকর্ম্মাতীম শৌণ্ড, আদি শঙ্খধ্বনি শুনে, যদ্ধা আহব তাহাকে আহ্বান করে, কালাচাঁদ বলিয়া উঠিল 'এবে মোর সৈন্যে বিলাস হবে ; দেখি কোন আঁটকুড়ির বেটা কোন শালা ঠেকায়' বলিয়া গঙ্গার প্রতি বীরদম্ভে চাহিল, অবশ্য গঙ্গার প্রতি নহে, অন্য কেহ অলক্ষ্যে ছিল যাহাকে দেখিতে পাইয়াছে। কালাচাঁদ আর কালক্ষেপ না করিয়া বাপকে জাগাইয়া কহিল, 'তুমি হিমভাত চাট্টি খাও।' বাপ দেখিল তাহার সম্মুখে কলাপাতায় হিমভাত, বাসি বেগুন পোড়া। ইহার পরক্ষণেই কালাচাঁদ বলিল 'আমি নৌক দেখি, পারে ত যেতে হবে...'

সে, বেলা যখন বেশ খুব শীর্ণ, ফিরিয়া আসিল ; কোন নৌকা নাই, যদি বা আছে কবে কখন ছাড়িবে ঠিক নাই, বেশ বোঝা যায় মহাভাবনায় নির্ব্বোধ, বিরাট নয়নযুগলের এক কোণ দিয়া পৈত্রিক গঙ্গাকে অবলোকন করিল, বাপ কহিল, 'তাহলে'

কালাচাঁদ সদর্পে উত্তর দিল, 'তাহলে আবার কি। চুপ কর দিকিনি··· হাসপাতাল যেতেই হবে···'

তাহার বাপের প্রথম হইতে ও হাসপাতাল যাওয়াতে একটু আপত্তিছিল, এখন এরূপ অবস্থা বিবেচনা করিয়া কহিল, 'হাসপাতাল আমি যাব না।'

কালাচাঁদ কহিল 'যাব যাব···চুপ করে থাক...বুঝবে নাকি...' আর বাক্যব্যয় না করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল, দাঁড় বাহিতে বাহিতে বলিল, 'ছেলেমানুষী

ছেলে না, মরলে তো আমিও মরবো ··রোগ নিয়ে ছেলেখেলা নয়···ভগবান আছেন, এখন তো আর চোত বৈশেখ মাস নয়'

যখন গঞ্জের ঘাটে পৌঁছাইল তখন বেশ বেলা. নৌকাটি ছোট খালের ভিতর রাখিয়া তীর হইতে নিদিন্দের ডাল ভাঙিয়া মলমে গুঁজিল যাহাতে মাশের মুখে রোদ না পড়ে, এইটুকু ব্যবস্থা করিয়া উপরে উঠিল. মুখে দুই চারিটি টিনের চালা সম্মুখে দাঁড়িপাল্লায় ওজনের ঠেকাঠা. ইতিমধ্যে একটি ভাঙা মেলার চিহ্ন : অবিক্রিত মাল, কেহ লাঙলের ফলা ইত্যাদি গুছাইতে ব্যস্ত, আর হাসপাতাল। দূরে জরাজীর্ণ,—এখান হইতে দুই চারটি এনামেলের চটমাটা বাসন, ঝিলচাদর নজরে পড়ে।

হাসপাতাল দর্শনে তাহার কেমন মুখখানি হইল, এ হাসপাতাল হুজুরের খবর, ডাক্তার তাহাকে ভালবাসে, এবং ডাক্তারের হাতযশ আছে। তাড়া মেলার দিকে কালাচাঁদ চাহিল. একান্ত হইতে হাঁক আসিতেছে. 'এইলো এইলো এক পাঁচ, টাকায় পাঁচ টাকা।' যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেই স্থান হইতে হাসপাতাল কতটুকু পথ তবু তাহার মনে হইল, অনন্ত এ পথ। হাসপাতাল দর্শনে, যদিও সে নিজেই তাহার বাপকে এখানে আনিতে আকাঙ্ক্ষা করে, এখন বিমূঢ় বিষাদগ্রস্ত ; তাহার অন্তরস্থ অনুসন্ধান বার্ধ, বৃক্ষলতাদিকে কহিই দিয়াছে, মস্তকে হস্ত স্থাপন করত অসহায় ভাবে সে চলচ্ছক্তিরহিত। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাসপাতালের দিকে আগাইয়া গেল. কি বীভৎস নোংরা হলঘর, পাশে একটি কক্ষ অদ্ভুত লজ্জিত, সে ভোমকে প্রথমেই প্রশ্ন করিল. 'এ ঘর এত বড়ে···' হয়ত কালাচাঁদের বাপের জন্য এ ঘরটি বড় পছন্দ হয়। কিন্তু ভোমের উত্তর শুনিয়া ভয়ে ঘরের দিকে চাহিয়া সেলাম করিল, 'ঘর ঝিরিজি ঘর ইংলিসম্যান' কালাচাঁদ ত্রস্ত, ইংলিসম্যানদের নূতন জুতার উদ্দেশ্য নাকি যায়। 'সে কাতর নয়নে ভোমের দিকে চাহিল. জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তারবাবু কোথায় ?' ভোম উত্তর করিল, 'মফঃস্বলে গেছে।' কালাচাঁদ বারান্দায় বসিয়া পড়িয়া ঘরের দিকে চাহিতেই দেখিল একজন কঙ্কী ইনজেকশন ভোমকে ডাকিতেছে. ভোমের উত্তর, 'বিকালে শুনবো সো' শোনা গেল। কালাচাঁদ এই বিকট আবহাওয়ার মধ্যে ঘামে গেঞ্জান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িল ; কঙ্কীর চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙে এবং মনস্থ করিল, না বাপকে যদি মরতে হয়, আমার কোলে মাথা দিয়ে মরুক, বলিয়া যেখানে সে উঠিয়াছে সেই সময় তেড়ী পথে দেখিল, প্রায় লাঙ্গার শরীর আকারে একটি ঘোড়ার গাড়ীর, যাহার পদযুগ প্রায় মাটিতে স্পর্শ করিয়াছে।

ডাক্তার বাবুকে কালাচাঁদ বিনীত নমস্কার করিতে ডাক্তার বাবু তাহার প্রতি চাহিয়া বিস্ময়ে অভিভূত, বহুকাল এত মিঠায় চেহারা তিনি দেখেন নাই। কালাচাঁদ কহিল, 'আমার বলকে, চণ্ডী শাশীর দলের বলকে···'

'তোর বাবা কোথায় ?' সদয়ভাবে ডাক্তার বালককে প্রশ্ন করিলেন : কালাচাঁদের কথা, অর্থাৎ তাহার বাপ এত পথ পদব্রজে আসিতে পারিবে না পাল্কী বা তুলি না হইলে, আর সে নিজে যাবার এত নীচু যে কাহাকে ভর দিয়া এত পথ পাড় ভাঙিয়া আসিবে—শুনিয়া কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক। ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া সে একজন রুগী পরিব্রাহি ডাকিতে আরম্ভ করে,ডাক্তার বাবু তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিল, 'দাঁড়াও না যান···রা, তুমি দাঁড়াও আমি এখুনি আবার মফঃস্বলে যাবো, বাড়ী থেকে এক মিনিটে আসছি, ওষুধ পত্তর নিতে এসেছি' বলিয়া মিনিটের মধ্যে ডাক্তার আসিয়া তাহাকে কহিলেন, 'চ'। খালের পাড়ে আসিয়া কালাচাঁদ রশি টানিয়া নৌকা নিকটে আনিল, ডাক্তার জুতা খুলিয়া অল্প কাদার উপর দিয়া তাহার বাপকে অতীব যত্ন করিয়া দেখিল, পূর্বেই সমস্ত লক্ষণ ঘাটে আসিবার পথে শুনিয়া কি এক কথা তাহার মনে হয় : চোখ তুলিয়া কহিল, 'এই নৌকোয় গাঙ, পার হলে কি করে, তুমি বটে বড় কঠিন লোক - না না আমার টাকা না...শোন' বলিয়া কালাচাঁদকে পাশের উপরে লইয়া কহিল, 'মৃত্যু অবধারিত' বলিয়া তাহার প্রতি সস্নেহে চাহিয়া সহসা প্রচণ্ড কণ্ঠে কহিল, উপদেশ দিল, 'দেখ' যেহেতু কালাচাঁদ ডাক্তারের কথা শুনিয়া আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিতে পারে নাই, উহা বিস্ময় আহত করে : একদমে সে ঘটিতি নীচে প্রায় নৌকার কাছে, কখন যে দুই কানে অঙ্গুলি প্রদান করিয়াছে তাহা জানা নাই, মুখে অপরাহ্নের ছবি, ডাক্তার প্রেসক্রিপশনের নলচেটি হাতে উহাদের বক্তব্য লিখিতে, স্পষ্ট করত বলে, 'এখনই চলে যাও।' বেচারী কালাচাঁদ কি করিবে ভাবিয়া পাইল না পুনরায় পাড়ের দিকে উঠিয়া খানিক অবপৃষ্ঠ-আরূঢ় ডাক্তারবাবুর পশ্চাত গমন করি ধমকাইয়া একা এধারে দাঁড়াইয়া নিরাকার, তাহার কপোল দেশ বহিয়া অশ্রু কয়েক ফোঁটা নামিল, এই সংবাদ শুনিবার জন্য কি এত অত্রাধি হইয়াছে, মৃত্যু অবধারিত, শালপাতার দোনা ফেলার আওয়াজ হইতে যাহার পরমায়ু-বর্ষ প্রস্তুত। 'ডাক্তার কি করতে তাহলে আছে, বাবাকে বাঁচাতে নয় তো,' ক্রোধে আক্রোশে কালাচাঁদ দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করিল, অস্ফুটস্বরে বলিল, 'অলরাইট' তাহার মধ্যে দানবেরা খেলিতে আরম্ভ কি যে করে তাহা লেখা নাই, গাছের ডাল ভাঙিতে কাঁচা মুচিল মুহূর্তের নাই

যন্ত্রণায় ওরে যেদিনী কাঁপাইয়া চলিল ··তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই. সে যাবে এখনি কলিকাতায় যাইবে ; মৌকাইয়া আপনাদের নৌকার কাছে আসিতেই বাপ বলিল, 'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে···বড় ক্ষিদে।'

'জানো ডাক্তার টাকা নেয়নি, আমি অনেক খাবার কিনবো, কলকাতায় যাবো···ডাক্তার বলে তুমি ছেলেমানুষ নৌকা বইতে পারবে না আমি মনে মনে পাসলা খাড়া হয় - খাঁ এখনই যাবো·· আগে চাকাও কচা চাপাই···'

কালাচাঁদের গায়ে হাতে পায় বীরত্ব পৌরুষ লাবণ্য হইয়া দেখা দিয়াছিল ; সে পাকে উঠিয়া যেখানে ডাক্তার তাহাকে সেখানেই, কণকাল, কোন যারোক্তক বিষয়ের পত্রজের গুজন করিতে আসক্তিত্ব, আশ্চর্য্য ! ইতঃমধ্যে, অথচ, ইতস্তত ভিন্নমোরা তালব্য শব্দ, উপায়হীন-সূচক, নিজেকে একজনা করিতে নিঃসৃত হয় ; এবং এইকালে ডাক্তার যাহা যাহা বলে, আনুপূর্ব্বিক ক্রমে মনে আসে, 'তুমি রসকের মিস্তে, হাসপাতালে অনেক জায়গা···বাপকে এখানে এনেছ এটাই পশুশ্রম,···বড় জোর কটা দিন বেচুরে নিজের বিছেতে—তুমি হুষের আর কেউ থাকলে নিশ্চয় তাকে বলতুম কষ্ট হয়—" এই পর্য্যন্ত শ্রবণে, কালাচাঁদ তখন, যাহা ক্ষমতার লেশ নাই, সুন্দর ওষ্ঠদ্বয় পৃথক করিয়া কহিল, 'যা হয় ··কপালে - ডাক্তারবাবু আপনি শুতি···।' ডাক্তার যাই, ও অদূরে গন্ধা হইতে লম্বিৎ লইয়া তাহাকে বাধা দিল, 'পাগল, এখনই নিয়ে যাও,···বাদুন না, বারোজাত জোমে যোবে হড়া··ভাল হবে···।' এখন, কালাচাঁদ নিজের অনুরোধ স্মরণে চাপা চীৎকার করিল, 'আমি শালাও কথা বলিনি' এবং পরক্ষণেই যাহা বিদ্রূপ শোনা যায়, 'হুতু অবধারিত···দেখি কোন শালা আছে —তার বাপও এখনও জন্মায়নি,' এই উক্তিতেই আপাসাহেবের মুখখানি ভাসিয়া উঠিল নিমেষেই, তাহার বাক্যাবলীর, কালাচাঁদের, প্রতিধ্বনি হইয়া আপা সাহেবের গলা আসিল, 'ভাগ্‌তা হায় ভাগতা হায় ;' ইহা অনুভবে, কালাচাঁদ রোষবশে ঘুমড়াইয়া বিকলপ্রায়, সে ঘষিয়া, ছুনিমিত্ত বিব পত্রজের গুজনে ক্ষিপ্ত, এবং এই বিকারে ইতস্তত নিরীক্ষণ করিল : জরাজীর্ণ হাসপাতাল ঐখানে, আর তাহার কিরিঙ্গী ঘর। তৎক্ষণে সে আরোগ্য মহাজন-সাক্ষাৎ তথা পন্থা পাইল, পলকেই সেও ইংরাজ—যাহারা দুর্দান্ত, অমানুষ, নীচ, জানোয়ার, শিশু স্ত্রিধারীকে ঘুষের চোকর, অন্তঃসত্ত্বা রমণীকে, প্রভুর নামে, লাথি মারিতে যাহারা স্বর্গসুখ পায়—কালাচাঁদও সেই ইংরাজ-সমান, উহার পুণ্যদা চক্ষুর অচিরাৎ সিকল কচু মেঘবর্ণ, তাহার মস্তিষ্কও দেখা দিল, নিজেকে না বুঝিতে দিয়াই

আপনার ঠোঁট খুলিয়া ফেলিল। টাকা তিনটি নিশ্চয় মাটিতে, সে উলঙ্গ এবং জন্মাবধি আয়ী পদচারণায় হেতু শুষ্ক মৃত্তিকায় পদচিহ্ন গভীর; তাহার তীব্র পিপাসার উদ্রেক হইয়াছে, একটা নিম্ন বেগ স্থির, জঘনে অগ্রপশ্চাৎ আন্দোলিত; যেখানে, তাহার অংশভাগী ঘোষণা করে, সেই স্থানে আঙ্গোপে লাথি, তিন তিনবার মারিল, আর যে টাহার পর দৃঢ়মুষ্ঠি ও মধ্যমার শীর্ষ স্পর্শে যে মৃত্ত ঘটনা করে, তাহারই মধ্যপথ দিয়া তিন তিনবার মুক্তমুক্তি কাটিল, আশ্চর্য! তিনবারই, সে সফলকাম হয়: এই মর্মদর্শে জলদগম্ভীর স্বরে ভাকিল 'কালাচাঁদ'। এবম্প্রকার সিংহনাদে যেরে কালবৈশাখী আর যে তীর্যাক্ষমূর্তিতে বেরুদণ্ডের শেষ রৈখা ভগ্নীভূত, দন্ত ঘর্ষণে—ধমিচ এখনও সে সমাক অলকাপুরীর সৌন্দর্য, যক্ষ যমুনর—বাহু স্তম্ভিত, লতাগুল্মবৃক্ষপত্রাদি নিশ্বয়, সাহু-শালিক ও আর আর পক্ষীদের কণ্ঠে চাপাটে মাঠ প্রবেশ করিয়াছে; সে দেখিল খেলার মাঠ, অনবরত সে কাউল করে, অনবরত হুইসিল দিয়া খোনা মাস্টার বলে 'কাউল, আর যদি কর' বুক ফুলাইয়া কালাচাঁদ, এখন, এখানেই, নানাবিধ কাউল করার ভঙ্গিতে কহিল 'বেশ করবো'; পরক্ষণেই দেখিল রসিকের তেওী-পাতাকাটা, যাহা দক্ষিণা-পবন সঞ্চালিত পরবন-আবিত দীঘির তরঙ্গ-বিভঙ্গ, বহু নিষ্ঠাসহকারে রসিক উহা আরোপ করিয়াছে, তাহা ক্ষয় করিতে অত্যুগ্র উৎসুক: পরে ভাবিল তাহারই গর্ভে সে ছিল, যে ক্রুর দর্শনা, চণ্ডোদরী নারী নিশাচরী, যে বলে আমার গর্ভাবস্থা, এই অবস্থায় আমি যে পর্যন্ত দর্শন করিয়াছি·· হুসনয়না সীতাকে সেই পর্যন্ত আমার ইচ্ছা হইতেছে আমি ইহার বক্ষ প্রীহা ফুসফুসের স্থূল পার্শ্বভাগ, নাড়ীবন্ধন সহিত ছেদিত ভক্ষণ করি···(ইহার পরও নির্ঘাত অশোকবন পুষ্পিত হয়); মুখখানি এরূপ ব্যাদান করত ফিরিয়া দাঁড়াইল যে, লোক দিক সমূহ ত্রস্ত, কহিল, 'মত্যা মত্যার পাঁয়ে আমি হিজড়ে হনুমান...শালা' আর ইহার সহিত মনস্বী ধার্মিক কালাচাঁদ ঈশ্বর হস্তক্ষেপীয়া করে এবং ইদানীং এই আনুষঙ্গিক দুর্ভেদ্য ক্ষমতা লইয়া তাহার শিরা-উপশিরা তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া ছুটে; দেখিল, আয়না ধরিয়া সে নিজে, আয়নার সম্মুখে বসিয়া, হনুকে পরম নিষ্ঠুরতা দিয়া আপনার মুখমণ্ডল সাজাইতে ব্যস্ত, দুটি গালের আলো দুই পার্শ্বে, হনুকে এক রহস্যময় গোপনতা লইয়া গোপনতাকে আপন মুখে বীর গাম্ভীর্য সহকারে খেলাইতেছে; এই গোপনতা এক নিরবচ্ছিন্ন শান্তিপ্রসূত, যোগলব্ধ, যেখানে জ্যামিতি কভু সুরম্যে, কখনও চন্দ্রালোকে, ক্বচিৎ সিক্ত হস্তের বর্ণাঢ্য রক্তিমতায়; এখন বিজ্ঞান তখন অদৃশ্য, আর চারিদিকে, গন্ধা বিস্তীর্ণ, নিঃসঙ্গ

উপজীবিকার নির্ভাবনা : এখন এই লাম্পট্য সোপনতাকে উচ্চনচ করিবার বাসনায় সে আস্ফালন করিল ; সে আহার বারিয়া, দেখিল সন্ধ্যাই, সে-সোপনতা ভাঙিয়া ফেলিয়াছে, চারিদিকে অনংখ্য টুকরো, টুকরো, টুকরো। এবং ব্রজনাথে ধিক্কার দিল, দেখি, 'মৃত্যু কি করে, ছেলের হাতে মোয়া' কখন হইতে যে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া জল পড়িতেছিল তাহা সে জানিত না ; অগোচরে হাতের কব্জি দিয়া খানিক অশ্রুমোচন করিয়া, যোগীগণ-দুর্লভ প্রবাহিনী গঙ্গাকে দর্শনে, অপেক্ষেই দৃষ্ট, অপেক্ষেই দুর্ধর্ষ অজ্ঞাতপূর্ব শক্তি সঞ্চারিত এবং যুগপৎ আশ্চর্য। নিজেকেই প্রশ্ন করে, 'আমি কি স্বপ্ন করি, পাগল পাগিতেছি, এসব সত্যসত্যই আমি সত্যই সত্য ?' তীক্ষ্ণ অবিশ্বাসের অন্ধকার পরেই, ক্রন্দন-ব্যাহত স্বরে বলিল, "মা মাগো, আমায় সাধন দাও, জন্ম-জন্মান্তর আমি সাধন করবো আমি বাঁচাবোই বাঁচাবোই' আর যে, দ্রুতগতিতে টাকাগুলি তুলিয়া মাথায় ঠেকাইয়া, অশ্রুসিক্ত চোখে ঠোঁট পরে ; সে বিড়বিড় করি অনর্গল কুৎসিত গাল পাড়িতে অস্থির, ইতিমধ্যে কেহ তাহাকে দুংকারে উড়াইয়া দিয়াছে, তাহার ভালবাসা যাহা কাল-অগ্রাহ্যী, ইহাতে হাত পড়িয়াছে, যে ভালবাসা রসিকের যাহা দু-কড়ির, দুকড়ি যে ছদম ভালবাসে, রসিক এই অবিশ্বাস-বস্তুকে চতুর চক্ষু, তাহার, ভ্রূভঙ্গে নষ্ট করিতে সক্ষম, বলিয়াছিল, 'ওলো কালাবাবু আমি মধুর ভাবের ভাবি, কাকন ফেলে কাঁচে সেরো দিইনি, পীরিত আমার ঘোরা ঘরকে যায় না…'

বাঘাল ভোজনের দিন সন্ধ্যায়, 'পীরিত আমার ঘোরা ঘরে যায় না' এই মুলধিত কথানিচয় বলকে বলে, ঠিক ইহার পূর্ব দিনে রাত্র তখন গভীর, রসকে মৃদুস্থ অবস্থায়, স্বপ্নচালিত, দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত যাহার তালু লাল, অগ্রসর হয়, উহার ঠোঁট দুইটি মাঝে মাঝে স্ফুরক হইতেছিল ; নিকটে যাহারা ছুরা, তাস, খেলিতে ব্যস্ত, সহসা এহেন দৃশ্যে ধ, রসিক, দরজা দিয়া বারান্দায়, এটি ফুল বাড়ী এবং একই ভাবে আনাগোনা করে, আর ইহার সহিত 'কালা কালা' নামটি উক্ত হয়, দরজার অবকাশ দিয়া রসিক স্বপ্নচালিত, পার হইবার সময় তাহার তালুতে লণ্ঠনের আলো অনৈসর্গিক হইয়া দেখা দেয় ; এ ঘটনা কালাচাঁদকে চমৎকৃত ব্যাকুল করে। এখন, এই সকল ভালবাসা তাহাকে যুক্তিপূর্ণ করিয়াছে, কাল-বালাকে সে লাট খাইতে দিবে না ; সে রুখিবেই ; জলদগম্ভীর স্বর তাহার জিহ্বা আলোড়ন করে, এখান হইতে দেখিল, নীচে, নৌকা—নিদিষ্টায় ভাল সাজান,—পাশ দিয়া দু'একটি নৌকা পার হইয়া যায়, নিম্ন মৃত্তিকা সম্মুখ হইতে দুই হাতে

ভাল দেখাইয়া আপন মনে কহিল, 'তখখান ত ঘরে যায়নি···আমি আটাশে ছেলে নই' এবং উচ্চ কণ্ঠে কহিল, 'এ হাসপাতাল আহারাম, বুঝলে, দাঁড়াও আমি এলায় বলে. কিছু কিনে আনি—এখনই যাব' বলিয়াই টাকা তিনটি কিছুক্ষণ হাতে নাড়াইয়া নিক্ষেপ করিল, রাস্তার মুখ প্রত্যেকটির দেখিয়া সে আনন্দে বিফারিতপ্রায় ; দেখিল বেলায় কিছু নাই, শুধু ঘর্ষট—ইহা ঘরের বেলা—অচল, একটি পানের দোকান. শীতের হাওয়ায় অজস্র পরিত্যক্ত পাতা উড়িতেছে ; মনস্থির দোকানে আসিয়া হাঁকিল. 'সিলভেট হাওয়া সাড়ী'—তদ্বয়ে কিছু করার এই প্রকাশ ! সিগারেট ধরাইয়া যাহাতক সে নির্ধম করিয়া টানিয়াছে, অমনি ধমক দিয়া কাশি, এবং এক পাক ঘুরিয়া গেল. কটিতি সে নৌকা অভিমুখে দৌড়াইয়াই থামিল : এ তাহার বাপের কাশির নহে, তথাপি এই কাশি, সকলের মত চক্ষু দেয়, কালাচাঁদ ক্রোধ-উদ্যত : এ সময় একটি বৃদ্ধ কণ্ঠস্বর বলে, 'খোকা আস্তে টান' খোকা কথাটি শ্রবণে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া কাশিবার মধ্যেই অস্ফুট কণ্ঠে বক্তব্য করিল, 'খোকার তলপেটে দাড়ি' ! কাশির ধমক সম্মুখের প্রতীয়মানতায় রক্ত হিটাইতেছিল। তদ্দৃষ্টে কালাচাঁদ পাশুটে, এবং এমতকালে কড়ওয়ালার গলার আওয়াজ, ফুয়াড়ীদের হুঁসার কানে আসিল ; চিঁড়ে মুড়ির খোঁজ উঠিয়া গিয়াছে, রাস্তার মুখের আনত ডাল দেখিয়া তাহার মনে হইল আমার যাবার লাগিতে পারে, যদিও অসম্ভব, বাবা নামাইয়া কড়ওয়ালার কাছে আসিতেই দেখে কড়ওয়ালা ও তাহার সঙ্গী উঠিয়া যাইতেছে। কালাচাঁদ কহিল, 'আমি খেলবো' তখনই ছক পাতা হইল ; কড়ওয়ালা কহিল, 'যাহারা খেলিবে না তাহারা ভীড় করিও না' বলিয়া হুতসম্পদ ফুয়াড়ীদের হটাইয়া দিল ; চৌঁচির গিয়েতে- কালাচাঁদের পুঁচরা পয়সা ছিল, কালাচাঁদ, প্রথমেই দু'আনা লাগাইয়া কড় দৌটা হাতে লইয়া 'জয় মা, জয় পাঁচ'—জিত : এই জিত তাহাকে অযথা বিশ্বাসে আনিল, সে চাঁক হইতে এক টাকা ধরিল ; পুনরায় জিত ; মা থাকে কপালে বলিয়া, যখন জিতের টাকা হাতে পাইল, তখন মুখ দিয়া বাহির হইল 'এবার কলকাতা' ; কিন্তু মনে হইল, দুটাকা বাজে আনায়,'জয় মা' বলিয়া সমস্ত টাকা যা ছিল ধরিল। জিতলে চল্লিশের উপর, 'চার তিন' বলিয়া কড় চালিল ; আনন্দে লাফ দিয়া উঠিল, 'চার তিন চার তিন' বলিতে বলিতে হঠাৎ কি হইয়া গেল, একটানে তাঁহার চৌঁচি খুলিয়া লইয়া ছক খুলিয়া ঘাসের উপর ঘাসের সাঁকো দিয়া দৌড়াইল প্রথমে কড়ওয়ালা এবং তাহার সঙ্গী : কালাচাঁদের মুখে যখন শব্দ আসিল তখন

তাহারা দাঁকো পার হইয়া, খাল পার হইতে আর একটি খাল যেখানে বাহির হইয়াছে সেখানের একটি শালতিতে উঠিয়া পড়িল, কালাচাঁদ দ্রুত পিছু লইল, তাহার চীৎকারে সকলে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু হায় কালাচাঁদের, ভ্রান্তভাবশতঃ খালের দাঁকোতে পা পিছলাইয়া গেল, ছটফটে মেলির ধরিয়া সে বলিতে লাগিল ; ইহা ভয়ঙ্কর বিপদজ্জনক, ইহা যাহারা তাহাকে সাহায্যের জন্য ছুটিয়া আসে তাহাদের মারা সৃষ্টি করে, এবং অনেক ঘুরে ঘুরে সীধ গাছের পিছনে শালতি অদৃশ্য ; কালাচাঁদকে লোকে কোন রকমে তুলিল, অন্ধকারে তাহার মেঁটি কলাওয়ালারা ফেলিয়া গেল, সে উহা পুনঃসংগ্রহ করে ; একজন সান্ত্বনা দিয়া কহিল, 'কেঁদে কোন ফল হবে না, তুমি দুখের ছেলে, মাই-হারা সন্তান, তুমি সেই দুখের সঙ্গে···' সত্যই, কালাচাঁদের চোখে জল ছিল না, নাশা স্ফীত, ঠোঁটে মুখমণ্ডল কম্পমান ; অন্তরে এক বাক্যের অহরহ পুনরাবৃত্তি শোনা যায় —'এখন', এবং মাঝে মাঝে একটি মেটের মত সমস্তল বক্ষ তালিয়া উঠিয়া তাহার চক্ষুকে ঝাপসা করে, এই বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া মাত দিবি কাটে, ছুয়া আর মেলিবে না ; তখন সেও যাত্রা দলে, জলখাবারের পয়সা দিয়া বাপের জন্যই— ঊরুপয়ার সুয়াদার নিমিত্ত—আনায় একশো তেঁতুল বিচির পত্তন, উহাই বাজী ধরিয়া খেলা হইত, একদিন চণ্ডী পাত্রীর ঘর হইতে বলিক উঠিয়া আসিল, তাহাকে ছুয়া হইতে টানিয়া অন্ধকার উঠানে যায়, বলে, 'বুক ছুঁয়ে দিব্যি কর, মনে রাখিস এখানে ভালবাসা আছে মানে ঠাকুর আছেন', ইদানীং সেই মেটের মত সমতল বুকখানি, ছলয় যেখানে, গভীরভাবে পরিক্রমণরত ! কালাচাঁদ, এখন, দ্বিধিত পদ্মার স্নানকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখিল।

খালের সুউচ্চ পাড় হইতে, নিম্নে, শ্যাম নৌকায় নির্নিমেষ, চট আচ্ছাদনে যাহাকে দেখে, সে তাহার বাপ, ইহজীবনের কারণ, এবং সে নিজে দগ্ধ ; চকিত হওয়ার পর মধ্যে কালাচাঁদ আপন দীর্ঘশ্বাস শুনিয়াছে, ঘন ঘন রোমহর্ষে দেহ ভ্রমড়াইয়া অস্থির, ইচ্ছায় অথবা হিম তিক্ত শ্লেষাক্তনি, করিতে থাকিয়া ; একারণ যে পঞ্চভৌতিক নির্জীব বিনিকল্প স্তব্ধতা, বালককে বিকলাঙ্গ দৃঢ় করে ; অন্ধকার ইত্যাকার নিরেট যে স্পর্শ-সাপেক্ষ, অন্ধকার অনুভবে তাহার ইন্দ্রিয়ে আঘাত হইয়াছে ; এই স্থান হইতে গঙ্গার বিশাল শূন্যতাকে নিরীক্ষণ করিয়াই সে শীতকাতর, গঙ্গাবক্ষে সন্ধ্যা এখন কথকিত ধূসর মেদুর, জলাশয়ই কৃষ্ণবর্ণী কচুরীপানা ভাসমান ; গঙ্গার ছোত্র তাহার জানা নাই ; অবশ্য সম্পূর্ণ একটি পদ্ম যাত্র ধীরে ধীরে আবৃত্তি করিয়া, নীচে পাড় রহিয়া নামে, লগী খুলিয়া

কান্নি আকর্ষণে ওপ টানিল, এবং আমার তাহার বাপ সাড়া পাইয়াছে কিনা নয় ইহা ঠিক দিতে নজর করিতেছিল, নৌকার তৃণীকৃত আঁধার। গঙ্গার মুখে নৌকা আসিতেই অল্প চক্ষু খাইল, কালাচাঁদের আপন চোঁচি যথাযথভাবে, ঘুলিয়া যাইবার কালে চোখে পড়িল, মুখ হইতে চট সরাইয়া তাহার বাপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিল, এ দৃষ্টির নিকট অন্ধকার রৌদ্র, এবং উগ্রভাবে কাশিল ; পিতা এক ঘোর দুঃস্বপ্ন, এবং সে অসহায় ; এখন সে কোনক্রমে, লগী ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল : 'ভাড়া বেলা, নৌকানীয়া নেই···কিছুটি' মরকাইয়া জোরে বলিল, 'নেই' : জলে শুধু লগীর শব্দ বাতীত এখানে নিথর, অনেক দূর হইতে ভাসা ভাসা কথা এবং মাঝি মাল্লার গানের কলি, সুরের আভাস, সৈন্য বহন করি আনে, গ্রাম রেখা কালো, আর যে আলো দেখা যায়। কালাচাঁদ বৈঠা ধরিল। বৈঠার আওয়াজে যে সে দুর্বল একথা বিশদ হইবার সম্ভাবনা, এক বিকট শব্দ তাহাকে আকর্ষণ করে, মরমত উল্লাস মথিত আওয়াজ, 'কেয়া নাও-কেয়া, বড় নৌকায় বাঁধ'—পিতার কথায় এতাবৎ নীরবতার মধ্যে বিশেষ সম্বল ছিল তাহা পুত্রের নিকট পরিষ্কার, পিতা যে ভাড়ুয়ের কথা-পরামর্শ—'বলে, আর বাহাদুরি নয় টাকা দিয়ে, বড় নৌকায় নৌকা বাঁধ'—আর আর কথা, নিশ্চিত, সব শুনিয়াছে ; কালাচাঁদ একবার গঙ্গার প্রতি চাহিল, অপরাধ, লজ্জাবোধ মধ্যে মরমরাহ হইয়া উঠিল : আবার রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, 'কেয়া নৌকা...টাকা কই যে টাকা···' কালাচাঁদ উত্তর করিল, 'খিদে বুঝি আমারও পাইনি' বলিয়া যত সম্ভব দ্রুত বৈঠা মারিতে লাগিল। পুনরায় শোনে, 'তুই কি মনে করেছিস এঁা। হারামী আমায় মেরে ফেলতে চাস, যে আমায় এপারে নামিয়ে টাকা, টাকা দিয়ে কি করেছিস বল'—বিরক্ত আত্মরক্ষী কালাচাঁদ সদর্পে কহিল, 'ওটাকা তো হলকে আমায় দিয়েছে···তোমার কিসে' বলিয়া দুর্দান্ত জবরদস্ত বাহিতে লাগিল। জন্ম মরণাপন্ন পিতা, চট ফেলিয়া উঠিয়া কাশি চাপিয়া বলিল, 'যে শালা, হারামী টাকা না হলে তোকে লাথিয়ে' ইহাতে অপমানিত কালাচাঁদ, যে অপরাধ জর্জরিত, ইতরের কণ্ঠে বলে 'ইঃ টাকা তোমার বাবাকেলে ধন কি না' সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাপ কহিল, 'তবে রে শালা খানকির ছেলে, বেজন্মা'। কালাচাঁদ দাঁড়াইয়া উঠিয়া রাগে কম্পিত দেহে উত্তর দিল, 'তঃ যত তঁার জন্যে করা হয় তত বাড় বেড়েছে না, কের যদি মুখ আসটে কয়বে, তো, আমি দাঁড় ফেলে দেবো' —বর্ষীয়সীনার উন্মত পিতা নিজেকে সামলাইতে পারিল না, 'পুনরায় একই গাল পাড়িল, যাহাতক বলা, হিতাহিত / কাণ্ডজ্ঞান-রহিত বালক বৈঠা ছুড়িয়া

ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'হয়'—পিতাও ক্রোধে অধীর, তৎক্ষণাৎ তাহাকে লাথি মারিতে গিয়া পা স্খলিত : নৌকায় পাটাতনে আছাড় খাইয়া পড়িল। নৌকা ভাহি ভাহি পোলারমান, আর যে আকাশে বিদ্যুৎরেখা ক্ষণিকের বিকিরণ করে ও মেঘগর্ভ আহাজের ভেঁা মন ছিঁড়িয়া মারিয়া উঠে। কালাচাঁদ প্রস্তরীভূত। নৌকার অস্বাভাবিক কম্পন এখন, ক্রমে, আর নাই ; কালাচাঁদ সমস্ত দিক হয় চোখে নিরীক্ষণরত, আহাজের ভেঁা তাহার দেহে স্পন্দিত, উপলব্ধি করে সর্ব্বত্রেই পিতার আলেখ্য : গঙ্গার বক্ষে ঘূর্ণায়মান জলরাশি—এখানে সেখানে : মধ্যে এই ভাঙ্গ-নৌকা, সম্মুখে পিতা, একখানি হাত নৌকা ছাড়িয়া আছে, আর তিমিরাবৃত, তমসাবৃত অন্ধকার! ক্রৌঞ্চ-বিধুন অন্ধকার! ভূতার অন্তর্হিত বাধাবানের অন্ধকার।

গঙ্গাবক্ষে এহেন দুর্দৈব সংঘটনে, বসুধার গৃহ ছাড়িয়া উর্ধ্বরতা লাসর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে : অংশ হইতে পূর্ণ, আত্মস্থ-ত্রিভুবন, সঙ্কল্পিত, শব্দহীন : সে একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল, বক্ষে কপাট বন্ধন হস্ত, জ্যোতি প্রধান ঘষিতেই, বন্ধন মুক্ত করত, মুখ অতিব্যক্তিময় মনে হয়, সে পার্শ্ববর্তী হস্তাঘাতে অসহীরী শৃঙ্খল কাটিতেছে : ক্রমে, হস্ত সঞ্চালন করে, সে সন্তরণ দক্ষ : মুহূর্ত্তেই, দক্ষিণ পায়ের, আপন অঙ্গুলি দ্বারা, ভূবিলিখন আরম্ভ হয়, অনেকেই হস্তঅঙ্গুলি দ্বারা ক্রত কি লিখিতে থাকে, আর কয়েক পল অন্তরে সে ব্যঞ্জনাক্ষর-বিরহিত শব্দ করিতে সমর্থ, অনন্তর যানান উচ্চারণ শোনা যায়, 'ঠাকুর' : সম্যক জ্ঞানদীপ্ত মনে উচ্চৈঃস্বরে, মস্তক আন্দোলন করত, ভ্রূ অভূত আওয়াজ, 'ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুর'বলিয়া উঠে, এই ডাকে ঘোর প্রতিধ্বনি হয়, এবং বুঝা যায়, পৃষ্ঠতা কোথাও নিপট, যাহার গাত্রে শব্দ আহত হইয়া লক্ষগুণ, সেখানে মৃত্তিকা আছে : কালাচাঁদ, উহার পরক্ষণেই, এই আপশোষ করে, যে সর্ব্বত্রে পিতাপুত্র দেখিয়াছে অনুপরমাণুর পিতা আছে তাহার এ-কি বিড়ম্বনা! তাহার এই দশা, সে সর্ব্বনাশকে ডাকিয়াছে : পৃথিবীতে আর পাখী নাই, তারকার লাগিয়া কি ভয়ঙ্কর! সে শশব্যস্ত, বাপের কাছে গেল, দেখে, মুখ বহিয়া রক্তধারা, উদর গভীর, পাঁজরার মধ্যে মধ্যে কালো রেখা : বাপের মুখ সযত্নে মুছাইয়া দিয়া, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আওয়াজে কহিল, 'বাবা আমাদের কি হবে?' বারম্বারই এ প্রশ্ন শোনা যায় : ক্রমে নিজেকে বিশ্বাস হইল পিতৃবৎ, অন্যদিকে যাত্রাময়ী গঙ্গা, তাহার দেহ কোন এক অবলম্বন হইতে খসিয়া পড়িতেছে : পূর্ব্বাহ্নে দেখিয়াছিল বাপের একটি চোখ খোলা, এখন দেখিল উহা পৈশাচিক বীভৎস, তথাপি সে

পিতার বক্ষে, সংসাহসে, কান পাতিল ; হাতখানি তুলিয়া কানে দিল, আপন বক্ষে হস্ত স্থাপনা করিল ; কাঠে, নৌকায়, কান পাতিল, প্রতি বিন্দুতে, জলে স্পন্দন বিদ্যমান, শুধু এক স্থানে নাই ; পিতা অনন্তের অংশ, নিস্পন্দ ; কন্যাকে কালাচাঁদের মুখ বিকৃত হইল, অজ্ঞ নাই ; মুখ তুলিয়া বালের ভৌতিক মুখ-পানে চাহিল ; আচম্বিতে দাঁড়াইয়া তারস্বরে বলিল, 'বাবা বাবা কথা বল, কথা বল', পরে কহিল 'মৃত্যু অবধারিত মৃত্যু···মৃত্যু', আপন বয়স তুলিয়াছে সে ভাবিয়া পড়িল, স্পন্দন নাই, দেহ চমৎকার ; ওষ্ঠ দংশন ব্যতীত আর উপায় নাই ; মস্ত ভয়ে ঘোষণা করিল, 'নৌকা আমি কেয়ার আমি আমি আমি' হাত দিয়া জলরাশি, উন্মত্ত উন্মাদ, কাটাইতে কাটাইতে, দুর্জয় দুর্ধর্ষ, ক্রমাগত পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ; এ সময় পিতৃহন্তা ক্রমে মস্ত হস্তীর হস্তার হাতে দিক সমূহ তাহার্ত ; ভয়ঙ্কর ভাবে, বদ্ধি অক্ষুব্ধ, হাসিতে হাসিতে, জল হইতে হাত তুলিয়া পিতার দেহের চারিদিকে পরিক্রমণ করে। এখন, বালের পৈশাচিক মুখ-মণ্ডল, একটি চক্ষু যাহার খোলা, হাওয়া বাকি অল্প কম্পিত, দেখিয়া সে অত্যুগ্র ক্ষিপ্ত হয়, যে কোন কিছু বিবেচনা না করিয়া বর্তিত চোখের প্রতি চাহিয়া রুষ্ট কণ্ঠে কহিল, 'আমাকে ভয় দেখিও না, ভয়, বন্ধ করো চোখ' বলছি এ কথার সঙ্গে, বালের চোখে সে মুষি বসাইয়া দিল, মৃতের মুখ উন্মুক্ত, খানিক রক্ত বাহির হয়, এবং মুহূর্মুহু, বেচারীবালক, কাঁদিয়া উঠিল ; কাঁদিতে কাঁদিতে সে অবশ, একবা সে ঘুমাইয়া পড়িল। কত ক্ষণিক, সে যে ঘুমাইতেছে তাহা সে বুঝে নাই, সহসা কিসে হস্তস্পর্শে আসিয়া উঠিল,দেখিল নৌকার বাহিরে কচুরীপানার তাহার হাত, চারিদিকে ঘূর্ণায়মান জলরাশি, সভয়ে বালের দিকে তাকাইল, মনে হইল গাত্র যদি লেহন করে, হয়ত পুনরায়···এবং সে জিহ্বা প্রসারিত করি প্রস্তুত ; সম্ভবত, মৃত পিতার গাত্রে জিহ্বা স্পর্শ করিল কিন্তু কচুরীপানার ধারা তাহাকে অন্যমনস্ক করে, এখন তাহা, অর্থাৎ আর উপায় নাই। কখন যে সে লাফ দিয়া বসিয়াছে সে জানে না ; অবিরত গতির মধ্যে যাহা কালের বিচিত্র খেয়া, ছোট নৌকায় সে করজোড় করে, ডাকিল, 'দীনবন্ধু। এ আমার পাপ।' হঠাৎ মনে হয় 'আমি পালা গাহিতেছি' জলে আপনকার প্রতিবিম্ব দেখা যাননে চিত্তচকল, এবং তন্ময় দর্শনে হয়ত বলিয়া উঠে, 'আঃ আমার প্রতিবিম্ব—পীরিত নিয়ে আমি নয়-ছয় করেছি ঠাকুর ঠাকুর এখন আমার কেমন ভাল লাগছে ঠাকুর আমি যেমেছি আমি ক্লান্ত হয়েছি জলনে আমি ক্লান্ত···আমার দুঃখ দাও নাথ, দুঃখ যা সুন্দর কেননা দুঃখই একমাত্র সৌন্দর্য্য। সব সুখ আমি গঙ্গায় আছি' পরক্ষণে উঠিয়া বালক

কল্পনায় করিল, ধীরভাবে কিঞ্চিৎ গলোদক তুলিয়া তারস্বরে নাম করিতে লাগিল !···এই সে বলিতে চাহিল, 'পৃথিবীতে আবার যদি আসি: আমি আসবোই ...ভালবাসা দিও—দেখ আমার ভালবাসা যেন ঘরে যাবে না' ···এবং মনস্থ করিল পিতাকে আলিঙ্গন অবস্থায় ধরিবে। ওষ্ঠ কাঁপিল 'যে ভালবাসা...'

সহসা জাহাজের বাঁশীর শব্দ, ক্রমে চক্ষু মেলিয়া চাহিল ; সূর্য্য দিক্‌নির্ণয় করে, তারা ছোঁয়া কুয়াশা, জলে নীলাক্ষণ লাবণ্য। এতেক নয়ন অভিরাম জলোচ্ছ্বাস বনিকাতঙ্ক ইতঃপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, কিন্তু কে যেন তাহার ভিতরে থাকিয়া পালাইতে চাহে ; সে নৌকাইতে গিয়া স্থির বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে তাহার শিরঘূর্ণন আরম্ভ হইল, পিতার দিকে একবার চাহিল, উত্তাল তরঙ্গবর্ষে নীলাক্ষণ যায়, সেখানে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বালক দুই এক হস্তক্ষেপ করিয়া ঘুরিয়া নৌকা অভিমুখে কটিতি অগ্রসর হয়, এ কারণ যে তাহার মনে হয় 'আমার পিতাকে ফেলিয়া আমি পালাইতেছি' এহেন আসৎকালে সে নিজেকে ধিক্কার দিতে সমর্থ হইল, সত্বর সে নৌকায় গাত্র ধরিল, জাহাজের ষ্টেট-এ নৌকা প্রায় খাড়া এক চক্ষু মুক্ত পিতাকে দেখিল। তথাপি জলোচ্ছ্বাসে চোখে সে চাহিতে পারিল না, হাত নৌকা হইতে পৃথক হইল। প্রাণপণ করিল, তরঙ্গের কাছি ধরিতে যায় নৌকা যায় ধরিয়া ধরিয়া যাইতে লাগিল !

বর্ণোচ্ছ্বাসের মধ্যে কালাচাঁদ ডাকিল 'বাবা বাবা' পরে ডাকিল 'হে মাধব প্রাণ মাধব মন গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম ধন !' যে বাদল দিনের বড় সোহাগের খেলা যাত্র, এ তুমুল বর্ণোচ্ছ্বাসে নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্ত : পিতার নৌকা ক্রমাগত সাগর অভিমুখে যায়।

কয়েকটি কবিতা

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

এই বাংলাদেশে শুধু রক্তমাখা নিউজ পেপার বন্ধুদের দিন।

দূরের পাহাড়গুলি কিংবা তুমি দিনান্তের রেখা
নীল জল অথবা হাউই
তুমি তীরন্দাজ বধে ধনুর্বোণ ধরেছো
অতন্দ্রীকুসুমস্তাণ হৃদয় তোমার
স্বদেশ-বিদেশে মিশে শ্রাবণ কি তুমি ?

ভালোবাসা দিলে তবে ভালবাসা পাবে।
তোমার যোগ্যতা গূঢ়
নিশ্ছিদ্র অতীত নিয়ে তুমি করো খেলা
তোমার লাটাই ভালো
চাঁদ বেনে উড়ে যায় কোজাগর-সিংহলে
রিজার্ভ। রিজার্ভ।

দুঃখদিকে যেথা যায় চার্চ, ললোমন
তোমরা যেখানে করো বসবাস সেখানে অন্তত
বিশুদ্ধ নাপিত আসে—
এই ধমনিতা, এই এরেক্সি-মাথক্ৎ
তোমাদের কাটা-ছেঁড়া, ধর্মযুদ্ধ—নীল ও লোহিত
পোপের জন্ম ও মৃত্যু
'উনি কি ক্যাসিস্ট্ ?'

এই বাংলাদেশে শুধু রক্তমাখা নিউজ পেপার
বন্ধুদের দিনে
বন্ধুদের দিনে করে বসবাস নেপথ্য ও স্টেজ,
হিংসু ও অহিংসু করে কোলাকুলি, হত্যা, মুষ্ট্যাঘাত।
চেতনার মতো এই অচেতনা শিখিয়েছো তুমি
তুমি ধর্মরত তুমি যৌন তুমি কাদিনীকাঞ্চন

তুমি তোমাদের তুমি উচ্চাকাঙ্ক্ষা তুমি ধানজমি
তোমার ছুটতি তুমি ব্রাহ্মণের— চণ্ডালের নও।
অন্তরের বাস থেকে মুক্তি নেই— মুক্তি নেই কোনো
আবিল পাঁকের থেকে মুক্তি নেই বিদগ্ধ ভ্রূণের
বায়ুরাজ্যের মতো ওকে পেটিকোট
তুমি সন্তর্পণ, তুমি শ্মশানের মাঝে বাড়ি করো
ভগ্নে চিলের মতো চঞ্চল তোমার আনাগোনা
ছুপুরের ঘরোঘরে। পচীকেশ, আধরোট, বাদাম
তুমি সব পেতে পারো। ধর্মাধর্ম—তুচ্ছ করে প্রেম!
এই পথে দেবদারু— বাদুড় মনের ভাঁটফুল
বেরালে বেরালে মাখা মাংসেটা-কিমতন্
মজাদীঘি, তাম্রাগ্রাম, দোলমঞ্চ—ব্যর্থ সম্পত্তির
নশ্বর হাতের কাজ
ভালোবাসা?
জোনাকির আলো?
এ কী সব?
চোখের অপরিসীম ক্লান্তি, তাই ঘুরে আধোলীন
নিকটে আসে না যেন ভুল হবে
চরিতার্থতায় শেষে আছে কি বিস্ময়ে মেয়া মেশ
মুক্তির সংস্রব-হারা এ-দিনযাপন?
—কিংবা মুক্তি মৃত্যু ও শৈশবে।
রাজার বাড়িতে আজ ভোজসভা
তীর্থে ক্ষিরনাম
তুমি না আড়াল থেকে জনতার, চাদুর রাজার
তুমি কোন্ পথে যাবে?
কার সংবৎসরের বৈর্ষ নেবে? কোন্ অদৃষ্ট?
তুমি ধর্ম-পুরোহিত
নিষ্ক্রিয়তা তোমার নিয়তি
একত্রে রয়েছো তুমি বর্তমান-অতিবর্তমান

ছায়া-ছলনাকে করো সমাসীন
তুমি সব পারো
তোমার যোগ্যতা আর স্বাধীনতা অনির্বচনীয়।
ধীরে ধীরে যায় খোলে গূঢ়তায়, রহস্যবোধের
শুকতারা তুলে ধরে অন্ধকার কুঁড়ির চিবুক
—পদ্ম না হয়ে যায়!
আরো পরিস্ফুটতর হবে
পৃথিবীর অতীতের পারা তাকে স্বচ্ছ করে তোলে
মুহূর্তেও ধরা পড়ে প্রতিমুহূর্তের দু-কম্পন
মানুষের ধর্ম থেকে মানুষের এই ফিরে যাওয়া
স্তব্ধ হয় চিরঅকস্মাৎ
যায় খোলে গূঢ়তায়, যায় খোলে রহস্যবোধের
শুকতারা তুলে ধরে অন্ধকার কুঁড়ির চিবুক
—পদ্ম না হয়ে যায়!
আরো পরিস্ফুটতর হবে।

প্রিয়তমা, শুকতারা

প্রিয়তমা ফুল তুলেছো শ্রাবণরাতে
এমনি আত্মাহুত
ঘরোঘরো করে অন্তর তারই সাথে
প্রতিধ্বনির মতো
ঘুলো-ঝাঁঝা মুখে মাতাল লেগেছে ভারি
আমার নির্বাসনে
যেতে হবে অতি সত্বর—আড়াআড়ি
সমুদ্রে, দক্ষিণে
প্রিয়তমা, শুকতারা হলো চঞ্চল
মেঘে ঢাকে বারবার
আকাশ ভরে কি শ্রাবণ-মেশানো জল
তোমারি যোগ্যতার?

ইস্টিশান নতুন

ইস্টিশান নতুন— রেলগাড়ি
ভেবেছিলাম শুধে দেবো পাড়ি
হঠাৎ এসে বলে— তুমি যাবে।
'বিদেশ-বিভূঁই, কেউ কি জানে যায় ?'
শুধোই, যাতে শুনলে অতঃপর
তোমাকে পর্শাবে
ভয়ের থরোথরো কলকব্জা।
তুমি আমার চুম্বনে আর-তারা
পাবে— কিংখাবে।
ইস্টিশান নতুন— রেলগাড়ি
ভেবেছিলাম শুধে দেবো পাড়ি
হঠাৎ এসে বলে— তুমি যাবে।

তোমার পথ কি আমার পথেই পড়ে

যবে কাছে পাই সমুদ্র হলে পার
সে থাকে সুদূর মনে
ঘাটে বসে করি বার্থ-সফলতার
তুলনা সংগোপনে
অতোদিক অঙ্গে নির্জন সন্ধ্যার
কলকব্জাদের সিঁড়ি
বহুনায়িকের হলের মরীচিকায়
দেখেছিলে হাবিজিবি
তবু প্রাণ থেকে ছড়িয়ে পড়েছে প্রাণে
অথচ এলোচুল
আমার মন কি ছুটেছে খর্ত্তমানে
দিগন্তাল— অন্তকূল
আনাগোনার অন্তরে বাসা নড়ে
প্রয়োজনহীনতার
তোমার পথ কি আমার পথেই পড়ে
প্রিয়তমা বারেবার ?

ছ'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়ি

মতি নন্দী

মাঘের দুপুরে, যদি ভকভকে আলো পা দিয়েই মন্দ ভাল লাগে, পোকা পেট্রোলের গন্ধ আসে, একটি কি দুটি লোক বিরাট মাঠটা একাকী পার হতে থাকে, উপুড় হয়ে পুকুর ধারে কেউ ঘুমোয় এবং হঠাৎ পাখিদের ডাক শোনা যায়—"এবার একটু বসা যাক।" বিনোদ গড়ের মাঠের দিকে মুখ করা বেঞ্চটা দেখিয়ে বলল।

"হ্যাঁ অনেক হেঁটেছি।" বলেই কমলা আলো দিয়ে বসল। সিঁথিতে, কপালে দগদগে তেল সিঁদুর। খোকা এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। তার জন্যই কালীঘাটে পুজো দিতে কলকাতায় আসা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে যাদুঘর পর্যন্ত সবাই হেঁটে গেছে। এবার মনুমেন্ট দেখার কথা। সীতা আঙুল দিয়ে পীতু-নীতুকে তা দেখিয়ে দিল : "ওই যে।"

একজন ফিসফিস করে বলল, "আমরা ওর কাছে যাব না?"

"গিয়ে কি হবে। এখান থেকেই তো দেখা যাচ্ছে।"

ওরা দুজন আর কথা বলেনি। মুখ ফিরিয়ে বসে রাস্তায় গাড়ি চলাচল দেখতে লাগল। কিছুদূরে গাছের ছায়ায় একজোড়া ছেলেমেয়ে গল্প করছে আর মেয়েটি খুব হাসছে। সীতা তাদের দিকে মুখ করে বসল। কমলা চেল দিয়ে মুখটা আকাশমুখো করে চোখ বন্ধ করে রইল। তার গায়ে অঙ্গে ক্লান্তি। খোকা একটু অধৈর্য হয়েই বলল, "কতক্ষণ বসবে?"

বিনোদ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "যাবোই বা কোথায়?"

খোকা উঠে দাঁড়াল। পকেটে হাত দিয়ে, কয়েক পা এগিয়ে একটা ডাঁডকে লাথি মারল। সেটা ভেঙে যেতে আর কোন কাজ না পেয়ে মাঠের মধ্যে এগিয়ে গেল।

খোকার গুঁতনিতে কেশ দেখা দিয়েছে, কণ্ঠস্বরে কর্কশতা এসেছে। দুই পায়ে মনযোগ। বাহুর পেশী বয়সের আকৃতি নিচ্ছে। এবার প্রথম একটা বড় পরীক্ষায় বসবে। এখন ও কি রকম বোধ করছে, সেইটা জানতে বিনোদের সাধ হল। তাই সেও উঠে পায়চারী করতে করতে খোকার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

"তোর মা বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছে। একটু জিরোক। তুই বসনা, সকাল থেকে তো বসতে দেখলুম না।"

খোকা কথাটা গায়ে মাখলো না। দূরে রাস্তার ওপারে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। সেই দিকেই তাকিয়ে। একদল মেয়ে পুরুষ, বিনোদের মনে হল তারা বেহারী, এমন ভাবে বাসে উঠল যেন স্টেশনে এক মিনিটের জন্য থামা ট্রেনে উঠছে। বাস ছাড়ার পর দেখা গেল একজন চেঁচিয়ে বাসের পিছনে ছুটতে শুরু করেছে। বিনোদের ভারী হাসি পেল।

"খোকা দেখলি না, একটা ব্যাপার।"

ঘটনাটা বিনোদ বলল। খোকা প্রয়োজনমত ছেলে খেলার দিকে মুখ ফেরাল। বিনোদও সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শ্রান্ত বোধ করতে শুরু করল। তার ইচ্ছে হল বাসে পা ছড়িয়ে বসতে।

"কলকাতাতেই খেলার সুবিধে, কত ক্লাব।" খোকা স্বগতোক্তির মত করে বললেও বিনোদ জবাব দিল, "আমাদের ছেলেবেলায় এত কিছু ছিল না। যেখানে মাঠ উঠোন ছিল, সেখানে ব্যাডমিন্টন থেকে শুরু করে সব খেলা হত। পাড়ার বাইরে যাওয়ার দরকারই হতনা।"

খোকা শুনছিল, হঠাৎ খেলার মাঠ থেকে চীৎকার উঠল। একজন আউট হয়ে ফিরে যাচ্ছে। আউটের পদ্ধতিটা দেখতে পেলনা খোকা, তাই বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি বরং ওদের কাছে গিয়ে বোসো।"

বিনোদ অপ্রতিভ বোধ করল। কথা না বলে গুটি গুটি ফিরে এল।

পীতু ফিসফিস করে সীতাকে জিজ্ঞাসা করল, "দিদি, এবার আমরা কি দেখতে যাব?"

"চিড়িয়াখানা?" পীতু বলল।

"জানিনা, বাবাকে জিজ্ঞেস কর।" সীতার রাই উঠছে। ছেলেমেয়ে দুটো খালি কথাই বলে যাচ্ছে। দেখে দেখে আর দেখতে ভাল লাগছে না।

"চিড়িয়াখানা আজো সকালে যেতে হয়।" বিনোদ উত্তরটা দিয়ে দিল। কিন্তু ছেলে দুটির মুখ দেখে তার মায়া হল। বলল,"অন্য কোথাও অবশ্য যাওয়া যায়।"

"সিনেমা?" সীতা চট্ করে বলল।

"এখন শো আরম্ভ হয়ে গেছে। তাছাড়া এখানে ইংরিজি ছবি দেখাচ্ছে।"

বিনোদ মুখ ফিরিয়ে নিল, যাতে সীতা প্রসঙ্গটা টানতে না পারে। খোকাকে দেখতে পেল সে। একটা ঢিল কুড়িয়ে সামনে জোরে ছুঁড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে

এদিকেই তাকাল। ও যেন এতক্ষণ ঘোড়ার মত ছটফট করছে। শুধু গন্তব্যটা জানতে পারলেই হয়।

পীতু ফিসফিস করে বলল, "আমরা কি এবার বাড়ি ফিরব?"

বিনোদ উঠে দাঁড়াল।

"চল্, একটা জিনিস দেখাব।"

ওরা তাকাল।

"আমাদের বাড়ি দেখাব, খোকাকে ডাক্।"

কমলা কথা বলেনি এতক্ষণ। এবার বলল, "কোন্ বাড়ি? যেটা ছিল?"

বিনোদ কথা না বলে বাস স্টপের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

"ও-ছাই দেখে কি লাভ। তার চেয়ে আর একটু বসে থাকলেই হোত।"

গজগজ করে কমলা উঠে দাঁড়াল। পীতু ছুটে গেছে খোকাকে ডাকতে। সীতা বলল, "সেদিন মেট্রোয় সিনেমা দেখে গেছে বি-ডি-ও'র বড় মেয়ে।" বাস স্টপে দাঁড়িয়ে খোকা বলল, "এসব ক্লাসে আমিও যেতে পারি।"

বাসে ওঠা পর্যন্ত বিনোদ কারুর দিকে আর তাকাল না।

এখনো অফিস ছুটির ভীড় আসেনি। বিনোদ বাসের জানলার ধারে বসল। ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বাসটা চলেছে। ঘুমুনি লাগছে। সে যে কত ক্লান্ত এইবার টের পেল। আরাম পাবার জন্ত চোখ বুঁজল। মাঝে মাঝে খুলে দেখে একটা-দুটো গাছ, একটু খাল-খাটি, জমাট বাঁধা ধূলোর বাড়ি। কাণে বাজছে বাসের ঘন্টি, এঞ্জিনের শব্দ আর অনবরত প্রবল এক সাঁইসাঁই ধ্বনি। বিনোদ ভিতরে ভিতরে ভার বোধ করতে শুরু করল, যেন ঘুমে আসছে।

"জানলা দিয়ে মুখ বার কোরো না, পিতু নীতু।"

কমলার গলা শোনা গেল। চোখ খুলে বিনোদ দেখল সামনের লোকটি ঘাড় হেঁট করে কি যেন পড়ছে। পাশের জন জর্দা-পান চিবোতে চিবোতে শূন্য চোখে সামনে তাকিয়ে। ব্যস্ত হয়ে একজন উঠে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সেখানে বসল। বাইরে কেবল ট্রাফিকের লাল আলোটা ঝলমল করছে। স্থির বাসটার গোটাদেহ এঞ্জিনের ঝকঝকানির সঙ্গে কাঁপছে। বিনোদের মনে হল, সপরিবারে কোথাও চেঞ্জে চলেছে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের ওঠা-নামা চলেছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়াতেই কমলার ওঁকো চোখে পড়ল। মা বললেন, "বারণ করেছিলুম জানলা দিয়ে মুখ বার করিস না।" আঁচলটাকে দলতের মত পাকিয়ে চোখের মধ্যে অনেক খুঁজলেন, খুঁ দিলেন।

সেরে কাপড় দলা করে মুখে চেপে তাপ দিয়ে চোখে চেপে ধরলেন। মা জর্দা খেতেন। গন্ধটা তখন সুন্দর লাগছিল।

"তোর মেজকাকার চোখে একবার কয়লার গুঁড়ো পড়ে, সেকি কাণ্ড।" এই বলে জানলার কাঁচ নামিয়ে দিয়ে মা হেসে বললেন, "আর ভয় নেই।" তারপর একটা পান মুখে দিয়ে পাশে বসলেন। আমরা দুজনে একই জানলা দিয়ে দৃশ্য দেখতে লাগলাম। পিচ ফেলার জন্য মা একবার কাঁচটা তুলেছিলেন। বাবা চুরুট মুখে একটা ইংরিজি বই কখন থেকে পড়েই চলেছেন। মা ফিসফিস করে বললেন, "নন্টু, তোর বাবাকে বলনা, বই রেখে এখানে এসে বসতে।" বাবাকে বলতেই হেসে কেমন করে যেন আর দিকে তাকালেন। মা ঘোমটা বাড়িয়ে চোখ সরিয়ে নিলেন। তারপর তিনজনে সেই কাঁচতোলা জানলাটি দিয়ে বাইরের গাছ, চাষী, মুরগীর, মোষ আর পথিকদের দেখতে লাগলাম। এইভাবেই একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম মা'র কোলে।

অন্ধকারে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে স্টেশনে নামলাম। ওয়েটিং রুমে মা মাথা মুছিয়ে দিয়ে চা খেতে চাইলেন। বাবা বাইরে বেরিয়ে চা আনলেন। আমিও খেলাম। বাবা বললেন, "নন্টু, আর একটা জিনিস দেখাব, কখনো দেখিসনি।"

প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এলেন। কি অন্ধকার চারিদিক। বাবার চশমার কাঁচে বৃষ্টির জল লেগেছে। স্টেশনের দিকে আলোয় তা ঝলমল করে উঠল।

"তাকা সামনে।"

তাকালাম, গাঢ় অন্ধকার চোখের সামনে ওৎ পেতে। তাকিয়ে তাকিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেলাম।

"এবার উপর দিকে চোখ তোল্।"

তাই করলাম। চোখ তুলতেই হঠাৎ ঝকঝক করে কেঁপে গেলাম। সেই অন্ধকার এক জায়গায় শেষ হয়ে গেছে। সুতোর মত আঁকা-বাঁকা ঘোলাটে আকাশ, সেই অন্ধকারের মাথায় চড় বসেছে। অন্ধকারটা যেন ভেঙে পড়বে বুঝি।

বাবা আঙুল তুলে বললেন, "ওটা হচ্ছে পাহাড়। ওখানে বর্ণা আছে। আমরা একদিন দেখতে যাব।" গানের সুরের মত করে বাবা কথা বলেছিলেন।

অবাক হয়ে ছেলেমেয়েরা তাকাল। আঙুল তুলে বিনোদ বলল, "ওইটেই ছিল আমাদের বাড়ি।"

"কে আছে ওখানে ?" পীতু জিজ্ঞাসা করল।

"লোকেরা থাকে।" গীতা বুঝিয়ে দিল। লোহার গেটের একটিমাত্র পাল্লা। দুপাশের আমগাছ দুটি ছাড়া। ফুলবাগানটার পুরনো ডাঁচ ভূপ হয়ে রয়েছে। দোতলার বারান্দায় কাঠের পার্টিশান। রেলিঙে নানান ধরনের কাপড় শুকোচ্ছে। বাড়িটার বহু বছর কলি ফেরানি, কিন্তু দাগরাজি দেখা যাচ্ছে। ভাঙা পাইপ দিয়ে তিনতলা থেকে হুড়হুড় করে জল পড়ল। দোতলার কার্নিসে একটা বেড়াল মাথা বাঁকিয়ে কি চিবোচ্ছে, সম্ভবত চড়াই। সদর দরজা খোলা রয়েছে। রাস্তা থেকেই দেখা যায়, অনেকগুলি বেঢ়েমানুষ, বাসনমাজা, কাপড়-কাচার কাজ করছে। উঠোনে আগে জলের কল ছিল না। দোতলার হঠাৎ চীৎকার করে কে খিস্তি করল।

"দোতলার ওই বারান্দার পেছনেই হলঘর। বাবা বলতেন।"

"ঘরে কি করত ?" পীতু জানতে চাইল।

"গান হত, রিহার্সাল হত, পাড়ার পুজোর মিটিং হত। একতলার ওই ঘরটা ছিল বেজকাকার শেরেস্তা। ছোটকাকা যাবা যেতে ওর বৈঠকখানাটা বেজকাকা নেয়। তখন খুব মজেল হয়ে গেছে।

বাড়ি থেকে একটা লোক ওদের লক্ষ্য করছিল। বিনোদ আঙুল দিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেখাচ্ছিল। তার দিকে আঙুল তুলতে দেখে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল, "কাকে খুঁজছেন ?"

বলার ভঙ্গিতে বিনোদ হকচকাল। হঠাৎ পীতুই বলে ফেলল, "আমাদের বাড়ি দেখতে এসেছি।"

ভুরু কুঁচকে লোকটি সপরিবার বিনোদকে দেখল। চোখেমুখে বিস্ময় ও অবজ্ঞা কোটাল। কিন্তু যখন বিনোদ বলল, "এটা এককালে আমাদেরই বাড়ি ছিল," লোকটি হাঁক ছেড়ে বাঁচল।

"বেচে দিয়েছেন।"

বিনোদ ঘাড় নাড়ল।

"বেচবার আর লোক পেলেন না। খোঁয়াড় মশাই খোঁয়াড়। জানোয়ার হয়ে বাস করছি। এদিকে ভাড়া নেয় সত্তর টাকা করে।

খোঁৎ খোঁৎ করতে করতে লোকটি বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। বিনোদ হেসে ফেলল।

"শ্বেত পাথরের উঠোন, সিঁড়ি, মার্বেল পাথরের হলঘর, কত বড় বড় জানলা

দেখেছিল, মঙ্গিণমুখো ?" খোকার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "এই বাড়িকে বলে কিনা খোঁয়াড়। এ রকম বাড়িতে বাস করছে, ব্যাটার বাবার ভাগ্যি।"

কমলার দিকে সে তাকাল। আশ্চর্য, সিঙ্কন দিয়ে কি যেন দেখছে। খুবকের মত করে বিনোদ বলল, "এদিকে দেখ না, ওই যে তিনতলার খড়খড়ি জানলা ওটা ঠাকুরঘর। তার পিছনে ছাদ, ছুটো ব্যাডমিন্টন কোর্ট হয়ে যায়।"

এক বুড়ো কাশতে কাশতে জানলাটায় এসে দাঁড়াল। কমলা মুখ ফিরিয়ে নিল। নিচু স্বরে সীতাকে বলল, "সকাল থেকেই বকর চলেছে, আর বকটায় বসি।"

"এভাবে, এখানে যোগোনা।" বিনোদের কথায় কমলা তাড়াতাড়ি পা নামিয়ে নিল। কিন্তু উঠল না। এক বৃদ্ধ তখন যাচ্ছিল। বিনোদকে দেখে ইতঃস্তত করে কাছে এগিয়ে এল।

"হরিকা, আমি বিনোদ, নন্দ।"

"চিনতেই পারিনি মুখ না, চোখে তো আর ভাল দেখি না, তা তুমি যে বুড়িয়ে গেছ।"

"বয়স তো হচ্ছে।" বিনোদ হেসে বলল।

খোকনা মুখে বুড়ো হাসল। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে যাবা নেড়ে বলল, "একটা লোক ছিলেন বটে তোমার বাবা। কি অন্তঃকরণ। সারাজীবন শুধু দিয়েই গেলেন। এককৌটা সাহায্যও কারুর কাছ থেকে নিলেন না। তারেদের মানুষ করলেন, তারা গাড়ি-বাড়ি করল, আর তিনি ?" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ো চুপ করল। বুকটা দুলে উঠে চলচল করছে বিনোদের। খোকার দিকে তাকাল। শুনে নিক্, হরিকাকে তো আর সে বলতে শিখিয়ে দেয়নি।

"এইটি আমার বড়ছেলে, এবার ছায়ার থেকেওয়ালী দেবে।"

বিনোদ আশা করেছিল খোকা প্রণাম করবে। হরিকা হাজার হোক ব্রাহ্মণ। কিন্তু খোকা তার চোখ ইশারা অগ্রাহ্য করল।

"বেশ বেশ, বংশের মুখোজ্জ্বল কর বাবা। আমার ছোট নাতি গতবার আই-এস-সি পাশ করল। তোমার মেজকাকার ছেলে খুকুকে ধরে কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছি। লোক ভাল। পাড়ার সকলের কথা জিজ্ঞেস করল। তোমাদের কথাও। যাও না বলে দুঃখ করল।"

"বাবা কখনো কারও কাছে হাত পাতেন নি। সেই রক্ত আমার গায়েও তো আছে।"

"তা বটে, তা বটে।"

সীতা এসে বিনোদকে ফিসফিস করে বলল, "মা বলছে, কখন ফিরবে ?"

ফেরার সময় কমলা বলল, "রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথা বলল, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসাতে তো পারত।"

"অবস্থা তেমন ভাল নয়। নইলে কি আর বলত না। ওর বড় মেয়ের বিয়েতে দেনা কাণ্ড ! পালঙ্ক দেওয়ার কথা ছিল, দিতে পারেনি। বরকে তো সভা থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল বরের বাপ। কান্নাকাটি পড়ে গেল। বাবা তখন জামিন থেকে নিজে দাঁড়িয়ে বিয়ে দেওয়ালেন। পরদিনই বরের বাপের হাতে চারশো টাকা গুণে গুণে দিলেন। বুঝে ছাখ্, সে আমলের চারশো টাকা মানে আজকের দেড় হাজার টাকা।"

এতক্ষণ পর খোকা মুখ খুলল, "দিয়ে কি লাভটা হোল !"

শোনামাত্রই ঝিমঝিম করে উঠল বিনোদের মাথা। চুপ করে রইল সে। অবশ্য কিছুক্ষণ পরেই আবার বলল, "খুদু আর আমি একই ক্লাসে পড়তুম।"

কেউ শোনার জন্য আগ্রহ দেখাল না। নীতু মা'র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা লাগছে বলে পীতু হুঁকড়ে বসে। কিন্তু বাবার কাছে গল্প শোনার জন্য জলজল করে তাকিয়ে। বিনোদ আর কথা বলেনি।

স্টেশান থেকে রেললাইন ধরে প্রায় আধমাইল গিয়ে লোহা কারখানার পাশ দিয়ে গোপাল কুণ্ডু রোড। সেখান থেকে বিনোদের বাড়ির গলি তিন মিনিটের পথ। তারা ট্রেন থেকে নামল তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। দূরে সিগন্যালের লাল আলো জ্যাবড়া দেখাচ্ছে। রেললাইনের দু'হাত উপরে কুয়াশা চাপ বেঁধে। ঘুমন্ত নীতুকে কোলে নিয়ে কমলা ঘর্মাক্ত হয়ে পড়েছে। পীতুর হাত ধরে বিনোদ স্লিপারে পা রেখে ধাপে ধাপে এগোতে লাগল। এক একটা স্লিপারে ফাঁক বেশি। পীতু পারছে না দেখে ওকে সীতার কাছে গছিয়ে দিল। তখন কমলা বলল, "এখানেই তো পুরুতমশাই কাটা পড়েছে।"

খোকা বলল, "আরও এগিয়ে, ফুটবল মাঠের কাছে।"

কমলা বলল, "কি সাহস !"

বিনোদ বলল, "কিসের সাহস, ঘরার ?"

"না গো, রামায়াদবের সোনার মুকুট চুরি করা কম সাহসের কাজ ? একটুও বুক কাঁপল না ! ধরা পড়ে গেল তাই, নয়তো কুষ্ঠ হয়ে যেত ওই হাতে।" খোকা তখন কমলার দিকে ফিরে বলল, "তুমি কি করে জানলে যে হোত ?"

"তুই যাম্। পাপ করলে ভগবান শাস্তি দেবেনই। আত্মহত্যা করে কাঁকি

দিল তাই। কিন্তু কাঁকি দিয়ে যাবে কোথায়, যমের দরবারে তো যেতেই হবে, তা ছাড়া পরলোকও আছে!"

বিনোদ কথা বলল না। তাকাতে শুরু করল ললিত শুটচাঁদের কথা। একদিন এসে ভোট চাইল মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকশনের সময়। বিনোদ বলেছিল, "ঠাকুরদেবতার সেবা নিয়ে থাকবে, তুমি আবার এ সবে যাচ্ছ কেন?" ললিত বলে, "ঠাকুর তো দেশের মানুষ। তাদের সেবাই তো করতে চাই।" বাবা বলেছিল। সবাই ওকে মানা করত, কথা শুনতো। চুরি করা পচে অপমান এড়াতে ছ'টা পঁয়তাল্লিশের ট্রেনে গলা পেতে দিল। দেমাকী ছিল, দেমাক দেখিয়েই চলে গেল। এসব মানুষ আজকাল বড় একটা চোখে পড়ে না।

খল খল আওয়াজ হচ্ছে সকলের পা ফেলার। পাথরে আঙুল ঠুকে সীতা একবার যন্ত্রণায় কাৎরে উঠল। কমলা ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছে। দেখে দেখে সবাই পা ফেলছে।

"প্রিলিপল্ থাকা দরকার, না হলে এলোমেলো হয়ে জীবন কাটে।" চাপা স্বরে বিনোদ বলল খোকাকে। "বাবা একবার বলেছিলেন, তখন আমি খুব ছোট। মেজ কাকার ভায়রা ভাই যোগেন ঘোষ কর্পোরেশন ইলেকশনে দাঁড়িয়েছিল। বাবার কাছে এলেন ভোট চাইতে। কুটুম বলে তো খুব আদর-যত্ন করে বসালেন। কিন্তু জানিয়েও দিলেন, কংগ্রেস ছাড়া আর কাউকে ভোট দেবেন না। মেজ কাকাও অনেক করে বললেন, কিন্তু বাবা অটল। সারারাত ঘুমোলেন না, বোতলার বারান্দায় পায়চারী করলেন। পরদিন মেজ কাকা কোর্টে বেরোচ্ছেন তখন ডেকে বললেন, "যোগেনবাবু নিজে এসেছিলেন, কুটুম, তার মর্যাদা আছে, সেটা রাখতেই হবে। ওকে জানিয়ে দিও আমি কাউকেই ভোট দেব না।"

একটানা গল্পটা করে বিনোদ প্রচুর শ্বাস করল। খোকা মাথা নিচু করে দেখে দেখে হাঁটছে। পিছন থেকে সীতা চেঁচিয়ে বলল, "বাবা একটু দাঁড়াও বড্ড এগিয়ে গেছ।"

কারখানার কাছে ওরা এসে পড়েছে। একটা পুরনো বাঁকড়া বটগাছের পাশ দিয়ে রাস্তাটা ঘুরে চলে গেছে। বিনোদ খোকাকে নিয়ে গাছটার নীচে দাঁড়াল।

কমলার প্রায় এগিয়ে পড়ায় দশা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "তোমরা তো ছিল্ লাগিয়ে ছুটছ। আমি ওদিকে ভরে মরি।"

সীতা বলল, "ছ'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়ি আসার সময় হয়েছে, মার খালি ভয় বসি আবারও কাটা পড়ি।"

"না বাপু, গাড়িটাড়ি নিয়ে খেলা নয়। ও হচ্ছে নিয়তির মত। হাত দেখালেও থামবে না, পায়ে কাটিয়েও যাবে না।"

কমলার বলার ভঙ্গিতে বিনোদের কৌতুক করার ইচ্ছা। সিগন্যালের রঙ সবুজ হয়ে রয়েছে। সে বলল, "তাহলে একটু দাঁড়াও, তোমার নিয়তি আসছে তাকে দেখে যাও।"

"না, না, চলো। ঠাট্টা করতে হবে না।"

বিনোদ ওকে হাত ধরে টেনে রাখল। ছেলেমেয়েরা দেখছে লক্ষ্য করে কমলা ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় দূরে এঞ্জিনের হুইসল্ বাজল।

দুজনে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। গুমগুম শব্দ হচ্ছে। লাইনের উপরে পিছলে যাচ্ছে আলো। মাঠের মাঝে ইলেকট্রিকের লম্বা খুঁটির মাথা ঝকঝক করে উঠল। একটা শেয়াল ওদের কাছ দিয়ে ছুটে গেল।

"এসে গেছে, এসে গেছে।" বিনোদ কাঁপা গলায় অন্ধকারের মধ্যে বলল। ফিসফিস করে পীতু বলল, "কি এসে গেছে বাবা?

"নিয়তি।"

বিনোদ কয়েক পা এগিয়ে গেল। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া চাঙড়ের মত হুড়মাড় করে ট্রেনটা এসে পড়েছে। বিনোদ দু হাত বাড়িয়ে শিশুর মত কলকলানি দিয়ে লাইনের দিকে এগিয়ে গেল। কমলা ভয়ঙ্কর সুরে চীৎকার করে উঠল। খোকা ছুটে গিয়ে বিনোদের কোমর আঁকড়ে ধরল। যখন, কামরাগুলোর আলো ওদের দেহ থেকে অদৃশ্য হল, মাটি স্থির হল, বাতাস শান্ত ভাবে বয়ে গেল, ঘটনাস্থের পাখিরা চীৎকার বন্ধ করল, নক্ষত্রের আলিঙ্গন ঘুচল, তখন বিনোদ বলল, "ভয় নেই রে, ও লাইন ধরে চলে। আমি ওর লাইনে যাচ্ছি না।"

কমলা ফুঁপিয়ে বলল, "কবে তোমার পাগলামি থামবে?"

হাহা করে বিনোদ বলল, "চল চল, এবার যাওয়া যাক।"

বাড়ি পৌঁছে, খোকা পড়তে বসল। আধাদামে কেনা গতকালের খবরের কাগজ নিয়ে বিনোদ ওর কাছে বসে পড়ছে আর মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে। কিন্তু একটা মনে করে রাখতে ভ্রূ কোঁচকাচ্ছে, থুতনিতে হাত রেখে ঠোঁট কামড়ে টেনিয়ে রয়েছে, হুবহু ওর ঠাকুর্দার মত। সারা মুখ এ সময় একটা দম্ভের মত দেখায়। আত্মপ্রত্যয়ে কঠিন মনে হয়। বিনোদ মুগ্ধ চোখে খোকাকে দেখছিল। হঠাৎ তা খোকার নজরে পড়ল। মুইয়ে গেল সে।

"তোকে একটা কথা বলব, শুনবি ?"

খোকা অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল। ইতঃস্তত করে বিনোদ বলল, "তোর ঠাকুর্দার পর আর মান সম্মানের মুখ দেখিনি। তুই আবার দেখা পারবি না ?"

কথাটা বোঝবার জন্য খোকা কিছু সময় নিল। ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে এল ওর মুখ। বিনোদ ঝুঁকে এগিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "মনের মধ্যে সদা সর্বদা বলবি বড় হবো, বড় হবো। ফাঁকি দিবি না, ছোট কাজ করবি না, একবার নীচু হলে উঠে দাঁড়ান ভারী শক্ত কাজ রে।"

তারপর একটা দুর্বার্তের মত সে অপেক্ষা করতে লাগল। খোকা অন্তত একবার মাথাটা ও হেলাক। যা একটিটে যা বলুক।

সেই সময় ভিতরের ঘরে পীতু নাকি সুরে চেঁচিয়ে কান্না জুড়ল। বিনোদ বিরক্ত হয়ে উঠে গেল। ওর ক্রুদ্ধ মুখভাবে পীতু চুপ করল। সীতা দ্রুত বেরিয়ে গেল। নীতুও বেরোতে যাচ্ছিল, বিনোদ ওর কান ধরল। "কাঁদছিস কেন, দাদা পড়ছে না ওঘরে ?"

সেই সময় পীতু বলল, "দিদি চুল বাঁধছিল। ওকে বিয়েয় শুধু আবার চাইছে।"

"সেল কোথায় তোর দিদি।" পীতু হঠাৎ চুপ করে গেল। সীতা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। বিনোদ তাকে দুবার জিজ্ঞাসা করল। সীতা শুধু চুপ। এবার কঠিন ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল, "পয়সা গেলি কোথায়, কে এনে দিল ?"

"কেউ না।"

"তা হলে ?"

হঠাৎ পীতু বলল, "সুশীলদা কানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি দেখেছি।"

কিছুক্ষণ কেউই কথা বলল না, চোখের পাতাটুকু পর্যন্ত ফেলল না। তারপরই বিনোদের চড়ে সীতা ছিটকে পড়ল কয়লার পিঠের উপর। নাথি মারতে যাচ্ছিল কয়লা তখন দুহাতে আগলে ঘরে বলল, "বিয়ের যুগ্যি মেয়ের গায়ে হাত তুলছ, লজ্জা করে না ?"

বিনোদ থরথর করে কাঁপছে, গলায় কথা আটকে গেছে। গলার স্বর দুমড়ে মুচড়ে কয়লা বলল, "বড় বংশের ছেলে, তা বস্তির লোকের মত আচরণ কেন ?"

দিশাহারা হয়ে বিনোদ চারধারে তাকাল। ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে খোকাকে বলল, "সুশীলকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে ? এসব কি ব্যাপার ?"

চোখ দুটো লাল করে খোকা বলল, "কেন, কি করবে ?"

"জেবেছে কি সে। যখামি করার জায়গা পায়নি ?"

"সুশীলদা আমার মাকেশান এনে দেবে কলকাতা থেকে।"

"তাতে কি হয়েছে, তাই বলে—"

বিনোদের কণ্ঠস্বর মৃতের শেষ কম্পনের মত। কেঁপে উঠে থেমে গেল। খোকার সারা মুখে মত মাখানো। কঠিন দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়েছে গোঁয়ারের মত। বিনোদ চোখ নামিয়ে নিল। সন্তর্পণে খোকার পাশ কাটিয়ে বাইরের রকে এসে দাঁড়াল। একবার মুখ ফিরিয়ে ঘরের দিকে তাকাল যেন এইমাত্র তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আধা পরে খোকা হন হন করে ওর পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল। তখন সে মনে মনে বলল, খোকা ফিরে আয়।

তারপর বিনোদ হাঁটতে শুরু করল। গলি ধরে সে ঘুরতে ঘুরতে চৌরাস্তায় পৌঁছল। তখন সিনেমা ভেঙেছে। মানুষের ভীড় আর সাইকেল রিক্সার ভেঁপুতে বিরক্ত হয়ে কাছের গলিটায় ঢুকতে যাচ্ছে দেখল চায়ের দোকানে সুশীল আড্ডা দিচ্ছে। সে থমকে দাঁড়াল। তখনই খোকা এসে ওর সামনে ঝুঁকে বলল, "কেন এসেছ এখানে ? আমি জানতুম তুমি আসবে। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মান-সম্মানের কথা ভেবে ভেবে।"

বিনোদ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। আমার ছেলে, আমারই ছেলে খোকা। ওকি ভাবছে আমি ইতর ? মাথা নামিয়ে সে দ্রুত ভীড়ের মধ্যে মিশে যাবার জন্য লোকেদের ধাক্কা দিতে শুরু করল।

ফুটবল মাঠের ওধারে রেল লাইন। এ ধারে শিবমন্দির, বেতাপাড়ার গলি, মিউনিসিপ্যালিটির দীঘি, বি-ডি-ও অফিস তার পাশে পলিতের ঘর। রাস্তার ইলেকট্রিক আলো ঘরের দরজায় কোনক্রমে আসে।

খসখস শব্দ হচ্ছে। অন্ধকার ঘর থেকে হাতাওড়ি দিয়ে পলিতের বুড়ো বাপ বেরিয়ে এল।

"কে ?"

"আমি বিনোদ। রথতলার বিনোদ।"

বুড়ো আন্দাজে তাকাল। হাত দিয়ে মাটি খাবড়ে বলল, "বস। কি মনে ?"

"এমনি।"

"অঃ।"

মাথায় টাক। মুখ ভর্তি দাড়ি। গায়ের চামড়া ভাঙা পাথরের মত কর্কশ, কুঞ্চিত। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

"দু'দিন হয়ে গেল। একাদশী থেকে আজ। সবাই বলল, একটু আগেই দু'টার গাড়ির অনেকে ওখান দিয়েই হেঁটে গেছে, তখন কাউকে দেখেনি।"

বিনোদ টের পেল তার শীত করছে। এগিয়ে বুড়োর মুখোমুখি হয়ে বসল। ওর শরীর থেকে বন্য গন্ধ আসছে।

"আমাকে ওরা চলে যেতে বলেছে। নয়তো মার করে দেবে। ওরা এটা নিয়ে নেবে।"

"কোথায় যাবেন?"

আঙুল তুলে বুড়ো দূরের আবছা গাছের ওপারে রেল লাইনের দিক দেখাল।

"কেন?" ফিসফিস করে বিনোদ বলল।

ও এমনভাবে মুখ তুলল যেন বিনোদের কথাটার অর্থ জানতে চায়। তারপর মাথা নাড়তে শুরু করল। ওর ঘন বুক দাড়িতে ভরা মুখটা রাস্তার আলোয় বিষণ্ণ দেখাল।

"জানো, আমি আর কিছু বুঝতে পারি না, টের পাইনা। গলির একটা মেয়ে কাল ভাত দিল, খেলুম, স্বাদ পেলুম না। লম্বা ঘরে আচার দিয়ে খেলুম, তবু।" ছল ছল করে উঠল বুড়োর স্বর, "কাল সেজেগুজে বেরিয়েছিলুম, তাতেই সারারাত শুয়ে রইলুম। বুঝলে, আমার শীত করল না।"

বুড়ো হাতড়াতে লাগল। বিনোদ ডান হাতটা এগিয়ে দিতেই খপ করে ধরে কাছে টানতে লাগল। বিনোদ ঝুঁকে ওর বুকের কাছে মুখ এগিয়ে আনল।

"দু'টা পঁয়তাল্লিশের গাড়িতে চলে গেল, আমাকে ফেলে। ও কি আমাকে ঘেন্না করত? আমি আর কথা বলতুম না।" বুড়োর স্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

"আজ কিছু খেয়েছেন?"

কথাটার অর্থ বুঝতে বুড়ো আবার মুখ তুলল।

"ও আমার কথা একদম ভাবলই না।" বুড়োর নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়ল। বিনোদের মনে হল, চোখ দিয়ে জল নামছে। ভাল করে দেখার জন্য সে মুখটা বুড়োর মুখের কাছে আনল। মুখ দাড়িতে ভরা।

বিনোদ বন্য গন্ধ পেল। আপাতত আর ঘোর।

গাছের পাতা খসল। খসখস শব্দে তিতির ছুটে গেল। দূর থেকে ঘুঘুর দিকে মহিষের গলায় বাঁধা ঘন্টা বাজতে বাজতে চলে যাচ্ছে। উপরে মেঘহীন মসৃণ ঢালু পাথরে পশ্চিম থেকে রোদ পড়েছে। বাবা বললেন, "কর্ণা কোন দিকে বলতো।"

মা ঠিকুক তুলে একটা দিক দেখালেন। বাবা হাসলেন, "নহু তুই বল্।"

খোকার মত চারিধারে তাকালাম। তখন বাবা বললেন, "আয় আমরা খুঁজে বার করি, পারবি?" আমি বাবা নাড়লাম। বাবা আর মা ওধারে চলে গেলেন। চারধারে আলগা পাথর, হাঁটু সমান ঝোপ। একটু নিচে বড় বড় গাছ। মনে হল ওই দিকেই ঝর্ণা। পা টিপে নীচের দিকে নেমে এলাম। একটা উঁচু পাথরে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমনি বাবা মার হাত ধরে তাড়াতাড়ি করে নেমে আসছেন। আমায় দেখে হাত তুললেন। কাছে এসে বললেন, "নহু এখুনি ফিরতে হবে। এখানে কাল চিতাবাঘ দেখা গেছল। এক রাখাল বলল।"

কেয়ার সময় বলেছিলাম "তোমরা ঝর্ণা পেলে না," কিন্তু ওঁরা খুব উদ্বিগ্ন থাকায় জবাব দিলেন না। প্রায় নীচে পৌঁছে গেছি। তখন মনে হল কান্না-কাটিই কোথাও ঝর্ণা ঝরছে, শব্দ শুনতে পাচ্ছি। বাবাকে বললাম। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না, বেলা পড়ে আসছে, এখন ঝর্ণার ধারে যায় না। এখন বাঘে জল খেতে আসবে।" মা খুব শান্ত করে আমার হাত চেপে ধরলেন। তখন খুব সুন্দর সূর্যাস্ত হচ্ছিল। অনেক দূরে গিয়ে একবার, পিছু ফিরে তাকিয়েছিলাম। পাহাড়টা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। ওর মধ্যে ঝর্ণা আছে, সেটা আর দেখা হল না। তবু বিনোদ মুখটা আরো কাছে আনল। আঙুলটা বুড়োর চোখে স্পর্শ করিয়ে আলোর দিকে বাড়িয়ে দিল। চিকচিক করে উঠল জলটা।

বুড়ো মুখ তুলে তাকিয়ে। মনে হয়, বুনো ঘাড়ি, পাথরখণ্ডের মত কঠিন চাউনি। ঘাবা দিয়ে ঘরের অন্ধকারে খসখস শব্দ করে চলে গেল।

তখন দুটোন বাঁধ পার হয়ে, বিনোদ রেল লাইনের ধারে এসে দাঁড়াল। চীৎকার করতে করতে খোকা ছুটে আসছে "বাবা বাবা একি পাগলামি হচ্ছে।" সারাক্ষণ ও পিছু নিয়ে রয়েছে। বিনোদ ভাবল, ওকি আমায় এখনো ইতর ভাবছে। কিন্তু ছটা পঁয়তাল্লিশের ট্রেন তো আজ আর আসবে না।

আমাদের কথা

১৯৬১-র এপ্রিল-মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮) মাসে 'এক্ষণ' প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর নিয়মিত আমাদের দ্বিমাসিক পত্রিকাটি ১৯৬২-র আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বিশেষ শারদীয় সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়নি, কিছুকালের জন্যে এর প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়েছিল মাত্র।

যেখানে পত্রিকার প্রকাশ স্থগিত রাখা হয় ঠিক তার পর থেকে আবার 'এক্ষণ' প্রকাশ করা হলো, অর্থাৎ বর্তমান সংখ্যাটি 'এক্ষণ'-এর দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা। ধারাবাহিক লেখাগুলিকেও এ-সংখ্যায় যথারীতি ছাপা হলো। যে-সব গ্রাহকের চাঁদা দেওয়া ছিল তাঁদেরও যথারীতি 'পত্রিকা পাঠানো হলো। পত্রিকার বিভিন্ন রচনার মধ্যে যে একটি বিশেষ চরিত্র অল্প সময়ের মধ্যেই বৃহৎ এক পাঠকগোষ্ঠীর অনুমোদন ও প্রশংসা অর্জন করেছিল ঠিক সেই ধারাই মোটামুটি অনুসরণ করার চেষ্টা হলো। এক কথায়, মাঝখানে কিছু সময় পার হয়ে গেছে মাত্র, 'এক্ষণ' পূর্বাপর তার সর্বাঙ্গীন চারিত্র বজায় রেখে পুনঃপ্রকাশিত হতে আরম্ভ করলো। আশা করি, আমাদের লেখক, পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপন-দাতা ও শুভানুধ্যায়ী সকলের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি আগের মতই আমরা পাবো।

এই সংখ্যা সম্পর্কে দু একটা কথা। এ-বছরে আমাদের দেশের ও অন্য দেশের কয়েকজন মনীষীর জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। তাঁদের সকলের বিষয়ে 'এক্ষণ'-এর পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রবন্ধ ও আলোচনা প্রকাশ করা হবে। বিশেষ করে শেক্সপীয়র-বিষয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের পরামর্শ অনেকে আমাদের দিয়েছিলেন। কিন্তু এ-বছরের বিভিন্ন সংখ্যায় শেক্সপীয়র প্রসঙ্গ আলোচিত হবে, এই পরিকল্পনাই আমাদের কাছে সব চেয়ে গ্রহণীয় মনে হয়েছে। একটি বিশেষ সংখ্যা শেক্সপীয়র আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখার চেয়ে এ ভাবেই আমাদের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করবো। আমাদের পূর্ব-পরিকল্পনা মত শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের যে অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, এ-সংখ্যায় তার তৃতীয় অঙ্কটি ছাপা হলো। এ ছাড়া, শেক্সপীয়রের কয়েকটি সনেটের অনুবাদ ও হ্যামলেট নাটক সম্পর্কে একটি মূল্যবান প্রবন্ধও এ-সংখ্যায় স্থান পেলো।

'একক'-এর একটি পরিকল্পনা অনুসারে আমরা পুনর্মুদ্রণ পর্যায়ে পুরনো ও দুষ্প্রাপ্য লেখা নিয়মিত ছেপে এসেছি। এটি অনেকের কাছেই আকর্ষণীয় বলে বোধ হয়েছে। বাংলা রঙ্গালয়ের আদিযুগের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বিনোদিনীর 'আমার কথা' বইটি আমরা ধারাবাহিকভাবে ছাপছিলাম। এ-সংখ্যায় তার শেষাংশ ছাপা হলো। আগামী সংখ্যায় আমরা আর একটি মূল্যবান বই সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ করবো। আশা করি পাঠকেরা সেটি নতুন করে পেয়ে আনন্দিত হবেন।

ইতিপূর্বে 'একক'-এ গল্পের অভাব নিয়ে অনেকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরা এ-বিষয়ে সচেতন থাকলেও নিরুপায় ছিলাম। এ-সংখ্যায় একালের দু'জন খ্যাতিমান লেখকের দুটি গল্প ছাপা হলো। আগামী সংখ্যাগুলিতেও নিয়মিত গল্প দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করবো।

কবিতা সম্পর্কে আমাদের সুচিন্তিত পরিকল্পনা আছে। এ-সংখ্যাতেও পাঠকের' তা লক্ষ্য করে থাকবেন।

স্থানাভাবের জন্যে অনেকগুলি লেখা এ-সংখ্যায় দেওয়া গেল না। এমন কি, লেখা হাতে থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থ-সমীক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগও বাদ দিতে বাধ্য হয়েছি— এ জন্যে আমরা একান্ত কুণ্ঠিত বোধ করছি। আগামী সংখ্যায় পত্রিকাকে এদিক থেকে ত্রুটিহীন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

চিত্রকলা, নাটক বা চলচ্চিত্র ইত্যাদি বিষয়ে অথবা সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট বিভাগ পত্রিকায় নিয়মিত রাখার কোন পরিকল্পনা আমাদের নেই। কিন্তু আমাদের কালের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিষয়কেই যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার সদিচ্ছা রইলো। সর্বদা সকল বিষয়কে স্থান দেওয়া উপযুক্ত লেখার অভাববশতই সম্ভব হয়ে ওঠে না, এ জন্যে বিজ্ঞ পাঠকদের কাছে আমরা মার্জনাপ্রার্থী।

আমাদের দেশ ও কালের সম্পর্কে অভিনিবেশ, সংকীর্ণতার মূল্যবোধকে ছিনিয়ে আনার দুরন্ত প্রয়াস, সুস্থ ও শুভ জীবনবোধকে প্রতিষ্ঠার মহৎ আদর্শ যদি আমাদের পত্রিকায় যথাযোগ্য প্রতিফলিত হয় তাহলেই আমাদের শ্রম ও উদ্যোগ চরিতার্থ হবে বলে আমরা মনে করি। এই সমস্ত বিষয়ে প্রত্যেকটি পাঠকের মতামত ও পরামর্শ আমরা সাগ্রহে কামনা করি।

পরিশেষে, 'একক' যতদিন মুদ্রিত ছিল তখন যে সমস্ত শুভানুধ্যায়ী পাঠক ও বন্ধুগণ পত্রিকা বন্ধ থাকায় অসুখী হয়ে আমাদের প্রতিনিয়ত প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছেন এবং আবার পত্রিকা বের করতে অবিরত তাগাদা করেছেন তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সম্পাদক

প্রবীর ঘোষ কর্তৃক ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ১/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত এবং ৬, রাজারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২ হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

উইলস্-এর

উড্‌বাইন্

স্বাদে সেরা বিখ্যাত সিগারেট

৩৫ পয়সায় দশটি

উইলস্-এর

উড্‌বাইন্

WIC-2 BEN

দ্বিতীয় বর্ষ এবং পঞ্চম সংখ্যা

সূচীপত্র

পুনর্মুদ্রণ

রবীন্দ্রনাথের ছবি প্রসঙ্গে — কৃষ্ণকৃপাল ভট্টাচার্য

অনুবাদগল্প

ওথেলো — সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

শেক্সপীয়রের কমেডি ও নারীচরিত্র — সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুবাদ

ম্যাকবেথ : দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য — রাম বসু

চিত্রকলা

চিত্র-দর্শকের ভূমিকা — মণি কাঞ্জিলাল

কবিতা

অসমছন্দে অভিক্ষেপ — অশোক পালিত

প্রবন্ধ

'ছত্তা' ও বিরূপ মানসিকতা — গৌতম সান্যাল

লোক-গীতি

ব্রিটেনের আইরিশ গান — রমেন রায়চৌধুরী-সংগৃহীত

গল্প

ঘুড়ি — বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থ সমীক্ষা

একালের কবিতা — রণজিৎ সিংহ

সম্পাদকীয়

শশিভূষণ দাশগুপ্ত স্মরণে

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্মালা আচার্য

দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

বিংশতিবর্ষ বয়োক্রম আমার যেন শীতবাত যারা আমাকে করিলে আমি স্বধর্মচ্যুত হইয়া খ্রীষ্টের উপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিলাম। তৎকালে আশা ছিল, যে কত বিবি আমার নয়নভঙ্গির চাতুর্য্যে মোহিত হইয়া প্রাণনাথ করিতে ব্যস্ত হইবে, কত ইংরাজ আপনপ্রার্থিত প্রিয়তমার অনাদরে হতাশ হইয়া অজস্রপাত ও আমার শাপদান করিবে এই সকল অমল মনোরথে সমাকৃষ্ট হইয়াই আমার খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হয়। যদি প্রভুর কথা জিজ্ঞাসা কর, প্রভু আমার অন্য ধর্ম্মে যেমন, খ্রীষ্টধর্ম্মেও সেইরূপ অর্থাৎ কিছুই নহে। আমি মাতার চরিত্র উচ্চারণ করিয়া শপথ করিতে পারি, যদি পৃথিবীর কোন ধর্ম্মে আমার বিশ্বাস থাকে। আমি ধর্ম্মকে ঐহিক মহাযাতনা-পুঞ্জের উপায় চিরকাল মনে করিতাম, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা স্থির নিশ্চয় আছে, যে খ্রীষ্টধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত আর সমুদয় ধর্ম্ম অপেক্ষা অল্প অনুপকারী। এই ধর্ম্মের অবলম্বী জাতিরা এক্ষণে শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাদিগেরই অধিষ্ঠান এখন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রিয়নিকেতন হইয়াছে। কিন্তু যাহারা ইহাকেই খ্রীষ্টধর্ম্মের ঐশ্বরিকতার যুক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করে, আমি তাহাদিগকে মনের সহিত ঘৃণা করি।

আমি খ্রীষ্টান হইয়া যে সকল আশা সিদ্ধ করিব মনে করিয়াছিলাম, তাহার একটিও সফল হইল না। কোন বিবিই প্রণয়িভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। বাঙ্গালি বলিয়া ইংরাজেরা ঘৃণা, এবং ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া স্বজাতীয়েরা পরিহার করিতে লাগিলেন। তথাপি আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ হইল না। প্রত্যুৎপন্নমতি ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত শরীরের সাহায্যে আমার প্রফুল্লতার কোন হানি হয় নাই। মিশনরিরা যে অত্যল্পমাত্র বৃত্তি দিতেন, তাহাতে আবশ্যক ব্যয়ও নির্ব্বাহিত হইত না। অতএব বাঙ্গালাভাষার একজন লেখক হইয়া বসিলাম। উৎকৃষ্টই হউক, আর অপকৃষ্টই হউক আমার রচনাদ্বারা আপনার অনেক আনুকূল্য হইল, লোকের উপকার হইয়াছে কি না তাহা লোকেই বলিতে পারে

আমার সে বিষয়ে অবধান ছিল না. পয়সার দরকার বড়, যাহাতে হউক পয়সা পাইলেই হইত। এইরূপে কিছুকাল কাটাইলাম। কিন্তু যৌবনের উত্তপ্ত রক্ত ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। সচ্চরিত্র ও সদাশয়স্বভাব হইয়া বিস্তীর্ণ অর্ণবাম্বরের এক কোণে অজ্ঞাতরূপে বিলীন হইতে হইবে এই ভাবনা আমার বিষের ন্যায় হইল। মন কিছুতেই স্থির থাকিল না। বাঙ্গালাভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া বিখ্যাতি লাভ করিতে অভিলাষ ছিল না, অতএব চেষ্টাও হইল না। আমি বাঙ্গালার অধিবাসী, ভাষা, এমন কি সকলই অতিশয় ঘৃণা করিতাম। অতি পাপাচার কুকুরের কতকগুলি স্বজাতীয় হইয়াছি এই ভাবিয়াই আমার কত ক্ষোভ হইত, আমার তাহাদের দেশে তাহাদের ভাষায় কিছু আনুকূল্য করিয়া তাহাদিগের মনোরঞ্জন করিব বরং মলিনগাত্র বীভৎসাচার নগ্নাঙ্গ পিশাচদিগের সহবাস তাহা অপেক্ষা প্রার্থনীয়, আমার তখন মনের গতি এইরূপ ছিল। এইরূপ বিদ্বেষী হইয়া এদেশে থাকিতে মন সরিল না। লেখনী-দ্বারা যাহা উপার্জন করিয়াছিলাম, তাহাদ্বারা বোম্বাই নগরাভিমুখ এক ফরাসি জাহাজে এক পূর্ব ভাড়া করিলাম এবং স্থির করিলাম যে, ইংরাজেরা ঘৃণা করিয়াছে, বাঙ্গালিদিগের সমাজও পরিত্যাগ করিলাম, অতএব এক্ষণে হাইদ্রের অধিরাজ্যে আপনার সৌভাগ্য উপার্জন করিব। এইরূপ অধ্যবসায়ে আরূঢ় হইয়া জোয়েলনামক জাহাজে অধিরোহণ করিলাম। গঙ্গার শুভ্র জলে ভাসিয়া জাহাজ দুই দিনেই সমুদ্রে উপস্থিত হইল। সাগর-দ্বীপ নয়নগোচর হইল। হিন্দুদিগের কুসংস্কার ও তীর্থযাত্রার এই স্থান সাগরের তরঙ্গে সঙ্কিত শিক্ততোচ্ছ্বাসরূপ ধারণ করিয়া আছে। শীতাতপ অতি অস্বাস্থ্যকর। সকলেই আপনার ভ্রাতা, বা ভগিনী বা অন্য কোন পরিবার গঙ্গাসাগর হইতে যেরূপ বিবর্ণকপোল ও ক্ষামাঙ্গ হইয়া প্রত্যাগত হয়েন তাহা দেখিয়া সাগরদ্বীপের শীতাতপের অপকর্ষ অনুমান করিতে পারেন।

আমাদিগের জাহাজে সপ্তদশবর্ষবয়স্কা এক ফরাসি-যুবতী ছিলেন। তাঁহার নাম জুলিয়া। তাঁহার স্বামীও এই জাহাজে ছিলেন। স্বামীর বয়ঃক্রম চল্লিশ বর্ষের ন্যূন ছিল না। বুঝিতেই পার, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীর প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি সুরূপা। তাহার অলকগুলি কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোলদেশে পতিত হইত যে দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নয়নযুগল উজ্জ্বল বিশাল ও ভ্রমরের ন্যায় নীল। কপোলতল এরূপ স্বচ্ছ, যে মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়া অবধি মুখমণ্ডল-সুলভ ভাবের

অনধীন থাকি নাই। জুলিয়ার স্বামী আমার নবীন বয়স ও নির্জন ব্যবহার দেখিয়া অবশ্যই উচিত এবং কোন বিষম ঘটনার শঙ্কায় শঙ্কাকুল থাকিতেন। তিনি আমার প্রতি অতি অপরিচিতভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তথাপি তাহার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন স্পষ্টরূপে নিষেধ করিতে পারেন নাই। ইউরোপের প্রথা এদেশের মত যুবতী স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে না, অতএব আমি জুলিয়ার প্রতি সিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে বিমুখ হই নাই। এইরূপে আমাদিগের পথ অতীত হইতে লাগিল। কোন দিন একটি হাঙ্গর, কোনদিন জলরাক্ষসের মস্তিষ্কের চূড়া, কোন দিন বহুলীবন্দরে বাঙ্গলের বন, কোন দিন সকেন ঊর্দ্ধিমালার আবৃত উপকূলে অবস্থিত মান্দ্রাজনগরের প্রাসাদাগ্র এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা বঙ্গোপসাগরের নীল জল ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলাম।

একদিন অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হইল, চন্দ্রের পরমাণ রশ্মিজাল সমুদ্রের উপরিস্থলে চিক্ চিক্ করিতেছিল, বরুণদেব যেন শয়ান ছিলেন, অত্যল্প বাতাঘাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লহরী সঞ্চালিত হইতেছিল, জগৎ স্তব্ধীভূত বোধ হইল, জলের মধুর কলকল ধ্বনি কর্ণে সুস্বচ্ছন্দে আঘাত করিতেছিল, এই সময়ে আমি জাহাজের ছাদে আসিয়া প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতেছিলাম। জুলিয়া হৃৎসৌন্দর্য্য পরিক্ষেপে শ্রীখাপনয়নার্থ সেই স্থানে আসিয়া বসিল। জাহাজের আর সকলে নিদ্রাগত বা কার্য্যব্যাপৃত ছিল। সেই কালে জুলিয়ার হৃদ্যোন্মাদী যৌবনশোভা দর্শন করিলে কেই বা অপহৃত-জ্ঞানস না হইত। মনে করিয়া দেখ, আমি কিরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। আবার জুলিয়া বলিল, "সমুদ্রোপরি জ্যোৎস্না কি মধুর।" "মধুর" এই শব্দটি এরূপ মধুরভাবে উচ্চারিত হইল যে আমি কি বলিব। আমি কহিলাম, "তাহার সন্দেহ কি। আমার এক অনির্ব্বচনীয় শান্তভাব সর্ব্বব্যাপী হওয়াতে এই কাল অতি মধুর হইয়াছে।" আমরা এইরূপে বিশ্রব্ধভাবে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম, এই কালে তত্র মেঘাবরণদ্বারা শশী আবৃত হইলেন। আমি পূর্ব্বোক্ত প্রলোভনের প্রতিরোধ করিতে পারিলাম না। জুলিয়ার করকমল ধারণ করিলাম। ইহার অল্পেই সমীরণ প্রবল হইয়া উঠিল, উত্তরে কপিলবর্ণ বিদ্যুৎ উদ্ভিন্নিত হইতে লাগিল, তরঙ্গের উৎসেধ কিছু কিছু বাড়িতে লাগিল, জলের শব্দ কোলাহল হইয়া উঠিল, একত্রবাশীকৃত পালগুলি ফুল্লকুন্দ ইত্যাকার বিনাদযুক্ত হইল, অন্তরীক্ষ পরিবর্ত্তমান কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশিদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিল।

সূচায়িত করিল, চন্দ্র যে স্থানে অবস্থিত হইয়াছিলেন, সেই তাস তাঁহার প্রভা-নিচয়দ্বারা চিহ্নিত ছিল. কিন্তু এক্ষণে তাহা দর্শনপথ হইতে বিনষ্ট হইল। এখন সম্পূর্ণ অন্ধকার হইল। ঝঞ্ঝা প্রচণ্ডবেগে মাস্তলে আঘাত করিতে লাগিল, সমুদ্র প্রক্ষোভিত হইয়া ঘনোদ্বিঘূর্ণ কল্লোলদ্বারা জাহাজকে তাড়ন করিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। গর্জ্জনকারী তরঙ্গেরা একবার তরীর ছাদ নিম্ন হইয়া পুনর্ব্বার শিখরের ন্যায় উচ্চ হইল এবং বাতাবেগে উদ্ভীন ফেনরাশিদ্বারা আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল। বিদ্যুৎ নয়ন প্রতিঘাত করিবার ক্ষণকাল পরেই বংশকোটনাদ বজ্র মাথার উপর দিয়া গড়াইয়া কর্ণ বধির করিল। ঘূর্ণিবায়ু তরঙ্গযুক্ত আর্ত্তরবে জাহাজের সকলে উপরে উঠিয়া আইল। জাহাজ তরানকরূপে বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। এক একবার এক পার্শ্বে নত হইয়া যেন আমাদিগকে সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ উর্ম্মির গ্রাসে ফেলিয়া দেয়, আবার অপর দিক্ হইতে তরঙ্গবেগ এমনি সবেগে আঘাত করে, যে তৎক্ষণাৎ প্রতিকূল দিকে অবনত হয়। একবার এরূপ ঘটিতে ও শীঘ্র প্রক্ষিপ্ত হইল, যে ঘূর্ণিয়া ঘুরিয়া সাগরগর্ভে পতিত হইল। ক্ষণকাল পরেই আবর্ত্তযুক্ত পয়োরাশি তাহাকে বেষ্টনপূর্ব্বক রসাতলে লইয়া গেল। আমার সেই সময়ের আন্তরিক কষ্ট মুখাবান মহাভূতদিগের প্রচণ্ডতাকে অতিক্রম করিয়াছিল। ভাবিলাম এখনি ক্রিয়ার অনুবর্ত্তী হই, কিন্তু গূঢ় জীবনতৃষ্ণা সে ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করিল। জাহাজের লোকেরা বা তাহার স্বামীও তখন জানিতে পারে নাই, যে অত্যুজ্জ্বল ভূতপটি বরুণদেবের বলি হইয়াছে, আমিও প্রকাশ করিলাম না। বায়ু উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল। আমি মাস্তল না ধরিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। এই সময়ে আমার বিপদ্‌গ্রস্ত জাহাজের দুর্দ্দশা মনে পড়িল। আমি যেন স্বচক্ষে দেখিলাম, যে যাত্রীরা ভূখার কাতর হইয়া পরস্পরকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে,যেন আমার ভূৎক্ষাম দেহ হইতে মাংস কর্ত্তনপূর্ব্বক কটাহে সিদ্ধ করিতে দিয়াছে। উঃ কি ভয়ানক! আমি কাল্পনিক ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, যদি জাহাজ রক্ষা পায়, তবে সেই ধন্য হইবে, যদি রক্ষা না পায় তবে অবশ্য মৃত্যু। এই চিন্তিয়া জাহাজের ছাদে যে বোট থাকে, তাহা সমুদ্রে সত্বরে ভাসাইলাম এবং তৎক্ষণাৎ তাহার উপরে লাফিয়া পড়িলাম। তরঙ্গের বেগে বোট বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইল। আমি তাহাকে বায়ুর গতিতে সমর্পণ-পূর্ব্বক স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিলাম। মনে করিতে পার, যে আমার তখন ভয়ের সীমা ছিল না, কিন্তু আমার যাহা কিছু ভয় ছিল, সে সকলই মানুষ হইতে।

আমি মহানুভবের প্রকোপে আত্মসমর্পণ করিতে কিছুমাত্র ত্রস্ত হই নাই। এরূপ শান্ত ও গম্ভীরভাবে অবস্থিত রহিলাম, যে একজন আমেরিক ষ্টীয়ানের দেখিয়া ঈর্ষা হইত। প্রকৃত ষ্টীয়ানের পরকালে শান্তিভোগের আশাযারা চিত্ত সুস্থির থাকিতে পারে। সে সুখস্বপ্নে পরিক্রম করিবে, স্বচ্ছ গিরিনদীর তটজাত সুস্নিগ্ধ পুষ্পের আঘোণে পরিতৃপ্ত হইবে, জলপিতার গভীরান্ প্রভাষার দৃশ্যের সৌম্য কান্তি দ্বারা নয়ন সার্থক করিবে। এবম্বিধ মহামনোরথ অবশ্যই মানুষের লঘু চিত্তকে নিবৃত্তি করিতে পারে। কিন্তু আমার সে সকল আশা ছিল না, আমি জানিতাম, যে জলধির অপরিচ্ছন্ন ও বস্তিহীন বিকল হইলেই দৈহিক ও মানসিক জ্ঞান বিলুপ্ত হইবে, শরীর জলে পচিয়া স্ফীত হইবে, তাহার কিয়দংশ জলচরেরা কতক বা খেচরেরা ভক্ষণ করিবে ইত্যাদি। অতএব আমি দেহের অসারতা, আত্মার অত্যাত্মভাব ও পরলোকের অঘটনীয়তা জানিয়া কি নিমিত্ত খেদ করিব? যদি কিছু ইচ্ছা হইত, তবে জুলিয়ার স্নেহস্পর্শ, তাহার মুখদর্শন ও তাহার সহিত প্রণয়ালাপদ্বারা বিপদের লঘুকরণ। কিন্তু হায় সে অতীত—জলসাৎ হইয়াছে। এই ভাবিয়া আমার তখন শুটিকতক অশ্রুবিন্দু নির্গত হইয়া কপোল আর্দ্র করিল। বায়ু পূর্ব্বদিক্ হইতে বহিতেছিল। এই নিমিত্ত মনে করিয়াছিলাম, যে আমার বোট ভাসিতে ভাসিতে ভারতবর্ষের পূর্ব্বউপকূলে উপস্থিত হইবে। কিন্তু সারারাত্র বোটখানি একবার অত্যুচ্চ জলস্তম্ভোপরি উঠিল আবার মহাবেগে প্রালেয়াক্ত তরঙ্গের গহ্বরে প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। আমার অনেকবার ঘুমি হইল, তাহারা জমে নিস্পন্দ হইয়া পড়িলাম। এখন নয়ন না করিলে চলিল না। দৌর্ব্বল্যে চক্ষু মেলিতে পারিলাম না। এক একবার চাহিলে কেবল বিদ্যুতের প্রভা লোচনকে পরিপূর্ণ করিত। জমে আন্তরিক স্ফূর্ত্তি অবসান হইয়া আসিল, শিরোদেশের অভ্যন্তর যেন কেহ বরফের পাতে মুড়িয়া দিল, এই শীতানুভব ক্রমশঃ উপস্থিত হইলে চক্ষু বাধিত হইয়া অন্ধকার করিল। বোট স্থির আছে, কি চলিয়া যাইতেছে কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। ক্ষণার গর্জ্জন ও জলের কোলাহল অতি সূক্ষ্মরূপে শ্রবণগোচর হইতে লাগিল, গাত্র কাষ্ঠের কঠিন স্পর্শেও ঘর্ষণক্রিয়াযুক্ত হইল। আমি সেই অবধি কি হইল তাহা জানি না। তখনই অচেতন হইলাম।

আমার পুনশ্চেতনাসময়ে দেখিলাম, যে দুই নীলবর্ণ উজ্জ্বল নয়ন আমার উপর চাহিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে জানিলাম, যে মুখ অতিকোমল-কপোল-যুক্ত, ললাট সুবর্ণের শুভ্রতা ও বক্ষঃস্থল কাঁচলি দ্বারা আবৃত। পার্শ্বে

এক দৃশ্য আমাকে অকস্মাৎ মোহিত করিতেছে। আমার প্রথমে এই দর্শন স্বপ্ন বোধ হইল, কিন্তু দেখিলাম অতি সূক্ষ্ম পদার্থগুলিও পারমার্থিক অবস্থায় যেরূপ থাকে, সেইরূপেই আছে। আমি অতিশয় বিস্ময়ের সহিত পুরোবর্তিনী যুবতীর মুখে দৃষ্টিপাত করিলাম। সে মধুরস্বরে বৃদ্ধাকে কিছু বলিল, আমি তাহার বিন্দু-বিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না। পরে আমাকে উঠাইবার নিমিত্ত হস্ত ধারণ করিল। আস্তে আস্তে উঠিয়া দেখিলাম যে আমি সমুদ্রোপরে আপনার বোটেই রহিয়াছি। সমুদ্র শেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে নাগরের শান্ত জলে উপকূলের তরুবর্গের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তথাকার উপকূল শিলাময় এবং স্থানে স্থানে ছই তোলা অপেক্ষাও অধিক উচ্চ, ইহার প্রায় মুক্তাপি উঠিবার উপায় নাই। আমার বোট যে খানে লাগিয়াছিল, তথায় এক কৃত্রিম খনিত সোপান-শ্রেণী ছিল। এই সকল সোপান আস্ত পাথর কাটিয়া রচিত হইয়াছে। জলে থাকিলে একেবারে ছটি তিনটির অতিরিক্ত সোপান দেখা যায় না। ফলতঃ ঠিক্ কলিকাতার বহুবেটের সিঁড়ির মত। সমুদ্রের পাকের উপর নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি বৃক্ষ দেখা গেল। বোট যেখানে লাগিয়াছিল, তথায় ভূমির কিয়দংশ জলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তরীপের আকার ধারণ করিয়াছে। এই অন্তরীপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপ উদ্ভূত হইয়া স্থলভাগ হরিবর্ণ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আকন্দের কাল-রেখা-শবলিত শ্বেত কুসুম বিকসিত হইয়াছে আমি যুবতীর স্কন্ধে তরাপর্ণ-পূর্বক দুর্বলভাবে স্থলে উত্তীর্ণ হইয়া বহুলক্ষিতে সোপানে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। এই স্থানের পাড় অপেক্ষাকৃত নিম্ন ছিল, শীঘ্র উঠিতে পারা গেল। দেখিলাম স্থান অতি রমণীয়, স্থলের দিকে বরাবর চন্দন, তাল, এলালতালিঙ্গিত চূত ও তাম্বূলবল্লীপরিণদ্ধ সুপারি, এই সকল বৃক্ষের অতি বিস্তৃত অরণ্য হইয়াছিল। চক্ষু যত দূর গেল, কেবল নানা বর্ণে বিচিত্রিত পত্রপুঞ্জই লক্ষিত হইল। সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবলোকন করিলাম, যে আমাদিগের নিম্নে জলরাশি অক্লেশ ও অচল শিলা-বন্ধের উপর শনৈঃ শনৈঃ আঘাত করিয়া বারম্বার অপসৃত হইতেছে। পাড় ঠিক খাড়াভাবে সমুদ্রের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। আমি অতিশয় দুর্বল ছিলাম, যুবতীর অবলম্ব পাইয়া সহকার বৃক্ষের ছায়াযুক্ত একটি ক্ষুদ্র পথ অবলম্বন করিলাম। তখন দিনমণি প্রখরতাধারণে উন্মুখ হইতেছিলেন। এমন কালে এই শীতল পথ পাইয়া আমার অনেক নির্বৃতি হইল। আম্রবনের ঘন পল্লবে পথ অন্ধকারময় ছিল। বায়ু অতি মৃদুভাবে পত্রপুঞ্জে প্রবেশিয়া এক প্রকার হর্ষসূচক শব্দ আবিষ্কৃত করিতেছিল।

আমার ঘনসন্নিবিষ্ট পাষাণিক নমুনার উত্তাপ এই শীতল স্থানে প্রবেশ করিবামাত্র অপগত হইল। দুই ধনি পথ এই ভাবে অতিক্রম করিয়া সম্মুখে অতি প্রাচীন ও শক্ত এক অট্টালিকা দেখিলাম। ইহার সর্ব্বাংশ দৃঢ় পাষাণে নির্ম্মিত। ভিত্তিমিত কখন চুনকাম বা বর্ণলেপ প্রয়োজন করে না। পাষাণনির্ম্মিত কড়ি-কাঠের অগ্রভাগ ভিত্তি হইতে বহির্গত আছে। অত্যুচ্চ তোরণে দুই লৌহকীল-সম্বদ্ধ কপাট লম্ব আছে। কোন প্রকার শস্ত্রই তাহাকে ভেদ করিতে সমর্থ নহে, এমন কি আমার বোধ হইল কামানের গোলাও শীঘ্র কিছু করিতে পারে না। অট্টালিকা তাদৃশ আয়ত নহে, কিন্তু অত্যন্ত উচ্চ। প্রবেশের একটি ব্যতীত আর নাই। আর চারি দিকে কোন স্থানেই জানালা নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে গবাক্ষ আছে। আমি দুই অবলার রক্ষিত ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটি অর্দ্ধবয়স্ক পরিচারিকা দুইটি তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিল। তাহারা আমাকে উপরিতলে লইয়া গিয়া এক কোমলশয্যাযুক্ত পর্য্যঙ্কে শয়ন করিতে ইঙ্গিত করিল। আমি হস্তসংজ্ঞাদ্বারা জানাইলাম, যে আমার শয়ন করিতে অভিলাষ নাই অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে। তাহারা বুঝিতে পারিয়া কতগুলি ভর্জ্জিত জন্তুর ও চিনি-বিরচিত ছাগছুগ্ধের সর রৌপ্য পাত্রে আনিয়া দিল। আমার বাস্তবিক ক্ষুধা হইয়াছিল, উৎকর্ষ অপকর্ষ বিবেচনা না করিয়া খাইতে লাগিলাম। আহার শেষ হইলে অত্যন্ত নিদ্রা উপস্থিত হইল, অতএব সেই পর্য্যঙ্কেই শয়ন করিলাম।

প্রায় সন্ধ্যার সময় আমার জাগরণ হইল। তখনও দেখিলাম পার্শ্বে যুবতী উপবিষ্ট আছে। তাহার আকার দর্শনে নিতান্ত অচতুরও পূর্ব্বরাগের চিহ্ন দেখিতে অসমর্থ হইত না। তাহার নয়ন বারম্বার আমার প্রতি প্রেরিত হইয়া সংপতিসময়েই নিবর্ত্তিত হইত, এবং তৎক্ষণাৎ কপোলতল ব্রীড়াচিহ্নস্বরূপ পাণ্ডবাভায় ঈষৎ রঞ্জিত হইত। কিন্তু কথা কহিবার পথ ছিল না। মানুষের সর্ব্বস্বস্বরূপ জিহ্বা থাকিলেও আমাদিগের পক্ষে তাহার অসদ্ভাব হইল। বাস্তবিক সে অতি মধুরদর্শনা। আমার ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে উদ্ভবণ হইয়াছে তাহার কিছুই নির্ণয় ছিল না অতএব সে কোন্ দেশীয় কামিনী তাহা প্রথমে জানিতে পারি নাই। তথাপি তাহার সুকোমল অঙ্গ, চিক্কণ কপোলযুগল, কুঞ্চিতায়তমৃদু নয়নপল্লব, এবং সংস্কৃতকবিদিগের সতত বর্ণিত সুবর্ণতুল্য দেহপ্রভা, এই সকল দেখিয়া এক জন ভারতবর্ষীয়ের মন অনায়াসেই অপহৃত হইতে পারে। যে আমি গতরাত্রে ধূলিধূসর বর্ণবাত্যার অনুগামী হইতে চাহিয়াছিলাম, এখন সেই সময়ের পর চল্লিশ ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই সেই আমি আর এক যুবতীর প্রণয়

বলবান হইতে পরাঙ্মুখ হইলাম না। ইহারই নাম মানুষের অচঞ্চলতা, ইহারই নাম মানুষের জিতেন্দ্রিয়তা, আর ইহারই নাম মানুষের একনারীব্রতত্ব। যে মূঢ়জনকর্তৃক পরার্দ্ধ বার জলতে উদ্ঘোষিত প্রণয়সর্বস্ব, যদি তোমার অর্থ এই হয়, যদি উহার নিগূঢ় চরিতার্থতা কথাই প্রণয়শব্দবাচ্য হয়, যদি কবিরা যে সকল লোভনীয় মনোরম প্রণয়বার্তার বর্ণন করেন, সে সমুদয়ই অযথার্থ ও কল্পনা-সম্ভবিত হয়, তবে যেন উত্তরকালে মুখাপায় কেহ তোমার অনুবৃত্তি করে না। আমি তখন ধর্মবোধকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলাম, যে, এখন যে আমার মনোহরণ করিতেছে, সে আমাকে সাগরের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছে, অতি বিপদের সময় আশ্রয় দিয়াছে, আমাকে অপ্রার্থনায় গৃহের অতিথি করিয়াছে এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আপনার যৌবন ও সুখ আমায় আহরণ করিবার অভিলাষ দেখাইতেছে। ঈদৃশ উপকারী জনের প্রত্যুপকার না করিলে মনুষ্য নামের অযোগ্য হইতে হয়। আমার প্রত্যুপকারই কেবল বধূর, তাহার সহিত অবশ্যম্ভাবীর সূত্রে বদ্ধ হইয়া চিরকাল সুখ সম্ভোগ। আমি এই সকল ভাবিয়া তৎকালে ধর্মকে ফাঁকি দিলাম।

যুবতীর প্রযত্নে ও বৃদ্ধার পরিচর্যায় দিন চারি পাঁচে আমার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ভূত হইল। আমি তাহাদিগের ভাষার দুই একটি কথা বুঝিতে সমর্থ হইলাম, কিন্তু যুবতী কোন্ জাতীয় রমণী, সে কিরূপে যৌবনে এরূপ স্বতন্ত্র হইয়াছে, তাহার অট্টালিকা কোন নগরের সন্নীপবর্তি কি না, আমি ভারতবর্ষের কোন্ স্থানে আছি, এই স্থান জনপদ কি অরণ্যময় এই সমুদয় জিজ্ঞাস্য উত্তরকালীন অবস্থার ন্যায়, স্বপ্নের পূর্বশেষ দশার ন্যায়, ঈশ্বরের ন্যায়, চন্দ্রলোকের অন্তরস্থরহস্যের ন্যায়, আমার নিকট অপরিজ্ঞাত ও অস্পৃষ্ট রহিল। প্রতিদিনই পূর্বনির্দিষ্ট গৃহের পর্যন্তে উপবিষ্ট হইয়া বিভিন্নিত নানা শস্যাবলী দেখিতে লাগিলাম, জনার ভাজা ও ছাগমাংসের সহ খাইতে লাগিলাম, এবং বৃদ্ধা ও যুবতীর পরস্পর কথোপকথন শ্রবণ করিয়া আপনার ভাষাজ্ঞানের কিছু কিছু আধিক্য করিতে লাগিলাম।

সোমের দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইল। যুবতী আমার প্রতি সেইরূপ প্রেমভাবে দৃষ্টিপাত করে, আমিও তাহার প্রতিদান করি। কিন্তু এই পর্যন্তই সেব। আমি এখন জনে তাহার ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে শিখিলাম। তাহাদিগের মুখে জানিতে পারিলাম, যে সেই অট্টালিকা এক জন পরিব্রাজকের ছিল। পরিব্রাজক বহুকাল স্ত্রিবাভোগ মাসের অধীন থাকিয়া ঐ স্থানে আপনার

পিরিচুর্ণ নির্মাণ করিয়া বাস করিত। যুবতী তাহারই দুহিতা, নাম কমলাক্ষী। ঐ অট্টালিকা হইতে ত্রিবাঙ্কোর নগর অধিক দূরবর্তী হইবে না, অধিকতঃ ছয় দিনের পথ। এতও হইত না যদি তথায় যাইবার কোন সুপথ থাকিত। চারি দিকে অনেক ক্ষুদ্র শৈল থাকাতে প্রপাত, অরণ্যশ্রেণি, গিরিনদী ইত্যাদি দুর্গম স্থান পার হইয়া ঐ স্থান হইতে ত্রিবাঙ্কোরে যাওয়া যায়। সমীপে লোকালয় নাই, কেবল পল্লিসার একাকী বাস করিত, সে এবং তাহার ভার্যা লোকান্তরিত হইয়াছিল তদনুসারে কমলাক্ষী গৃহস্বামিনী হইয়াছে। তাহাদিগের ক্ষেত্র ছিল তথায় উদ্ভিজ্জ আহার উৎপন্ন হইত, ছাগযূথ ছিল, তাহার দুগ্ধ পরিপোষক ভোজন হইত। পূর্বোক্ত স্ত্রী এই দুহিতার তত্ত্বাবধারণ করিত। কখন নগরে যাইবার প্রয়োজন হইলে সেই যাইত। নির্ঝরের স্ফটিকসম জলধারা পান করিত। দানুহের স্বাস্থ্যকর শীতল বায়ুতে পরিসেবিত বেলাভাগে তাহারা বিহার করিত। বসন্তকালে সিংহলের দারুচিনির গন্ধযুক্ত বীর সমীর দ্বারা তাহাদের চতুঃপার্শ্ব রমণীয় বন আমোদিত হইত। অট্টালিকার সন্নিকটে প্রবহমানা ক্ষুদ্র গিরিনদীতে স্নান করিয়া তাহারা দেহের তাপশান্তি করিত। এবম্বিধ মনোহারী বিবিক্ত স্থানে কমলাক্ষী সুরলোকের বিদ্যাধরীর ন্যায় বাস করিত। তাহার যৌবন অদ্যাপি অঙ্কুর ছিল। তাহার রূপে কালিদাসের "অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ" এই বাক্য সম্যক্ সংগত হইত। সে পুষ্প যে চকল, নিষ্ঠুর ও কুটঘাতার প্রধান নিদর্শন তাহা অদ্যাপি শিক্ষা করে নাই, তাহার সরল চিত্ত ভ্রম নিকট বঞ্চনাভাবের উপদেশ পায় নাই। অনায়াসেই আঘাতে দমপিত ও পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হইল। তাহারই বাস্তবিক, পবিত্র প্রণয় হইয়াছিল, সেই শরৎকালের নির্মল সুধাকর ও মনোজ্ঞরূপ দিনকরবিম্বের বিস্ময়নীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মনের মালিন্য দূর করিয়াছিল। তাহার হৃদয় যেন শরৎকালে সাগরগর্ভে নিমজ্জনোদ্যত আয়ত তরণিমণ্ডলের নিকট অনুরাগ শিক্ষা করিয়াছিল। এত দিন মনোমত পাত্র না পাইয়া সেই অনুরাগ প্রতিফলিত হয় নাই। আমাকে সে, রূপবান্ বলিয়াই হউক, প্রণয়ের অনিবন্ধনতাপ্রযুক্তই হউক, অন্তরের সহিত ভাল বাসিতে লাগিল। যে অবধি অতি অল্প মাত্রায় কথা কহিতে শিখিয়াছিলাম, সেই পর্য্যন্তই মুক্তভাবে আপনার মনের সমুদায় কথা বলিত, কিছুমাত্র লজ্জা বোধ না করিয়া গাত্র অনাবৃত রাখিত। তাহার সারল্য এমন চমৎকারী ছিল। আমি সংসারে কেবল বাহ্য প্রেম দেখিয়াছি, হৃদয়ে এমন সরস রস আছে, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না।

আমার বাছা হইল, সদুপর ছদয় প্রবীভূত করিয়া এমন সুজনকে ঢালিয়া দি। আমি স্থির করিলাম, যে অবনিমণ্ডলে যদি কিছু সুখ থাকে, যদি দুর্জ্জনের অত্যাচার, জিঘাংসুদিগের দুর্দ্ধান্ত সংহারক সমর ও উৎপীড়কদিগের লৌহসদৃশ কঠিন হস্ত পৃথিবীকে একেবারে বাসের অযোগ্য না করিয়া থাকে, তবে বোধ হয় এমন সুখ আর কোথাও পাওয়া যাইবে না, আমি এই স্থানে চিরতৃপ্তিতে জীবন ভোগ করিয়া যাবার সমুদয় অবনীতে দেহার্পণ করিব। তখন কবিরা আপনাদের মধুর সংগীতে যাহার বর্ণন করেন, আমার সেই অবস্থা লাভ হইয়াছে বোধ হইল।

কমলাদীর ভাষায় সম্পূর্ণরূপে বুৎপন্ন হইতে আমার দুই মাস লাগিল। এই দুই মাস কাল আমি গৃহ হইতে বহির্গত হই নাই। অট্টালিকার নানা গৃহের নানাবিধ সজ্জা দেখিয়া বেড়াইতাম। এই সকল গৃহের মধ্যে কমলাদীর বাসাগার অতি রমণীয়। ইহা হইতে সাগরের নীল জল অসংখ্য ক্ষুদ্র দ্বীপে অবাকীর্ণ লক্ষিত হইত। কল্লোলধ্বনি প্রভাতে কমলাদীর নিদ্রা ভঙ্গ করিত। সুরভি বায়ুর প্রবাহে তাহার শয্যাস্তরণ চঞ্চলিত হইত। অস্তোন্মুখ দিনকরকিরণ গবাক্ষদ্বারদ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া ইহার ভিত্তি রঞ্জিত করিত। ইহার এক পার্শ্বে টবে রোপিত দুটি গোলাপ্ গাছ ছিল। তাহার নয়নমোহী পাটলবর্ণ কুসুমের আমোদে গৃহ সর্ব্বদা আমোদিত থাকিত। ভিত্তিতে হনুমান রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি রামায়ণের নায়কবর্গের প্রতিমা চিত্রিত ছিল। পর্য্যঙ্ক দুগ্ধফেনবর্ণ এক গদি ও তদুপরি কুসুমী বর্ণে রঞ্জিত এক আস্তরণ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। কমলাদী এই শয়নে আপনার পরিশ্রমের অঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া নয়নে নিদ্রাকে অবকাশ দান করিত। আমার ইচ্ছা হইত যে যদি আমিই শয়নীয় হইতাম। অট্টালিকার নিম্নতলে একটি সংকীর্ণ বিবরাকার গৃহ ছিল। কমলাদী মৃত্যুর সহিত পরিক্রমে বহির্গত, আমি একদিন সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম। তথায় মৃত পরিগায়ের যুদ্ধে বিনিযোজিত নানা অস্ত্র সজ্জিত ছিল। প্রায় তিন হাত ব্যাসের একখানি ঢাল এবং রাক্ষসের নয়নযোগ্য লৌহবর্ম্ম দেখিয়া আমি সমধিক বিস্মিত হইলাম। যে কেহ পরিগায়দিগের ছবি দেখিয়াছে সেই জানে, যে এই সকল প্রকাণ্ড বীরেরা কেমন বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে গমন করে। কিন্তু ইউরোপীয় সৈনিকদিগের সাহসের নিকট ইহাদের মূর্ত্তি ভীষণ হয় না এবং তাহাদের গুলিকেপের নিকট এমন দুর্ভেদ্য বর্ম্মও কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

দুই মাস অতীত হইলে কমলাদী বিবাহের প্রস্তাব করিল। তুমি মনে করিয়াছিলে, যে ইহার পূর্ব্বেই আমরা পরস্পরের সহিত অবাধ ব্যবহার

করিয়াছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। কমলাদী নিতান্ত সরল হইলেও ধর্মানুযায়ী বিবাহ-বিধির নির্ব্বাহ অতি আবশ্যক বোধ করিত। তাহার এমন মধুর প্রস্তাবে কে না সম্মত হয়। এ স্থলের বিবাহ, মালাবিনিময় প্রভৃতি সামান্য আচারে সম্পন্ন হয়, আমরা সেই বিধিতে পরস্পর সুস্থিত হইলাম। আমাদিগের পূর্ব্বরাগ কখন কোন অন্তরায় দ্বারা বিহত হয় নাই, এক্ষণেও আমরা নির্বিঘ্নে ঘর করিতে লাগিলাম। এক্ষণে আমরা স্বেচ্ছাক্রমে পরস্পরকে সংযত করিয়া নানা স্থানে বিহার করিতে লাগিলাম, বকুল বৃক্ষের তলে উপবেশন করিতাম, গিরিনদীতে বিহরমান হংসমুখে কৌতুকযুক্ত হইতাম, আম্রকুঞ্জে অবিরলিতকপোলে কথা কহিয়া রাত্রির অতিপাত করিতাম, নয়নমুগ্ধ হইয়া নির্ঝরের ঝরণশীল জলে ধৌত হইতাম, সমুদ্রতটে কত খেলা খেলিতাম, বর্ষাকালে জলবিন্দুসিক্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া মধুর মধুরীর কেকা সহিত নৃত্য ও পক্ষবিস্তার দর্শন করিতাম, শরৎ কালের নির্ম্মল জ্যোৎস্নার সহিত কমলাদীর কপোলপ্রভার উপমা দিতাম, গ্রীষ্মের ঘূর্ণিকা লইয়া তাহার ঝরনাদীল অলকে বসাইয়া দিতাম, হেমন্তের বায়ুর আঘাতে গণ্ডস্থলে পরাইয়া দিতাম, মধু মাসের মধু বায়ু সেবন করিতে করিতে তাহার বদনসুধা পান করিয়া মাস নামের সার্থকতা করিতাম। আর কত বলিব, সংক্ষেপ করিয়া যে স্থানে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, আমরা সে সকলের পাদগ্রহ করিতে অবশিষ্ট রাখি নাই। যদি আমার চিরকাল ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিবার অভিলাষ থাকিত, যদি দুরাশা কর্ণে জপতা না করিত, তবে আমি কমলাদীর সহিত অবিচ্ছেদে সুখ ভোগ করিতাম। প্রিয়বাদিনী প্রিয়দর্শনা ভার্য্যা, মানুষের বিষচক্ষু হইতে দূরবর্ত্তিনী, প্রকৃতির অতি মনোহর অবস্থা নিরীক্ষণ এবং স্বতন্ত্রতা, ইহা অপেক্ষা সংসারে আর সুখ কি আছে। আমার সে সকলই ছিল। নিবিড় অরণ্যসমুদ্ভূত শৈলমালা প্রতিদিন লোচনগোচর হইয়া অপরিসীম আনন্দ দান করিত, নির্ঝর হইতে ঝর্ঝর শব্দে প্রতিধ্বনিত বারি বীণা অপেক্ষাও অধিক মধুধারা বর্ষে শ্রবণ করিত, ঘন পল্লবের শুক্লছায়ায় সূর্য্যতাপ হইতে ত্রাণিত নদীর তটভাগে হংসকুল অপেক্ষা সমধিক কোমল নব শষ্প শয়নীয় বিস্তার করিয়া রাখিত, কলকণ্ঠ পক্ষিরা মধুর স্বর আবিষ্কৃত করিয়া নাগরিকাদিগের আমোদদায়ী গায়কবর্গকে ধিক্কার করিত, কস্তুরী মৃগদিগের অবাসনে সুরভীকৃত শিলাতল শ্রমহারী বিছানস্বরূপ হইয়া উপবেশনের নিমিত্ত আহ্বান করিত। ইহা অপেক্ষা মধুরতর আবাস আর কি হইবে? আমার এমন স্থানে যেরূপ সৌন্দর্য্য যেরূপ প্রণয়,

যেরূপ গুণান্বিত ছিল তাহাতে কি এমন স্থান সেই স্বর্গলোক অপেক্ষা রমণীয়তর নহে? তথায় কোন সংস্কৃত নাটকের একজন পাত্র বলিয়াছে, যে তথায় আহারও নাই, পানও নাই, কেবল মীনের মত অনিমিষে চাহিতে হয়।

কিন্তু আমার মন ইহা অপেক্ষা অনেক ভিন্ন মনোরথ দ্বারা রঞ্জিত হইতেছিল। নবযৌবনবন্ধন রমণীয়তা অতীত হইলেই আমার চিত্ত অন্য দিকে ধাবিত হইল। ভাবিলাম আমি কি এত অল্প বয়সেই সংসার আরম্ভ করিব? জগতের কেহ আমায় জানিবে না? কমলাক্ষীর সংসর্গেই জীবনক্ষেপ করিব? আমার আকাঙ্ক্ষা কি যশোমন্দিরে অপরিজ্ঞাত বিবিক্তবাসিনী এক কামিনীর প্রণয়ী হইয়াই চরিতার্থ হইল? কিন্তু তখন কমলাক্ষী হইতে মন তত ভ্রষ্ট হয় নাই, তখনও তাহার সেবন শরীরকে মহাসুখ অনুভব করিতাম, অতএব তাদৃশ বিরক্তি জন্মিল না।

এক বৎসর এইরূপে অতীত হইল। তখন কমলাক্ষীর বয়ঃক্রম ঊনবিংশতিতে অধিরোহণ করিল। আমি চতুর্বিংশতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলাম। কমলাক্ষী সর্ব্বদা গুরুজনের ভয় বা লজ্জা না থাকাতে আমার বক্ষেরই ভূষণ স্বরূপ থাকিত। যৌবনের যাবতীয় সুখ আমার অনুভূত হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে অনের অগ্রভাগ মলিন হইল, কপোল পাণ্ডু, শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল, এবং অরোচক ইত্যাদি গর্ভের চিহ্ন নির্গত হইল। আমার এই ঘটনায় অন্তরঙ্গ নির্ব্বেদ একেবারে ভাবশূন্য হইয়া উঠিল, আমি মনে করিলাম, যে আর আমার এ স্থলে বাস শ্রেয়স্কর নহে। আর একটি স্নেহের পাত্র হইলে কি সমুদয় বন্ধন ছেদ করিয়া পলাইতে পারিব। কমলাক্ষীকে পরিত্যাগই আমার কত ভাবনা, কত চিন্তা, কত উদ্বেগের হেতু হইবে। আমাকে সে সমুদয়ের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত কত প্রয়াস পাইতে হইবে. আমার অপত্য হইলে তাহার অস্ফুট বাক্য সুধাময় স্মিত ও স্নিগ্ধ জননীর সদৃশ স্নিগ্ধদর্শন মুখকমল দেখিলে কি তাহা ছাড়িতে পারিব? এইরূপ ভাবিয়া আমি অবিজ্ঞাতরূপে পলায়নে স্থিরনিশ্চয় হইলাম। আমার মন এরূপ চঞ্চল। যদি ইহাতে অতি অল্পমাত্রায়ও সন্তোষের সংযোগ থাকিত।

যে আমি প্রথমে কমলাক্ষীর সহিত চিরকাল সুখে বাস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই আমার এখন যত শীঘ্র সম্ভব, সেই সুখময় কারাগার হইতে দূরীভূত হইবার প্রবল অভিলাষ হইল। যৌবন কি ভয়ানক সময়। যশোবাসনা এই সময়ে মানুষকে অভীভূত করিয়া সাক্ষাৎ সংহারের অন্ধকারময় কুহরে নিক্ষেপ

করে। এই সময়ের প্রত্যেক মানব যথার্থ সুখে সুখী না হইয়া লোকসমাজে বিখ্যাতি লাভকেই মানুষের অন্য উৎকৃষ্ট বোধ করে। সন্তোষবর্ধন তখন অপরিচিত থাকে, তখন অযোক্তিযুক্ত কার্য্য না করিলে যেন বিনোদনশূন্য হইতে হয়। আমার অবিলম্বে অপসরণই নির্দ্ধারিত হইল। পাথেয় স্বরূপ কতকগুলি ফলমূল ও কমলালীয় পিতার অস্ত্রাগার হইতে একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি গ্রহণ করিলাম।

পূর্ব্বদিক্ অরুণোদয়ের চিহ্ন ধারণ করিলে আমি নৈঃ নৈঃ অট্টালিকা হইতে বহির্গত হইলাম। তখনও পক্ষীরা একপাশে অবস্থান পরিত্যাগ করে নাই তখনও ছুটি একটি নক্ষত্রের ক্ষুদ্র পত্র আপনার গর্ভে প্রবেশ করে নাই। আমি এই অহোরাত্রের সন্ধি সময়ে বহির্গত হইয়া অতি শীঘ্র উত্তরদিক্‌বর্ত্তী ক্ষুদ্র-শৈলে অধিরোহণ করিলাম। বন্ধুর আরোহণপথে হস্ত পদের সাহায্য লইয়া উঠিতে হইল। দক্ষিণে ও বামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণ্টকবৃক্ষ গাত্র ঘর্ষণ করিতে লাগিল। ঊর্দ্ধে লম্বমান শিলাবিতত যেন আমাকে প্রোথিত করিবার জন্য দেখাইতে লাগিল। চারি দিক্ ঝোপ ও কণ্টকবনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আমি পথ জানিতাম না। তথাপি যেদিকে উঠিবার স্থান পাইলাম, তথায়ই যাইতে লাগিলাম। ক্রমে যত ঊর্দ্ধে উঠি, ততই ভাঙ্গা পাথর, কাটা মৃত্তিকাস্তূপ ও দুরারোহ পাহাড় আমার পথে বিঘ্নস্বরূপ হইতে লাগিল। অতিশয় প্রয়াসের সহিত এই সকল অতিক্রম করিতে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। দুই প্রহর রৌদ্রে পাথর তপ্ত হইয়া উঠিল। আমার পাদুকারহিত চরণ তাহাতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিল। তথাপি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত আপনার শ্রমেই রত থাকিলাম। বনফল দ্বারা ক্ষুধার শান্তি করিয়া আমি অনাচ্ছন্ন মস্তকে সূর্য্যের প্রখর কিরণ সহ্য করিতে করিতে হস্ত ও পদের বিনিয়োগ করিয়া সরীসৃপের ন্যায় যাইতে লাগিলাম। এই সময়ে একস্থলে পথশেষ হইল। পর্ব্বতের দাহুদেশের ধারে আমি আপনাকে দণ্ডায়মান দেখিলাম। প্রায় পঞ্চাশ হাত নিম্নে এক জলপ্রবাহ ভয়ানক গর্জ্জন ও শুভ্রবর্ণ ফেনরাশি উদ্গম করিতে করিতে মহাবেগে নিম্নগামিনী হইতেছিল। স্রোতের অপর পারে অনেক নীচে এক পাহাড় ছিল। এক বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ সেই পাহাড় হইতে উদ্ভূত হইয়া আপনার বিশাল শাখা, আমি যে পারে ছিলাম, সেই পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিল। আমার সাহস তখন অতিশয় বাড়িয়াছিল। আমি স্রোতের ভীষণ নিনাদ ও তাহার ফেনরূপী মেঘে অবধান না করিয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থের শাখা

ধরিলাম। সেই শক্ত পাথার আশ্রয় হইয়া আমি বাষ্পরোধী জলপ্রপাতের উপর বিষ্কার দিয়া অপর পারে অবতীর্ণ হইলাম। এক্ষণে দেখিলাম, পাহাড় ফুরাইল। তরঙ্গসঙ্কুল ক্ষেত্রসমূহে ধনার, সিলেট প্রভৃতি শস্যচয় কম্পমান হইতেছিল। দূরবর্তী তরুসমূহ লোকালয়ের নিকটবর্ত্তিতা সূচন করিল। আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া চারি ধারে তালমালা দ্বারা বেষ্টিত পুষ্করিণীর ঘাসযুক্ত গড়ানিয়া পাড়ে বসিয়া তাহার শীতবায়ু সেবন করিতে লাগিলাম। তালপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি আমার শ্রবণে শ্রান্তির সময় অতি মধুর হইল। ক্ষণকাল পরে এক সোমুখ একটী গোপাল বালকের অনুসৃত হইয়া পুষ্করিণীতে জল পান করিতে লাগিল। কত দিন এরূপ দর্শন করি নাই, এখন অতি মধুর বোধ হইল। তখন রৌদ্রের তাপ শান্তির উন্মুখ হইতেছিল। আমি গোপালবালকের উপদিষ্টমান পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গ্রামে উপস্থিত হইলাম। তথাকার আতিথেয় অধিবাসীরা পরম সমাদরের সহিত সেদিন বাস করিতে দিল। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিলাম। মাঠের শোভা, দেশীয় লোকের অবস্থা, নারীগণের সুশ্রীকতা, এই সকল দেখিতে দেখিতে দুই প্রহরের সময় ত্রিবাজোরে উপস্থিত হইলাম। তথায় সঙ্গে আনীত বস্ত্রের বিক্রয় দ্বারা কতকগুলি মুদ্রা বিনিময়ে পাইলাম। ত্রিবাজোর হইতে পাঁচ দিনের মধ্যেই ত্রিবাজোর দেশের পরিবেষ্টক মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাকার পার হইয়া হাইদরের রাজ্যে পদার্পণ করিলাম। আমার নিশ্চয় হইল যে, হাইদরের সেনাদলে ভুক্ত হইয়া আমার অবমাননাকারী ইংরাজদিগের উপর বিলক্ষণ বৈরনির্য্যাতন করিব।

হাইদরের রাজ্যের প্রান্তভাগেই তাঁহার অপক্ষপাতিতা, ন্যায়াচার ও পুত্রের ন্যায় প্রজা পালনের যশ শ্রবণ করিলাম। কত অনাথ অবলা তাঁহার প্রসাদে দুই লোকের ক্রূরতা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তাঁহার সাধুবাদ করিতেছে, কত উপেক্ষিত গুণবান্ ব্যক্তিরা তাঁহার গুণগ্রাহিতায় উচ্চ পদে অধিরোপিত হইয়া প্রশংসা করিতেছে, এই সকল লক্ষ্য করিলাম। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কাহাকেও তাঁহার আধিপত্যে অসন্তুষ্ট দেখিলাম না। তাঁহার সৌরাজ্যের চিহ্ন সর্ব্বত্র দেখিতে পাইলাম। কৃষাণেরা অতি প্রফুল্লভাবে মাঠের কার্য্য করিয়া অপর্য্যাপ্ত আহার উৎপন্ন করে, মহীসুর প্রদেশের সর্ব্বভাগেই উদ্যান, ক্রয়বিক্রয়ের কলকলপূর্ণ নগর, সরমান গ্রামাবলী ও দুষ্কৃতহীন রাস্তা। প্রজারা তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু অবতার মত দেখিত, সম্ভ্রান্তেরা অতি দয়ালু জনকের মত বোধ করিত। তাঁহার রাজস্ব অতি সুনিয়মে সংগৃহীত ও গৃহীত হইত। কোন

জমীদার যে রাজদত্ত ক্ষমতার সাহায্য পাইয়া দরিদ্রদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিবেন, তাহার কিছু পথ ছিল না।

আমার, এই সকল সদ্‌গুণ শ্রবণ করিয়া আপনাকে তাঁহার কার্য্যে ব্যাপৃত করিতে অত্যন্ত আগ্রহ হইল। আমি তখন তিন দিনের মধ্যেই তাঁহার রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইলাম। তথায় তাঁহার সেনানাথের নিকট উপস্থিত হইয়া এক জন সামান্য সৈনিক হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলাম। সেনানাথ অতি সুজন ছিলেন, তাঁহার মুখে দাক্ষিণ্য স্পষ্টরূপে লিখিত ছিল। তিনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু আমার বৈদেশিক বেশ ও বাঙ্গালীর মত আকার দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যাহা হউক, আমি ইংরাজদিগের প্রতি শত্রুতার ভাব প্রকাশ করাতে তাঁহার সংশয় অপনীত হইল।

এইরূপে কিছু কাল সামান্য সৈনিক পদেই আমাকে রহিতে হইল। অনন্তর দৈবযোগে আমার আশাসিদ্ধির উপায় হইল। যৎকালে আমি হাইদরের সেনায় নিবিষ্ট হইয়াছিলাম, সেই সময়ে তাঁহার জাগরূক চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কতক জন প্রসিদ্ধ দস্যু রাজ্যে অত্যাচার করিত। প্রায় প্রতি মাসেই কেহ না কেহ তাহাদিগের উপদ্রব সহ্য করিতেন ও রাজসমীপে আসিয়া আক্ষেপ করিতেন। হাইদর অতি কঠিন শাসন ব্যবস্থিত করিয়াও তাহাদিগকে ধরিতে সমর্থ হইলেন না। দুরাচারেরা সৈনিকদিগের বন্দুককে অবজ্ঞা করিত, চৌকীদারদিগের অবধানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিত। পরিশেষে তাহারা এমন সাহসিক হইল, যে শ্রীরঙ্গপত্তনের অভ্যন্তরে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। নগরের মধ্যে সন্ধ্যার পর কেহ ঘরের বাহির হইতে পারিত না। তাহারা রাত্রিকালে দস্যুবৃত্তি করিয়া দিবাভাগে যে কোথায় লুকাইত, তাহা কেহ অনুসন্ধান পাইত না। হাইদর ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে যদি কেহ দস্যুদিগকে ধৃত করিয়া দিতে পারে, তবে তাহাকে দেশের এক ভদ্রতা করা যাইবে, এবং যদি তৎকালে কোন উচ্চ পদ খালি থাকে, তবে প্রার্থনা করিলে সে সেই পদে অধিরোপিত হইবে। এই সৌভাগ্য আমার নিমিত্তই সঞ্চিত ছিল।

আমি একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নগর হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিম দিকে যে একটী ক্ষুদ্র শৈল ছিল, তথায় ভ্রমণ করিতে গেলাম। এই শৈল অতি রমণীয়। ইহার উপরিস্থ নীলবর্ণ নানা তরুর পত্রযুক্ত পরিবৃত হইয়া মনে কত মহীয়ান্ ভাবের আবির্ভাব করে। ইহার পার্শ্ব গড়ানিয়া। তথায় শ্বেত, রক্ত, কাল পুষ্পে শোভিত অনেক ঝোপ আছে। ইহার তলভাগ নিবিড় শরবনে

আন্দোলিত। উপরের ঘাট হস্তের হুহু শব্দ বিস্তৃতভাবে কর্ণে আসিতেছে। সায়ংকালের প্রাক্কালে এই সকল যোগ, ঘ্রাণ ও শ্রবণ এরূপ এক প্রকার তত্ত্ব-বিস্ফারিত আনন্দের উৎপাদন করে, যে তাহা অনির্বচনীয়। আমি এখন স্থান চিরকাল বড় ভাল বাসিতাম। শৈশবেই আমার এখন স্থানের পল্লবজালে আবৃত হইয়া শুইয়া থাকিতে, ঘুঘুর বিষাদজনক কলরব শ্রবণ করিতে এবং বায়ুর তীক্ষ্ণ হিল্লোলে স্নাই হইতে বড় অভিলাষ হইত। আমার এরূপ স্থান মনে করিয়াই নয়ন জলার্দ্র হইত। আমি কথিত দিনে সেই স্থানে যাইয়া আপনার শ্রমবিত্ত অঙ্গ পত্রোচ্ছয়ে ঢালিয়া দিলাম। আমার শরীর পুরোবর্তী পবন দ্বারা আন্দোলিত হইল।

এই সময়ে আমার নিম্নে যেন মানুষের স্বর শ্রবণ করিলাম। প্রথমে আমার আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। আমার শরীর আপাদ মস্তক কম্পবান্ ও উৎপুলক হইল এবং অতিশয় ঘাম্ বহিতে লাগিল। আস্তে আস্তে কর্ণের তলস্থিত পত্ররাশি অপসারণপূর্ব্বক স্পষ্টই আমার দুই তিন জনের কথোপকথন শ্রবণ-গোচর হইল। একজন কহিল, "ওহে, আমাদের বরিষার জন্য পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়াছে, তবে এখন ওঠ্ ঘরে না একবার যাইলে মজা নাই।" আমি ইহাতেই বুঝিয়া লইলাম, যে তাহারা কথা কহিতেছে। আমার তখন আহ্লাদও হইল, ভয়ও হইল। দস্যুদিগের নির্জ্জন স্থান পাইয়াছি বলিয়া আহ্লাদ হইল, যদি এখনি যাই, তবে রাত্রিকালে শয়নে পদশব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া বিনাশ করিবে, এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে একটি শৃগাল খস্ খস্ করিয়া শয়নের উপর দিয়া চলিয়া গেল এবং গ্রামে যাইয়া চীৎকার করিল। আমার বিলক্ষণ সুবিধা হইল। আমি অকুতোভয়ে শয়নে চলিয়া গেলাম, দস্যুরা নিঃসন্দেহ পূর্ব্বোক্ত শৃগাল মনে করিয়া কিছু বলিল না।

আমি দ্রুতবেগে সেনানীর নিকট উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিলাম। তিনি স্বয়ং পঁচিশ জন গৃহীতাস্ত্র সৈনিক সঙ্গে লইয়া আমার সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং অবিলম্বে যে স্থানে কথা শুনিয়াছিলাম, সেই স্থান অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই বেলা বিনীতভাবে বশীভূত হও। নতুবা এখনি সকলের মস্তক চূর্ণ করিব।" বাস্তবিক ও দস্যুদিগের পলায়নের উপায় ছিল না। তাহারা পাহাড়ের গড়ানিয়া পার্শ্বে শুইয়া নিদ্রিত থাকিত। সুতরাং মুখ পবনের দিকে এবং নিকটে

লোকজনের অসদ্ভাব থাকাতে তাহারা এতদিন নির্বিঘ্নে ছিল। কিন্তু এখন প্রবেশপথ মুক্ত হইল। সুতরাং তাহারা একে একে বহির্ভূত হইয়া সৈনিকগণের অধীন হইল। কিন্তু এক্ষণে সেনানাথ ও আমি দুই জনে তাহাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দিবা একটি সজ্জিত ক্ষুদ্র গৃহ, তাহার চারি ধারে আয়না, দেয়ালগিরি ইত্যাদি দ্রব্যসামগ্রী রহিয়াছে। একটি সিন্দুক ছিল, তাহা উদ্ঘাটন করিয়া দেখা গেল, অনেক বস্ত্র, কতগুলি মুদ্রা এবং খানকতক শাণিত তরবারি।

সেই সমুদয় লইয়া আমরা নগরে প্রত্যাগমন করিলাম। হাইদর বন্দীদিগকে যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড বিধান করিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার সেনার অর্দ্ধভাগের নেতা করিলেন। সেনানাথ আমাকে আপনার সমকক্ষ দেখিয়া কিছুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না। ফলতঃ আমার উদ্যম, সাহস ও কলহবিরাগ দেখিয়া তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, এমত কি, সন্তানের মত দেখিতেন। আমার সৌভাগ্য সংপূর্ণরূপে উজ্জ্বল হইল, সকল আশা ফলবতী হইল। আমি হাইদরের রাজসভায় একজন ওমরা হইয়া বাস করিতে লাগিলাম।

হাইদরও আমার প্রতি সবিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে নিদর্শন-স্বরূপ উল্লেখ করিয়া আপন পুত্র টিপুকে অপকৃষ্ট বলিয়া তিরস্কার করিতেন। এই নিমিত্তই টিপুর আমার প্রতি আন্তরিক দ্বেষ হইল। আমি টিপুর ঈর্ষাপীড়িত মনে বিশ্বাস ও মিত্রতা জন্মাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। হাইদর চিতলদ্রুগ নামক প্রসিদ্ধ গিরিদুর্গ অধিকার করিবার সময় আমার সাহস ও কৌশল দেখিয়া অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়াছিলেন এবং আপনার দুহিতার সহিত পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি টিপুরই অনুরোধিকা পরিণয়ের নিমিত্ত তাহাতে সম্মত হই নাই।

কিছু দিন পরেই হাইদর বহুকালসঞ্চিত ইংরাজদিগের প্রতি কোপ উদ্গার করিতে আরম্ভ করিলেন। যে কেহ ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তিনিই ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের বৃত্তান্ত সম্যক্ অবগত আছেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে হাইদরের চিরস্মরণীয় কলহও তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি ইংরাজদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, "এত দিন আমি কিছু বলি নাই। আচ্ছা। তাতে কিছু এসে যাবে না।" সকলেই জানেন, তাঁহার তুরঙ্গসেনা মাদ্রাজের আড়াই ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত আসিয়া ইংরাজদিগের মনে কেমন ভয় জন্মিয়াছিল,

মহীশূরে যাইবার সকল সিপিমার্গ কেমন অবরোধ করিয়াছিল, কত ক্রতবেগে কার্পাটিকের এক নগর হইতে অপর নগরে দুই অশ্বিদলের মধ্য দিয়া যাইত, কত কৌশল, কত প্রয়াণ, কত প্রতিপ্রয়াণ করিত। আমি এই সকল যুদ্ধের অনেক ব্যাপারে তার গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমারই অধীনস্থ সেনাদল কাপ্তেন বেলি সাহেবের সেনা সম্পূর্ণরূপে পরাভব করে, আমি পতিচরিতে নির্ভয়ে উপস্থিত হইয়া বরাশি গবর্ণরের নিকট হাইদরের সৌত্যকার্য্য নির্ব্বাহ করি। এই যুদ্ধে স্টেইংস্ সাহেব একেবারে সকল অন্ধকার দেখিয়াছিলেন, তাঁহারই আদেশে তখন মারহাট্টাদিগের সহিত সময় চলিতেছিল আমার হাইদর এই সময়ে বিরোধিভাব ধারণ করিলেন, তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেন না। কিন্তু ঘটনাক্রমে মেজর কুট্ সাহেব তৎকালে সৈনাপত্য ভার গ্রহণ পূর্ব্বক অনেক প্রয়াস ও কৌশলে হাইদরের বর্দ্ধমান প্রভাবের লঘুতা করিয়া দিলেন। সংগ্রাম নিবৃত্ত না হইতেই হাইদর এক প্রাচীন রোগে আক্রান্ত হইয়া লোকান্তরিত হইলেন। তাঁহার তনয় টিপু এক্ষণে উত্তরাধিকারী হইয়া পশ্চিম ও পূর্ব্ব দুই উপকূলেই যুদ্ধে সমান রক্ষা আপনার অসাধ্য ভাবিলেন এবং অচিরে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজেরা বিলক্ষণ শিক্ষা পাইয়াছিল, এক্ষণে আগ্রহ সহকারে তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিল। সন্ধির সর্ত্ত প্রথম পণবন্ধ আমাকে ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ। আমি তাহাদিগের প্রতি অতিমাত্র শত্রুতা করিয়াছিলাম, তাহাদিগের সার্থে বড় আঘাত করিয়াছিলাম, এই নিমিত্তই ইংরাজদিগের আমার প্রতি দ্বেষ হইল। কিন্তু আমি কিছু অন্যায় করি নাই, সেনাপতি হইলে যুদ্ধে আর পাঁচ জন শত্রুর প্রতি যেমন ব্যবহার করে, আমিও সেইরূপ করিয়াছিলাম। অতএব আমাকে করতলস্থ করিবার অভিলাষ গুপ্তভাবে সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে লাগিল। যদি প্রকাশিতভাবে তাহারা একজন সেনাপতিকে আপনাদিগের হস্তগত হইবার নিমিত্ত পণবন্ধ পত্রে প্রার্থনা করিত, তাহা হইলে ইউরোপে মুখ দেখাইবার পথ থাকিত না। অতএব টিপুর সহিত দূতদ্বারা এই কথাবার্ত্তা স্থির হইল, যে, টিপু আমাকে ধরিয়া ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন। টিপুর মতলব ছিল, তিনি এই উপায়ে আমাকে অপসারণ করিতে বিমুখ হইবেন না।

আমি অতি শীঘ্রই এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলাম। আমার তখন টিপুর রাজ্যে ক্ষমতা অল্প ছিল না। সৈনিকেরা আমার নিতান্ত বশীভূত ছিল। সৈনাপত্যের যেরূপ বিজ্ঞতা সহকারে ব্যয় করাতে অনেক বিভব সঞ্চয়

করিয়াছিলাম। এই দুই সুবিধার সুকৌশল-যুক্ত বিনিয়োগ করিলে টিপুর রাজ্যে বিলক্ষণ গোলযোগ বাধিত। কিন্তু আমি তাদৃশ ধর্মজ্ঞানশূন্য ছিলাম না। তাঁহার পিতার উপকার দ্বারা বশী হইয়া সেই বল তাঁহার পুত্রের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে আমার একবারও অভিলাষ হইল না। আমি আপনার সমুদয় সামগ্রীর সহিত টিপুর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বালোরে অতিমুখে যাত্রা করিলাম। যাইবার সময় টিপুকে এই পত্র লিখিয়াছিলাম।

"তুমি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছে, তদনুসারে তোমাকে আমার কোন নামে সম্বোধন করিবার অভিলাষ নাই। যদি তোমার বুদ্ধি অবিচলিত থাকে, তাহা হইলে জানিতে পারিবে, যে আমি তোমার অনেক উপকার করিয়াছি এবং তোমার মাৎসর্য্য উদ্দাম না হইলে আরও কত করিতাম। তুমি আমাকে ইংরাজহস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইয়া আপনার শক্তির অসম্মান করিয়াছ। তুমি হাইদরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আপন দেশের একজন প্রজাকে শত্রুর প্রসাদের সহিত বিনিময় করিতে লজ্জাবোধ করিলে না। যাহা হউক, আমার বন্দীভূত সৈনিকগণকে আমি তোমাকে সমর্পণ করিতে কিছুমাত্র সম্মতি প্রকাশ করি নাই। লোকে অবশ্যই আমার মহাপ্রভাবতা ও তোমার লঘুচিত্ততা চিরকাল উদ্‌ঘোষণা করিবে। তোমার ইংরাজদিগের নিকট এই কাপুরুষতার ফল শীঘ্রই দৃষ্ট হইবে। আমার মন যেন তোমাকে হাইদরের পুত্র হইতে পরিনির্দ্দিষ্ট রাজ্যের শেষ পুরুষ মনে করিতেছে। যদি কিছু ঐশ্বরিক ক্ষমতা থাকে, তবে যাহাতে আমার এই আশঙ্কা বিফল হয়, তাহাই যেন সেই ক্ষমতা দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, ইহা আমি মনের সহিত প্রার্থনা করি।"

আমার ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপে সত্য হইয়াছে, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। আমার মহীসুর পরিত্যাগ সময়ে ত্রিশ জন তুরঙ্গারোহী অনুচর ছিল। ইংরাজেরা আমাকে ধরিবার নিমিত্ত কত চেষ্টা করিয়াছিল, কত স্থানে থানা বসাইয়াছিল, কত কৌশল করিয়াছিল। আমি অরণ্য গিরিসঙ্কট প্রভৃতি দুর্গম বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই বালোরের পথ ধরিলাম। সিন্ধিয়া সাতিশয় অভ্যর্থনা করিলেন, এবং আপন সভার একজন সভাসদ্ করিলেন। আমি তাঁহার অনুগ্রহচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া শান্তিসুখে কাল অপনয়ন করিতে লাগিলাম। তৎকালে ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার সন্ধি ছিল। এই নিমিত্ত ইংরাজেরা তাঁহাকে আমার সমর্পণ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তীব্রপ্রতাপ মারহাট্টা অতি কোপনভাবে উত্তর করিলেন যে, "ইংরাজদিগের কোন অধিকার

নাই, যে একজন স্বতন্ত্র রাজার প্রতি এইরূপে প্রজানির্বাসনের আজ্ঞা করিয়া পাঠান। বাদশাহরাজ অতিশয় আশ্চর্য্য হইবেন, যদি কোম্পানির স্বদেশীয় বাজার নিকট লন্ড চাটরে হিন্দুস্থানের অধিরাজদিগকে এইরূপে অপমান করিবার ক্ষমতা অর্পিত থাকে।"

ইংরাজদিগের আমার প্রতি এই স্নেহচিহ্ন প্রকাশ করা অবধি আমি অনিদ্রা উঠিলাম। আমার তাহাদিগের অপকার করাই জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। আমি সিন্ধিয়াকে বুঝাইয়া দিলাম, যে এক দল বণিক্ কত পরিশ্রম, কত ছল, কত কৌশল, কত অন্যায় করিয়া এক্ষণে এত প্রবল হইয়াছে। তাহারা উত্তরকালে তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে হস্তগত করিতে উপেক্ষা করিবে না। আমি দেখাইয়া দিলাম, যে দেশীয় সেনা বর্ত্তমান অবস্থায় কোন ক্রমেই ইংরাজদিগের সমকক্ষ হইতে পারিবে না; যে, তাহাদিগের সুশিক্ষা ইউরোপীয় রীতিক্রমে নির্ব্বাহিত হইলে অতি উৎকৃষ্ট সেনা হইতে পারিবে; যে, ইউরোপীয় রীতিক্রমে শিক্ষা দিলে ফরাসিদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, কারণ ফরাসিরা ইংরাজদিগের স্বভাবসঙ্গ। তাহারা এত ধূর্ত্ততা দেখিতে পারে নাই, বলিয়া হিন্দুস্থানে প্রভুতা উপার্জ্জন করিতে পারে নাই, নচেৎ তাহাদিগের সভ্যতা, যুদ্ধে পারদর্শিতা, সাহস ও কৌশল ইংরাজদিগের অপেক্ষা এক কেশও ন্যূন নহে, বরং অনেক স্থলে অধিক হইবে। আরও কহিলাম, যে, যদি হিন্দুস্থানের একজন প্রবল রাজা তাহাদিগকে আহ্বান করে, তবে ফরাসিরা প্রফুল্লচিত্তে তাহার কার্য্যে আপনাদিগকে ব্যাপৃত করিতে তৎপর হইবে।

আমার এই সকল প্রবোধনা সফল হইল। বয়গোইন্ নামক একজন ফরাসি তাঁহার সেনাকে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত হইল। অত্যল্প কালেই এই বন্দোবস্তের শুভ ফল দৃষ্ট হইল। সিন্ধিয়ার সেনা দেশীয় সকল রাজার অপেক্ষা সমধিক বলবান্ ও শিক্ষিত হইল। সিন্ধিয়ার মহারাষ্ট্র অল্প ক্ষমতার আতিশয্য হইল। দিল্লীর সম্রাট তাঁহার করতলস্থ হইলেন। ফলত দেশীয় কোন নরপতিই তাঁহার সদৃশ প্রভাবশালী হইতে পারে নাই। তথাপি আমার অন্তরস্থ অভিলাষ সিদ্ধ হইল না। আমার বাহা ছিল, যে একেবারে কোর্ট উইলিয়ম দুর্গের ভিত্তিতে কামানের গোলা না লাগাইলে বৈর নির্য্যাতন হয় না। কিন্তু সিন্ধিয়া অদূরদর্শিকারী ছিলেন না। ইংরাজদিগের সহিত অন্তরে বিরক্ত থাকিলেও অকারণ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার অভিলাষ ছিল না। তিনি সন্ধির সুশান্ত পক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজার উপকার করণেই তৎপর ছিলেন। অতএব তাঁহা হইতে

আমার হৃদয়ত বৈরের নির্যাতন অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি তখন ক্রোধে এরূপ অন্ধ ছিলাম, যে এমন এক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, যাহাতে যশ, মান, প্রাণ এই সকল সংশয়িত হইয়া উঠিল।

মালোয়ার রাজকুমারী চিতের অন্তরাল হইতে আমার দর্শন পাইয়া প্রেমরজ্জুতে পতিত হইয়াছিলেন, আমি প্রতিপক্ষপক্ষের এরূপ প্রবল করিয়াছিলাম। তিনি সেই অবধি আমার নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিয়া বিরহের সম্পূর্ণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তথাপি স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের বশবর্তী হইয়া পিতা বা মাতাকে বলিতে পারেন নাই। তাঁহার পিতাও একজন বৈদেশিককে কন্যা সম্প্রদান পূর্ব্বক আপন কুলে কলঙ্ক দান করিতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু আমি জানিলাম, যে আমার অতিশয় সৌভাগ্যের কথা, রাজকুমারী স্বকীয় কত সুলক্ষণকে উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক একজন অর্থহীন বৈদেশিককে পাণি দানে উৎসুক হইয়াছেন, তবে আমার নিশ্চিত অবশ্যই কিছু লক্ষিত থাকিবে। এই ভাবিয়া স্থির করিলাম, যদি আমি গোপনীয়ভাবে দেশীয় বিধি অনুসারে বিবাহ করি, তবে সিন্ধিয়া কি ক্রোধভরে আপনার প্রিয়তম দুহিতারও সর্ব্বনাশ করিবেন? ইহা কখনই সম্ভাবিত নহে। তিনি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেও দুহিতার অনুরোধে অবশ্যই রক্ষা করিবেন এবং তাঁহার মনোরঞ্জন পরিহারার্থে অবশ্যই যথোচিত পদে অধিরোপিত করিবেন। এই ক্ষমতার অধিকারী হইয়া তাহার জীবন সময়ে দেশের শত্রুবর্গকে অতিশয় প্রয়াস পাইয়া দমন ও বশীভূত করিতে চেষ্টা করিব। পরে তাঁহার পরলোক হইলে তাঁহার গৃহীত পোষ্য পুত্রকে শত্রুবর্গের সাহায্যে রাজাচ্যুত করা তাদৃশ দুঃসাধ্য হইবে না। তখন দেখা যাইবে যে হিন্দুস্থানের অত্যুৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া ইংরাজদিগের প্রতিকূলে কি করা যায়।

আমার এই মতলবের আমার দুই জন পরমবন্ধু মারহাট্টা সমুদয় জানিত। আমি তাহাদিগকে কহিলাম, "যদি আমার এই কল্প সিদ্ধ হয়, তবে তোমরা মালোয়ার মহামাত্য হইবে। যদি বার্থ হয়, তবে নিঃসংশয় থাকিও, যে কাটিয়া সমরই দিউক, মনের ভিতর সেরেকুই চালাক, তোমাদের নামোচ্চারণ বিষয়ে আমার অধর হীরাকস খাওয়া আঁটা থাকিবে।" এই কথা বলিয়া কিরূপে পুরোহিতের আনয়ন করিবে, কোথায় বিবাহ হইবে, রাজকুমারী বিবাহের সময় কিরূপ ছদ্মবেশ অবলম্বন করিবেন ইত্যাদি উপদেশ দিয়া সন্ধ্যাসময়ে রাজকুমারীর অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলাম, পথে যাইবার সময় আমার চরণদ্বয় যেন পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। আমি কখনও কোন কর্ম্ম করিতে ভয় পাই

নাই, কিন্তু এবার যেন কে আমাকে যাইতে নিষেধ করিতেছে এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম। যে কেহ আমার পশ্চাতে আসে, সে যেন ধরিতে আসিতেছে, এইরূপ মনে হইতে লাগিল। পেচক বালকদিগের ন্যায় চীৎকার করিয়া আমায় কম্পবান্ করিল। একটু কিছু নড়িলেই চকিত হইতে লাগিলাম। আমার যন্ত্রের অভ্যন্তরে একখানি ঘড়ির ঘই ছিল। তাহার এক প্রান্তে ছুইটা আংটা ছিল। পাছে কেহ দেখিতে পায় এই ভয়ে আমার ঘাম হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পরেই কৃষ্ণপক্ষের নিশায় ঘোর অন্ধকার জগত্‌কে আবরণ করিল। আমি কত প্রবোধ দিয়া মনকে সাহসযুক্ত করিলাম, কিন্তু আকাশে যেন কে আমাকে কত তিরস্কার করিতেছে এইরূপ বোধ হওয়াতে সমুদয় উৎসাহ জল হইয়া গেল। এইরূপে আমি খিড়কীর উদ্যানের পুষ্করণী পরিমাণ উচ্চ প্রাচীর কাঁপিতে কাঁপিতে উল্লঙ্ঘন করিলাম। বাগানে প্রবেশ করিবামাত্র এক বৃহৎ জ্যোতির্ম্মণ্ডল আমার নয়নকে আঘাত করিল। দেখিলাম রাজভবনের প্রাসাদ পরমোজ্জ্বল শোভা ধারণ করিয়াছে। অপারত বাতায়ন দ্বারা প্রভা নির্গত হইয়া বৃক্ষদিগের পত্র পর্য্যন্ত রঞ্জিত করিয়াছিল। পেচকের পক্ষে সূর্য্যালোকের ন্যায় আমার এই আলোক বিষাদজনক হইল। সেই সময়েই মনো প্রবেশ করিতে সাহস হইল না। এক কোণের ভিতর প্রজ্বালিত ছিপে মূত্রাশিত থাকিলাম। উঃ, তখন আমার এক মুহূর্ত্তও যুগের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আমি পাপ সম্পূর্ণরূপে না করিয়াই তাহার ফলভোগ করিলাম। সেই সময়ের কষ্ট কি আমি বাক্যে বর্ণন করিতে পারি? কত উদ্বেগ, কত শঙ্কা, কত বিষয় ভাবনা আমার হৃদয়কে চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল, তাহাদের ভয়ানক স্বরূপ কি সহ্য যায়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা যায়। চারিদিকের মধুর সৌরভ আমার অসহ্য হইল। আমি পরম রমণীয় শোভায় দৃষ্টিপাত করিতে কষ্টবোধ করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিলক্ষণ বোধ হইল যে মানুষের সুখ ও দুঃখ মনের অবস্থারই অনুসারী। তথাপি পাপের পথ এমনি পরিষ্কার ও মসৃণ, যে একবার তাহাতে পদার্পণ করিলে প্রত্যাগমন করিতে পারা যায় না। দুরাচার পাপপিশাচ তোমাকে কত সাদরে আলিঙ্গন করিবে, কত প্রলোভন দেখাইবে, তুমি তাহার বাহ্য মাধুর্য্যে মোহিত না হইয়া থাকিতে পার না। পরিশেষে যখন একেবারে বিনিপাতের গর্ত্তে ক্ষিপ্ত হও তখন তোমার অনুতাপ উপস্থিত হইয়া গাত্র জর্জ্জরীভূত করে, মন নীরব করে এবং তীব্ররূপে কশাঘাত করিতে থাকে। আমি তখনও নিরস্ত হইলে কিছু

মাত্র ক্ষতি হইত না। কিন্তু দুঃপ্রবৃত্তি সর্বাধিক বলবতী, আমাকে যেন বাঁধিয়া রাখিল।

নিশীথ সময় উপস্থিত হইল। আমি গোপন স্থান হইতে বহির্ভূত হইয়া আকাশে জ্যোতমান তারাবলী দেখিলাম। তাহারা যেন আমার কার্য্য দেখিবার নিমিত্ত চিক্ চিক্ করিতেছিল। পর্ব্বতের শীতবাত হু-হু শব্দ করিয়া আমার মুখে লাগিয়া যেন দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে লাগিল। আমি এই অচেতন পদার্থের বারণ না শুনিয়া রাজকুমারীর জানালায় উঠিলাম। সমুদয় নিস্তব্ধ ছিল, সকল আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছিল, কেবল একটিমাত্র প্রদীপ সুপ্ত নৃপতনয়ার মুখে আপনার প্রভাজাল ছড়াইয়া দিতেছিল। আমি এক উচ্চ পর্য্যঙ্কে শয়ান রাজকুমারীর শরীর দর্শন করিয়া যেন জড়ীভূত হইয়া গেলাম। সেই ভক্তিযোগ্য রূপ দর্শন করিলে মনে কোন প্রকার অসৎ প্রবৃত্তির আবির্ভাব হয় না। আমার সেই আকারকে যেন অলৌকিক জীব বোধ হইল। পবিত্রতা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আমা হইতে ভক্তির আকর্ষণ করিতে লাগিল। এরূপ মহিমা, এরূপ কান্তিচয়, এমন অবর্ণনীয়তা কখন দেখি নাই। তাঁহার রূপ মধুর, তথাপি মনে এক প্রকার সম্ভ্রমের উৎপাদন করে। তোমার বোধ হইত না, যে এ পদার্থ অন্য লোকের উপাদানে নির্ম্মিত অথবা পার্থিব শোক, তাপ ও বিপুর বলবশ। আমি চকিত হইয়া ক্ষণকাল এই মনোহর বস্তু নিধ্যান করিতে লাগিলাম। আমার সমুদয় মালিন্য, সমুদয় অসদাশয় দূরীভূত হইল। এই সময়ে রাজতনয়া জাগরিত হইয়া আমি যে জানালায় ছিলাম, অকস্মাৎ সেই দিকেই দৃষ্টিপাত করিলেন, আমাকে দেখিতে পাইয়াই কোপপ্রস্ফুরিতাধরে কহিলেন "দুরাত্মন্, আমি তোর অভিসন্ধি অনেক দিন জানিতে পারিয়াছি। তুই মনে করিয়াছিলি, যে এরূপ কৃতঘ্ন দুরাচারকে এক বারহাট্টা অবলা পাণি দান করিবে। যাহার শিরায় শিবাজীর রক্ত বহিতেছে, সে এই চারিত্রভ্রংশকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে? আমি তোকে ভাল বাসিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম, তুই আমার প্রীতির নিতান্ত অযোগ্য। তথাপি আমি মহানুভাবতা গুণে বলিতেছি, যে এই দণ্ডেই পলায়ন কর্, নচেৎ আগামীদিনের সূর্য্য তোকে এইখানে দেখিলে আলোয়া রাজা তোর রুধিরে কলুষিত হইবে।" এই বলিয়া পাষেয়স্বরূপ হস্তের এক আভরণ উন্মোচন করিয়া দিলেন। আমি কাঁপিতে কাঁপিতে গ্রহণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ উদ্যান হইতে বহির্গত হইলাম।

আমার তখন প্রাণভয়ই প্রবল প্রবর্ত্তনা হইল। সেই রাত্রেই উর্দ্ধশ্বাসে পূর্ব্বা-

ভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন আমার মনে বিস্ময়, ভয় ও দুঃখের পরস্পর যুদ্ধ হইতে লাগিল। আমি সর্ব্বসাধারণ পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিন্ধ্য-পর্ব্বতের পাদবর্ত্তী মহারণ্যে প্রবেশিলাম। আমার আরণ্য পশুর ভয় কিছুমাত্র ছিল না। যদি কোন হিংস্র জন্তু আমাকে মানসিক যাতনা হইতে মুক্ত করিতে আসিত, তাহা হইলে আমি অতিশয় আহ্লাদের সহিত আমিষপিণ্ডের ন্যায় আপনার শরীর তাহার নিকট উপনীত করিলাম। যখন আমি অরণ্যে প্রবেশ করিলাম, তৎকালে রাত্রির অবসেষ ছিল। কাননের সূচীভেদ্য অন্ধকার আমার নিকট স্বাগতীকৃত হইল। আমি কিছুমাত্র গণনা না করিয়া পত্রবনের মধ্যে চলিয়া যাইতে লাগিলাম। কতদূর যাইয়া অতিশয় শ্রান্তি বোধ হইল। স্বাস্তীকৃত শুষ্ক পর্ণের উপর শয়ন করিয়া মৃতের ন্যায় নিশ্চিন্ত ভাবে শয়মান হইতে লাগিলাম।

প্রভাতের সহিত পক্ষীরা কলরব করিয়া উঠিল। সেই গহন কাননে মধ্যাহ্ন-কাল ব্যতীত অন্য কোন সময়েই সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না। আমার সেই সময়ে আমার জীবনতৃষ্ণা প্রবল হইল। গত রাত্রে কত আশা করিয়াছিলাম, রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিব, মালোয়া রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত লোক হইব, হয়ত এক সময়ে সিংহাসনেও অধিরোহণ করিব। হা পরমেশ্বর, প্রভাতে ক্ষুধায় শান্তির নিমিত্ত ইতস্তত বিচরণ করিতে হইল! দেব, তুমি এইরূপেই মানুষের আশা লইয়া খেলা কর। আমি ফলমূল অন্বেষণার্থে চারি দিকে নয়ন প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে এক প্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হইল। আমি কারণ জানিবার নিমিত্ত অতিশয় কৌতূহলযুক্ত ও উদ্বিগ্ন হইলাম। কিন্তু পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আস্ত মানুষ গিলিতে সমর্থ এক ব্যাঘ্র শুণ্ড পাতিয়া বসিয়া আছে নয়নগোচর হইল। আমি ভয়ে লাফাইয়া উঠিলাম। ব্যাঘ্র চক্ষু লাল করিয়া এক ভয়ানক গর্জ্জন ছাড়িল, পদাগ্রে পৃথিবী বিদীর্ণ করিল, এবং লাঙ্গুল চড়াৎ করিয়া মৃত্তিকায় আঘাতপূর্ব্বক আমার অভিমুখে উল্লম্ফ প্রদান করিল। আমি শস্ত্রশূন্য হাতে আর কিছু না থাকাতে, রাজকুমারীর প্রদত্ত অলঙ্কারখানি স্বভাবত ছুঁড়িয়া দিলাম। শার্দ্দূল মহাকোপে আমার দিকে আসিতেছিল, অকস্মাৎ অলঙ্কারের চারুচিক্য দেখিয়া চমকিয়া উঠিল এবং নখদ্বারা ধারণপূর্ব্বক দন্তে রাখিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আমি এই অবকাশে পাঁচ হাত অন্তরস্থিত বটবৃক্ষে যাইয়া উঠিলাম। তাহার জটাসমূহ ভূতাকারে মৃত্তিকাতে বহুমূল হওয়াতে বৃক্ষ এক পিঞ্জরের সদৃশ হইয়াছে। আমি আপাতত হিংস্রের দশন হইতে রক্ষা

পাইলাম তাবিয়া রাজকুমারীর ঔদার্য্যগুণে বহুবার করিতে লাগিলাম। শার্দ্দূল আপনার উপহার পলায়ন করিল দেখিয়া গলদেশ হইতে একপ্রকার গম্ভীর চীৎকার আবিষ্কৃত করিল। "কতক্ষণ থাকিতে পারিস্, থাক্" এই বলিতেই যেন আমার প্রতি অনিত দৃষ্টি প্রক্ষেপ করিল। আমি ক্ষুধায় জর্জ্জর হইয়া সেই বট-শাখায় বসিয়া রহিলাম। ব্যাঘ্রও বৃক্ষতল হইতে একটুও নড়িল না। ক্ষুধাতৃষ্ণা সহ্য করিয়া পলায়িত শীকারের দীর্ঘ চর্ব্বণ করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া উপবিষ্ট থাকিল। এক একবার তাহার ক্রোধভরে দিগ্‌বিদিক্ পূর্ণ করিতে লাগিল।

আমি তাহার দৃঢ় নিশ্চয় দেখিয়া মনে করিলাম, যে বর্ব্বরের নখর হইতে রক্ষা পাইয়া ক্ষুধায় মর্ম্মভেদক যন্ত্রণায় বুঝি প্রাণত্যাগ করিতে হইল। সেই অহোরাত্র এইরূপ অতিবাহিত হইল। ব্যাঘ্র তথাপি স্থান ছাড়িয়া গেল না। এত বিলম্ব হইতেছে বলিয়া তাহার যেন ক্রোধের আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমি তাহার ভীষণ দৃষ্টিপাত ও নিষ্ঠুর দন্ত কড়মড়ি সহ্য করিতে না পারিয়া আপনাকে পত্র-জালের ভিতর লুক্কায়িত করিলাম। আমার তখন অনাহারজনিত গাত্রদাহ কষ্ট হইতে আরম্ভ হইল। গাত্র ঘর্ম্ম হইতে লাগিল, শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইল। ভাবিলাম, দৌর্ব্বল্যে শাখার উপর থাকিতে অসমর্থ হইয়া ব্যাঘ্রের মুখগহ্বরে পতিত হইব। এইরূপ মনে করিতেছিলাম, এই সময়ে অকস্মাৎ "গৌ গৌ" ইত্যাকার শব্দ শ্রবণগোচর হইল। আমি বহির্ভূত হইয়া দেখিলাম, ব্যাঘ্রের উপর হইতে ঝিল্লিকি দিয়া রক্ত ছুটিতেছে। সে অতি যাতনায় এপাশ-ওপাশ্ করিতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকার শব্দ করিতেছে। ক্ষণকাল পরে তাহার শরীর জবে চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিতে লাগিল। হাঁ করা মুখ মাটিতে ন্যস্ত হইয়া পড়িল। গল হইতে একটু একটু রক্তধার নির্গত হইতেছিল। তাহার পার্শ্বদেশ এক একবার ঘর্ম্মাক্ত আন্দোলিত হইতেছিল। কিয়ৎকালান্তর তাহার সমুদয় জীবনচিহ্ন অন্তর্হিত হইল। অমনি তৎক্ষণাৎ এক কৃষ্ণকায় পুলিন্দ কর্ব্বুরের আক্রমণের সহিত লতাবন হইতে ঝম্পাপিকা করে লাফাইয়া পড়িল। তাহার শ্যাম গাত্রদেশ নানাবিধ গিরিমল্লিকার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া শ্বেত, নীল ও রক্ত কমলে আচ্ছন্ন কালিন্দীজলের শোভাধারণ করিয়াছিল। তাহার শিরস্থিত বন্যোষ্ণীষে এক মহুয়পুষ্প সন্নিবেশিত হইয়া কদলীপত্রের ন্যায় হেলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার অপাঙ্গ সিন্দূরে লোহিত হইয়া এক ভয়ানক জ্যোতি প্রক্ষেপ করিতেছিল। হই পার্শ্ববর্ত্তি তূণীরদ্বয় হইতে কঙ্কপক্ষ বহির্ভূত দেখা গেল। তদযুক্ত বহুকখানি অঙ্গে নিক্ষিপ্ত ছিল, পরিধান এক কৌপীন। তাহার সর্ব্বাঙ্গ পাষাণের ন্যায় দৃঢ় বোধ

হইল। সে করস্থিত কৃপাণিকা দ্বারা বাঘের গ্রীবা দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। তৎক্ষণাৎ পূর্ণ তিনিছিদ্র দিয়া দল যেমন বেগে নির্গত হয় সেইরূপ এক রুধিরস্রোত বহির্গত হইয়া পুলিন্দের মস্তকাদি সমস্ত শরীর সিন্দূরময় করিল। পরে সে বাঘের চর্ম পৃথক্ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময়ে এক বীর পার্শ্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া তাহার মস্তকে পড়িল। সে চমকিয়া উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র আমাকে দেখিতে পাইল। অমনি ক্ষিপ্রহস্ততা প্রদর্শনপূর্বক ধনুকে বাণ যোজনা করিল। আমার স্বর ক্ষুধায় অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিল, তথাপি যত পারিলাম, তত উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া কহিলাম, "আমায় মারিও না, মারিও না, আমি শরণাগত, আমি অতিথি।" ইহা শুনিয়াই বাণ সংহার পূর্বক অবতীর্ণ হইতে ইঙ্গিত করিল। আমি তাহার আজ্ঞানুসারে নামিয়া তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলাম এবং সাতিশয় ক্ষুধা প্রকাশ করিলাম। সে তূণের অভ্যন্তর হইতে তিন আঙ্গুল পুরু, ঘুঁটের অগ্নিতে দগ্ধ এক মহিষের পিণ্ড প্রদান করিল। আমার এক দিন আহার হয় নাই অতএব এই খাদ্য নিতান্ত অপ্রিয় হইল না। আমি প্রকৃত ঔদরিকের মত খাইতে লাগিলাম।

তাহার ব্যাঘ্রচর্ম পৃথক্ করণ শেষ হইলে আমাকে অনুগামী হইতে আদেশ করিল। জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহার সঙ্গে কতক দূর গমনপূর্বক কতকগুলি কুটীর দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেক কুটীরই এক প্রকাণ্ড তরুর ছায়ায় অবস্থিত। চারি দিক্ দেবদারুবনে বেষ্টিত। তাহাদিগের সুমেরুর আভা চিন্তাপ্রবণ মানসে অনেক ভাবনার উদয় করিতে সমর্থ, এক এক আরণ্য লতা উচ্চস্থ বৃহদাকার পুষ্পগুলে মণ্ডিত হইয়া দেবদারুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। অধিষ্ঠানের মধ্যে ব্যাঘ্র, অথবা ঋক্ষবরাহের উপদ্রব নিবারণার্থ অথচ বংশদ্বারা রচিত প্রায় দশ হাত উচ্চ এক বৃত্তি আছে। এই বৃত্তির স্থানে স্থানে এক এক সাধারণ প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের পথ আছে। পুলিন্দ আমাকে লইয়া আপনার পরিবারের নিকট অতিথি বলিয়া পরিচয় দিলেন। অসভ্যাবস্থ লোকদিগের আতিথেয়তা এক প্রধান ধর্ম। এমন কি, অতিথিকে বাস দিবার নিমিত্ত তাহারা কখন কখন প্রতিবেশীর সহিত কলহে প্রবৃত্ত হয়। তাহার পরিবারেরা আমার আগমনে অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। পুলিন্দের যুবকবয়স্ক দুহিতারা অবাধে আমার সমীপে আসিয়া কেহ আমার কেশকলাপে স্থূল কৃষ্ণ অঙ্গুলি দিয়া খেলা করিতে লাগিল, কেহ আমার গাত্রত্বক পরীক্ষা করিতে লাগিল, কেহ বা আমার হাত লইয়া অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীয়কের

হীরকপ্রভা দেখিতে লাগিল। তাহাদিগেরও প্রায় সর্ব্বাঙ্গ নগ্ন, কেশ অতি নীল, অধর দাড়িমের ফুল ও সিন্দুর দ্বারা বিম্বের মত লাল। পুলিশ আমাকে কহিল, "তুমি অতিথি হইয়াছ। আপনার গৃহের ন্যায় আমাদিগের নিকট অবস্থান কর, তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই" এই বলিয়া চলিয়া গেল। তাহার পত্নী ও দুহিতারা মূলধনে ও তাত খাইতে দিল। আমি তাহা খাইয়া সেদিন তাহাদিগের একটি কুটীরে বিচালির শয্যায় শয়নপূর্ব্বক রাত্রিপাত করিলাম।

পরদিন প্রাতে সেই অধিষ্ঠানের দলপতি আমাকে দেখিতে আইলেন। আমি তাঁহাকে আমার ইংরাজদিগের নিকট হইতে ভয় বিজ্ঞাপন করিলাম এবং বিশেষ কহিলাম, যে তাহাদিগের হাতে আমায় জানিতে পারিলে কারারুদ্ধ করিবে। তিনি কহিলেন, "তোমার এই স্থান হইতে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই, তুমি চিরকাল আমার আতিথেয়তার উপর নির্ভর করিতে পারিবে। কোম্পানির সেনা কোন কালে এখানে প্রবেশ করে না।" এই কথা বলিয়া আমাকে তাঁহার গৃহে লইয়া চলিলেন, যাইবার সময় পুলিশের দুহিতারা কতবার তাহাদিগের বসীয়র দেহ আমার শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট করিল এবং দলপতির আজ্ঞা অনুল্লঙ্ঘনীয় ভাবিয়া বিমুখ হইল। দলপতির গৃহে আসিয়া দেখিলাম, যে তাঁহার দলপতিত্বের চিহ্ন কেবল তাঁহার পরিবারের গাত্রে কতগুলি লৌহাভরণ ও ময়ূরপুচ্ছের আধিক্য। ষোড়শবর্ষবয়স্কা তাঁহার এক দুহিতা ছিল। তাহার বেশভূষণ দর্শন করিয়া আমি অতিকষ্টে হাস্য সম্বরণ করিলাম। ময়ূরপুচ্ছ হইতে পালক তুলিয়া অতিক্ষীত কপোলে বসাইয়া দিয়া বিচিত্রিত করিয়াছে। তিনীপুষ্প সদৃশ দুই উরুতে লোহিত বসন্ জড়ান আছে। সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত স্তনদ্বয় চুচুক ব্যতীত সর্ব্বাগ্রে সিন্দূরাক্ত হইয়া ঠিক্ দুই বৃহৎ ওষ্ঠাধরের মত দেখিতে হইয়াছে। শীর্ষস্থ কেশপাশ মাথে এক খোঁপা বাঁধা আছে। তাহাতে দুটি একটি পুষ্পও গ্রথিত হইয়াছে। বেগুনের মত সর্ব্বাঙ্গ চিকণ। তাহার এই রূপের বাস হইয়া কত কৃষ্ণকায় প্রণয়ী প্রতিদিন সাক্ষাৎকার লাভার্থ আসিয়া হতাশে ফিরিয়া যাইত। তাহার গর্ব্ব দেখিলে মনে হইত, বুঝি সে আপনাকে সকল স্ত্রী অপেক্ষা সুরূপা মনে করে। আমি তাহাদের বাটীতে যাইবামাত্র সে দৌড়িয়া দেখিতে আইল এবং আপনার প্রেমকিঙ্করদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া পিতার সম্মুখেই আমাকে বারম্বার বেষ্টন করিল এবং বারম্বার আমার কপোলে অধর ঘর্ষণপূর্ব্বক এরূপ ঘৃণা জন্মাইয়া দিল যে আমার মনে হইল, পালাইতে পারিলে বাঁচি।

বলপতি তাহাকে অপসৃত হইতে আজ্ঞা প্রদানপূর্বক কহিলেন, "এই আমার গৃহ। তুমি সন্তানের ন্যায় প্রতিপালিত হইবে। তুমি আমাদিগের ব্যবসায় ও কার্য্য শিক্ষা কর, তোমার কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই।" আমি, অন্তর শুভাশুভ বিধানে ভবিতব্যতা দেবীরই প্রভুতা জানিয়া, শিরঃকম্পন দ্বারা তাহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলাম এবং সেই অবধি পুলিন্দদলভুক্ত হইয়া বাণ শিক্ষা, লক্ষ প্রদান, রজ্জারোহণ, যুক্তি নির্ণয়, লতাযন্ত্র রচন প্রভৃতি আবশ্য কের প্রয়োজনোপযোগী শিল্প শিক্ষা করিতে লাগিলাম। পুলিন্দদিগের সহিত মৃগয়ায় যাইতাম, নিকটবর্ত্তী হ্রদে নৌকারোহন দ্বারা মৎস্য ধরিতাম, কুম্ভীরের ন্যায় জলে সন্তরণ করিতাম, বরাহের অনুসরণে ক্রোধে বক্ষের কোটরে বিলীন হইতাম, তথাকার ভল্লুকদের নখির মুখ হস্ত দ্বারা বিশীর্ণন পূর্ব্বক অতি দূরে নিক্ষেপ করিতাম, উচ্চতীর বৃক্ষের প্রতি শরক্ষেপ পূর্ব্বক ভূতলে পাতিত করিতাম, পর্ব্বতপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক জলপ্রপাতের কল্লোলশব্দ শুনিতে শুনিতে মৃগয়ার যোগ্য পশু অন্বেষণ করিতাম, সরল নামক দেবদারুর ঘুনার স্নিগ্ধ বিস্তৃত সৌরভে আমোদিত হইয়া বনে বিচরণ করিতাম, এবং নিহত পশুর চার্ম্ম অঙ্গে বন্ধন পূর্ব্বক ক্ষুদ্র শৈলের শাদলময় পার্শ্বদেশ হইতে অবতীর্ণ হইতাম। অতি অল্পকালের মধ্যেই আমার আচার ও রুচি পুলিন্দদিগের সদৃশ হইল। আমার জীবাত্ত সেই অসভ্য জাতিদিগের অনুরূপ হইয়া উঠিল। হ্রদের চারি ধারে বাঁশ, বাউ, দেবদারু প্রভৃতি তরু দ্বারা বেষ্টিত। তাহাদিগের প্রতিবিম্ব হ্রদগর্ভে অধোমুখ ভাবে পতিত হইয়া এক গম্ভীরান্ দর্শনীয় পদার্থ হইত। আমি এক শাখায় উচ্চ অগ্রে উপস্থিত হইয়া ঝম্প্ করিয়া জলে ঝাঁপ দিতাম। কত গভীর জলে তলাইয়া গিয়া পুনর্ব্বার অনেক দূরে উত্থান পূর্ব্বক সকলকে বিস্মিত করিতাম। কখন বা দেবদারুর দুর্ব্বারোহ শাখায় দোলা খাটাইয়া এপার ওপার করিয়া দোল খাইতাম। কখন কৌশল প্রদর্শনার্থ তাহাদের ক্ষুদ্র তালে দাঁড়াইতাম, এবং তাহা বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িতে না পড়িতে উর্দ্ধস্থ আর এক লম্ব শাখা অবলম্বন পূর্ব্বক ঝুলিয়া পড়িতাম। এইরূপে আমি একজন প্রকৃত পুলিন্দ হইয়াছিলাম। আমার শরীর শীতাতপের পরিবর্ত্ত সহ করিয়া বিলক্ষণ কঠিন ও সবল হইয়াছিল, বর্ণ অনেক মলিন হইয়াছিল, এবং বর্ব্বরদিগের অপেক্ষা প্রায়ঃ দেহ থাকাতে আমার তাহাদিগের নিকট অতিশয় গৌরব ও শোভা হইত। প্রতি পুলিন্দ আমাকে বলপতির প্রিয়পাত্র জানিয়া অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইতে বাসনা করিত, প্রতি অবলাই দীর্ঘকায় ও শ্রীযুক্ত আকার দেখিয়া প্রণয় প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হইত।

আমি এইরূপ অবস্থানসহকারে বহুকাল পুলিন দেশে বাস করিতে পারিতাম, এমন কি সংসারের আস্বাদ গ্রহণ পূর্বক আমার চিত্তের এক দিনের নিমিত্ত দয়া দেশে যাইতে ঔৎসুক্যমাত্র ছিল না এবং আমি মনে করিয়াছিলাম, যে এই সকল সরলচিত্ত প্রাকৃতিক মনুষ্যের নিকট সুখে জীবন ক্ষেপ করিব। কিন্তু ধনপতিদুহিতার রূপসুধা আমার তথায় বাস করিবার সকল আশা উচ্ছেদ করিল। সে মনে করিয়াছিল, যে আমি তাহার রূপে অবশ্যই মোহিত হইব এবং তাহার নিকট প্রণয় যাচ্ঞা করিব। কিন্তু সে মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে স্বয়ং আমাকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। প্রতিদিন আসিয়া আমার কাছে বসিত, আমার গালে দুই হাত বুলাইয়া দিত, এক একবার বাহুদ্বারা বেষ্টন করিত এবং আরও কত কি অনুরাগের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া আমার চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিত। আমি আপনার সমুদয় ধৈর্য্যের আহ্বান পূর্ব্বক এই সকল উৎপাত সহ্য করিতাম। পরিশেষে নিতান্ত বাড়াবাড়ি হইল। সে আপনার জনক সন্নিধানে আমার সহিত বিবাহের প্রস্তাব তুলিল এবং আমার ধৈর্য্যকে প্রণয়ের চিহ্ন মনে করিয়া দৃঢ়তর করিয়া বলিল। তিনি আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, তাঁহার মনে এইরূপ ইচ্ছা বহুদিন অবধি ছিল, কিন্তু দুহিতার ইচ্ছা না জানিলে আপনি বিবাহের কথা তুলিতে অসম্মত ছিলেন। এখন তাহারই সাতিশয় আগ্রহ দেখিয়া কালবিলম্ব ব্যতিরেকে লম্বতিধান ও দুহিতার অভিরুচির প্রশংসা করিলেনী বিবাহের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। অন্যান্য স্থান হইতে নিমন্ত্রিতেরা উপস্থিত হইতে আরম্ভ হইল। আমার এই বিপদের সময় কিছু উপায় স্থির করিতে না পারিয়া পলায়নমাত্র পরায়ণ দেখিলাম। কিন্তু অরণ্যে একাকী কিরূপে পলাইব, কোথায় যাইব, এমন কোন স্থানই আছে, যথায় ইংরাজেরা আমাকে হস্তগত করিবেক না। এই সকল চিন্তায় মহা ব্যাকুল হইলাম। দৈবক্রমে এই কালে অনাবৃত হইয়া এক উপায় উপস্থিত হইল।

বিবাহে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আর একজন প্রবল ধনপতির তরুণবয়স্ক তনয় আসিয়াছিল। সে প্রথমে আমার ভাবিনী বধূর পাণিগ্রহণে সাতিশয় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল এবং এখন আশাও পাইয়াছিল, যে সেই একদিবসে তাহার বর হইবে। কিন্তু এক্ষণে একজন নবাগত বিজাতীয়কে স্বয়ংবৃত দেখিয়া স্বভাবতই অসন্তুষ্ট ও আমার মহাবিদ্বেষী হইল। আমি নানা ইঙ্গিতে তাহার মনের ভাব অবগত হইয়া তাহাকে কহিলাম, যে "নির্জ্জনে তোমার এক স্থির নিবেদন আছে।" পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক লতাকুঞ্জে দুই জনে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে

কহিলাম, "ভদ্র, তোমার প্রিয়ার পাণিগ্রহণ করিতে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। নিরুপায় ভাবিয়া আমি সম্মতি প্রদর্শন করিয়াছি। যদি তুমি কোন পলায়নের উপায় করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাকে চিরকাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মিত্র মনে করিব। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখ, যে ইংরাজ রাজ্যে জাতভাবে বাস করিবার আমার পথ নাই।" আমি অতি ধীর ও অমায়িকভাবে এই বাক্য উচ্চারণ করিলাম। কিন্তু সে আমার তাদৃশ সুরূপার পরিত্যাগহেতু বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত এবং আমি বারম্বার তাহাকে কহিলে আহ্লাদিত হইল। পরে কহিল, "তোমার এই স্থান হইতে পলায়নের বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া দিতে পারি। এই পূর্ব্বদক্ষিণে আয়ত বিদ্যাটবীর অনেক ভাগ আমাদিগের জাতীয় লোকের অধ্যুষিত আছে। এইসকল অধিষ্ঠানের পরস্পর বিরোধ থাকিলেও অতিথির কার্য্য সম্পাদন করিতে কেহ এক মুহূর্ত্তকাল পরাঙ্মুখ হয় না। তথাপি তোমার আমাদিগের জাতির সহিত সহবাস জানিলে, তোমার ভাবী শ্বশুর এরূপ অবমানিত হইয়া কখন ক্ষমা করিবে না। আমি বোধকরি, উড়িষ্যার সমীপে ছদ্মবেশে বাস করা পরামর্শসিদ্ধ। তথাকার জঙ্গলে অনেক আরণ্য জাতি বাস করে, তুমি তাহাদিগের দলভুক্ত হইলে ইংরাজেরা কোন কালে তোমার অনুসন্ধান পাইবে না। তোমার তথায় যাইবার ভাবনা নাই, প্রত্যেক অধিষ্ঠানের একজন পথদর্শক তোমাকে তাহার পূর্ব্বদিক্‌স্থিত অধিষ্ঠানে রাখিয়া আসিবে। এইরূপে কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি বিদ্যাটবীর পূর্ব্ব প্রান্তে উপস্থিত হইবে এবং তথায় আপনার বাসস্থান মনোনীত করিয়া লইবে।" আমি এই পরামর্শে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া "পরদিন প্রাতঃকালে দুইজনে দুইদিক্ হইতে বহির্গত হইব এবং এই লতাকুঞ্জই সংগতিস্থল হইবে" এই স্থির করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। আমার উদ্বিগ্নচিত্তের সে দিবস বিশ্রাম হইল না। সারা রাত্রি আপনার নিষ্ফলিত উদ্যম বৈষম্য ভাবিতে ভাবিতে কালাপনয়ন করিলাম।

পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ লোহিতবর্ণ হইলেই আমি গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট লতাকুঞ্জে যাইয়া দেখিলাম, দলপতিতনয় আমার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ জঙ্গলের অন্ধকারে গুপ্ত থাকিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। তখন সম্যক্ আলোকোদয় হয় নাই। বনের অন্তর্ভাব অতি রমণীয় ছিল। দুটি একটি উদ্যমশীল পক্ষী শাখায় এক পদে অবস্থিত হইয়া বাগ্বৃত্তি বর্ণন করিতেছিল। আমাদিগের পথের দুই ধারে আউ ও দেবদারু গাছ ছিল। প্রাভাতিক পরিশুদ্ধ বায়ু তাহাদিগের ভিতর দিয়া বহু-বহু করিতে করিতে সঞ্চরণোদ্যত দেহ শীতল ও

উদ্ভাবিত করিতেছিল। তরুর যাহা সুস্থির ও শান্তভাব অবলম্বন করিয়া যেন সাক্ষাৎ মহিমা মূর্ত্তিধর হইয়া নিদ্রাকালীন স্থিরভাবের নিদর্শন দেখাইতেছিল। বনপক্ষিকুলের এমন মনোরম স্থানে প্রায় তিন ক্রোশ পথ আমার সহিত আসিয়া আর এক অধিষ্ঠান হইতে আমাকে একজন পথদর্শক করিয়া দিলেন। তথায় প্রাতরাশ নির্বাহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার চলিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে কত সুন্দর গিরি, নয়নতর্পণ কানন, মন্দপ্রবাহ তরঙ্গিণী, শৈবালময় সরোবর, নবশষ্পে ধরিত্রীর শাদল, বায়ুহিল্লোলে কম্পিতশীর্ষ শালিনিচয়, ঘাটোদ্ভূত পত্রের মূলভাগে অবনত কলস ধান্য, এই সকল দেখিতে দেখিতে অহোরাত্র অবিশ্রামে গমন পূর্ব্বক কয়েক দিবসে সাগরের ন্যায় অপার বিন্ধ্যাটবীর অন্ধকারময় গর্ভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উজ্জয়িনীর ক্ষেত্রমণ্ডল নয়নগোচর করিলাম।

যে সময়ে উজ্জয়িনী অধিকারে পদার্পণ করিলাম, তাহা সন্ধ্যার প্রাক্কাল ছিল। সেই স্থান হইতে জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া লক্ষিত হইল। আমি তখন অতি শ্রান্ত হইয়া নদীপরবর্ত্তী এক তরুতলে নিষণ্ণ হইলাম। তথাকার নিকটে লোকালয় ছিল না। আমার উত্তরে প্রায় আধ ক্রোশ অন্তরে একটি ক্ষুদ্র শৈল দেখিলাম। তৎকালে আকাশ অতিশয় পরিষ্কার ছিল। বেলা অধিক না থাকাতে এবং আপনিও বিশেষ শ্রান্ত হওয়াতে মনে করিয়াছিলাম, যে আজি এই তরুতলেই অতিপাত করিব।

আমি এইভাবে নিষণ্ণ আছি, এইসময়ে এদেশে যাহাকে তুফান বলে, সেই ঝড় উপস্থিত হইল। সমুদ্র হইতে বাতাস বহিয়া নদীর পত্রোরাশির স্রোত ফিরাইয়া দিল এবং ফেন উদ্গমন করিতে করিতে সেই পত্রোরাশি মুখস্থিত দ্বীপে আঘাত করিতে লাগিল। বায়ুদ্বারা দ্বীপের উপকূল হইতে সিকতারাশি এবং জঙ্গল হইতে ঘন পত্রোচ্ছ্বাস সমাক্ষিপ্ত হইয়া গেল। সেই পত্রজাল বাত্যাবেগে নদী ও মাঠ পার হইয়া আকাশের কত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। এক একবার দ্বীপকাণ্ডে বাতাস বেগ বদ্ধ হইতে লাগিল। ইহারা অতি প্রাংশু বৃক্ষের মত উচ্চ হইলেও মাঠের ঘাসের ন্যায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমার আশ্রয়তরু এরূপ ভেজে কম্পিত হইতে লাগিল, যে চাপা পড়িবার আশঙ্কায় আমি মাঠের দিকে ধাবমান হইলাম। পুরোবর্ত্তী স্রোতস্বিনীর জল উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়া তীরদেশ প্লাবিত করিল এবং আমাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত বন্যাবেগে মাঠের উপর দিয়া আসিতে লাগিল। আমি যেখানে উচ্চ ভূমি পাইলাম, সেই স্থানেই উঠিয়া পড়িতে লাগিলাম। রাত্রি বাড়িতে লাগিল, এবং আমি দুই ঘণ্টাকাল ঘোর অন্ধকারে,

কোথায় যাইতেছি কিছুই নির্ণয় না করিয়া চলিতে লাগিলাম। এইসময়ে এক ভড়িৎপ্রভা কাদম্বিনী ভেদ ও গগনমণ্ডল উদ্দীপন করিয়া দক্ষিণে সংক্ষোভিত সাগর এবং বামভাগে দুই ক্ষুদ্র শৈলের মধ্যস্থলে নিহিত এক উপত্যকা দেখাইয়া দিল। আমি আশ্রয়ের নিমিত্ত দৌড়িয়া সেই উপত্যকার দিকে গমন করিলাম এবং প্রবেশস্থানেই ঘন্টার ন্যায় গম্ভীর গর্জন শ্রবণ করিলাম। ইহার দুই পার্শ্বে পাহাড় ও মধ্যভাগে প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষমণ্ডলীধারী আছে। যদিও ঝড় ভীষণ গর্জনপূর্বক তাহাদিগের শিরোভাগ নত করিতেছিল, তথাপি তাহাদের মূলদেশ পার্শ্ববর্তী পাষাণের মত অচল ছিল। এই প্রাচীন বনাঙ্গ বিশ্রামস্থান বোধ হইল, কিন্তু তাহার ভিতরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল। ইহার সীমার নানা লতা উদ্ভূত হইয়া বৃক্ষসমূহ জড়াইয়া এক প্রকার লতাদুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিল। আমি অতি কষ্টে তাহাদিগের বন্ধন পৃথক্ করিয়া প্রবেশ করিলাম এবং ভাবিলাম ঝড় হইতে রক্ষা হইল। কিন্তু এই সময় মহাবেগে বৃষ্টি পড়িয়া আমার চারিদিকে অসংখ্য স্রোত বহাইয়া দিল। আমি এই বিপদে একটী আলোক এবং উপত্যকার অতি সংকীর্ণভাগে বৃক্ষতলে অধিষ্ঠাপিত এক কুটীর দর্শন করিলাম। আমি তৎক্ষণাৎ সেইদিকে ধাবমান হইয়া দ্বারে আঘাত করিবামাত্র এক সৌম্যাকার পলিতকেশ পুরুষ কপাট খুলিয়া দিল। আমি আপনাকে আশ্রয়ার্থী অতিথি বলিয়া বিজ্ঞাপন করাতে সে আমাকে কুটীরের মধ্যবর্তী এক মাদুরে উপবেশন করাইয়া আমার সম্মুখে আম, মধু, আতা এবং নারিকেল জল ও চিনিতে পরিপক্ক এক শরাব ভাত আনিয়া দিল। পরে আপনি এক যুবতী অবলার কাছে যাইয়া বসিল।

আমার একণে সমুদয় আশঙ্কা অপগত হইল। কুটীরখানি পাষাণের ন্যায় অচল হইয়া ছিল। ইহা অতি সংকীর্ণভাগে এক বটবৃক্ষতলে নির্মিত ছিল। ইহার পক্ষোচ্ছ এরূপ ঘন, যে একবিন্দু বৃষ্টিও তাহা ভেদ করিতে পারে নাই। যদিও ঝড় তরুবর ভগ্ন গর্জন করিতে লাগিল, এবং মহা কর্কশঠোর ধ্বনিতের সহিত আমার উপর দিয়া বহাইয়া যাইতেছিল, তথাপি কুটীর মধ্যের ঘুম বা প্রদীপ কিঞ্চিন্মাত্র চঞ্চল হয় নাই। বৃদ্ধ অনির্বচনীয় স্নেহের সহিত সেই যুবতীর প্রতি চাহিতেছিল। সে বসিয়া গলায় পরিবার নিমিত্ত পদ্মবীজের মালা গাঁথিতেছিল। একটি বৃদ্ধ কুকুর ও তরুণ একটি মার্জ্জার অগ্নিসন্নিধান বহ্নির নিকট শুইয়া ছিল। কুকুর এক একবার চক্ষু চাহিয়া তাহার প্রভুর প্রতি দৃষ্টিপাত ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল। আমার আহার সমাপ্ত হইলে বৃদ্ধ যুবতীর প্রতি সংকেত করিবামাত্র সে আমার সম্মুখে এক নারিকেলের খোল

রাখিয়া তাহাতে দেবুর রস, ইক্ষুরস ও জলে নির্ম্মিত এক পানীয় ঢালিয়া দিল। আমি সানন্দ চিত্তে পান করিয়া শরীর শীতল করিলাম। পরে বৃদ্ধ আমার কাছে বসিয়া কোথা হইতে আসিতেছি, কোথায় যাইব, কি জাতি, কি ব্যবসায় ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিল। আমি সংক্ষেপে আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সে বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে কহিল, "তোমার এত অল্প বয়সে ঈদৃশ লীলা হইয়াছে। আমার আশ্চর্য্য নহে, বোধ করি শুনিতে অকৌতুক হইবে না।" আমি অতিশয় অনুরোধে পূর্ব্বক আগ্রহ প্রকাশ করিলে এইরূপে আপনার বৃত্তান্ত কহিল।

"তুমি বাঙ্গালি, অতএব মালবারের সামাজিক ব্যবস্থা সম্যক্ অবগত নহ। তথায় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সাত জাতি আছে। সর্ব্বাপেক্ষা অধম জাতির নাম পরিয়া। পরিয়ারা বিশুদ্ধ জাতির নয়নগোচর হইলে নিহত হয়। বিশুদ্ধ জাতিরা তাহার দর্শন পর্য্যন্ত এরূপ অপবিত্রতাজনক বোধ করে। আমি এই পরিয়া জাতির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমার সমুদয় সংসারই শত্রু ছিল। আমি প্রথমে এইরূপ ভাবিতাম 'যদি সকলেই তোমার শত্রু হয়, তবে আপনি আপনার বন্ধু হও। তোমার বিপদ্ এমন গুরুতর নহে, যে তোমার বল তাহা সহ্য করিতে পারে না। বৃষ্টি যত কেন মুষলধার হউক না, এক ক্ষুদ্র পক্ষীর গাত্রে একেবারে দুই এক বিন্দুর অধিক লাগে না।' আমি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আহারান্বেষণে বনে বনে ও নদীর ধারে ধারে ফিরিতাম, কিন্তু প্রায়ই আয়াসকল ব্যতীত আর কিছু পাইতাম না এবং সর্ব্বদাই শ্বাপদের ভয়ে শঙ্কিত থাকিতাম। আমি ইহাতে নিশ্চয় করিলাম, যে প্রকৃতি একাকী মানুষের নিমিত্ত কিছু দেন নাই অতএব যে সমাজ আমাকে ঘৃণা করে, তাহারই নিকট থাকিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া, ভারতবর্ষে যে সকল পরিত্যক্ত ক্ষেত্র আছে, যাহাদের প্রভুরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে গমন-পূর্ব্বক যাহা কিছু পাইতাম ভক্ষণ করিতাম। এই ভাবে আমি নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। যদি কখন কোন প্রয়োজনীয় ফলের বীজ পাইতাম, তবে এই ভাবিয়া রোপণ করিতাম যে আমার না হউক, অন্যের উপকার হইবে। আমার এই অবস্থার অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইল। আমার নগর দেখিবার নিমিত্ত বড় অভিলাষ ছিল। আমি দূর হইতে নগরের প্রাকার, উচ্চ অট্টালিকা, নিম্ন নদীতে অর্ণবপোতশ্রেণী, রাজমার্গে সার্থ বণিগ্‌দল এই সকল দেখিতাম। আমি দেখিতাম পৃথিবীর সর্ব্বভাগ হইতে পণ্য আনীত হইতেছে,

বিভিন্ন রাজ্যের দূতেরা সাহায্যক প্রার্থনার্থে আসিয়াছে, এবং সৈনিকেরা কার্যাকালে অতিদূরবর্তী প্রদেশ হইতে উপনীত হইতেছে। যত দাদা, আমি নগরের নিকটে যাইয়া বিস্ময় সহকারে পর্যটকবর্গের পরোক্ষে ধূলিস্তূপ দর্শন করিতাম এবং উপকূলে সাগরতরঙ্গের আঘাত সদৃশ কোলাহল শ্রবণ করিয়া তথায় যাইবার নিমিত্ত অতিশয় উৎসুক হইতাম। কিন্তু অপরিচিত জাতি বলিয়া প্রবেশের অনুমতি ছিল না। তখন আপনাআপনি কহিতাম, এক্ষণে বিচিত্রাবস্থ লোকে যা যে স্থানে আপনাদিগের শ্রম, ধন, ও আমোদ সংযুক্ত করিয়াছে, নিঃসংশয় সে স্থান অতি রমণীয়। দিবাভাগে যাইবার অনুমতি নাই বটে, কিন্তু রাত্রে আমাকে কে নিষেধ করে? নিরুপায় মূষিক যাহার কত শক্ত আছে, সে অন্ধকারের আবরণে যথাইচ্ছা গমন করে, সে ভিক্ষুর কুটীর হইতে রাজার প্রাসাদে গমন করে। যদি তারালোকেই সুখে জীবনক্ষেপ হয়, তবে আমার সূর্যালোকের প্রয়োজন কি? দিল্লীর সন্নিধানে আমি এইরূপ ভাবিয়াছিলাম। আমার রাত্রে নগর প্রবেশ করিবার সাহস হইল। আমি লাহোর সেট্ দ্বার প্রবেশ করিলাম। প্রথমে এক নির্জ্জন নগরমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, দুই ধারে বণিক্‌দিগের দোকান। স্থানে স্থানে দৃঢ়রূপে আবৃত সরাই এবং গভীর স্তব্ধীভাবের আশ্রম বাজার রহিয়াছে। আমি নগরগর্ভে অগ্রসর হইয়া যমুনানুলবর্তী প্রাসাদ ও উদ্যানে পরিপূর্ণ ওমরাদিগের পল্লী দর্শন করিলাম। এই স্থান নানা বাদ্যধ্বনি ও বাইজিদিগের সংগীত শব্দময় হইয়া ছিল। বাইজি মশালের আলোকে নদীকূলে নৃত্য করিতেছিল। আমি এই মাধুর্য্য সম্ভোগ করিতে এক উদ্যানতোরণে দাঁড়াইবামাত্র দালেরা দরিদ্র বলিয়া দরিয়ায় তাড়াইয়া দিল। আমি ওমরাপল্লী ত্যাগ করিয়া অনেক পাগোদার সমীপ দিয়া চলিয়া গেলাম। সেই সকল পাগোদার কতগুলা দুর্ভাগা লোক প্রণিপাত ও রোদন করিতেছিল। আরও কিঞ্চিদ্দূরে যোদ্ধাদিগের সমর নিবেদনের চীৎকার শুনিয়া মনুষ্যের নিকট আসিয়াছি বুঝিলাম। এই স্থানে ইউরোপীয়দিগের কবরযুক্ত ভূমি ছিল। তথা হইতে অনবরত 'খবরদার খবরদার' করিতেছিল। আমি পরে আর একটী অট্টালিকার নিকট দিয়া যাইবার সময় শৃঙ্খলার ঝন্ ঝন্ শব্দ ও আর্ত্তরব শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম, যে কারাগার। আমি চিকিৎসালয় হইতে দুঃখের ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। তথা হইতে সাক্ষিগোপাল শব্দ নির্গত হইতেছিল। পথে দেখিলাম, চোরেরা দৌড়িয়া পলাইতেছে ও চৌকীদারেরা অনুসরণ করিতেছে। ভিন্নভিন্ন দারাঘাত আঘাত দ্বারাঘাত বড়মানুষের দ্বারে উদ্ভিন্নের

নিমিত্ত ভিক্ষা করিতেছে। যাহারা উপজীবিকার্থে অসতী হইয়াছে, এমন স্ত্রীলোকও অনেক দেখিলাম। পরিশেষে এক প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। তাহার মধ্যস্থলে বাদশাহের প্রাসাদ। প্রাঙ্গণের চারিধারে নবাবদিগের তাঁবু ছিল। প্রত্যেকের পৃথক্ প্রকার মশাল, নিশান ও চামরযুক্ত দুইশাখার যষ্টি। দুর্গটী এক পরিখায় বেষ্টিত ও গোলন্দাজ সৈন্যে রক্ষিত। চারিদিকে বাতি জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে দেখিলাম, প্রাসাদের চূড়া মেঘস্পর্শী হইয়াছে। আমার প্রবেশ করিতে ইচ্ছা থাকিলেও চারিদিকে যে সকল কৌতা বুলিতেছিল, তাহা দেখিয়াই প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি কয়েক জন কাফ্রি দাসের সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের দেখামান রহিতে শীতঘনীকৃত আপনার অঙ্গকে পুনরুক্ত করিলাম।

পরদিন সমাধিস্থানে যাইয়া দিনাতিপাত করিলাম। তথায় প্রেতদিগকে দত্ত আহারের উপযোগ যাহা সুধা গণ্য হইল। আমি ভাবিলাম, জীবিতেরা নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে সমাজ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগের কুসংস্কারের সাহায্য পাইয়া প্রতিপালিত হইতেছি। আমি এই ভাবে প্রতি দিন দিবাভাগ মৃত্যুর নিবেশে ও রজনী পুরমধ্যে ভ্রমণপূর্ব্বক ক্ষেপণ করিতে লাগিলাম। এক দিন এক ব্রাহ্মণী আপনার মৃত স্বামীর সহগমনার্থে সজ্জিত হইয়া কোন আচার নিষ্পন্ন করিতে সেই সমাধিস্থানে দেখা দিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া সহগমন রূপ দুর্ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলাম এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের মনে 'তিনি দুবিয়া গিয়াছেন' এই বিশ্বাস উৎপাদনার্থে তাঁহার অবগুণ্ঠন নদীজলে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া এই দেশে উপস্থিত হইলাম। আমাদিগের প্রণয়ের ফলস্বরূপ এই দুহিতা জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদিগের অন্তঃকরণের আনন্দপ্রতিবন্ধরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু ওঃ! বেদনা যেন উদ্দীপিত হইতেছে! এই সূক্ষ্ম কুসংস্কারময় জগতে যে কেবল আমাকে ত্রাণ দানিত, তাহার নয়নানন্দ মূর্ত্তি এক জুর মধ্যে পৃথিবী হইতে অপনীত হইল," এই বলিয়া পথিক নিজ দুহিতার উৎসঙ্গে পতিত শীর্ষ ক্ষেপণপূর্ব্বক বারম্বার তাহার প্রতি সস্নেহ নয়নে চাহিয়া মূর্চ্ছিত হইল। মুখে শীতল পানীয় ছিটা করিলে পুনরুজ্জীবিত হইল। কহিল, "বৎকালে আমার এই দুহিতার শৈশব দশায় বর্ত্তমান ছিল, এবং প্রিয়তমা সহধর্ম্মচারিণী জীবিত ছিল, সেই কালে এক জন সাহেব জগন্নাথের পণ্ডিতের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আহা, সে আমার মুখে কত যবনী প্রকাশ

করিতে লাগিল এবং আমার সারল্যের কত প্রশংসা করিল। কিন্তু হায়, সে জানিতেছে না যে আমার সংসারের প্রায় সমুদয় প্রলোভন অপগত হইয়াছে, কেবল এই পীযূষবর্ষিনী গুহিতা আমাকে অত্যাপি জীবনে অভিলাষী রাখিয়াছে! হায়, আমার দেহ নির্জ্জীব হইলে এই বিস্তীর্ণ অর্থরাশির কে বংশার ভার গ্রহণ করিবে। আমরা এমন অধম জাতি, যে এই দেশে ইহার কাহাকেও রক্ষিতা করিবার উপায় নাই। হা, যদি সহসা আমার অন্তক ঘটিয়া উঠে, বংসে তোর দুর্দ্দশায় কে দৃষ্টিপাত করিবে, হে পরমেশ্বর এবম্বিধ জীববর্গকে সৃষ্টি করিয়া যে তোমার কি গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে, মানুষ কি তাহা কখন জানিতে পারিবে না, কেবল অন্ধকারে পদে পদে স্খলিত হইয়া আপনার কৌতুক তরে বিদীর্ণ হইবে।" ইহা বলিয়া দুই পিতা দুহিতার অশ্রুপাত করিতে লাগিল। আমি বৃদ্ধের এই আখ্যান শ্রবণ ও স্বচক্ষে তাহার মনোযাতনা নিরীক্ষণ করিয়া শান্তিসুখ লুব্ধ হইলাম। গভীরভাবে ক্ষণকাল তাহার সারলা, সাধুতা ও দুর্ভাগ্য ভাবিতে ভাবিতে আমার অন্তঃকরণ আর্দ্র হইল। আমি কহিলাম, "তাত, তুমি আমার সম্বোধনে বিস্ফারিত নয়ন হইও না। আমি এই অবলায় রক্ষিতা হইয়া চিরকাল তোমাকে এই সম্বোধন করিব। যদি আমার স্থিরতার প্রতি কোন সংশয় হয়, যদি তোমার এরূপ মনে হয়, যে আমি রিপুবিশেষের পরবশ হইয়া তোমার মহার্ঘ নিধি, বার্দ্ধক্যের অবলম্বন, ও জীবনের সারকে বিনিপাত কূহরে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি, তবে, হে পরমেশ্বর, তুমি সাক্ষীস্বরূপ হইয়া মনের অন্ধকার দূর কর, তোমার নয়ন মরীচান্ অন্তরাকাশ দেখিতে পায়, অণু সদৃশ সূক্ষ্ম, বায়ু অপেক্ষাও লঘুগামী মানবচিত্তেও তাহার সেইরূপ প্রসার আছে। তোমার ইহা অগোচর নাই, যে আমার এই বাক্য মায়িক কি প্রকৃত। আমি তোমার এই সরীচান্ কৃতি বিশ্বমণ্ডলের পবিত্র নাম লইয়া শপথ—"আমি আরও বলিতেছিলাম, কিন্তু পরিয়া সান্তিসুর আগ্রহ সহকারে "বৎস, বিরত হও, আমি তোমার অমায়িকতা বিষয়ে কণামাত্র সন্দিহান নহি" এই বলিয়া দুহিতার অঙ্গুলি আমার মুখে অর্পণ করিয়া অবশিষ্ট বাক্যের উচ্চারণ বিনিবারিত করিল। আমি অকৃত্রিম প্রেম প্রকাশ পূর্ব্বক অবলার করধারণ করিলাম এবং কহিলাম, "তাত, আমি তোমার উপদেশপূর্ণ চরিত্র হইতে শান্তিসুখ শিক্ষা করিলাম। আমার এখন সংসারের চাকচিক্যময় পদার্থে অসারতা বোধ হইল। আমি এরূপ মূঢ় ও উন্মত্ত ছিলাম যে, যে স্থিরে প্রত্যেক যন্ত্র

কুসুমসদৃশ গন্ধিত যাহা সর্বশ্রেষ্ঠার নাম উচ্চারণ করিতেছে, যমার চকোর চক্ষের প্রতি চাহিয়া সেই নাম বুঝাইয়া দিতেছে এবং চন্দ্র আমার সুধাময় কিরণধারা চকোরের নয়নে সেই নাম লিখিয়া দিতেছে, এমন বিশে থাকিয়াও সেই সর্বশ্রেষ্ঠাকে জানিতে পারি নাই। কিন্তু আমি এখন তোমার ভক্তি হইতে তাহা শিক্ষা করিলাম, এবং তাঁহার করুণার অসীমতা জানিয়া আমার কিছুমাত্র নিরাশতা নাই। আমি সে পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তোমার দুহিতার এই পাণিগ্রহণ করিলাম। ইহা জীবন থাকিতে পরিত্যাগ করিব না।" পরিয়া মহাহ্লাদে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। আমি পরিয়াদুহিতার পাণির সহিত মানসেরও অধিকারী হইয়াছি।

এক্ষণে আমার শ্বশুর লোকান্তরিত হইয়াছে। আমি তাহার সেই সমাহিত করিয়া স্থানের পরিচয়ার্থ মর্মরিকার চারা বসাইয়া দিয়াছি। সেই স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপ আপনাদিগের অঙ্গ বাড়িয়া যায় এবং সূর্যের অবিজ্ঞাত হস্ত তাহার উপরে পুষ্প বর্ষণ করে। আমার এখন শস্যোদয়ের অধিগম হইয়াছে। আমার এখন রাজ্যলাভের অভিলাষ নাই, দেশে দিগন্তবিস্তারী প্রখ্যাতি করিবারও ইচ্ছা হয় নাই। আমি সংসারের দুশ্চিন্তা, জনসমাজের অসূয়া, সংসারক সময়ের দুর্বার্তা হইতে দূরতর থাকিয়া শনৈঃ শনৈঃ সেই বিধাতার সন্নিধানে উপস্থিত হইতেছি এবং এক দিন অবশ্যই সেই সাধারণ বিশ্রাম ভূমে শয়ান হইয়া সুখে নিদ্রাণ হইব।*

*'জীবনস্মৃতি' থেকে জানতে পারি একটি ফরাসী আখ্যায়িকার অনুবাদ বালক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। আখ্যায়িকাটির নাম "পৌল ভর্জিনী"—অনুবাদকের নাম কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। কৃষ্ণকমলের সে-রচনা পুরনো অবোধবন্ধু পত্রিকার ফাইলেই সমাহিত আছে—গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়নি। কৃষ্ণকমলের রচনার গুণ সম্পর্কে আজকের অধিকাংশ বাঙালী পাঠকের কোন ধারণা করাই কঠিন।

"পৌল ভর্জিনী"র অনুবাদ ছাড়াও কৃষ্ণকমলের অন্যান্য বহু সাহিত্যকীর্তিই আজ সাধারণ পাঠকসমাজে বিস্মৃত। তাঁর প্রথম রচনা 'ইরাকান্তের মৃত্যু ভ্রমণ'। তিনি নিজেই বলেছিলেন: "ষোলো সতের বৎসর বয়সে 'ইরাকান্তের মৃত্যু ভ্রমণ' নামক একখানি পুস্তক আমি রচনা করিয়াছিলাম···ঐ গ্রন্থ সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রকাশিত হইয়াছিল" [পুরাতন প্রসঙ্গ, ১ম পর্যায়]। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাঙলা উপন্যাসের আট বছর আগে কোন ষোল-সতের বছর বয়সের বালকের রচিত প্রথম পুস্তক এটি, একথা প্রায় অবিশ্বাস্য বলেই বোধ হয়।

ঋষিকল্প অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখেছেন "এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাদম্বরী নয়, বেতাল পঁচিশ নয়, তারাশঙ্করও নয়, প্যারীচাঁদও নয়—এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরলতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য চটলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বারম্বার তিন বার পাঠ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাহার বিশ্লেষণ আয়ত্ত করিতে পারিলাম না।···আমার বিশ্বাস হুতোমকাল্পেচার ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী। আমি বালক কালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আকৃষ্ট হইলাম। আর উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল" [বঙ্গভাষার লেখক]।

হুতোমকাল প্রকাশের পরেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "এতদ্দেশীয় উপন্যাস সকলেরই এক ধারা ; সকলেই 'এক রাজা ছিলেন তাঁহার দো দো রানী'—এইরূপ বাঙ্গা মনে আরম্ভ হইয়া থাকে, এই উপন্যাস তদ্রূপ নহে, এবং গল্পটিও নিষ্ফলীয় বোধ হয় না" [বিবিধার্থ-সংগ্রহ, আষাঢ় ১৭৮০ শক]।

কৃষ্ণকমলের জন্ম ১৮৪০, মৃত্যু ১৯৩২। অসামান্য মনস্বিতা ও দুর্ধর্ষনীয় মতাদর্শের অধিকারী এই মানুষটির সুদীর্ঘ জীবন (৯২ বৎসর) এবং অত্যাশ্চর্য কর্মকাহিনীর কিছু পরিচয় বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় সম্পাদিত 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থখানিতে লিপিবদ্ধ আছে। কৃষ্ণকমলের অগ্রজ রামকমল ভট্টাচার্য্যও আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত কলেজের কৃতি ছাত্র ছিলেন। তারপর প্রেসিডেন্সি ও ডভ্‌টন কলেজেও তাঁর শিক্ষা চলে। ১৮৬০-এ তিনি বি. এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে তিনি খানাকুল কৃষ্ণনগরে প্রধান শিক্ষকতা করেন, নর্মাল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর অফ স্কুলস্ নিযুক্ত হন, প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপক ও পরে প্রধান অধ্যাপক হয়েছিলেন। ১৮৭২ সালে তিনি আইন পরীক্ষা দিয়ে কয়েক বৎসর ওকালতি করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত করায় তিনি হিন্দু একান্নবর্তী পরিবার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ১৮৯১ থেকে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত সময় তিনি রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

অল্প বয়স থেকেই কৃষ্ণকমল কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভায় প্রবন্ধ পাঠ করতেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি 'বিচারক' নামে অ্যাডিসনের 'Spectator' ধরনের একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করতেন। ১৮৯১-এ বিখ্যাত হিন্দুস্থানী পত্রিকার তিনি প্রধান সম্পাদক হন। তখন তিনি রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ ঐ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক হন এবং তাঁর ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত ঐ পত্রিকায়।

বালক বয়সে হুতাকাঙ্ক্ষ রচনা করার পরে তিনি 'বিচিত্রবীর্য' নামে একখানি বই প্রকাশ করেছিলেন (১৮৭২)। ইংরাজীতে তাঁর আইন সংক্রান্ত অনেকগুলি বক্তৃতা আছে এবং তিনি 'শকুন্তলা'র ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন (১৮৯১)। রমেশচন্দ্র দত্তের 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থের চতুর্থভাগ হিসেবে 'ধর্মশাস্ত্র' তাঁরই রচনা (১৮৯৪)। কৃষ্ণকমল 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা', 'উত্তর রামচরিত', 'রঘুবংশ', 'মেঘদূত' ইত্যাদি বইয়ের টীকাসহ সংস্করণ করেছিলেন এবং তাঁর 'কুমারসম্ভব'-এর প্রথম সাত সর্গের বাংলা অনুবাদ (১৮৭৪) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া নাম না-দিয়ে পূর্ণিমা, অবোধবন্ধু, ভারতী প্রভৃতি বহু মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। নাম না-থাকলেও 'পুরাতন প্রসঙ্গে'র সূত্র ধরে অনেকগুলি রচনার সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থাকারে সেগুলি সঙ্কলিত হয়নি।

কৃষ্ণকমল ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত। সংস্কৃত, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় তিনি প্রায় সমান পারদর্শী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্য ও প্রভাব তাঁর ব্যক্তিজীবনে ও ভাষাচর্চায় সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। চারিত্রিক দৃঢ়তা, সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তি, নিরহঙ্কার প্রকৃতির জন্য তিনি তৎকালীন বিদ্বান-সমাজে পরম শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

কৃষ্ণকমল ছিলেন দার্শনিক কোঁতের শিষ্য। এই সম্পর্কে নিজের স্বীকারোক্তি (পুরাতন প্রসঙ্গ) তিনি বলেছিলেন : "আমি positivist ; আমি নাস্তিক।"

হুতাকাঙ্ক্ষ রচনায় কৃষ্ণকমল Counter-এর Romance of History-র একটি আখ্যান অবলম্বন করেছিলেন। এ-সংখ্যায় 'এক্ষণ'-এ সম্পূর্ণ হুতাকাঙ্ক্ষ পুনর্মুদ্রিত হলো। পাঠকদের উৎসাহ পেলে আমরা বিখ্যাত 'সৌল বজিনী'ও ভবিষ্যতে ছাপতে পারি। [উদ্ধৃতির উদ্ধৃতি-অংশের মোটা হরফ আমাদের।]

সম্পাদক

ওথেলো

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[ইয়াগো ও ওথেলোর প্রবেশ]

ইয়াগো। আপনার তাই মনে হয় ?

ওথেলো। তোমার হয় না ?

ইয়াগো। কি হয় না,
গোপনে চুম্বন করা ?

ওথেলো। অবৈধ চুম্বন।

ইয়াগো। অথবা বন্ধুর সঙ্গে বিবস্ত্র দুএক ঘণ্টা
শয্যাশায়ী থাকা, অবশ্য নিষ্পাপ মনে ?

ওথেলো। বিবস্ত্র শয্যায় তবু পাপ নেই বলে ?
শয়তানের সঙ্গে এ ছলনা ;
নিষ্পাপ মন তবু ওইভাবে থাকা, এ নগ্নতা
শয়তানকে মুগ্ধ করে, দেবতা টলায়।

ইয়াগো। তার মানে কিছুই করেনি, এ দোষ ক্ষমার যোগ্য
কিন্তু আমি স্ত্রীকে যদি একটা রুমাল দিই—

ওথেলো। কি হয় তাহলে ?

ইয়াগো। তাহলে তা তারই হয় ; এবং যেহেতু তার,
যে কোন পুরুষকে তা, যৌতুক দিতেও পারে।

ওথেলো। তার ধর্মও তো তার অধিকারে,
তা কি সে বিলোতে পারে ?

ইয়াগো। ধর্ম তার এত সূক্ষ্ম নজরে পড়ে না,
প্রায়শ তাদেরই থাকে যাদের তা নেই।
রুমাল সম্পর্কে কিন্তু—
হা বিধাতা, ওই কথা মানসে তুলে নেতে চাই :
হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে—সেই স্মৃতি মনে ছায়া ফেলে,
নারী সংক্রমিত দূরে অমরদল বার্তার বাহক
শুনতে কাক যেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার রুমাল তার কাছে।

ইয়াগো। আছে তাতে কি হয়েছে?

অথেলো। বিলম্বিত ঠেকছে এখন।

ইয়াগো। এতেই? কি হত তবে, বলতাম যদি দেখেছি সে
মজাচ্ছে আপনাকে, কিংবা শুনেছি বলছে সে—
লম্পটেরা যে রকম নিজেরাই হাতেপায়ে ধরে
নারীদের কাছে, কিংবা কোন বিনাদের চলানিতে
তুলে নিজে মজে, পরে নিজেকে জাহির করতে
অনর্গল না বকে পারে না—

অথেলো। কিছু কি বলেছে?

ইয়াগো। বলেছে, বলেছে, তবে, কি জানেন প্রভু,
যতটুকু অস্বীকার চলে।

অথেলো। কি, কী কী বলেছে?

ইয়াগো। বলেছে, সে যাকি……কি করেছে জানি না আমি।

অথেলো। কী, কী?

ইয়াগো। সহবাস।

অথেলো। তার সঙ্গে?

ইয়াগো। তার সঙ্গে, একসঙ্গে যা খুশী বলুন।

অথেলো। তার সঙ্গে সহবাস, একসঙ্গে সহবাস? এক সঙ্গে সহবাস বলি কখন,—যখন তাকে নিয়ে এক জায়গায় বাস করা হয়,—কিন্তু তার সঙ্গে সহবাস, অকথ্য। রুমাল—স্বীকার করেছে—রুমাল। স্বীকার করা, তার মানে ফাঁসিতে লটকানো। না, না, আগে ফাঁসি, তারপরে স্বীকার, আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। সর্বেন্দ্রিয় আজন্ম করা এ আবেগ অহেতুক

হতে পারে না। না, না, শুধু কথা আমাকে এভাবে কাঁপাতে পারে না। হিঃ হিঃ হিঃ। মাঝে মাঝে, কানে কানে, ঠোঁটে ঠোঁটে। এও কি সম্ভব?—স্বীকার, স্বীকার করেছে? ক্ষমা? ওঃ শয়তান। [পতন]

ইয়াগো। করে চল কাজ,
কর কাজ শুধু আমার, এইভাবে সাবাতলো
ঘরে শুয়ে বিছানেতে, এইভাবে সতীসাধ্বী কত
অপরাধ না করেও পায় অপবাদ। একি, প্রভু,
শুনছেন, প্রভু, আমি। ওথেলো……

[কেসিওর প্রবেশ]

এই যে, কেসিও।

কেসিও। একি, কি ব্যাপার?

ইয়াগো। প্রভু মূর্ছা গিয়েছেন, মৃগীতে ধরেছে,
এ হল দ্বিতীয়বার, কালও হয়েছিল।

কেসিও। রসের কাহিনী বলে দিন।

ইয়াগো। না, না, থাক।
ঘোরটা আপনা থেকে কেটে যাওয়া ভালো,
তা না হলে শাঁখলা ভাঙবে, পরে ক্রমে ক্রমে
বহু উন্মাদ হয়ে যাবে; ওই বুঝি নড়ছেন:
অল্পক্ষণের জন্য আড়ালে থাকুন
একুণি জ্ঞান হবে; আগে উনি চলে যান,
আপনার সঙ্গে পরে গুরুতর পরামর্শ আছে।

[কেসিওর প্রস্থান]

কেমন আছেন, প্রভু? মাথায় আঘাত লাগে নি ত'?

ওথেলো। আমাকে ঠাট্টা হচ্ছে?

ইয়াগো। আপনাকে ঠাট্টা? হিঃ হিঃ।
পুরুষের মত যদি মুখটুই সইতে পারতেন।

ওথেলো। যে পুরুষ বেতার স্বামী কিম্বুত সে জানোয়ার।

ইয়াগো। তবে এই জানোয়ার, এখনি কিম্বুত নাগরিক,
বহু বহু আছে জনবহুল নগরে।

অথেলো। সে কি স্বীকার করেছে?

ইয়াগো। প্রভু, বুঝতে পারবেন না।
জানবেন জোয়ালে বাঁধা বয়ল যাদের
হতে পারে আপনার হাল; লক্ষ লোক বেঁচে আছে,
প্রতিরাত্রে শোয় যারা পরের শয্যায়, যে শয্যা
স্থির জানে নিজস্ব তাদের: আপনার দশা তো ভালো:
ওঃ, এ তো নারকী আক্রোশ, শয়তানের প্রচণ্ড বিদ্রূপ,—
নিশ্চিন্ত শয্যায় শুয়ে বেশ্যাকে চুম্বন করা
সতীসাধ্বী ধারণায়। নাঃ, নিজে আগে জেনে নিই,
নিজেকে যখন জানি, জানি আমি ও নারী কেমন।

অথেলো। সত্যি, সত্যি, বিচক্ষণ তুমি।

ইয়াগো। আস্তানে যাতোন ঘুরে
একটু ধৈর্য ধরে সবেতে থাকুন।
এখানে যখন আগে এসেছিল কেসিও, তখন
আপনি উদ্বাস্ত লোকে—যে মহত্তা খুবই অশোভন
আপনার মতন লোকে; আপনার মূর্ছার কথা বলে
পরিয়ে দিয়েছি তাকে, তবে বলে দিয়েছি সে যেন
এখুনি আবার দলে ফের কথা কইতে আসে,
আসবে সে বলে গেছে; আপনি সেসথা থেকে
দেখে যান ঠাট্টা টিটকারি তার, কি রকম স্পষ্ট
তার চোখে মুখে ফুটে ওঠে ঘেনতার ভাব;
কারণ আগের কথা তাকে দিয়ে আবার বলাব,
কোথায়, কি করে, কতবার, কতদিন আগে, কবে
আপনার স্ত্রীর সঙ্গে মিলেছে ও মিলবে স্থির আছে:
শুধু তার হাবভাব দেখুন; তবে ধৈর্য ধরা চাই,
নইলে বুঝব আপনি মূর্তিমান শুধুই আক্রোশ,
মানুষের পদবাচ্য নন।

অথেলো। ইয়াগো, শুনছ, শোন?
ধৈর্যে আমি কত মূর্খ, কী চতুর, তুমি দেখে নিও;
কিন্তু শুনছ, শোন? কোতল, খুন।

খুবই সম্ভব ;
কিন্তু সবই সময়ে সুযোগে ; একটু আড়ালে যাবেন ?

[ওথেলোর প্রস্থান]

কেসিওকে এইবারে প্রশ্ন করব বিয়াঙ্কার কথা ;
এ বিবি যোগায় তার অস্ত্রশস্ত্র যা কিছু হলদ
প্রেমের বেসাতি করে ; কিন্তু সে কেসিওর জন্যে
স্নেহও পাগল ; মেয়াদের এইতো মরশুম,
অনেককে মজায় কিন্তু নিজে মজে একজনের কাছে।

[কেসিওর প্রবেশ]

তার কথা শুনলে পরে কেসিও হাসতে পারবে না
হাঃ হাঃ অট্টহাসি তার ; ওই সে এদিকে আসছে :
ওকে হাসতে দেখলেই ওথেলোর মাথাটা ঝিমঝিমাবে,
আনাড়ী সন্দেহ তার হতভাগা কেসিওর ওই
হাসি, ঠাট্টা, ভাবভঙ্গী, খেলো রসিকতা
ঠিক উল্টো বুঝে নেবে। কি খবর, কৌজদার, ভালো ?
ঘোটেই না, ওই তাকে যে মর্যাদা দিলেন আমাকে,
মনে আমি তারই অভাবে।

ইয়াগো। পাকড়ান ডেসডিমোনাকে, আপনার হবেই হবে।
(মৃদুস্বরে) বিয়াঙ্কার এক্তেয়ারে আছটা থাকলে পরে
কত তাড়াতাড়ি মিলে যেত।

কেসিও। আরে দূর, হতভাগীটা।

ওথেলো। এরই মধ্যে দেখ কী হাসির ঘটা।

ইয়াগো। দেখিনি এমন নারী পুরুষকে এত ভালবাসে।

কেসিও। হতভাগী হয়ত বা সত্যিই আমাকে ভালবাসে।

ওথেলো। অস্বীকার তবু মুখে, বেশেই উড়িয়ে দিতে চায়।

ইয়াগো। কেসিও শুনছেন ?

ওথেলো। দাঁধাসাধি করছে এবারে
যাতে বলে চলে ; বেশ হচ্ছে, খাসা, চমৎকার।

ইয়াগো। বিবি তো রটাচ্ছে তাকে সাদি করবেন,
সত্যি নাকি ?

কেসিও। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

ওথেলো। বিজয়ী রোদান, কী এ, বিজয় উল্লাস ?

কেসিও। আমি—নাহি—তাকে ? ওই বাজারের কলঙ্কীটাকে ?
মোহাই, এ ঘটে কিছু আছে বলে জানবেন,
ভাববেন না অতটা মিছেই। হাঃ, হাঃ, হাঃ,
ঠিক, ঠিক, খুব ঠিক ; অধীর এ হাসি।
সত্যি, হুজুর, আপনি বিয়ে করছেন ওকে।
তাই নাকি, সত্যি বলছেন !
মিথ্যা হলে মজার আমি।
আমাকে বিয়ের চেষ্টা ? ভালো, ভালো।

বাঁদরীটা নিজে থেকে এইসব বলে যেতাচ্ছে ; ভালোবাসার অন্ধ মোহে সে মনে মনে গড়েছে, আমি তাকে বিয়ে করব, এতে আমার কোন কথা দেওয়া নেই।

ওথেলো। ইয়াগো ইশারা করছে, এবারে ও বলছে কাহিনী।

কেসিও। এইত সে ওখানে ছিল, সর্বত্র সে আমার পিছু ধাওয়া করে। ক'দিন আগে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে তেনিসের কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছি, সেইখানে এই আহ্লাদী এসে হাজির, কি আর বলব, এসেই আমার গলাটা হঠাৎ এমনি করে জড়িয়ে—

ওথেলো। আর আকুল হয়ে কেঁদে উঠল, "ও আমার প্রাণের কেসিও" ! ওর হাবভাবে ত তাই বোঝাচ্ছে।

এই গলা ধরে ঝুলে পড়ে, এই বুকে লুটোয়, এই কান্না, এই টানে তো এই টানে—হাঃ হাঃ হাঃ।

এবারে বলছে কি করে সে ওকে আমার ঘরে ঢুকিয়েছিল। তোর ওই নাকটাকে দেখছি, কিন্তু যে কুকুরটার কাছে তা ঘুঁষে দেব সেটাকে দেখছি না তো।

নাঃ, ওর সঙ্গ আমাকে ছাড়তেই হবে।

[বিয়াঙ্কার প্রবেশ]

ইয়াগো। এই যেরেছে। ওই যেখুন কে আসছে।

কে—একটা যে গন্ধগোকুল ; ইস্, একেবারে গন্ধে ভুরভুর।
কিসের অতলবে আমার পিছু ধাওয়া করছ, বল তো ?
আ মোলো যা,—যদ তার সাহসাজ নিয়ে তোমার পিছনে
ঘুরে মরুক, কিন্তু এইমাত্র যে রুমালটা আমাকে দিয়ে এলে
তার রহস্যটা বল দেখি ? আমিও আজ বোকা বুঝে নিলাম : এর নক্সার কাজটা পুরো আমাকে তুলে দিতে
হবে ! বেশ আষাঢ়ে গল্প—নিজের ঘরেই পাওয়া গেছে অথচ
জানো না, কে যে ফেলে গেছে। কোন বেহায়ার দেওয়া
উপহার এটা, আর এ থেকে আমাকে কিনা নক্সাটা তুলে
দিতে হবে। যাও—যাওগে যাও সেই দেয়ারীকে : যেখান
থেকেই পাও, আমি ওই নক্সার একটা কোঁড়ও তুলতে
পারব না।

ডেসি। আরে আমার প্রাণের বিয়াঙ্কা, হল কি, হল কি ?

ওথেলো। কি আশ্চর্য, রুমালটা আমার যে।

বিয়াঙ্কা। আজ রাতে যদি খেতে আসতে চাও তো আসতে পার, যদি
না আস, পরে যখন ফুর্তি হবে, তখন এসো।

[প্রস্থান]

ইয়াগো। যান, যান, গিয়ে নিন।

ডেসি। নাঃ খেতেই হবে, নইলে রাস্তাতেই চেঁচাতে থাকবে।

ইয়াগো। রাত্রে ওখানেই খাচ্ছেন ?

ডেসি। তাই তো ঠিক আছে।

ইয়াগো। ভালো, আমিও ছুটে যেতে পারি আপনার সঙ্গে, কারণ
আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।
নিশ্চয় আসবেন, আসবেন তো ?
কথা বাড়াবেন না, আপাতত যান।

[ডেসিওর প্রস্থান]

ওথেলো। [অগ্রসর হয়ে] ইয়াগো, কি ভাবে ওকে কোতল করব ?

ইয়াগো। দেখলেন, নিজের কুকীর্তি নিয়ে কিরকম হালাহালি করছিল ?

ওথেলো। ওঃ ইয়াগো।

ইয়াগো। এ ছাড়া, রুমালটা দেখলেন ?

ওথেলো। ওটা কি আমার ?

ইয়াগো। আপনার যে, সে আর বলতে : দেখলেন ওই পাজী মেয়ে মানুষটাকে, মানে, আপনার স্ত্রীকে ও কী চোখে দেখে ! সে এটা দিয়েছে ওকে, ও আবার সেটা দিয়েছে তার রক্ষিতাকে। আমি যদি—আমি যদি ওকে নয় বৎসর ঘরে তিলে তিলে মারতে পারতাম ; কী রূপ, কী মাধুরী, আহা !

ইয়াগো। না, না, ওসব আপনাকে ভুলতেই হবে।

ওথেলো। আজ রাত্রেই ও পচে মরে আস্তাকুড়ে যাক্, ওর বাঁচা চলবে না ; না, না, আমার বুকটা পাথর হয়ে গেছে ; আমি যা মারছি, আমার হাতেই লাগছে : ওহো-হোঃ দুনিয়ার ওর চেয়ে মধুর আর কেউ নেই, ও রাজেশ্বরের শয্যা আলো করতে পারত, ও সম্রাটের সেবা পাবার যোগ্য।

না, না, এইভাবে আপনাতে সোজা পায় না।

পাপিষ্ঠা দুলোয় যাক্, আমি কেবল ওর একটু বর্ণনা দিচ্ছি ; কী সুন্দর ওর সূচের কাজ, গানে বাজনায় কী অসাধারণ, ওর গান শুনলে মনের ভাসুকও নিজের ভুলে যায় ; কথাবার্তায় রসিকতায় কী চৌখস, কী উন্নতরুচি।

ইয়াগো। এসব আছে বলেই আরও বেশী খারাপ।

ওথেলো। হাজার হাজার বার : কিন্তু কী সাহে কী নম্র স্বভাব।

ইয়াগো। তা বটে, বড় বেশী নম্র।

ওথেলো। যা বলেছ, ঠিক তাই, তবুও কী মর্মান্তিক, ইয়াগো ; ইয়াগো, কি মর্মান্তিক।

ইয়াগো। যদি তার অনাচার আপনার এত নিদারুণ মনে হয়, তাকে তা চালিয়ে যাবার কলাও অধিকার দিয়ে দিন না ; যদি তা আপনার গায়ে না লাগে, তাতে আর কারও এসে যায় না।

ওথেলো। আমি তাকে কুটি কুটি করে কাটব। আমার ঘরে ব্যাভিচার !

ইয়াগো। ছিঃ ছিঃ, কী অনাচার।

ওথেলো। আমারই কর্ণধারীর সঙ্গে !

ইয়াগো। আরো বেশী অনাচার।

ওথেলো। ইয়াগো, আজই, আজ রাতেই আমাকে কিছু বিষ এনে

দাও ; ওর সঙ্গে আর বোঝাপড়া করব না, ওর রূপ, ওর মোহিনী মায়া আমার হৃদয়কে যদি উলিয়ে দেয় ; না, ইয়াগো, আজ রাত্রেই।

ইয়াগো। না, না, বিষ দিয়ে কেন, শয্যাতেই গলা টিপে খতম করুন, যে-শয্যা কলঙ্কিত করেছে সেই শয্যাতেই।

ওথেলো। তাই ভালো, তাই ভালো, এ বিচার মনের মত, খুব ভালো।

ইয়াগো। আর কেসিও সম্পর্কে, সে ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন : মাঝরাতের আগে আরও খবর জানতে পারবেন।

বাঃ বাঃ খুব ভালো [নেপথ্যে তূর্যধ্বনি] কিসের এই তূর্যধ্বনি ?

[লোডোভিকো, ডেসডিমোনা ও অনুচরদের প্রবেশ]

ইয়াগো। নিশ্চয় ভেনিস থেকে কেউ ; লোডোভিকো আসছেন ডিউকের কাছ থেকে, সঙ্গে দেখছি আপনার দাও।

লোডোভিকো। সেনাপতি চিরজীবী হোন।

ওথেলো। আন্তরিক ধন্যবাদ।

লোডোভিকো। এনেছি শুভেচ্ছা এই ভেনিসের রাজসভা থেকে।

ওথেলো। তাঁদের আদেশনামা আমার শিরোধার্য।

[চিঠি খুলে পাঠ]

ডেসডিমোনা। তারপর লোডোভিকো, তোমাদের কি খবর ?

ইয়াগো। আপনার দর্শন লাভে খুবই আনন্দিত আমি : সাইপ্রাসে স্বাগত জানাই।

লোডোভিকো। ধন্যবাদ, কৌজদার কেসিওর কি খবর ?

ইয়াগো। এই আছেন আর কি।

ডেসডিমোনা। জানো ভাই, তাঁর সঙ্গে আমার স্বামীর ঘটে গেছে মনান্তর, তোমাকে মিটিয়ে দিতে হবে।

ওথেলো। ঠিক জানো ?

ডেসডিমোনা। কি বললে ?

ওথেলো। [পাঠ] "এ কাজে না হয় যেন ত্রুটি, যেহেতু তোমাকে…"

লোডোভিকো। কই না, ডাকেন নি তো, পড়াতেই ব্যস্ত দেখছি : তোমার স্বামীর সঙ্গে কেসিওর ঘটেছে বিরোধ ?

ডেসডিমোনা। যত মর্মান্তিক ; ওঁদের বেলাতে আমি
সব পারি, কারণ কেসিও আমার বড় প্রিয়।

ওথেলো। ঈঃ নরকভূত!

ডেসডিমোনা। কি গো?

ওথেলো। ঘটে কিছু আছে?

ডেসডিমোনা। একি, স্বামী?

লোডোভিকো। বোধহয় চিঠিটাই এর জন্যে দায়ী :
মনে হয়, ওঁরা ওকে ফিরে যেতে বলেছেন
কেসিওকে শাসনভার দিয়ে।

ডেসডিমোনা। তাই নাকি, কি আনন্দ!

ওথেলো। সত্যি!

ডেসডিমোনা। কি বলছ?

ওথেলো। তোমাকে পাগল দেখে খুশি হচ্ছি।

ডেসডিমোনা। সে কি, প্রিয়তম?

ওথেলো। শয়তানী! [ডেসডিমোনাকে আঘাত]

ডেসডিমোনা। এ আমার প্রাপ্য নয়ত!

লোডোভিকো। এ ঘটনা তেনিসে কেউ বিশ্বাসই করবে না,
দেখেছি, এ শপথ মিলেও : এ যে বারণা অতীত,
শান্ত করুন ওকে, ও কাঁদছে।

ওথেলো। ঈঃ শয়তানী, শয়তানী।
নারীর চোখের জলে এ ধরণী প্রস্তুত হলে,
প্রতি বিন্দুপাতে ওর জন্ম নিত একেকটা কুমীর :
দূর হ' সম্মুখ থেকে।
যাই, যদি চক্ষুশূল আমি
[গমনোদ্যত]
সত্যি, আহা, কি নম্র বিনীত :
আপনাকে মিনতি, ওকে ফিরিয়ে আনুন।

ওথেলো। যাদুমণী!

ডেসডিমোনা। বল?

ওথেলো। ওকে নিয়ে কী করতে চাও?

লোভোভিকো। কে, আমি, কি বলছেন?

ওথেলো। হ্যাঁ, আপনিই তো চাইলেন ওকে আমি আবার ফেরাই:
জানেন ও ফিরতে পারে, ফিরে ফিরে ঘোরে তবু চলে,
আবার আবার ফেরে, কাঁদতেও পারে, হ্যাঁ, কাঁদে।
এবং বিনীত নম্র, যা বললেন, নম্র বিনীত;
খুবই বিনীত। ঢালো, ঢালো চোখে যত জল আছে।
এ ব্যাপারে মহাশয়,—কি নিখুঁৎ দুঃখের ছলনা!—
আমাকে হুকুম হয়েছে.....চলে যাও, যাও,
পরে ডেকে পাঠাব আবার.....এ আদেশ মেনে নিয়ে
তেমনিই ফিরে যাচ্ছি.....দূর হ' সামনে থেকে।

[ডেসডিমোনার প্রস্থান]

কেসিও আমার বলে, বেশ; হ্যাঁ, আজ রাতে, অনুরোধ,
আপনি আমি এক সাথে করব আহার,
সাইপ্রাসে আগত জানাই।.....বাঁদর, বাঁদর, জানোয়ার।

[প্রস্থান]

লোভোভিকো। একি সেই মহামতি মূর, সমস্ত সেনেট যাঁকে
আদর্শ মানুষ জানে? একি সেই চরিত্র মহান
আবেগে যে অবিচল? যাঁর গুণ ধর্ম-মুকুটিন,
দুর্দৈব প্রহারে কিংবা দুর্বিপাক শরাঘাতে যাকে
স্পর্শ বা বিদীর্ণ করা অসম্ভব?

ইয়াগো। সেই তিনি নেই।

লোভোভিকো। মস্তিষ্ক ঠিকই আছে, যায়নি বিকল হয়ে?

ইয়াগো। যা দেখছেন তাই: তাঁর কী মানায়, তাই নিয়ে
আমার সাজে না বলা; যা মানায়, যদি তাই নয়,
প্রার্থনা আমার, তাই হন।

লোভোভিকো। ছিঃ ছিঃ স্ত্রীর গায়ে হাত?

ইয়াগো। কাজটা হয়নি বটে ভাল: তবু যদি বুঝতাম
এই হাত তোলাই চরম।

লোভোভিকো। তাঁর কি এমনি রীতি?
অথবা চিত্তের ফলে হঠাৎ চড়ে গিয়ে
এ অন্যায় প্রথম ঘটাল?

ইয়াগো। আহা, আহা!
আমি যা দেখেছি জানি, খোলাখুলি তাই বলা
আমার বিবেকে বাধে; আপনিই দেখতে পাবেন,
ওঁর চাল চলনেতে মিশেই যা বোঝাবেন, তাতে
আমার বলার আর দরকার হবে না; যান, যান,
দেখুন নজর করে কিভাবে চলেন।

লোডোভিকো। খুবই দুঃখিত, তিনি আমার ধারণামত নন।
[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য—প্রাসাদ কক্ষ।

[ওথেলো ও এমিলিয়ার প্রবেশ]

ওথেলো। তাহলে বলছ তুমি কিছুই দেখনি?

এমিলিয়া। শুনিনিও, সন্দেহও হয়নি কখনো।

ওথেলো। আচ্ছা, তুমি ওকে আর কেসিওকে একত্রে দেখেছ?

এমিলিয়া। কিন্তু তাতে অন্যায় দেখিনি, তাছাড়া শুনেছি আমি
প্রতিটি অক্ষর ওঁরা দুজনে যা বলেছেন।

ওথেলো। সেকি, ফুসফুস কথা হয়নি?

এমিলিয়া। না, প্রভু, কখনো না।

ওথেলো। তোমাকে বলেনি চলে যেতে?

এমিলিয়া। কখনো না।

ওথেলো। এই বস্ত্র, হাতপাখা, রুমাল, দস্তানা আনতে?

এমিলিয়া। কখনো না, প্রভু।

ওথেলো। আশ্চর্য।

এমিলিয়া। বিশ্বাস করুন, প্রভু, সাক্ষী তিনি, আমার যা কিছু
পুঁজি, যাদুমি তোহাই: অন্য কিছু যদি মনে থাকে
দূর করে দিন, তা আপনারই মনের ঘাসাই;
যদি কোনো হতভাগা আপনাকে ধোঁকা দিয়ে থাকে,
ভগবান তাকে শাস্তি দিন নরকের কীট করে;
কারণ, তিনিও যদি পবিত্রতা সতীসাধ্বী মন
কোনই পুরুষ নয় সুখী, সবচেয়ে পুণ্যবতী
সেও খল, কুৎসার মত।

ওথেলো। যাও, তাকে আসতে বল।

[এমিলিয়ার প্রস্থান]

বলল তো অনেক, তবে সে কুটনী নিতান্ত আনাড়ী
এটুকু সে বলতে পারে না ; এতো একটা ঘুনো বেশ্যা,
ঘুষেতে কুলুপ আঁটা নরভানির আস্ত সিন্দুক,
পূজো-আর্চা চলে কিন্তু শুধু, আমার মতকে দেখা।

[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রবেশ]

ডেসডিমোনা। প্রিয়তম, কি বলবে বল।

ওথেলো। এস সখী, কাছে এস।

ডেসডিমোনা। তোমার কি ইচ্ছে ?

ওথেলো। দেখি, দেখি, চোখদুটো,.....
আমার মুখের দিকে চাও।

ডেসডিমোনা। একি বিদ্‌ঘুটে খেয়াল ?

ওথেলো। ওগো দুতী, তোমার যা কাজ তাই কর,
মুখলকে একা রেখে দরজাটা বন্ধ করে যাও,
যদি কেউ আসে তবে কেসো কিংবা গলাখাড়া দিও :
তোমার কারচুপি কর, কর কারচুপি ; ভাগো।

[এমিলিয়ার প্রস্থান]

ডেসডিমোনা। পায়ে ধরি, বল, বল, কী তোমার কথার মর্ম ?
তোমার কথার আলা বুঝতে পারছি
কিন্তু কথা বুঝছি না কিছুই।

ওথেলো। তুমি কী ?

ডেসডিমোনা। তোমার স্ত্রী আমি, তোমারই সতীসাধ্বী স্ত্রী।

ওথেলো। একথা ধর্মের নামে বল্, বলে যা নরকে ;
এ দিব্যপ্রতিমা দেখে শিশাচেরা পারে তবে তোর
অঙ্গস্পর্শ নাই করে, তাই, আরো পাপ কর, তুই
সাধ্বী, ধর্ম সাক্ষী বল।

ডেসডিমোনা। ঈশ্বর জানেন, সত্যি বলছি।

ওথেলো। ঈশ্বর সত্যিই জানে স্রষ্টা তুই নরকের কীট।

ডেসডিমোনা। কি বলছ, কার কাছে ? কার সঙ্গে ? স্রষ্টা আমি কিসে ?

অথেলো। উঃ উঃ ডেসডিমোনা, যাও, যাও, চলে যাও।

ডেসডিমোনা। হায়রে দুর্দিন, তুমি কাঁদছ কিসের জন্যে?
আমি কি কারণ ওই চোখের জলের?
যদি তুমি মনে কর তোমাকে এখান থেকে
তলব করায় আমার বাবার হাত আছে,
আমাকে ক'রো না দোষী; যদি তিনি তোমাকে হারান
আমাকেও হারিয়েছেন।
বিধাতা আমাকে যদি
দুঃখ দিয়ে কষ্টত যাচাই, অন্যায়ত এ মস্তকে
লাঞ্ছনা ও অপমান অবিশ্রান্ত করত বর্ষণ,
আমাকে দারিদ্র্যে বৈধে আকণ্ঠ যদি ভরে দিত,
আশাপূর্ণ কারাবাস এই যদি হত বিধিলিপি,
তবু আমি অন্তরের কোনখানে পেতাম নিশ্চয়
এক বিন্দু ধৈর্যশক্তি; কিন্তু, হায়, আমাকে নিষ্ঠুর
মূর্তিমান করে রাখা, যাতে কাল যুগান্তরে তার
বীভৎসির অঙ্গুলি নির্দেশ করে……ওঃ ওঃ।
তবুও, তবু তা আমি হাসিমুখে সইতাম:
কিন্তু ওই, যেখানে লক্ষিত আছে হৃদয় আমার,
যেখানে আমার প্রাণ বাঁচে কিংবা মরে,
যে-উৎস সুখ থেকে আমার জীবনধারা বয়
অথবা শুকিয়ে যায়, সে আশ্রয় বঞ্চিত হওয়া,
কিংবা তা পঙ্কিল করে রাখা, ঘৃণা কৃমিকীট যাতে
অন্ন নেয় কুৎসা পাকায়। ধৈর্য, তুমি দেখ কিরে,
গোলাপী অধর ওই সুষুমার বেষ্টিত
কি বিকট, নরকের মত।

ডেসডিমোনা। আশা করি আমি সতী, এ বিশ্বাস আছে।

অথেলো। হ্যাঁ, যেন শ্রীঘরের মাহি কলাইখানায়,
ভিষগাত্মা হতে না হতে জোঙ্ক খুঁজতে ছোটে।
ওরে বিষলতা, তুই কেন এত মধুর সুন্দর?
এত মধু এ সুরভি, যারা অন্ন তোকে চেয়ে কাঁদে,
ছিল ভালো যদি তোর অন্ন নাই হত।

ডেসডিমোনা। যাব, না জেনে কী অপরাধে অপরাধী আমি?

ওথেলো। এই শুভ্র পত্রখানি, এই গ্রন্থ অমিথ্যা সুন্দর
"বেশ্যা" লেখা হবে বলে স্থির হয়েছিল?···কী করেছি?
করেছ কী। বাজারের পণ্য নারী ওরে।
যদি তোর কীর্তিকথা এই মুখে বলি, এ কপোল
অনন্ত চুল্লী হবে, তাতে সব লজ্জাশরম
জলেপুড়ে আঙরা হয়ে যাবে। কী করেছি।
এ কথায় স্বর্গ নাসাচ্ছদ করে, চাঁদ চোখ বোজে,
চুমু খায় যাকে পায় এমন যে কুলটা বাতাস
গুহ্যতম তাও কিনা পৃথিবীর অন্ধ্রে লুকোয়
পাছে কানে শোনে এই কথা।·····কী করেছি,—
নির্লজ্জ গণিকা!

ডেসডিমোনা। ধর্ম সাক্ষী, মিথ্যে এই অপবাদ।

ওথেলো। তুমি কি গণিকা নও?

ডেসডিমোনা। নই, ইষ্ট জানে।
স্বামীর সেবার জন্যে এ দেহ আমার
ঘৃণিত অবৈধ কোন পাপস্পর্শ থেকে রক্ষা করা
যদি গণিকার লক্ষণ না হয়, আমিও তা নই।

ওথেলো। সেকি, বেশ্যা নও?

ডেসডিমোনা। না, আমার ধর্ম আছে।

[এমিলিয়ার প্রবেশ]

ওথেলো। এও কি সম্ভব?

ডেসডিমোনা। ভগবান, ক্ষমা কর।

ওথেলো। তাহলে আমাকে মাপ কর:
মনে হয়েছিল তুমি ভেনিসের ধূর্ত বেশ্যা সেই
ওথেলোকে যে বিয়ে করেছে: শোন তুমি, ওহে বিবি,
তোমারই তো হক্‌ভর মেহেন্তের বিশ্বাসীত যেকে,
আহারদের দাসী, তুমিই তো, হ্যাঁ, তুমি, তুমি তো!
যা করার করেছি আমরা, এই নাও বখশিস্,
মোহরমুখ কর, আর, যা ঘটল রেখো তা গোপনে।

[প্রস্থান]

এমিলিয়া। হায় এই ভদ্রলোক কী ভেবেছে ?
কেমন আছেন দেবী, আছেন ভালো তো ?

ডেসডিমোনা। হয়েছি খুবের ঘোরে।

এমিলিয়া। আচ্ছা দেবী, কি হয়েছে আমার প্রভুর ?

ডেসডিমোনা। কার ?

এমিলিয়া। আমার প্রভুর গো।

ডেসডিমোনা। কে তোমার প্রভু ?

এমিলিয়া। যিনি আপনার প্রভু।

ডেসডিমোনা। আমার তো কেউ নেই, এমিলিয়া, আর কথা থাক।
আমি কাঁদতেও পারছি না, জবাব আমার কিছু নেই,
যা আছে তা চোখের এ জল : শোন ভাই, আজ রাতে
আমাদের বাসর শয্যাটা পেতে দিও : মনে রেখো ;
তোমার স্বামীকে ডেকে আনো।

এমিলিয়া। কী আশ্চর্য বদল।

[প্রস্থান]

ডেসডিমোনা। এভাবে আমাকে পায়ে ঠেলা—এই ঠিক, খুবই ঠিক ;
কী আমি করেছি যাতে আমার যা গুরুতর ত্রুটি
তাও তাঁর সামান্যও সন্দেহ জাগায় ?

[ইয়াগো ও এমিলিয়ার প্রবেশ]

ইয়াগো। আমাকে কি ডেকেছেন, দেবী ? খবর ভালো ত ?

ডেসডিমোনা। বলতে পারি না ; যারা দুষ্টুমোর শিশুকে শেখায়,
শেখায় শান্তভাবে, মিষ্টি কথা বলে ;
এমনি তো আমাকেও পারতেন শাসন করতে,
শাসনে শিশুই তো আমি।

ইয়াগো। কি হয়েছে, দেবী ?

এমিলিয়া। যেভাবে দেবীকে প্রভু যেন্না বলে অকথ্য ভাষায়
অপমান করেছেন, আহা, কি বলব ইয়াগো,
যার প্রাণ আছে সে তা সইতে পারে না।

ডেসডিমোনা। আমাকে ও নামে ডাকা যায় ?

ইয়াগো। নাম ? কোন নাম দেবী ?

ডেসডিমোনা। যা ও বলল, আমাকে যা বলেছেন স্বামী ?

এমিলিয়া। তিনি ওঁকে বেশ্যা বলেছেন। মদ খেয়ে চাওাতেও
করে না এ অপমান নিজের জনীকে।

ইয়াগো। তিনিই বা বললেন কেন ?

ডেসডিমোনা। জানি না, আমি তা নই, এইটুকু জানি।

ইয়াগো। কাঁদবেন না, কাঁদবেন না। যতই দুঃখের কথা।

এমিলিয়া। 'বেশ্যা' নাম শোনার জন্যে কি ছেড়েছেন তিনি তাঁর
বাপ ভাই, স্বজন স্বদেশ, ছেড়েছেন সেরা সেরা
সম্ভ্রান্ত পাত্রের ? এতেও কি কাঁদবে না লোকে ?

ডেসডিমোনা। আমারই এ অদৃষ্টের দোষ।

ইয়াগো। এর অন্য দিক ওঁকে।
এ দুর্মতি কোথা থেকে এলো তাঁর ?

ডেসডিমোনা। বিধাতা জানেন।

এমিলিয়া। আমার গলায় দড়ি, যদি না বজ্জাৎ কোন
বদমাস মতলববাজ, ধারাবী শয়তান
তোষামুদে ধড়িবাজ, চাকরী জোটাবার জন্যে
না রটায় মিথ্যে অপবাদ, আমার গলায় দড়ি।

ইয়াগো। ছেলেপন, এখানে কেউ সেরকম নেই, অসম্ভব।

ডেসডিমোনা। যদি কেউ থাকে, তাকে ভগবান করুন ক্ষমা।

এমিলিয়া। ক্ষমা—ফাঁসীর দড়িতে, ক্ষমা পাক নরকস্থুতে সে।
ওঁকে কেন বেশ্যা বলবে ? কার সঙ্গে দেখেছে সে ?
কোনখানে, কি প্রকারে, কবে, কিসে আঁচ করেছে সে ?
নিশ্চয় মুরকে কোন পাষণ্ড বেল্লিক, কোন
হতচ্ছাড়া পাজির পাতাড়া মিথ্যে করে লাগিয়েছে।
ভগবান, এই সব বজ্জাতের মুখোস খসিয়ে দাও,
সাচ্চা লোকের হাতে দিয়ে দাও বিছুটির ছড়ি,
যাতে সে উদম করে বজ্জাতকে চাবকে বেড়ায়
দুনিয়ার এবার ওধার।

ইয়াগো। চুপ, আস্তে কথা বল।

এমিলিয়া। মরণ হয় না তার। সেও তো এমনি ভদ্রলোক,
যে তোমায় যা তা বলে মাথাটা গুলিয়ে দেয়, ফলে
আমাকে মুরের সঙ্গে করেছিলে তুমিও সন্দেহ।

ইয়াগো। আস্তে উজবুক, যাও।

ডেসডিমোনা। বলুন, ইয়াগো,
কী উপায়ে ফিরে পাবো স্বামীকে আমার,
আপনি তরলা, যান তাঁর কাছে : সাক্ষী এই দিব্য বিভা,
জানি না, কেন বা তাঁকে ভালোবাসি। বলছি নত হয়ে :
যদি জ্ঞানে জ্ঞানে আচরণে আমার মনের গতি যদি
প্রেমের সীমানা তাঁর কখনো লঙ্ঘন করে থাকে,
অথবা এ চোখ কান, কিংবা কোন ইন্দ্রিয় আমার
মুগ্ধ হয়ে থাকে যদি অন্য কোন রূপে,
আজ কিংবা কোন কালে অতীতে বা অনাগত দিনে—
অক্ষুণ্ণ বিচ্ছেদে তিনি ভাসিয়ে দিলেও—
আমার হৃদয় যদি তাঁর প্রেমে না থাকে বিভোর,
তবে শাস্তি মুছুক আমার। নির্মমতা সব পারে।
পারে তা নিভিয়ে দিতে জীবন আমার, কিন্তু
প্রেম আমার অবিনাশী। 'বেশ্যা' বলতেই পারি না,
এই যে বললাম এতে মন উঠছে বিষিয়ে ;
যাতে এই নাম কিনতে হয়, আমাকে তা
করাবে এ প্রলোভন নেই দুনিয়ায়।
অনুরোধ, পাস্তা হন : এ তাঁর বিরক্তি শুধু :
রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ, তার
কিছু তাঁর আপনাতে সঞ্চেছে।

ডেসডিমোনা। তা না হয়ে আর কিছু যদি—

ইয়াগো। তাই, তাই, আমি বলছি। [তূর্যধ্বনি]
বাজনা বাজছে, শুনছেন, এসেছে ফিরে ভাক,
ভেনিসের পাঠানো দূত সব অপেক্ষা করছেন,
কাঁদবেন না, যান ভেতরেতে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

[ডেসডিমোনা ও এমিলিয়ার প্রস্থান]

[রোজারিগোর প্রবেশ]

কি খবর রোজারিগো ?

রোজারিগো। আমার সঙ্গে তোমার ব্যবহারটা ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

ইয়াগো। অন্যরকম কী দেখলে ?

রোজারিগো। ইয়াগো, তুমি প্রতিদিন কিছু না কিছু বলে আমাকে ধোঁকা দিয়ে চলেছ। এখন দেখছি তো, আমাকে সুযোগ সুবিধা ছুঁড়ে দেওয়া দূরের কথা, একটু আশার আলোও দেখাতে পারছ না। অনেক হয়েছে, আর আমি সইব না, তাছাড়া এতদিন যে বোকামি করেছি তাও আর চেকে ঢেপে রাখব না বলে দিচ্ছি।

ইয়াগো। আমার একটা কথা শুনবে, রোজারিগো ?

রোজারিগো। সত্যি কথা বলে দিচ্ছি, তোমার কথা ঢের শুনেছি, তোমার কথার কাজে কোনই মিল নেই।

ইয়াগো। আমার উপর খুব অবিচার করছ।

রোজারিগো। যা সত্যি তাই-ই বলছি। আমার যা কিছু ছিল সব তো খুইয়ে বসে আছি : ডেসডিমোনাকে দেবে বলে আমার কাছ থেকে হীরে জহরৎ যা আদায় করেছ, তার অর্ধেক পেলে অপ্সরাপরীর যে কোনও সন্ন্যাসিনীর মনও টলে যেত ; তুমি বলছ সে সব নিয়েছে, আমার দিকে তার মন ঝুঁকেছে, আমাকে সে প্রতিদান দেবে বলে আশা ভরসা দিয়েছে, অথচ কাজে তো কিছুই দেখছি না।

ইয়াগো। বেশ, বেশ, যাও।

রোজারিগো। 'বেশ', 'যাও', বললেই আমি যাচ্ছি। ব্যাপারটাও মোটেই বেশ নয়, বরঞ্চ বেশ গোলমেলে ঠেকছে, ক্রমেই আমার ধারণা হচ্ছে আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙা হয়েছে।

ইয়াগো। বেশ, বেশ।

রোজারিগো। আমি বলছি ; বেশ নয় ; আমি নিজের পরিচয় দিয়ে ডেসডিমোনার সঙ্গে দেখা করছি ; যদি সে আমার হীরে জহরৎগুলো ফিরিয়ে দেয়, আমিও আর ওকে চাইব না,

তবু তাই নয়, তাকে অবৈধভাবে কামনা করেছি বলে অনুতপ্ত হব ; কিন্তু যদি না দেয়, জেনে রেখো তোমার কাছ থেকে সব আদায় করব।

হয়েছে তোমার কথা ?

হ্যাঁ, হয়েছে, জেনে রেখো, এখন একটা কথাও বলিনি যা কাজে বলায় না।

বাঃ, বাঃ, এ্যাদ্দিনে তোমার ভেতর কিছুৎ দেখতে পাচ্ছি। রোডারিগো, হাতে হাত দাও ; এতদিন তোমার সম্পর্কে যা ভেবে এসেছি, এখন থেকে তা পালটে গেল, বুঝতে পারছি, তুমি যে-সে লোক নও : তুমি আমার ব্যবহারে অন্যায় দেখেছ, ঠিক বলেছ, তবু কিন্তু ভাই, সাচ্চা বলছি, তোমার ব্যাপার নিয়ে কোন রকম কারচুপি করিনি।

রোডারিগো। তা তো মনে হয় না।

ইয়াগো। মানছি। বাস্তবিক মনে হয় না, আর তোমার এই সন্দেহের পেছনেও যথেষ্ট বিচার বিবেচনা আছে : কিন্তু, রোডারিগো, যদি তোমার ভেতরে সেই পদার্থ থাকে, যা আগে থেকে এখন অনেক বেশী আছে বলে আমার বিশ্বাস, অর্থাৎ সাহস, শক্তি, মনোবল, তাহলে আজ রাতে তার প্রমাণ দাও। কাল রাতে যদি তুমি ডেসডিমোনাকে ভোগ করতে' না পাও, তাহলে ছলে বলে কৌশলে, যেমন করে পার, দুনিয়া থেকে আমার জানটাকে লোপাট করে দিও।

রোডারিগো। কি কাজ ? আমার সাধ্যের মধ্যে ? অন্যায় নয়ত ?

ইয়াগো। শোন, ওথেলোর জায়গায় কেসিওকে বসানোর জন্যে ভেনিস থেকে আজই হুকুম এসেছে।

রোডারিগো। সত্যি ? তা হলে তো ওথেলো ডেসডিমোনা আবার ভেনিসে ফিরে চলল।

ইয়াগো। না, না, সে এখন যাবে মরিটানিয়ায়, সুন্দরী ডেসডিমোনাকেও স্বভাবত সঙ্গে নিয়ে যাবে, অবশ্য যদি না কোন অঘটনের ফলে তাদের এখানে থেকে যেতে হয়। তাকে ঘরে রাখার নিশ্চিত উপায়, কেসিওকে সরিয়ে দেওয়া।

রোডারিগো। তাকে সরিয়ে দেওয়া, মানে?

ইয়াগো। মানে খুবই না, ওথেলোর ভাবনা যখন তার সীমাতীত করে দেওয়া, মানে একেবারে বিলু উড়িয়ে দেওয়া।

রোডারিগো। আর এ কাজটা তুমি আমাকে দিয়ে করাতে চাও, কেমন!

ইয়াগো। ঠিক ধরেছ, যদি সাহসে ভর করে তোমার পাওনা গণ্ডা লাভ করতে চাও। আজ রাতে সে একটা বেশ্যার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করবে, আমি সেখানে তার সঙ্গে দেখা করতে যাব; এখনো সে তার সৌভাগ্যের কথা জানে না। তার বেড়িয়ে আসার দিকে লক্ষ্য রেখে যদি তুমি ওৎ পেতে থেকো —আমি ব্যবস্থা করব যাতে সে রাত বারোটা থেকে একটার মধ্যে বেরোয়, তুমি তাহলে ইচ্ছামত তাকে ধারেন করতে পারবে: তোমাকে সাহায্য করতে আমি কাছাকাছি থাকব, আমাদের দুজনের হাত থেকে তাকে পার পেতে হবে না। চলে এসো, অমন করে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না; আমার সঙ্গে এসো, ওকে খতম করা যে কতখানি দরকার তোমাকে এমন ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে তোমার নিজেরই মনে হবে ওকে শেষ করা তোমার একান্ত কর্তব্য। খাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে, হাতও অনেক রয়েছে: এখন কেটে পড়।

রোডারিগো। এ সম্পর্কে আমার আরও খোলা দরকার।

ইয়াগো। আলবৎ, তোমার মনে কোন সন্দেহ রাখব না।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রাসাদের অন্য কক্ষ]

[ওথেলো, লোডোভিকো, ডেসডিমোনা, এমিলিয়া ও অনুচরবর্গের প্রবেশ]

লোডোভিকো। ব্যস, ব্যস, আপনি আর কষ্ট করবেন না।

ওথেলো। তাতে কি হয়েছে, বেড়ানো আমার পক্ষে ভালো।

লোডোভিকো। তবে, আমি চলি। অধীনের বন্দেগী।

ডেসডিমোনা। শুভরাত্রি, সুস্বাগত।

ওথেলো। একটু কি বেড়াবেন?……

ও, ডেসডিমোনা,—

ডেসডিমোনা। কি বল ?

ওথেলো। তুমি শুতে যাও, আমি এখুনি ফিরে আসছি, তোমার পরিচারিকাকে ছুটি দিয়ে দিও।...যাও, যা বললাম, খেয়াল রেখো।

ডেসডিমোনা। তাই হবে।

[ওথেলো, লোডোভিকো, পরিচারকগণের প্রস্থান]

এমিলিয়া। কি খবর ? এখন ওঁকে ত দেখছি শান্ত অনেক।

ডেসডিমোনা। আমাকে যেমন বলে ফিরবেন একটু পরেই,
আমি যেন শুতে যাই, সেই সঙ্গে তোমাকেও
ছুটি দিয়ে দিই।

এমিলিয়া। ছুটি, আমাকে দেবেন ?

ডেসডিমোনা। এ তাঁর আদেশ, তাই, শোন এমিলিয়া,
তোমার পোষাক দিয়ে তুমি চলে যাও ;
এখন কিছুতে তাঁকে অসন্তুষ্ট করা ঠিক নয়।

এমিলিয়া। ভালো হত আপনি তাঁকে না যদি দেখতেন।

ডেসডিমোনা। আমি তা মানি না, তাঁর মধ্যে এমনি হারিয়ে গেছি
যে তাঁর গাঢ়ন, জিদ, ভ্রূকুটি, সবেতে,—
চুলটা যাও না খুলে,—তাই আমি তাঁরই সোহাগ।

এমিলিয়া। আপনি যে চাদর পাততে বলেছেন, দিয়েছি তা পেতে।

ডেসডিমোনা। আসলে দবই এক : কি নির্বোধ আমাদের মন।
মরি যদি তোমার আগে, তোমাকে রাখছি বলে, ওই
চাদরে আমাকে ঢেকে দিও।

এমিলিয়া। ছিঃ ছিঃ : ওকথা বলে না।

ডেসডিমোনা। আমার মায়ের এক দাসী ছিল, নাম বারবারি,
ভালোবেসেছিল যাকে সে পাগল হয়ে গিয়ে
তাকে ছেড়ে চলে যায় ; তার প্রিয় গান ছিল এক,
গানটি পুরনো, যেন কান্নাভরা তারই কাহিনী,
এই গান গেয়েই সে মরে ; আজ রাতে সেই গান
কিছুতে পারছি না ভুলতে।...কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে

ঘরে গিয়ে একপাশে মাথাটা হেলিয়ে গান গাই
দুখিনী মেয়েমানুষের মত। তাড়াতাড়ি নেয়ে নাও।

এমিলিয়া। আনব কি পোষাক পোষাক?
না, এইটে খুলে নাও।

ডেসডিমোনা। এই লোডোভিকো রূপবান।

এমিলিয়া। খুবই সুন্দর দেখতে।

ডেসডিমোনা। আলাপেও বড় ভাল।

এমিলিয়া। আমি ভেনিসের একটি মেয়েকে জানি যে তার একটু অধর সুধা পাবার লোভে সেলেস্টাইন পর্যন্ত যেতে রাজী।

ডেসডিমোনা। [গান] "হেথা অভাগীর দীর্ঘশ্বাসে বকুলপাতা ঝরে,
গায় সে বসে কান্নাভরা গান:
কোলের উপর মাথাটি তার, হাতটি বুকের পরে,
গায় সে কান্না, কান্নাভরা গান।
নদীর ধারায় হায় দুখিনীর কান্না সুরময়,
গায় সে কান্না, কান্নাভরা গান।
তার দুচোখের অশ্রুধারায় পাষাণ গলে যায়;"—
এগুলো সরিয়ে রাখো:—
"গায় সে কান্না, কান্নাভরা গান।"
আর যেন ক'রো না গো, এখনই আসবেন তিনি:—
"গায় সে, আমার কাঁটার মালা, তাই তো মণিহার।
কেউ ছুঁয়ো না তারে আমার যে পরাণ বালা"
না, না, এটা তো না। কে ও? দোরে কে বা দিচ্ছে?

এমিলিয়া। কেউ না, বাতাস।

ডেসডিমোনা। [গান] "তাকে আমি কপট বলি; সে তাই শুনে বলে,
হায় রে কান্না, কান্নাভরা গান:
আমি যদি আনমনা যাই, তুমিও যেও চলে।"
রাত হল, এঘরে এসো: চোখদুটো কড়কড় করছে
এর ফলে কাঁদতে হবে কি?

এমিলিয়া। না, না, ওসব কিছু না।

ডেসডিমোনা। তাই হয় তবে। হিঃ, এই পুরুষজাত, হিঃ হিঃ।
এমিলিয়া, তুমি বল, কখনো কি ভাবা যায়
এমন নারীর কথা, যে স্বামীকে প্রতারণা করে
এরকম বিশ্রীভাবে?

এমিলিয়া। কিছু কিছু আছে বৈকি।

ডেসডিমোনা। তুমি তা করতে পার, পৃথিবীর সম্পদ পেলেও?

এমিলিয়া। পারেন না আপনি কি?

ডেসডিমোনা। না, স্বর্গে রবালোক সাক্ষী।

এমিলিয়া। আমিও পারি না কিন্তু এই যুক্ত স্বর্গের আলোয়,
তবে বেশ পারি আমি আঁধারে আড়ালে।

ডেসডিমোনা। পৃথিবীর বিনিময়ে এ কাজ করতে পার তবে?

এমিলিয়া। পৃথিবীটা বড্ড বড়, ওইটুকু সামান্য পাপের
বড় বেশি দাম।

ডেসডিমোনা। যাই বল, পারবে না কখনও।

এমিলিয়া। যাতবিক বলছি, আমার মতে, আমার পারা উচিত এবং পারার পরে অস্বীকার করাও উচিত; তবে হ্যাঁ, একটা খেলো আচ্ছি বা কয়েকহাত কাপড়ের ছিট, বা একটা আংটি, বা গুড়না বা একটু মাথার ফিতে বা এই ধরণের ছোটোখাটো জিনিসের জন্য তা করতে যাব না; কিন্তু সারা দুনিয়াটা পেলে? আচ্ছা, কে এমন বোকা আছে যে নিজে একটু অসতী হয়ে তার স্বামীকে রাজাধিরাজ করবে না? এর জন্যে আমি নরকে যেতেও রাজী।

ডেসডিমোনা। দুনিয়ার বদলেও আমি যদি এ অন্যায় করি,
আমাকে শাপান্ত ক'রো।

এমিলিয়া। ছি ছি ফিল, অন্যায় যা, তা তো এই দুনিয়ার চোখেই অন্যায়; আর, আপনার ওই কষ্টের বিনিময়ে দুনিয়াটা আপনার হাতে এলে, অন্যায়টা আপনার নিজস্ব দুনিয়াতেই হবে। তখন ও নিজের মধ্যে আপনি অন্যায়কে ন্যায় করে নিতে পারবেন।

ডেসডিমোনা। এরকম ভেবে আমে তাবতেই পারি না আমি।

কষ্ট নেবেন ? এত আছে যারা দেহের বদলে দুনিয়াটা নিয়ে
তাদের বলবল দিয়ে তা ভরিয়ে তুলতে পারে।
কিন্তু আমি মনে করি স্বামীদের ত্রুটির অন্তেই
স্ত্রীদের পতন ঘটে; হয় তারা কর্তব্যে শিথিল
আমাদের পাওনা গণ্ডা অপরের কোলে ঢেলে আসে,
নয়ত বা অকারণ সন্দেহ আলায় জলে পুড়ে
আমাদের পাশে বেড়ি বাঁধে : কিংবা তারা ঘরে ধরে,
অথবা রাগের চোটে খরচাপাতি বন্ধ করে দেয়।
আমাদেরও রাগ আছে ; নারীমন গলেও যেমন
জলতেও পারে কিন্তু। স্বামীরা খেয়াল রাখে যেন
স্ত্রীরা তাদেরই মত : চোখ নাক তাদেরও আছে :
স্বামীদের মত তারা তাদের কিছুও পায় আর—
কিসে জ্বাল, কিসে মিষ্টি। কেন তারা আমাদের ছেড়ে
অপরকে নিয়ে মজে থাকে ? একি ঘিনিমিনি খেলা ?
মনে হয় তাই : মডিস্রম এর কি কারণ ?
বোঝায় তাই : একি মডিস্রম দুর্বল মনের ?
সম্ভবত তাও। তবে কি খেলার পাশ, মডিস্রম,
দুর্বলতা, পুরুষের একচেটে, আমাদেরও নেই ?
আমাদের ঘরে রাখে যেন ; নইলে জানবে তারা
আমরা যে পাপ করি, তা তাদের শোধনের ধারা।

ডেসডিমোনা। হাত ধর, যাও তুমি : বিধাতা আমাকে মতি দিন,
মনের মত যা দেখি, আমি যেন আনন্দে ঘুমিন।

[প্রস্থান]

শেক্‌সপিয়রের কমেডি ও নারীচরিত্র

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠ কবি ও সমালোচক টি. এস. এলিয়ট শেক্‌সপিয়রের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন গত চারশ' বছরে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন লোক শেক্‌সপিয়রের নাটককে যখন যেমনভাবে দেখেছেন তা থেকে ইউরোপীয় সভ্যতার চারশো' বছরের ইতিহাস গঠন করা সম্ভব। সমাজের বা মানুষের যে সমস্ত গূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্ব বা সমস্যা শেক্‌সপিয়রের নাটকের উপজীব্য তা কালজয়ী, কারণ বিধিবদ্ধ ধারণার চেয়ে মানুষের কথাই সব সময় বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে দ্বিতীয় রিচার্ডের রাজত্বকালে ইংল্যাণ্ডের মানুষ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গভীর সমস্যার গুরুভার বহন করে এগিয়ে চলেছিল। এলেন তৃতীয় রিচার্ড - অন্যায়ভাবে সিংহাসনে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেন। এইরূপে পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিখ্যাত "Wars of Roses"-এর সূত্রে এই অবস্থার চরমতম অধ্যায় ও অবসান। এদিকে টিউডর শাসন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইংল্যাণ্ড দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। সামন্তরাজদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব এবং পারস্পরিক গৃহবিবাদ, কলহ ও দ্বন্দ্ব নতুন ধনতান্ত্রিক পথকে ক্রমশঃ প্রশস্তিত করছিল। এই সূত্রে প্রাচীনপন্থী কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামন্ততান্ত্রিক যুদ্ধবেরা ক্রমশঃ প্রগতিশীল নব্য বুর্জোয়া শক্তির কাছে হার স্বীকার করে পিছু হটছিল। শ্রেণী-সমতার ঠিক এই মুহূর্তটিতে রাজতন্ত্র ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদিও মানী এলিজাবেথের সময়ের নিঃসন্দেহে একটি সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো তবুও ইচ্ছাকৃতই হোক বা অনিচ্ছাকৃতই হোক এই সরকার নব্য বুর্জোয়া শক্তির অভ্যুত্থানের প্রথম ধাপ।

এই আপাতবিরোধী সমাজব্যবস্থায় শেক্‌সপিয়রের দৃষ্টিভঙ্গী ততটাই জটিল যতটা কিনা তৎকালীন বাস্তব সামাজিক অবস্থা। একদিকে যেমন তিনি সামন্ততান্ত্রিক দ্বন্দ্ব, কলহ, রক্তপাতে ক্ষুব্ধ, অন্যদিকে নব্য ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানিয়েও নতুন মানুষের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাবকে তিনি সর্বদাই যে প্রশংসা করে গেছেন এমন নয়। শিল্পী হিসাবে একদিকে তিনি যেমন এই নতুন জীবনদর্শনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, অন্যদিকে তিনি ততটাই আঘাত পেয়েছিলেন

সমাজের নতুন আয়োজনের স্বার্থপরতায়। মানুষ সম্বন্ধে শেক্সপিয়রের গভীর বিশ্বাস ও আস্থাই তাঁকে মানুষের সত্যিকারের চেহারা তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। শেক্সপিয়রের কমেডি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমাদের সামনে বাধা তুলে দাঁড়ায়, তা হ'ল, এই সমাজব্যবস্থায় নারী-জাতির মূল্যায়ণ কীভাবে হ'ত। সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় পরিপুষ্ট যে সমাজ সেখানে নারী ছিল পরিমানের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সে যখন যার অধিকারে তখন তার অনুগত। কিন্তু বুর্জোয়া ভাবধারায় সমাজে নারীর স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হ'ল। পুরষার ভাবধারির স্থানে অধিকার করল টাকা। ঠিক সেইভাবেই নারীর জয়মালা এসে পড়তে লাগল বিত্তবানের কণ্ঠে। তাই হ্যামলেটের কাছে রানীর অসহায় আত্মসমর্পণ বা ওফেলিয়ার নীতিবিগর্হিত আনুগত্য অসহ্য।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কাঁট, হাস্যরসের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, তা হচ্ছে 'strained expectation being suddenly reduced to nothing'. পরবর্তীকালে এই মতবাদই নানাভাবে পরিবর্ধিত এবং পরিবর্জিত রূপে স্বীকৃত হয়েছে।

তাহলে কমেডির গোপন কথাটি কী? বার্গস এবং ফ্রয়েড দু'জনেই স্বপ্ন এবং হাস্যোদ্দীপক অবস্থার মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন। আরো আশ্চর্য এই যে,প্রতিটি স্বপ্নের অনুভূতিই, তা সে ভয়ংকরই হোক বা সুন্দরই হোক, নিশ্চিতই জাগরণ হাস্যরসের অবতারণা করে। কিন্তু যতক্ষণ এই স্বপ্ন প্রক্রিয়া চলেছে ততক্ষণ এই অভিজ্ঞতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কী? এত বাস্তব, জেগে থাকার খুঁটিনাটি অভিজ্ঞতাই এই অভিজ্ঞতায় হুবহু বর্তমান। এ দু'টি অভিজ্ঞতাকে যদি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বিচার করি তাহলেই কমেডির গূঢ় তাৎপর্যটি ধরা পড়বে। প্রত্যেক মানুষই বাইরে জগতটিকে বোঝবার এবং উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে, সেই জগত সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতাকে জিইয়ে রাখতে চায় এবং সেই কাল্পনিক জগতকে নিজের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু সেই বিশেষ অবাস্তবের মধ্যেও বাস্তবতা আছে—তাতেও আনন্দ আছে, কারণ মানুষ দেখে, এর মধ্যেও জীবনের প্রাচুর্য বা উজ্জ্বলতার অভাব নেই। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, কি করে এই বাইরের জগত একই সঙ্গে বাস্তব ও অবাস্তবের অনুভূতি প্রদান করতে পারে। বার্গস এ ব্যাপারে বলেছেন : 'The first point to which attention should be called is that the comic does not exist outside the pale of what is strictly human'.

কমেডির এই বাস্তব-অবাস্তব চেহারা মানবজীবনের এমন কতকগুলি অবস্থা যাকে আমরা আস্বাদও করতে পারিনা আবার উপেক্ষাও করতে পারিনা।

হাস্যোদ্দীপক এই অবস্থা উদ্ভাবন, প্রযোজনা, কারণ এ মানসিক এবং এ অবাস্তব কারণ কমেডিয়ান এর মধ্যেও অবস্থান করতে পারে না এবং এর বিপক্ষেও না।

কিন্তু শেক্সপিয়রের কমেডির বৈশিষ্ট্য কী? শুধুই কি তিনি কতকগুলি জটিল পরিস্থিতি বা ঘটনার পাকচক্র সৃষ্টি করেছিলেন এবং নায়কের অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন? তাই কি? তা যদি হ'ত তাহলে শেক্সপিয়র শুধুই তাঁর যুগে সীমাবদ্ধ থাকতেন এবং ঘনষ্ট বা ফেচারের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে পরিগণিত হতেন। সাধারণত কমেডি দৈনন্দিন জীবনের অসম্ভাব্য বিষয় নিয়ে মাখা ঘামায় কিন্তু দর্শকদের কাছে সেটা একটা বিজ্ঞির ঘটনা। শেক্সপিয়র কিন্তু কী কমেডি, কী ট্র্যাজেডি সবেতেই চরিত্রের গূঢ় তাৎপর্য নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। কোন ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলিকে বাইরে থেকে দেখার প্রচেষ্টা নেই বরং অন্তস্তল থেকে বিশ্লেষণ শুরু হয়। তাছাড়া অনেক সমালোচকের মতে শেক্সপিয়র ট্র্যাজেডির চেয়ে কমেডিগুলিতে অনেক বেশী সফল। ঠিক অতটা জোর করে না বললেও একথা নিশ্চয়ই বলা যায়, শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে কমেডির গুরুত্ব অনেক বেশী, কারণ কমেডি শুধুই জীবনের বা সমাজের প্রতিচ্ছবি নয়, কমেডি সমাজের বা জীবনের ওপর বক্রতা বা প্রয়োজনবোধে কটুকাটব্যও বটে, তাই অনেক বেশী সুদূরপ্রসারী তার লক্ষ্যভেদ। কিন্তু শেক্সপিয়রের কাছেও কমেডি প্রকটতর শিল্প নয়, বরং প্রকাশের শিল্প। কমেডির চরিত্রগুলি সব অবস্থাতেই জীবনকে আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করবে, এটাই হ'ল তাদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এবং এখানে তারা ট্র্যাজেডির নায়কের থেকে ভিন্নধারা, তাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন দিতেও পরাঙ্মুখ নয়। বিশেষ কোন আদর্শ বা অনুভূতিকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা কমেডির নায়কের নেই কারণ তার কাছে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে আদর্শ আর কিছু থাকতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ শাইলক যদি ট্র্যাজেডির নায়ক হ'ত তাহলে তার মানসিক পরিবর্তন ঘটা সম্ভবপর নয়, কারণ ট্র্যাজিক অনুভূতি কোন বোকামিতায় যার ধারে না। তাই শাইলকের চরিত্রের চরমতম পরিণতি যেখানে মেয়ের প্রতি ভালবাসা, ধর্মীয় সংস্কার, প্রতিহিংসা এবং অর্থগৃধ্নুতা সব ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে এক ভাবসাম্যের সৃষ্টি করেছে। তাই যখন তার প্রাণ বিপন্ন তখন প্রাণ

বাঁচাতে গিয়ে এদের অন্তর্বৃত্তিকে জানতে হয়েছে একে একে এবং প্রাণের বৈপরীত্যে এদের অন্তর্বৃত্তি তুঙ্গ— তাই নাটকও প্রযাপত কবিক।

শেক্সপীয়রের নাটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জুড়ে রয়েছে তাঁর নারী-চরিত্রগুলি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে দু-একটি ছাড়া সব ট্র্যাজেডির মূল গায়েন হলেন একজন পুরুষ। কিন্তু কমেডির অধিকাংশ নায়ী, পুরুষ নয়। এই কমেডির নামে ঘটনাবহুল বিচিত্র জীবন সব তাদেরই ঘিরে। এর কারণ খুঁজতে গেলে দেখব, জীবন এবং নাটকের মধ্যে মহাকবি এক পারম্পর্য খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। ট্র্যাজেডিতে স্বভাবতই এই পারম্পর্য এত নিকটতর নয় যতটা ভিন্ন কমেডি-গুলিতে। জীবনের ক্ষেত্রে যা সত্য শিল্পের ক্ষেত্রে তা অসত্য নয়। মানুষের জীবনে সুখ ও সাফল্যে নারীর দান পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী একথা অনস্বীকার্য এবং এটাই হল শেক্সপিয়রের কমেডির মোটা কথা। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও ঠিক, সব নায়ীই যে জীবনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে এমন নয়। নারী মহাকবির কাছে পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী চতুরা, তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান অনেক বেশী এবং স্বভাবতই তাদের দায়িত্ববোধও অনেক বেশী। অনেক সময়ই জীবনে আমরা অবস্থার যার্থার্থ্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারি না— সেজন্য জীবন ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়।

অধ্যাপক চার্লটন শেক্সপিয়রের কমেডি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, তাঁর কমেডিগুলি জীবনকে গড়ে তোলবার উদ্যোগের এক প্রমাণ—'an explicit recognition that man depends, not merely for his success in life, but for his survival through life, on his possession of so much cool reason that he may secure for himself immunity from the mortal diseases, which arising from his emotional and imaginative faculties, may render him unable to distinguish between bushes and bears.'

এ ছাড়া মিডসামার (A Midsummer Night's Dream) কথাও আমরা তাঁর কমেডির তাৎপর্য উপলব্ধি করি :

> The lunatic, the lover, and the poet
> Are of imagination all compact :
> One sees more devils than vast hell can hold,—

That is the madman : the lover, all as frantic,
Sees Helen's beauty in a brow of Egypt :
The poet's eye, in a fine frenzy rolling,
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven,
And, as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poets' pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

প্রেমের অনুভূতি শেক্সপিয়রের কমেডির একটি মূলসুর। জীবনে সুখ ও সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রেমের অবদান বড় সামান্য নয়। ভালবাসার ক্ষমতা মহাকবির চোখে প্রতিভাবর শিল্পীর চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। শেক্সপিয়রের কমেডিগুলিতে ভালোবাসা এবং ভালোবাসা পাওয়া এই দুটিই মূলসুর।

রোমান্টিক কমেডিগুলিতে যে নারীচরিত্রগুলিকে আমরা দেখি তাদের প্রায় সকলেরই চরিত্রের দার্ঢ্য ও মনের দৃঢ়তা লক্ষণীয়। কিন্তু শেষ অধ্যায়ের নাটকগুলিতে যে নারীদের সন্ধান পাই মনের দিক থেকে তারা অনেক অপরিণত। মিরান্দা, পার্ডিটা, কিংবা ইমোজেনের তুলনায়, পোর্শিয়া, রোজালিণ্ড বা বিয়াট্রিস অনেক বেশী পরিণত মনের পরিচয় দেয়। অনেকে তাঁর শেষ অধ্যায়ের নারীচরিত্রগুলিকে শেক্সপিয়রের দুহিতা বলে সম্বোধন করেছেন। শেক্সপিয়র তাদের যেন সর্বদা স্নেহবৎসল পিতার মত দেখেছেন। তারা নাটকের আর সব চরিত্রের চেয়ে শীর্ষদেশে বসে। এরা জীবনের ব্যাপ্তি বা সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন কাজে অগ্রসর এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।

শেক্সপিয়র রোমান্টিক কমেডি এবং শেষ অধ্যায়ের নাটক এই দু'ক্ষেত্রেই পারিবারিক সম্পর্কে যে বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলনের নীতি অনুসরণ করেছেন তাতে নাটকের গঠনে যে জটিলতার সৃষ্টি হয় বিয়োগান্তে তার গুরুত্ব অনেক। তাই যেন কিংবা পিতা ও পুত্র বা কন্যার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণে যে বিচ্ছেদ (উদাহরণত উইন্টার্স টেইল, সিম্বেলিন বা পেরিক্লিস ও টুয়েলফথ নাইট)

সেখানে সামাজিক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার বলপূর্বক পিতা তার সন্তান-সন্ততিদের ওপরে যে অধিকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন নারীর স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি হিসেবে পরবর্তীকালে সেই সামাজিক বিন্যাসের পুনর্গঠন থিয়েটার ও নাটকের ক্ষেত্রে এক অভিনব পরিকল্পনা, সেখানে থিয়েটারের ভাষা ও নাটকের বক্তব্য দুইই স্পষ্টত প্রকাশিত হয়েছে।

'আর্টেই অফ কেনিস' যদি মহান নাটক হয় তা অবশ্য কখনই গল্পের বাঁধুনির জন্য নয় কারণ সেক্সপিয়রের মহত্ত্ব এইখানেই যে তিনি ঘটনা থেকে চরিত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

অনেক সমালোচকের মত অবশ্য এই যে 'মিডসামার নাইট্স ড্রীম' সেক্সপিয়রের কমেডির ক্ষেত্রে প্রথম সার্থক পরীক্ষা। এ নাটকের আগে তিনি যেসব নাটকে হাত পাকিয়েছেন সেখানে তিনি নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীকে একত্রিত করেছেন। এ নাটকে তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। এখানে পরীরাজ্য, বস্তুজগতের প্রেমিক-প্রেমিকা এবং আথেন্সের মেটে খাওয়া মানুষ সব এক সঙ্গে এসে জুটেছে। কিন্তু নাট্যকারের এখনই মুন্সীয়ানা যে পরীরা এসে পৃথিবীতে অনায়াসে অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেমনভাবে, তেমনই অবলীলাক্রমে তাঁতি বটম্ পরীরাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং এরা সবাই থিসিয়াস, লাইস্যাণ্ডার, ডিমিট্রিয়াস, হেলেনা ও হার্মিয়ার নাটকে অবাধে অংশ গ্রহণ করে চলেছে।

এখানেও সেই কন্যার স্বাধীনসত্তার ওপর পিতার অনধিকার হস্তক্ষেপের ফলে হার্মিয়া ও লাইস্যাণ্ডার আইনের নাগালের বাইরে পালাচ্ছে। ইজিয়াস ও হার্মিয়ার সঙ্গে 'রমেলো' নাটকের ক্যাপালেট ও জেসিকোনার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বাস্তব ও অবাস্তবের সংঘর্ষ পুরো নাটকের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে। অনেকে মনে করেন, এ নাটকের প্রধান কারিগর পরীরা, সেখানে বস্তুজগতের মানুষ শুধু মাত্র একটি সংলগ্ন ঘটনা। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা দরকার যে নাটকের সমস্ত ঘটনাই কিন্তু ঘটে চলেছে থিসিয়াস আর হিপোলিটার বিবাহকে কেন্দ্র করে। পরীরাজ ওবেরণ এসেছেন দূর থেকে ('the farthest steep of India') যাতে এ বিবাহ সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয় এবং তাদের জীবন আনন্দ ও ও স্বাচ্ছন্দ্যের ফলশ্রুতে মুখরিত হয়ে ওঠে। থিসিয়াসের সঙ্গে টিটানিয়ার শুদ্ধ-প্রণয়ের কথা অবিদিত নয় এবং তিনিও থাকবেন বিবাহের শেষ অনুষ্ঠান

পর্যন্ত। আমেদের খেটে খাওয়া মানুষরা ঘুটেছে রাজারানীর বিবাহে তাদের নাটক নিয়ে। বটম্ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নাটকের ব্যাখ্যান করতে গিয়ে থিসিয়াস যে কথা বলেছেন তাকে আমরা এ নাটকের যথার্থ বক্তব্য বলে মেনে নিতে পারি। তাঁর কথায় 'The best in this kind are but shadows, and the worst are no worse, if imagination amend them.' শেক্সপিয়র এ নাটকে তাঁর নায়িকাদের নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসেননি যেমন কিনা তিনি করেছেন পরবর্তী নাটকে—'টুয়েলফ্থ নাইট'-এ ভিয়োলা বা 'মাচ-এডু আবাউট নাথিং'-এ বিয়াট্রিসের চরিত্র নিয়ে। কিন্তু যে-পদ্ধতি তিনি এখানে অবলম্বন করেছেন তা 'চৈতালী রাতের স্বর'কে ব্যাখ্যা করতে যথাযথই কাজ করেছে। হেলেনা, হার্মিয়া, লাইস্যাণ্ডার ও ডিমিট্রিয়াস পালের পাকে-চক্রে পড়ে প্রেমের যুক্তির বহস্যই প্রমাণ করে চলেছেন।

'মার্চেণ্ট অফ্ ভেনিস্' নাটকের শাইলক্ একটি অমর সৃষ্টি। পোর্শিয়া যদিও অবশ্য শাইলকের বাঁচির কাছে জিয়মান তবু তিনিই যে এ নাটকের কেন্দ্রবিন্দু একথা অনস্বীকার্য। মিলেস্ জেমিসন পোর্শিয়া সম্বন্ধে বলেছেন 'all the noblest and most loveable qualities that ever met together in woman.' তিনি তাঁর এক প্রবন্ধে পোর্শিয়া, ইসাবেলা, বিয়াট্রিস ও রোজালিণ্ড সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, তাঁরা characters of intellect because when compared with others they are at once distinguished by their mental superiority'। এ চরিত্রে বিন্দুমাত্র ভাবপ্রবণতা বা আবেগের অবকাশ নেই, আছে দৃঢ়তা ও প্রচণ্ড মানসিক স্থৈর্যের উদ্ভাসন। প্রিন্স অফ্ আরাগন বা মরক্কোকে অপছন্দ করলেও যদি তাঁরা যথার্থ পাত্রটি বেছে নিতেন পোর্শিয়া কিন্তু তাদের স্বাধীনে বরণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হতেন না। পোর্শিয়া ভালভাবেই জানেন যে 'the brain may devise laws for the blood, but a hot temper leaps o'er a cold decree,—such a hare is madness the youth, to skip o'er the meshes of good counsel the cripple ;' (I, II) তাঁর গভীর আত্মবিশ্বাস এবং সংবেদনশীল মনই তাঁর চরিত্রকে এমন প্রগাঢ় গাম্ভীর্য অর্পণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমে তিনি শাইলকের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানান, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস আছে যে যদি তিনি এতে সফলকাম না-ও হন তাতেও ক্ষতি নেই কারণ শেষ পর্যন্ত পোর্শিয়া শাইলকের বিরুদ্ধে

তাঁর পাওনাদার অন্টি কেপল করেন, তখন শাইলকের পরাজয় সুনিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট হয়। এই নাটকে শাইলকের শেষ কথাগুলি লক্ষ্য করলে আমরা দেখি

I pray you give me leave to go from hence
I am not well. Send the deed after me,
And I will sign it. (IV)

শাইলক কি শেষ পর্যন্ত হার মানেন? অধ্যাপক হাডসন অবশ্য মুক্তকণ্ঠে বলেছেন: 'Shylock's character is essentially tragic: there is none of the proper timbre of comedy in him.'

এর পর আমরা যদি আমরা 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকের বিশ্লেষণ করি দেখব রোজালিণ্ড এ নাটকে শুধু মাত্র মুক্তবায়ুর হিসেবেই কাজ করছেন না বরং অন্য চরিত্রের সঙ্গে এঁর যোগসূত্রও পরিষ্কার ভাবে পরিস্ফুট হবে। টাচ্‌স্টোন ও অ্যাডাম এ নাটকে অংশ গ্রহণের চেয়ে দর্শক হিসেবেই অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে রোজালিণ্ড অর্লাণ্ডোর অহেতুক বিষাদের ব্যাখ্যান দিয়ে তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণে সাহায্য করেছেন। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে, পোর্শিয়ার শাইলকের মত রোজালিণ্ডের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী চরিত্র এ নাটকে না থাকায় নাটকীয়তা ঠিক অতটা ঊর্দ্ধে ওঠে না যতটা কিনা 'মার্চেন্ট অফ ভেনিসে'র বিচারের দৃশ্য। বার্নার্ড শ তাঁর 'The Dark Lady of the Sonnets'-এ শেক্সপিয়র-এর মুখে 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' ও 'মাচ এডু আবাউট নাথিং' লেখার একটি সেন্সিয়ান জবাবদিহি করিয়েছেন, সেটা প্রণিধানযোগ্য :

I have also stole from a book of idle wanton
tales two of the most damnable foolishness in the world,
in the one of which a woman goeth in man's attire
and maketh impudent love to her swain, who pleaseth
the groundlings by overthrowing a wrestler :
I have writ these to save
my friends from penury, yet shewing my scorn for
such follies and for them that praise them by calling
the one 'As You Like It' meaning that it is not
as I like it,.....

কিন্তু শেক্সপিয়রের কোন ট্রয়েডিতে গৌণ চরিত্রগুলি এত প্রাধান্য পায়নি যেমন কিনা এ নাটকে পেয়েছে। টাচ্‌স্টোন হয়ত একটি ভাঁড় কিন্তু এ নাটকে তার স্থান টুয়েলফ্‌থ নাইটের ফেস্টের চেয়ে অনেক বেশী মূল্য। টাচ্‌স্টোনের চরিত্র আরও অনেক বেশী জটিল। অনেক সময়েই সে বাঙ্গাত্মক অর্থের মুখপাত্র, কিন্তু এখানে তার পরিধি সীমিত। এ প্রসঙ্গে রোজালিণ্ডের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তার মতে টাচ্‌স্টোন 'wiser than he is ware of'। তার পক্ষে জাকুসকে বোকা বানানো সোজা কিন্তু কোরিনের ক্রমবীণ দার্শনিক সামনে সে ত্রিয়মান। শেষ পর্যন্ত রোজালিণ্ডই টীয়ে এসে তরী ডোবাবার আগেই হাল ধরেন।

শেক্সপিয়রের নাটকগুলিতে নারীচরিত্রের দীপ্তি এত উজ্জ্বল যে ভিক্টোরীয় যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প-সমালোচক জন রাস্কিনের কথার যাথার্থ্য আমরা সহজে উপলব্ধি করি, বিশেষ করে ট্রয়েডিগুলি প্রসঙ্গে, যখন তিনি বলেন : 'Shakespeare has no heroes, he has only heroines'।

ম্যাকবেথ : দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য

রাম বসু

ম্যাকবেথের প্রাসাদ

লেডী ম্যাকবেথ : যে মদে হাতাল ওরা আমি তাতে ছড়েছি দাহসী
যা খেয়ে অজ্ঞান ওরা তা আমাকে মাতিয়ে দিয়েছে
ও কি ? চুপ !
না, ও শুধু পাঁচার ডাক,—নিষ্ঠুর ঘোষক যে রাত্রীকে
হননের প্রহর জানায় ! সে হয়ত কাজ করছে
দরজা ছড়েছে খোলা, প্রতিহারী মদে চুর হয়ে
রাজ-কাজে শুতি মেরে দিচ্ছে নাক ডাকায় আরামে
ওদের খাবারে আমি মিশিয়েছি ঘুমের ওষুধ
মৃত্যু ও প্রকৃতি যেন যুদ্ধ করে ওদের ভিতরে ।
মরার মতন ওরা, কালঘুম নেমেছে এখন ।

ম্যাকবেথ (নেপথ্যে) কে ? কে ওখানে ? কে ?

লেডী ম্যাকবেথ হা পোড়া কপাল ! সর্বনাশ ! ওরা জেগে গেছে বুঝি
আর বুঝি সে কাজ হল না । শেষ করা দূরে থাক
শুধু তার ভোড়জোড়ে আমাদের সর্বনাশ হল ।
শোন, আমি ছোরাগুলো ঠিক করে সাজিয়ে রেখেছি
খুঁজে পাওয়া ওঁর ত উচিত । তার সে ঘুমন্ত মুখে
আমার বাবার মিল না খুঁজে পেতাম যদি,—তবে
আমি ত নিজের হাতে এ কাজ করতাম ।

[ম্যাকবেথের প্রবেশ]

স্বামী ! তুমি !

ম্যাকবেথ : সে কাজ করেছি আমি । কোন শব্দ তুমি কি শোন নি ?

লেডী ম্যাকবেথ : শুনেছি পাঁচার ডাক আর ঝিঁঝি চুকরে উঠেছে ।

ম্যাকবেথ : কোন কথা তুমি কি বল নি ?

লেডী ম্যাকবেথ : কখন ? এখন ?

ম্যাকবেথ : আমার সময় ?

লেডী ম্যাকবেথ : আমি।

ম্যাকবেথ : চুপ !
কে শুয়ে পাশের ঘরে ?

লেডী ম্যাকবেথ : ডোনালবেইন।

ম্যাকবেথ : (নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে) কী বীভৎস দৃশ্য।

লেডী ম্যাকবেথ : কি বললে ? বীভৎস দৃশ্য ? এত সব নির্বোধ কল্পনা।

ম্যাকবেথ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হেসে উঠল একজন, অন্যজন
ডাক দিল "খুন ! খুন !" আর সেই সব কানে যেতে
এ' ও'কে জাগাল্। আমি চুপ করে শুনতে লাগলাম
কিন্তু তারা ছোট্ট পাঠ করে কের চলে পড়ল ঘুমে।

লেডী ম্যাকবেথ তবু ত দু'জনে ছিল একই বিছানায়।

ম্যাকবেথ : জল্লাদের রক্তমাখা আমার এ দুটি হাত দেখে
বলে উঠল একজন : "দয়া করো প্রভু" ; "পূর্ণ হোক"
বললে অন্যজন। তাদের ভয়ার্ত কণ্ঠ কানে এল।
"দয়া করো প্রভু"—এই আর্তির উত্তরে "পূর্ণ হোক"
আমি কিন্তু বলতেও পারিনি।

লেডী ম্যাকবেথ : এখন গভীর ভাবে এ সব ভেবো না।

ম্যাকবেথ : "পূর্ণ হোক" কেন আমি উচ্চারণ করতে পারি নি ক' ?
প্রসাদের প্রয়োজন সব চেয়ে আমারই ত বেশি
তবু কেন "পূর্ণ হোক" আটকে গেল জিভের ডগায় ?

লেডী ম্যাকবেথ : ওই সব কাজকর্ম এই ভাবে ভাবা ঠিক নয়
তা হলে পাগল হয়ে যাবে।

ম্যাকবেথ : মনে হল কেউ যেন বলে উঠল, "ঘুমাবো না আর :
ম্যাকবেথ ঘুমুতি হনন করে"—নিষ্কলুষ ঘুম
দুশ্চিন্তার জট খুলে যে নিদ্রায় মরণ রেশম
যা প্রতিদিনের মৃত্যু, কঠোর শ্রমের পরে স্নান
যা আনে শান্তির সুধা ক্লিষ্টির মনে ; প্রকৃতির

মহাত্যাগে আহার্য সভার, জীবনের আনন্দের
পরিপুষ্টি সে-ই করে দান—

লেডী ম্যাকবেথ কী সব বকছ যা' তা' ?

ম্যাকবেথ : ঘরে ঘরে সে ডেকে বেড়ায় : "ঘুমারো না আর
গ্লামিস করেছে খুন নিদ্রাকে, কডর তাই আর
ঘুমাবে না কোনদিন, ম্যাকবেথ ঘুমাবে না আর।

লেডী ম্যাকবেথ : কে এমন চিৎকার করেছে ? কেন তুমি ভেঙে পড় ?
তুমি বীর, কই সেই সাহস তোমার ? কেন তার
এই সব পাগলের মত ? যাও, জল নিয়ে এস
হাতের কলঙ্ক চিহ্ন ধুয়ে ফেলে পরিষ্কার হও
ছোরাগুলো নিয়ে গিয়ে কেন ঘরে আনলে এখানে ?
ও গুলো ত ওখানে থাকবে। যাও, ফের নিয়ে যাও, আর
ঘুমন্ত ওদের মুখে রক্ত লেপে দিয়ে চলে এস।

ম্যাকবেথ : না, আমি যাব না আর
যে কাজ করেছি আমি তা ভাবতেও গায় কাঁটা দেয়
তার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাবার সাহস হয় না।

লেডী ম্যাকবেথ : ছি, ছি, এই কি মনের জোর !
আমাকেই ছোরাগুলো দাও। ঘুমন্ত অথবা মৃত
ওরা সব ছবির মতন। রক্ত কথা বলো দেখে
শুধু পায় একমাত্র অবোধ শিশুরা। যদি তার
দেহ থেকে এখনও রক্তের ধারা বয়,—তবে আমি
প্রতিহারীদের মুখ রক্তে রক্তে রাঙা করে দেব
দোষী বলে ধরা যাবে একমাত্র তখনই তাদের।

[প্রস্থান। দরজায় করাঘাত]

ম্যাকবেথ : কোথা থেকে এই শব্দ আসে ?
কি হল আমার ? কেন আতঙ্কে উঠি প্রত্যেক আওয়াজে ?
কী ভয়ঙ্কর এই হাত !—উপড়ে আনে দু চোখ আমার।
আমার এ হাত থেকে সব রক্ত চিহ্ন ধুয়ে নিয়ে
সব করে দিতে পারে সব সিন্ধু মহা বহুদের ?
না ;—বরং আমারই হাতের রক্ত রাঙা করে দেবে

ওরফে তরফে ঘুম্ব সাসরের হুল্লর পরিধি
লাল হবে সমন সবুজ।

[লেডী ম্যাকবেথের প্রবেশ]

লেডী ম্যাকবেথ তোমার হাতের মত আমারও হাতের রঙ, তবু
আমারও হৃদয় যদি তোমার মতন ম্যাকবেথে
বিবর্ণ কাপুরুষ হত তা হলে লজ্জায় মরতাম।
(দরজায় করাঘাত) দক্ষিণ দরজায় শব্দ শুনি। চল,চল ঘরে যাই
অল্প জল ছুঁয়ে দেবে আমাদের সব কৃত কাজ
তারপর সমস্ত সহজ! অনেক তুচ্ছতা আজ—
নিরাশ্রিত করেছে তোমাকে। শোন, শোন, দাড়ি আছে
রাত্রির পোষাক পর। কি জানি কখন কেউ এসে
যদি ভাবে জেগে আছি আমরা দুজন জেগে জেগে
অমন কাতর ভাবে আত্মহারা হয়ো নাকো আর।

ম্যাকবেথ : কী করেছি তা জানার চেয়ে ভাল আজ বিস্মরণ

(দরজায় করাঘাত)

ডানকান! শুনে জাগ। যদি তুমি জাগিতে আমার।

[প্রস্থান]

চিত্র-দর্শকের ভূমিকা

মণি জানা

যে-কোনো আধুনিক শিল্প-প্রদর্শনীতে দর্শকের মতামতের অপেক্ষা একটি প্রদর্শনী নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ এই কারণে যে তা এদেশীয় লোকের শিল্প-সচেতনতার একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কনে সাহায্য করে। এই নানান মন্তব্যের আসরে যাঁদের দল ভারী, তাঁরা—বলতে দ্বিধা নেই—এ্যাব্‌স্ট্রাক্ট বা বিমূর্ত শিল্পকে ঘৃণা করেন। এঁদের নানাবিধ অভিযোগের মধ্যে যা সবচেয়ে উল্লেখনীয় তা একটি অতিসরল অথচ সমাধানহীন প্রশ্ন—শিল্প বিমূর্ত হবে কেন? সাম্প্রতিক চিত্রকলায় বিমূর্তিকরণের যে ঐতিহাসিক স্তর আছে, তা তাঁদের শিল্প-উপভোগের পথে সহায়ক নয়, উপরন্তু তা শিল্পী-দর্শক সম্পর্কের মধ্যে অকারণ জটিলতা ও তিক্ততার সঞ্চার করে। এঁরা সৎ এবং তাদের ঘরে চুরি করেন না বলেই হয়ের তারে যন্ত্রিক বোকাই হলেও এঁরা উপভোগের অসায়তা প্রমাণে আগ্রহী।

এ-কথা অনস্বীকার্য, বিমূর্ত শিল্পের মতো অতীতের কোনো শিল্পই এমন সুদৃঢ় ও সুগভীর দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। শিল্পীমন যদিও স্বভাবতই শিল্পমুখী ও শিল্পের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় পরাঙ্মুখ, তবুও এক্ষেত্রে বিমূর্ত শিল্প-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তাদের লিখিত নজীর যথা কান্‌ডিন্সকির *Art of Spiritual Harmony* এবং মনড্রিয়ানের *Plastic Art* বিমূর্ত শিল্পের তত্ত্বগত ভিত্তির সাক্ষী। যন্ত্রযুগের সতীর প্রতিক্রিয়ায় যা যুগযন্ত্রণার নিষ্ঠুর চাপে চিরাগত বস্তুনিষ্ঠ শিল্প কিভাবে বাস্তব মূর্তিকে বর্জন করে আপন ঐকান্তিক বিশুদ্ধতায় বিমূর্ত হল, সে ইতিহাসের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। উৎপত্তির ইতিহাস জেনেও বিদগ্ধ রসিকের চোখে এ শিল্প আজও দুর্বোধ্য ঠেকে, সৎ বিচার ও সরল উপভোগের চাবিকাঠি হারিয়ে যায়।

বিমূর্ত শিল্পেও যে এক প্রকার ইমেজ বা মূর্তি আছে, এই প্রকার শিল্পের কঠোরতম সমালোচকও তা স্বীকার করবেন, তবে যা আছে তা হয়তো সর্বত্র বাস্তবের অনুরূপ নয়। শিল্পীর উদ্দেশ্য যে রূপসৃষ্টি, 'অনুরূপ'-সৃষ্টি নয়, এ-কথা সারা দুনিয়ার শিল্প-ইতিহাসের সর্বাধিক স্বীকৃত সত্য। এবং কাকেই বা আমরা

বিমূর্ত বলি ? যা অদৃষ্টপূর্ব, যা আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানের অগোচর, যা কেবল শিল্পীর ধ্যান থেকে উৎসারিত মূর্তি ? তবে পৃথিবীর সকল বস্তুই বিমূর্ত। গ্রহান্তর থেকে পূর্ণ যোগশক্তি নিয়ে এই পৃথিবীর বুকে নেমে যদি প্রথম একটি গোলাপকে দেখতুম যা কোনোদিন দেখিনি, তবে তাকেও মনে হত বিমূর্ত। কিন্তু তাতে গোলাপের সৌন্দর্য উপভোগের পথে কোনো সংস্কারগত বাধা জন্মাতো না। একটি সুন্দর সূর্যাস্ত দেখে প্রশ্ন করি কি—এ কার 'অনুরূপ' ? একটি গোলাপ, একটি সূর্যাস্তের মতোই শিল্পীর সকল মহৎ রূপসৃষ্টিই আপন অস্তিত্বে আপনি সমীয়ান। তবে বাস্তবধর্মী শিল্প-উপভোগ অপেক্ষাকৃত সহজ এই কারণে যে সেখানে কল্পনা-শক্তি অল্প কাজে লাগে, পরিচিত বস্তু সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে স্বাভাবিক নিয়মে ও অনায়াসে যে অনুভব ও মনোভাব গড়ে উঠেছে, একই বস্তুকেই চিত্রিত দেখতে পেলে সেই সেই অনুভব সহজেই জাগ্রত হয় এবং এক্ষেত্রে চিত্রিত বস্তুর রূপান্তরের চেয়ে বস্তুর সঙ্গে দীর্ঘ পরিচয়ই অধিক কার্যকরী। কিন্তু যেখানে অঙ্কিত মূর্তি অভিনব ও অভাবিত, সেখানে কল্পনা-শক্তির পূর্ণ প্রয়োগে নবতর অনুভব উদ্দীপিত করার প্রয়োজন হয়, এই অনায়াসসাধ্য ভাবোদ্দীপনের মধ্যেই জ্ঞান, বোধ ও চৈতন্যের দিগন্ত প্রসারিত হয়, অপরপক্ষে একই বোধশক্তির পৌনঃপৌনিক প্রয়োগে অনায়াস-সাধ্য শিল্প-সম্ভোগের ক্ষেত্রে আসে কল্পনার স্থবিরত্ব ও পরিশেষে ক্লান্তি

এবং কাকেই বা আমরা অবশ্যগ্রাহ্য স্থায়ী মূর্তি বলি ? পরিচিত একই মূর্তি নানাজনের কাছে নানা আকারে প্রতিভাত। 'The image of the external world which we have any moment is a convention, and varies from age to age, and even from individual to individual.'—হার্বার্ট রীডের এই উক্তি শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের অনুকূল। একই মানুষের রূপ বদলায় যুগে যুগে, জাতিতে জাতিতে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই বিভেদ। বাইজেন্টাইন শিল্পীরা মানুষের এক মূর্তি কল্পনা করেছেন, রেনেসাঁস চিত্রকরেরা করেছেন আর এক। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের নারীমূর্তির সঙ্গে মোগল ও রাজপুত চিত্রের নায়িকাদের কী গভীর পার্থক্য। তবে কাকে বলবো আমরা জগতের স্থায়ী আকার, অথচ অপরিবর্তনীয় রূপলেখা ? সুতরাং মানব-দেহকে, প্রাকৃতিক বস্তুকে অভিনব রূপ দেবার, অভাবনীয় আকৃতি দেবার মৌল অধিকার শিল্পীমাত্রেরই অবশ্যপ্রাপ্য। 'জগতের কোথাও একটা সূর্যের অনুরূপ আর-একটা সূর্য এযাবত ঘটনা হল না, একটা গাছের অনুরূপ আর একটা গাছ

এত হল না, একটি মানুষের অনুরূপ আর-একটি মানুষ এও হল না. কিন্তু দুখানি ডানা, দুদের দুটি পাপড়ি, গায়ের দুটি পাতা, চোখের দুটি তারা এ ওর অনুরূপ হল দেখি, তবুও সেখানে দুজনে সমান আসন পেলে না— এ রইলো দক্ষিণে ও রইলো বামে, একের অভিমুখী আর-এক এই নিয়ে চললো কাজ বিশ্বরচনার' ('সাদৃশ্য' : রবীন্দ্রনাথ)।

চিত্র-দর্শকের দ্বিতীয় সমস্যা—বিমূর্ত শিল্পে প্রকৃতির স্বরূপতা বা অনুকৃতি যেমন অনুপস্থিত, মানুষের সুখ-দুঃখ, বাসনা-কামনাও যথাযথরূপে চিত্রিত নয়। এই প্রকার রসিক স্বভাবতই ভাবেন, শিল্প ভাবাবেগ প্রকাশের ভাষা। তাঁদের ধারণা, শিল্প যদি অবচেতনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট না হয়, দুঃখদগ্ধ প্রাণের গোপন বেদনা যদি চিত্রপট স্পর্শ না করে, তবে সেটা নিরর্থক। এঁদের আকাঙ্ক্ষা কিয়ৎপরিমাণে তৃপ্ত করে একমাত্র জার্মান্ শিল্পের ছবি, German Expressionism বা অভিব্যক্তিবাদ. কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লেখের প্রয়োজন যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিবাদী শিল্পীদের চিত্রকলা শিল্প হয়ে উঠেছে অভিব্যক্তির বলে ততটা নয়, যতটা নন্দনতাত্ত্বিক নিয়মের যথাযথ প্রয়োগে। শিল্প যেমন প্রকৃতির আলেখ্যচিত্র নয়, তেমনি তা ভাবাবেগের উদ্গীরণ বা উদাহরণও নয়। যিনি শিল্পকে শুধুমাত্র ভাবের বাহন হিসেবে ভাবেন, তিনি শিল্পের অবমাননা করেন, তিনি শিল্পকে দরিদ্রার আসনে না বসিয়ে, তাকে ঝিয়ের কাজে লাগিয়ে মনের ঘরদোর সাফ করান। এই প্রকার শিল্পের গভীরতম সমালোচনা আছে মাতিসের বহুল প্রচারিত এই উক্তির মধ্যে :

What I dream of is an art of balance, of purity and serenity devoid of troubling or depressing subject-matter, an art which might be for every mental worker, be he businessman or writer, like an appeasing influence, like a mental soother, something like a good armchair in which to rest from physical fatigue.

চিত্র-দর্শক এক্ষেত্রে প্রশ্ন করেন—শিল্প কি তবে জীবনবিমুখ বিলাসদ্রব্য? বাহ্যপ্রকৃতি ও প্রত্যক্ষ মানবজন থেকে বিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ কল্পনার অবতল এই বিমূর্ত শিল্প মানুষের কোন প্রয়োজনে আসবে? আসলে, বাহ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য, সুন্দর মানবদেহ বা সুন্দর ভাবসকল প্রাচীন শিল্পের উপজীব্য হলেও শিল্পের অন্তিম ও প্রতিবেদন জীবননিরপেক্ষ এমন একটি স্বতন্ত্র সত্তা যা এক অর্থে বিমূর্ত এবং যার উপলব্ধি ব্যক্তিকে শিল্প-উপভোগে প্রায় অর্থহীন। কোনো এক প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচকের একটি উক্তি আছে : 'সুরই সুরের প্রাণ, সুরের

একটি ফল যা আমরা দু'হাত দিয়ে না ধরে শুধুই প্রত্যক্ষ করি।' আর যা আবেগ হতে পারে বীজ, কিন্তু শিল্প প্রস্ফুটিত কুসুম। 'I love the rule that corrects the emotion.'—শিল্পী ব্রাকের এই মন্তব্য শিল্পের নন্দন-তাত্ত্বিক ভিত্তির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। যদিও ঘরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও নিজস্বতার আবিষ্কার গর্বের প্রমুখ উনিশ শতকের শিল্পীদের কীর্তি, তবু মূর্ত-বিমূর্ত, প্রাচীন-নবীন সকল সার্থক শিল্প-কর্মের মৌল উৎকর্ষ রঙ ও রেখার ছন্দোময় বিন্যাস ও সঙ্গতি, তাৎপর্যময় রূপসৃষ্টি, গতি ও শান্তি, কৃতি ও কৌশলের মৌলিক অস্তিত্ব। শুধু ভাব শুধু আবেগ শুধু ধারণা শিল্প-সৃষ্টিতে অচল। এই প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের আর একটি মন্তব্য স্মরণীয় : 'হাতে মালে জড়িত দিব্য লাবণ্যযুক্ত শরীর—তার স্থানে আছে আর্ট, কিন্তু শুধু ধাস শুধু হাড় যা কঙ্কাল রূপসৃষ্টির বেলায় অচল।'

বেশ কিছু সংখ্যক চিত্র-দর্শক আছেন যাঁরা সাহিত্য-পাঠকের দৃষ্টি নিয়ে শিল্প বিচারে অগ্রসর হন। তাঁরা ছবির মধ্যে চান কাব্য, নাটকের চরিত্র খোঁজেন, গল্প বা কাহিনী পেলে আরামবোধ করেন। এঁরা ভাবেন, একই বিষয়কেই কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায় বা ভাস্কর্যে রূপদান করা সম্ভব। প্রতিটি শিল্প-মাধ্যম যে উপকরণ-সাপেক্ষ, একের সত্তা অপরটিতে প্রকাশের চেষ্টা যে অপচেষ্টা—এই সত্যের বিস্মৃতি থেকেই এই বিভ্রান্তি বা confusion of Arts-এর সৃষ্টি। ক্রোচের মতে শিল্প হচ্ছে শিল্পীর মনে তার উপকরণের ঐকান্তিক লড়াইয়ের ফলাফল। শিল্পসত্যমাত্রই উপকরণ-সাপেক্ষ। চিত্রকর যদি তাঁর রঙ তুলি ও ক্যানভাসের প্রকৃত ধর্ম ও প্রতিক্রিয়া না বোঝেন, ভাস্কর একটি প্রস্তর খণ্ডের মহিমা যদি বিস্মৃত হন, স্থাপত্যে শিল্পী যদি তাঁর brick-এর সুচারু সম্পর্কে উদাসীন থাকেন, তবে প্রত্যেকের অপরিমেয় ভাব-ঐশ্বর্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও শিল্প-সৃষ্টি নিরর্থক। সাম্প্রতিক বিমূর্ত শিল্পী এই উপকরণের রহস্য-উদ্ঘাটনে আগ্রহী, শিল্প-মাধ্যমের গুণ সন্ধানে সচেষ্ট। কিন্তু উপকরণ-বাসনা যখন ভাবসত্যকে দলিত করে শুধু আপন কৌতূহলকেই অবলম্বন করে, তখন বিমূর্ত শিল্প হয়ে ওঠে ব্যাভিচার, তখন সে নিষ্ফলের হাতে নিজেই নিজের যাবতীয় তুলে দেয়।

চিত্রপ্রদর্শনীর কৌতূহলী দর্শকদের মধ্যে একদল আছেন যাঁরা জাত্যাভিমানী, যাঁরা এ-দেশীয় শিল্পীর চিত্রে ভারত ভিন্ন অপর কোনো দেশের শিল্পের ছায়া দেখলে আহত হন। বিমূর্ত শিল্প অভারতীয় এবং দেশের ঐতিহ্যের ভূমিতে শেকড় সঞ্চারিত না হলে শিল্পের ভবিষ্যৎ নেই—এই যুক্তিতে তাঁরা আধুনিক

শিল্পজ্ঞানেরই মূলপাত করেন। বলা বাহুল্য, বর্তমান ভারতীয় জীবন ও ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতীর অজ্ঞতা থেকেই এই জাতীয় মনোভাবের সৃষ্টি। শিক্ষিত নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবন কোন ক্ষেত্রে আজও একান্তভাবে ভারতীয়? ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমিতে আজও প্রতিষ্ঠিত? বিজ্ঞান-রাজনীতি-সমাজনীতির ক্ষেত্রে, কাব্যে সাহিত্যে, এমনকি ব্যক্তির জীবনদর্শনেও আজ ভারতীয়ত্ব অবশিষ্ট নেই এবং সেখানে ক্ষোভ বা লজ্জারও অবকাশ নেই। শুধু শিল্পের বেলায় ভারতীয় থাকতে হবে কোন যুক্তিতে? নানা জাতির সমাবেশে, নানা মতবাদ ও আদর্শের সংঘাতে ভারতীয় মন আজ দোদুল্যমান। এই সঙ্কটে কোন একান্ত গৃহকোণে বসে শিল্পী তাঁর পিতৃপিতামহের শুদ্ধ আত্মার মহিমাকে আঁকড়ে থাকবে?

আসলে, এজাতীয় সমালোচক ভুলে যান যে শিল্প রক্তের ফসল, তারত বা ইউরোপের ছাপমারা, হাতে বা মেশিনে গড়া কোনো বাণিজ্যিক দ্রব্য নয়। এক বিন্দু রক্ত থেকে যেমন সন্তান জন্ম নেয় এবং সেই রক্তের দোষগুণ সেই সন্তানের চরিত্রে বর্তায়, ঠিক তেমনিই শিল্পীর সামগ্রিক সত্তা, তার রক্তের যাবতীয় লক্ষণ তার সহজকৃত শিল্পের মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। 'শিল্প হচ্ছে ভালোবাসা'— এই সংজ্ঞা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই অর্থে যে, নিজ সৃষ্টির সঙ্গে শিল্পীর সমগ্র সত্তা সম্পৃক্ত, জীবন ও পৃথিবীর টানে শিল্পীর রক্তকণিকা গান গেয়ে ওঠে এবং যেহেতু ভালোবাসার ফলকে কেবল ভালোবাসা দিয়েই গ্রহণ করা সম্ভব, সেইহেতু শিল্প-সমালোচনাযাত্রাই এক অর্থে অবাঞ্ছনীয়। শিল্প-কর্মের মধ্যে এই হৃদয় ও সততার সন্ধান চিত্র-দর্শকের নৈতিক দায়িত্ব। শিল্পী যদি সৎ হন, শিল্পের নামে যদি artifact কিংবা বাণিজ্যিক দ্রব্য নির্মাণের অভিপ্রায় না থাকে, তবে সৃষ্টির ওপর বুদ্ধিজীবী সমালোচকের প্রিয় বা অপ্রিয় তাঁর প্রজাপতির ডানার ওপর খাতকের উদ্যত কৃপাণের মতোই নিষ্ফল।

অসমছন্দে অভিষেক

অশোক পালিত

১

হে আমার চতুষ্পার্শবর্তী পৃথিবী, তোমাকে আমার তন্ময়তা দান করিতে পারি. অনন্তিলাষ হইতে আপনাকে উৎখাত করিয়া তোমার সন্নিকটে ধ্যানস্থ হইতে পারি. তুমি আমায় উৎসুকা প্রদান করিও।

ক্লান্ত লহরীর অতিক্রম স্বতঃস্ফূর্ত মূর্তি ইদানীং সমপরিমাণ স্থান অধিকার করিয়া আছে মাত্র, সঙ্গীত নাই সমর্পণ নাই, আমার সমুদয় সত্তার কলকণ্ঠে উঠিয়া থাক্ তোমার অস্তাচলের নাদুস্থে বৈদানুস্থে, তুমি আমায় জাগরিত করো।

নশ্বরতা দুত্বার অধিক প্রতীয়মান হইলে বিগলিত আনন্দাশ্রু পদ ধূসর করিবে। আবীর খেলিবার প্রয়োজন নদীতটে কোনোও দিন ফুরাইবে না। তোমার মুখ-গহ্বরে মুখ মিলাইয়া জিহ্বায় জিহ্বা স্পর্শ করিয়া আমার গ্রামাঘাণ অরন্ধিকাকে সুন্দর আকার দান করিব, তোমার হাত দুইটি হাতে লইয়া বলিব, জন্মজন্মান্তর আমি তোমার হইলাম, হে নীলাম্বিবসনা, তুমি আমার হইও।

২

এই সেই বীজবহনকারী অন্ধকার যাহা ক্ষণাৎক্ষণই মায়া সৃজন করিতেছে, যখন আঁকিয়া চক্ষুকে আধি করিয়া তুলিতেছে, সেই অন্ধকার যাহার পরিসরে পৃথিবীতে কুসুমসম্ভারের বিনিময় হয়, মা তাঁহার সন্তানের মুখ আপনার দিকে ফিরাইয়া তাহার মুখচুম্বন করেন।

খেলিতে খেলিতে খেলা শেষ হইলে বালিকার অভিভূত বিহ্বল দৃষ্টি যেরূপ ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়, ঊর্ধ্বলোকে, ঊর্ধ্বলোক হইতে পুনরায় পৃথিবীতে, শঙ্কিত পদক্ষেপ হইতে ত্রাস উন্মেষ করিয়া, ভয় হইতে ইন্দ্রিয়-বিপর্যয়কে রক্ষা করিয়া আপনার প্রতি প্রবল মমত্ববশত সে যেরূপ ঘরে ফিরিয়া চলে, সেইরূপ প্রাণঘন বিষণ্ণকারী পূর্ণতার নিষিকার পরিপ্রেক্ষিত হইতে উদ্ধার করিয়া এই অন্ধকার আমি তোমার হাতেই অর্পণ করিব, তুমি গ্রহণ করিও।

চিত্তাভ্যন্তে জলসিঞ্চন করিলে পৃথিবী শীতল হইবে, পৃথিবীকে শীতল করিব। তোমার নাম ধরিয়া ডাকিলে সর্বত্র আমার প্রতিবিম্ব পড়িবে, সর্বত্রে প্রতিবিম্ব দিব। কিন্তু রজনীগুলি? রজনীগুলি কি প্রহর গণনা করিবার নিমিত্তই।

৫

তুমি এসো, নচেৎ আমি একাকী পরাধীন।
পরবশে পরবাসে কে থাকিতে চায়।

আনন্দ মুকুলিত হইলে পূর্বে সহস্র বৎসর পূর্বে আচল উঠাইতে, ইদানীং সে ইচ্ছা কালে বিলুপ্ত। তুমি রোমরাজিতে হর্ষ ফুটাইতে পারো, তোমার ক্রম লাঘবে যাইবে। খেদ করিও না। খেদ করিলে প্রকৃতি ভাবুক হইবে। দাও আমাকে তোমার স্তনদ্বয়ের প্রতিমতাসমেত সকল ছন্দ সকল আয়োজন সকল সম্ভাষণ, দাও অন্তিমকালের চিত্তবিভ্রম। আমি সাগরে যাইব।

নিকট জলহীন। লোক দেখিলে শুধাই, জল কোথায়! বক্ষস্থল দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত, ধরায় পুড়িয়া পুড়িয়া ক্ষিট। এ যাবৎ তোমার দৃষ্টি আমায় সজাগ রাখিয়াছে, মৃত্তিকায় স্পর্শ দিয়াছে। নভোপথের যত তাপ যত সন্দিগ্ধচিত্ততা যত আকারহীনতা দূরে যাক্, বিলাইয়া যাক্। বর্ষণ চাহে মন। তুমি এসো। পুরোভাগে হাস্য করতঃ অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করো।

বহ্নিগুলি সাজানো নাই।
আসিবার কালে হংসকে দেখিলাম—
সরসীর জলে মুখ ডুবাইয়া আত্মার সন্ধান করে।
আমি তাহাকে হিংসা করি না।
আমার রাগ নাই দুঃখ নাই
মস্তিষ্কের ভিতরে শুধু চতুর্দশ লক্ষ ভ্রমরের গুঞ্জন।

সেই গুঞ্জনের মধ্যেই কখন হাসি
কখন চাস্য বন্ধ করি শয়ন করিতে পারি না।
এই গুঞ্জনের মধ্যেই তোমার অধর দলিত করিতে প্রয়াস পাই।
তোমার কাছে থাকিলে মনে হয়,
শান্তিই আমার কাম্য
যাহা সর্বত্র বিরাজ করিবে।
কিন্তু কতক্ষণই বা সে নক্ষত্র থাকে!
পরক্ষণেই ত সেই চতুর্দশ লক্ষ ভ্রমরের গুঞ্জন।

এখন দুর্বল যে বহ্নিগুলি সাজাইতে পারি না।
ইদানীং কেহ সাহায্য করিতেও আসে না
সকলের হাত যেন অবশ
অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি।

'হত্যা' ও বিকৃত মানসিকতা

গৌতম সান্যাল

'হত্যা' প্রসঙ্গের আলোচনা অপরাধতত্ত্বের অন্তর্গত। অপরাধতত্ত্ব বলতে একটি ব্যাপক শাস্ত্রও বোঝা যেতে পারে, আবার কেবলমাত্র আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত সঙ্কীর্ণতর তত্ত্বও বোঝানো যেতে পারে। খুব ব্যাপক অর্থে ধরলে অপরাধমূলক ঘটনাগুলির আলোচনা সমাজতত্ত্বের আলোচনার অন্তর্গত। এই অর্থে কেবলে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে করা আলোচনা ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে করা আলোচনা—এই দুই-ই অপরাধতত্ত্বের অন্তর্গত বলা যেতে পারে। কিন্তু নীতিতত্ত্ব বলতে অনেক চিন্তাবিদই এক স্বতন্ত্র শাস্ত্র বোঝেন, এবং এই অর্থে নীতিতত্ত্বের সঙ্গে আইনশাস্ত্র বা ব্যাপক সমাজতত্ত্বের সঙ্গে এর কোন প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক স্বীকার করেন না। এ সম্বন্ধে অবশ্যই মতপার্থক্যের অবকাশ আছে। 'হত্যা' সম্পর্কীয় আলোচনা ব্যাপক অর্থে অপরাধতত্ত্বের অন্তর্গত হতে পারে; সঙ্কীর্ণতর আইনের দৃষ্টিকোণ থেকেও করা যেতে পারে। অথবা, প্রাগুক্ত অর্থে নীতিতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও করা যেতে পারে। এখানে যে আলোচনা করা হচ্ছে—তা নিশ্চিতভাবেই শেষের দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। এ আলোচনাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে 'অপরাধতত্ত্ব' অথবা 'সমাজতত্ত্বে'র আলোচনা বলে অভিহিত করা যায় কিনা—সে সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে হয়।

পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত হয়ে জ্ঞাতসারে কোন মানুষ যখন অপর মানুষের মৃত্যু ঘটায়—সেই মৃত্যুকে 'হত্যা' বলা যেতে পারে। 'হত্যা'র এই অর্থ যদি স্বীকার করা যায়—তবে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সমস্ত 'হত্যা'ই অপরাধ নয়। ঘাতক যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীকে হত্যা (এই ক্ষেত্রে 'হত্যা' শব্দটির ব্যবহার যথাযথ হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু, হত্যার যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে সেই লক্ষণ অনুসারে এই ব্যবহারকে সঙ্গত বলা যায়) করে আইনের চোখে সে কোনো অপরাধ করে না। আবার, এমন অনেক পরিস্থিতি দেখা যায় যেখানে 'হত্যা' আইনের চোখে অপরাধ বলে ধরা হলেও নৈতিক মানদণ্ডে হয়ত তা অপরাধ নয়। কিন্তু কোনো এক তৃতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা দেখব যে, যে-সমস্ত হত্যার আইনসঙ্গত সমর্থন অথবা নৈতিক (পূর্ব অনুচ্ছেদে নীতিতত্ত্বের যে অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে

সেই অর্থে) সমর্থন অথবা উত্তরবিধ সমর্থন আছে—সেই সমস্ত হত্যার সমর্থন আমরা করছি না। এই তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গীও নিশ্চিতভাবেই কোনো বিশেষ সমাজের নৈতিক মূল্যবোধের ওপর নির্ভর করে। এই অর্থে একে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও বলা যেতে পারে। কিন্তু স্বীকৃত কোন বিশেষ নৈতিক মানের সঙ্গে এর বিরোধিতাও একেবারে অসম্ভব নয়। এই তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বর্ণনা করার জন্য আমরা কয়েকটি উদাহরণের সাহায্য নিতে পারি। ঘাতকের হত্যা, সৈনিকের হত্যা, কোনো বিশেষ নৈতিক মানদ্বারা সমর্থিত কোনো হত্যা—এই তিন রকমের হত্যার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে হয়ত আমরা এই তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি বুঝতে পারব।

ঘাতকের পদের জন্য দরখাস্ত চাওয়া হচ্ছে, এ রকম কোনো কর্মখালির বিজ্ঞাপন আমাদের চোখে পড়ে না। এ রকম বিজ্ঞাপন কোথাও প্রকাশিত হলে ক'জন প্রকৃতিস্থ লোক দরখাস্ত পাঠাবেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষ-ভাবে মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকেরা অবশ্য এই পদের জন্য আগ্রহী হতে পারেন। কিন্তু, তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা এ প্রবন্ধের অন্তর্গত নয়। বিজ্ঞাপন চোখে পড়ুক বা না পড়ুক যে সমস্ত দেশে মৃত্যুদণ্ড এখনও প্রচলিত সে সমস্ত দেশে ঘাতকের কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিশ্চয়ই কিছু লোকের প্রয়োজন হয়। ও সমস্ত লোকের সকলকেই মানসিক বিকারগ্রস্ত মনে করা যায় না। অতএব, এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য মানসিক বিকারগ্রস্ত লোকেদের নিযুক্ত করা হচ্ছে, এ-জাতীয় ব্যাপার মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঘাতকের কাজ যারা সম্পন্ন করে তাদের সম্বন্ধে আমরা কি ধরনের মানসিকতা পোষণ করি? ঘাতক যখন মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত কোন লোকের গলায় ফাঁসীর দড়ি টেনে দেয়, অথবা তাকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে দেয়, তখন সে পরিণাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবহিত হয়ে আন্তরিকভাবেই সেই কাজটি করে। শুধু তাই নয়, এক অর্থে তার এই কাজকে স্বেচ্ছাকৃতও বলা যায়। কারণ, ঘাতক হলে সে ঐ কাজ করতে বাধ্য হলেও ঘাতকের কাজ নেওয়া বা না নেওয়া সম্বন্ধে তার নিজের ইচ্ছা কাজ করে। ঘাতকের সম্পর্কে আমরা কি মনোভাব পোষণ করি—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর সহজসাধ্য নয়। ঘাতক সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশের বিরূপ মনোভাব পোষণ করলে আমরা নিশ্চয়ই কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করে থাকি। আমরা নিশ্চয়ই বিবেচনা করি যে ঘাতক যখন কোনো আসামীর মৃত্যু ঘটায় তখন নিশ্চয়ই আসামীর প্রতি তার নিজের কোনো ধরনের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার ভাব থাকে না।

আমরা বিবেচনা করি যে সে নিশ্চয়ই অনন্যোপায় হয়ে নিজের জীবিকার্জনের জন্য ঐ বৃত্তি গ্রহণ করেছে। তাই ঘাতকের বৃত্তির প্রতি আমরা সকলেই অল্পবিস্তর হেয়জ্ঞান পোষণ করি। ধরা যাক কয়েকজন লোক একসঙ্গে কথাবার্তা বলছে, হঠাৎ জানা গেল তাদের মধ্যে একজনের বৃত্তি হল ঘাতকের বৃত্তি। সঙ্গে সঙ্গে কি তার প্রতি অন্য সকলের মনোভাব কিছু পরিবর্তিত হবে না? আর সে পরিবর্তন নিশ্চয়ই সে বিশেষ লোকটির প্রতিকূলেই যাবে। ভাবতে কি রকম লাগবে যে আমার কোনো প্রিয়জন, আমার কোনো আত্মীয়, আমার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু ঘাতকের বৃত্তি অবলম্বন করেছে?

ঘাতকের হত্যা সম্পর্কে আমাদের মানসিকতা সম্পর্কে হয়ত মতভেদ দেখা দেবে না, কিন্তু সৈনিকের বৃত্তি সম্পর্কে সাধারণত আমরা বিরূপ মানসিকতা পোষণ করি না। বরং সৈনিকের বৃত্তি সম্পর্কে আমরা গর্ববোধ করি। কারণ সৈনিকের বৃত্তির পেছনে রাজনৈতিক আদর্শ, জাতীয়তাবোধের আদর্শ, এমন কি মানবিকতার আদর্শের সমর্থন রয়েছে। আর এই রকম কোনো না কোনো আদর্শকে সভ্য-সচেতন সকল মানুষই লালন করে থাকে। কিন্তু তবুও সৈনিকের বৃত্তির প্রতিও আমাদের নিরঙ্কুশ অনুমোদন থাকে না। যুদ্ধকে আমরা পরিহার করতে চাই। শান্তির জন্য আন্দোলন আজ পৃথিবীতে ক্রমশই ব্যাপক হয়ে উঠছে। কিন্তু যুদ্ধের বিরুদ্ধে আমরা যখন আন্দোলন করি, তখন আমাদের দৃষ্টি থাকে ব্যাপক ধ্বংস নিরোধের দিকে। সৈনিকের বৃত্তির আলোচনা আরও একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে করা যায় এবং এখানে সেইটিই প্রাসঙ্গিক। ধরা যাক, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে কোনো সৈনিক। যুদ্ধের শেষে দীর্ঘদিন বাদে আবার সে মিলিত হচ্ছে তার আত্মীয় আর প্রিয়জনদের সঙ্গে। তাকে যখন তার মা অথবা স্ত্রী দীর্ঘদিন পরে সম্ভাষণ জানাচ্ছে, তখন হঠাৎ যদি তাদের কারোর মনে হয় তাদের প্রিয়জন এই লোকটিই প্রেনেড ছুঁড়ে অথবা বেয়োনেটের খোঁচায় তারই মত আর একটি মানুষকে হত্যা করেছে। এমন কি অনেক সৈনিক নিজেরাই বিবেক-দংশন অনুভব করে—এরকম অভিজ্ঞতার কথাও ত আমরা জেনেছি। কাজেই সৈনিক যখন যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যা করে সেই হত্যার প্রতিও আমরা সাধারণভাবে বিরূপ মানসিকতা পোষণ করি।

নৈতিক মান সম্পর্কে বিভিন্ন নীতিশাস্ত্রবিদ্‌দের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এ ছাড়াও, দেশ-কাল ভেদে বিভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন নৈতিক মান প্রচলিত, একথাও যথেষ্ট সঙ্গত। কোনো বিশেষ সমাজে প্রচলিত বিশেষ নৈতিক

যান দ্বারা সংঘটিত হত্যার ঘটনা অসম্ভব নয়। এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যেখানে বিশেষ নৈতিক আদর্শকে অটুট রাখতে হলে কোনো একটি হত্যার সংঘটন অবশ্যপ্রয়োজনীয়। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে উক্ত নৈতিক আদর্শের জন্য ঐ হত্যা নৈতিক সমর্থন লাভ করে। তবুও যে শোকটি প্রত্যক্ষভাবে ঐ হত্যাটি সম্পন্ন করে তার প্রতি বিরূপ মানসিকতা খুবই স্বাভাবিক।

'হত্যা'র প্রতি এই যে বিরূপ মানসিকতা একে অনেকেই হয়ত সর্বগত বলে স্বীকার করবেন না। এই মানসিকতা যে সর্বগত ও জাতীয় কোনো তত্ত্বের প্রতিপাদনও এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। সকল কালের সকল দেশের মানব সমাজে যে হত্যার প্রতি এই ধরনের মানসিকতা প্রচলিত ছিল এমন কথা মোটেই বলা যায় না। আজকের যুগেও মানবসমাজের সর্বত্র এই মানসিকতা বিরাজমান এমন কথাও বলা যায় না। তবুও এই মানসিকতা সর্বগত না হলেও যে বহুলত একথা সম্ভবত অস্বীকার করা যায় না। এই বিরূপ মানসিকতার বহুলত অস্তিত্ব মেনে নিলে আমাদের আর একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তা হল, এই বিরূপ মানসিকতার সঙ্গে অন্য কোনো আদর্শবোধের বিরোধ। ঐ বিরূপ মানসিকতার স্বার্থে আদর্শবোধকে জলাঞ্জলি দিতে হবে এমন কথা বলা যায় না। আবার আদর্শবোধকে প্রাধান্য দিলেই যে এই ধরনের মানসিকতা দূর হয়ে যাবে, একথাও বলা যায় না।

হত্যার প্রতি বিরূপ মানসিকতার অস্তিত্ব থেকে কোনো তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু এই ধরনের মানসিকতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই বিরূপ মানসিকতার সঙ্গে কোনো বিশেষ আদর্শবোধের যে সম্ভাব্য বিরোধ তার নিরসন যদি কোনো উপায়ে সম্ভব হয়, তবে তার জন্য প্রয়োজন ঐ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার। এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব মনস্তত্ত্বের আলোচনায়। মনস্তত্ত্বের আলোচনা কতখানি বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে তার উপর নির্ভর করছে এই 'বিরূপ মানসিকতা'র ব্যাখ্যা।

শ্রীহট্টের আউলিয়া গান

যতীন রায়চৌধুরী- সংগৃহীত

চার চিজে পিন্‌জিরা বান্ধি ঘরে করলায় বন্ধ,
বন্ধু নির্দয়ীয়ার মন
কেমনে পাইমুরে কালা ত'র দরিশন।
তুমি আমি আমি তুমি জানিয়াছি মনে
বিচিতে জন্মিয়া গাছ বিচি ঘরে কেনে,
দুই হইতে এক হইল পিরীতির কারণ
এই ভাবিয়া আশিকের দিল করে উচাটন।
সমুদ্দুরের জল উঠে বাতাসেরো জুরে
আবর হইয়া যোরে পবনের ঘরে,
মাটিতে পড়িয়া আবে সমুদ্দুরে যায়
কাহেতে মিলাইয়া জাতে তরংগ খেলায়।
কাহিন্দা জানোয়ার যদি কোনো এক কালে
জাতি ছাড়া বন্ধ হয় শিকারিয়ার জালে,
কেমনে জিন্দেগী কাটে বন্ধ খানার তার,
মাওক হইয়া তত্ত্ব তুমি আশিকের বিচার।
অধম আবকুমে কয় মাওক মানিয়া
ছাই আড়্‌ পাতাইয়া থুইছে উলুরে পাঁখিয়া,
আহার করিতে যদি না যাইত মন,
না লাগিত প্রেমের লাগা, না হইত মরণ।
বন্ধু নির্দয়ীয়ার মন।

চার চিজ—কিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ—চার ভূত (আমাদের পঞ্চভূতের মত)। পিন্‌জিরা—পঞ্জর, পাঁজর। হ'রে—মোরে, আমারে। করলায়—করলাম। নির্দয়ীয়ার মন—নির্দয়ীদের মন (কৃষ্ণ)। আশিকের—প্রেমিকের। জুরে—জোরে। আবর—মেঘ। পবনের ঘরে—আকাশে। কাহিন্দা—দুষ্ট। যদ্ধ খানা—খাঁচা। মাওক—প্রেমস্থল। আবকুমে—কবিরের নাম। মানিয়া—মেনে। আড়্‌—পাখী ধরার ফাঁদ। উলু—ঢ'ঁই লোকা। লাগা—আঠা।

দ্রষ্টব্য। শ্রীহট্ট— আউল গান। সকল সম্প্রদায়ে গেয়ে থাকে।

নমাজ আমার হইলো না আদায়
নমাজ আমি পড়তে পারলাম না
দারুণ খাস্তাসের দায়।
ফজরের নমাজের কালে ছিলাম আমি ঘুমের ঘোরে,
জহর গেলো আইতে যাইতে
আসর গেলো কামের দায়।
এশারের নমাজের কালে
গেলাম আমি গোআইল ঘরে
হাওর থাইকা আইল না গাই
বাছুর আমার বান্ধা নাই।
মুরগিবের নমাজের কালে
বিবি বলেন চাউল ফুরাইছে,
ছাইলা যাইয়ার কান্দন শুইন্যা
কান্দে কাগল ছুরবিন্ দায়।

পড়তে—পড়তে। আদায়—সম্পন্ন, অনুষ্ঠিত। খাস্তাস—অভ্যাস। ফজর—সকালের নমাজ। জহর—দুপুরের নমাজ। আসর—বৈকালের নমাজ। এশারের—রাত্রের নমাজ। হাওর—গো-চারণের জন্য মাঠ। থাইক্যা—থেকে। আইল—আসিল; মুরগিব—সন্ধ্যার নমাজ। কান্দন—কান্নার। ছুরবিন্ দা—ছুরবীন দা; সরকারী জরীপ কর্মের অঙ্গে একটা উঁচু জায়গায় ছুরবীন বসানো হয়েছিল। কালে সেখানে একজন কর্মির এসে বসার লোকে তাকে ছুরবীন দা বা ছুরবীন কর্মির বলে উল্লেখ করতো। তার নিজের নাম হারাণ্ড কোন কোন দিন নাম বেঁধে তার নামে চালাতো।

অত্য হকির মোয়াজ্জি
ছুল্নার মধ্যে উস্থরে কাইন্দে,
তবিত্, মাথ্ ছনি।
চাচি ক্যাচ্ল পাচি ক্যাচ্ল,
কাইলো উড়ার ধান
ধলিপুরে গিয়া কাইলো মোকাম চাইরখান।
কন্যের কাচ্লো কন্যচুল ভাই

চৌখের কাটলো জ্যোতি,
দেহায় কাটলো মায়া রে ভাই,
হুন্তায় রাখলো না বাকি।

অথা—(সংস্কার)। ধকির—ধকির। ধুলদায়—(ধকিরের) সোনায়। উন্দুরে—উন্দুরে। ওবিত্—ধবর। রাখ্ধনি—রাখনি। চাটি—চাটাই। পাটি—মানুষ। উড়ায় থাম—ধেতের চালায় রাখল। মণিপুর—হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতন্ত্রের মত সুফীদেরও 'মণিপুর' নামে দেহের ভেতরে এক কাল্পনিক 'স্থান' বা বিন্যাস। ওকার—'ধকার': "সুফী-সাধনার সাধক কতকগুলি স্তর বা 'ধকার'...অতিক্রম করেন। এই ধকার সাধকের সাধন-পথে বিভিন্ন মানসিক ও নৈতিক স্তর বিশেষ" (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)। এই 'ধকার' বা স্তর সাধারণত সাতটি—নাসুত, মলকুত, জবরুত ও লহুত। সাধনার দ্বারা এই সব স্তর অতিক্রম করতে হয়। কর্ণে—কর্ণের। কর্ণফুল—কানের ফুল। দেহার—দেহের। হুন্তায়—কোমরে।

[illegible] গহরে বাড়ি-উৎসবে গায়ক জালালের গলায় ধকির সমাবেশ থেকে সংগৃহীত।

৩

মুরশিদ্ কই আইলাম ও,
নির্ণয় না পাই মুরশিদ্ কই আইলাম ও,
যারে ভজিতে আইলাম তার তো উদ্দেশ নাই।
অরণ্য জংগলায় যাযে মুরশিদ্ বাড়িয়াছি ঘর,
ভাই নাই, বান্ধব নাই, কে লইবে খবর
(আমার) কে লইবে খবর।
আকলুদ্ শা হকিরে কয় শুন সাধু ভাই
কামাই কল্লে খাউয়া আছন, সংগে যাউয়া নাই
তবে সংগে যাউয়া নাই।
মুরশিদ্ কই আইলাম ও।

মুরশিদ্—মুর্শিদের গুরু। আইলাম—এলাম। নির্ণয়—নির্ণয়। আকলুদ্ শা—ধকিরের নাম। খাউয়া—খাওয়ার লোক। যাউয়া—যাওয়ার লোক।

বি.দ্র.—উপরের লোক-সাহিত্যগুলির উচ্চারণে কতক গুলি বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলি যাইবার সময় ধরা যায়। কথা হিসাবে এদের মধ্যে যে সৌন্দর্যই থাক সুরের মধ্যে যা-তখনে এর মূল্য দেওয়া যায় না। [illegible] গায়কগুলি শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। এ ধরনের বহু গান তিনি সংগ্রহ করেছেন, দুঃখের বিষয় আমি আর কোথাও এগুলি সংগ্রহ করা নেই। উৎসাহী জ্ঞোতারা আমাদের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। সম্পাদক।

জুয়া

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

দূর থেকে শব্দ পেয়ে ওরা বুঝল, লঞ্চ আসছে। লঞ্চ অথবা মোটর বসানো ছোটখাট বোট। যে বোটে জল-পুলিশ অথবা জল-জুয়াচোর অথবা ছেলে যে কেউই থাকতে পারে। জুয়াচোর অথবা ছেলের জন্য ভাববে না ওরা, জল-পুলিশের বোট হলেই শেষ ঘাটে তরী ডুববে। তাহলে এবার মুখের গ্রাস ঠোঁট অবধি উঠে আসার পর অকস্মাৎ কে যেন ছিনে নিয়ে গেল। কিংবা শেষ আশাটুকু এবার চোখের মণি থেকে টুপ করে খসে পড়ল; বাস সব অন্ধকার।

ওরা বুঝল, সামনে এখন নতুন করে আবার এক রহস্য ঘনাচ্ছে। তাই নতুন করে আবার ওদের বুকের ভিতরে বুভুক্ষাটা বড় হয়ে ফেঁপে ফুলে অস্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। এমন অসহ্য চাপ, যে কুয়াশাশীতল রাত্রির মধ্যেও ওরা ঘরঘর করে ঘামতে লাগল।

এরই মধ্যে কটি শেখ বিড় বিড় করে কি যেন বলবার চেষ্টা করছিল তখন থেকে, মনযন্ত্রের কানে এল না। একটানা লঞ্চের শব্দ কানের পর্দার পুরু করে একটা স্তর জমিয়ে রেখেছে ওর। বুদ্ধিশক্তির উপর আরো বেশি করে ও নির্ভর করতে লাগল। ফলে, তীব্রভাবে ও বোটের বোটের হেডলাইট, হেডলাইটের কোকাস বারার ধরন লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই ও অনুমান করতে পারছিল না, কার বোট, কে হতে পারে? জল-পুলিশ না ছেলে? আর যাই হোক, পার্টির নয়। পার্টির লঞ্চ এ অসময়ে চলবারও কথা নয়। কে তবে?

অনবরত কোকাস ঘুরছে চারপাশে, কুয়াশার মধ্যে, আকাশের গায় আর দু পাশের ঘুনোজলে। কোকাসের আলো শক্ত জমান একটা বল্লীকাঠের মতো বাঁই বাঁই করে ওদের নৌকার উপর দিয়েও পেরিয়ে গেল। আর একটু হলেই ছুঁয়ে ফেলেছিল আর কি। ওরা দুজনেই হুমড়ি খেয়ে গলুইয়ের সঙ্গে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল তখন। তার পর অনেকক্ষণ আলোর কলকটা তীরের দিকে ঘুরতে থাকায় বোটটাও অনেকখানি এগিয়ে এল। আরো

এগিয়ে আসার পর যখন ওরা বুঝতে পারল ওটা জল-পুলিশের 'বোট নয়, তখন যেন আবার ওরা যত্তে প্রাণ ফিরে পেল।

কচি শেখ বিজ বিজ করেই বলল, 'নয় রে নয়, পুলিশ নয়। মায়ের লঞ্চ।'

নবচন্দ্র ক্ষীণ কণ্ঠে সায় দিল, 'হুঁ ক্যানিং যাচ্ছে।'

মায়ের লঞ্চ পাশ কাটিয়ে চলে গেলে সামনে আবার অন্ধকার নামল। অন্ধকার আর কুয়াশা। অন্ধকারে তাকিয়ে থেকে লঞ্চের শব্দ আর জলের শব্দ, এ ছাড়া আর কিছুই নেই। খানিকক্ষণ আগে যেমন ছিল লাঠি-সোটা, লণ্ঠন, দোরগোল, চতুর্দিক থেকে ঝাঁক ঝাঁক করে ছুটে আসছিল, না, সে সব এখন কিছু নেই। এখন এক অন্ধকার। অন্ধকার আর কুয়াশা। এমন অন্ধকারই এ যাত্রা ওদের বাঁচিয়ে দিল। ওদের দু'জনকে। কচি শেখ আর নবচন্দ্রকে। কিন্তু হতভাগা আর একজন! যে-জন এখন ছইয়ের ভিতর আলো, আলো, আলো দেখবার জন্য কাতরাচ্ছে, তার কথা এরা যেন ভুলে গিয়েছিল এতক্ষণ। ব্যাপারটা সেই পুরনো হতাশাকে সত্যি বলে প্রমাণ করে দিচ্ছে যেন, চাচা, আপনা প্রাণ বাঁচা। হতাশা কচি শেখের মনে পড়ল এ সময়। মনে পড়ার অদ্ভুত রকম ও অন্ধকারের মধ্যে বলে হেসে উঠল।

'আমরা তাহলে বেঁচে গেলাম রে নব। দু পাতে এখন সোঁদর বন।'

নবচন্দ্র ঠাণ্ডা গলুইয়ের উপর কপাল ঠুসে ঠুসে ধরছিল, যেন শীতলতাটুকু ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে মেধের মধ্যে টেনে নিয়ে ভিতরটা আরো শীতল করবার চেষ্টা করছিল। ওকে একটা চার পা-অলা জীবের মতো বিদ্ভূত দেখাচ্ছে এখন। কোমরের দিকটা বন্দুকের মতো ফুল ফুল করে ফুলে ফুলে উঠছিল। কচি শেখের মনে হল জল থেকে লাফিয়ে উঠে বড় জাতের একটা কাকড়া গলুইটাকে চেপে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করছে। এখন এগিয়ে গিয়ে ওর পায়ার একটা নাড়ি মারলে আস্ত করে জলেই ও উলটে পড়বে। পড়লে ব্যাপারটা বন্ধ হয় না। তীব্রণ নিষ্ঠুর ভাবে ও নবচন্দ্রের ফুলে ওঠা পায়ার দিকে বৈঠা দিয়ে একটা খোঁচ মারল।

নবচন্দ্র ঘুরে তাকাল। পলকেই আবার আতঙ্কে চোখ ফিরিয়ে নিল পিছনে। মনে হল পিছনে এখনো সেই স্তোমারের মতো লঞ্চের শব্দ গুনগুন করে ছুটে আসছে। লঞ্চের শব্দ, আর জলের শব্দ। কান পেতে তার মধ্যে কোন মানুষজনার হৈ-হল্লোড় লাঠি সোটার শব্দ কিংবা ঐ ধরনের অন্য কিছু শুনবার চেষ্টা করল ও। সামনের দিকে আকাশ। আকাশ আর নক্ষত্র।

অল্প অল্প করে নক্ষত্র জ্বলছে। কুয়াশার মধ্যে চাঁদটা হঠাৎ ঘুরে ঘুরে অনেক নীচে অবধি নেমে আসছে। যেন লাফি দিলেও নাগাল পাওয়া যায়। নব ঝিলিমিলে নবচন্দ্র যেন জৌলিক কোন দৃশ্য দেখছে। ঘোলাটে চোখে ও কচি শেখের দিকে তাকাল। পলকেই ও আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই মাকোৎ, বুকের কাছে তাকিয়ে দেখ, চক চক করছে।'

কচি শেখ বুকের দিকে তাকাল। হাতের ছোটা বুলিয়ে বুঝতে পারল, চট চট করছে এক চাপ রক্ত। ভেদি ভাতের মতো আঠা আঠা। লোমের গোড়ায় শক্ত হয়ে কামড়ে বসেছে। অথচ রক্তের সেই লাল রঙটুকু উবে গিয়ে কালো, ভীষণ কালো দেখাচ্ছে জায়গাটা। ওর মনে পড়ল, ওরতকে ডিঙিতে টেনে তুলবার সময় একবার ও ওকে বুকে চেপে ধরেছিল। মনে হল, সেই সময়টাকে আর একবার ওর মনে পড়িয়ে দেবার জন্যই যেন রক্তটা ওর বুকে লেগে আছে।

কচি শেখ অর্থহীনভাবে নবচন্দ্রের দিকে তাকাল, তাকিয়ে হাসতে লাগল।

নবচন্দ্র শিউরে উঠল হাসি দেখে। এমন দুঃসময়েও কেউ হাসতে পারে! আশ্চর্য! কচি শেখ কি ভুলে গেল, ওরা জীবন নিয়ে এখন ঝিনিঝিনি খেলছে। যে কোন মুহূর্তেই এখন যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে। তা ছাড়া ওরত ডিঙির সন্ধির মধ্যে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে কাতরাচ্ছে এখনো মইয়ের ভিতর। সন্ধির কলাটা ওরতের বুকে না লেগে কচি শেখের গায়েও তো লাগতে পারত! কপাল ভাল, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ওরত তবু মায়ের মতো ডাকাতে ডাকাতে ডিঙিতে এসে উঠতে পেরেছিল। লোকটা যদি বেঁচে যায়, কলুজের জোরে বাঁচবে। নবচন্দ্র খানিকটা বিরক্ত হয়ে শুধাল, 'হাসছিস যে? ঘুরবি না রক্তটা?'

'ঘুরব।' স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর করল কচি শেখ। 'দুই বেটা এখন বেরতে গিয়েছিস—' বলতে বলতে জলের কাপটা নিয়ে মুখ ধোয়াতে লাগল কচি শেখ।

নবচন্দ্র বলল, 'এবার তা হলে আলো জ্বালি? আর তোমার রক্ত আছে বেশে নে এ বেলা।'

'ডিঙিটাকে জলে না ডুবলে রক্ত যাবে না রে। ভিতরে যা, সোটাটাই রক্তে ভেসে গেছে, যেথে যায়।' বলল কচি শেখ।

নবচন্দ্রের বুকের ভিতর দুরুদুরু উঠল। ভরতটা ঘুমিয়ে এতক্ষণে শেষই হয়ে গেল। 'সাড় পাচ্ছিস কিছু?' শুধাল।

দু'জনেই এবার দু'পাশুই থেকে ছইয়ের দিকে দৃষ্টি পাতল। ডিঙির দুলুনিতে ছইটাও দুলছে। খুব ঝিমিয়ভাবে, বুকের স্পন্দনের মতো একটু একটু উঠছে আর নেমে আসছে। আর পলুইয়ের সঙ্গে বৈঠার ঘষা খেয়ে অদ্ভুত একটা আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। যেন ভরত ডিঙাল ছইয়ের ভিতর পড়াতে পড়াতে যন্ত্রণা প্রকাশ করছে ও জানাচ্ছে। নবচন্দ্র মনে করতে পারল, আজ পাঁচ বছর ওরা তিনজন আর এই ডিঙি নৌকো এক হয়ে মিশে আছে। এই পাঁচ বছরে কত কি যে ঘটে গেল। কতবার ওরা বাঁচল। কতবার ওরা মরেও মরল না। অথচ আজ ভরত ডিঙাল, কতক্ষণই বা, আর কতটুকুই বা পরমায়ু ওর। এইবার একজনকে ওরা বিদায় দেবে। ভরত ডিঙাল ওদের মন থেকে ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকবে। আরো কতজনাই মন থেকে একে একে মুছে গেছে বলে এই মুহূর্তে ওর মনে হল।

'তুই একবার ভিতরে যা নব।' ঘড়ি শেখ বলল। 'বাইরে আমি পাহারা দেই, তুই দেখে আয় একবার।

নবচন্দ্র চারপাশে আর একবার তাকাল। কুয়াশা আর অন্ধকার। ডিঙির নীচে পাতের জল ঘস ঘস করে পা ঘষছে। দুই তীরের কিছুই ওর চোখে পড়ল না। অন্ধকার ছাড়া কিছুই না। ডিঙিটা বোধ হয় মাঝগাঙ দিয়ে চলেছে এখন। ভরতের নাম ধরে ও ডাকল, 'ভরত, এই ভরত।'

উত্তর এল না। পরস্পর আর একবার ওরা খুব চাওয়া-চাউয়ি করে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। তারপর হামা দিয়ে ছইয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল নবচন্দ্র। অন্ধকার আরো ঘনীভূত এখানে। জমাট একটা পাথরের মতো ভারী মনে হচ্ছে ভিতরটা। এখানেই পড়ে আছে ভরত।

ও নরম গলায় আবার ডাকল, 'ভরত রে, এই ভরত।'

এবারও কোন সাড়া পেল না ও। তা হলে কি শেষ হয়ে গেছে ভরত। আতঙ্কে ছইয়ের গায়ে লণ্ঠনটাকে খুঁজবার চেষ্টা করল। ও কিন্তু নড়তে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভরতেরই গায়ে। মা মা গা এটা? লোমশ, ভুলি-পাকান মাংস আলার শীতল মনে হল ওর। গায়ের মোষ কি খাবাল ওর। হাঁটুতে ওর গায়ের মোষ খোঁচড় কাটছিল। হাঁটু সরিয়ে খানিকটা ঝুঁকে এল নবচন্দ্র। ভরত শ্বাস টানছে কিনা বুঝবার জন্য খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল ও।

'কি রে নব, বলে কি ভরত?' ঘরের বাইরে থেকে কচি শেখ নবচন্দ্রকে শুধাচ্ছে।

শুনল নবচন্দ্র। উত্তর করল না।

ভরতের হাঁটুর ঘাটায় চট চট করছে। 'এঁ্যা, এতদূর অবধি রক্ত গড়িয়েছে তা হলে।' ঝনাৎ করে আর এক পলকের জন্য নবচন্দ্র মানুষগুলোতে ঝাঁকানি খেল নবচন্দ্র। নিজেকে সামলাবার জন্য কাপড়ের খুঁটে দ্রুত হাত চুকিয়ে দেশলাই বার করার চেষ্টা করল। 'খুড়তোর, দেশলাইটা গেল কোথায়? এই কচি, মাচিস আছে? অন্ধকারে হাই কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'রোস, দিয়ে আসছি।' ভিড়িটা একটু অদ্ভুত রকম দুলে উঠল। নবচন্দ্র বুঝল, কচি শেখ ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। স্থির হয়ে ও অপেক্ষা করতে লাগল।

'দুই বেটা শুয়েই ঘরে গেলি। এত যদি শুর তবে এ লাইনে কেন আসা।' বলতে বলতে কচি শেখ উটের মতো ঘরের ভিতর গলা চুকিয়ে দেশলাই জ্বালাল।

এক পলকা আলোয় চমকে উঠে নবচন্দ্র দেখল, ভরত কুৎসিত একটা ভঙ্গি করে বেকায়দা ভাবে পড়ে আছে। এক হাঁটু ভাঁজ করা, দোমড়ান। আর এক পা ছড়িয়ে টান টান হয়ে আছে কালির কটোর দিকে। বুকের উপর রক্তের ঝুলঝুলি। তেলি শুতোর মতো রক্ত ছড়ান চাটাতলে।

'কি রে, কি হ'ল?' কাঠিটা নিভে যাচ্ছে দেখে খিঁচিয়ে উঠল কচি শেখ। 'হাঁ করে বসে থাকবি নাকি বেকুফ?'

নবচন্দ্রের নড়তে যেন ভয় করছিল তখন। জখমিটা বড় মারাত্মক। বাঁচবে তো ও। নাকি এই শেষ।

কচি শেখ আবার কাঠি জ্বালল, দেখল, এক হাতে রক্ত থামতে পড়ে আছে ভরত। আর এক হাত শিয়রের দিকে, গরমার বাস্তটার দিকে টেনে রেখেছে। বাস্তটার কাচা চামের অ্যাবড়াথাবড়া ভাবে কয়েক গুচ্ছ সোনার গাঁথা। সোনাগুলি যেন ধরতে চাইছিল ভরত।

'এই,' কচি শেখ শুধাল, 'চোখ দুটো দেখেছিস?'

নবচন্দ্র দেখল, ভরতের চোখ দুটো খোলা আকাশে নীলুকলের মতো নজর আকাশে। 'কাঁদছিল নাকি ও?'

'এই প্রথম ওর চোখে জল দেখলাম।' বলল কচি শেখ।

'আমিও।' বলল নবচন্দ্র। 'আমিও কোন দিন ওর চোখে জল দেখব ভাবি নি।'

আর একটা অনন্ত কাটি নিঃশেষ হওয়ার পর কচি শেখ আবার একটা কাটি আনল। আঙুলের ডগায় ছেঁকা খেয়ে ও এবার চিমিটে চিমিটে বলল, 'উঁহু, আঙুল পুড়িয়ে দিলি আমার। এবার তুই লণ্ঠনটা জেলে নিবি, না, এমনি ভাবে গোটা রেশনটাই শেষ করব।'

নবচন্দ্র খানিকটা লজ্জিত হেসে দেখল, ওস্তরের বৌ পাশে বেড়ার গায় লণ্ঠনটা ঝুলছে। হাসা দিয়ে ও ওস্তরকে তিরোল, তারপর অস্পৃশ্য জিনিসের মতো দু আঙুলে আলতোভাবে লণ্ঠনটাকে তুলে নিল।

কাটি নিভে যেতে আবার অন্ধকার। কচি শেখ বলল, 'বাইরে আয়, জেলে নিয়ে যা।'

দুজনেই বাইরে এল। চিমনি কল খুলতে খুলতে নবচন্দ্র বলল, 'ওস্তরের মাটা কেমন শীতল মনে হল রে কচি। বোধ হয়—'

কচি শেখ খুব জোরে ঘাস টানতে টানতে বলল, 'শালার এই লাইনটাই বড় খচ্চর। এতে যদি পুলিশে ধরত অনেক ভাল হত। ছোট খাট কিছু খাঁতানি খেয়ে হাজতে ঢুকে থাকাও অনেক ভাল। জানে তো আর খতম হত না কেউ। সবই ওর কপাল।'

নবচন্দ্র রেশনটা জেলে লণ্ঠনের পলতের আগুন ছোঁয়াল। তারপর চিমনিটাকে উপুড় করে বসিয়ে কচি শেখের দিকে চোখ ফেরাল। ওর চোখ দুটো ওলিখোরের মতো লাল টকটক করছে। কপালের নীচে ঘুস গড়াচ্ছে, থুতনির কাছে খোঁচা খোঁচা দাড়ি জমে আছে, অনেক দিন কামায় নি ও। বেশ অনেকদিন ধরে একটানা নেশা করছে ও। নবচন্দ্রের কেমন ঘেন্না হচ্ছিল ওর দিকে তাকাতে।

নেশা ওরা তিনজনেই করেছিল। সন্ধ্যায় বটুখালির বাজারে। নেশা না করলে এসব কাজে হাত বসে না। নেশা না করলে এমনভাবে হাজারটা লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পালিয়েও আসা সহজ হত না। নেশা করেছিল বলেই খুন-খারাপি করতে পারে এমনি একটা শক্তি নিয়ে আজ সন্ধ্যায় ওরা বেরতে পেরেছিল। তারপর প্রথমটায় ছদ্মবেশে ভালমানুষ সেজে গ্রাম-বাসীদের সঙ্গে মিশে গেল। প্রতিটি আচরণকে ওরা শালীন করে রেখেছিল তখন। একটি লোকও তখন বুঝতে পারে নি, কি ওদের অভিসন্ধি, কি অঘটন আজ রাতে ওরা ঘটাতে চলেছে।

সমস্ত ঘটনাটাতেই আশ্চর্য রকম নাটকীয় বলে মনে হতে লাগল নবচন্দ্রের। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের মতই উত্থান-পতনময় ঘটনাগুলো নাটকীয় ঘটে গেছে।

সন্ধ্যার বটুখালির ঘাটে নৌকো বেঁধে, বাজারে। বাজার থেকে সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ির বাইরের বারান্দায় রাত্রিবাসের জন্য আশ্রয় গ্রহণ, তারপর গভীর রাতে ঘরে ঢুকল দু'জনে, তরুণ আর কচি। ঘরজোড়া নবচন্দ্র। কী আলোয় টর্চ ঘুরল এ পাশে ওপাশে। সিন্দুকও পাওয়া গেল। সিন্দুক খোলা অবধি কাকপক্ষীও টের পেল না। বাড়ির কর্তা মনোরী কাঁপিয়ে একবার কেশে উঠলেন। বুঝতে পারল না ওরা লোকটা ঘুমের চোখেই কাশল কিনা। তিনজনেই ছায়ামূর্তির মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। নিশ্বাসের শব্দও চেপে রইল।

নাহ্, ঘুমিয়েই আছে লোকটা। সিন্দুক থেকে গয়নার বাক্সটা টেনে বার করল তরুণ। ভারী মনে হচ্ছে কি। বাক্সটা বুকে চেপে নাচতে ইচ্ছে হল ওর।

আর ঠিক এই সময়ই অতর্কিতে দুর্ঘটনাটা ঘটে গেল। একলাফে লোকটার বুকের উপর চড়ে বসে ভাগার তুলে ধরল কচি সেখ। তারপর তক্ষিতেই আবার তিনজনে লাফিয়ে ঘরের বাইরে এসে ছুটতে শুরু করল।

ঘাটের কাছাকাছি এসে বন্ধুদের খোঁচায় চীৎকার করে লুটিয়ে পড়ল তরুণ। বুক থেকে তবু ও বাক্সটাকে আলাদা করল না। মায়ের মতো লাফাতে লাফাতে নৌকায় এসে আশ্রয় নিল।

তারপর—

হ্যাঁ তারপর এক দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতে নবচন্দ্র কচি সেখের দিকে তাকাল। 'লণ্ঠনের আলোয় কুয়াশাটাকে স্পষ্ট এখন ধরা যাচ্ছে। জলজল করে চেপে বসেছে কুয়াশা। পাটাতনের উপর টুপ টুপ করে জল পড়ছে। নদীতে জলের টান এখন ভাঁটার দিকে। ফলে তেমন কোন ঢেউ নেই আজ। ঢেউ থাকলে আরো বিপদকে পড়ত ওরা।

'কি রে, কি দেখছিস?' চোখ বাচিয়ে প্রশ্ন করল কচি সেখ।

'তোকেই দেখছি।' নবচন্দ্র ম্লান একটু হাসবার চেষ্টা করল।

'আমাকে? হুঃ, তুই এমন ভয় পেয়েছিস নয়। তোদের মতো লোক নিয়ে বড় কাজে হাত দেওয়াই ঠিক নয়।'

ঐ দুজনকে তাকাল নবচন্দ্র। বলল, 'ভদ্রলোকের জন্য খুব খারাপ লাগছে, নইলে আর কি। বাস্টাও তো পাওয়া গেছে।' বাস্টার কথা এই প্রথমবার উচ্চারণ করল নবচন্দ্র। এবং মনে মনে ও নিজেকে খুব ছোট করে কল্পনা করল।

'বেশ মানুষের মায়া কিন্তু।' কটি শেখ লোভার্ত চোখে হাসছে। 'অনেক মাল পায়ের উপর পা তুলে জিরিয়ে নেওয়া যাবে, কি বলিস?'

'হুঁ।' ছোট্ট করে উত্তর করল নবচন্দ্র। হ্যারিকেনে তিন উঠছে বেড়াল হওয়ায় পলতে-কলটাকে খানিকটা খুঁচিয়ে শিখাটাকে খাটো করে দিল ও।

'তাছাড়া একটা কথা বলব?' কটি শেখ নবচন্দ্রের দিকে তাকাল।

'কি কথা?'

'হয়তো শুনতে তোর খুবই খারাপ লাগবে; তবু, সত্যি বলেই বলতে পারি।'

'কি কথা? কি সত্যি?'

'বহু ভদ্রত আর বাঁচল না।' কটি শেখ গলা নিচু করেই বলবার চেষ্টা করছিল।

এত বড় ঘটনার পর কেউ বড় একটা বাঁচে না। কিন্তু কি বলতে চায় ও? নবচন্দ্র বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

'যদি শেষ পর্যন্ত না-ই বাঁচে,ও তাহলে এবার গফুরার বাস্টা ভেড়েচুরে আমরা দুজনেই ভাগ করে নেব। ব্যাপারটা কিন্তু কম নয়রে নব। বরাবর তো আমরা তিনজনেই পেতাম, এবার নেব দুজনে।'

'আর যদি ও বেঁচে ওঠে?'

'সে তা হলে অন্য কথা। অবশ্য ও না ফিরলেই ভাল; আমাদের তিনজনের কেউই যেন না ফেরে···' শুকনো ঠোঁটে খুব শীতলভাবে হাসল কটি শেখ। তারপর একটু লজ্জায় হয়ে বসে, গলা তুলে বলল, 'যাহ্, সর্দার, লণ্ঠন জেলে বাইরেই বসে থাকবে নাকি। ভিতরে যা; কিছু করা যায় কিনা দেখ।'

যেন এইমাত্র নবচন্দ্রও সম্বিৎ ফিরে পেল। পেয়ে, হন্তদন্ত হয়ে লণ্ঠন নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল।

ভিতরটা নিতান্তই ছোট বলে ঘরের ভিতরও পরিসরটা নেহাতই কম। তাই পাশ একপাশে সিঁদুরমাখা মা-কালীর একটা কটো ঝুলছে। আর

ওপাশে একখানা ক্যাম্বেতারা বাক্স। তার গায় গুটি কয়েক মেয়ের ছবি আঠা দিয়ে সাঁটান। ছবিগুলোর গায়ে আতুল বসা বিশ্রী সব দাগ লেগেছে। একটু তফাতেই একটা বাহবারা জাল, যার কোপাবার কাঁটা। প্রয়োজন হলে ঐ কাঁটাতেই মানুষ কোপাতে হবে। একবার নই করে ছুঁড়ে মারলে চকচক করে ঢুকে যাবে, মের আরার টান পড়লে নাড়িভুড়িতে উলটো কাঁটায় জড়িয়ে থাকবে।

লণ্ঠনটাকে কাঁটার গায় ঝুলিয়ে দিল নবচন্দ্র। 'যেই তরত, তরতরে—' তরতের হাঁটুতে একটু ধাক্কা দিল ও।

সাড়া শব্দ পাচ্ছে না দেখে বুকের দিকে ঝুঁকে পড়ল। 'ইস্, কি রক্তরে বাবা!' পায়ের নীচে চিটচিট করছে। তরতের এলানো হাতটাকে একটু-খানি তুলে ধরল ও। 'আরে আস্, এখনো রক্ত বেরুচ্ছে রে কচি!' প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিল নবচন্দ্র।

হাতটাকে ও তুলেই রাখল। ঘন জায়গাটায় একতাল মাংসপিণ্ড জবার পাঁপড়ির মতো বেরিয়ে এসেছে। বল্লমটা বড় বেয়াড়া জায়গায় ঢুকে গিয়েছে ওর। আর একটু নীচে লাগলে ফুসফুসটা বেঁচে যেত। হয়ত বা বাঁচতেও পারত তরত। বেচারা। সবই কপালের খেলা।

হাতটাকে নামিয়ে কাটা জায়গাটায় একটুখানি চাপ দিয়ে রক্ত বন্ধ করবার চেষ্টা করল নবচন্দ্র। তরতের মাথার দিকটা খানিকটা বাঁকাভাবে ঘুরে সবনার বাক্সের দিকে এলিয়ে পড়ে আছে। কপালের পাশে কাটা দাগটা চকচক করছে আর একটা ঘায়ের মতো। এই দাগটা কবে হয়েছিল নবচন্দ্র মনে করতে পারল। আজ যদি নবচন্দ্র বেঁচে ওঠে ওর এই পেটের কাছের দাগটা চিরকাল ও চিনতে পারবে।

রক্তের ফোয়ার হাতের মুঠো ওরে উঠল দেখে নবচন্দ্র ক্ষত জায়গা থেকে হাত সরাল। অসহায়ভাবে ও দেখল, ঘাড়ে মাথে মুখ থুলে বড় বড় শ্বাস টানছে তরত। একটু জল দেব মুখে। ভাবতে ভাবতে আবার ও কচি শেখকে ডাকল, 'এই কচি, ভিতরে আয়। ব্যাপারটা কিন্তু ভাল নয় এখন।'

কচি শেখ বলল, 'বাইরে একজনের থাকা দরকার। তুই আয়, আমি যাচ্ছি।'

প্রস্তাবটা খারাপ নয়। এইভাবে তরতের কাছে বসে বসে মৃত্যু দেখার চেয়ে বাইরে গিয়ে কুয়াশার নীচে বসা ভাল। সঙ্গে সঙ্গে ও উঠে পড়ল।

বাইরে এল। 'আহ্, বেশ ঠাণ্ডা এখানে।' তবু এবার সব ভয়ে শ্বাস টানা বাদে কিছুক্ষণ।

'এই যে।' বৈঠাটা নবচন্দ্রের হাতে দিয়ে কচি শেখ উবু হয়ে ইইয়ে ঢুকল। ঢুকে এক নিঃশ্বাসে ও ভরতের আপাদমস্তক একবার দেখে নিল। তারপর আর্তভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ যে হয়ে এসেছে রে নব।'

নবচন্দ্র উত্তর করল, 'হুঁ'। তোর অবধিও টিকবে না আর। পারলে একটু জল খাওয়া কচি। এ সময় নাকি খুব তেষ্টা পায়।'

কচি শেখ উত্তর করল, দাঁড়া, খাওয়াচ্ছি।'

যেন এইখানেই সব কথা ফুরিয়ে গেল ওদের। কচি শেখ এবার ভরতের গলায় জল ঢেলে দেবে বোঁটা বোঁটা করে। মৃত্যুকালে জল দিলে পুণ্য হয়। এক অর্থে কচি শেখ পুণ্য করছে এবার। করুক। নবচন্দ্র বাতাসের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বাতাসের ঝাপটায় শীতল হবার জন্য স্থির হয়ে বসে রইল।

তারপর, অনেকক্ষণ পর হঠাৎ লক্ষ্য করল ভিড়িখানা খানিক বেতালভাবে দুলছে। বুঝতে পারল, কচি শেখ এপাশ ওপাশ দুলতে শুরু করেছে ইইয়ের ভিতর। আরো কিছুক্ষণ পর ও বাস্তু মনার শব্দ পেল। পাটাতনে চাপর মারার শব্দ, কান সজাগ রেখেই নদীর কুয়াশার দিকে তাকিয়ে রইল ও।

আরো খানিকক্ষণ শূন্যতার মধ্যে কেটে যাওয়ার পর ও বুঝতে পারল, কচি শেখ ইইয়ের ভিতর থেকে বাইরে আসছে। এক হাতে হুমড়ে হুমড়ে একটা টিনের পাত্র নিয়ে আসছে। পাত্রটি দেখেই ও চিনতে পারল। 'আমার এখন মদ খাবি কচি?'

'আলবাত খাব। না খেলে আমরা তিনজনেই মরে যাব।'

অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল নবচন্দ্র। মদ খেলে একদিক থেকে সত্যি সত্যি বাঁচা যায় বলে ভ্রমে পড়ল ওর। খেয়েই চুলে থাকা যাক। কপালে যা আছে ঘটবেই।

কচি শেখ ঝাঁকি দিয়ে টিনটাকে মুখের কাছে ধরল। 'বুঝলি নব, রাতটা হয়ত কোন রকমে টিকে যাবে ভরত, কিন্তু তার বেশি নয়।' বলতে বলতে ওর গলা ভেঙে এল। শত হলেও ধরা বাঁচা হাতে নিয়েই তো এতকাল ঘুরছে ওরা। আজ ভেক এতটুকু ভুলের জন্য।

ভিড়ির নীচ থেকে জলের শব্দ গলে গলে কানে আসছে। বাতাসে

কুয়াশার গন্ধ। ঘালির মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে কুয়াশা ঝরছে। ছইয়ের ভিতর থেকে অনেক টুকরো চাঁদের আলো নদীর উপর আলোর কৌটা পরিয়ে রেখেছিল। কৌটাগুলি জলের ঢেউয়ে একটু একটু করে কাঁপছে। আবার ভেঙে ভেঙে ভাঁজিয়ে যাচ্ছে। আবার গুঁড়োগুলো একসঙ্গে মিশে গোলাকার কৌটা হয়ে উঠেছে।

কৌটাগুলির দিকে তাকিয়ে রইল নবচন্দ্র। অনেক কথাই ওর মনে পড়ছিল। তারা তারা হারিয়ে যাওয়া, বহু পুরনো স্মৃতির গুঁড়ো সারা মন ভরিয়ে দিচ্ছিল ওর।

ছইয়ের পাশে মশা মারতে ব্যবহার করার একটি দেখ। কাছে ডাকল, 'গলা ভিজিয়ে নে।'

নবচন্দ্র এগিয়ে এল। মিষ্টি মোলায় গন্ধটা ওর নাকে এল এ সময়।

'বাই বলিস মালটা কিন্তু খারাপ বেচেনি ওরা।'

মগ থেকে জল খাওয়ার মতো খানিকটা গিলে নিয়ে ম্লান একটু হাসল নবচন্দ্র।

'খানিকটা চাট পেলে ভাল হত। ভীষণ খিদে পেয়েছে না রে?'

নবচন্দ্র বলল, 'হুঁ।' বলে মগটা আবার ও কটি শেখের দিকে ফিরিয়ে দিল।

একটাই মগ। ফলে দুজনেই এক মগে পইয়ে পইয়ে গিলতে লাগল।

খানিকক্ষণ পর কটি শেখ বলল, 'তুই কি ভাবছিস আমি জানি নয়।'

'কি ভাবছি?' প্রশ্ন করে কৌতুকে তাকাল নবচন্দ্র।

'তুই ভাবছিস, তোর অবশিষ্ট টিকবে না ভরত। আমার কিন্তু মনে হয়, অত সহজে ও মরবে না।'

কুয়াশার জন্য ভোর হতে কত বাকি বলা যাচ্ছিল না। তবু যতই নদর যাক, তবুও আর কয়েক পলক বেঁচে আছে। অসম্ভব, তার বেশি আয়ু নেই ওর। 'কাটা জায়গাটা তুই ভাল করে দেখেছিস কটি? দলা অনেক মাস্ল কেটে গেছে। তাছাড়া যা রক্ত।'

'রক্ত তো বেরবেই।' স্বাভাবিক গলায় বলল কটি শেখ। 'জখমটা তো আর কম নয়। তা হলেও বলছি ও সূর্য-ওঠার আগে মরছে না। ততক্ষণে আমরা জঙ্গলের ধারে পৌঁছে যাব।'

'যখনই মরুক ওকে কিন্তু কবর দেব আমরা। কবরের উপর ছোট ছোট

হলপায় পুঁতে দেব। আমার যদি সময় পাই, বেঁচে থাকি, গাছগুলো এসে দেখে যাব।'

'তোর খুকটা বড় বয়স রে নব।' অদ্ভুতভাবে হাসল কচি শেখ। 'এসব লাইনে না এসে উচিত ছিল তোর যাত্রার দলে যাওয়া।'

মানিকটা অপমান বোধ করল নবচন্দ্র। 'তা হলে বলছ ধরে গেলে ওকে আলে ভাসিয়ে দেবে?'

'তা দেব কেন? কবরই দেব। ব্যস, সব তখন ফুরিয়ে যাবে।'

আবার ঘর ঢেলে বল ভর্তি করল। টিনটা প্রায় খালি হয়ে এসেছে এবার।

বলটা এবার দু আঙুলের চাপে উপরে তুলতে শুরু করল নবচন্দ্রের। হাতটা কেমন কাঁপছিল ওর। ঠোঁটে চেপে বলটাকে ও পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচাল। চোখের তারা দুটো কি কচি শেখের মতো ওরও লালচে হয়ে উঠেছে এখন। কাঁচা টকটকে রক্তের মতো লালচে। চোখ দুটোকে কুঁচকে ছোট করে বুজে, আবার ও খুলে ধরল।

'তা যাই বলিস না কেন, এক ব্যাপারে কিন্তু ভালই হয়েছে আমাদের। ভাগটা এখনই হচ্ছক, আর পরেই হচ্ছক সোনা-রুপোয় তো ভাগ বসাতে পারবে না। এবার আমরা পুরো গয়নাই দুভাগ করে নিতে পারব।'

নবচন্দ্রের মনে হল ও যেন সত্যি সত্যি বাস্তু থেকে আধা-আধি বখরায় গয়না তুলে নিচ্ছে। যতই মিছে হোক ব্যাপারটায় ও কিন্তু লাভবানই হল শেষ পর্যন্ত।

'কি রে নবচন্দ্র তুই কিছু বলছিস না?

'কি আর বলব।' নবচন্দ্র বলটাকে কচি শেখের দিকে এগিয়ে ধরল। থর থর করে হাত কাঁপছিল ওর।

'আচ্ছা ধর যদি আমরা আর একটা ব্যাপার করি। তাকাল কচি শেখ।

চোখের সামনে কুয়াশার ভাঁড়োগুলো আলোর ফুলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে নবচন্দ্রের। আকাশের তারাগুলোই নেমে এল কি? বুঝতে পারছিল না ও।

'ধর্ আজকে আমরা গয়নাগুলো দু ভাগ না করে যদি একভাগই করে নেই।'

'মানে?'

'মানে আর কি! মানে খুব সহজ। ধর, তুই তো বলছিস, তোর হওয়া

অবধি টিকে থাকতে না ভরত। তাই যদি সত্যি হয় আমি তোকে পুরো বাজীটাই দিয়ে দেব। আর না হলে আমিই নেব নবমাতলো।'

'ভরতকে নিয়ে জুয়া খেলবি!' আর্তভাবে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল নবচন্দ্র।

'কেন, দোষ কি তাতে! ওর যদি বেঁচে ওঠার আশা থাকত তা হলে না হয়,—'

নবচন্দ্র অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে রইল। বাজী ধরা উচিত কি অনুচিত কিছুই ও বুঝতে পারছিল না।

'ঘরে যাওয়ার পর তাদের পাল্টি আর ভরত, তকাৎ থাকে কিছু?' কটি শেখ এগিয়ে এসে নবচন্দ্রের মাথা ঘরে ঝাঁকি দিল। 'নে নে, কপাল ঠুকে এবার লেগে পড়। সূর্য ওঠার আগে মরলে তুই পাবি নব নবমা, পরে মরলে আমি পাব।'

নতুন করে সূর্যের মুখ আর দেখবে না ভরত, নবচন্দ্র স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিল। তবু, তবু ওর এ ধরনের বাজী ধরতে বুক কাঁপছিল। আবার বলল, 'শেষ পর্যন্ত ভরতকে নিয়ে বাজী ধরব।'

'যাহ্ শালা তোর আবার সব কিছুতেই বুকপুক করা। বাঁচাতে পারবি, তা হলে না হয়—'

আবার শুরু হোক তাকাল নবচন্দ্র।

'তা যখন পারবি না, তা হলে যা বলছি তাই কর। কপালে থাকলে লেগে যাবে তোর।'

নবচন্দ্র বলল, 'বেশ ডুবেছি যখন সব দিক দিয়েই ডুবব। রাজী।'

ভিড়ির নীচে জলের শব্দ। জলের উপর আলোর ফোঁটাগুলি কাঁপছে। নামবে অন্ধকার, পেছনেও অন্ধকার। অন্ধকার আর কুয়াশা। নবচন্দ্র উঠে গিয়ে অঙ্ক গলুইয়ে বসল। হাতে বৈঠা তুলে নিল। কটি শেখ খালি টিনটাকে নাড়ি কাছিয়ে জলে ফেলে দিল। রশিটা কেবল গড়াতে লাগল পাটাতনের উপর।

ছইয়ের ভিতরে ভরত। ভরত আয়নার জবা ফুলের মতো রক্ত মাংস দলা দলা পাকিয়ে ঘরে আছে। ফুস ফুস করে তাই দিয়ে এখনো বুঝি রক্ত গড়াচ্ছে। মানুষ মরে যাওয়ার পরও কি রক্ত গড়ায়। ভেতরের রক্তটা কি জমে যায় না কখনো।

নবচন্দ্র বাক্সটাকে বাঁকিয়ে সাফ করার চেষ্টা করল। তীব্রণ ঘোঁয়াটে লাগছে এখন। হে, মা কালি। রাতটা যেন রবারের মতো লম্বা অনেকখানি লম্বা হয়ে যায়। ভরত বেচারা না মরা অবধি রাতটা যেন না ফুরায় মা। ভয় ভয়ে ছইয়ের ওপাশের পলুইয়ে ও কচি শেখকে দেখতে লাগল।

কচি শেখ চুলতে চুলতে বৈঠা চালাচ্ছে জলে। নাবাল চিন্তায় মতো ও-ও ভাবছিল, কি প্রয়োজন ছিল ওর বাজী ধরার। ভরপুক নবটাকে একটা ধোঁকা মেরে জলে ফেলে দিলেই তো চুকে যেত সব।

'কি রে নবচন্দ্র, কি ভাবছিস?'

'কিছু না।'

কিছু না কি রে? বাক্সটা না আমি তোর কপালেই রয়ে গেছে আজ।' বলে, মন মন করে হেসে উঠল কচি শেখ।

অমন ভাবে হাসল কেন ও। সন্দেহ হল নবচন্দ্রের। তবে কি ওর অন্য মতলব মাথায় এসেছে। সঙ্গে সঙ্গেই ওর চাবিটার কথা মনে পড়ল। চাবিটা কোথায়? কচি শেখ কি লুকিয়ে রাখল। তাই বা সম্ভব কি করে? বাক্সটা তো কেউই আমরা খুলে দেখিনি এখনো। থাকলে তো চাবিটা ভরতের কাছেই থাকা উচিত।

ও তাড়া তাড়া গলায় শুধাল, 'চাবিটা কোথায়? এই কচি, চাবিটা পেয়েছিস?'

'বাক্স যখন হাতের কাছে, চাবি না হলেও চলবে।' উত্তর করল কচি শেখ।

'না, শুধু বলছি চাবিটা কি হল?'

'কি আবার হবে। ভরত হয়তো গিলে ফেলেছে।'

অসম্ভব নয়, অনেক সময়ই এসব জিনিষ গিলে ফেলতে হয়। তবু নাবালকের মতোই নবচন্দ্র শুধাল, 'তা হলে তাটা পাবি কি করে?'

'কি করে আবার, পেট চিরে বার করে নেব।'

'মিবি!' বিস্ময়ে প্রশ্ন করল নবচন্দ্র। 'পারবি তা?'

'কেন পারব না। বড়া মানুষের পেট চিরতেও ভয় নাকি। যে লে, যাই বাপ যাই বাপ; এখনো রাত ভোর হতে বহুত্ সময়।'

শুয়ে শুয়ে বৈঠাটাকে জলে নাবাল নবচন্দ্র। জলের শব্দ ছাড়া আর কিছুই ওর কানে আসছে না এখন। আলোর ফুল ছাড়া কিছুই ও দেখছে না আর। কিন্তু হঠাৎই যেন ওর মনে হল, ভাগ্যটাও বাজী ধরেছে ওদের সঙ্গে, ওর পাওনাটাও ও ভালভাবেই ভাগ বসিয়ে রাখার জন্য চাবিটাকে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে রেখেছে।

নবচন্দ্র ঠুসল, ওর হাত পা এবার অবশ হয়ে আসছে।

একালের কবিতা : বিষ্ণু দে সম্পাদিত। সংঘমিত্র পাবলিকেশনস

কিছুদিন থেকে বাংলা কবিতা সংকলন সম্পাদনার হুজুগ দেখা দিয়েছে। যে কেউ নিজের খেয়ালখুশি মাফিক রকমারি শিরোনামায় সংকলন বের করছেন। কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না এমন নয়। বৈষ্ণব কবিতার একাধিক উল্লেখযোগ্য সংকলন বেরিয়েছে। কিন্তু আধুনিক কবিতার উদ্ভট পর্যায় পরিকল্পনা ও চারিত্র আরোপে উৎকট খেয়ালিপনা দেখা যাচ্ছে। এখন সঠতাও চোখে পড়ে, বাংলা কবিতার চারটি পর্যায় ভাগ ক'রে চতুর্থ পর্যায়টি তড়িঘড়ি বাজারে ছাড়া হ'ল, অথচ প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয়ের কোনো পাত্তা নেই।

এ রকম উদ্যোগ প্রচেষ্টায় নাম জাহির করবার সুবিধা মেলে, সাহিত্য ব্যবসায়ীদের বাজার সরগরম রাখা যায়, কবিতা বিলাসীদের বিলাসের উপকরণ যোগানো যায়, কিন্তু কবিতাপাঠকের সঙ্গত উদাসীনতা ভেঙে কখনই তাঁদের মনের দরবারে পৌঁছনো যায় না।

কবিতা পাঠকের কাছে না জানা ভাষার যাহাই করা কবিতার অনুবাদ সংকলনের বা কম পড়া কোনো কাব্যজগতের কবিতা সংকলনের কদর থাকতে পারে। তবুও যাহোক, নাম করা কবিদের একটা কি দুটো কি একটা কবিতা পড়ার সুযোগ মেলে, অজ্ঞতা ঘোচানো যায়, ভিন্ন ভিন্ন কাব্যজগতের মোটামুটি একটা হালচাল জানা যায়।

কিন্তু কবিতাপাঠক নিজের ভাগ্য ও নিজের সময়কালের ব্যাপারে এত অল্পে তুষ্ট হতে নারাজ। তাঁর সুযোগ আছে; একেবারে নতুন কবির বিষয়ে খোঁজ রাখার, ভিন্ন কবিদের প্রথম থেকে শেষ বা হালের বইটি বারবার পড়ার, বিবর্তনের প্রক্রিয়াটি আবিষ্কার করার, যাচাই করার; মোট কথা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক যাহাবাজ সমালোচক সম্পাদক প্রকাশক প্রভৃতির ফরমান ফতোয়া বাতিল ক'রে কবিতা বিষয়ে তাঁর নিজের মত গ'ড়ে তোলার। এ রকম কবিতা-পাঠক থাকেন ব'লেই কবির বাঁচোয়া। সমালোচক সম্পাদক

প্রকাশকুল সাধারণত বাজার তৈরি করেন কিন্তু কবিতাপাগল লোকের সাহচর্যই কবির সৃষ্টিপ্রেরণাকে জীইয়ে রাখে।

সেই কারণেই, আধুনিক বাংলা কবিতার চলমান্তি সংকলনের কদর তাঁদেরই কাছে যাঁরা কবিতা পড়েন না বা কম পড়েন এবং সেইসব বিদেশীর কাছে যাঁরা সবেমাত্র ভাষাটি আয়ত্তে এনে পড়তে সুরু করেছেন। কবিতা-পাঠক প্রতিৎ নবম সুযোগে নেহাৎ কৌতূহলবশে এইসব সংকলনের পাতা ওল্টান, সংকলনের অপরিহার্যতা যাচাই করেন।

সুতরাং বলা যায়, সম্পাদকের কৃতিত্ব তাঁর সংকলনকে যথাসম্ভব প্রতি-নিধিত্বমূলক অথবা বিশেষ চরিত্রে চিহ্নিত ক'রে সর্বদিক পাঠকের কাছে অপরিহার্য ক'রে তোলার বিচারে।

আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন কাজে মাত্র কয়েকজন—প্রথমে আবু সয়ীদ আইয়ুব ও বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পরে বুদ্ধদেব বসু এরকম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব ও বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতা বহুদিন বাজারে উধাও হওয়ায় বুদ্ধদেব বসু আবার নতুন ক'রে সম্পাদনা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতাই এখন বাজারে চালু আছে। কোনো কোনো কবির বিষয়ে সম্পাদকের কপট উদাসীনতা এবং নিজেকে বেমালুমভাবে আড়ালে রাখবার চলনভঙ্গিকে আমল না দিলে বলা যায়, সংকলন হিসেবে আধুনিক বাংলা কবিতা মোটামুটি প্রত্যাশা এবং চলনসই।

হালের আর একটি সংকলন, বিষ্ণু দে সম্পাদিত একালের কবিতা, কবিতা-পাঠককে কৌতূহলী করেছে। বিষ্ণু দে কবি। এবং যেহেতু তাঁর কবিতায় তাঁর সময়ের দৈন্য ও মহিমা ঘৃণা ও ভালোবাসা ক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ত আন্তর উচ্চারণ পায় যেহেতু গভীর হৃদয়ভাবোধে আজকের কবিতাপাঠক তাঁর যে কোনো সাহিত্যিক উদ্যোগে কৌতূহলী হ'তে অভ্যস্ত।

নাম শুনে মনে হতে পারে, যেন বিদেশের কবিতা নিয়েই হয়ত সংকলনটি গ'ড়ে উঠেছে। তা নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ১৯৩৯ অব্দানো বাঙালি কবিদের কবিতার সংকলনই একালের কবিতা।

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে, সংকলনের নাম একালের কবিতা কেন। মুখবন্ধে সম্পাদক লিখেছেন, "নামকরণ একালের কবিতাসংগ্রহই রইল। কারণ আধুনিক শব্দটা খুব নিশ্চিত নয়।" নিশ্চিত লাগলে হয়ত আধুনিক শব্দটাই রাখা হত।

কিন্তু কেনই বা নির্দিষ্ট নয় সে কথা সম্পাদক স্পষ্ট বোঝান নি। আবার, একালের লক্ষণ বোঝাতে গিয়ে তিনি আধুনিক শব্দটাকেই ফিরে ফিরে ব্যবহার করেছেন। নামে কৈফিয়ৎটি নিরুপায় অনুহাতমাত্র— যেহেতু আধুনিক বাংলা কবিতা নামে সংকলনটি বাজারে চালু আছে।

আমাদের মনে হয়, আধুনিক বলতে আমাদের সাহিত্যিক আলোচনায় শুধুই যে একটি নির্দিষ্ট সময়কে বোঝায় একাল বলতে তা বোঝায় না। আধুনিক-এর সীমা ব্যাপক। পণ্ডিতদের বিচারে মাইকেল থেকেই বাংলা কবিতায় আধুনিকতার স্পষ্ট অভিযান। যদিও, বোঝা যায় না কেন, আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনগুলিতে এবং আলোচ্য সংকলনে সম্পাদকরা মাইকেলকে পরিহার করে রবীন্দ্রনাথ থেকেই সংকলন শুরু করেন।

পরিকল্পনার প্রচার দেখে আমরা আশা করেছিলাম, কিছু একটা হবে। হয়ত কিছু যে সম্পাদিত সংকলনে কবিতাপাঠকেরা নতুন কোনো দিক দেখবেন। সংকলনটি পড়ে তবে দেখা গেল, একালের কবিতা পূর্ববর্তী আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনগুলিরই প্রক্ষেপের মাত্র।

সংকলনে মোট ৯০ জন কবির ২২১টি কবিতা নেওয়া হয়েছে। কবির তালিকা নেহাৎ কম নয়। একালের আধুনিক কোনো কবিতালিকা গ্রন্থে হয়ত সংকলনের সব কবি উল্লিখিত হ'তে পারেন, কিন্তু একালের চারিত্র প্রকাশে সব কটা কবিতাই যে প্রাস্ত তা মনে হয় না। অনেক কবিতাই জোলো —আবেগ উত্তাপের বালাই বর্জিত। কবিতার ভাষা ও ভঙ্গিতে ব্যক্তিত্ব ঝলকায় কদাচিৎ। কবি প্রস্তাবিত 'কবিতার ভাষা' সন্ধান এখনকার ক'জন কবি বা করেন!

অর্থাৎ, টীকা ভাষ্যের ফুটকড়াই খেতে বেরিয়ে এসে আখেরে আমাদের কবিতার ভোটা বেটাতে হয়— জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তী বিষ্ণু দে অরুণ মিত্র সমর সেন এবং কমবেশি বুদ্ধদেব বসু সঞ্জয় ভট্টাচার্য অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ কবিদেরই কবিতায়। এঁদের পর বিশিষ্ট কবি বলতে চিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায় মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সুকান্ত ভট্টাচার্য রাম বসু অলীক রায় প্রভৃতিকে। আরও মাত্র কয়েকজন আছেন যাঁরা কখনো সখনো জোরালো কবিতা লিখেছেন। '৩০-এর কোঠায় জন্মেছেন এমন আরও দুএকজন এবং '৪০-এর কোঠায় সুনীল চক্রবর্তী শঙ্খ ঘোষ শক্তি চট্টোপাধ্যায় সবসে পড়েন। এঁদের একাধিক কবিতা মিলে,

বিশেষ ক'রে শেষ দুজনের কবিতার যথাযথ পরিচয় সংকলনে আরও স্পষ্ট হত।

মনে হয় বয়সের উদারতা দেখাতে গিয়ে বিচক্ষণ কবি আলোচনাকারী সংকলয়িতার ভূমিকা নিয়েছেন। এবং কবিতা সংকলনের পরিকল্পনায় যথাসম্ভব একটি কবিতালিকাগ্রন্থ তৈরি করেছেন। মুখবন্ধ থেকে জানা যায়, পরিকল্পনা ছিল ব্যাপ্তিতে যাবার, তেমনভাবে সব কবিরই অনেক কবিতা সংকলন করার। তা সফল হয় নি। হলে কি দাঁড়াত জানি না। যা দাঁড়িয়েছে, আর যদি মেনে নেওয়া যায়, সাধারণত কবির প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতাই সংকলনে যাবাই হয়, তাতে মানের বিচারে এই সংকলনের অনেক কবিতার সূত্রে অনেক কবিকে ছেঁটে দেওয়া চলত।

তাহ'লে সংকলনটি সংহত হত, বিশেষ চারিত্রে দিশাহীন হ'ত, পাঠক হিসেবে আমরা উপকৃত হতাম, কবিরা উন্নত মানের কবিতার সমাবেশ দেখে উন্নত কবিতা লিখতে প্রণোদিত হতেন এবং এখনকার বাংলা সাহিত্য জগতের হৈচৈয়ে ছজোড় খানিক সময়ের জন্যেও চিন্তার বাধ পাবত। তা হয়নি।

রণজিৎ সিংহ

শশিভূষণ দাশগুপ্ত স্মরণে

মৃত্যু মাত্রেই আমাদের অভিভূত করে। বিশেষত যদি তা ঘটে কোন আত্মীয়ের। কিন্তু কখনো কখনো অনাত্মীয়ের মৃত্যুতেও যখন আমরা আত্মীয়-বিয়োগের ব্যথা অনুভব করি তখন বুঝি সেই মানুষটির অন্তরে অপরের জন্যে সঞ্চিত কোন সম্পদ ছিল। সেই মানুষকে কখনো বলি মনীষী, কখনো মহামানব বা দেশপ্রাণ। সোজাসুজি দেশের সেবা করে যাঁরা বৃহৎ জনসাধারণের অন্তরে স্থান পান তাঁদের মহাপ্রয়াণে মানুষের শোকের একটা ব্যাপক চেহারা দেখতে পাই— সেখানে শোকপালনের সমারোহ, স্মৃতিরক্ষায় ও প্রতিমূর্তি গড়বার উদ্যম এবং রাজপথের নাম পরিবর্তন। এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয় যাঁদের জীবনব্যাপী সাধনার পরিচয় বিনা ঘোষণায় দেশের চিত্তে চিরস্থায়ী হয়। হয়তো জনসাধারণের চাইতেও তাঁদের ভূমিকা সূক্ষ্ম অথচ সুদূরবিস্তৃত। অল্পসংখ্যক মানুষের কাছে তাঁদের স্মৃতি

উজ্জ্বল, কিন্তু অনেক সংখ্যক মানুষ তার কলঙ্কভাগী। এমন একজন বহু মানুষ সত্ত আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন, তিনি শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

দেশের বিদগ্ধজনের কাছে সুপণ্ডিত ও আদর্শ অধ্যাপক হিসাবে শশিভূষণ দাশগুপ্তের খ্যাতি ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচিতি প্রধানত তাঁর বিখ্যাত Obscure Religious Cults, Tantrik Buddhism, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ইত্যাদি গবেষণাগ্রন্থগুলিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া সাহিত্য সমালোচক ও তাত্ত্বিক হিসাবে নিজ প্রতিভার প্রমাণ তিনি রেখে গেছেন বাংলা সাহিত্যে নবযুগ, বাংলা সাহিত্যের একদিক, সাহিত্যের স্বরূপ, শিল্পলিপি ইত্যাদি ও কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের উপর একটি বই, এবং আরও কয়েকখানি বইয়ের মধ্যে। তাঁর জীবনের শেষ পর্বের রচনা—উপনিষদের আলোয় রবীন্দ্রনাথ এবং টলস্টয় গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ, কিংবা মিস্টিসের সম্প্রতিকা এ্যারিওপেজিটিকার সুসম্পাদিত অনুবাদে তাঁর চিন্তা ও ধ্যানের বিস্তৃতি আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

আর আদর্শ অধ্যাপকরূপে তিনি বেঁচে রইলেন তাঁর অসংখ্য ছাত্রের মনে, বিশেষ করে সেই সব ছাত্রের মনে যাঁরা অধ্যাপনাকেই জীবিকা করেছেন। শশিভূষণ প্রকৃত শিক্ষাব্রতী ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের প্রধান ও রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকরূপে তাঁর বিভিন্ন কর্মের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা একথা ভালভাবেই জানেন। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্ব তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই উপলব্ধিজাত দায়িত্ববোধ থেকে তাঁর উদ্যম নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা পার হয়ে দিল্লী সহ সমস্ত নেপালগ্রাম প্রাগ যোগীন পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় শশিভূষণের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। অথচ তাঁর চেতনা নিজ মাতৃভাষার সেবায় সংকীর্ণ হয়ে যেতে পারেনি। তিনি একাধিক ভারতীয় ভাষা জানতেন এবং বিশ্বসাহিত্যের বিস্তৃত পটভূমিতে তাঁর উৎসুক চিন্তা ও চর্চা ব্যাহত হতে তাঁরা পারেনি। প্রধানত তাঁর চর্চার ক্ষেত্রটি ছিল দর্শন শাস্ত্র এবং প্রাচীন শাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্য নিয়ে তাঁর অনলস সাধনা চলেছিল। অথচ আধুনিক সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব ও শিল্পসাহিত্যের সমস্যা বারবার তাঁর নানা প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হয়েছে।

আসলে শশিভূষণের ছিল একটি সজীব প্রাণ। সেই সজীবতা তাঁর

মনকে বহুবিষয়ে কৌতূহলী করেছিল। শশিভূষণ নিজে সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর একাধিক উপন্যাস, কাব্য ও রচনাগ্রন্থ আছে, এমন কি ছোটদের জন্যেও তাঁর লেখা কয়েকখানা বই আছে। চিত্তের সরলতার ও সজীবতার এ সবই সার্থক প্রমাণ। জ্ঞানতপস্যার ও শিক্ষাব্রতের দুরূহ ব্রতে আজীবন নিযুক্ত থেকেও তিনি একটুখানি নিজস্ব অবকাশ রেখেছিলেন— যখন সৃষ্টির আনন্দ তাঁর মনকে গভীর সাযুজ্যে ভরিয়ে রাখে, মুক্তি দেয়। তাঁর উপন্যাসে এমন একটা আন্তরিকতা ও মাটির গন্ধ পাই একালের অধিকাংশ উপন্যাসে যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

তারুণ্য ও নূতনের প্রতি শশিভূষণের চিরদিন একটা আকর্ষণ ছিল। তাঁর কর্মজীবনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা এ কথা জানেন। জ্ঞানগম্ভীর, সংযতবাক্ ও ভাবুক এই ব্যক্তিটি বহু তরুণের অযেচ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এমন কি, বয়সের প্রিয়পাত্রদের বাইরেও তাঁর প্রসন্ন চিত্তের একটা উন্মুখতা ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি ক্ষমতা অনুযায়ী বহু পরিবর্তন ও নূতনত্ব আনতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। এ বিষয়ে তরুণতম শিক্ষকদের সঙ্গে পরামর্শ করতে তিনি কখনো দ্বিধা বোধ করেননি।

অন্তত দুটি কাজে তাঁর প্রয়াস অসম্পূর্ণ রয়ে গেল বলে আমাদের বিশেষ ক্ষোভের কারণ ঘটেছে। একটি হচ্ছে বঙ্গভাষার ও সাহিত্যের মহৎ সাধক স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের স্মৃতিরক্ষার জন্য শক্তির উদ্যম; অন্যটি হচ্ছে বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্য চর্যাগীতিগুলি সম্পর্কে নূতন তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য গবেষণা ও 'অন্ধকার যুগে'র রহস্য উন্মোচনে দুরূহ প্রয়াস্বীকার। এই শেষোক্ত গবেষণার সূত্রপাত তাঁর ইউরোপ গিয়ে প্রাচ্যসঙ্গীতবিদ্ স্বর্গত আর্নল্ড বাকের কাছে সংগৃহীত 'টেপ-রেকর্ড' শুনে। এখানেও শশিভূষণের সদাকৌতূহলী অন্তরের সজীবতারই প্রমাণ। এই উপলক্ষে নেপাল ভ্রমণের পরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ব্যাধি দুরারোগ্য বলে ধরা পড়ে এবং ধীরে ধীরে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছিলেন এ কয় মাস ধরে। তিনি জানতেন; তবু তাঁর মুখের সেই স্মিতরেখাটি মিলাতে দেখিনি, তবু তিনি অসুস্থ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন— তাঁর সাধনার ক্ষেত্র, এখানেই, কলেজ স্ট্রীটেই, তাঁর মনপ্রাণ যেন পড়ে ছিল চিরটা কাল।

শশিভূষণের মত নিরহঙ্কার মানুষ এযুগে বিরল হয়ে এসেছে। অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে অপরিচিত ব্যক্তির নিমন্ত্রণে সভাপতিত্ব করতে

যেতে আমরা তাঁকে অনেকবার দেখেছি। অথচ তিনি যেন একটু লজ্জা প্রকৃতির লোক ছিলেন, একটু আত্ম-কুণ্ঠিত ও আত্মপ্রচার-বিরোধী। এরই হয়তো ছিল একটা অত্যাশ্চর্য দৃঢ়তা। নিজের গভীর আদর্শবাদ, সততা ও আন্তরিক ধর্মোভম সেই দৃঢ়তারই ফল। সেই দৃঢ়তা বজ্রতত্ত্ব বিস্ফোরণে প্রকাশ পেত না, তা প্রকট হতো তাঁর দীর্ঘ সেবার, শিক্ষাব্রতীর সূক্ষ্ম অথচ বহুবিস্তৃত কর্মশক্তিতে। বিনয় যে বিভায়ই হয়, আর তা যে কথাবার্তায়, আচরণে, জীবনযাত্রার সবকিই প্রস্ফুটিত হয়, শশিভূষণকে না দেখলে এ জ্ঞান আমাদের পূর্ণ হতো না। আর, কোথায় যেন শশিভূষণ ছিলেন একটু উদাসীন, অধ্যাত্মবাদী। হয়তো সকল কর্মব্রতের ও জনপ্রিয়তার গভীরে তাঁর অন্যে এক যোগীর নির্বিকারত্ব ছিল। শেষ জীবনের ধর্মালোচনার বা জীবনব্যাপী ধর্মচর্চায় ও নিজ জীবনচর্যার সাত্ত্বিকতায় তার আভাস পাওয়া যায়। গান্ধীবাদ ও সর্বোদয়ের আদর্শের প্রতি তাঁর নৈতিক সমর্থন সেই সত্যেরই আর এক রূপ।

ধীরে ধীরে যখন তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছিল আমরা তাঁর ছাত্ররা অনেকেই গিয়েছি, স্মিতমুখে আমাদের সঙ্গে কাজ ও অকাজের কথা, নানা পরিকল্পনার কথা বলেছেন, আমাদের নানা কাজে উৎসাহ করেছেন— সেই মুক্তিত, অমায়িক, সরল ভঙ্গিতে।

আমরা যারা তাঁর কাছে অল্পদিন হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করেছি আমাদের সেই সরল সুন্দর প্রশান্ত সংযত মুখটি মনে পড়ছে। যে-মুখশ্রী সর্বদাই একটা প্রসন্ন স্মিতরেখায় সমুজ্জ্বল। তাঁর সেই প্রতিভাদীপ্ত চোখ দুটি, কণ্ঠের কোমল নিনাদ বরাভয়ের আমাদের স্মৃতিতে চিরোজ্জ্বল হয়ে থাকবে। কিন্তু তাঁর এই অকালমৃত্যুতে আমাদের কোন্ দ্বিধাতেই দীমা মানতে চাইছে না। মাত্র ৫৩ বছর পরমায়ু নিয়ে তিনি এই কঠিন পৃথিবীতে এসেছিলেন। এই পরমায়ুর প্রতিটি দিনকে তিনি সদ্ব্যবহার করেছেন, এটাই আমাদের কাছে পরম সান্ত্বনা। এর চাইতে বড় আদর্শ একালে আমাদের সামনে কী থাকতে পারে।

আমাদের দেশের অতি দুঃসময় চলেছে। তাই তার সবচেয়ে দরকারের সময়ে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা অকালে বিদায় নিচ্ছেন। এরূপ ব্যক্তিত্ব আর জন্মাচ্ছেন না। শশিভূষণের চর্চা, মনন ও অধ্যাপনার ক্ষেত্রে তো বটেই, মানুষ হিসাবেও তাঁর তুলনীয় মেলা কঠিন। তাঁর নামটির মতই তিনি।

প্রবীর ঘোষ কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস ৮।৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৩ মাহাবীর অক্রুর লেন, কলিকাতা ১৫ হইতে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্য

নূতন সংস্করণে এই সকল প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে—

কাব্য : স্পষ্ট অস্পষ্ট
সাহিত্যের উপকরণ
সাহিত্য ও সভ্যতা
আনন্দ ও সাহিত্য
আলোচনা
সাহিত্য
সাহিত্যের প্রাণ
মানবপ্রকাশ
কাব্য
বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা
বাংলা-লেখক
সাহিত্যের গৌরব
সাহিত্যসম্মিলন
সাহিত্য-পরিষৎ

মূল্য ৩·০০ টাকা

সাহিত্যের পথে

নূতন সংস্করণে এই সকল প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে—

সভাপতির অভিভাষণ
সভাপতির শেষ বক্তব্য
সাহিত্যসম্মিলন
কবির অভিভাষণ
সাহিত্যরূপ
সাহিত্যসমালোচনা
পঞ্চাশোর্ধ্বে
বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ
রূপকার
রূপশিল্প

মূল্য ৩·০০ টাকা

সাহিত্যের স্বরূপ

জীবনের শেষভাগে রচিত সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাবলীর সংকলন

মূল্য ১·০০ টাকা

॥ সাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বই ॥

প্রাচীন সাহিত্য	১·৪০
লোক সাহিত্য	১·৫০
আধুনিক সাহিত্য	২·৫০
বাংলাভাষা-পরিচয়	২·০০

বিশ্বভারতী

দ্বিতীয় বর্ষ

চতুরঙ্গ

ষষ্ঠ সংখ্যা

নারায়ণ ১৩৭১

সূচীপত্র

উপন্যাস (পুনর্মুদ্রণ)

গোস্বামীর দাগর যাত্রা — অন্নদাশঙ্কর রায় (?)

প্রবন্ধ

বাংলা সমালোচনা পরিস্থিতি ও পরিত্রাণ — অজিতকুমার চক্রবর্তী

কবিতার উৎস — উজ্জ্বল কুমার মজুমদার

সত্যতার সংকট, সাম্যবাদ ও ভারত — অরুণ মজুমদার

গল্প

আশঙ্কা — দেবেশ রায়

পটলা নিবারণ — শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নাটক

দীপ — উৎপল দত্ত ১৩৯

প্রবন্ধ

সাহিত্যিকের সঙ্কট — অন্নদাশঙ্কর রায়

ইংরেজের মুখে আজো আছে নারায়ণী — বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

কবিতা

বনীশ ঘটক সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য বিষ্ণু দে অরুণ মিত্র হরপ্রসাদ মিত্র রাম বসু ফল্গু বসু চিত্ত ঘোষ সলিল গঙ্গোপাধ্যায় জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত শান্তিকুমার ঘোষ আলোক সরকার প্রবোধ মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অরুণ ভট্টাচার্য শক্তিব্রত ঘোষ শিশিরকুমার দাশ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মানস রায়চৌধুরী রাজলক্ষ্মী দেবী নিখিলকুমার নন্দী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় মোহিত চট্টোপাধ্যায় শান্তি লাহিড়ী অশোক পালিত উৎপলকুমার বসু বন্দুলিকা দাশ বাণিনী বসু বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত রণজিৎ সিংহ ত্রিদিবরঞ্জন বালাকার।

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

সম্পাদক

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নির্মাল্য আচার্য

●

কার্যালয়

১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা ১২

২৫৫

গোস্বামীর
সাগর যাত্রা
বা
বাঙ্গালা বই।
(গল্প ও সমালোচনা।)

"নবদুর্গা" "বাঁশরী" প্রভৃতি পুস্তকের
গ্রন্থকারদ্বারা বিরচিত।

"যত সাধ করি সাগর হেরিতু,
বালির পাহাড়ে আসে।
সাগর শুকালো, বালির লুকালো,
অভাগী কপাল দোষে।"

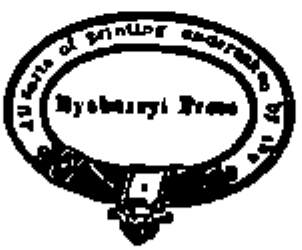

কলিকাতা।
ব্যবসায়ী যন্ত্র
শ্রী অভয়লাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৯১ সাল।

মূল্য চারি আনা। মফস্বলে ডাকমাশুল লাগিবে না।
(কলিকাতা—বি, কে, পাল এণ্ড কোম্পানির নিকট প্রাপ্তব্য।)

মূল গ্রন্থের প্রতিলিপি।
উপরে উল্লিখিত 'নবদুর্গা' বইখানির সন্ধান পাওয়া গেছে।
সেখানেও লেখকের নাম নেই।

গোস্বামীর সাগর যাত্রা

অথবা

বাঙ্গালা বই

—০—

প্রথম পরিচ্ছেদ

গঙ্গাসাগর

পৌষ মাসের সংক্রান্তি। বেলা আড়াই প্রহর হইতে যৎকিঞ্চিৎ বাকী। নবদ্বীপের দীপচাঁদ গোস্বামী সাগর-সঙ্গম তীর্থে গমন করিয়াছেন। সঙ্গে শিষ্য সেবক কেহই নাই, পরিবার ছাড়া একজন তল্লিদার ভাণ্ডারী আছে। রৌদ্রে গৌসাইজী সমুদ্রকূলে বালির চড়ার উপর একাকী বসিয়া আছেন। মনে কি ধ্যান, কেহই বলিতে পারে না। সাগরতরঙ্গের দিকে অচল দৃষ্টি। সমুদ্র শত শত তরণী বক্ষে করিয়া তরঙ্গদলে নাচিতে নাচিতে এদিকে ওদিকে যাইতেছেন। তরণীরা শত শত নরনারী বক্ষে করিয়া সাগর তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। এক দৃষ্টিতে দীপচাঁদ গোস্বামী তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নাই, তথাপি সমুদ্রজল-তলে গগনমণ্ডলের ছায়া দেখিতেছেন। আকাশে অনেক উঁচুতে এক ঝাঁক পাখী উড়িতেছে। কে জানে পক্ষীরা কি চীল, কাল কাল খয়েরের ছিটের মত কতকগুলি দাগ দেখাইতেছে। নীল জলে নীল আকাশের ছায়া। ভাবুক দর্শকের দর্শনেন্দ্রিয় সেই শোভা দর্শনে নিশ্চল। নির্ম্মল পবিত্র নীল গগন। একটী ছাড়া সমস্ত পদার্থেই প্রায় কলঙ্ক থাকে, সেই কথা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্তই যেন অকলঙ্ক নীলাকাশে পক্ষীরূপ কলঙ্ক।

দীপচাঁদ গোস্বামী স্বর্ণাকার, গৌরবর্ণ। হুতোম বলিয়াছিলেন, "জন্মাবচ্ছিন্নে রোগা গোঁসাই কখনও দেখি নাই।" কিন্তু এই সাগর-কূলের গোঁসাই অত্যন্ত কৃশ। চক্ষু এত বসা যে, আছে কি নাই অনুমান করা যায় না। বুকের অস্থিগুলি একে একে গণনা করিয়া লওয়া যায়। গোঁফ দাড়ি নাই। যাহারা জানে না, হঠাৎ দেখিলে তাহারা ষাণ্ডমুণ্ড বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা তিনি নন। পরামাণিকের অনুগ্রহে মুখখানি সর্ব্বদা লোমশূন্য থাকে।

গলায় তিন ছড়া তুলসীর মালা ; গায়ে রাধা-কৃষ্ণের নাম সংযুক্ত পাতপত্র আঁকা ঝীরাবলী ; হস্তে লাল বনাতের ঝুলঝালী। বয়স অনুমান পঞ্চাশ কি ছাপ্পান্ন বৎসর।

সাগর শোভা দর্শন করিয়া ভাবুক প্রেমিক গোস্বামী প্রভু আপ্‌না আপ্‌নি যেন হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে লাগিলেন ; হৃদয়ে এক প্রকার অপূর্ব্ব নবীন ভাবের আবির্ভাব ! কেহ শুনিতেছে কি না, সে জ্ঞান নাই। আপ্‌না আপ্‌নি মোহন স্বরে গাইতে লাগিলেন --

"প্রলয়-পয়োধি-জলে ধৃতবানসি বেদং।
বিহিত-বহিত্র-চরিত্র অখেদ হরে।"

বীরভূমের জয়দেবকে মনে পড়িয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীমতী রাধা কুঞ্জে কুঞ্জে যেমন রোদন করিয়াছিলেন, পশু, পক্ষী, তরু, লতা, গিরি, নদী, সকলকে যেমন মানুষের মনু-বার্ত্তা শুধাইয়া ছিলেন, সেই কথাগুলি মনে পড়িল। মানিনী বিরহিণী রাধিকা আকাশে কাল মেঘ দেখিয়া এক দিন কৃষ্ণ বলিয়া ধরিতে গিয়াছিলেন। সম্ভব কি অসম্ভব, প্রেমিক পাঠক যেন জিজ্ঞাসা না করেন। বিরহের অবস্থায় সে কথার বিচার-মীমাংসা থাকে না ; গোকুল-বিহারী নন্দদুলাল আর ব্রজেশ্বরী রাধারী সুখে থাকুন, তাঁহারা জানিতেন। মহা গর্ব্বিত মহাকবি জয়দেব তাঁহাদের মনের কথা জানিয়া কি না জানিয়া টানিয়া আনিয়াছিলেন। সেই আকর্ষণের নাম শীত গোবিন্দ। প্রভুর চক্ষে দুই ফোঁটা জল পড়িল।

পৌষ মাসের সূর্য্য মকরে প্রবেশ করিতেছেন ; ব্রাহ্মণকে যত তপ্ত করিতে পারিতেছেন না। পৃষ্ঠে সূর্য্যতাপ অবিশ্রান্ত স্পর্শ হইতেছিল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ হইলে কেহই কখনও সে উত্তাপ সহ্য করিতে পারিত না। শীতকাল বলিয়া গোসাইজী অক্লেশে তাহা সহ্য করিতেছিলেন। বিশেষ "গঙ্গা সাগরের শীত", এ দেশের স্ত্রী-পরম্পরায় এই ভাষা কথা অতি প্রসিদ্ধ।

দেখিতে দেখিতে এক খানি নৌকা ডুবিয়া গেল। ঝড় নাই, তুফান নাই, শীতকালের সাগর অতি প্রশান্ত, অকস্মাৎ নৌকা ডুবিল কেন ? কেন, কে বলিবে। ত্রাহি ত্রাহি ক্রন্দন-ধ্বনি উঠিল। কাণ্ডারীরা তিনটী উলঙ্গ যুবতী তুলিল। পঁচিশ জনের মধ্যে বাইশ জনকে পাওয়া গেল না। গোসাইজী তাহা দেখিলেন। মন অন্য দিকে ছিল ; কিন্তু হাতীর মাথায় অঙ্কুশ মারিলে সে যেমন স্বেচ্ছাগতি পরিত্যাগ করিয়া মাহুতের নির্দ্দেশবর্ত্তী হয়, মানুষের মন তেমনি একটু কিছু শোকাহত হইলে, পৃথিবীর চিন্তা ভুলিয়া অতীন্দ্রিয় লোকের অনুধাবনা করে।

ভাবিতে ভাবিতে গোঁসাইজী চমকিয়া উঠিলেন। কথা আছে, শব দর্শনে তত্ত্বজ্ঞান। তাবুক দর্শকের অন্তরে তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইল। সাগরের দিকে দৃষ্টি ছিল, নড়িল না, ফিরিল না, সমভাবে অচঞ্চল।

হঠাৎ একটা কাক আসিয়া শব-দেহের বুকের উপর উড়িয়া বসিল। বক্ষের মাংস চঞ্চুপুটে টানিয়া জমে জমে একটী চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইল। গোঁসাইজী নির্নিমেষ স্থির নেত্রে সেই বীভৎস দৃশ্য দেখিলেন।

সহসা চমক ভাঙ্গিল। পৌষ মাসের সংক্রান্তির রাত্রি, তাহাতে সমুদ্রকূল, বৃক্ষ লতা কাঁপাইয়া সাগরে ঢেউ দিয়া দিয়া উত্তরানিল ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেছে। পবনের খেলা দেখিয়া, আকাশে চন্দ্র দেখিয়া, প্রশান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি জলনিধি আনন্দে দুলিয়া দুলিয়া যেন নৃত্য করিতেছে। গোঁসাইজী যোগাসন পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তখন তাঁহার কৃশ শরীরে শীতানুভব হইল। তিনি একখানি তরণীতে আরোহণ করিলেন। তরণীমধ্যে একটী অর্দ্ধ-বয়সী স্ত্রীলোক, একটী ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা, আর একটী দশমবর্ষীয় বালক বসিয়াছিল। স্ত্রীলোকটী গোস্বামী-প্রভুর ধর্মপত্নী, বালিকাটী তাঁহাদের দুহিতা, আর সেই বালকটী তাঁহাদের ভাবী জামাতা।

গোঁসাইজী তরণীমধ্যে প্রবেশ করিলে, তাঁহার পত্নী সযত্নে এক খানি নীলবর্ণ বাসাপোষ্ বাহির করিয়া দিলেন; বাসাপোষখানি গোঁসাইজীর গাত্রে হীরাবলীর স্থান অধিকার করিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, প্রভুর তখনও সন্ধ্যা বন্দনাদি করা হয় নাই। ব্রাহ্মণী কোশা-কুশী আনিয়া দিলেন। প্রভু প্রায় চারি দণ্ড রাত্রির সময় দায়ংকালীন সন্ধ্যা উপাসনা সমাপ্ত করিলেন। উপাসনান্তে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করা হইল। গৃহিণীর সহিত অধিক কথাবার্ত্তা হইল না। গোস্বামীর মন অন্য দিকে ছিল। অন্যান্য কারণে যত না হউক, বিনা তুফানে সাগরে তরণী মগ্ন হইয়া তাঁহার অন্তরে করুণার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। আরও তাঁহার শব দর্শনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। মনে মনে তিনি সংসারের নশ্বরতা চিন্তা করিতেছিলেন। মানব দেহের ক্ষণভঙ্গুরতা তাঁহার হৃদয়সমুদ্রে যেন তরঙ্গিত হইয়া আন্দোলিত হইতেছিল, অন্যমনস্ক হইয়া কেবল তাহাই তিনি ভাবিতেছিলেন। আসিলেই যাইতে হয়, জন্মিলেই মরিতে হয়, ইহা সকলেই জানে; কিন্তু সকল সময় মনে থাকে না। যাইলে আবার আসিতে হয় কি না, মরিলে আবার পুনর্জ্জন্ম হয় কি না, এ তর্কে অনেক বিসম্বাদ আছে। মানুষ মরিয়া কি হয়, এ পর্য্যন্ত কেহই

তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন নাই। আমাদের পরাশর ঋষিগণ জিজ্ঞাসুদের ন্যায় সকল কথাই বলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু আমরা একটী আশ্চর্য্য দেখি, তাদৃশ দায়বান্ সাধুপুরুষদিগেরও মতের পরস্পর ঐক্য নাই। অন্যান্য দেশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরাও পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধে মীমাংসা করিতে সমর্থ হন নাই। বাস্তবিক মানুষ মরিয়া কোথায় কিরিয়া আইসে কি না, ইহার স্বরূপ সিদ্ধান্ত করা নিশ্চয়ই সহজ বলিয়া বোধ হয় না।

একজন বাঙ্গালী কবি বলিয়া গিয়াছেন—

"ঘরে যদি ফিরে আসি, বনে যদি রয়।
তবে ত বলিতে পারি, মরিলে কি হয়।"

এ কথাটী এক প্রকার অকাট্য। গোঁসাইজী তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন, কিম্বা তাঁহার চিন্তার উপক্রমণ আর কিছু এতথা আমরা বলিতে পারি না। ফলে তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন। অনেকক্ষণ পরে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া একটী নিঃশ্বাস ফেলিলেন। বালকের দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ শঙ্কিতস্বরে কহিলেন, "সোমনাথ! তোমরা যে ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস কর, তাহাতে কি এমন কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, যাহার দ্বারা মানুষের পরকালের গতি নির্ণীত হইতে পারে?"

বিজ্ঞতম গোঁসাইজীর এ প্রশ্নটী ঠিক যেন উন্মত্ত-প্রলাপবৎ বোধ হইল। সোমনাথ সপ্তদশ বর্ষীয় বালক, একটী পল্লীগ্রামস্থ সামান্য বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাহার পক্ষে তত্ত্ব বড় গুরু প্রশ্নের উত্তর দান করা কত দূর কঠিন ও কত দূর অসম্ভব, চৈতন্যবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। সোমনাথ একটু হাস্য করিয়া গোঁসাইজীর গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিল। গৃহিণীও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, ইনি কেবল রাশি রাশি পুঁথি পড়িয়া কেমন এক প্রকার বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন বটে, কিন্তু প্রভু তাহা ভাবিলেন না। প্রভু ভাবিলেন, "আমাকে ইহার মীমাংসা করিতেই হইবে। সংস্কৃত ধর্ম্ম শাস্ত্র অনেক দেখিয়াছি। আভাস পাইয়াছি, কিন্তু মীমাংসা পাই নাই। আমরা গোস্বামী, ইংরাজী শিক্ষা করি নাই. ম্লেচ্ছ কেতাব স্পর্শ করিলে আমাদের পবিত্রাত্মা কলুষিত হয় ; সুতরাং সে ভাণ্ডারে যদি কিছু রত্ন থাকে, তাহা আমরা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, দর্শন করিবারও অনধিকারী। অতএব— অতএবই বা কেন, বহু পূর্ব্বাবধি এতদ্দেশে বাঙ্গালা সাহিত্য কাব্যের আলোচনা হইতেছে। এই ভাষায় অনেক পুস্তকও আছে, তাহা এক বার

আলোচনা করিয়া দেখিব।" এটী কেবল তাঁহার ভাবনা নহে, মানসিক স্থির সংকল্প, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

রাত্রি হইতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে আকাশে যত নক্ষত্র উঠিয়াছিল, তত আর দেখা যায় না। নিশাকরের প্রদীপ্ত করে অনেকগুলি নিতান্ত নিষ্প্রভ। ঊষাকালে মালিনীরা ফুল তুলিয়া লইয়া গেলে, প্রভাতে যেমন মল্লিকা মালতে ঠাঁই ঠাঁই ছাড়া ছাড়া দুটী একটী শ্বেত পুষ্প নয়নগোচর হয়, পূর্ণ-জ্যোৎস্না যামিনীতে (কিঞ্চিৎ বেশী রাত্রে) আকাশও ঠিক সেইরূপ দেখাইতেছিল! অনেক নৌকায় প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে, শ্রীগর্ভাচার্য্য গোস্বামী সপরিবারে নিশাভোজন সমাপন করিয়া যথা যথা স্থানে বিশ্রাম লাভ করিলেন।

প্রভাতে নৌকা হইতে গৌসাই ঠাকুর দেখিলেন, পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিকে দুই রক্তমূর্ত্তি। পূর্ব্ব দিকে সূর্য্যদেব উদয় হইতেছেন। কৃষ্ণ প্রতিপদের চন্দ্র পশ্চিম দিকে অস্ত যাইতেছেন। চক্ষে না দেখিলে সে শোভা মুখে বলিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। জলে সুধাকর সাদুবর্ণ, জলে বিলীন : সূর্য্যদেব সুপ্রকাশ।

প্রভাতে উত্তরায়ণ-সময়ে স্নান করিয়া

"অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং।
হংসং নারায়ণঞ্চৈব, এতে নামাষ্টকং শুভং।"

ইতি মন্ত্রে পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া গৌসাইজী নৌকা খুলিয়া দিবার আদেশ দিলেন। কাণ্ডারীরা আদেশ পালন করিল। নানা স্থান অতিক্রম করিয়া তরণীখানি কয়েক দিনের পর যথাসময়ে নবদ্বীপের ঘাটে পৌঁছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অন্বেষণ

গৃহস্থ গোস্বামী গৃহে উপস্থিত হইলেন। সজ্জনের প্রতিজ্ঞা স্মরণ আছে, মন স্থির করিতে পারিলেন না। মাঘ মাসের চতুর্থ দিবসে গৃহিণীকে কহিলেন, "কাত্যায়নীর বিবাহ। এমাসে একটী ভিন্ন আর দিন নাই, সে দিন ১২ই মাঘ। আয়োজনের নিমিত্ত শীঘ্রই আমাকে সহরে যাইতে হইতেছে।"

কন্যার বিবাহে পিতা অপেক্ষা মাতার অধিক আনন্দ। গৃহিণী কহিলেন, "এখনও ত দিন আছে, দুদিন বিলম্ব কর, সাগরে কই হইয়াছে, দুদিন

বিস্তার কর। কিন্তু মেয়ের গহনাগুলি যেন একটু পাকাপোক্ত হয়। আর তুমি এক দিন বলিয়াছিলে, বেটের সঙ্গি বাঁধা রূপার সৈঁকে পরিয়া আমার জন্ম যাইতেছে, কাত্যায়নীর বিয়ের সময় একটা কিছু সোনার গহনা দিবে, তাহা যেন মনে থাকে।"

গোস্বামী হাস্ত করিয়া কহিলেন, "ঘুঁটে দিবার সময় রূপার কঙ্কণ থাকে না, সোনার থাকে।"

সে দিন আর অধিক কথা হইল না। তিন দিন অতীত হইয়া গেল। গোস্বামী ঠাকুরেরা চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ন্যায় ভোলানাথ হইয়া থাকেন না। তাঁহাদের হরেক রকম শিষ্য সেবক থাকে; শিষ্য-সমাগমে তাঁহারা চাণক্য চতুর হন। ব্রাহ্মণীকে প্রবোধ দিয়া মাঘ মাসের সপ্তম দিবসে বীরচাঁদ গোস্বামী মুরশিদাবাদে যাত্রা করিলেন। যাত্রা কালে ঊষা। নিবিড় কুজ্ঝটীকায় সমস্ত নবদ্বীপ অন্ধকার। আমাদের দেশের লোকে জানেন, মাঘের প্রথমে কুয়াসা আর শেষে বৃষ্টি হইলে বৎসরটী ভাল যায়। গোস্বামী ঠাকুর শুভ আশায় শুভ অবসরে কুয়াসায় যাত্রা করিলেন। আরোহণ তাঁহার যাহা, গঙ্গাসাগর তীর্থে তিনি তাহা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মুরশিদাবাদে পৌঁছিয়া সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালা পুস্তকের অনুসন্ধান করিলেন। ভট্টাচার্য্যদিগের গৃহে গৃহে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হস্তলিখিত অনেকখানি পুঁথি সংগৃহীত হইল। কেবল মুরশিদাবাদে অতীষ্ট সিদ্ধ হইল না। বীরভূম, বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, বর্দ্ধমান এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে কয়েক মাস ভ্রমণ করিয়া অনেকগুলি পুস্তক সংগ্রহ করিলেন। ব্রাহ্মণীর নিকট যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হইয়াছিল, তাহা মনে থাকিল, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য হইল না। সাগর-সঙ্গমে যে কল্পনা অন্তঃকরণ মধ্যে উদিত হইয়াছিল, তাহাই সর্ব্ব-প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিল। আরও কিছু দিন স্থানে স্থানে পর্য্যটন করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। সেখানেও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনেকগুলি গ্রন্থ হস্তগত হইল। যে সকল পুস্তক প্রাপ্ত হইলেন, তাহার অধিকাংশই ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রূপ সনাতন, জীব গোস্বামী, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, কবিকঙ্কণ, ক্ষেমানন্দ, কেতক দাস, রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, রামপ্রসাদ সেন, ও ভারতচন্দ্র রায় প্রভৃতি কবিগণের রচনা পাঠে গোস্বামী ঠাকুরের বিশেষ আসুরক্তি জন্মিল।

স্বামী গৃহাগত হইলে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাত্যায়নীর বিবাহের জন্ত

যাহা যাহা আনিতে গিয়াছিলে, তাহার কি হইল ? আসিতেই বা এত বিলম্ব হইল কেন ?"

গোস্বামীরা অধিকাংশ লোকের যুক্তিদাতা শীক্ষাগুরু। তাঁহারা প্রায়ই মিথ্যা কথা কহেন না, মিথ্যা কথার পাপ হয়। শিষ্য সেবককে ইহা বুঝাইয়া দেন ; সুযোগ পাইলে এক একটী সত্যাতেও উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু গৃহে গৃহিণীর নিকটে মিথ্যা কথা কহিলে হয়ত তত পাপ না হইতে পারে, মনে মনে এই স্থির করিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "সমস্তই বায়না দেওয়া হইয়াছে। এক বৎসর অকাল। বৎসর পূর্ণ হইলে বিবাহ হইবে। এখন তত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই।"

ব্রাহ্মণী শুনিলেন, মনে একটু দুঃখ হইলেন ; অথচ গোস্বামীর পত্নী, কিছু কিছু শাস্ত্রজ্ঞান থাকা সম্ভব ; অকালে কন্যার বিবাহ দিতে নাই বুঝিয়া পতিবাক্যে বাদানুবাদ করিলেন না। ব্রাহ্মণের একটা গুরুভার ঘুচিয়া গেল।

পরন্তু নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে অবশ্যই কষ্ট হইয়াছিল। গৃহে পৌঁছিয়া সাত আট দিবস কেবল নিত্যকার্য্য ছাড়া গোস্বামী অন্য কার্য্য কিছু করিলেন না। পতিব্রতা ব্রাহ্মণী নিত্য সায়ংকালে গরম জল করিয়া চরণ ধৌত করিয়া দিতেন, নিজে এক প্রহরের মধ্যেই আহারাদি করাইয়া শয়ন করাইতেন। তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় গুরুদেব গোস্বামী শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অধ্যয়ন

তাহার পরেই নব গ্রন্থাবলীর আলোচনা আরম্ভ। একে একে সমস্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিলেন। যাহা অন্বেষণ করেন, কোথাও কোথাও তাহা পাইলেন, কোথাও বা তাহার খণ্ডন দেখিলেন। মনঃপূত হইল না। কোথাও বা দর্শন করিলেন, মৃত্যুর পরেই নির্ব্বাণ। বিল্বমঙ্গলের একখানি ভক্তিসাগর গ্রন্থে দেখিলেন, প্রেমই মোক্ষ। সুতরাং বাঙ্গালার আদিকাব্য, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীতে প্রেম গাথা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বিদ্যাপতির রচনায় এক স্থানে দেখিলেন—

"জনম অবধি হাম্ রূপ নিহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।

সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনহু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু,
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।"

ভাল লাগিল না। সন্দেহ জন্মিল। নাথাবলীতে জানু বন্ধন করিয়া মুদ্রিত নয়নে চুলিতে চুলিতে পাঠক মহাশয় মনে মনে তর্ক আরম্ভ করিলেন, "কথাটা কেমন হইল! জন্ম অবধি রূপ নিরীক্ষণ করিয়া নয়নের তৃপ্তি হইল না, ইহা এক প্রকার বুঝা গেল; কিন্তু লাখ লাখ যুগ হৃদয়ে রাখিয়া হৃদয় জুড়াইল না, এটী ত বুঝিলাম না। জন্ম অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত এক জন্ম, সে জন্মে লক্ষ লক্ষ যুগ আসিতে পারে না। কোন বস্তুই লক্ষ লক্ষ যুগ বাঁচিয়া থাকে না, তবে ও পুনর্জ্জন্ম থাকিতে পারে? জন্ম জন্ম যদি জন্ম না হইলে লক্ষ লক্ষ যুগ কিরূপে সম্ভবে। যদি ধরা যায়, ঠাকুর দেবতার কথা, তথাপি তাহাতেও ত অনুকূল যুক্তি পাওয়া যায় না। রাম অবতার, কৃষ্ণ অবতার, চৈতন্য অবতার, ইত্যাদি শাস্ত্রে যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে ও তাঁহারা কেহই লক্ষ লক্ষ যুগ পৃথিবীতে ছিলেন না। তবে কিরূপে 'জনম অবধির' সঙ্গে 'লাখ লাখ যুগের' সমন্বয় হইতে পারে?" অনেক চিন্তা করিলেন, সিদ্ধান্ত আসিল না। পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া কবিবর চণ্ডীদাসের একটী প্রেম গীত পাঠ করিলেন।

"কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর,
নিরমল তার জল।
সুখের মকর, ফিরে নিরন্তর,
প্রাণ করে টল মল।
শুকজন আলা, জলে নিরালা,
পড়সী ঝাঁয়ল মাছে।
কুলে পানিফল, কাঁটায় সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে।
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়,
ঝাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কুট কুট করে,
সুখে দুখ দিল বিধি।"

ইহাই বা কি হইল ? প্রণয়ে যদি এত বাধা, এত বিঘ্ন, তবে সুখ কোথায় ! মোক্ষের ত কথাই নাই। কবি আর এক স্থলে বলিয়াছেন—

"কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া,
যে ধনী পিরীতি করে।
দুখের অনল, দেন সাজাইয়া,
সে ধনী পুড়িয়া মরে।"

প্রেম করিলে যদি দুখানলে পুড়িতে হয়, তবে কিজন্যই বা বলি, প্রেমে মোক্ষ ? অথচ সেই কবিই বলিতেছেন,

"সেই পিরীতি না জানে যারা।
এ তিন ভুবনে, মানুষ জনমে,
কি সুখ জানয়ে তারা ?
পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে,
পিরীতি মিলয়ে তবা।"

কবি ভাল মন্দ দুই দিক গাইতেছেন : ইহার মধ্যে কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ, বাছিয়া লওয়া সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে। চণ্ডীদাস আর এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"বড় সাধ করি, সাগর ছেঁচিনু,
মাণিক পাবারি আশে।
সাগর শুকালো, মাণিক লুকালো,
অভাগী কপাল-দোষে।
কহে চণ্ডীদাস, কালার পিরীতি,
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ বণিকার করাত যেমতি,
যাইতে আসিতে কাটে।"

প্রেম পাইবার নিমিত্ত আকিঞ্চন করিয়াও যদি হতাশ হইতে হয়, তাহা হইলে প্রেমে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া কত লোকের পক্ষে সম্ভবে বিবেচনা করিয়া দেখা ভাল। বিশেষতঃ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমস্ত কবিতাই প্রায় রাধাকৃষ্ণ লীলা রসে পরিপূর্ণ। দেবতার সম্বন্ধে যখন এত বিচ্ছেদ, এত হতাশ সঙ্কোচন, মানুষের পক্ষে তখন কতদূর নৈরাশ্যের সম্ভাবনা, অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারে।

বাঙালা বই বহু রত্নের আকর, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু মানুষ মরিলে আবার মানুষ হয়, কিংবা এক কালে নির্মাণ প্রাপ্ত হয়, এই দুই খানি প্রাচীন বাঙালা কাব্যে তাহার কোন তত্ত্ব নিরূপণ হইল না। দীনচাঁদ গোস্বামী আর এক বার বিশেষ যত্নপূর্বক কৃত্তিবাসের রামায়ণ, আর কাশীরাম দাসের মহাভারত অধ্যয়ন করিলেন। দেবতার অথবা মুনি ঋষির শাপে যাহারা ভিন্ন ভিন্ন যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা ভিন্ন অপর কাহারও পুনর্জন্ম বুঝিতে পারিলেন না। কবিতার তারতম্যের আলোচনা করিলেন, তাহাতে সন্তোষ লাভ হইল। ঋষি কৃত্তিবাসকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া মনে মনে কাশীরামকে দ্বিতীয় আসনে বসাইলেন। রামায়ণের নায়ক নায়িকাগণের কীর্তি-কলাপ, কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের করাল সংগ্রাম অনুধ্যান করিয়া মনে মনে বিস্ময় মানিলেন, কিন্তু যাহা খুঁজিতেছিলেন, অর্থাৎ মোক্ষ, তাহা পাইলেন না। এক এক বার মনে করিতেছিলেন, বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের কবিতার, এবং কৃত্তিবাসের সহিত কাশীরাম দাসের কবিতার তুলনা করিয়া দেখিবেন; কিন্তু সাহস করিতে পারিলেন না। অন্য পুস্তকে হস্তার্পণ করিলেন।

প্রথমখানি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বিরচিত চণ্ডী কাব্য। দ্বিতীয় খানি গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর। গোস্বামী যদিও জানিতেন যে, এই দুই পুস্তকে মোক্ষ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভের আশা বৃথা, তথাপি অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া এক বার পাঠ করিতে ইচ্ছা করিলেন। পূর্বে আর এক বার এই দুইখানি কাব্য তাঁহার পাঠ করা হইয়াছিল, সেই সময় কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বিদ্যাসুন্দরখানিও দেখিয়াছিলেন। উভয় বিদ্যাসুন্দরের রচনায় ইতরবিশেষ আছে কি না, তাহার তুলনা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় নাই। এক্ষণে কবিকঙ্কণের সহিত ভারতচন্দ্রের তুলনা করিতে তাঁহার কেন ইচ্ছা হইল, গোস্বামীর মনের কথা কে টানিয়া বলিবে?

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। কৃষ্ণ পক্ষের একাদশী। পৃথিবী ঘোর অন্ধকার। নবদ্বীপ নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে পেচকের বিকট চীৎকার ভিন্ন, সমস্ত পশু পক্ষী নীরব। নিশা-প্রহরী শৃগাল-পাল নিশা দ্বিপ্রহরে এক বার সকলে ঘোর রব করিয়া রাত্রিকে অথবা নবদ্বীপকে পাহারা দিল। আকাশের নক্ষত্রেরা অদৃষ্ট নক্ষত্র-পতিকে খুঁজিবার জন্য এককালে সব চক্ষু উন্মীলিত করিল। দীনচাঁদ গোস্বামীর বয়ঃক্রম ৫৫।৫৬ বৎসর; তিনি একটী প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া এক বার

কবিকঙ্কণ চণ্ডী, এক বার অন্নদামঙ্গল মিলাইয়া দেখিতেছেন। নেত্র এক এক বার বিকুঞ্চিত, এক এক বার বিস্ফারিত হইতেছে, ওষ্ঠাধর এক এক বার আনন্দে, আর এক এক বার যেন কিছু সংশয়ে বিকম্পিত হইতেছে। তিনি দেখিতেছেন, স্বভাবকবি কে কেমন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দরিদ্র কবি ছিলেন। দরিদ্র গৃহস্থের অবস্থা বর্ণনে প্রকৃতির সংগতি রাখিয়া তিনি যেমন কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ভারতচন্দ্র তেমন পারেন নাই। যদিও কুষ্ণনগরের সৌরাঙ্গে ভারতচন্দ্রকে নিতান্ত কষ্টে নিপতিত হইতে হইয়াছিল, তথাপি তিনি দরিদ্র সংসারকে ভালরূপে চিনিতে পারেন নাই। গোঁসাইজী প্রথমে চণ্ডীকাব্যে হরপার্ব্বতীর কন্দল পাঠ করিলেন। গৌরী কহিতেছেন—

"রন্ধন করিতে ভাল বলিলা গোঁসাই।
প্রথম পাত্রে যাহা শিব তাহা ঘরে নাই।
কালিকার ভিক্ষা নাথ উথার দুষিয়া।
অবশেষে যাহা ছিল রন্ধন করিয়া।
আছিল ভিক্ষার সেবে পালি দুই ধান।
গণেশের মূষিক করিল তাহা পান।
আজিকার মত যদি বাছা দেও শূল।
তবে যে পারিব নাথ আনিতে তণ্ডুল।"

এই কথা শুনিয়া শিব সক্রোধে কহিতেছেন,—

"আমি ছাড়ি ঘর, যাব দেশান্তর,
কি মোর ঘর করণে।
হয়ে স্বতন্তর, তুমি কর ঘর,
লয়ে তব গজাননে।
দেশে দেশে ফিরি, কত ভিক্ষা করি,
কুধায় অন্ন না মিলে।
গৃহিণী দুর্জ্জন, গৃহ হল বন,
বাস করি তরু তলে।

• •

আন বাঘ ছাল, শিঙ্গা হাড় মাল,
বিভূতি ভস্মের ঝুলি।
চল চল নন্দী, হও মোর সঙ্গী,
ঘরে না থাকিবে শূলী।"

গৌরী আবার কহিতেছেন,—

"কি জানি কি তপের ফলে পাইয়াছি হর।
সই সাজাতি নাহি থাকে দেখে দিগম্বর।
উন্মত্ত সাজটা হয় চিতা ধূলি গায়।
ছাড়িলে শিবের জটা অবনী লোটায়।
একাসনে শুতে নারি সাপের নিশ্বাসে।
অতোদিক পোড়ে প্রাণ বাঘ ছাল বাসে।
বাসের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই করে কেলি।
গণার মুণ্ড কাটে ঝুলি আমি খাই গালি।
বলদে বাহেতে ঘর নিবাহিব কত।
অভাগিনী গৌরীর দারুণ উপরত।" ইত্যাদি।

হরগৌরী কন্দলে কবিকঙ্কণের এইরূপ বর্ণনা। এই বিষয়ে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বর্ণনায় কিয়দংশ উদ্ধার করা যাইতেছে। শিব কহিতেছেন—

"ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাহ কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘ ছাল।
আর সবে যোগ করে কত শত সুখ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুঃখ।
নীচ লোকে উচ্চ ভাবে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিক্ষারি।
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী।
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায়।
বিনা সুলক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর।
খাইতে না পাই কভু পূরিয়া উদর।"

শিবানী কহিতেছেন,—

"শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটার বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল।

* * *

সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
বসনা কেবল কথা নিমুকের কুঁড়ি।

• • •

অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
ঘোর আঁধিয়ার পূর্ব্বকালী ঘন কই।
বুড়া গরু দড়া দাঁত ভাঙ্গা গাড়ু গাড়ু।
খুলি কাঁথা বাস ছাল লাপ সিঙ্গি লাড়ু।
তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ।

• • •

ভিক্ষা মাগি খুদ কনা যা পান ঠাকুর।
গণায় ইঁদুর করে কাটুর কুটুর।
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি যাব এই অলক্ষণ।"

দীপচাঁদ গোস্বামী এই দুটী বর্ণনা বিলাইয়া দেখিলেন। তৎক্ষণাৎ মনে হইল, ভারতচন্দ্রে কেবল মুকুন্দরামের ছায়া। গোস্বিকাক্রম ত্যাগ করিয়া "রাকা চন্দ্রমুখী" মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক ভগবতী পার্ব্বতী যেরূপ কৌশলে ফুল্লরার নিকট আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন, গঙ্গাতীরে ঈশ্বরী পাটনীর কাছে অন্নদার পরিচয়ে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উহারই ছায়ামাত্র। কেবল উহাই নহে; অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দরের অনেকাংশ মুকুন্দরামের অনুকরণ মাত্র। কেবল মুকুন্দরামও নহেন; গুণাকর ভারতচন্দ্র আরও দুই এক জন প্রাচীন কবির উক্তিই গ্রহণ করিয়াছেন।

দীপচাঁদ গোস্বামী নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন না। প্রায় দুই শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমির অধিকারী। তাহা ছাড়া শিষ্য সেবক বিস্তর, পরিবারও অল্প; সুতরাং তিনি সচ্ছন্দমত জিয়া-কলাপ নির্ব্বাহ করিয়া সচ্ছলে সংসারে বাস করিতেন। তথাপি ফুল্লরার দুঃখের কথা পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয় এক বার কাঁপিয়াছিল। ফুল্লরার বার মাস দুঃখ শ্রবণ করিলে সত্য সত্য অশ্রুপাত না করেন, এমন পাষাণ-হৃদয় অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়।

গোস্বামীর হৃদয় এক বার কাঁপিয়াছিল; কিন্তু বারি-বুদ্বুদের যেমন শীঘ্র বিলয় হয়, সেইরূপ সে কম্পন অচিরেই নিবৃত্ত হইল। পুনর্জ্জন্ম ও মোক্ষ আবার

মনে পড়িল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস আবার ছয়ের উপর হইলেন। ইঁহারা উভয়েই প্রেমিক কবি। মোক্ষের হেতু প্রেম। গোঁসাইজী আর এক বার তাহাই চিন্তা করিলেন। কিন্তু প্রেম যে কি পদার্থ, তাহা ভাল করিয়া অনুধাবন করিলেন কি না, তাঁহার মানসিক সিদ্ধান্ত শুনিয়া সহজে কেহ তাহা স্থির করিতে পারিবেন না। এক বার তিনি স্মরণ করিলেন—

"মাটির উপরে জলের বসতি তাহার উপরে ঢেউ।
তাহার উপরে পীরিতি বসতি, ইহা কি জানয়ে কেউ।"

জলের তরঙ্গের উপরে যে পীরিতির বাস, সে পীরিতি যে কি, সাধক প্রেমিকের নিকটে তাহার উপদেশ লইতে হয়। এই যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সংসার দেখিতেছে, ইহা কেবল প্রেম-পুষ্পে প্রেম-সূত্রে গাঁথা। যাঁহারা ঈশ্বর-প্রেমের পথিক, যাঁহারা সেই নিত্য প্রেমের প্রেমিক, তাঁহারা পৃথিবীর সকল পদার্থেই প্রেম দেখিতে পান। সংসারে পুরুষ প্রকৃতিতে যে প্রেম হয়, তাহাতে যদি খাদ, বাঁটা না থাকে, তাহা হইলে সেই প্রেমেও অনন্ত প্রেমময়কে লাভ করা যায়। কিন্তু যে কবি প্রেমকে সরোবর করিয়া তাহাতে নির্মল জল ঢালিয়াছেন, তাহাতে আবার কলঙ্ক-পঙ্ক রাখিয়াছেন, সেহালা দিয়া কলুষিত করিয়াছেন, পানিফলের কণ্টকে কণ্টকিত করিয়াছেন, পানা দিয়া ছুট কুট করাইয়াছেন, সে কবির কলঙ্ক-তত্ত্ব ও বিচ্ছেদ-তত্ত্ব কিছু অধিক; তাঁহাকে আমরা সত্য প্রেমিক অথবা সাধু প্রেমিক বলিয়া সম্মান দান করিতে সঙ্কুচিত হই।

"যে প্রেমেতে বিচ্ছেদ না হয়, কর মন সেই প্রেম-পদাশ্রয়।
যে প্রেমের অধিপতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পতি,
সে প্রেমে হইলে রতি, হয় অনন্ত অক্ষয়।"

যে কবি আত্ম-মনকে সম্বোধন করিয়া সমস্ত জগৎ-সংসারকে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই মহামহিম নিত্য প্রেমিক কবিবরই আমাদের যথার্থ প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, মর্য্যাদা, ও আদরের পাত্র। নবদ্বীপের গোস্বামী ততো দূর উচ্চ জ্ঞানের অধিকারী হইলেন না। তিনি ভাবিয়া লইলেন, প্রেম সকে সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেম। যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছেদ আছে, কলহ আছে, মনান্তর, ভাবান্তর, সমস্তই আছে, কপটতা যেখানে কর্ত্তরী হস্তে লইয়া প্রেমের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য বসিয়া থাকে, মৌখিক প্রেম যেখানে নিত্য অভিনব আশ্রয় অন্বেষণ করে, সেখানে সত্য প্রেমের স্থান হয় না। তাদৃশ অস্থায়ী প্রেমকে

প্রেম-পথে বরণ করিলে, প্রেমের অবমাননা করা হয়। তবে ইহার মধ্যে একটী কথা আছে। সাগরে ডুব দিলেই সকলে রত্ন সংগ্রহ করিতে পারে না; প্রেম-রত্ন লাভ করিব বলিয়া যাহারা সংসার-সাগরে ঝাঁপ দেয়, তাহাদের অধিকাংশই হতাশ হইয়া ভাসিয়া উঠে, কেহ কেহ হাবু ডুবু খায়, কেহ বা ডুবিয়া মরে। কাহার কাহার ভাগ্যে রত্নলাভ ঘটিলেও ঘটিতে পারে। গোঁসাইজী সে ঘরের দিকে গেলেন না, কাজেই তাঁহাকে ঘোর অন্ধকারে পূর্ণায়ুমান হইতে হইল। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি কোলে আবার দেখিলেন। কোন প্রেমেই সার নাই সিদ্ধান্ত করিয়া বহু যত্নে সংগৃহীত প্রেমগুলি অন্তরে একটী অন্ধ-সিন্ধুক-মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহোদ্যোগ

পর্যটনে, অধ্যয়নে, শিক্ষাদানকরণে, এবং অপরাপর বিবয়কার্য্যে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া গেল। এক বৎসর অকাল বলিয়া সত্যবাদী গোস্বামী হলধরকে গৃহিণীকে প্রবোধ দিয়া আসিয়াছিলেন, সে এক বৎসর অতীত-প্রায়। পর বৎসরের মাঘ সমাগত। কাত্যায়নীর ত্রয়োদশ বর্ষ পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দশে পদার্পণ। যৌবনারম্ভ। গোস্বামী-পত্নী অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। বয়স্থা কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিতে গোস্বামীও লজ্জিত হইতে লাগিলেন। পাত্রও গৃহে উপস্থিত, বাধা বা বিলম্বের অন্য হেতুও কিছু নাই, সুতরাং শীঘ্র শীঘ্র আয়োজন হইতে লাগিল। পাড়া প্রতিবাসী সকলেই শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন, কাত্যায়নীর বিবাহ। কাত্যায়নী দেখিতে পরীর মত পরম সুন্দরী ছিল না, কিন্তু স্বাভাবিক গুণে সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। স্বভাব যেমন নম্র, কথাগুলিও তদ্রূপ সুমিষ্ট, লজ্জাশীলতা-মাখা। সৌন্দর্য্যেও সকলেরই বাড়া। কাত্যায়নী ব্যতীত গোস্বামীর অন্য সন্তান সন্ততি ছিল না। তাঁহার পত্নী পূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। কন্যা দুটী এবং প্রথম পুত্র অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রবাদ ছিল, মধ্যম পুত্র বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে তাঁহারা গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করেন। পরে মধ্যমেরও অতি

শৈশবাবস্থায় হঠাৎ মৃত্যু হয়। তাহার পর কাত্যায়নী-ব্রত-বলে এই কন্যাটী জন্মে, সেই জন্য ইহার নাম কাত্যায়নী। যত আদরের কন্যা বলিয়া ইহার জননী ইহাকে আদরিণী বলিয়া আদর করেন। দেখা দেখি প্রতিবাসিনী কন্যারাও কাত্যায়নীকে আদর করিয়া আদরিণী আদরিণী বলে। সকলের মুখেই আনন্দ-চিহ্ন। আদরিণী কাত্যায়নীর বিবাহ।

এক পক্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার আয়োজন সুসম্পন্ন হইল; কেবল একটী আয়োজন বাকী। গোস্বামীর ভাবী জামাতা সোমনাথ দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহাদিগের বাটীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। সে আজ ছয় বৎসরের কথা। ডায়মণ্ড হারবরের নিকটবর্ত্তী কয়লসী গ্রামের শ্রীধর ভট্টাচার্য্য সস্ত্রীক হইয়া ঐ পুত্রটী সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে উপস্থিত হন। তাঁহারা অত্যন্ত দরিদ্র। সেই বৎসর সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী অনেক দূর ব্যাপিয়া মহা জলপ্লাবন হয়। অনেকের ঘর বাড়ী ভাসিয়া যায়। অনাহারে অনেক লোক ভগ্নাসন ছাড়িয়া, স্থানান্তরে আসিয়া পড়ে। শ্রীধর ভট্টাচার্য্যও সেই দলের একজন। দীনচাঁদ গোস্বামী তাঁহাদিগকে দেখিয়া সদয় অন্তরে স্বীয় আলয়ে আশ্রয় দান করেন। ভট্টাচার্য্য, তাঁহার পত্নী আর সোমনাথ প্রায় এক মাস কাল গোস্বামী-গৃহে বাস করিয়াছিলেন। অবশেষে বিদায় হইবার সময় ভট্টাচার্য্য ঐ পুত্রটীকে গোস্বামীর হস্তে অর্পণ করিয়া যান বলিয়া যান, "দুর্ভিক্ষ ও বন্যাতে আমরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, পুত্রটীকে প্রতিপালন করা এক্ষণে আমাদের অসাধ্য, বালকটীর পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছে। আপনি দয়া করিয়া পুত্রটীকে রাখুন; যদি ইচ্ছা হয়, সময়ে প্রত্যর্পণ করিবেন। আমরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিয়া যাইব। আমাদের সম্বল অবস্থা হইবার অগ্রে সোমনাথ যদি বিবাহের বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, এবং আপনি যদি ইহার বিবাহ দেন, সেই সময় আমরা যেন সংবাদ পাই।" কে জানে, কি কারণে সোমনাথকে দেখিয়া গোস্বামী ও গোস্বামী-পত্নীর হৃদয়ে বাৎসল্য-স্নেহের আবির্ভাব হইয়াছিল। কাত্যায়নীর বয়স তখন অষ্টম বর্ষ। কাত্যায়নীর সহিত সোমনাথের বিবাহ দিবেন মনে করিয়া গোস্বামী সানন্দ চিত্তে সোমনাথকে গ্রহণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়াছেন, দেশে ফিরিয়া যাইবার পাথেয় পর্য্যন্ত নাই, মাথা রাখিয়া থাকিবার গৃহ পর্য্যন্ত নাই; অতএব সদয় হৃদয়ে গোস্বামী তাঁহাকে পঞ্চাশটী টাকা দান করিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী বিদায় হইয়া গেলেন। অপুত্রক গোস্বামী তদবধি এই ছয় বৎসর কাল পরম যত্নে অপত্য-স্নেহে সোমনাথকে লালন করিতেছেন, লেখা পড়া শিখাইতেছেন। কাত্যায়নীর সহিত সোমনাথের

বালাভাবে সবিশেষ সন্তাব জন্মিয়াছে। কাত্যায়নী জানিয়াছে, সোমনাথের সহিত তাহার বিবাহ হইবে, ক্রমে ক্রমে একটু একটু লজ্জার সঞ্চার হইয়া আসিতেছে। দুজনে আর অধিকক্ষণ নির্জ্জনে অবস্থান করে না।

ক্রমশই বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী। বিবাহের সময় শ্রীধর ভট্টাচার্য্যকে সম্ভাষ দিতে হইবে, সেই কথাটী কর্ত্তা-কর্ত্রীর মনে পড়িল। তিনি একখানি বিনয়পূর্ণ আমন্ত্রণ-পত্র লিখিয়া একজন ব্রাহ্মণকে কয়জনী গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। বিবাহের পাঁচ দিন থাকিতে সেই পত্রবাহক ব্রাহ্মণের সহিত শ্রীধর ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার পত্নী নবদ্বীপে গোস্বামী-গৃহে উপস্থিত। আর এক দিন পরে বর কন্যার পাত্রে হরিদ্রা।

ভট্টাচার্য্য যে দিন উপস্থিত হইলেন, সেই দিন রজনীযোগে তাঁহার গৃহিণী ও গোস্বামী-গৃহিণী এক গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য কথা বার্ত্তার সহিত, ভট্টাচার্য্য-পত্নী কিঞ্চিৎ অভিমানস্বরে কহিলেন, "আহা! পূর্ব্ব জন্মে তোমরা আমার কে ছিলে! আজ ছয় বৎসর আমি সোমনাথের মুখ দেখি নাই। সোমনাথ যখন আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছল ছল চক্ষে আমার মুখ পানে চাহিল, তখন আমার বুক যেন ধড়্ ফড়্ করিয়া লাফাইতে লাগিল। কেন যে এমন হয়, কিছুই বুঝিতে পারি না। সোমনাথ আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে নাই, কুড়াইয়া পাইয়া মানুষ করিয়াছি মাত্র; তাহাতেই যখন এই, তখন না জানি, যাহারা গর্ভধারণ করিয়া সন্তান প্রসব করে, তাহাদের মায়া মমতা কতদূর বেশী!"

গোস্বামী-পত্নী একটু পূর্ব্বে হাসিতে হাসিতে কত কথাই কহিতেছিলেন, বিপ্র-বনিতার এই কথা শুনিয়া একেবারে যেন চকিত হইয়া উঠিলেন। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলে তুমি! সোমনাথ তোমার পেটের ছেলে নয়?"

ভট্টাচার্য্য-পত্নী উত্তর করিলেন, "না ভাই, আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ। ছেলে মেয়ে কিছুই হয় নাই। এইটীকে কুড়াইয়া পাইয়া মানুষ করিয়াছি, তাহাতেই উহার উপর পুত্র-স্নেহ জন্মিয়াছে। বিধাতা বৈমুখ কি না। দুঃখের কপাল কি না! রাখিতে পারিলাম না। অত বড় করিলাম, উপনয়ন দিলাম, শেষে পেটের দায়ে কাছ-ছাড়া করিতে হইল!"

স্থির হইয়া গোস্বামী-গৃহিণী এই কথাগুলি শুনিলেন। পূর্ব্ববৎ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি কুড়াইয়া পাইয়াছিলে? কোথায় পাইয়াছিলে?"

"ঠিক জানি না!" ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ঠিক জানি না! কর্ত্তার মুখে শুনিয়াছি, নদুড়ের চড়ায়।"

গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। গোস্বামী-গৃহিণী শয্যা হইতে উঠিয়া সেই প্রদীপের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রদীপটি আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিলেন। অলক্ষিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন শিহরিয়া উঠিল। অবিগলিত বাষ্প-বারিতে নেত্রপুট যেন পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। সজল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভট্টাচার্য্য-গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "যখন কুড়াইয়া পাইয়াছিলে, তখন তাহার বয়স কত?"

ভট্টাচার্য্য-পত্নী উত্তর করিলেন, "আড়াই বৎসর। আমরা যখন পাই, তখন অজ্ঞান। জ্ঞান হইলে মা মা বলিয়া কতই ক্রন্দন করিয়াছিল, কিছুতেই শান্ত করিতে পারি নাই। তিন চারি দিন কিছুই খাওয়াইতে পারি নাই। কাঁদিয়া কাঁদিয়া যখন নিতান্ত ক্লান্ত হইত, কোলে করিয়া শয়ন করাইতাম, ঘুমাইয়া পড়িত। যতক্ষণ ঘুমাইত, ততক্ষণ ঠাণ্ডা। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিলে কিম্বা জাগিয়া উঠিলে আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিত। সর্ব্বক্ষণ আমি তাহার মাথার কাছে বসিয়া জাগিতাম। ঘুমের ঘোরে যাহা অস্ফুট স্বরে কত কথাই বলিত, কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। থাকিতে থাকিতে ক্রমেই শান্ত হইল। বালক-স্বভাব, অল্পেই তুষ্ট, অল্পেই শ্রান্ত। থাকিতে থাকিতে আমাকেই মা বলিয়া জানিল। স্নেহে মনের সব সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। সেই বালক স্নেহ-গুণে আমাদের বশীভূত হইল। কর্ত্তা করিয়াছিলেন, বালকটী যেখানে পড়িয়াছিল, পূর্ব্বে সেখানে সোমনাথ নামে এক শিব উঠিয়াছিলেন; সেই জন্য সেই শিবের নামেই আমরা উহার নাম রাখিয়াছি, সোমনাথ।"

ব্রাহ্মণী অনেক কথা কহিলেন। গোস্বামী পত্নীর ইহা ও তত শুনিবার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং সকল কথায় কানও দিলেন না। দ্রুত পদে দ্রুত হস্তে গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহিরে গমন করিলেন। তাঁহার ঈদৃশ চঞ্চল ব্যবহারে ভট্টাচার্য্যগৃহিণী কি ভাবিলেন, তিনিই জানেন। শয়ন করিয়াছিলেন, শয্যার উপরে উঠিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কর্ত্তা সে রাত্রে বাটীর মধ্যে শয়ন করেন নাই। ভট্টাচার্য্যের অনুরোধে বহির্ব্বাটীতেই ছিলেন। বাটীর এক জন পরিচারিকার দ্বারা গৃহিণী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রাত্রি অধিক হয় নাই, উহা দেড় প্রহর রাত্রি। পত্নীর আহ্বানে গোঁসাইজী অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। অন্দরের যে গৃহে দামোদর শালগ্রাম শিলার অধিষ্ঠান, সেই গৃহের সম্মুখ প্রাঙ্গণে উপবেশন করিয়া গোস্বামী-দম্পতি চুপি চুপি অনেকক্ষণ কত কথা বলাবলি করিলেন; কেহই

তাহা শুনিল না। শেষে একটু চিন্তাকুল অন্তরে, গভীর মননে গোস্বামী কহিলেন, "হাঁ! ভট্টাচার্য্যের মুখে আমিও কতক কতক ঐ রকম আভাস পাইলাম। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মনে বড় সন্দেহ হইতেছে। আর কিছু না হউক, কাত্যায়নীর বিবাহে বাধা পড়িল। পূর্ব্বে যেরূপ পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহাতে অপর কিছু সন্ধান জানিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন জানিলাম, জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেও সোমনাথ অজ্ঞাত-কুলশীল। জাতিতে ব্রাহ্মণ কিনা, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? ভট্টাচার্য্যের গৃহে উপনয়ন হইয়াছে, তবু এই প্রমাণে ব্রাহ্মণে তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে সাহসী হইতে পারে না। সমস্ত শ্রমই বৃথা হইল!"

ব্রাহ্মণী কহিলেন, "অত কথা পাড়িয়া তুমি আমাকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা পাইতেছ, কিন্তু আমার প্রাণ কেমন করিতেছে। কত পূর্ব্বের কথা যে আমার মনে পড়িতেছে! তুমি শুধু, তোমাকে আর বেশী কি বলিব।"

ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া ফেলিলেন। গোস্বামীও কাতর হইয়া তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ দিলেন। "রাত্রে আর কিছু অধিক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না; প্রভাতে নিগূঢ় কথা বাহির হইতে পারে," এই বলিয়া পত্নীকে রাত্রের মত নিরুদ্বেগে শয়ন করিতে কহিলেন। গৃহিণী স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন, গোস্বামীও বাহিরে গেলেন। সমস্ত রজনী উভয়েরই নিদ্রা হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরিচয়

প্রভাতে নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে গোস্বামী আর ভট্টাচার্য্য চণ্ডীমণ্ডপে নিভৃতে উপবিষ্ট হইলেন। নিকটে আর কেহই রহিল না। গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বলুন দেখি, বালকটী যখন কুড়াইয়া পান, তখন কি তাহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না?"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "কিছুমাত্র না। নিঃশ্বাস না থাকিলে মৃত দেহ বলিয়াই স্থির করিতে হইত।"

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া গোস্বামী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আপনি যে তাহার উপনয়ন দিয়াছেন, উপনয়নের অগ্রে কিরূপে জানিয়াছিলেন, সে ব্রাহ্মণ-পুত্র?"

ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, "বালকেরই মুখে। তিন বৎসরের বালক; আমি তাহাকে অনেক বার ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নাম কি? করিয়াছিল, টেঁপু! বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কখন বলিয়াছিল কর্ত্তা, কখনও বলিয়াছিল গোঁসাই।"

সন্দিহানভাবে গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক বার বলিয়াছিল কর্ত্তা, এক বার বলিয়াছিল গোঁসাই; ইহাতেই কি আপনি নিশ্চয় করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ-পুত্র?"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "কেবল ইহাতেই না। গোঁসাই শব্দটী শুনিয়া অকস্মাৎ আমার মনে এক প্রকার সংশয় জন্মে। মানুষের ডাক-নাম গোঁসাই থাকিতে পারে। তদ্ব্যতীত সচরাচর লোকে আমাদের দেশের গোস্বামী প্রভুদিগকে সাধারণতঃ গোঁসাই বলিয়া থাকে। এই সংশয়ে আমি পুনঃপুনঃ খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমরা কি জাতি? তাহাতে বালক উত্তর করিয়াছিল, তাহা আমি জানি না। আবার আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার নিজের গলায় পৈতা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আমার যেমন পৈতা আছে, তোমার বাপের গলায় কি এই রকম পৈতা দেখিয়াছ? বালক প্রথমে ঘাড় নাড়িয়াছিল, তাহার পর কথা কহিয়া বলিয়াছিল, হাঁ, আছে, মা আছে, বাবা আছে, পৈতা আছে, ঠাকুর আছে, গরু আছে, আর কিছু না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া বালক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। সেদিন আর কিছু জানিতে পারিলাম না। তাহার পর আরও অনেক দিন অনেক অবসরে কথার কৌশলে জানিতে পারিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণের পুত্র, তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না।"

গোস্বামীর বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্ব শরীর হর্ষবিষাদে কণ্টকিত হইল। অলক্ষিতে অশ্রুমার্জ্জন করিয়া ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বালকের গাত্রে কোন প্রকার অলঙ্কার ছিল?"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "ছিল। মাথায় দুটী সোনার পুঁটে, আর গলায় একটী সোনার বাছলী।"

গোঁসাইজী অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। যেন কি চিন্তা করিয়া গম্ভীর বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেই দুখানি গহনা কি আপনি নষ্ট করিয়াছেন?"

"না",—ভট্টাচার্য্য বিনা চিন্তায় উত্তর করিলেন, "না।— তাহা আমি নষ্ট করি নাই। সংসারে অনেক প্রকার কষ্ট হইয়াছিল, তথাপি সে দুটি বস্তু আমি

সমস্ত ঘরে রাখিয়াছি। বড়ার ঘরখানা তালিয়া গিয়াছিল, গৃহের কোন সামগ্রীই বাহির করিতে পারি নাই, সেই সময় বড়ই মনস্তাপ পাইয়াছিলাম। যখন স্বামি সোমনাথকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাই, তৎকালে সে দুটি বস্তু আমার হস্তগত ছিল তজ্জন্য আপনাকে দেখাইতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, তাহা আর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া কতকগুলি জিনিস পত্রের সঙ্গে সে দুটী প্রিয় সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছি। সোমনাথের শুভ বিবাহে যৌতুক দিবার অভিলাষে এই বারে তাহা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।"

গোস্বামীর হৃদয়ে কি এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইল। তিনি সাগ্রহে করিয়া উঠিলেন, "এক বার আমি তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি। যদি বাধা না থাকে, আপনি এই সময় আমাকে দেখাইতে পারেন।"

ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "বাধা কিছুই নাই। যখন সোমনাথকে অর্পণ করিয়াছি, তখন সোমনাথের বস্তু আপনাকে অর্পণ করিব, তাহাতে বাধাই বা কি থাকিতে পারে।"

গোঁসাইজী কহিলেন, "আমি তাহা লইতে চাহি না; সোমনাথের বস্তু সোমনাথকেই যৌতুক দিবেন। আমি কেবল এক বার দেখিব মাত্র।"

হরমণি নামে এক দাসী সেই সময় তামাক সাজিয়া দিতে আসিয়াছিল। ভট্টাচার্য্য তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওগো বাছা! তুমি এক কর্ম্ম কর ত। বাড়ীর ভিতর আমার স্ত্রী আছেন, তাঁহার নিকট আমার একটী কৌটা আছে। সেই কৌটাটী চাহিয়া আন।"

পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ বিপ্র-বাক্য প্রতিপালন করিল। ভট্টাচার্য্য-ঘরনির নিকট হইতে একটী রক্তবর্ণ পুরাতন কৌটা চাহিয়া লইয়া চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্য তাহার হস্ত হইতে কৌটাটী গ্রহণ করিয়া আবরণ উন্মোচন করিলেন। দুটী স্বর্ণ পুঁটে, আর একটী স্বর্ণ-কবচ বাহির হইল। গোঁসাইজী তাহা হাতে করিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় অকস্মাৎ অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। ভট্টাচার্য্য তদ্দর্শনে বিস্ময়-বিকশিত নয়নে চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি! আপনি রোদন করেন কেন? এই দুখানি গহনার মধ্যে এমন কি আছে যে, তাহাতে আপনার শোকের উদয় হইতে পারে?"

গোঁসাইজী হরমণিকে বাড়ীর ভিতর যাইবার আদেশ করিয়া সেই কবচটী খানিকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করিলেন। হরমণিরও

চক্ষে জল। হরমণিও এক দৃষ্টে সেই অলঙ্কার দুটী দেখিতে লাগিল। পার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া নেত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক মৌনভাবে তথা হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। গোঁসাইজী তাহা দেখিলেন, ভট্টাচার্য্য দেখিলেন না। হরমণি চলিয়া গেলে গোঁসাইজী নিস্তব্ধভাবে তথা হইতে উঠিয়া কবচটী হস্তে কার্য্যান্তর-ব্যাপদেশে কিঞ্চিৎ অন্তরে গেলেন। যখন দেখিলেন, অপরের অদৃশ্য হইয়াছেন, তখন অতি সাবধানে অল্পে অল্পে বাহুলীটির এক মুখ মুক্ত করিলেন। এক খণ্ড ক্ষুদ্র তুলট কাগজ বাহির হইল। সেখানি উন্মুক্ত করিয়া গোস্বামী ঠাকুরের সর্ব্ব শরীর প্রেম-পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সস্মিত অথচ বিস্মিত বদনে প্রত্যাগত হইয়া ভট্টাচার্য্যকে কহিলেন, "আপনি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি আসিতেছি।"

সংক্ষেপে ত্বরিতস্বরে এই কথা বলিয়া গোস্বামী মহাশয় অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী গত রাত্রের কথায় সন্দিহানভাবে নিতান্ত ত্রিয়মাণা হইয়া ভাণ্ডারগৃহে অন্তর্বসনে এখানকার জিনিষ ওখানে, ওখানকার জিনিষ সেখানে সরাইয়া রাখিতেছিলেন। প্রভু সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া হর্ষ-বিকসিত নয়নে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, "পুণ্যশীলে! আমাদের সৌভাগ্য উদয়। হারানিধি প্রাপ্ত হইয়াছি। গণক আচার্য্যের কথা মিথ্যা হইয়াছে। সুশীলচন্দ্র বাঁচিয়া আছে! তুমি বিষয় বদন দূর করিয়া মঙ্গলাচরণ কর।"

ব্রাহ্মণী চিন্তাকুল ছিলেন, পতিবাক্য-শ্রবণে অকস্মাৎ হৃদয়ে একটা আঘাত লাগিল। যে কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা হইতে নয়ন ফিরাইয়া লইয়া পতির বিস্মিত বদনে চঞ্চলভাবে বিনিক্ষেপ করিলেন। মুখের ভাবে কিছুই প্রকাশ পাইল না। বোধ হইল যেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ঈষৎ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি কথা! আমার সুশীলচন্দ্র বাঁচিয়া আছে?—আঃ!—আঃ!—কোথায় আমার হারানিধি?"

"উতলা হইও না।"—গম্ভীরভাবে প্রবোধ দিয়া গোস্বামী কহিলেন, "উতলা হইও না।—তোমার সুশীলচন্দ্র তোমার গৃহেই উপস্থিত আছে। তোমার এক্ষণকার পালিত পুত্র সোমনাথই সেই প্রাণাধার সুশীলচন্দ্র। করুণাময় শ্রীধর ভট্টাচার্য্য তাহাকেই সযত্নকুলে কুড়াইয়া পাইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন সোমনাথ নামে আমাদের সুশীলকেই আমাদের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। সুশীলের মাথায় যে দুটী পুঁটে থাকিত, সুশীলের গলায় আমি যে রাম কবচ পরাইয়া দিয়াছিলাম, ভট্টাচার্য্য তাহাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজ আমাকে

তাহা দেখাইলেন। বাহুলীর মধ্যে কবচ খানি অবিকৃত আছে। নাম, ধাম, জন্ম-নক্ষত্র সমস্তই আমি পাঠ করিলাম। এত দিনের পর আমাদের হারানিধি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। গণকের গণনাবাক্য মিথ্যা হইয়া গিয়াছে।"

গৃহিণীর যুগল নেত্র বারিপূর্ণ হইল। যুগল হস্তে পতির চরণ ধারণ করিয়া সাশ্রু নয়নে বসিয়া পড়িলেন, ঊর্দ্ধমুখে পতির মুখপানে চাহিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, "ভট্টাচার্য্যের মঙ্গল হউক পরমেশ্বর তাহাদের সুখে রাখুন। আমার সুশীল, আমার সুশীল! ওঃ! এই জন্যই যাহাকে দেখিয়া অবধি আমার হৃদয়ে পুত্র-স্নেহ হইয়াছিল। এই জন্যই ভট্টাচার্য্য-পত্নীর মুখে সমুদ্রস্নানের কথা শুনিয়া গত রাত্রে আমার প্রাণ ওত কাঁদিয়া উঠিয়াছিল! চল,—শীঘ্র চল, আমার মনে আর একটী কথা উদয় হইতেছে, শীঘ্র চল, সুশীলকে ডাকাইয়া সে সন্দেহটীও ভঞ্জন করিয়া লইব। এখনই তাহাকে ডাকাইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।"

সোমাধী কহিলেন, "আর কোন পরীক্ষার প্রয়োজন নাই, আর কোন সন্দেহ রাখিবার কারণ নাই। এই দেখ, সেই স্বর্ণকবচ। ইহাই আমাদের সুশীলচন্দ্রের গলায় থাকিত।" এই কথা বলিয়া কবচ বাহুলীটী বাহির করিয়া গৃহিণীকে দেখাইলেন। স্থির দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিয়া পুত্র-বৎসলা সোমাধী-মহিলার চক্ষে আবার জলধারা গড়াইল। আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তিনি পুনরায় পতিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "তথাপি,—তথাপি প্রভু! সে বিষয়টী আমাকে পরীক্ষা করিতে হইবে। তুমি চল,—সেটী ভাল করিয়া না দেখিলে,—আমরা স্ত্রীজাতি কি না,—সেটী ভাল করিয়া না দেখিলে সন্দেহ ঘুচিতেছে না।"

সোমাধী আর আপত্তি করিলেন না। উভয়ে ভাণ্ডার গৃহ হইতে বাহির হইলেন। শয়ন-কক্ষের সংলগ্ন আর একটী গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বারবানির দ্বারা সোমনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিদ্বদ্বদন সোমনাথ উপস্থিত হইলে, সোমাধী-পত্নী সর্ব্বাগ্রে সস্নেহ নয়নে তাহার পৃষ্ঠভাগ নিরীক্ষণ করিলেন। সুশীলচন্দ্রের পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার পাংশুবর্ণ জড়ুল ছিল। বয়সের সহিত তাহা আরও কিছু উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিয়াছে। জননী তাহা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত, বিস্মিত, ও স্নেহভাবে পরিপূর্ণ হইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় পুনঃপুনঃ অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। জননী সস্নেহে পুত্রকে পার্শ্বদেশে বসাইয়া চিবুক স্পর্শপূর্ব্বক সাদরে চুম্বন করিলেন। কহিলেন, "বাছা! বাছা সুশীল! তুমি আমারই সুশীলচন্দ্র। এই অভাগিনীর গর্ভেই তোমার জন্ম হইয়াছে। তুমি ভট্টাচার্য্যের পুত্র নও, ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী তোমার জননী নহেন; তুমি আমাদেরই

প্রাণধন সর্ব্বস্ব। ভট্টাচার্য্য তোমার প্রতিপালক মাত্র। তোমার নামও সোমনাথ নয়, তুমি আমাদেরই সুশীলচন্দ্র। আমি রাক্ষসী, তিন বৎসর বয়সের সময় আমি তোমাকে গঙ্গাসাগরে হারাইয়াছিলাম। শ্রীধর ভট্টাচার্য্য তোমাকে সমুদ্রের চড়ায় কুড়াইয়া পাইয়া পুত্রভাবে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাপাক্রমে তিনি তোমাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকটে আমরা জীবনের জন্য ঋণী হইয়া রহিলাম। যিনি তোমাকে মাতার ন্যায় স্নেহ যত্নে প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই ধিক্কণীর নিকটেও আমি চির-ঋণী থাকিলাম। ছয় বৎসরকাল তুমি অজ্ঞাতভাবে অপরিচিত নামে আমাদের গৃহে রহিয়াছ, আমরা চিনিতে পারি নাই; এখন সময়ই প্রকাশ পাইয়াছে।" সস্নেহে এই কথা বলিয়া স্নেহময়ী জননী পুনরায় প্রাণাধিক সুশীলচন্দ্রের চিবুক স্পর্শে চুম্বন করিলেন।

সুশীলচন্দ্র এতক্ষণ বিস্ময়-স্তম্ভিত অন্তরে নির্ব্বাক হইয়া ঐ সকল কথা শ্রবণ করিতেছিল, জননীর কথা সমাপ্ত হইলে ভক্তিভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া জনক-জননীর চরণে প্রণিপাত করিল। কিন্তু তৎকালে তাহার মানস-সরোবরে যে কি এক হৃদয়-বিকম্পন পূর্ণিমায় উদ্বেলিত হইয়া প্রবল তরঙ্গ তুলিয়াছিল, তাহা সেই তরুণ হৃদয়ই অনুভব করিতে পারিল, অপরের পক্ষে অনুভবনীয়। সুশীলচন্দ্র অবনত মস্তকে জননীর বাম পার্শ্বে বসিয়া রহিল। একটু পরে শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, তাঁহার পত্নী হরমণি দাসী, বালিকা কাত্যায়নী, আরও দুই এক জন পরিচারিকা ও প্রতিবাসিনী সেই স্থানে উপস্থিত। ঘটনা-শ্রবণে সকলেই বিস্ময়-পুলকে পরিপূর্ণ। হরমণি শিশুকালে সুশীলচন্দ্রের ধাত্রী ছিল, সুশীলের প্রতি তাহার মাতৃবৎ স্নেহ। চণ্ডীমণ্ডপে কৌটাবন্ধস্থ কবচ দর্শনে হরমণির চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছিল, তাহারও কারণ এই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গণকের গণনা

এক্ষণে কিছু পূর্ব্ব কথা প্রকাশ করিবার অবসর। গোস্বামী ঠাকুর বারম্বার বলিয়াছেন, গণকাচার্য্যের গণনা-বাক্য মিথ্যা হইয়াছে। একথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি? গণকাচার্য্য কাহার সম্বন্ধে কি কথা গণনা করিয়াছিলেন?— কি কথা মিথ্যা হইয়া গেল?

শ্রীশচন্দ্রের অন্নপ্রাশনের সময় এক জন গণক আসিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অনুরোধে তিনি ঐ বালকের ভাগ্য গণনা করিয়া প্রথমে মুখখানি কাঁচুমাচু করেন। তাহার পর গোস্বামী মহাশয়ের অত্যন্ত আগ্রহে দুঃখিত-চিত্তে বলিয়াছিলেন, "আপনি জন্মদাতা পিতা, আর উনি গর্ভধারিণী জননী; আপনাদের মুখের উপর সে নির্ঘাত-কথা বলিতে সঙ্কোচ করি। বালকটীর জলে কাঁড়া আছে। সযত্নে ভুষিবার আশঙ্কা।"

গণকের বাক্যে গোস্বামী অত্যন্ত কাতর হইলেন। তাঁহার পত্নী নিতান্ত অধীরা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি গণকের নিকট করজোড়ে বিনতিপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুর! এ সর্ব্বনাশ নিবারণের কি কোন উপায় হইতে পারে না? আমি বড় দুঃখিনী, সন্তান হইয়া রক্ষা পায় না; আমার এ ছেলেটীরও এত বড় কাঁড়া। আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে। যদি কিছু উপায় থাকে, দয়া করিয়া বল, পরমেশ্বর তোমার ভাল করিবেন।"

গোস্বামী নিজেও কাকুতি মিনতি করিয়া গণক ঠাকুরকে বিস্তর উপরোধ করিলেন। গণক ঠাকুর উত্তম সুযোগ পাইলেন। ধ্যান-মগ্নের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ মুদ্রিত-নেত্রে কি চিন্তা করিয়া বারেক দুই বার আকাশ পানে চাহিলেন; এক বার ভূমিতল নিরীক্ষণ করিলেন;—দুই বার উত্তর পার্শ্বে দৃষ্টি করিলেন;—অল্প অল্প ওষ্ঠ কম্পিত হইল; ভূতলে পাঁচ বার পদাঘাত করিলেন;—অবশেষে মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর শিরোপরি উপবীত ধারণ করিয়া কি কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করিলেন। আবার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "দৈব বলে কি না হয়।— গ্রহকোপ শুনিলেই হাল ছাড়িয়া দিতে হয় না।— তত চিন্তা নাই। বেশী কিছুই করিতে হইবে না; একখানি রামকবচ ধারণ করাইলেই মঙ্গল হইবে। আমি নিজেই সাত দিন পরে আসিয়া রামকবচ দিয়া যাইব। সর্ব্ব কবচ অপেক্ষা রামকবচ উৎকৃষ্ট রক্ষাকবচ। ব্যয়ও সামান্য। পাঁচটী রজত মুদ্রা যায়।— টাকাকটী কিন্তু অগ্রে চাই; কারণ কি না, কবচ লিখিবার খরচপত্র আছে।"

তখন।— গোস্বামী-পত্নী অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া উৎসাহের স্বরে কহিলেন, "টাকার জন্য চিন্তা নাই। এখনি আমি তোমাকে পাঁচ টাকা দিতেছি, ছেলেটী যাহাতে রক্ষা পায়, তাহা তোমাকে করিতেই হইবে। টাকার জন্য চিন্তা নাই: ছেলে আগে না টাকা আগে।— পাঁচ টাকার জায়গায় বেশী লাগে, তাহাও দিব।—ছেলেটিকে রক্ষা কর।"

গোস্বামীও গৃহিণী-বাক্য অনুমোদন করিলেন। তৎক্ষণাৎ গণকের হস্তে পাঁচটী টাকা আনিয়া দেওয়া হইল। বালককে আশীর্বাদ করিয়া গণক ঠাকুর মনে মনে ভাবিলেন, "আরও কিছু বেশী চাহিলেই ভাল হইত! আচ্ছা,—সূত্রপাত করা থাকিল, যে দিন কবচ লইয়া আসিব, কবচের অভিষেক বলিয়া সেই দিন দশ টাকা বেশী করিয়া লইব।"

নামাবলী স্কন্ধে করিয়া গণক ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বদনের চিন্তাকুল ভাব দেখিয়া গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর! বিলম্ব কেন?—কি ভাবিতেছেন?"

ভাব গোপন করিয়া গণক ঠাকুর উত্তর করিলেন, "ভাবি নাই কিছু; বোধ হয় তিন চারি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেটীর সর্ব্বদা ব্যামো স্যামো হইবে। রক্ষা কবচে সচরাচর আধিব্যাধির দমন হয় না। যদি দেখেন, ছেলেটী জব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ সুস্থ অবস্থায় এক বার মকরে গঙ্গাসাগরে স্নান করাইয়া আনিবেন। তাহাতে সমুদ্র-কাঁড়ারও ভয় ঘুচিয়া যাইবে।"

বিমর্ষ বদনে গোঁসাইজী সে বাক্যেও অঙ্গীকার করিলেন। গৃহিণীও তাহাতে সায় দিয়া গণককে সম্বোধনপূর্ব্বক আবার কহিলেন, "দেখো ঠাকুর! সাত দিনের দিন কবচখানি যেন পাওয়া যায়।"

একটি সুদীর্ঘ হাই তুলিয়া অনুকূল উত্তর প্রদানপূর্ব্বক গণক ঠাকুর সে দিন বিদায় হন। তাহার পর নির্দ্দিষ্ট দিবসে কবচখানি দিয়া অভিষেক বাবদে পঁচিশ টাকা আর গণনায় দক্ষিণা দশ টাকা, একুনে এই পঁইত্রিশ টাকা লইয়া যান। সেটী আজ আঠারশ বৎসরের কথা। তদবধি দীপচাঁদ গোস্বামীর ভবনে সেই গণকের আর একবারও পদার্পণ হয় নাই।

গণক যাহা অনুমানে বলিয়াছিলেন, তাহাও সত্য হইয়াছিল। সুশীলচন্দ্র আঠাই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানা রোগে আক্রান্ত হয়। তাহার পরেও মধ্যে মধ্যে মাথা ধরা, পেট কাঁপা, অজীর্ণ, বমনাধি, উদরাময় ইত্যাদি হইত; রাবকবচে তাহার উপশম করিতে পারিত না। কাজেই গোঁসাইজী এক দিন গণকবাক্য স্মরণ করিয়া সুশীলের তৃতীয় বর্ষের পৌষ মাসের শেষে তাহাকে লইয়া সপরীক গঙ্গাসাগরে যাত্রা করেন। মকর সংক্রান্তির দিন সেই তিন বৎসরের শিশুকে নৌকার উপর হইতে সাগরে স্নান করান হইতেছিল; জলনিধির তরঙ্গবেগে সহসা দৈববশে জননীর হস্ত হইতে পিছলাইয়া জলে পড়ে। জনক জননী যারা শোকাকুল। তরঙ্গে তরঙ্গে বালকটী যে কোথায় কত দূরে ভাসিয়া যায়, কেহই

কিছু সন্ধান করিতে পারেন নাই। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, পাঠক মহাশয় পূর্ব্বেই তাহা অবগত হইয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরস্পর বিদায়

পূর্ব্ব কথা স্মরণে মূল প্রস্তাব হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়া গেল। পাঠক মহাশয় এক্ষণে সেই আরব্ধ বিষয়ের অবশিষ্ট দর্শন করুন।

দারাপুত্র প্রাপ্ত হইয়া নবীন গোস্বামী মহাশয় যে পরম পুলকিত হইলেন, একথা বলা বাহুল্য। বাল্যী হরমণির অন্তরেও পরমানন্দ। সুশীলচন্দ্র ও কাত্যায়নীর মনের ভাব অন্য প্রকার। ভ্রাতা ভগিনী পরিচয় হইল, অথচ তাহাদের মনে আনন্দ নাই। সুশীল যখন সদুহে হারাইয়া যায়, তখন কাত্যায়নীর জন্ম হয় নাই। তাহার পর করজলীর ভট্টাচার্য্য যে সময় দ্বাদশ বর্ষীয় সুশীলকে অজ্ঞাত গোস্বনাথ নামে পরিচয় দিয়া পিতৃগৃহে রাখিয়া যান, তখন কাত্যায়নী আট বছরের। এখন সুশীলচন্দ্র অষ্টাদশে, কাত্যায়নী চতুর্দ্দশে। এই ছয় বৎসর সুশীলও জানিত না যে কাত্যায়নী তাহার সহোদরা, কাত্যায়নীও জানিত না যে সুশীল তাহার সহোদর। বর্ষবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরে কেবল এই মাত্র জানিয়াছিল যে, তাহাদের উভয়ে বিবাহ হইবে। একত্র ক্রীড়া, একত্র উপবেশন, একত্র ভোজন, একত্র শয়ন, ইত্যাদি আলক্ষ্যে উভয়ে বিলক্ষণ প্যার হইয়াছিল। অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবা ও চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকার হৃদয়ে যথার্থ প্রণয় সঞ্চার না হইলেও বিবাহের নামে অবশ্যই আনন্দ হইয়া থাকে। সুশীল ও কাত্যায়নীর হৃদয়ে অবশ্যই সে আনন্দের উদয় হইয়াছিল। এক্ষণে সত্য পরিচয় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আশাভঙ্গ জন্য নিরানন্দ প্রবেশ করিল। প্রকৃতিসিদ্ধ ভ্রাতৃ-ভগিনী-স্নেহ-জনিত আনন্দ যেন জলদাবৃত শশধরের মত মুহ্যমান থাকিল; স্ফূর্ত্তি পাইল না। উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন গৃহে বিমর্ষ।

কাত্যায়নীর বিবাহে বিলম্ব পড়িয়া গেল। আগামী কল্য গাত্রে হরিদ্রা হইবার কথা, কিন্তু তত শীঘ্র পাত্র পাওয়া যায় কোথায়; সুতরাং সে দিনটীও ত্যাগ করা হইল।

পাঁচ সাত দিন অতীত। সুশীল ও কাত্যায়নী উভয়েই দিন দিন অধিক চিন্তাযুক্ত, অধিক বিষণ্ণ। বিবাহে নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন, বিবাহের ত বিচিত্র

সংঘটন,—ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর অধিক দিন নবদ্বীপে বিলম্ব করিতে পারিলেন না। এক দিন প্রাতঃকালে অবসর বুঝিয়া গোস্বামী মহাশয়কে কহিলেন, "দেখুন, পরমেশ্বরের মনে ছিল, আপনার দ্বারাপুত্র আপনি প্রাপ্ত হইলেন :—আশীর্ব্বাদ করি, পুত্র কন্যা দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে থাকুক। আমি অনেক দিন হইল, গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি ; ঘর সংসার ফেলিয়া আর কত দিন এখানে থাকিতে পারি ? অনুমতি করুন, বিদায় হই। সুশীলের বিবাহের সময় সংবাদ প্রেরণ করিলেই পুনরায় আসিব। কাত্যায়নীর বিবাহেও যেন সমাচার পাই।"

গোঁসাইজী কহিলেন, "আপনার কাছে আমি চির জীবনের মত বাঁধা হইয়া রহিলাম। আপনার অনুগ্রহেই আমি আমার হারানিধি প্রাণাধিক সুশীলচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইলাম। এ জন্মে তাহাকে আর দেখিতে পাইব, ইহা আর মনে ছিল না ; কেবল জগদীশ্বরের কৃপায় আপনার দ্বারাই আমাদের এই সৌভাগ্যোদয় হইল। আপনি গৃহে যাইবেন, বারণ করিতে পারি না। আশা করি, সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সুখী হইব।"

ভট্টাচার্য্যকে এই কথা বলিয়া গোঁসাইজী এক বার অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অর্দ্ধ দণ্ড পরে প্রত্যাগত হইয়া ভট্টাচার্য্যের হস্তে দুই শত মুদ্রা প্রদান করিয়া বিনম্র-বদনে কহিলেন, "মহাশয় ! আপনার পাথেয়স্বরূপ এই যৎকিঞ্চিৎ অর্থ অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার উপযুক্ত প্রতিশোধ কিছুই দিতে পারিলাম না, এই বড় আক্ষেপ রহিল।"

সানন্দ অন্তরে গোস্বামীদত্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "অকিঞ্চিৎকর অর্থে অকৃত্রিম বিজ্ঞতার পরিচয় হয় না, উহা কোন প্রকারে বিনিময়েরও বস্তু নহে। আপনার সদ্ব্যবহারেই আমি পরম আপ্যায়িত হইয়াছি। সুযোগ পাইলেই এই তীর্থস্থানে আসিয়া আপনার দর্শন লাভ করিব।"

এইরূপ সৌহার্দ্দ-বর্দ্ধন নানাপ্রকার কথোপকথনের পর উভয়ে স্নান আহ্নিক সমাপন করিলেন। যথাসময়ে আহারাদি সমাপ্ত হইল। আহারান্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহযাত্রা। তিনি সস্ত্রীক প্রফুল্ল-বদনে গৃহস্থ প্রত্যেকের নিকট সস্নেহ শ্রিত-সম্ভাষণে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভাগীরথীর ঘাটে তরণী আরোহণ করিলেন। গোঁসাইজী স্বয়ং সুশীলের সহিত তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া কত কি চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

এক মাস অতীত হইয়া গেল। সুশীল ও কাত্যায়নী কখনই কৃশ, কখনই বিবর্ণ, কখনই উৎসাহ-পরিপূর্ণ। ছয় বৎসর যাহারা একত্র খেলা করিয়াছে,

একত্র ভ্রমণ করিয়াছে, একত্র বসিয়া গল্প করিয়াছে, একত্র পুস্তক পাঠ করিয়াছে, দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে একত্র বসিয়া ভোজন করিয়াছে. এখন আর তাহারা প্রায়ই একত্র হয় না। যদি দৈবাৎ নির্জ্জনে দেখা হয়, উভয়েই মাথা হেঁট করিয়া থাকে. —উভয়ের চক্ষেই অশ্রু দেখা দেয়, উভয়েই মুখ ফিরাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া যায়। অপরে সে ভাব অনুভব করিতে পারে না; বোধ হয় লক্ষ্যও হয় না।

কাত্যায়নী বয়স্থা হইয়াছে; বিবাহ না দিয়া গোস্বামী মহাশয় আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। সুশীলচন্দ্রেরও বিবাহের বয়স হইয়াছে, তাহার জন্যও একটী পাত্রী অন্বেষণ করা আবশ্যক। গোসাইজী ব্যস্ত হইয়া স্থানে স্থানে পাত্র পাত্রী অন্বেষণে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আরও এক বাস অতীত। শান্তিপুরে একটী সুপাত্র, আর ভরিপাড়ায় একটী সুপাত্রী স্থির হইল। অচিরেই শুভকর্ম্ম সমাধা করা গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছা। কিন্তু প্রকৃত আয়োজনের এখন অনেক বাকী। পূর্ব্বে এক দ্বারা আয়োজন করা হইয়াছিল, ঘটনাচক্রে এখন দোহারা দ্রব্যাদির প্রয়োজন। কাত্যায়নীর অলঙ্কার বস্ত্র প্রস্তুত, আবার নূতন বধূর জন্য আর এক প্রস্থ আবশ্যক। সুশীলের বস্ত্রাদি বরসজ্জা প্রস্তুত, আবার জামাতার নিমিত্ত নূতন সজ্জা প্রয়োজন। কাজেই কিছু বিলম্ব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সাধারণ আলাপ

দেখিতে দেখিতে আরও এক বাস যায়। বাণীকান্ত ঘোষ নামে এক ব্যক্তি সুশীলকে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা দিতেন। পাড়ায় আরও পাঁচ সাতটী ছাত্র তাঁহার কাছে তখনকার চলন মত "সাড ঈয়র, সাড খোদা, হার্ষো ঘোড়া, কৌ সাতী" ইত্যাদি ইংরাজী পাঠ লইত। নবদ্বীপে তখন বাণীকান্তের ন্যায় ইংরাজীওয়ালা কেহই ছিলেন না; এই সুখ্যাতিতে পাড়ায় তিনি "বাবু ম্যাষ্টার" নামে বিখ্যাত। কেহ কেহ বা বেশী কথা এড়াইবার জন্য শুদ্ধ "ম্যাষ্টার" বলিয়া ডাকিত। শিষ্যদের নিকট মাত্র উপাধি "স্যার।" এক দিন বৈকালে সুশীলচন্দ্র একাকী তাহার বাবু-ম্যাষ্টারের সঙ্গে তাহাদের মেজো বাগানে* বেড়াইতে যায়। কথায় কথায় ম্যাষ্টার

* নবদ্বীপে দীপচাঁদ গোস্বামীর আর কাঁটালের বাগান ছিল। বিশেষ জামাইষষ্ঠীর জন্য বড় বাগান, মেজো বাগান, ও ছোট বাগান বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইত। বড় বাগান আর ছোট বাগান জঙ্গলাকীর্ণ অপরিষ্কার; মেজোটী কিছু পরিষ্কার, বাসে মাসে দুই একটি চাপা, বকুল ও করবী ফুলের গাছ ছিল; বেড়াইবার অযোগ্য ছিল না।

মহাশয় তাহার নিকট সতীদাহ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপের গল্প করেন। সুশীলচন্দ্র সংক্ষেপে তাহার প্রকৃত মর্ম বুঝিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে ম্যাটারের মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "স্যার! সতীদাহ কারে বলে?— গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ করাই বা কি রকম?"

বাবু ম্যাটার স্থূল সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করিয়া সুশীলকে ঐ দুটী বিষয়ের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখখানি বর্ষাকালের জোয়ার-ভাটা-বিহীন নদীর জলের ন্যায় গম্ভীর হইয়া আসিল। এক দৃষ্টে সুশীলের বিস্ময় বদন নিরীক্ষণ করিয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। অবশেষে একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে স্তম্ভিত স্বরে কহিলেন, "দেখ সুশীল! তোমার পিতামাতা তোমাকে সমুদ্রে হারাইয়া ছিলেন, আট নয় বৎসর পরে আশ্চর্য্য প্রকারে অপর এক জন ব্রাহ্মণের নিকট তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। সে ব্রাহ্মণও তোমাকে সমুদ্রের চড়ায় অজ্ঞানাবস্থায় কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন বলিয়াছেন। বড়ই আশ্চর্য্য! বলিতে কি সুশীল! সেই বিষয়ে আমার মনে বড় একটা ধোঁকা জন্মিয়া রহিয়াছে। আমি—"

"কি ধোঁকা স্যার?"— কথা সমাপ্ত হইবার অগ্রেই অধিকতর বিস্ময়-বিস্ফারে সুশীলচন্দ্র সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "কি ধোঁকা স্যার?"

স্যার তখন উভয় সঙ্কটের মাঝামাঝি পড়িলেন। ভাবিতে লাগিলেন,— "বলি কি না বলি?—যে কথা ঠিক জানি না, বালকের নিকটে সে কথা প্রকাশ করিয়া কলঙ্কগ্রস্ত হইব;—বিপদগ্রস্তও হইতে পারি। করি কি?— মনের মনে অসম্বর্ধ হইয়া হঠাৎ ধোঁকার কথাটা কেনই বা বলিলাম! এখন করি কি?"

বিষম ভাবনা!— স্যার তখন সত্য সত্যই উভয় সঙ্কটে পড়িলেন! সুশীলের পুনঃপুনঃ সাগ্রহ উত্তেজনায় বুদ্ধির সাগর বাবু ম্যাটার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, "ধোঁকাটা কি জান সুশীল!— এদেশে রীতি আছে, প্রসূতির প্রথম প্রথম দুটী একটী সন্তান নষ্ট হইলে, শেষের সন্তান বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া, মায়ের একটী সন্তানকে গঙ্গাসাগরকে দান করে।"

এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া সুশীলচন্দ্র একটু গম্ভীরভাবে কহিল, "যদি দেশের রীতিই ঐ প্রকার, তবে সে কথা স্মরণ করিয়া আপনার ধোঁকা জন্মিয়া রহিয়াছে কেন?"

ম্যাটার মহাশয় আর মনের কথা গোপনে রাখিতে পারিলেন না। মাষ্টারি বয়নে মুখভঙ্গী করিয়া অট্ট সকালন পূর্ব্বক কহিলেন,"কেন জন্মিয়া রহিয়াছে জান

সুশীল! তোমার দুটি সহোদরের জন্ম হইয়াছিল :—অকালে অতি অল্প বয়সেই সে দুটীর মৃত্যু হয়। সেই জন্য বোধ করি, তোমার পিতা মাতা হয় ত তোমাকে গঙ্গাসাগরকে দান করিয়া থাকিবেন। আমার অনেক বয়স হইয়াছে কিনা, আমি সব জানি। তোমার পিতা ৺চূড়াচাঁদ গোস্বামী প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তির সময় সাগরযাত্রা করেন। এক বৎসর তোমাকে আর তোমার জননীকে সঙ্গে লইয়া যান। তখন তুমি খুব ছোট। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, তোমাকে আনিলেন না। সকলের সাক্ষাতে বলিলেন, তুমি সাগরে হারাইয়া গিয়াছ! যাহাই কেন হউক না, সন্তান হারাইয়া গেলে মাতা পিতা কখনও পাষাণের মত স্থির থাকিতে পারেন না। কিন্তু আমার বেশ স্মরণ হয়, সে সময় ঐ কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহারা বেশ পাষাণের মত স্থির ছিলেন। কেন জান?— প্রথা আছে, সাগরকে সন্তান দান করিয়া কাঁদিতে নাই।— কাঁদিলে দানটি ব্রতের ফল হয় না। ভবিষ্যৎ পুত্রের কল্যাণ কামনায় তাঁহারাই তোমাকে সমুদ্রের জলে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিলেন। পরমায়ু ছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় চড়ায় ঠেকিয়া তুমি রক্ষা পাইয়াছিলে। শেষে ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ যেন ঈশ্বরের দূতস্বরূপ হইয়া তোমাকে প্রতিপালন করেন। এক জনের পুত্রকে অপরে মানুষ করে, এমন প্রমাণ আমাদের পুরাণ শাস্ত্রে অনেক আছে।"

সুশীলচন্দ্রের সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। আর একটীও কথা কহিল না। বেলাও অবসান হইল, আকাশের পশ্চিম কোণে এক খণ্ড ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দেখা দিল। মেঘ গর্জ্জনে বাবু ব্যাটারের অত্যন্ত ভয় হয়। গুড়্ গুড়্ করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল। বাবু ব্যাটারের দৌড়!—পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুশীলচন্দ্রও ছুটিতে লাগিল। সন্ধ্যার সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি আসিল। বাবু ব্যাটারের আর খোঁজ খবর রহিল না; সুশীলচন্দ্র অর্দ্ধসিক্ত বদনে ঘরে আসিয়া পৌঁছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

গণকের গণনা সফল

আজ রাত্রে সুশীলচন্দ্রের বিষম বদন আরও বিষম। সুশীল ভাবিতেছে, "উঃ কি শুনিলাম! পিতা মাতা— আমাকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহারা কি এতই নিষ্ঠুর। জগতে কি জনক জননী এত নিষ্ঠুর থাকিতে পারে। সত্য কি আমি সেই নিষ্ঠুর পিতার ঔরসে নিষ্ঠুরা জননীর

জন্মের জন্য প্রহণ করিয়াছিলাম। কাত্যায়নি! সত্য কি তুমি সেই মরা-মায়া-শূন্য জনক-জননীর কন্যা। না, না, তাহা কখনই সম্ভব বোধ হয় না। তাহা হইলে তুমি আমাকে অত ভালবাসিতে পারিবে কেন। তাহা হইলে তোমার হৃদয়ে অত স্নেহ, অত দয়া, অত মায়া স্থান পাইবে কেন? তুমি স্বর্গ-কন্যা। পৃথিবীর লোকের মুখে এখন তুমি আমার সহোদরা। এখন সহোদর-স্নেহে আমি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারি, আশীর্বাদ করিতে পারি, ভাল বাসিতেও পারি। কিন্তু সে স্নেহ, সে ভালবাসা আর এক প্রকারের। কাত্যায়নি কোথায় তুমি, এক বার দেখ এসে কি দশা এখন আমার। না এস না, দেখ না, তোমার সে স্নেহমাখা মুখ আর আমি দেখিতে পাইব না। আমি আর গৃহে থাকিব না, হয়ত এখনই প্রভাতে আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। কাত্যায়নি আমি তোমাকে ভুলিব না। নিষ্ঠুর জনক-জননীর সঙ্গে আর সম্বন্ধ রহিল না। যাঁহার কোলে পিতামাতা বলিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারই অনন্ত-কোলে গিয়া শীতল হইব। তখন জ্ঞান ছিল না, এখন জ্ঞান হইয়াছে; এখন আর বালির চড়ায় ঠেকিব না। পিতা এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মানুষ মরিলে কি হয়। তখন উত্তর দিতে পারি নাই। এইবারে বোধ হয়, পারিব। কাত্যায়নি এক বার আসিয়া দেখা দাও। আঃ একি ভ্রান্তি, আমার কেন ডাকি, সে মুখ দেখিলে আমার হয়ত মায়া আসিবে। যে শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়াছিলাম আবার কি সেই শৃঙ্খল পায়ে দিব? না কাত্যায়নি, তাহা আর হইবে না। তুমি আর চক্ষের কাছে এস না, আর না। এ কি হরমণি, তুমি কেন এখানে?"

সুশীলচন্দ্র স্বপন করিয়াছিলেন, মুক্ত বাতায়ন-পথে চঞ্চল পবন আসিয়া তাঁহার সিক্ত বদন অল্পে অল্পে শুষ্ক করিতেছিল। সুশীল চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন, ভ্রম নয়, স্বপ্ন নয়, সত্যই সম্মুখে হরমণি।

হরমণি সুশীলচন্দ্রের শৈশব-ধাত্রী। এ পরিচয় পাঠক মহাশয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। অশ্রুপূর্ণ-নয়নে সস্নেহ বচনে কহিল, "সুশীল বাছা, এই মেঘ, এই অন্ধকার, এই দুর্য্যোগ, এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে? কখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার পরেই তোমার ক্ষুধা পায়, এখনও কিছু খাও নাই, আমার প্রাণ ছটফট করিতেছে, এস যাদু ঘরে এস।"

উদাস-নয়নে ধাত্রীর মুখপানে চাহিয়া সুশীলচন্দ্র কহিলেন, "না আর আমি কিছু খাইব না। আমার খাওয়া-দাওয়া ফুরাইয়াছে, সংসারে আমার খেলাধূলা

ফুরাইয়াছে, সুশীল কিম্বা সোমনাথ নামে তোমাদের স্নেহপাত্র জগতে কেহ ছিল, ইহা তোমরা আর মনে করিও না, আমি সাগরের সামগ্রী। সাগরে আমার বিসর্জ্জন হইয়াছিল। পিতা বলিয়া সাগর আমাকে গ্রহণ করেন নাই, এখন গ্রহণ করিবেন ; আমি সাগরে যাইব। এই নবদ্বীপ চৈতন্য দেবের জন্মস্থান। সেই মহাপ্রভু চৈতন্য দেব আজ আমাকে চৈতন্য দান করিয়াছেন। হরিপ্রেমে সেই নিমাই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, শচীদেবীর মায়া রাখেন নাই, প্রাণ-প্রতিমা, পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রণয়ের অনুরোধ রাখেন নাই, পরমেশ-প্রেমে বিভোর হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। সেই প্রেমে আমার নিমাই পূজ্যপাদ তীর্থে কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ধরিতে গিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। দেখিতেছি সেই নিত্য চৈতন্য আমার হৃদয়ে আবির্ভূত। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া শীতল হইব। তুমি চলিয়া যাও। এখন সময়ই অবসান, তুমি চলিয়া যাও। তোমাকে দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিতেছে, মায়া-বন্ধনে আর বাঁধিও না। কাত্যায়নীকে বলিও, যদি পরলোক থাকে, সেই লোকে ওরীতাবে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

হরমণি অনেক আকিঞ্চন করিল, সুশীলচন্দ্র জল বিন্দু পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলেন না। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হরমণি বাহির হইয়া গেল। সাধারণ দাসীদের ন্যায় কাঁদিয়াই হরমণির স্নেহ-প্রকাশ শেষ হইল। সুশীলের বিষয়ে কাহাকেও কিছু না বলিয়া হরমণি আহারান্তে যেমন প্রত্যহ শয়ন করিয়া থাকে, তেমনই শয়ন করিল। সুশীলচন্দ্র দ্বাররুদ্ধ করিলেন, শয়ন করিলেন না, বিশ্রামের ইচ্ছাও হইল না, অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত গৃহের মধ্যে ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করিলেন। জীবনে শান্তি নাই। অত অল্প বয়সে মনে মনে সিদ্ধান্ত হইল, নরলোকে জীবনে শান্তি নাই।

সময় নিশীথ। সুশীলচন্দ্র গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া। কত কি চিন্তা, কত কি বৈরাগ্য তাহার মনে আসিতেছে, যাইতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, চঞ্চল-বায়ু-সঞ্চী সাগর-তরঙ্গের ন্যায় কে তাহা গণনা করে।

রজনী তৃতীয় প্রহর। সুশীলের নয়নে অল্প অল্প তন্দ্রার আবেশ আসিল। শয়নে আবেশ হয়, ইহাই সকলে জানেন, কিন্তু সুশীলচন্দ্র শয়ন করেন নাই, বিশ্রামদায়িনী নিদ্রা নিকটেও আইসেন নাই। না নিদ্রা, না তন্দ্রা, তথাপি সুশীল স্বপ্ন দেখিতেছেন, আকাশ নীলবর্ণ জলরাশি, তাহার উপর একটী প্রস্ফুটিত নীলপদ্ম। তাহার উপর একটী পদ্মমুখী কামিনী। পদ্মটী ক্রমে ক্রমে ভাসিতেছে,

জলে জলে ডুবিতেছে। কবিকঙ্কণে শ্রীমন্ত যেমন কালিদহে কমলে কামিনী দর্শন করিয়াছিলেন, আজ রাত্রে দীপচাঁদ গোস্বামীর পুত্র সুশীলচন্দ্র গোস্বামীর সেইরূপ জাগ্রত স্বপ্নে কমলে কামিনী দর্শন।

নিশা প্রায় অবসান। আকাশে চন্দ্র ছিলেন কি না, মেঘে অন্ধকারে সুশীল তাহা দেখেন নাই। সেই নিস্তব্ধ রাত্রে সুশীলচন্দ্র গৃহদ্বার মুক্ত করিয়া রাজপথে বাহির হইলেন। ঊষার আবরণে ধরণী তখন অল্প অল্প অন্ধকার। সুশীলচন্দ্র কোন পথ দিয়া কোথায় গেলেন কেহই দেখিলেন না। কেহই জানিলেন না। প্রভাতে গোস্বামী-পুরী অন্ধকার।

হিন্দু শাস্ত্র রত্নাকর। এই শাস্ত্রের দেব দেবী মুনি ঋষি সময়ে সময়ে, ভক্তজনকে দেখা দিয়া পলকের মধ্যে যেমন লুকাইয়া যাইতেন, সুশীলচন্দ্রও তেমনি ঊষার অন্ধকারে লুকাইয়া গেলেন। গৃহে হাহাকার পড়িল। এক মাস কেহ কিছু সন্ধান পাইলেন না। হরমণি ওরে কোন কথা বলিল না। অনেক অনুসন্ধান হইল, অনেক দিকে অনেক লোক গেল, সমস্ত চেষ্টাই বিফল। হালাতে সমুদ্রযাত্রী এক কাণ্ডারী আসিয়া গোস্বামীকে সংবাদ দিল, সাগর-সঙ্গমের পশ্চিমে স্রোতে আকণ্ঠ-জলে সুশীলচন্দ্রকে উদ্দেশ্যে জপ করিতে সে দেখিয়া আসিয়াছে। সেই পর্য্যন্ত শেষ, তাহার পর আর অন্য কোন সংবাদ নবদ্বীপে পৌঁছে নাই।

কাণ্ডারীমুখে সংবাদ শ্রবণ করিয়া গোস্বামী নিঃসন্দেহ স্থির করিলেন, গণক ঠাকুরের কথা এতদিনে সত্য হইল। দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ গণনা কি কখনও মিথ্যা হয়। শিশুকালে সুশীলচন্দ্র সমুদ্রে পড়িয়াছিলেন, সমুদ্র বোধ হয় দয়া করিয়া গ্রহণ করেন নাই; বিশেষতঃ সুশীলের সঙ্গায় তখন রক্ষা-কবচ ছিল। এখন কবচ-মুক্ত; এবারে সুশীলচন্দ্র নিশ্চয়ই আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে! এজন্মে আর তাহাকে প্রাপ্ত হইবার কোন উপায় নাই।

পুত্রশোকে দীপচাঁদ গোস্বামী সংসার-বিরাগী হইয়া দেশত্যাগী হইলেন। তাঁহার পত্নী সুশীলের শোকে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। কাত্যায়নীর বিবাহ হইল কিনা, তাহার সংবাদ নাই।

এক বৎসর গেল। আজমীরের পুষ্কর তীর্থে এক জন ভস্মভূষিত সন্ন্যাসী পরিভ্রমণ করিতেছেন। এক দিন সন্ধ্যাকালে তিনি সাবিত্রী পর্ব্বতের উপত্যকাভূমে উপবিষ্ট। ধ্যানযোগে নিমগ্ন। চক্ষে অনবরত বারিধারা। বক্ষঃস্থলে যুগলহস্ত অঞ্জলিবদ্ধ। যোগীবর যোগমগ্ন হইয়া ধ্যান করিতেছেন। যোগে ধ্যানে অশ্রুপাত

কেন? ঈশ্বরপ্রেমে? না, তাহা ত বোধ হয় না। মুখে দুই চারি বাক্য নির্গত হইতেছে। কি ধ্যান করিতেছেন? কয়েকটী বাক্য স্পষ্ট স্পষ্ট শ্রবণগোচর হইল। যোগী বলিতেছেন, "আমি মূঢ়, আমি বাতুল, মানুষ মরিলে কি হয়, জানিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, বাঙ্গালা বই অন্বেষণ করিয়াছিলাম। কিন্তু কোথায় সে তত্ত্ব পাইব? বনবাসী রামচন্দ্র মৃত পিতার সজীব মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। বেদব্যাস রাজা যুধিষ্ঠিরকে মৃত কৌরব বীরপুরুষগণের ও রণশায়ী কুরু সৈন্যগণের সজীব মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগের ন্যায় পুণ্যাত্মা নই, আমি কিরূপে পরলোকের গতি নিরূপণ করিতে সমর্থ হইব? পরলোকের গতি নিরূপণ অনেক দূরের কথা, আমার জীবিত পুত্র যৌবনারম্ভে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, বহু অনুসন্ধানেও তাহার নিরাকরণ করিতে পারিলাম না।" যিনি এই কথাগুলি বলিলেন, তিনি নবদ্বীপের বীরচাঁদ গোস্বামী।

আবার গোস্বামী যোগীবরের রসনায় তিনটি বাক্য উচ্চারিত হইল। "ধিক্ বাঙ্গালা বই।"

দশম পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট

"ধিক্ বাঙ্গালা বই।" আমাদিগেরও প্রতিধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয়, "ধিক্ বাঙ্গালা বই।" কিন্তু গোস্বামীর বাক্যে প্রতিধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয় না। বীরচাঁদ গোস্বামী বর্ত্তমান সময়ের অশীতি বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালা বই নিতান্ত সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস ও রমানন্দ দাস প্রভৃতি কবি-প্রণীত কতিপয় বৈষ্ণবগ্রন্থ, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত প্রভৃতি কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ তৎকালের বঙ্গীয়-কাব্য-সাহিত্য-ভাণ্ডারের আদরণীয় সম্পত্তি। সেগুলিকে কখনি ধিক্কার দেওয়া যায় না। বীরচাঁদ গোস্বামী বোধ হয় ভাবগ্রাহী নহেন, সেই নিমিত্তই অনভিজ্ঞের ন্যায় কহিলেন, "ধিক্ বাঙ্গালা বই।"

এখন বরং আমরাই বলিতে পারি, ধিক্ বাঙ্গালা বই। শ্রীরামপুরের মিশনরি সাহেবেরা, রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা

কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, নন্দকুমার কবিরত্ন, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু কালী প্রসন্ন সিংহ, ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বাবু দীনবন্ধু মিত্র, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, এবং বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি জীবিত ও মৃত প্রত্যেকার মহোদয়গণের যত্ন, উৎসাহ, ও অধ্যবসায়ে বঙ্গভাষা যদিও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, যদিও দিন দিন নগরে ও প্রদেশ মধ্যে অসংখ্য অসংখ্য বাঙ্গালা পুস্তক বিরচিত, অনুবাদিত হইয়া নগরীয় ও প্রদেশীয় অসংখ্য লোকের আলো করিতেছে, যদিও নিত্য নিত্য নানাবিধ সমাচারপত্রে রাশি রাশি বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচন ও বিজ্ঞাপন তাবে পাঠকমণ্ডলী চাপা পড়িয়া যাইতেছেন, তথাপি বিক্ বাঙ্গালা বই। অধিকাংশই অপাঠ্য। যথার্থ সারবান্ পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা সাধারণতঃ অঙ্গুলী দ্বারা গণনা করা যায়। অধিকাংশই অসার, অধিকাংশই অযথা অনুবাদ, অধিকাংশই উদ্ভিষ্ট, এবং অধিকাংশই চর্ব্বিতচর্ব্বণ।

বাজারে আজ কাল যাবতীয় নাটক ও উপন্যাসের ছড়াছড়ি। অকর্ম্মণ্য লোকেরা এই দুই শ্রেণীর পুস্তককে যাদুবিক ক্রীড়া-বস্তু সাজাইয়া লইয়াছে। বিদ্যালয়ের ছিদ্রেরাও নাটক উপন্যাস লিখিতে অসম সাহসে অগ্রসর। ফলতঃ এই দুইটী বিষয় এত শক্ত যে, প্রকৃতি-দেবীর পূর্ণ আরাধনা ভিন্ন কোন মতেই সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। উপন্যাসে কেবল গদ্য বিন্যাস করিলেই সাহিত্য-সমাজে গ্রন্থকার বলিয়া আদরণীয় হওয়া যায়, এইরূপ অনেকের সংস্কার। সেই ভ্রমাত্মক সংস্কারে কলিকাতায় বটতলা বাজার উজ্জ্বল করিয়াছে। বস্তুতঃ স্বভাবের সুচিত্র দেখাইতে না পারিলে, সজীব আখ্যায়িকা রচনায় হস্তক্ষেপ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তবে ঠাকুরমার "রূপকথা"গুলি পূজনীয় বর্জ্জনীয়।

উপন্যাস অপেক্ষা নাটক রচনা আরও কঠিন। নাটকে গ্রন্থকারের নিজের কথা একটীও থাকে না; সকল কথাই অপরের মুখে বলাইতে হয়। তাহার উপর দেশ কাল পাত্র সমন্বয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। কত জ্ঞান, কত অভিজ্ঞতা, কত বহুজ্ঞতা, কত চরিত্র দর্শন, এবং কতই সতর্কতা নাটকে প্রয়োজন, আধুনিক নাট্যকারেরা স্বপ্নেও তাহা বিবেচনা করেন না। নাটক-কার রাজা, নাটক-কার রাণী, নাটক-কার বিদূষক, নাটক-কার মন্ত্রী, নাটক-কার প্রতিহারী, নাটক-কার কঞ্চুকী, নাটক-কার দাসী, নাটক-কার ঋষি, নাটক-কার

প্রেমিক, নাটক-কার বিরহী, নাটক-কার বীর, নাটক-কার ভীরু, নাটক-কার সাধু, নাটক-কার চোর, নাটক-কার মানুষ, নাটক-কার রাক্ষস, নাটক-কার দেবতা, নাটক-কার দানব, নাটক-কার সব। তাঁহাকে সময়ে সময়ে সকল সাজে সাজিয়া আকাশে, মহীতলে, এবং রসাতলে বিচরণ করিতে হয়, সর্ব্বক্ষণ প্রকৃতির সহিত খেলা করিতে হয়, যাহার যেরূপ স্বভাব তাহার প্রকৃত অনুকৃতি দেখাইয়া দিতে হয়। যাহাতে এইগুলি থাকে, তাহার নাম নাটক। আজ কাল কেবল আমরা কতকগুলি বিকৃত-ক্রিয়া-সংযুক্ত পদ-বিন্যাস দর্শন করিয়া নাটক নামের সার্থকতা অনুভব করিতেছি। পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে এক জন বঙ্গীয় কবি নাটকের এরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া আক্ষেপ সহকারে কহিয়াছিলেন, "এ নাটক নাটক না বিটে।" বহুদিন পূর্ব্বে সেই কবির মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ঐ বাক্যটী আজিও বঙ্গীয় নাট্য-সংসারে অবর্ণ হইয়া উজ্জ্বল প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে।

ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ত কথাই নাই। বঙ্গভাষায় এই দুই বিষয়ের অস্তিত্ব আছে, একথা বলিলে স্পষ্ট মিথ্যা বলা হয়। ভাষার উৎকর্ষ সাধন অথবা অর্থলোভের অন্তরে যে কারণেই হউক, বিদ্যালয়ের বালকদিগের জন্য যে দুই এক খানির প্রকাশ দর্শন করা যায়, তাহা শুদ্ধ ইংরাজীর উদ্গীরণ মাত্র। ভারতবর্ষ এত বড় রাজ্য, এখানে এত লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন, সেই পৌরাণিক সামান্য মহাভারত ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের আর একখানিও ইতিহাস নাই! ইহা কি দেশের পক্ষে সামান্য লজ্জা? সামান্য কলঙ্ক? আজকাল বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে পঞ্চাধিক গ্রন্থকার প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস নেত্রগোচর হয়। সকলগুলিই ইংরাজী ইতিহাসের অবিকল অনুবাদ। ইংরাজ যেখানে ভুলিয়াছেন, ইংরাজ যেখানে যাহাকে ভাল বলিয়াছেন, ইংরাজ যেখানে যাহা নিন্দা করিয়াছেন, বঙ্গীয় গ্রন্থকারের অনুবাদিত ইতিহাসে ঠিক ঠিক তাহার প্রতিধ্বনি হইয়াছে। অনুকরণ অবশ্যই করণীয়। ভাল বিষয়ের অনুকরণ না করিলে কখনই সংশোধন, সংস্কার, অথবা উন্নতি হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য; কিন্তু অযথা অনুকরণ কিম্বা চিরকাল অনুকরণের সাধন, উভয়ই দোষাবহ; সেই জন্যই আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, "ধিক্ বাঙ্গালা বই!"

আর এক মহাদোষ। আজ কাল আমাদের সমাজের ঐশ্বর্য্যশালী বড় লোকেরা লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতে প্রায়ই ঘৃণা বোধ করেন। আলস্য, বিলাস,

দুখা জীবা, দুখা আমোদ তাঁহাদিগের অধিকাংশেরই একান্ত প্রিয়। লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতে তাঁহাদিগের যাহে যেন বাজ পড়ে। যাঁহারা সে চর্চ্চা রাখেন, তাঁহারা অবশ্যই সাধুবাদের পাত্র ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদিগের সংখ্যা এক সহস্রের মধ্যে একটী কি দুইটী অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়। গ্রন্থ প্রণয়ন করা এদেশের ধনবান লোকদিগের পক্ষে অত্যন্ত অপমানের বিষয়। তাঁহারা ভাবেন, কৃষি, বাণিজ্য, এবং গ্রন্থ প্রণয়ন নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র লোকদিগেরই কার্য্য, সম্ভ্রান্ত বড় লোকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে সম্ভ্রমের হানি হয়। এমন বিষম ভ্রম আর নাই। দেশের কথাটির উল্লেখ করাই এ পুস্তকের প্রসঙ্গাধীন : অতএব তাহাই আমরা সপ্রমাণ করিব। ইউরোপ খণ্ডের রাজা, ডিউক, লর্ড, আরল, ব্যারণ, নাইট, পীয়র প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ বহু সম্ভ্রান্ত লোকেরা কবি ও গ্রন্থকাররূপে গণনীয় হইয়া স্ব স্ব দেশের প্রচুর উপকার সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কাব্য-সাহিত্যের আলোচনায় বড় লোকের সম্ভ্রমের হানি হয়, যে দেশে এমন বড় লোক এবং এমন সম্ভ্রমের অবস্থান, সে দেশ যত শীঘ্র রসাতলে যায়, ততই মঙ্গল। তাদৃশ সম্ভ্রমকে আমরা দূর হইতে নমস্কার করিয়া বিদায় করিতে ইচ্ছা করি।

বাঙ্গালা বই দুর্নামগ্রস্ত কিন্তুক, আমরা তাহার যৎকিঞ্চিৎ কারণ নির্দ্দেশ করিলাম। যাঁহাদিগের সম্পত্তি, তাঁহারা গুণগ্রাহী হইয়া যত্নপূর্ব্বক দেশীয় ও জাতীয় কলঙ্ক মোচনে অগ্রবর্ত্তী হন, ইহাই প্রার্থনা।

সমাপ্ত

'দোষাবীর নামর যাত্রা'র লেখকের কোন নাম পাওয়া যায় না। প্রকাশক-রূপে অক্ষয়চন্দ্র ঘোষ নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। (তিনি নিজেই কি লেখক ?) 'নামর যাত্রা'র লেখক যে আরো কয়েকখানি বই লিখেছিলেন, গ্রন্থশেষে তার উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। সেই বইগুলির সন্ধান এখন পর্যন্ত আমরা কোথাও পাই নি। 'দোষাবীর নামর যাত্রা' বইখানির প্রকাশকাল বাংলা ১২৯১ সাল। পুনর্মুদ্রণের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কাছে ঋণ স্বীকার করি।

সম্পাদক

বাংলা সমালোচনা : পরিস্থিতি ও পরিত্রাণ

অরুণকুমার সিকদার

বৎসর দুই আগে একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিকে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ রচনার জন্য আমাকে এক বৎসর কালের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা সমালোচনা গ্রন্থের বেশীর ভাগ পড়তে হয়েছিল। বাংলা সমালোচনার দুর্বলতা সম্বন্ধে যে কথা প্রচলিত আছে সে কথা কতটা সত্য এবং আদৌ সত্য কি না তা সে সময় যাচাই করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। সে সময় তিনটি ব্যাপার চোখে পড়েছিল। প্রথমত, যাঁরা সাহিত্যের স্রষ্টা, গল্পকার ঔপন্যাসিক, তাঁরা কেউ-ই প্রায় নিজেদের শিল্প সম্বন্ধে ভেবেছেন এমন প্রমাণ কোন প্রবন্ধে রেখে যান নি। কবিরা এর ব্যতিক্রম। কবিরা নিজেদের শিল্প সম্বন্ধে সচেতন এবং কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন সেই সচেতনতার প্রমাণ বর্তমান কালের প্রায় প্রত্যেক প্রধান বাঙালী কবি রেখে গেছেন। তাঁদের মতামত, কবিতা সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা সামনে থাকায়, পাঠকের পক্ষে তাঁদের কবিতা পড়া, সমালোচকের পক্ষে তাঁদের কবিতা বোঝা সহজ হয়। কিন্তু ঔপন্যাসিক ও গল্পকারেরা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌন। তাঁদের রচনা এমনিতেই এত দ্রুত বিক্রিয়ে যায় বলে হোক বা প্রকাশকের তাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন রচনায় হস্তক্ষেপ করতে হয় বলে হোক তাঁরা, মনে হয়, তাঁদের শিল্প সম্বন্ধে কোন চিন্তার অবকাশ পান না। শিল্পের রূপ, তার বক্তব্য বিষয়, তার ভাষা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কোন চিন্তা বর্তমান কালের খ্যাতনামা জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকদের প্রভাবিত করেছে এমন উদাহরণ বড় দেখি না। অথচ যিনি স্বয়ং স্রষ্টা তাঁর সাক্ষ্য সাহিত্য-সমালোচনা ও উপলব্ধির ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান দলিল। প্রউস্ট্যে টলস্টয়, কাম্যু, এমন কি, কর্তার যদ্ নিজেদের শিল্পচিন্তা প্রবন্ধবদ্ধ করতে দ্বিধা করেন নি।

পূর্বোক্ত প্রবন্ধটিতে বলেছিলাম সাহিত্যের স্রষ্টারা যখন মূক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন সাহিত্যিক-নিন্দিত অধ্যাপকসম্প্রদায় সমালোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু এই ধন্যবাদ অবিমিশ্র নয়। কারণ শতকরা নব্বুই জন অধ্যাপকের সমালোচনা সাহিত্যপ্রেমের ফল নয়।

এই জাতীয় সমালোচনা গ্রন্থের অধিকাংশই ছাত্রছাত্রীর মুখ চেয়ে লেখা। যে সব সাহিত্যিকের রচনা পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত নয় তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা গ্রন্থ লিখে এই সব লেখকেরা মূল্য সময়ের অপব্যয় করেন না। কোন কোন প্রতাবশীল লেখক আবার কোন ঔপন্যাসিক কবি বা নাট্যকার সম্বন্ধে বই লিখে প্রতিপত্তির জোরে সেই সাহিত্যিককে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়ে নেন। এই জাতীয় বইয়ের বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে বাংলায় এম. এ. বা অনার্স পরীক্ষার্থীদের জন্য এই বইগুলি লেখা— সাহিত্যপ্রেমিক পাঠক পড়তে পারেন, কিন্তু তেমন মুষ্টিমেয় পাঠক এই গ্রন্থগুলির প্রধান লক্ষ্য নয়। শুধু ঈশ্বর কেন, অভিজ্ঞ লোক মাত্রেই জানে বাংলায় ডিগ্রি নিয়ে চাকরি পাওয়া কী দুরূহ ব্যাপার এবং বিদ্বান-সমাজে তার মর্যাদাই বা কেমন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেক বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বাংলায় এম. এ. এবং বি. এ. পরীক্ষা দেন— গ্রন্থের অধিকাংশ কলেজে না পড়ে পরীক্ষার্থী এবং এরাই সমালোচনার নামে সহায়ক পুস্তকের সব চেয়ে বড় ক্রেতা। এদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ আবার স্কুলে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকা. অনার্স ডিগ্রি পাবার উপর যাদের পদোন্নতি এবং বেতনবৃদ্ধি নির্ভর করে। এ ছাড়া সোস্যাল এডুকেশন প্রভৃতি নানা সরকারী প্রকল্পের ফলে মফঃস্বলে অনেক গ্রন্থাগার হয়েছে, জেলা ও মহকুমার সদরে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। এই সমস্ত গ্রন্থাগারে বই কেনার জন্য সরকার থেকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয় এবং ফলে পুস্তকের মধ্যে সাধারণ বেশ বড় অংশ গ্রন্থ-পুস্তক কিনতে হয় এবং ফলে, বেশ কিছু পরিমাণ সমালোচনা গ্রন্থ কেনা হয়ে যায়। বহু নূতন কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগারের প্রসারের ফলেও এই জাতীয় বইয়ের বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে গেছে। ফলে কোন রকমে ডিগ্রি নিতে উন্মুখ ছাত্র এবং ক্রমবর্ধমান নবসাক্ষর, অপরিণতবয়স্ক পাঠক ও অলস পাঠক, যাদের রুচি গড়ে ওঠার সুযোগ পায় নি, সেই পাঠকবর্গকে সামনে রেখে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে সব সাহিত্যসমালোচনা-গ্রন্থ লিখিত হয় তাদের গুণমূল্য সহজেই অনুমান করা যায়। বিবেকহীন প্রকাশক ও নির্বিবেক লেখক মিলে এই পাঠক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বাজারে যে জাতীয় বই ছাড়ছেন তাতে বাংলা সমালোচনা সংখ্যায় পুষ্ট হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু গুণে তার কোন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে না।

তৃতীয়তঃ আছে গবেষণার উদ্দেশে লেখা সমালোচনা গ্রন্থ। আমাদের

দেশে এই দুর্গতি সাম্প্রতিক। আমাদের দেশের খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ অধ্যাপনার দ্বারা খ্যাতি ও ছাত্রের হৃদয়ে অমরত্ব লাভ করেছিলেন। নিজেদের যোগ্যতায় ইয়ারতকে খাড়া রাখার জন্য তাঁদের ডক্টরেট ডিগ্রির কিংবা বাৎসরিক একটি করে গবেষণাগ্রন্থ প্রসবের প্রয়োজন হতো না। সেই সব প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের উত্তরাধিকার সম্ভবত শ্রীযুক্ত তারকনাথ সেন, শ্রীযুক্ত সুশোভন সরকার প্রভৃতির পরে একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন মার্কিনদেশে যে নিদারুণ দুর্গতি দেখা দিয়েছে— যার ফলে আমাদের দেশের শিক্ষকের বি. টি.-র মত কলেজের অধ্যাপকের পি-এইচ.ডি. আবশ্যিক— সেই বদ্ধমূল আমাদের দেশে সর্বব্যাপী হবে। কিছুদিন পূর্বে মার্কিনদেশী অধ্যাপক জাক্ বারজুন দুঃখ করে বলেছিলেন তৃতীয়শ্রেণীর গ্রন্থ-লেখিত গবেষকের মর্যাদা বাড়ায় সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সত্যকার শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়েছে। উক্ত দেশের 'Ph. D. industry'-র তুলনায় আমাদের দেশের ডি. ফিল. এখনো খুঁটির শিল্প মাত্র— কিন্তু সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পোষকতায় ফলে তার শ্রীবৃদ্ধির প্রভূত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বিলেতে বা মার্কিনদেশে, বিদেশী পত্রিকায় লেখা সত্য হলে, সাহিত্য-বিষয়ে গবেষকেরা বিপদে পড়েছেন কারণ হেনরি জেমস্ বা জেমস্ জয়স সম্বন্ধে যথেষ্ট লেখা হয়েছে, অন্য খ্যাতরাও বাকি নেই, এখন গবেষণায় হস্তক্ষেপমুক্ত কবি এবং সাহিত্যিক বড় বিরল হয়ে এসেছেন। এমন অবস্থা হয়েছে শেষ পর্যন্ত যে উনিশ শতকের খবরের কাগজে যে সব পত্র লেখক তার নানা বিষয়বস্তুর শতকরা হিসাব নিয়ে সংখ্যাতাত্ত্বিক গবেষণাকে সাহিত্যের গবেষণা বলে চালাতে হবে। গরীব বাংলা ভাষার সাহিত্যিকের সংখ্যা খুব বেশী নয়, ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্রুতগতিতে গবেষণার স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা চলতে থাকলে অচিরেই সেই সাহিত্যিকদের তালিকা যে শেষ হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। তখন ?

এই শ্রেণীর গ্রন্থ লেখকের 'ভক্তু মল্লিকের মত উন্নতির' পথকে যতই কুসুমাস্তীর্ণ করে দিক তাদের অধিকাংশের নিজস্ব মূল্য সামান্য। ঐতিহাসিক উপন্যাস বা প্রবন্ধ চৌধুরীর রচনাবলী সম্বন্ধে গবেষণার বই খুললে দেখা যাবে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উপন্যাস বা প্রবন্ধের সারাংশ— মূল বই না পড়ে যে মতামত দিতে চায় তার কাছে এই অসার অংশ প্রয়োজনীয় হতে পারে কিন্তু গবেষণাগ্রন্থে তার স্থান কেন, এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া দুষ্কর। বাংলা সাহিত্যের হাস্যরস সম্বন্ধে গবেষণা পুনরুক্ত হয়, তার মধ্যে দুকড়ি বালের লেখা সম্বন্ধে আলোচনা

থাকে না। মৃত জ্যোতিহীন অবসন্ন ভাষায় তথ্য সাজানো হয়, সিদ্ধান্ত হয়, কখনো যুক্তিহীন আত্মবাক্য উচ্চারিত হয় কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ও সাহিত্যপ্রেমের লক্ষণ প্রায়শ মেলে না। এই গবেষণাগ্রন্থগুলি সাহিত্যপ্রেমের জন্য বা বাস্তবিক অর্থে সাহিত্য-সমালোচনার জন্য লেখা হয় না, লেখা হয় ভবিষ্যৎ নির্মাণের সোপান হিসাবে। বাংলা দেশে সর্বক্ষেত্রে বর্তমানে যে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে আরোহণের নিদারুণ মোহ দেখা দিয়েছে, গবেষণা ও ডক্টরেট উপাধির সাহায্যে ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রয়াস সেই সামাজিক ব্যাধিরই একটি লক্ষণমাত্র। এই গবেষকদের মধ্যে দুটি শ্রেণী দেখা যায়। এক দল ব্যাপারটাকে বেশী মূল্য দেন না, ব্যাপারটাকে নিতান্ত উন্নতি সহায় হিসাবে গ্রহণ করেন এবং নিজেদের সাহিত্যরুচি এবং বোধ ইত্যাদি আপাতত প্রচ্ছন্ন রেখে গবেষণা-পদ্ধতির প্রচলিত রসায়নের প্রয়োগে একটি থিসিস রচনা করেন। নিতান্ত না করলে সাংসারিক জীবনে চলে না তাই তাঁরা নিজেদের এই ব্যাপারে ব্যাপৃত করেন। কিন্তু অপর দল, গরিষ্ঠদলের মধ্যে এই রসবোধও নেই। তাঁরা সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্ব দেন এবং তার কারণও স্পষ্ট, কেননা একমাত্র এই গবেষণালব্ধ উপাধিতেই তাঁরা মূল্যবান। যে গবেষণা মর্যাদার একমাত্র ভিত্তি তাকে গুরুত্ব না দেবার অর্থ নিজেদের ভিত্তি নাশ করা। বলা যায়, ব্যবসায়িক উদ্দেশে লেখা সমালোচনা গ্রন্থ এবং ডিগ্রি লাভের উদ্দেশে লেখা গবেষণার বই বাস্তবিক সমালোচনা নয়। কারণ সত্যকার সমালোচনার লক্ষণগুলি সেখানে অনুপস্থিত। সাহিত্য-প্রেম থেকে তার জন্ম নয়, পাঠকের রুচি তৈরির দায়িত্ব সে পালন করে না, সাহিত্যের স্থান স্থির করায়, ব্যাখ্যা বা রসোপলব্ধিতে সাহায্য করে না।

কিন্তু তাই বলে বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্র এক দিগন্ত-বিস্তীর্ণ বন্ধ্যা মরুভূমি নয়, একেবারেই যে কোন ফসল এখানে ফলে না তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় কচিৎ কদাচিৎ যে ভালো সমালোচনা প্রকাশিত হয় তা প্রকাশিত হয় কোন সাহিত্যপত্রে প্রবন্ধ আকারে। মূলকার বইয়ের আকারে ভালো সমালোচনা পাওয়া যায় না বললেই হয়— যে সব ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ইতিহাস, কিছু প্রাসঙ্গিক কিছু অপ্রাসঙ্গিক নির্বাচিত পরিবেশ বা সামাজিক পশ্চাৎপট বর্ণনা, কিছু লেখকের জীবনকথা, কিছু তথ্য, কিছু তত্ত্ব। সাহিত্যরুচি যাঁরা তৈরী করেছেন, নূতন সমালোচনা পদ্ধতির যাঁরা প্রবর্তনা করেছেন, ম্যাথু আর্নল্ড, এলিয়ট, তাঁদের কোন সমালোচনার বই লিখতে বসেন নি— তাঁরা সাহিত্যপত্রিকায় এক-একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, সেইগুলি পরে প্রবন্ধ

হয়েছে। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সমালোচনামূলক রচনাগুলিও তাই। রবীন্দ্রনাথও নানা সময়ে সাহিত্যবিষয়ে ভাবনাগুলি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধাবলীতে বিবৃত করেছিলেন— পরে সেইগুলি নানা গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কখনো বুদ্ধদেব বসু যখন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসমালোচনা লেখেন তখনও তা প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হয়ে পরে পুস্তকে সংকলিত হয়। মূলকার গ্রন্থ গবেষণার উপযুক্ত বাহন হতে পারে কিন্তু মনে হয় প্রবন্ধই সমালোচনার প্রকৃষ্ট বাহন। বাংলায় যে এই জাতীয় প্রবন্ধ বেরোয় না তা নয়।

তবে কম বেরোয়। তাছাড়া ভালো সমালোচনা বের হওয়া এখানে স্বাভাবিক বা প্রত্যাশিত নয়,'এই আবির্ভাব আকস্মিক। ফলে, ভালো এবং মন্দরাচ্যের মধ্যে পার্থক্য এত দুস্তর যে সহজেই বোঝা যায় এখন পর্যন্ত সমালোচনায় কোন মানদণ্ড দাঁড়িয়ে যায় নি। এখানেই বাংলা সমালোচনার প্রধান দুর্বলতা এবং এই দুর্বলতার কারণ, সমালোচনা যে তথ্যের ভিত্তির উপর দাঁড়ালে সবল ও সার্থক হয় সেই তথ্যের ভিত্তিনির্মাণে আমাদের আলস্য। একথা ঠিক যে কবিতা, উপন্যাসই সমালোচনার মূল বিষয়, প্রাথমিক লক্ষ্য। একথাও ঠিক যে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যশিক্ষা দেবার সময়, এই প্রাথমিক লক্ষ্যের কথাই ভুলে যাওয়া হয়। কিন্তু তেমনি একথাও সত্য যে কবিতা বুঝতে গেলে, তার রসোপলব্ধি করতে গেলে, তার তাৎপর্যের স্তরসমূহের জটিল বিন্যাস অনুধাবন করতে গেলে কবিতার পদে পদে ইঙ্গিতে স্তবকে মিলে আমাদের নিবদ্ধ-দৃষ্টি হওয়া যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন আরো কতকগুলি প্রাসঙ্গিক তথ্য জানা। কারণ একটি কবিতাকে কবির অন্য কবিতা থেকে, কবির জীবন ও ব্যক্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার মধ্যে শুদ্ধতা থাকতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণতা থাকে না। তাই সাহিত্যই যে সাহিত্যসমালোচনার লক্ষ্য,— কবির জীবন নয়, দেশকালের ইতিহাস নয়, এই কথা মনে রেখে সেই সাহিত্যবোধকে সাহায্য করে যে তথ্যাবলী তার সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে। এই পরিচয় বিনা সাহিত্য-সমালোচনা নিরালম্ব হয়ে যায়। সমালোচনার ক্ষেত্রে এই অপ্রাথমিক বিষয়ের অবতারণাকে বিদ্রূপ করে যদিও এলিয়ট বলেছেন, 'the discovery of Shakespeare's laundry bills would not be of much use to us,' কিন্তু একথা ঠিক যে অবান্তর তথ্য কোন কাজে না লাগলেও প্রাসঙ্গিক তথ্য সমালোচনার প্রাথমিক উপাদান যে কাব্য উপন্যাস বা নাটক তার উপলব্ধিতেই সাহায্য করে। সমালোচনার প্রাথমিক

উপাদান এই তথ্যগুলি নয় কিন্তু সহায়ক হিসাবে এদের মূল্য যথেষ্ট। বাংলা সমালোচনার দুর্বলতার প্রধান কারণ এই সুশৃঙ্খল তথ্যাবলীর অভাব— এই অভাবেরই ফলে বাংলা সমালোচনা হয় আপাতঃ, অনুমানাশ্রিত।

আমাদের মধ্যে যারা হিন্দু তারা ধর্মের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাপূজক হলেও কোন এক বিচিত্র কারণে ব্যক্তির ব্যাপারে প্রতিষ্ঠাপূজক নই। যে কারণে ভারতীয়গণ ইতিহাস রচনায় বিমুখ ছিলেন সেই কারণ এখনো সক্রিয় কিনা জানি না। অথবা এই ঘটনা কি দুর্বল জাতীয় বিনয় বা ত্রীড়ারই প্রমাণ— যে কোন কারণেই হোক জীবনীরচনা আমাদের অভ্যাসগত হয় নি। উনিশ শতকে কিছু ভালো আত্মজীবনী আমরা পেয়েছিলাম— দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, নবীন সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ইত্যাদির। যদিও ব্যক্তিগত ব্যাপারে ত্রীড়া সব সময় এঁরা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, তবু যা পেয়েছি তার জন্য আমরা ধন্য বোধ করি। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে ছেলেবেলার অনেক কথা অঙ্কিত রেখে দিয়েছেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠে তার মূল্য যে অসামান্য তা পাঠকমাত্রেই জানেন। কিন্তু দেবেন্দ্রের দ্বিতীয় কোন জীবনীর কথা জানি না, বিহারীলালের কোন জীবনী নেই। জীবনতথ্যের অভাবে কবিতার অখণ্ড মনোযোগ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না বলে কবিতাপাঠ হয়তো নিবিড় হয় কিন্তু সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। বুদ্ধি এত সহজে ক্ষান্তি মানে না, সে জানতে চায়, বিহারীলাল কী ভাবে কৃত্রিম মহাকাব্যের প্রভাব এড়িয়ে গেলেন, কাব্যসম্বন্ধে তাঁর কোন মতামত ছিল কি না, ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে কবিজীবনের সম্পর্ক কেমন ছিল। শাসক, অর্থনীতির ঐতিহাসিক, বেদের অনুবাদক, ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের বিচিত্র বহুমুখী জীবন অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় কোন জীবনী এখনো লেখা হলো না। উনিশ শতকের সাহিত্যিকদের কথা ছেড়ে দিই— তাঁদের পরিচিতজন এখন কালগ্রাসে, তথ্যপঞ্জী হারিয়ে গেছে, পারিবারিক কাগজপত্র তাপ-শৈত্য-আর্দ্রতা ও কীটের প্রকোপে এতদিনে বিনষ্ট। কিন্তু অতুলপ্রসাদ ও শরৎচন্দ্র তো বহুদূর কালের নন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস সম্বন্ধে মতামতের তারতম্য হতে পারে, কিন্তু তিনি যে একজন প্রধান সাহিত্যিক, তাঁর জীবন যে রোমাঞ্চকর এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সম্প্রতি কিছু কিছু গালগল্প তাঁর সম্বন্ধে প্রকাশিত হলেও তথাপিও তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী আজো প্রকাশিত হয় নি। যে সমস্ত কবি বা লেখক অতি-সম্প্রতি গত হয়েছেন তাঁদের পরিচিতজন অনেকজন এখনো জীবিত, সেই সাহিত্যিক সম্বন্ধে তাঁদের স্মৃতি এখনো সহজলভ্য, পারিবারিক

কাগজপত্র পাণ্ডুলিপি এখনো উদ্ধারের অতীত হয়ে হারিয়ে যায় নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বর্তমানকালের অনেক লেখকের জীবনী লিখিত হলো না, কেউ যে লেখার উৎসাহ বোধ করছেন তারও প্রমাণ পাই না। অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত জীবনীটি এতোই ক্ষুদ্র যে তাতে বরং আরো অতৃপ্তি জাগে। প্রমথ চৌধুরীর একটি ক্ষুদ্র আত্মজীবনী-মাত্র আছে। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, ঠাকুর ও চৌধুরী পরিবারের কাছে প্রমথ চৌধুরীর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর উপাদান নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু তাঁর জীবনী আজো লেখা হলো না। বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ অতি-সম্প্রতি গত হয়েছেন। জীবনীগত তথ্যের অভাবে বিভূতিভূষণের নির্জন মন ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপক্ষপাত নির্মোহ চিকিৎসকের দৃষ্টি কোন উৎস থেকে এসেছিল তা জানার সুযোগ পাই না। বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বতন্ত্রধর্মী নিলিপ্ততার কোন কারণ ব্যক্তি-ইতিহাসে ছিল কিনা জীবনীর অভাবে তা জানার উপায় নেই। একই সঙ্গে যে মানুষ হনুমানের স্বপ্ন ও বৃদ্ধির মার্চের সৃষ্টা, অভিধান-সংকলয়িতা, রামায়ণ, মহাভারত ও মেঘদূতের অনুবাদক, রাসায়নিক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সেই রাজশেখর বসুর এত বিচিত্র ও বহুমুখী জীবন সম্বন্ধে জীবনীকারের উৎসাহ জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁর গদ্যরচনা-সমূহের কোন কোন আলোচনা পেলেও তাঁর জীবনী রচনায় কেউ উৎসাহী হয়েছেন এমন প্রমাণ মেলে না। এই আপাত বহুধাবিভক্ত জীবনের মধ্যে কোথাও ঐক্য ছিল কিনা, এই কথা আমরা জীবনীকারের কাছে জানতে চাই। নানান-সংস্করণ শ্রেষ্ঠ কবিতার পিছনে যে জীবনীসত্ত্বা আছে তা ছাড়া জীবনানন্দের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এমন কি কবিতাগ্রন্থগুলিতে কবিতা কালানুক্রমে সাজানো নেই, একই কালের লেখা কবিতা নানা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই রকম অব্যবস্থিত অবস্থা হওয়ায়, জীবনী জানা না থাকায় সমালোচকের পক্ষে তাঁর কবিতার বিবর্তন, প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাওয়া প্রায় হঠকারিতা হয়ে দাঁড়ায়— ভাষা ও ইমেজ বিষয়ের ক্ষেত্রে কী তিনি বর্জন বা অর্জন করছেন সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে যাওয়া দুঃসাহসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন কোন জীবনীকারের হাতে হয়তো এই নিরাসক্ত কবির মনস্তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হতো, যার অন্তরায় গোপন উৎস থেকে এই নিরাশাব্যঞ্জক কবিতাগুলির জন্ম। সুধীন্দ্রনাথের জীবনীরচনায় উৎসাহ বোধ করার মত যথেষ্ট কারণ আছে। বিরোধিতাপ্রিয় দার্শনিক পিতা,

নটশ্রেষ্ঠ পিতৃব্য, খাস্তগীর পরিবার, বারাণসীতে শিক্ষা, বিচিত্র প্রতিষ্ঠানে কর্মগ্রহণ, রবীন্দ্রসান্নিধ্য, ইয়োরোপ ও মার্কিনদেশ ভ্রমণ, পরিচয় পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘকাল সম্পাদনা, দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ— ইত্যাদি উপাদানের সমবায়ে একটি বিস্ময়কর জীবনী রচিত হতে পারে। তাঁর আত্মীয় বন্ধুজন এখনো জীবিত— উপকরণের কোন অভাব হবে না। যদি সেই জীবনী রচিত হয় তাহলে হয়তো তাঁর কবিতা পড়তে গেলে যে সব প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায় তার মীমাংসা হবে। আমরা যারা ইয়েটস্-এর কবিতার পাঠক তারা জীবনী থেকে কবিপ্রিয়া মড গনের কথা জানতে পারি, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এই বিদেশিনী কে, যার কেশের প্রতিচ্ছায়ায় সোমূলির মেঘ সোনা হয়ে যায়, সপ্তসিন্ধু পরপারে যার বাস, যার শেফালি অঙ্গুলি কৌতুকে কবির পথে একদিন বিচরণ করেছিল? জীবনী লেখার ক্ষেত্রে এক বিষয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে— জীবনীকারের ব্যক্তিগত সততা এবং তথানিষ্ঠা যেন তাকে আমাদের জাতীয় অতিবাদ-প্রবণতা থেকে রক্ষা করে। জীবনী লিখতে গিয়ে যেন দেবচরিত্র বা নরচন্দ্রমার চরিত্র অঙ্কন না করা হয়, যেমন মহত্ত্ব তেমনি দুর্বলতা যেন গোপন করা না হয়, বার্নসের চিঠিপত্র পড়ে বার্নসের চরিত্রে বায়রণ যে 'dirt and deity' একত্রে দেখতে পেয়েছিলেন, জীবনী যেন সাহিত্যিকের মানব-চরিত্র তেমনি সম্পূর্ণতার সঙ্গে 'warts and all' পরিস্ফুট করে।

যদিও সম্প্রতি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনীকে হেয় প্রতিপন্ন করার একটা ভাব দেখা দিয়েছে তথাপি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাঁরাই আলোচনা করেছেন তাঁরাই প্রভাতকুমারকে পুনঃপুন ধন্যবাদ না দিয়ে পারেন নি। প্রভাত-কুমার যে কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনী না লিখে দ্বারকানাথের পৌত্রের জীবনী লিখেছিলেন এও আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ কবিজীবনী রবীন্দ্রনাথ নিজেই জীবনস্মৃতিতে লিখে গিয়েছেন। আর কবিজীবনী লিখতে গেলে অতিরিক্ত কাল্পনিকতা প্রশ্রয় পাবার, লেখকের মনোমত ব্যাখ্যায়, লাভজনকভাবে হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু দ্বারকানাথের পৌত্রের জীবনী অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বহির্জীবন তথানিষ্ঠ হওয়া চাই, সেখানে কাল্পনিকতা বা জীবনীকারের ব্যক্তি-প্রবণতা প্রশ্রয় পাবার আশঙ্কা থাকে না। কবির কবিজীবন কবিতাতেই থাকে, জীবনীতে চাই ব্যক্তির ইতিহাস। অথচ জীবনীতে যে ব্যক্তি-ইতিহাস থাকে তাই আবার কবিতার উপলব্ধিতে সাহায্য করে, সমগ্র জীবনের সঙ্গে কবিতাকে যুক্ত করে', বহির্জীবনের সঙ্গে অন্তর্জীবনের সংযোগ

প্রতিষ্ঠা করে' এবং কবিতাসমূহের পারম্পর্য ও রচনাকালীন পরিবেশের বিবরণ দেয়। প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনীর কাছে এই সব কারণে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই বৃহৎ জীবনী আমাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রসাহিত্যের উপলব্ধিতে তার অনন্যসাধারণ মূল্য যোগা সত্ত্বেও, অন্যান্য কবির জীবনী রচনার কোন চেষ্টা হয় নি। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী তাঁর ভক্ত-বন্ধু লিখেছেন, মোহিতলালের বা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জীবনী কি লিখিত হবে না?

প্রতীচ্যে এমন ঘটনা কখনো ঘটে না। কবি বা সাহিত্যিকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর জীবনী প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে তাঁর জীবনের নতুন নতুন উপকরণ আবিষ্কৃত হতে থাকে— চিঠিপত্রের সংকলন বেরোয়, অপ্রকাশিত রচনাবলী প্রকাশিত হতে থাকে (যেমন হেমিংওয়ের বেরোল), পরিচিত জনের স্মৃতিকথা প্রকাশিত হয় (যেমন জয়সের ভাই লিখেছেন জয়েস সম্বন্ধে), —অবশেষে মৃত্যুর হয়তো পঁচিশ হয়তো পঞ্চাশ বছর পরে সংগৃহীত তথ্যাবলী ব্যবহার করে আসে নতুন জীবনী বেরোয়। এখানেই ক্ষান্তি নয়— আরো পরে কিছু কিছু সময়ের ব্যবধানে অধিকতর তথ্যসমৃদ্ধ নূতন জীবনী ছাপাখানা থেকে বেরিয়ে আসে। জাইলান টমাসের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁর বান্ধবজনের লেখা স্মৃতিকথা পুস্তকাকারে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর চিঠির সংগ্রহ বেরোয়, জীবনী বেরোয় এবং নূতন জীবনীর উপাদানও সংগৃহীত হতে থাকে। কিছুদিন আগে আণ্ডারসনের জীবনী প্রকাশিত হয়েছে, অতি-সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে রুপার্ট ব্রুকের জীবনী। এতেই প্রমাণিত হয় শুধু প্রধান-প্রধান সাহিত্যিক নয়, অপ্রধান সাহিত্যিকদের জীবনী লেখাতেও প্রতীচ্যের জীবনীকারগণ কতটা তৎপর। এ ছাড়া নূতন তথ্যানুসন্ধান সব সময় চলেছে। জনরাভের পোলদেশীয় পশ্চাৎপট সম্বন্ধে এতদিন অনেক কিছু জানা ছিল না। সম্প্রতি কিছুদিন আগে সেই বিষয় সম্বন্ধে নূতন তথ্যসম্বলিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী প্রকাশিত হচ্ছে, যদিও সম্পূর্ণ পত্র সংগ্রহ কতদিনে প্রকাশিত হবে বলা কঠিন। এই পত্রাবলী পড়লে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য উপলব্ধির পক্ষে এই চিঠিপত্রগুলি আমাদের কতটা সহায়তা করে। ছিন্নপত্রাবলী ব্যতিরেকে সমকালে লেখা গল্প এবং কবিতার উপলব্ধি যেন কিছুতেই সম্পূর্ণ হয় না। যে দেশে লেখকদের জীবনী পর্যন্ত লেখা হয় না সে দেশের সাহিত্যিকের পত্রসংগ্রহ প্রকাশিত হবে এ আশাও যেন বাতুলতা।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যে এই দায়িত্ব পালন করেন না তার একটা কারণ হয়তো পারিবারিক জীবনকে লোকচক্ষুর সামনে বে-আব্রু করার স্বাভাবিক সংকোচ। অন্য কারণ হয়তো প্রকাশকের অভাব। কিন্তু যদি মনে রাখা যায়, কবিসাহিত্যিকের জীবন জানতে চাওয়ার সঙ্গত দাবী আছে, কবি-সাহিত্যিকের কাছে তাদের আত্মীয়স্বজনের দাবী যতটা পাঠকের দাবী তার চেয়ে কম নয়, ইতিহাসের দাবীতে ব্যক্তিগত সংকোচ পরিহার প্রয়োজন— প্যাডনামার আত্মীয়বন্ধু হবার অপার সৌভাগ্যের জন্য এই নগণ্যার মূল্য দিতেই হবে— তাহলে বোধহয় লেখকের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ডায়েরি প্রকাশে কোন সংকোচ থাকবে না। লেখকের ব্যক্তিসত্তার চেয়ে তাঁর লেখকসত্তার প্রতি আনুগত্য বেশী ছিল বলেই রচনাবলী অগ্নিতে সমর্পণ করার সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ব্যাস্ত্র ব্রড কাফকার রচনাবলী প্রকাশ করেছিলেন— বন্ধুর নির্দেশের চেয়ে মহাকালের বিচারের উপরে তিনি বেশী আস্থা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু বায়রণের বন্ধু আত্মীয় শুভানুধ্যায়ীগণ তিন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পরিবারবর্গকে রক্ষার উদ্দেশে তাঁরা ভবিষ্যৎকালকে বঞ্চিত করেছিলেন— বায়রনের আত্ম-জীবনীর পাণ্ডুলিপি জলন্ত চুল্লিতে নিক্ষেপ করেছিলেন। ভবিষ্যৎকাল সেই শুভানুধ্যায়ীদের ক্ষমা করে নি। ডরোথির জার্নাল যদি অগ্নিদগ্ধ হতো তাহলে কী প্রচণ্ড ক্ষতি হতো তা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যপাঠক মাত্রেই জানেন। আসলে কোনটি মূল্যবান কোনটি অকিঞ্চিৎকর তার বিচার বর্তমানকাল সব সময় সঠিকভাবে করতে পারে না। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতের উপরে সে বিচারের দায়িত্ব অর্পণ করাই ভালো। ক্যাথরিন ম্যানসফিল্ডের আর্গাস এমন কি স্বামীকে লিখিত চিঠিপত্রের সংগ্রহ প্রকাশ করার স্বামী মিডলটন মারেকে ক্যাভ্‌ এই নিন্দায় নিন্দিত হতে হয়েছিল কিন্তু মিডলটন মারে ঠিকই করেছিলেন— স্বামী হিসাবে তাঁর যা দায়ী লেখিকার কাছে পাঠক-সমাজের দায়ী যে তার চেয়ে বেশী বই কম নয় তা তিনি জানতেন। ব্যক্তিগত অস্বস্তির কারণ সত্ত্বেও স্ত্রীর লেখিকা পরিচয় পরিস্ফুট করার জন্য তিনি দাম্পত্যজীবনকে সর্বসাধারণের কাছে নগ্ন করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। ডি. এইচ. লরেন্সের পত্রাবলী দুই খণ্ডে সংগৃহীত হয়ে কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। ইয়েটস্‌, অস্কার ওয়াইল্ড, জয়সের পত্রাবলীর সংকলন-গ্রন্থ কিছুকালের মধ্যে একে একে প্রকাশিত হয়েছে। এই সব সাহিত্যিকের রচনাবলী উপলব্ধির পক্ষে এই পত্রাবলীর মূল্য, বলা বাহুল্য, অসাধারণ। বার্ণার্ড শ মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে টি. ই. লরেন্সকে

লেখা তাঁর স্ত্রীর চিঠি দেখেন এবং দেখে বিস্মিত হন এই কারণে যে নিজের স্ত্রীর জীবনের এই একটি দিক এতদিন তাঁর সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। এই অবস্থায় 'ন নিশ্চয়ই অসম্মতি বোধ করেছিলেন কিন্তু তিনি ই. ই লরেন্সের উদ্দেশে লেখা তাঁর স্ত্রীর এই পত্রগুচ্ছের মুদ্রণ বন্ধ করার কোন চেষ্টা করেন নি। খ্যাতনামাকে তার শিল্পের দামেই এই বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়। ব্যক্তিগত সম্মতি-অসম্মতির চেয়ে সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিক দাবী অনেক বড়। দীর্ঘকাল পূর্বে যে সব বাঙালী সাহিত্যিক গত হয়েছেন তাদের পত্রাবলী দুর্লভ হতে পারে, কিন্তু যাঁরা সম্প্রতি গত হয়েছেন তাদের পত্রাবলী আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের কাছে নিশ্চয়ই সঞ্চিত আছে। সেগুলি অবিলম্বে প্রকাশের ব্যবস্থা করা দরকার। না হলে সাহিত্য-সমালোচনার এই মূল্যবান সহায়ক উপাদান চিরকালের মত হারিয়ে যাবে। অজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের পত্রাবলীর কিছু সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন, অনেক পরে অনুপলুপ্ত মধুপর্ক নামে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় জীবনানন্দের কিছু পত্র ছাপা হয়েছিল। কিন্তু এই রকম খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশের কথা বলছি না, আমি বলছি কালক্রমে এবং প্রাপকক্রমে একটি সম্পূর্ণ সংকলনের কথা। বেশ কিছুদিন আগে মনে পড়ে মাসিক বসুমতী পত্রিকার কোন একটি সংখ্যায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল প্রায় সবই ব্যবসায়িক চিঠি—লেখকের সঙ্গে প্রকাশকের টাকা-পয়সা নিয়ে যেমন চিঠি-পত্র আদান-প্রদান হয়। আমি এই জাতীয় চিঠির কথা বলছি না, আমি বলছি মধুসূদনের মত পত্রাবলীর কথা (এই পত্রাবলীর একটি সংকলন সম্পাদনা করে ক্ষেত্র গুপ্ত আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন) যার মধ্য দিয়ে লেখকের ব্যক্তিত্ব এবং রচনাবলীর সৃষ্টিক্রিয়া পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আমি বলছি সেই জাতীয় চিঠির কথা যেমন চিঠি ওয়ার্ডসওয়ার্থ উলফ, ও লিটন স্ট্রাচি পরস্পরকে লিখেছিলেন, যেমন চিঠি ফ্লোবেয়ার, জর্জ সাঁদ্ বা অন্যান্য অনেক পত্র-প্রাপককে লিখেছিলেন—অর্থাৎ যে চিঠির মধ্যে আত্মালোচন থাকে, ব্যক্তি-পুরুষের আলো যার মধ্যে জ্বলতে থাকে।

সমালোচকের যেমন সৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় প্রয়োজন—সেই নিবিড়তর পরিচয়ই সমালোচনা—তেমনি তার চাই সৃষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে, সাহিত্যিকের রচনাকালীন মানসের সঙ্গে পরিচয়। শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত একটি প্রবন্ধে বালতী পুঁথির উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের নেপথ্যভূমির কিঞ্চিৎ পরিচয়

আমাদের দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাটাকুটিতে ভরা কোন কোন পৃষ্ঠার ফোটো প্রতিলিপি, জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা বা সুধীন্দ্রনাথের কাব্যসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত তাঁদের পাণ্ডুলিপির ফোটো-প্রতিলিপি আমাদের আগ্রহ জাগায়—যে আগ্রহ শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখতে বাধ্য হই আমরা। আমাদের দেশ ধনী মার্কিন দেশ নয়, সুতরাং কবিসাহিত্যিকের পাণ্ডুলিপির ফোটো প্রতিলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবে এ আশা সম্পূর্ণ দুরাশা। কিন্তু রবীন্দ্র-শতবর্ষ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির এমন একটি ফোটো প্রতিলিপি গ্রন্থ যে কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে এবং বিশ্বভারতীর ব্যবস্থাপনায় করা যেত না এমন মনে হয় না। আমাদের দেশের প্রতিকূল আবহাওয়ায় পাণ্ডুলিপিগুলি নষ্ট হয়ে যাবার পূর্বে অন্তত রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, যেখানে একটী শব্দের পরিবর্তনই বিরাট পরিবর্তন, একটী ফোটো প্রতিলিপি গ্রন্থ প্রকাশ করা উচিত। রোটেনস্টাইনের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় গীতাঞ্জলির ইংরাজি বা বাংলা পাণ্ডুলিপি তাঁর কাছে ছিল, এখন সম্ভবত তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধিকারে আছে। রোটেনস্টাইন জানিয়েছেন ইয়েটস্ ইংরাজি গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিতে সামান্য কয়েকটি শব্দ পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। অথচ ইয়েটস্ এর জীবনীকার মোর্ জানিয়েছেন এবং এইরকম ধারণা ভারতবর্ষেও বহুল প্রচলিত আছে যে ইয়েটস্ ইংরাজি গীতাঞ্জলি নিজে সম্পূর্ণ পুনর্লিখন করেছিলেন। ইংরাজি ও বাংলা গীতাঞ্জলির ফোটো-প্রতিলিপি প্রকাশিত হলে এই ধারণার চিরস্থায়ী নিরসন হতো। যদি মনে রাখি রবীন্দ্রনাথই আমাদের আধুনিক-কালের সব চেয়ে বড় সাংস্কৃতিক সম্পদ তাহলে এই কারণে অর্থব্যয় বৃথা বলে মনে হবে না। সারা ভারতবর্ষে একদিন বৈশাখ উপলক্ষে অর্থহীন বক্তৃতাবহুল সভা হয় এক বছর সেই সব সভা বন্ধ রেখে সেইজন্য যে অর্থ ব্যয়িত হতো তার দ্বারাই বোধহয় এই আপাত অসম্ভব পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের আশা করা যায় অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তা করা যায় না। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে, এমন কি রবীন্দ্র-নাথেরও কবিতা ব্যতীত অন্যান্য পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারেন বড় বড় প্রতিষ্ঠান। কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের পক্ষে জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য কবিদের, বিভূতিভূষণ প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের পাণ্ডুলিপি মাইক্রো-ফিল্মে নিবদ্ধ করা কিছু কঠিন কাজ নয়। এতে খরচ কম, আবহাওয়ার বিরুদ্ধতায় নষ্ট হওয়ার ভয় নেই, সংরক্ষণের জন্য জায়গাও বেশী লাগে না। রবীন্দ্রনাথের

সমস্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, যা নিজের অধিকারে আছে কিংবা স্বদেশে-বিদেশে ব্যক্তিগত মালিকানায় আছে, তার মাইক্রো-ফিল্ম্ করিয়ে রাখা বিশ্বভারতীর কর্তব্য। নচেৎ ভবিষ্যতে কীটদষ্ট, আবহাওয়ার বিনষ্ট পাণ্ডুলিপির দিকে তাকিয়ে দুঃদৃষ্টির অভাবের জন্য দলাদলি করাঘাত করতে হবে। মাইক্রো-ফিল্ম্ করা থাকলে সত্যকার গবেষক সেগুলি ব্যবহার করতে পারবেন এবং সৃষ্টির শিহরনে যে যন্ত্রণা যে হতাশা যে আবিষ্কার এবং যে উল্লাস তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হতে পারবেন, কিছুটা বিনয়ের শিক্ষা নিতে পারবেন।

পাণ্ডুলিপির ফোটো-প্রতিলিপি বা মাইক্রো-ফিল্মের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে আয়ত্ত করা প্রয়োজন। এই সঙ্গে প্রয়োজন একই রচনার বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত পাঠান্তরের বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ। ইয়েটস্ এর কবিতার Variorum Edition যখন দেখি তখন খুবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই রকম একটি সংস্করণ কত প্রয়োজনীয়। ইয়েটস্-এর কবিতার এই সংস্করণ হাতের কাছে থাকে বলে জানতে পারি আদিতে যে পঙ্‌ক্তিগুলি ছিল—

> And then you come with those red mournful lips,
> And with you came the whole of the world's tears,
> And all the trouble of the labouring ships,
> And all the trouble of your myriad years.

তারই অন্তিম রূপ হলো—

> A girl arose that had red mournful lips,
> And seemed the greatness of the world in tears,
> Doomed Like Odysseus and the labouring ships
> And proud as Priam murdered with his peers.

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দুটি রূপ অনুধাবন করলে কাব্যের ভাষা ও সঙ্গীত সম্বন্ধে কবির শিল্পদৃষ্টির যে বিবর্তন তা সহজে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথেরও বহু রচনার প্রথম প্রকাশিত রূপের সঙ্গে পরবর্তী রূপের অনেক ব্যবধান হয়ে গেছে। ইয়েটস্-এর মত ও রবীন্দ্রনাথেরও পাঠান্তর সমূহ সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে একটি সংস্করণ প্রকাশ করা প্রয়োজন। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ একই নাটক সামান্য পরিবর্তন করে অন্য নাম দিয়ে ছাপিয়েছেন, গল্পনাট্য চণ্ডালিকার সুর-যোজনার ফলে তার ভাষাগত পরিবর্তন হয়েছে, কোন সময়ে নাটকে গান যোগ করেছেন, কখনো বর্জন করেছেন, এক নাটকের গান অন্য নাটকে ব্যবহার করেছেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার পাঠান্তর-

পর্যায় পুলিনবিহারী সেন সেষ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। আমরা জানি 'বধূ, তোমায় সেষ যে না পাই' আদিতে ছিল 'ভালোবাসায় সেষ যে না পাই' জানি 'ধরা দিয়েছি লো আমি আকাশের পাখি' এই গানটি কবি ও কোমল কাব্যের একটি চতুর্দশপদীর প্রথম আট পদের ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ মাত্র, আমরা আরো জানি যে সেষ সপ্তক গ্রন্থের দশটি গদ্যকবিতার বহুপরিবর্তিত রূপও বর্তমান। এই রূপান্তরের ইতিহাস এবং উদাহরণ আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রন্থ-পরিচয় নামক সম্পাদকীয় অংশ থেকে জানতে পারি কিন্তু সব ক্ষেত্রে পাই না এবং একত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবেও পাই না। অথচ এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। সাহিত্যপরিষদ্ প্রকাশিত বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর প্রত্যেকটি বইয়ের শিরনে পূর্ব-পূর্ব সংস্করণের সংযোজনবর্জনের সমস্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। ইয়েটস্-এর মত রবীন্দ্রনাথও নিজের রচনার দুর্দম সংস্কারক ছিলেন। নাতানা-প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থে পাঠান্তর-তালিকা বিস্তৃত করে প্রকাশক আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। অন্যান্য সাহিত্যিকের রচনায় যেখানে আমরা এই ধরনের পৌনঃপুনিক সংস্কার লক্ষ্য করি সেখানেও এই জাতীয় পাঠান্তরসহ সংস্করণ প্রকাশ করা উচিত।

আর প্রয়োজন গ্রন্থ পঞ্জী বা বিবলিয়োগ্রাফি। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জী রচনা করতে গেলে যে সব তথ্য প্রয়োজন তার অধিকাংশ রবীন্দ্রজীবনী এবং প্রত্যেক গ্রন্থের সংশয় গ্রন্থ পরিচয়ে পাওয়া যাবে। সেই তথ্যাবলীকে ভিত্তি করে অচিরেই রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে হাত দেওয়া প্রয়োজন। অনেকে এই কাজ আংশিকভাবে করেছেন। যেমন প্রবন্ধনাথ বিশীর গ্রন্থের জন্য পুলিনবিহারী সেন রবীন্দ্রনাথের গল্পের এক বিবলিয়োগ্রাফি তৈরী করে দিয়েছেন। গ্রন্থপঞ্জীতে রচনার উৎস, প্রথম প্রকাশকাল, প্রথম প্রকাশ স্থান, প্রকাশক পরিচয়, মূল্য, পৃষ্ঠাসংখ্যা থেকে যাবতীয় তথ্য সংগৃহীত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনূদিত রচনাগুলির মধ্যে কোনগুলি রবীন্দ্রনাথের, কোনগুলি অন্যের অনুবাদ তার তালিকা দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি অনুবাদের সংক্ষিপ্ত তালিকা রুদ্র কৃপালানি-কৃত ইংরাজী জীবনের পরিশিষ্টে আছে। রবীন্দ্রনাথের বাংলা ও ইংরাজি রচনার পূর্ণাঙ্গতর তালিকা প্রস্তুত করেছেন পুলিনবিহারী সেন ও জগদিন্দ্র ভৌমিক সাহিত্য আকাদমি প্রকাশিত শতবার্ষিকী প্রস্তাবনিবেদন গ্রন্থে।

শ্রীযুক্ত সেন অপর একজনের সহযোগিতায় সাহিত্য আকাদমি প্রকাশিত Indian Literature পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের

ইংরাজী অনুবাদের এক তালিকা দিয়েছেন। কিন্তু এই তালিকাগুলির কোনটিতেই বিস্তৃত তথ্য নেই। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভারতের প্রাদেশিক ভাষা-সমূহে এবং অন্যান্য বিদেশী ভাষায় যে প্রচুর অনুবাদ হয়েছে তার কোন তালিকা এখনো পর্যন্ত চোখে পড়েনি। কোন প্রবন্ধ কোথায় কী উপলক্ষে ভাষণের জন্য লেখা, কোন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা, কোনটি বক্তৃতার অনুলিপি থেকে পরে প্রস্তুত হয়েছিল সেই সব তথ্যও গ্রন্থপঞ্জীতে থাকবে। একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধে প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার অনুলিপির এবং অনুলিপিকারদের একটি মূল্যবান তালিকা দিয়েছেন। নাটকের প্রকাশ ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন তার অভিনয়ের ইতিহাস, অন্যান্য রচনাবলীর ক্ষেত্রে নাট্যরূপান্তরের এবং সিনেমা-রূপান্তরের ইতিহাস। সঙ্গীতগুলির পরিবর্তন-ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন তাদের রেকর্ডিং-এর ইতিহাস। এই সর্বশেষ বিষয়ে কবিকথা নামক গ্রন্থে সন্তোষকুমার দে ও প্রশান্তবন্ধু ভট্টাচার্য অনেক মূল্যবান তথ্যপরিবেশন করেছেন। বাংলা গ্রন্থ-পঞ্জীর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য যোজনা অবিনাশচন্দ্র ঘোষালের শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ বিবরণী নামক পুস্তকটি। অত্যন্ত নৈপুণ্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে লেখক শরৎচন্দ্রের প্রবাসী-সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ এবং সন্নিবেশ করেছেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ শরৎচন্দ্রের কোন পাণ্ডুলিপির সন্ধান তিনি পান নি, এমন কি উক্ত রচনাবলীর প্রথম সংস্করণও তিনি দেখার সুযোগ পান নি। এই অনিবার্য সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও একটি পরম প্রয়োজনীয় কাজ লেখক সম্পন্ন করে শরৎচন্দ্রের ভবিষ্যৎ সমালোচকমাত্রের কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়েছেন। এই পুস্তকে শরৎচন্দ্রের সমস্ত গ্রন্থের পত্রিকায় ও গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশকাল, প্রকাশক-পরিচয়, মূল্য পৃষ্ঠাসংখ্যা, প্রাসঙ্গিক বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য তথ্য এবং কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া শরৎচন্দ্রের পূর্বে অগ্রকাশিত পত্রাবলীর একটি সংকলন, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির তালিকা এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ও বিদেশী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থসমূহের তালিকা এই গ্রন্থের মূল্য আরো বৃদ্ধি করেছে।

সাহিত্য-সাহিত্যিক সম্বন্ধে এই জাতীয় তথ্যসংগ্রহের কাজ অত্যন্ত নিয়মিত ও সংগঠিতভাবে করার প্রয়োজন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। অথোর ভিত্তি সুদৃঢ় করার কাজে যতদিন বাংলা সাহিত্যের সেবকরা ব্রতী না হচ্ছেন ততদিন বাংলার সমালোচনার দুর্বলতা দূর হবে বলে মনে হয় না। বাংলা দেশে এখন

কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান আছে। তারা যদি কর্মবিভাগ করে নিয়ে এই জাতীয় কাজে আত্মনিয়োগ করেন তাহলে মহা উপকার হয়। বড় সমালোচক হতে গেলে যে মননশক্তি প্রতিভা অধ্যয়ন এবং প্রগাঢ় ঐতিহ্য-পরিচয় প্রয়োজন তা সকলের থাকে না এবং না থাকলেও কিছু অপরাধের নয়। কিন্তু বিনয় শ্রম-ক্ষমতা এবং নিষ্ঠা থাকলে জীবনীরচনা, পত্রাবলীসংগ্রহ, গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত ইত্যাদি তথ্যমূলক কাজে স্থায়ী সাফল্য লাভ করা সম্ভব এবং সেই কৃতিত্বের মূল্য কিছুমাত্র কম নয়। এই কাজের জন্য কিছু অসাধারণ প্রতিভা প্রয়োজন হয় না, এই কাজ অনেকটা যান্ত্রিকভাবে করা যায়, কিন্তু ক্ষমতা ও সুস্থমন মনের অধিকারী হলে এই কাজে সাফল্য অর্জন সম্ভব।

সাহিত্যিকদের বন্ধুস্বজন ও উত্তরাধিকারীদের দায়িত্ব এই ব্যাপারে খুবই। যদি মৃত সাহিত্যিকের সাহিত্য ও জীবন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিজেরা সম্পাদন করতে পারেন ভালোই, নচেৎ সম্পাদনায় উৎসুক গবেষকদের হাতে সেই উপকরণগুলি অনায়াসে বিনা বাধায় তুলে দেওয়া উচিত। সবচেয়ে ভালো হয় যদি প্রতীচ্যের মত লেখকেরা বা তাদের উত্তরাধিকারীরা লেখকের কাগজ-পত্র সব নিঃস্বত্বে বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে দান করেন। ভবিষ্যৎ গবেষকের অপেক্ষায় তাহলে উপাদানগুলি সযত্নে রক্ষিত হতে পারে। প্রকাশকদের দায়িত্ব এই বিষয়ে কম নয়। অন্যান্য জনপ্রিয় গ্রন্থ ছাপিয়ে তাঁরা ব্যবসা করুন আপত্তি নেই, কিন্তু যে বিদ্যাচর্চার উপর তাঁদের ব্যবসায়িক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত সেই বিদ্যাচর্চার শ্রীবৃদ্ধির প্রয়োজনে এই জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশে তাঁদের অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন। বিশেষত যে সমস্ত লেখকের বই ছাপিয়ে প্রকাশক খ্যাত এবং লক্ষ্মীমন্ত হয়েছেন সেই সব লেখকের মৃত্যুর পর তাঁদের জীবনী লেখানো ও প্রকাশ করা, গ্রন্থপঞ্জী ও অন্যান্য তথ্যাবলী সংকলন করানো ও প্রকাশ করা তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। এই কাজ তাঁদের পক্ষে করাও সহজ এই কারণে যে জীবৎকালে তাঁরা লেখকের প্রকাশক ছিলেন বলে তাঁদের হাতে এখন সব তথ্য, পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র থাকে বা অন্যদের কাছে থাকে না। যে প্রকাশক রাজশেখর বসুর সমস্ত বই প্রকাশ করেছেন তাঁরা কি রাজশেখরের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশের দায়িত্ব নিতে পারেন না? বাংলার প্রকাশক সম্প্রদায় এই নৈতিক দায়িত্ব পালন না করলে পুনর্বার প্রমাণিত হবে যে তাঁরা নিতান্ত ব্যবসায়ীমাত্র, সাহিত্যসেবী নন। কিন্তু

এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব সবচেয়ে সর্বাধিক। জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাই এই প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্বের কারণ হলে এবং এখানে এই কাজের উপযুক্ত পরিবেশ ও সংগঠন থাকে বলেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী। প্রত্যেকটি বিভিন্নে মৌলিক ব্যাপার, নূতন বিশ্লেষণ সৃষ্টির পরিচয় দিতে হবে এই দাবী যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিহার করেন এবং এই জাতীয় প্রবন্ধাদি তথ্যসংগ্রহ —যা সমালোচনার ভিত্তিকে দৃঢ় করে—তারও অঙ্কে যদি গবেষকদের উচ্চ উপাধিতে ভূষিত করার ব্যবস্থা হয় তাহলে সাহিত্যপ্রেমে না হোক ডিগ্রির মোহেও অনেকে এই প্রয়োজনীয় কাজে হস্তক্ষেপ করবেন। এতে তথ্যসংগ্রহের কাজ ত্বরান্বিত হবে এবং সত্যকার সমালোচনার শক্তি যার নেই তাকে ভুল বুঝার মোহে সে ধারে পড়ে সমালোচনার হাত দিলে মাঝে মাঝে যে হাস্যকর পরিস্থিতি হয় তার হাত থেকেও বাঙালী পাঠক রেহাই পাবে। সব এম, এ, পাশ, গবেষণায় উৎসুক ছাত্রদের এই কাজে লাগালে আরো ভাল ফল হবে। অতি-কাল্পনিক আত্মব্যঞ্জনামূলক অতিভাষিক সমালোচনার বীজ তাদের মধ্যে অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পাবে না, কাজের সংস্পর্শে এসে তাদের মধ্যে প্রথম থেকেই বৈজ্ঞানিক নৈর্ব্যক্তিক সত্য ও তথ্যনিষ্ঠা দেখা দেবে। সেটাও বাংলা সমালোচনার পক্ষে কম লাভের ব্যাপার হবে না। ঘোটের উপর বাংলা সমালোচনাকে তার বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করতে গেলে এই আমাদের করণীয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুলিনবিহারী সেনের আন্তরিক প্রযত্ন ও নিষ্ঠার উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। তাই একথা বিশ্বাস করা যায় না যে এই প্রয়োজনীয় কাজ বাঙালী সাহিত্যসেবীর পক্ষে অসম্ভব।

কবিতার উৎসে

উজ্জ্বল কুমার মজুমদার

সাধারণত আমরা কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে 'ভাব'বাদী। ফলে প্রকাশেই কবিতার যে সার্থকতা সে সত্যটাকে আমরা এড়িয়ে চলি। আমরা যে ভাবে কবিতা পড়ে এসেছি বা পড়িয়ে আসছি তাতে ওই 'ভাব'বাদী পদ্ধতিরই প্রকরণকে দেখতে পাই। কবিতা যে ভাবেরই একটা বিশেষ পদ্ধতির প্রকাশ তা জেনেও নতুন করে আলোচনার পথ আমরা বাতলাই না। এ ব্যাপারে আমাদের মানসিকতায় বিশেষ একটা আলস্য আছে।

এই আলস্যবশত আমরা কবিতা উপভোগের ব্যাপারে নিশ্চেতন হয়ে পড়েছি। কবিতা উপভোগের অনুভূতি আমাদের আছে কিন্তু সেই অনুভূতিকে বিশ্লেষণ করে দেখি না, বিচার করে দেখি না, ভালো-লাগা মন্দ-লাগার ভিত্তি কোথায় সে সম্পর্কেও নিজেদের প্রশ্ন করি না, উত্তর দেবার উপায় খুঁজে পাই না এবং তার ফলে কতকগুলো বিস্ময়সূচক বিশেষণ দিয়ে কবিতাকে যাচাই করেছি জেনে পরম তৃপ্তি পেয়ে থাকি। আমাদের দেশের খুব অল্প কবিই বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেছেন। অথচ সমালোচকের অক্ষমতায় বিরক্ত হয়ে আমরা অনেক সময়েই কবিদের দায়ন্ত হই সত্যিকারের সমালোচনার আশায়। কারণ পারলে তাঁরাই উৎসের দিকে পাঠককে চালিত করতে পারেন।

কিন্তু বিজ্ঞ সমালোচক আমাদের দেশে নেই বললেই চলে, আর যাঁরা কবি ও সমালোচক তাঁদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ—মোহিতলাল পর্যায়ের সমালোচক ক-জন আছেন যাঁরা কাব্যের শুধু বিষয় বা ভাব নয়—সমগ্রভাবে রূপসৃষ্টির বিচার করে দেখিয়ে দিয়েছেন কাব্য কি করে পড়তে হয়, উপভোগ করতে হয় বা সেই উপভোগকে পাঠকের মনে সঞ্চার করে দেওয়া যায়।

কবিতা সমালোচনার ব্যাপারে আমাদের নানা ধরণের প্রবণতা দেখা যায়। অনেক সময় কবিতার ভালো-লাগা মন্দ লাগার ব্যাপারে ব্যক্তিগত ভালো মন্দ-বোধকে যথাসম্ভব কাজে লাগিয়েই বিশ্লেষণের পথ এড়িয়ে যেতে চাই। অনেক সময় আবার কবিতায় ভাবরূপের অন্বেষণবর্জনের কথা জেনেও ভাবের অর্থাৎ প্রকাশ হিসেবে রূপের বিচার করি না, করলেও মাত্রাগুণে ছন্দরীতি বলে দিই। অনেক সময় কবিতায় বিষয়বস্তু দিয়ে কাব্যের বা কবির বিচার করে থাকি।

রাজতন্ত্রবিরোধী কমরেড শেক্সপিয়রের রূপ উদ্‌ঘাটন করে শেক্সপিয়রের সাহিত্যের মাটি বা কাব্যমূল্য বাড়ানো যায় না। বিদ্রোহী মতামতের জন্য কবি হিসেবে শেলির দর বাড়েনা। টেনিসনের জাতীয়তা কি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতা তাঁদের কবিপ্রতিভার গুরুত্ব বাড়ায় না। এই ধরণের সমালোচনায় সমালোচক নিজের মতামতের সঙ্গে কবির মতামতের মিল দেখে উল্লসিত হন। কিন্তু কবির যে মূল বৈশিষ্ট্য তাঁর sensibility বা ইন্দ্রিয় চেতনা, তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জনের পদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গি যা তাঁদের ব্যবহৃত শব্দে প্রকাশিত একথায় কবির যা 'reality' তা তাঁরা বিচার করে দেখেন না।

কিন্তু সমালোচনার আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত কবির ব্যবহৃত শব্দ শব্দ ব্যবহারের পদ্ধতি, নির্বাচন ও সজ্জা, এক কথায় তাঁর সংগঠনী শক্তি। এই শক্তির মধ্যেই তাঁর প্রতিভা নিহিত রয়েছে। শিল্পী হিসেবে কবি তাঁর অভিজ্ঞতাকে কতখানি স্মরণীয় করে রাখতে পারছেন, যুগ ও জীবন কিভাবে তাঁর ব্যবহৃত শব্দে স্মরণীয় হয়ে উঠছে : তাই হবে সমালোচকের লক্ষ্য। এ কথার সমর্থনে রবীন্দ্র-উক্তি উদ্ধার করতে পারি :

> মানবজীবনের সহজ সুখদুঃখে—প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্যে আনন্দই সাধারণত ওয়ার্ডস্‌বার্থের কাব্যের অবলম্বন বলা যেতে পারে। কিন্তু টমসন এবেনসাইড প্রভৃতি তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের রচনার মধ্যেও এই বিষয়টি পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়ের গৌরব তো কাব্যের গৌরব নয়; বিষয়টি রূপে মূর্তিমান যদি হয়ে থাকে তাহলেই কাব্যের অমরলোকে সে স্থান পেল। সম্প্রতিকালকে সম্বোধন করে কীট্‌স্ যে কবিতা লিখেছেন তার বিষয় বিশ্লেষণ করে কীই বা পাওয়া যায় : তার সমস্তটাতেই রূপের আছে।
>
> (সাহিত্যরূপ : সাহিত্যের পথে)

সমালোচনায় ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কেও সমালোচকের অবহেলা চোখে পড়ে। কতকগুলি শব্দ আমাদের ব্যবহার করতেই হয় সেগুলি jargon এর মতো হয়ে যায়, কিন্তু সেই শব্দগুলি-ব্যবহারের ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে সেই সম্ভাবনার দায়-দায়িত্ব আমরা এড়িয়ে যাই। বাংলা সমালোচনায় 'রোমান্টিকতা' ও 'বাস্তবতা' শব্দ দুটি এত দায়িত্ব-হীনভাবে প্রযুক্ত হয় যে সব সময়েই এ দুটির অর্থ নিয়ে তর্ক উপস্থিত হয়। বিভিন্ন প্রসঙ্গে এদের বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। তাই সমালোচকের উচিত কোন বিশেষ অর্থে সেটি প্রযুক্ত হোলো তা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেওয়া। আর তাই তো সমালোচকের কাজ—লেখক সম্পর্কে সাধারণ

ধারণাগুলো যে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সেগুলোর ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিচার করা। সমালোচনার পদে পদে উদাহরণ দিয়ে যৌক্তিকতার ভিত্তিকে দৃঢ় করার দায়িত্বকে আমরা এড়িয়ে যাই।

বিচিত্র উপকরণকে এক করে দেখে তুলে কবি তাঁর কাব্য সৃষ্টি করেন। সেখানে একটা বিশেষ আইডিয়াকে আবেগের মনে রূপ, চিত্রকল্প, মিল, অবক সজ্জার রূপ দিয়ে থাকেন। কবিতা সার্থকতালে তা যে অনির্বচনীয় রস সৃষ্টি করে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই অনির্বচনীয় রসকে কবি যে রচনীয় রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করেন তাকে বিশ্লেষণ না করলে, তার রহস্যকে খুঁটিয়ে বিচার না করলে স্রষ্টার প্রতিভার অন্তর্নিহিত রহস্যটিকে কিছুটা স্পষ্ট করাও সম্ভব হবে না। ঠিক ব্যাকরণের মাধ্যমে বিশ্লেষণ আর কাব্য বিশ্লেষণ এক নয়। কাজেই 'রস'বাদীদের ক্ষুব্ধ হবার কোনো কারণ নেই। কাব্য বিচার ঠিক ব্যাকরণের মতো নির্খুঁত শ্রেণী বিভাগে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে সাজিয়ে যাওয়া নয়। ব্যবহৃত শব্দগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে তার মধ্য দিয়ে কবির জীবিত মুহূর্তগুলিকে (যেমনি ক্ষেত্রদের ব্যবহৃত সেই 'felt life') ধরবার চেষ্টা করা। যাঁরা এই সাহিত্য বিচারকে ভুল বোঝেন তাঁরা এই পদ্ধতিকে 'অবয়বিকের শবব্যবচ্ছেদ' বলে থাকেন। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, এই রকম খুঁটিয়ে বিচার-বিশ্লেষণে কবিতার সমগ্র অর্থ বুঝতে সাহায্য করে, সামগ্রিক প্রতিক্রিয়াকে অনুভব করা যায়।

কবিতার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। কবিতা বিচারের পক্ষে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির বিচার অনিবার্য বলেই মনে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে কবিতার সমগ্র ভাবকে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সৌন্দর্য কতখানি সাহায্য করেছে সেই দিকে সব সময়েই লক্ষ্য রাখতে হবে।

ছন্দের বৈচিত্র্যে বিচিত্র ধ্বনি-স্পন্দনের সৃষ্টি হয়। কিংবা বলা উচিত স্পন্দনে বৈচিত্র্য ঘটিয়েই কবিরা ছন্দের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই স্পন্দনের বৈচিত্র্যে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে তার নিজস্ব-মূল্য বিশেষ নেই। অর্থকে পরিস্ফুট করতেই তার মূল্য। যখন পড়ি: 'শুকপর্ণনে নীল অরণ্য শিহরে। উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে', কিংবা 'আয় সিঁদুরে মোটো সিঁদুরে ঘুলুক দেখুক বাদুক' তখন ধ্বনি অর্থকে পরিস্ফুট ক'রেই তার মূল্য বোঝায়। প্রথম পংক্তির ধ্বনিতে বর্ষার ঘিন গভীর

ফুটে ছুটেছে, দ্বিতীয় পংক্তিটিতে ধ্বনির ধারা দিয়ে পিঁপড়েদের ঘুরে-ঘুরে সঞ্চরণের স্পন্দনকে ধরবার চেষ্টা করেছেন কবি। গানের সঙ্গে কবিতায় এইখানে মস্ত বড় তফাৎ। ছন্দরীতিতে ধরাবাঁধা শাসন, কবি তার মধ্যে নিজের ভাবকে মুক্তি দেন। এই বাঁধা রীতিতে একটা ধ্বনির পুনরাবৃত্তি হয়, শ্রুতিতে তা সুখকর মনে হলেও বেশিক্ষণ এই পুনরাবৃত্তি একঘেয়েমি আনে। কৌশলী কবির পক্ষে ধরাবাঁধা ছন্দ রীতি ভিত্তিমাত্র—যা থেকে সরে গিয়ে কবি কৌশলে তাঁর স্পন্দনকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কবির সৃষ্ট বিচিত্র ধ্বনিস্পন্দনের মধ্যে ছন্দরীতি একটি উপকরণ মাত্র। ধ্বনিস্পন্দন যেন এমন একধরণের গতিবেগকে সোনাওনতি মাত্রার চেয়ে অনেকই বেশী এগিয়ে নিয়ে চলে। ছন্দরীতির মধ্যে ছন্দস্পন্দন কবিকে স্বাধীনতা দেয়। ছন্দের প্রথাগতি শাসনে এই ছন্দস্পন্দনই কবির ব্যক্তিগত স্বরকে চিনিয়ে দেয়।

এই ধ্বনিস্পন্দন কবির ব্যক্তিচরিত্রের প্রকাশ বলেই কোনো নিয়মেই তাকে বাঁধা চলে না। কাজেই কবিতা পড়বার বেলা, যদিও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন, তার কোনো সার্বভৌমিক আইনকানুন নেই। অনেক সময়েই দেখা যায় কবি বিশেষ রীতির প্রত্যাশিত ঢেউ ভুলে যান, প্রত্যাশিত মাত্রা পূরণ করেন না, তাকে অনেক সময়েই অপেক্ষিত রাখেন, অনেক সময় আকস্মিকতা সঞ্চার করেন। ইয়েটস বলতেন শুধু প্রেরণা কবিকে ক্লান্ত করে না, ক্লান্ত করে শব্দযোজনার কৌশল। একটি অমর সন্ধ্যার কৌশল কোটাতে গিয়ে সারা দিন কাটে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ছন্দস্পন্দবৈচিত্র্যের উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন,

কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ অগাধ
আকাশে!
বনে দুলেছিল ফুল গন্ধ বাতুল
বাতাসে। (রবীন্দ্রনাথ)

এই অংশটির প্রথম ও তৃতীয় পংক্তিতে প্রথম পর্বে উচ্চারণ করবার দুই-চার-দুই তালের কৌশল যে দোলনের সৃষ্টি করেছে তা কবিতাটির ('ব্যর্থ যৌবন') যৌবনমত্ত রাত্রির উন্মাদনার সঙ্গেই স্পষ্ট করে তুলেছে। তাছাড়া ওই দুটি পংক্তিরই দ্বিতীয় পর্বে প্রথমে 'অগাধ' ও পরে 'ব্যাকুল' শব্দ-দুটির আ-কার ও উ-কারের দীর্ঘ উচ্চারণ উন্মাদনার গভীরতাকে প্রকাশ করেছে। আরেকটি কবিতাংশ তুলে এই স্পন্দন পরীক্ষা করা যেতে পারে:

বস্তু হাত কর-বর্ধনের ব্যগ্রতায়
হাসিতে এগিয়ে যেন, 'সুখ-সন্ধ্যা', স্বর চেয়ে কের
আমার স্বামীর দিকে, 'হুর্ আ্যাপাসাজ্, ইনি বুঝি
ম্যাডাম কোনিগ্? প্রীত, আপনাদের দেখে খুশী প্রীত,
সুখ-সন্ধ্যা। ম্যাডামকে যাচ্ছিনি দেখো কি, কিম্বা রেটে
কিছু কারিয়ার?' একী, আমার স্বামীর মুখে চোখে
সংযম-অতীত কোন্ আঁধি নামে,...

(অমিয় চক্রবর্তী)

এখানে লক্ষ্য করার মতো এই যে সাধারণ আলাপের ভঙ্গিকে প্রবহমান ছন্দে আশ্চর্যভাবে গেঁথে ফেলা হয়েছে। মোটামুটি পয়ার জাতীয় ছন্দের ছন্দগতি বজায় আছে (আট-দশের ভাগ : কেবল 'হুর্' এবং 'আপ' এই দুটিকে একমাত্রা ধরতে হবে), কোথাও শব্দকে ভেঙেও ছন্দগতিকে খুঁজতে হয় না। অথচ সামাজিকতা, ভদ্র সম্বোধন ও বিনীত প্রশ্ন, আনন্দোচ্ছ্বাস ও সামাজিকতার পুনরুক্তি এবং আপ্যায়নের বিনীত অনুযতি প্রার্থনা সবগুলই ফুটে উঠেছে। এবং তা ঘটেছে ছন্দের বন্ধনেই অর্থ গতির সুকৌশল বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনে। ছন্দের মাপে এই বৈচিত্র্যই বাক্‌ভঙ্গির স্বাভাবিক ছোটাতে সাহায্য করেছে। ছন্দ, বা meter যদি হয় নিয়মিত পদক্ষেপে একই পথে অভ্যাসবশত চলা। ছন্দস্পন্দ বা Rhythm ছন্দে সেই অভ্যস্ত পদক্ষেপের পথেই ক্ষুদ্রগত পরিবর্তন-জনিত নতুন নতুন সৌন্দর্যের আবির্ভাব।

সাম্প্রতিক কাব্যে এই স্পন্দ বৈচিত্র্যে কারুকর্মে দক্ষতা প্রমাণের একটা ঝোঁক এসেছে। ফলে বিশুদ্ধ লিরিকের শীতলতাকে আমরা অনেক সময়েই পাইনা। ইওরোপীয় কাব্যে বিশেষ করে ইংরিজি কাব্যে এই বিশুদ্ধি খুবই কমে গেছে। বোধহয় ইয়েট্‌স ডিনামোয়ের হাত থেকেই এই বিশুদ্ধ শীতলতা শেষ আমরা পেয়েছি। বাঙলাকাব্যে এ বিশুদ্ধি এখনও যায় নি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে কারুকর্ম যতই থাক, জটিলতায় গীতিকবিতা যেন একেবারে পঙ্গুত্বে না হয়। এই প্রসঙ্গে বাঙলা ছন্দের বিভিন্ন রীতি সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। অবশ্য বাঙলা ছন্দ সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক আলোচনা করেছেন। তবে কোনো একটি বিশেষ কবিতার পক্ষে তাতে প্রযুক্ত ছন্দের উপযোগিতা কতখানি সে সম্পর্কে আরও একটু বেশি অবহিত হওয়া আমাদের পক্ষে প্রয়োজন। একটি ছন্দ পরীক্ষার উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যকে স্পষ্ট করা যাক :

সূর্য অস্ত গেল। দিবার শুভ্র আলোক, অন্ধকার লেগে
ভেঙে গেছে।—চূর্ণ হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে যেন একটা ঝড়ে;
ওরে বর্শাগুলি চারিধারে—আকাশে ও মেঘে।
যেন একটা বর্ম-সৈন্য ঘুমিয়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্রে প'ড়ে;
যেমন একটা মহানদী বয়ে গিয়ে পূর্ব খরবেগে
শেষে শাখায় উপশাখায় ছড়িয়ে পড়ে মন্দীভূত তেজে;
যেমন একটা মহাগীতি মহাতানে মহাছন্দে জেগে,
ছড়িয়ে পড়ে বিকম্পিত শততন্ত্র মূর্ছনাতে বেজে।
সূর্য অস্ত গেল। বিশ্ব ঘেরে এল কৃষ্ণ মূর্তি নেমে,
মিলিয়ে গেল মহানদী সিন্ধুজলে, গীতি গেল থেমে। (দ্বিজেন্দ্রলাল)

এই বর্ণনায় মহাকাব্যের বীরপুরুষ-অধ্যায়ের সমাপ্তির সুর ফুটে উঠেছে। সংকোচক দলমাত্রিক রীতিতে অমিত্রাক্ষর বা প্রবহমান পয়ার-মহাপয়ারের বিষয় যে কত বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেতে পারে তার প্রমাণ এই কবিতাটি। এই ছন্দে প্রবহমান পর্বযতির পরিবর্তে পদযতির ব্যবহারে ভাবমুক্তি আসে, এক-একটা পুরো কথাভঙ্গির বাক্য এর মধ্যে প্রবেশ করে যায়, দ্বিতীয়ত বৃত্তবদ্ধ উচ্চারণে বলিষ্ঠতা আসে, তৃতীয়ত—যা দ্বিজেন্দ্রলালের কৃতিত্ব—হসন্তপ্রাণ কথাভাষা আর ধীর গম্ভীর সাধুভাষার মিশ্রণে কবি কাব্যের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবাধ মুক্তি পান। এখানে দ্বিজেন্দ্রলাল এই পরীক্ষার দ্বারা নতুন করে ভাবমুক্তির পথ তৈরি করেছেন। বক্তব্যকে অনেক বিস্তৃত করে বলবার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন।

বাংলা কাব্যে মোটামুটি যে তিনটি ছন্দরীতি আছে—পয়ার জাতীয় যা তান প্রধান বা বিশিষ্ট কলাবাত্রিক, মাত্রাবৃত্ত বা ধ্বনি প্রধান বা সরল কলাবাত্রিক এবং শ্বাসাঘাত প্রধান বা দলমাত্রিক—সে তিনটি রীতির সুযোগ সুবিধা মোটামুটি আমাদের জানা। সরল কলাবাত্রিকের ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথেরই আবিষ্কার, দলমাত্রিকের ছড়ার রাজা ছেড়ে তাকে নানাভাবে গম্ভীর ও কথা-ভঙ্গির উপযোগী করে ব্যবহার করবার কৌশল বাংলা কাব্যে তাঁরই দান। সরল-ছন্দে তাঁর দক্ষতাও সংশয়াতীত হয়ে পরবর্তী কবিদের প্রেরণা জুগিয়েছে। ভাব-পর্ব অনুযায়ী পংক্তিবিন্যাসের কৌশলে তিনি আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন।

কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে মিল একটি লক্ষণীয় বিষয়। ছোট পর্ব বা উপপর্ব, পর্ব, পদ এবং পংক্তির বিচিত্র মিলে স্তবকের বা সমগ্র কবিতার ধ্বনি-মাধুর্যের একটি বিশেষ রূপ ফুটে ওঠে। মিল বা অন্ত্যানুপ্রাস আমাদের

অলঙ্কারশাস্ত্রেরও অন্তর্গত। এবং মিল যত দূরান্তরিত হয় ততই তার ধ্বনিগত সৌন্দর্য সূক্ষ্মতা লাভ করে। যেমন :

মন্থরা তা, রাত্রি এলো, কী ক'রে বলো সে পথ চিনি—
কোথায় আশ্বাস এই গোধূলির অশান্ত প্রত্যূষে
যেখানে সংগম-জল-মাটি
হারায় অগণ্য ঢেউয়ে ; পৃথিবী কাজার, দিক-বেলা।
দূরে ক'রে জীব সত্তি আমার চৈতন্যে নিমিত্ত,
ঢেকে দিয়ে দৃশ্য সেই যার অন্তর্গত বাধা-জাদা
বাঁচায় জেনেছি সুধা, ওরে সমাধির
এ কী অবর্ণতা ; যোগ-সংকেত মুহূর্ত ঘন হ'য়ে
চূর্ণ হোক শেষ রাত্রি, না হ'লে প্রত্যয় অক্ষ-বেলা
অমুক নির্মম সূর্য, যৌবনী জনতা বৃত্ত দিবা—
আবার সংসারে বুঝি, খুঁজি সেই প্রাণ অকৌহিণী।

(অমিয় চক্রবর্তী)

এই স্তবকের শেষ 'অকৌহিণী' শব্দটি দূরাগত 'চিনি' শব্দটির সঙ্গে ধ্বনিসাম্য লাভ ক'রে প্রায়-ক্ষীণ একটি ধ্বনির রেশকে যেন ফিরিয়ে এনে স্তবকটিকে সম্পূর্ণ করেছে। এছাড়া ইংরেজি পদ্যের feminine rhyme, inverse rhyme, cross rhyme, rich rhyme ইত্যাদির অনুসরণে বাঙলা কবিতাতে বিচিত্র মিল দেখতে পাওয়া যায়। অন্তর্লীন মিলের উদাহরণ দিচ্ছি :

'অটল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে' (সমর সেন)
'বন্যার মতো পুরুলতা, অরণ্যে যৌবন (সমর সেন)
'তোমাকে বুকে ক'রে তোমাকে বুকে ক'রে কাটে আমার রাত্রি।'

(বুদ্ধদেব বসু)

এই ধরণের মিল অনেক সময়েই অন্ত্যানুপ্রাসের অভাব মিটিয়ে থাকে। Inverse rhyme-এর উদাহরণ যেমন : 'একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে।' অনেক সময়েই দেখা যায় কবিরা শুধু ধ্বনিগত সাদৃশ্যের জন্যই মিল আনেন না, মিলের দ্বারা এক গভীর অর্থসংগতির ইঙ্গিতও থাকে। যেমন :

যাক এ জীবন
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায়, যাহা
ছুটে যায়, যাহা

খুলি ছয়ে লোটে খুলি 'পরে, চোরা
ছড়াই যায় অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক
যাক এ জীবন পুরিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক। (রবীন্দ্রনাথ)

যে জীবনে পুঞ্জিত জঞ্জালের ফাঁকি ধরা পড়েছে, তাকে দূর করাই কবির অভিপ্রায়। এবং সেই অভিপ্রায়ের ধারাই 'যাক' ও 'ফাঁক' এই দুটি শব্দ মিলিত।

ছন্দের মতোই কবিতার অপরিহার্য উপকরণ হোলো চিত্রকল্প। অবশ্যই কেবল চিত্রকল্পের সমষ্টিই কবিতা নয়, কিন্তু চিত্রকল্প কোনো উক্তিকে স্মরণীয় করবার পক্ষে কবির মোক্ষম অস্ত্র।

ভাষার মধ্যেই ছবি লুকিয়ে রয়েছে। দৈনন্দিন ব্যাপারে আমরা তার তাৎপর্য সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েছি। কিন্তু অতিপ্রয়োগে যে ছবি মূল্যবর্ণ হারিয়েছে কবি তাকে এড়িয়ে নতুন চমকপ্রদ তুলনা করে নতুন ছবিকে মূর্ত করে তোলেন। কবির মন স্মৃতির চিত্রশালা। অভিজ্ঞতাকে কাব্যে রূপ দিতে গিয়ে কবি স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে দু একটি ঘটি-বাটিকা অজ্ঞাতসারেই তাঁর বক্তব্যে জুড়ে দেন। দুটো অমিল বস্তুর মধ্যে মিল খুঁজে কবি তাঁর দৃষ্টির বিস্ময়কে প্রকাশ করে বলেন। কবি যখন বলেন: 'বলি আমি এই হৃদয়েরে। সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়', কিংবা বলেন: 'হানো ইস্পাতের মতো ঋজু দিন'—তখন কবির অভিপ্রায় ছবি হয়ে চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কিন্তু কবি যখন বলেন 'রক্তের উন্মাদ অরণ্য ছড়ালো মর্মর মর্মর মেঘে' তখন মেঘের সঙ্গে মর্মরের তুলনায় শুধু ছবিই ফোটে না, মর্মরের মাদকতা আমাদের ইন্দ্রিয়কে সচেতন করে। এমনও হতে পারে সমস্ত কবিতাটাই একটা চিত্রকল্প। যেমন অমিয় চক্রবর্তীর 'বৈশাখিক'।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার। চিত্রকল্পের যোগফলে কবিতা হয় না যেমন, তেমনি চিত্রকল্প আর স্বাভাবিক সরল উক্তির যোগফলেও কবিতা হয় না। অনুষঙ্গের পরম্পরায় একটা প্রাণশক্তি যেন চিত্রকল্প আর সরল উক্তিগুলিকে একসঙ্গে গেঁথে তোলে। জীবনানন্দের 'ধনলতা সেন' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। এই কবিতায় দূর সেন্দ্রয়ণের বিদেশিনী ছবি, তারপর আশ্বিনের আভাস ফুটেছে হালতাড়া আমাদের নাবিকের বালুচিনি দ্বীপের সবুজ বেলার আভাস পাওয়াতে। এই রীতির আমরা ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের মধ্যে

(বিশ্বের তত্ত্বার্তবার্ষ) বহুবার দেখেছি। তারপর পাখির নীড়ের শান্তি ও নিরাপত্তাবোধ সমস্তই মনলতা দর্শনের প্রতিক্রিয়া। তারপর ধীর শান্ত সন্ধ্যার নিঃশব্দ আগমনের ছবি, দিনের আলোর ছবি : সোনালির রঙে ঝিলমিল সন্ধ্যার আগমনে বধূর বিচিত্র ভাব মূনলের ইঙ্গিত, পাখিরা বধূর আসার ছবিতে ছন্চিন্তার অবসান ও তৃপ্তি বোধ, নদীর উল্লেখ ক'রে তার সাগরে বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিকে অনুল্লিখিত রেখে পুনরাবৃত্তির দোষকে এড়িয়ে গিয়ে পাঠকের মনে সেই কল্পনার প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেবার কৌশল এবং শেষে মিলনের শুভারম্ভ —যার মধ্যে বহির্জীবনের অসন্তোষের লেশমাত্র নেই। 'ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন'—এই অংশেই তার প্রকাশ। সব মিলিয়ে প্রত্যেকটি ইমেজ কবির অভিপ্রেত বক্তব্যকে যেন 'এক আলোকের সূত্রে' গেঁথেছে।

অনেক সময়েই কবির ধর্ম অনুযায়ী কবিতার বিচিত্র চিত্রকল্পগুলির মধ্যে একটি যুক্তি পরম্পরা কাজ করে : কখনো একটি পূর্ব পরিকল্পনার দ্বারা সূত্রে। কিন্তু কখনো সে চিত্রকল্পগুলি নিজেদের আকারগত সৌষম্য বজায় রাখে বটে, তবে তাদের পারস্পরিক লক্ষ্যের মধ্যে কোনো যুক্তির পরম্পরা থাকে না, কবির মৌলিক বক্তব্যকে কোনো যুক্তিনিষ্ঠ খুঁজিতে পাওয়া যায় না. যৌক্তিকতাকে ছাড়িয়ে চলে যায় অর্থ। তখনই হয় নিয়মের সৃষ্টি। যেমন 'বলাকা' কবিতা। এই কবিতার ছবিগুলি বিশুদ্ধ অনুষঙ্গের সূত্রে বাঁধা, কোনো যুক্তির পরম্পরায় নয়। কয়েকটি অনুষঙ্গকে কবি স্তবকে স্তবকে সাজিয়ে গেছেন। পাখার বলি যে বেগের আবেগ জানিয়ে দিলে কবির মনে, তাতে যে সুর ফুটে উঠলো তার মধ্যে বাস্তব জগতের সঙ্গতি নেই। সে জগতে দিগন্তহারা মেঘের মতো পাহাড় ছুটোছুটি করে, ছিন্নমূল গাছেরা পাখা মেলে আকাশে ওড়ে, বনভূমি অজানা দ্বীপান্তরে ছোটে, নক্ষত্রের পাখার আলোয় অন্ধকার চমকে ওঠে আর মানুষের বাঁধা পাখিদের মতোই যুগে যুগান্তরে ছুটে চলে। তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে, এ বলাকা হোলো সেই বিশ্বযাত্রীর দীপ্ত যা নিয়তই অসীমের পাখা মেলতে চায়। এই 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন গতিশীল বিশ্বপ্রবাহের প্রতীক, তেমনি ইয়েটসের 'লিডা অ্যাণ্ড দি সোয়ানে' সৃষ্টিশক্তি বা প্রতিভার প্রতীক' মানুষের শরীরধর্মের আয়ত্তে যে শক্তি আসতে চায়। এইভাবে কবির ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ সূত্রে ভর ক'রে শব্দের অর্থ পাল্টে তাকে বিশেষ মর্যাদা দেয়। তখনই হয় নিয়মের সৃষ্টি।

কবিতার ব্যবহৃত শব্দকে আমরা ইংরিজিতে বলে থাকি poetic diction।

আঠারো শতকের ইংরিজি কাব্যে এই poetic dictionএর একটা স্বতন্ত্র মূল্য ছিল। তখন হাওয়ার কাব্যিক ভাষা ছিল zephyr, মেয়েদের বলা হতো nymph, মাছের ছিল finny prey, পাখির ছিল feathered choir, ভেড়ার ছিল fleecy care, ইঁদুরের ছিল the whiskered vermin race। এই ধরণের diction যেমন পূর্ববর্তী চসার, মিল্টন কি তাঁদের কবিতায় পাবার আশা রাখি না, তেমনি পরবর্তী শেলি, কিটস ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বা এলিয়টের কবিতায় পাবো বলে আশা করি না। এ ভাষা এক ধরণের সমাজেরই দাবি এবং এ শুধু আঠারো শতকের নয়। সব যুগেই কবিতার শব্দ ব্যবহারের পিছনে সে যুগের দাবি থেকে যায়। ইংরিজি সাহিত্যে একালে বিশেষ করে এলিজাবেথীয় লিরিক-ঐতিহ্যে অতি সরল প্রত্যক্ষ শব্দ ব্যবহারই ছিল বৈশিষ্ট্য। তাতে চিন্তার জটিলতা নাটকীয় ঘনত্ব প্রকাশ পেতো না বলে ডান ও তাঁর অনুসারীরা শব্দগুলিকে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ করলেন, বোধ ও বুদ্ধিগত অর্থকে সংবদ্ধ করলেন। অন্যদিকে মিল্টন আবার এলিজাবেথীয় শব্দ ব্যবহারকে ল্যাটিনধর্মী করে ধ্বনিগত গাম্ভীর্যের স্বাদ নিয়ে এলেন। এরপর আঠারো শতকে এই দু রকম ভাষাই অনুপযুক্ত মনে হোলো। কবিতা তখন এমন একটা মাধ্যম চাইলেন যাতে সে সময়কার সামাজিক পরিস্থিতা, ঔজ্জ্বল্য ও তত্ত্বতার দাবি মেটে। সাধারণ কথাকে এঁরা যেন স্যুট পরিয়ে ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে হাই সোসাইটির ভিড়ে মিশিয়ে দিলেন। বাংলা দেশে চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবকাব্য সাহিত্যে এই রকম একটা ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। সামনে ছিল চৈতন্য জীবন-কথার নায়ক, কবিরা তাঁদের কবিত্বকে অলঙ্কারে আচ্ছন্ন করে চৈতন্য-জীবনের প্রেক্ষাপটে রাধাকৃষ্ণ লীলার কথা প্রকাশ করতেন। ক্রমশ এই স্টাইল কৃত্রিম হয়ে দাঁড়ালো। অন্যদিকে মঙ্গলকাব্য-রীতিও একই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্র বুদ্ধি-ঝলসিত ধারালো ভাষায় মঙ্গলকাব্যকে নতুন রূপ দিলেন। এবং বিদ্যাপতির পর ভারতচন্দ্রই প্রথম কবি যিনি বাংলা কাব্যধারার স্টাইলের একটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন। আঠারো শতক থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত—কবিরা ভারতচন্দ্রের ভাষার ঘোরে মুগ্ধ হয়ে থেকেছেন। উনিশ শতকের কবিরা ইংরিজি শিক্ষিত হয়েও ভারতচন্দ্রের মোহ কাটাতে পারেন-নি। তারপর মাইকেল তাঁর নতুন মানসিকতা ও বিষয় বস্তুর দাবিতে অন্য এক ভাষা সৃষ্টি করলেন যার ছন্দস্পন্দনে মিল্টনের অভিঘাত পরধ্বনি শোনা গেল, ভাষার বন্ধ দিয়ে ল্যাটিন বাক্য-সংস্থান কাশল ফুটে উঠলো। শব্দ নির্বাচনে একদিকে যেমন গাম্ভীর্যকে মানদণ্ড

করা হোলো, তেমনি বক্তব্যকে প্রত্যক্ষ করার দায়িত্বে চলতি শব্দকেও আহ্বান জানানো হোলো। পরবর্তী প্রেম-নবীনের কাব্যে, এমন কি রবীন্দ্রনাথেও মাঝে মাঝে মধুসূদনের ভাষার ঘোর লোনা দিয়েছিল। কিন্তু গীতি কবিতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভে বাঙালি কবি যখন নিঃসংশয় হলেন তখন মাইকেলের রাজপথ তাঁরা ছাড়লেন। তখন বাউল-বৈষ্ণবের মর্মানুভূতির ভাষার সম্পদে টান পড়লো একদিকে, অন্যদিকে রোমান্টিক কবিদের অনুবাদ করে বাঙলা কাব্যে রোমান্টিক ব্যঞ্জনা ফোটাবার চেষ্টা চললো। তারপর সে ঐতিহ্যকেও সরিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। চলতি শব্দ, স্বভাবোক্তির সুকৌশল প্রয়োগ, বাক্‌পল্প, ছড় শব্দ, নয়ন ইত্যাদি প্রয়োগের বিচিত্র পরীক্ষা চলেছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি :

(১) বিধি-দত্ত দানা খেয়ে বেশ তো ছিলে ঘোটাসোটা,
ওরে শিশু, প্রাণ আমার। আজ কেন উপড়িয়ে খোঁটা
বন্ধ দরজায় মাথা ঠকঠকাস্? কীসে পেলো তোকে?
'আদিগন্ত তৃণভূমি দেখেছি যা আপনার চোখে।'
(রাজলক্ষ্মী দেবী)

—দেখা হোলো মনের ঘরেতে
কার সঙ্গে?—তার সঙ্গে—যে ছায়া, যে বিশাল উত্তাল,—
কেটে পড়লো সমুদ্র, চেয়ে দেখলুম নিজের কঙ্কাল
ছুটে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে, তবু স্রোতে হারাচ্ছে না, তাই
ভিতরে জিজ্ঞাসা উঠলো কী যে ঘটবে, কী চাই কী চাই?
মন কাঁপলো। আত্মা—মানে আত্মাকে আমরা দেখিনি তো,—
শুনেছি সে নিত্যরত, আমরা কেউই নই তার মতো।
(রবীন্দ্রনাথ মিত্র)

(৩) ঘরের ভিতরে কালো তেলা-তেলা আঁধার জ'মে
ক্লান্ত দু'চোখ ঝুঁকে আসে শুধু ঘুমের মোমে।
(দিনেশ দাস)

উদাহরণ গুলি পরীক্ষা করলে বোঝা যায় কবিরা একেবারেই মুখের ভাষাকে, চলতি প্রয়োগকে, আলাপের ভঙ্গিকে, আত্মকথনের স্বাভাবিক ভঙ্গিকে ছন্দে আশ্চর্যভাবে গেঁথে তুলবার চেষ্টা করেছেন। বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে শব্দের জাত-বিচার নেই তাঁদের, ফলে প্রকাশে আশ্চর্য ঋজুতা অনিবার্যভাবেই মুক্ত করে আমাদের।

কবিদের কাছে কৌশলই স্বতঃস্ফূর্তির দ্যোতক। সে কৌশলের শিল্পনে একটি দীর্ঘদিন ব্যয়িত হলেও মনে হয় তা যেন মৌহূর্তিক চিন্তার ফল। এই পরিশ্রম-অনায়াস প্রকাশ ভঙ্গির জন্য এই আয়োজন—কবিদের মাতিয়ে রাখে। কিটসের কথা মনে পড়ে : I want a brighter word than bright, a fairer word than fair। কবিরা সব সময়েই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ভঙ্গিকে উজ্জ্বলতর করার চেষ্টায় থাকেন। যদি না এই চেষ্টা থাকতো তাহলে আমরা—

সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী বাসে।
ওগো সখি রাগিনী লাগিল গায়ে!

(রবীন্দ্রনাথ)

না পেয়ে পেতুম :

আমিনে বেণু বাজিল ওপারে বনের ছায়ে
তাহার স্বপন লাগিল গায়ে।

কোন্ করুণ মুখের ছবি
পুবেন হাওয়ায় মেলে দিল
সজল ভৈরবী।

না পেয়ে পেতুম :

করুণ মুখচ্ছবি
বাদল হাওয়ায় মেলে দিল
বিরহী ভৈরবী।

প্রথমটিতে বেণুর রাগিণীর করুণা অনেক বেশি, 'বনের ছায়ে'র চেয়ে 'বিদেশী বাসে' যেন আরও বেশি অনির্দেশ্য ভাবের দ্যোতনা করে। দ্বিতীয়টিতে মুখের ছবির করুণ্য বাদল হাওয়ার যতটা ফুটেছিল তার চেয়ে আরও স্পষ্ট হয়েছে 'পুবেন হাওয়ায়'। হাওয়ার বিশেষণ যেন 'পুবেন' শব্দটিতে ফুটে উঠে করুণতাকে ঘনতর করেছে।

গদ্যলেখক যেমন ভাবনার, শব্দের ধ্বনন ও ধ্বনির দিকে দৃষ্টি রেখে লেখেন, একটি শব্দ নষ্ট করেন না, গীতিকবিকে আরও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে কাজ করতে হয় বলে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা তাঁর বেশি দরকার। শব্দগুলিকে সন্নিবদ্ধ করে একটা প্যাটার্নে নাজিয়ে তুলতে হয়। ভাবার সঙ্গীত, অর্থ, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ সরল উক্তি ও

আলঙ্কারিক প্রয়োগ, চিত্রকল্প ও ভাব, নাটকীয় বেগ ও শীতলতা, যত্ন, আলো—বড় কবির ভাষা থেকে এ সবই পাওয়া যায়।

৩

কবিতা পড়ে সাধারণত দুটি বিষয়ের ওপর আমাদের ঔৎসুক্য বজায় থাকে। কবিতায় রূপগত সৌন্দর্য কতখানি এবং তার মধ্যে কবিমন কতখানি সক্রিয়। তৃতীয় একটি বিষয়ও আছে—দৈহিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার। কারণ কবিতা পাঠের পর কবিরা নিজেরাই পিঠে পেটে চোখে মাথায় বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চালন হয়েছেন বলে দাবী দিয়েছেন। কিন্তু এ হলো ইনটুইটিভ প্রতিক্রিয়ার কথা। এ ছাড়া একটি বুদ্ধির দিক তো আছেই। কবিতাকে কখনো তার অর্থ থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। কবিতা যদিও সেরত একটা শব্দময় প্যাটার্ন, তবু কবি তো শুধু ধ্বনিকেই আমাদের মনে সঞ্চার করে দিচ্ছেন না। জীবনেরই একটা ব্যাপারকে, একটি ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে তিনি সেই ধ্বনির মাধ্যমে ব্যক্ত করছেন।

সব শিল্পের মূলেই আছে জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তব রূঢ় উপকরণকে নিজের মনের মতো রূপ দেবার চেষ্টা। জীবনের উপকরণে রূঢ়তা আছে, অবিন্যাস আছে। কিন্তু তাকে রূপ দিতে গিয়ে সেই রূঢ়তা ও অবিন্যাসের সবটুকু ঘুইয়ে ফেলাটা ঠিক নয়। কারণ তার মধ্যেই জীবনের উত্তাপ নিহিত রয়েছে। একেবারে নিখুঁত নিরেট পরিচ্ছন্ন পরিণতি বোধহয় শিল্পীর পক্ষে বাঞ্ছিত নয়। নিখুঁত রূপে নিরেট সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে সেই কেল্ট লাইভ নাও থাকতে পারে। একটি কবিতার কথা মনে পড়ে। শ্রীঅরুণ মুখার্জির সরকারের 'জন্মদিনে' কবিতাটি (আধুনিক বাংলা কবিতা : বুদ্ধদেব বসু : তৃ-সং ১৮৭ সংখ্যক কবিতা)। কবিতাটিতে শব্দপ্রয়োগে বা ছন্দের নিখুঁত তালে কবিকে দোষ দেবার কিছু নেই। তবু পাঠকের মনে প্রিয়ার কাছে কবির প্রার্থনাটুকুর আন্তরিকতা গভীর সুরে বাজে না। কবি যখন বলেন : নিখুঁত নেই ; স্বর্গ আনিনি, এনেছি জিজ্ঞাসার ধার। ও দুটি চোখের, তাৎক্ষণিকের পাশে কি পরশ যৎসামান্য?—মনে হয় কবিতাটির ছন্দস্পন্দই প্রার্থনার বিষয়টিকে উপযুক্তভাবে প্রকাশ করতে দেয়নি। মাত্রাবৃত্তের ঝোঁক, রুদ্ধ মলের আঘাত ঘন ঘন শব্দন তুলে প্রার্থনার ব্যাকুলতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। চিত্রকল্পগুলিতেও অনুভূতির চেয়ে কল্পনাবিলাসের প্রকাশ বেশি হয়ে পড়েছে। আসলে কবিতা তার অনুভূতির উত্তাপে আমাদের অনুভূতিকেও উত্তপ্ত করে তোলে। বিষয়ের মধ্যে একঘেয়েমি

যা নিরুত্তাপ নেই কিছু। যা আছে তা কবিতার মধ্যেই আছে। মনে আছে নিয়ে কবিতা লিখেও তার মধ্যে দিয়ে যৌন মিলনের উত্তাপকে সঞ্চার করিয়ে দেন পাঠকের মনে। অন্যদিকে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় মিলনের ব্রহ্মস্বাদ কথা বলতে গিয়েও ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা 'গভময় পাঠের উপদেশ' হয়ে উঠেছে।

এই শতাব্দীতে কবিতাকে রূপে বলে পরিপূর্ণ করবার কৌশল হিসেবে চিত্রকল্প ও সিম্বলের প্রয়োগ তার রসগ্রহণের ব্যাপারে আগেকার তুলনায় কাব্য-চর্চাকে আরও বেশি প্রবণতা করে তুলেছে। উনিশ শতকের শেষের দিকে ফরাসী সিম্বলিস্টদের মধ্যেই এই প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। তারই প্রভাবের স্বত্ত ধরে পাউণ্ড একবার বলেছিলেন : General expressions in non-concrete terms are a laziness, they are talk, not art, not creation। নির্বস্তুকভাবে ভাবার প্রকাশ করবার মধ্যে বহৎ কবিত্ব নেই। কবিতাকে ইন্দ্রিয়ময় চিত্রকল্পে অভিষিক্ত করে প্রকাশ করতে হবে। আর সব সময় যে যুক্তি পরম্পরায় কাব্যদেহ গেঁথে তুলতে হবে এমন কথা নয়। পাঠকের আবেগ ও চেতনাকে আলোড়িত করতে হবে। তার মধ্য দিয়েই যে ভাবারম্ভ ও সম্পূর্ণ গড়ে উঠবে তাতেই ব্যবহৃত শব্দগুলির অন্তর্নিহিত ভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অবশ্যই কাব্যে বিষয়কে concretise করার ব্যাপারটা নতুন নয়, আসলে এলিয়ট ও পাউণ্ডের জোরটা হলো abstract ভাষা ব্যবহার না করার ওপর। এই দু রীতির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একটিতে অনুভূতির ব্যাখ্যাত্মক নির্বস্তুক ভাষা, অন্যটিতে চিত্রকল্প ও সিম্বলের ব্যবহার। একটিতে নদী বেগবান সৌন্দর্য, অন্যটিতে নদী বেগবান প্রাণপ্রবাহ। একটি বুদ্ধদেব বসুর 'নদী, তুমি নদী' (দ্রৌপদীর শাড়ি), অন্যটি রবীন্দ্রনাথের বলাকার আট সংখ্যক (চঞ্চলা) কবিতা।

বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটিতে নদীর মধ্যে নটীর যে নৃত্যশীল সৌন্দর্যের তুলনা মিলছে, তাকেই কবি ব্যাখ্যা করে গেছেন। কবি নদীকে নটীর দেহে ইন্দ্রিয়িত করলেও তা এতো পরিষ্কার, প্রচ্ছন্নতার অভাবে এতো নগ্ন যে নদী তার সৌন্দর্য ছাড়িয়ে আমাদের মনের অন্য কোন কপাট খুলে দেয় না। চঞ্চলা কবিতায় নদীকে কবি 'ওগো নদী, চঞ্চল অলকা' বলেছেন বটে কিন্তু এ নদী জলসাগরের নদী নয়, এর লাস্যকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, সমস্ত বিশ্বরহস্যে এর যোগাযোগ অনুভব করা যায়। তাই সে নদী হয়েও 'অলকা সুন্দরী', কেবল 'বেনীবন্ধে

তারাস্রোত, বক্ষের স্পন্দনে লাবণ্যের মুহূর্ত-মণিকা' বলে তাকে বর্ণনায় রেখায়িত করা যায় না, সে হচ্ছে বিশ্বনৃত্যেরই কবিকল্পিত রূপ, তার নৃত্যমন্দাকিনীর নির্ঝরে বিশ্বজীবন মৃত্যুস্নানে নিয়ত নির্মল হয়ে উঠছে। এবং লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কবিতাটির মধ্যে কতকগুলি কাটা কাটা চলতি ছবির নিখুঁত বর্ণনা (impressionistic details) ছাড়া কিছু নেই। এবং এগুলি কবির স্বকৃত ব্যাখ্যার দ্বারা সংপৃক্ত নয়। কিন্তু ছবিগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ে একটা বিশেষ রকমের উত্তেজনা বয়ে আনে। সমস্ত কবিতাটিতে একটি গতিবেগের ছবি। প্রথমে নদী, তারপর সে ভৈরবী-বৈরাগিনী—উদ্দাম অভিসারিকার সর্বনাশা প্রেম বুকে নিয়ে সে ছুটছে। তারপরে দেখছি নদীর নৃত্য। শেষে দেখছি একটি নৌকো-তরুতর্ বয়ে চলেছে, তীর থেকে তীরে, কোথাও তার দাঁড়াবার আসক্তি নেই। সমস্ত ইমেজগুলি সেই গতিবেগের অভিব্যঞ্জনা লাভ করেছে। একটু লক্ষ্য করলেই ইমেজগুলির ব্যঞ্জনা বুঝতে পারা যায়। 'অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল', 'বন্ধহীন প্রবাহ', 'বন্ধকেনা' বুঝিয়ে দিয়েছে নদীকে অভিধার্থে নেওয়া যাবে না। তেমনি 'শব্দহীন সুর', 'নক্ষত্রের মণি,' 'অতুর থালি', 'বন্ধর পর্বত', 'নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য আরি আরি। তুলিতেছে শুচি করি। মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন', 'ভুবন মেখলা', 'অলক্ষিত চরণ', 'মহাস্রোত' ইত্যাদি ইমেজগুলিও ব্যঞ্জনার্থকে ফুটিয়ে তুলেছে।

যাই হোক, দুটি কবিতার মধ্যে তুলনায় এই কথাই স্পষ্ট হয় দুটি কবিতা দুটি বিভিন্ন ভঙ্গিতে লেখা। বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটি একটি উপমার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এবং সেই উপমাটিকে নদীর গতিবর্ষ ও সৌন্দর্যের সমাস্তরালে বিস্তৃত করে যুক্তিসঙ্গতভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অন্যদিকে 'চঞ্চলা' কবিতায় নদীর ছবিটা স্পষ্ট হতে হতে মাঝে মাঝে হারিয়ে গেছে, থেমে থেমে শুধু সেই বেগের আবেগ, সেই আবেগে ছুটে চলা তৈরবীর ঝোড়ো এলোচুলের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুর বিপদকে ডিঙিয়ে সে বলকে বলকে তার প্রাণ-শক্তিকেই প্রকাশ করেছে। তারপর দেখা গেছে নদী-অপ্সরী তার নৃত্যের আনন্দে জীবনের নব নব রোমাঞ্চ প্রকাশ করেছে। কবির মধ্যেও সেই প্রাণাবেগ এসেছে, এক পলকে যেন নিজের জীবনবিকাশকে দেখে নিয়েছেন বর্তমান পরিণতির মধ্য দিয়ে। তারপর কবি দেখলেন তাঁর যে মোহময় জীবনটিকে নিয়ে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বপ্রাণপ্রবাহের তীরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন সেটিও বহুদূর ফেলে উঠলো। তারপর এক ধাক্কায় অনির্দেশে ছুটে চললো।

এখানে কোন একটি উপমাকে বক্তব্যের সমান্তরালে স্পষ্ট করে পাশে তোলা হয় নি, কতকগুলি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে গতিবেগকে। পরে কবির মধ্যে তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া এসেছে, কবিও দেখেছেন অতীতে যেমন তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন, ভবিষ্যৎ 'মহাস্রোত' তাঁকে টানছে সেই পরিবর্তনের তাগিদে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটিতে উপমাটি মূল ছবিকে সৌন্দর্যের একটি স্পষ্ট রূপে বিধৃত করেছে। কিন্তু এ কবিতায় মূল ছবিটিই উপমেয় এবং ভৈরবী, নদী, তরণী সেই উপমারই উপমান হয়ে উপমেয়কে নানা দিক থেকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছে। এই ভাবেই বিস্তারের সৃষ্টি হয়। মূল উপমা নদী—এখানে বিস্তার হয়ে উঠেছে। এই বিস্তারের সূত্রেই ছবিগুলি গাঁথা—কোন যুক্তি-শৃঙ্খলায় নয়। ভৈরবী, অপরী, নদী এরা পরস্পরের পরম্পরা ভেঙে একটি আরেকটির আগে এলেও কোন ক্ষতি ছিল না। বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটিতে বন্ধুকে বক্ষ দিয়ে ধরবার চেষ্টা, রবীন্দ্রনাথের কবিতাটিতে নির্বন্ধক ভাবকে বন্ধুতে ধরে রাখবার চেষ্টা, এবং এই ভাবটিকে ব্যাখ্যার দ্বারা দিয়ে নয়—কতকগুলি ইমেজের দ্বারা দিয়ে ধরতে হয়। কিন্তু কবিতাটির উপান্ত স্তবকে কবি ব্যক্তিগতভাবে সেই ভাবকে একটু বেশি পরিষ্কার ব্যাখ্যা ক'রে ('মনে আছে পক্ষে···গানে হতে গানে') কাব্য-মূল্য খানিকটা নষ্ট করেছেন মনে হয়। বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটির নদী বাস্তব, কিন্তু চঞ্চলার নদী, ভৈরবী, বৈরাগিনী ও নদীকে আমরা বাস্তব জগতে দেখতে পাই না। তারা স্পষ্ট হলেও কবির অন্তর্জগতের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই কৌশলকেই বোধ হয় শ্মিত্রে জিদ বলেছিলেন creative incoherence।

৪

কবিতার বিচিত্র প্রকারভেদ রয়েছে এবং প্রকারভেদে বিচারের মানদণ্ডও বদলাতে হয়। যেমন নাট্যকাব্য ও কাহিনী কাব্য। সেখানে শুধু কাব্যমূল্য বিচার করলেই চলে না, তাদের নাট্যগুণ ও কাহিনী বর্ণনার প্রকৃতির দিকেও তাকাতে হয়। এ ছাড়া কবিতার একটি বিশিষ্ট কর্ম হলো গদ্য কবিতা। প্রকাশভঙ্গির এই নতুন পদ্ধতি পৃথক বিচারের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু অতিবিস্তৃতির ভয়ে আপাতত সে আলোচনা স্থগিত রাখা গেলো। কবিতার কর্ম সম্পর্কে তত্ত্বগতভাবে যতটা সচেতন আমরা, ততটা তার প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন নই। আমরা যদি আমাদের বহু-আলোচিত কবিতাগুলিতেও আমাদের ধারণাগুলি প্রয়োগ করি তাহলে নতুন করে তাদের কাব্যমূল্য বুঝতে পারবো। একটি কবিতাকে আলোচনা ক'রে তার আস্বাদ পেতে গেলে তার মধ্যে আমাদের

আলোচিত উপকরণগুলির যথাযথ প্রয়োগ হয়েছে কিনা দেখা দরকার। কারণ শুধু উপকরণগুলির বিশ্লেষণে কবিতার গুণর বিচার করা হয় না, তার সামগ্রিক রসোত্তীর্ণতার কথাও ভাবতে হয়। উপকরণগুলি সৃষ্টির উৎসে পৌঁছে দেয় আমাদের, তারপর সমগ্র সৃষ্টির দিকে তাকালেই তবে সেই সম্পূর্ণতার স্বরূপকে বুঝে ধরতে পারি :

We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time. (T. S. Eliot)

কিন্তু সম্পূর্ণ সৃষ্টির দিকে তাকাবার পরই সেই প্রথম দর্শনসুখ সার্থক হয়।

সভ্যতার সংকট, সাম্যবাদ ও ভারত

অরুণ মজুমদার

প্রথম পর্ব

সভ্যতা ও বৈরিভাববোধ

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনে সৃষ্টির আধার হলো বস্তুপুঞ্জের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও ঐক্য। বিবর্তনের স্তরগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দ্বন্দ্বের ও ঐক্যের গুণগত উত্তরণ ঘটে। এই উত্তরণের ঘটনা যখন যে বস্তুকে বা বস্তুপুঞ্জকে কেন্দ্র করে ঘটে, তখনই তাকে ঐ বস্তুর প্রগতিশীল অবস্থার রূপান্তর বলে আমরা ব্যাখ্যা করি।

কিন্তু দ্বন্দ্বের বিশ্বজগৎ অনেকটাই আমাদের অপরিচিত, আবার ঐক্যের জগতেও কেন্দ্র ও পরিধিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, তার অণু-পরমাণুগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সকল ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানের ও বুদ্ধির রাজ্যে এসে পৌঁছয়নি। দ্বন্দ্ব ও ঐক্যকে যতটুকু বোঝা যায় তা হলো আমাদের অস্তিত্বে, কর্মে ও জ্ঞানের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতের জন্যে, তার বিবর্তনের ইতিহাসে।[১]

প্রাণসৃষ্টির রহস্যও প্রাক্তিবিদ্যা এ যাবৎ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নি, একটি প্রাণসত্তায় জীবকোষসমূহের ভূমিকার খুঁটিনাটি (microscopic) বিশ্লেষণ এখন পর্যায়ে এখনও যায়নি যাতে প্রাণের জন্ম ও বিকাশের একটি পূর্বনির্ধারণবাদী ব্যাখ্যা অবিসম্বাদী রূপ পেতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক (macroscopic) বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে প্রাণের জন্ম ও বিকাশ ঐক্য, সহযোগিতা ও দ্বন্দ্বের নিয়ম মেনে চলে।

---

১ আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উৎকর্ষ দ্বন্দ্বও বিভাগ বেশ শিল্প, সাহিত্য থেকে দূরে সরে গেছে এবং তাতে উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ, বিভিন্নের সঙ্গে সমন্বয়ের সম্পর্ক থাকায় যা, বস্তুত উভয়েই পরস্পর ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ। তাই অধ্যাপক হাল বলেন: "Students of different subjects are like men exploring the branches of neighbouring trees...As he climbs higher, he will find its branches interlaced with those of the others. As he works downwards, tracing roots, he will find them entangled with other roots, nourished in the same soil. The individual trees are now so extensive that few men have time or ability to reach many of the upper branches.....Here, surely, in historical approach lies the practical solution of the problem."

History and Philosophy of Science— L. W. H. Hall. P. 323.

অবশ্য এও অনস্বীকার্য যে নিয়মের রাজত্ব প্রাণীবিদ্যার সকল আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পদার্থ বা রসায়ন বিদ্যার মতো স্পষ্ট হয় না। এর কারণ নিশ্চয়ই প্রাণীজগতের পরিচালনায় অলৌকিক কোন শক্তির লীলা নয়। দার্শনিক ও বিজ্ঞানী শ্রোয়েডিংগার বলেন যে, জড়জগতের নিয়মকে যে অনুসন্ধান-কাঠামোর পরীক্ষা করা হয়, প্রাণীজগতের নিয়মকে ঐ কাঠামোর পরীক্ষা করা সম্ভব নয়।* অধিকন্তু এও আমরা জানি যে পদার্থবিজ্ঞানে নিয়মের রাজত্ব প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদির স্তরে নিরুদ্দেশ হয়, একটি অণুর যথোচিত ক্ষুদ্র খণ্ডের অবস্থান ও গতির পরিমাপ অসম্ভব হয়। হয়তো প্রাণীজগতে অণুর দেহান্তরে খণ্ডদলের বৈশিষ্ট্যই নতুন আবিষ্কারের আলোয় জীবন্ত অণুর ব্যবহার, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বুঝতে অধিক সাহায্য করবে এবং পরিমাণিক স্তরে প্রাণীবিদ্যায় নিয়মের রাজত্বকে জ্ঞানের রাজ্যে নিয়ে আসবে।

আমরা শুধু এইটুকুই এখন অবধি বুঝেছি যে নিয়মের রাজত্ব স্পষ্ট হয় সাংখ্যিক বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে. যেখানে বিশ্লেষণের হাতিয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নয়, আর বিশ্লেষণের ক্ষেত্র অণুর অভ্যন্তরে নয়, অণুসমূহের জগতে। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে প্রোটনের অস্তিত্ব অণুর অস্তিত্বের সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে, সুতরাং আইনষ্টাইনের মতে যতই অজ্ঞাত থাকুক না কেন অণুর অভ্যন্তরেও নিশ্চয়ই নিয়মের রাজত্বের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে. হয়তো সেখার যা বিশ্লেষণের হাতিয়ার কটিমুক্ত নয় বলেই আমরা সেই নিয়ন্ত্রণের অবস্থা কোন পরিমাপে আনতে পারছি না।

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এইটুকু তো জানি যে প্রাণের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রকৃতিজাত প্রতিকূলতাই প্রাণকে প্রকৃতির সংগে ঘাত ঘাইয়ে নিতে প্রেরণা দিয়েছে এবং প্রকৃতির আনুকূল্য কোথায়, তার সন্ধানে সাহায্য করেছে। আমরা আরো জানি প্রাণীর জন্মের প্রকৃতি তার আলো, বাতাস, জল ও মাটির দ্বারা প্রাণের পরিপুষ্টিতে সাহায্য করে। এভাবে দেখলে এটা স্পষ্টই

---

* From all we have learned about the structure of living matter, we must be prepared to find it working in a manner that cannot be reduced to the ordinary laws of Physics. And that not on the ground that there is any 'new force' or what not, directing the behaviour of single atoms within a living organism, but because the construction is different from anything we have yet tested in the physical laboratory. *What is Life?* —E. Schrodinger.

একই প্রসঙ্গে উক্তি অপরাপর যার'লস ডারউইন তাঁর *Origin of Life* গ্রন্থে।

প্রতীয়মান হয় যে প্রাণসৃষ্টি প্রক্রিয়ায় একদিকে প্রকৃতিজাত প্রতিকূলতা অন্যদিকে প্রকৃতিজাত আনুকূল্য কাজ করে। অথচ বস্তু হিসেবে উভয়ে পরস্পর স্বতন্ত্র, কিন্তু ঐ স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা একমাত্র সমন্বয়ের প্রতিবিম্বে। এমন কি প্রাণীদেহের অভ্যন্তরস্থ জীবকোষসমূহও স্বতন্ত্র, কিন্তু সকল জীবকোষের সকল তন্ত্রই দেহ ব্যবস্থার নিয়মে চলে, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে যেমন জীবকোষের জীবকোষত্ব থাকবে না, তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে পরস্পর স্বতন্ত্র বস্তুপুঞ্জকে ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে নিয়ে গেলে বস্তুর স্বাতন্ত্র্যেরও বিলুপ্তি ঘটবার কথা—তখন আলো অন্ধকারের পার্থক্য ঘুচে যাবে, বায়ু আর বায়ু থাকবে না, জল আর জল থাকবে না।

জড়জগৎ ও জীবজগতের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতা মানুষ, পশু, পাখী, গাছপালা ও এমনকি ব্যষ্টিকোষের জগতে প্রাণের জন্ম ও বিকাশ সম্ভব করে তোলে; পার্থক্য হলো এই যে একটি বৃক্ষের প্রাণচাঞ্চল্য যেভাবে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়, একখানি ইটকাঠ বা শিলাখণ্ডের প্রাণস্পন্দন সেভাবে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় না, এমন কি পশু ও পাখীকে যেভাবে জন্ম ও মৃত্যুর প্রক্রিয়ায় আবর্তিত হতে দেখি, গাছপালা ও লতাপাতাকে সেভাবে দেখি না। একটি সূর্যমুখীর জন্মবৃত্তে দেখা যায়, তার পূর্বসূরী অসীম আকাশের আঙিনায় নানাবর্ণের গ্রহনক্ষত্রলোক সৃষ্টি করে অপেক্ষা করে, কোন্ পাখী বা কোন্ বাতাস তার কোন্ খোয়ালে তাকে তুলে নেবে— তার বেণু তুলে নিয়ে অন্য কোন অপেক্ষমানার সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দেবে। অথচ পশুপাখীর কাছে তাদের প্রাণসৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় কোন মানুষের সাহায্য সাধারণতঃ অপরিহার্য নয়, এদের মধ্যে সহযোগিতা প্রত্যক্ষ ও স্বাবলম্বী। তাই বলা যায় যে যদিও স্তর বিশেষে সহযোগিতার প্রকৃতি আলাদা, জীবজগতের বিভিন্ন স্তরের প্রাণীর স্ব স্ব জীবনচর্যায় সহযোগিতা মৌল নিয়ম।

জীবজগৎ ও জড় জগতের বিবর্তনের যে ধারায় মানুষের প্রথম জন্ম হলো তার মধ্যেও সহযোগিতার নিয়ম কাজ করেছে, যেমন ভাবে কাজ করেছে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের ব্রহ্মাণ্ডে প্রাণের আদি সৃষ্টিতে। মনুষ্য জাতির জন্ম-প্রক্রিয়ারও সহযোগিতা নিয়ম হিসেবে কাজ করে। গবিলা-মানব থেকে মানুষের রূপান্তরের বিভিন্ন স্তরে কি কি শারীরতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত কারণ কাজ করেছিল, আমরা জানিনা। লামার্ক, ডারউইন, ওয়ালেস্ মানুষ কেউই এখনও বলতে পারেন নি যে ঐ রূপান্তরগত বিকাশের অনুবন্ধ-নিয়মের প্রধান অবলম্বনগুলো কি কি। ফেডরিক এঙ্গেলস্ বলেন, শ্রমই ঐ রূপান্তরের অন্যতম

প্রধান সহায়ক হয়েছিল। অর্থাৎ জীবন ধারণের প্রচেষ্টাই রূপান্তরে সাহায্য করেছিল। এ-ধারণা শুধু মানুষ কেন, প্রাণিজগতের প্রায় প্রত্যেকের বিবর্তনের ইতিহাসে সত্য। মানুষ-বানরের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম সহযোগিতার উৎকর্ষে ও বুদ্ধির চমৎকারিত্বে অন্যান্য পশুদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিল, এমন বরং বলা যায়; কারণ শিকারজীবী অর্থনীতিতে শ্রমের প্রয়োগকে উন্নততর করবার, প্রকৃতিজাত নতুন নতুন বাস্তবতার সংগে পরিচিত হ'বার চিন্তা এদেরই পরবর্তী স্তরের মানুষদের মাথায় এসেছিল।

অন্যান্য প্রাণীদের মতোই শ্বাস-প্রশ্বাসাদি সকল জৈবিক ক্রিয়াতেই মানুষকে নির্ভরশীল হতে হয় তার জড় দেহপ্রকৃতির ওপর। বাঁচার নিত্য নব প্রচেষ্টায়, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার যৌথ কর্মের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এক দিকে যেমন মানুষকে নিছক প্রাণী হিসেবেই সহযোগিতার অত্যন্ত ও উদ্বুদ্ধ করে, তেমনি ব্যক্তিমানুষের স্বাতন্ত্র্যও তার কাছে অন্যতম বাস্তবতা হিসেবে প্রতিফলিত হয়। ঐ বাস্তবতাই বিকাশের নির্দিষ্ট স্তরে মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের স্তরে অন্যতম পরিণতি লাভ করে।

জীবতাত্ত্বিক দিক থেকে বিশ্বপ্রকৃতির জীব মানুষ জীবজগতে বিবর্তনের মূল্যবান সৃষ্টি। তাই একদিকে মানুষের সংগে অন্যান্য প্রাণীর জীবদেহগত সংগঠন ও নিছক জৈবিক ক্রিয়ার ঐক্য দেখা যায়, অন্যদিকে মানুষ প্রজাতি জীব জগতে বিবর্তনের ধারায় নয় কতকগুলো অনন্য ধর্মের অধিকারী হয়। মন্টেগু* বলেন, দুই প্রকার ধর্ম মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে আলাদা করে। তার প্রথমটি হলো একে অন্যের সংগে মিলিত হবার বাসনা; দ্বিতীয়টি হ'লো পারস্পরিক প্রকাশের ক্ষমতা। তিনি বলেন, মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধ তীব্র হলেই মিলিত হ'বার ইচ্ছা তীব্রতর, ভালোবাসা এই মানুষের কাছে নীতিমালার কথা নয়, ভালোবাসা মানুষের শারীরিক অস্তিত্বের সংগেই জড়িয়ে রয়েছে, ঐ অস্তিত্বের প্রকাশ ও বিকাশের অবলম্বন হিসেবে। আবার বহুকোষশরীরের সংগঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্যই প্রকাশের ক্রিয়ার উৎপত্তি, প্রকাশ না থাকলে মানুষ তার হিংসেরও মানুষের ব্যাকুলতা এবং সাধারণভাবে দেহগত ব্যাকুলতার প্রশমন করতে পারেনা। তাই আদিম মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা মানুষের অস্তিত্বজাত প্রথম ক্রিয়াটির রূপায়ন। এদিক থেকে দেখতে গেলে সহযোগিতা, ভালোবাসা ও একতা মানুষের অস্তিত্বজাত প্রথম ক্রিয়াটির প্রথম, দ্বিতীয় ও

* *Ashley Montagu—On Being Human*

তৃতীয় স্তর হিসেবে মানুষের অস্তিত্বের বিবর্তনের ধারায়, মানুষের মনের বিবর্তনের ধারায় প্রকাশ লাভ করে। এই তিনটি স্তরের রূপান্তর শিশুর বোধের পরিণত মানুষের বোধে রূপান্তরের অনুরূপ।* মানুষের মানুষ সম্পর্কে চৈতন্যের ক্রমবিবর্তনে যখন সহযোগিতাবোধ নিছক নৈতিক তাগিদের স্তর থেকে ভালোবাসার স্তরে উন্নীত হলো, তখন থেকেই মানুষের মৌল মূল্যবোধ হিসেবে ভালোবাসা পরিমার্জিত হতে আরম্ভ করলো। ভালোবাসাবোধের মূল্যবোধগত উত্তরণ (সহযোগিতা বাস্তবতা থেকে) হয়তো আরম্ভ হয়েছিল সভ্যতার† যুগের প্রথম দিন থেকে। ঐ উত্তরণের অন্যতম বাহক হয়েছিল মানুষ প্রজাতির অস্তিত্বলাভ দ্বিতীয় ক্রিয়া, অর্থাৎ প্রকাশ-ক্রিয়া।

মানুষ প্রজাতির বিবর্তনের ধারায় 'শ্যারাডক্স' হলো এই যে সভ্যতার যুগ শৈশবকালের প্রারম্ভেই ঐ মূল্যবোধের সঙ্গে বোধের বাস্তব রূপায়ণকে পৃথক করে দিয়েছে।

যে তিনটি যুগের প্রবেশদ্বার মানুষ অতিক্রম করেছে, সেই যুগত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুটো অর্থাৎ পশুত্বের যুগ ও বর্বর যুগ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপকে ততটা পরিস্ফুট করে নি, যতটা করেছিল মানুষের সঙ্গে জড়প্রকৃতি এবং অন্যান্য প্রাণী সাধারণের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপকে। তৃতীয় যুগেই অর্থাৎ 'সভ্যতার যুগে'ই অন্বয় নিয়ম ও সহযোগিতার নিয়ম আত্মপ্রকাশ করেছে বিকাশের ধারায় মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে। সভ্যতার যুগের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে মানুষ আগামী দিনের জন্য ব্যবস্থা করতে শিখলো।‡ স্থান, কাল ও বস্তুর একটি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে মানুষ পরবর্তী বিন্দুর

* এঙ্গেলস্ বলেন : Just as the developmental history of human embryo in the mother's womb is only an abbreviated repetition of history, extending over millions of years, of the bodily evolution of our animal ancestors, starting from the worm, so the mental development of the human child is only a still more abbreviated repetition of the intellectual development of these same ancestors, at least of the later ones.

—*Labour in Transition from Ape to Man P. 82. Selected Works, Vol. I*

† 'সভ্যতার যুগ' বলে যে যুগকে চিহ্নিত করা হয়, সেই যুগের বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক বিকাশের দিকের থেকে, 'সভ্যতা' কথাটির তাৎপর্যগত দিকের কথার মধ্যে না গেলেই ঐ ব্যাখ্যাকরণ করা হয়।

‡ উইল ডুরাণ্ট বলেছেন, মানুষ আগামীকালের কথা ভাবতে শিখলো অন্যান্য প্রাণীর নিছক থেকে। এ অবশ্য সম্পূর্ণই কল্পনার কথা। কারণ জীবনধারণের তাগিদায় অন্যান্য প্রাণী যখন যেটুকু শিখলো (কারণ অন্যান্য প্রাণী তো পারস্পরিক আদানপ্রদান থেকে শিক্ষা নিতে পারে না), মানুষের বেলায় তার অতিরিক্ত হয়ে গেল। তাছাড়া আদিমযুগের বিবর্তনের ঐ মন্থরতার পরিবর্তে ইতিহাসের যুগে ভাষা ও ব্যবস্থার অন্য প্রকৃতির দান, মানুষের জ্ঞান এবং বোধের ক্ষেত্রে এমন উত্তরণ ঘটালো যার তুলনা ইতিপূর্বে কোথাও নেই। দ্রষ্টব্য : *The Story of Civilization, Vol. I, P. 6.*

কথা ভাবতে আরম্ভ করলো তার, প্রজাতি হিসেবে বাঁচার প্রশ্নে, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং অন্তপ্রকৃতি ও অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে— চৈতন্যের রাজ্যে ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। ইতর প্রাণীদের সঙ্গে তুলনায় মানুষের বৈশিষ্ট্য এই স্তরেই স্পষ্ট হয়।[৭]

কিন্তু মানুষ প্রজাতির বিকাশ স্তরের নিয়মেই চলে, তাই যদিও সভ্যতার মূলে স্থানের দূরত্বকে, কালের ব্যবধানকে, বস্তুজগতে সত্তার পারস্পরিক বিরহকে দূর করবার জন্য মানুষ অগ্রসরের হতে চাইলো, চেতনা রাজ্যে ভালোবাসাকে মূল্যবোধ হিসেবে স্বীকৃতি দিল, তবুও ব্যবস্থার রাজ্যে তাকে এক নিগড়ের জন্ম দিতে হলো। ঐ নিগড় হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ। এদিক থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলো সভ্যতার রাজ্যের সিঁড়ি, যে সিঁড়ি অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু যে সিঁড়ির নিছক সিঁড়ি হিসেবে ভূমিকা হলো প্রজাতিরূপে মানুষকে পরস্পরনের অবস্থায় পৌঁছে দেওয়া ও তাকে বোধ ও বুদ্ধিতে প্রজাতির বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিত থেকে সরিয়ে দেওয়া। সভ্যতা যেখানে মানুষকে স্থান কাল, বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেমে ও ঐক্যে নিয়ে যেতে চায়, সভ্যতারই বিভিন্ন ধাপ সেই চাওয়ার পথে প্রতিবন্ধ হিসেবে এগিয়ে আসে। স্তরের নিয়মেই মানুষের শারীরিক অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বাঁচার প্রশ্নে, চৈতন্যের রাজ্যে সমগ্রতার সঙ্গে অংশের লড়াই, অথচ সমগ্রতার দিকে এগিয়ে যাওয়া মানুষের প্রজাতি হিসেবে বিকাশের পথ, অংশের জন্য ঝোঁকই তার বিনাশের পথ। কালের ধারায় তাই মানুষের সমগ্রতার লাভটুকুই বেঁচে থাকে, সমগ্রতাহীনতার ক্ষতিটুকু নিশ্চিহ্ন হয়, সমগ্রতার শক্তি তার কষ্টিপাথরে অচল ব্যবস্থাকে বর্জন করে, নতুন ব্যবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে— এখানেই ইতিহাসের গতি। মানুষকে ঐ গতির বাস্তব অবস্থায় দাঁড়িয়েই সমগ্রতার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, তার আরাধনা করতে হয়।

সভ্যতা সৃষ্টি, তাই সৃষ্টিকর্তা প্রজাতি মানুষ খণ্ডকালের অবদান দিয়ে সভ্যতার মানুষকে মহাকালের আসনে যেমন বসিয়েছে, তেমনি মাঝে মাঝে তাকে খণ্ডিতও করেছে। তাই সভ্যতা কখনো দ্রুতগতিতে এগোয়, আবার কখনো ধীর পদসঞ্চারে চলে, আবার কখনো কখনো সভ্যতার বিভিন্ন প্রকাশে পারস্পরিক বিরুদ্ধ ও বিরোধ সভ্যতার ধারা ফেলে এবং সভ্যতা রাহুগ্রস্ত হয়। বাধেজ্রনাথের

৭ এংগেলস্ বলেছেন : The further removed men are from animals, however, the more their effect on nature assumes the character of premeditated, planned action directed towards definite ends known in advance.—ঐ, P. 81

ত্রিবেদী বলছেন, "দুইটি প্রধান ঘটনা লইয়াই বিবর্তন— একটি বিকাশ, আর একটি বিনাশ।..... কোন একটি পদার্থের ক্রমাগত কিছুকাল বিকাশ হইতে থাকিল, তখন তাহাতে বিনাশের সংস্পর্শ মাত্র নাই, তারপর আর কিছুকাল ক্রমাগত বিনাশ চলিতে লাগিল, তখন তাহাতে বিকাশের লেশমাত্র নাই, এরূপ ঘটনা অসম্ভব। বিবর্তনে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিকাশ ও বিনাশ জড়িতভাবে চলিতেছে।..... তবে, যখন বিনাশাপেক্ষা বিকাশের পরিমাণ বেশী, তখন সমগ্র পদার্থটির বিকাশাবস্থা বলা যায়; আর যখন বিকাশাপেক্ষা বিনাশের পরিমাণ বেশী, তখনই তাহার বিনাশাবস্থা।"[৮] পদার্থের বিবর্তনে যে অবস্থান্তরের কথা রামেন্দ্রসুন্দর বলেছেন, মানুষ প্রজাতির, তার জীবন-জিজ্ঞাসার তথা সভ্যতার বিকাশেও একই প্রকার দ্বান্দ্বিক নিয়ম কার্যকরী হয়। সম্পদ সংগ্রহ ও উৎপাদন বৃদ্ধি যেমন মানুষকে তার সমগ্রতার বিকাশের দিক থেকে এগিয়ে দিয়েছে, সহযোগিতার উৎকর্ষসাধনে সমাজগঠনে প্রবৃত্ত করেছে, তেমনি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব অপরিহার্য করেছে, আত্মচেতনায় সমগ্রতাবিরোধী মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছে, সমগ্রতার সৃষ্টির সঙ্গে ব্যবস্থার লড়াই সুনিশ্চিত করেছে। এদিক থেকে দেখতে গেলে সভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্ব আসছে সভ্যতারই গতি থেকে। ঐ অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হয় সভ্যতার বাস্তব ব্যবস্থায় যখন সৃষ্টি প্রবাহকে জীবন-জিজ্ঞাসার মাধ্যমে বহুদূর ছাড়িয়ে যায়, মানুষ প্রজাতির প্রজাতিগত বিকাশের সঙ্গে তার চৈতন্যের বিরোধ বাধে, বাস্তবতার বিকাশমান পরিপ্রেক্ষিত যখন মানুষ প্রজাতির বোধ ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে।

২

মার্ক্সীয় মতে, সভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্ম হয় যেদিন থেকে মানুষ প্রজাতি তার অস্তিত্বের খানিকটা অংশকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর কাজ থেকে অব্যাহতি দিল। ঐতিহাসিক দিক থেকে মানুষ প্রাণী সাধারণের মতো শিকার-আহারে তার পুরো সময় ব্যয় না করে আগামী দিনের কথা ভাবতে শিখলো। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে আগামী দিনের চিন্তাই যখন সম্পদ-সংরক্ষণ এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম দিল, আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে মানুষ যখন তার চিন্তা, অভিজ্ঞতা, অনুভূতিকে কালের স্থানের ও ব্যক্তির নির্দিষ্ট বা তাৎক্ষণিক বিন্দুতে আবদ্ধ না রেখে প্রসারিত করে দিল পরবর্তী বিন্দুগুলোয়। সভ্যতার

৮ রামেন্দ্র রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১০-৭১

যুগের প্রথম দিনেই মানুষী সত্তার আবির্ভাব ঘটলো. কিন্তু ঐ আবির্ভাবের বিকাশ মানসিক।

এ জন্ম কি করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবস্থা থেকে জন্ম নেয়? মার্কস বলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ঘটনা যে বোধের জন্ম দেয়, সেই বোধ মানুষ প্রজাতিকে চৈতন্যের রাজ্যে বিশ্বজনীনভাবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অমানুষ করে তোলে অর্থাৎ মানুষপ্রজাতিগত বাস্তবভাবোধের* সঙ্গে স্বতন্ত্র একটি মানুষের বোধের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে। বস্তুতপক্ষে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ঘটনা যদিও প্রাক্-ব্যক্তিগত সম্পত্তি যুগের তুলনায় অর্থনৈতিক বিকাশের তথা সভ্যতার অর্থনৈতিক বিকাশের একটি স্তর, অপরদিকে তা মানুষ-প্রজাতির পারস্পরিক সাধ্যের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সহযোগিতার বাস্তবতা থেকে একটু পিছু-হটা। কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি আসবার পূর্বে আদিম সাম্যবাদী সহযোগিতাই ছিল একমাত্র বাস্তবতা, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির ঘটনা স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক স্বার্থের বাস্তবতা সৃষ্টি করে এবং সহযোগিতার মানসিকতার পাশাপাশি স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং স্বাতন্ত্র্যবোধজনিত স্বার্থবোধের জন্ম দেয়। এখানেই সভ্যতার চরিত্র অদৃষ্ট হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ঘটনা মানুষ প্রজাতির মূল্যবোধের জগতে মানুষে প্রজাতির বাস্তবতা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে, কারণ স্বতন্ত্র স্বার্থবোধের তাৎক্ষণিকতায় সে তার সহযোগিতায়, ভালোবাসায় প্রজাতিগত মূল্যবোধকে হয় হারিয়ে ফেলে নতুবা ভগবানের নির্দেশ হিসেবে অতীন্দ্রিয়ের রাজ্যে ছুঁড়ে দেয়।

অথচ সভ্যতায় অর্থনৈতিক বিকাশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির চরিত্রও বিবর্তিত হয়, ব্যক্তিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে সমষ্টিভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে, আর উৎপাদনব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রজাতির অমানুষীকরণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। সভ্যতার এই অর্থনৈতিক বিকাশে শ্রেণীসংগ্রামের দায়ভাগ আছে।

মার্কস বলেন অর্থনৈতিক বিকাশে বিকাশের অনুকূল শক্তি হ'লো গতিশীল

---

* ১৮৪৪-এর মার্কসের লেখা অনুসরণ করে বলা যায় যে মার্কস মানুষপ্রজাতিগত বাস্তবতার তিনটি দিকের কথা ডাইমেন্সন্ রেখেছেন। প্রথমটি হলো মানুষপ্রজাতি ও জড়প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের বাস্তবতা. দ্বিতীয়টি, হ'লো, মানুষপ্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বাস্তবতা; তৃতীয়টি হলো. মানুষের নিজের অস্তিত্বের ধরন ও তার জীবন-ক্রিয়ার যা একটু সোজা করে বললে বলা যেতে তার জীবনযাপন ও বিশ্বজনের পারস্পরিক সম্পর্কের বাস্তবতা।

জীবনক্রিয়া বা শ্রম, আর প্রতিকূল শক্তি হলো জীবন-নিষ্ক্রিয়তা। মানুষের মধ্যে শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি তাই। উৎপাদনে এক শ্রেণী শক্তির এবং অন্য শ্রেণী কলাহোর করে।

সভ্যতার অর্থনৈতিক বিকাশ যদিও অনেক দূর এগিয়েছে, আধ্যাত্মিক বিকাশ তার সমান এগুতে পারেনি। তার সব চেয়ে বড়ো কারণ হলো একদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বাস্তবতা অধ্যাত্মজীবনে মানুষকে মানুষ-প্রজাতির বাস্তবতা থেকে ঠেলে দিয়েছে, অন্যদিকে উৎপাদনে নিয়োজিত মানুষ অর্থনৈতিক বিকাশের সক্রিয় প্রধিক হয়েও প্রজাতিগত বাস্তবতাবোধ থেকে বঞ্চিত।

মার্কস বলেন, অর্থনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজের[১০] দু' পক্ষই যে শুধু পরস্পরের বৈরীতে পরিণত হয় তা নয়, যে শোষণ করে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বৈরীভাবের সৃষ্টি হয়[১১], এমন কি শ্রমিকের সঙ্গেও তার শ্রমের বা জীবনক্রিয়ার এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বৈরীভাবের সৃষ্টি হয়। শেষোক্ত বৈরীভাবদ্বয় মানসিক, তাই ঐ বৈরীভাবের কথা বলতে গিয়ে মার্কস মানুষের চেতনার স্তরে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিভাবে প্রজাতিগত বাস্তবতাবোধকে বিকৃত করে তাই বোঝাতে গিয়েছিলেন। শোষকের সঙ্গে তার পুঁজির বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বৈরীকরণ সম্পর্কে মার্কস অবশ্যই স্পষ্টত কিছুই বলেন নি, কিন্তু তাঁর

১০ মার্কসের মতে সমাজ বা 'কমিউনিটি' মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে প্রজাতিগত বাস্তবতা-বোধের অর্থাৎ সহযোগিতাবোধের অভিব্যক্তি। সমাজ কথাটি মার্কসের নিজস্ব প্রত্যয় বা জ্ঞানতত্ত্ব নয়, ভাববাদ। সমাজ তাই পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ মানুষ-প্রজাতি। ঐ সম্পর্কের অর্থনৈতিক বা শ্রেণীবাদের বিভেদ বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজও বিশ্লেষিত হয়। মানুষ এখিক থেকে সামাজিক জীব, ব্যক্তিসত্ত্ব ক্ষুদ্রো সভ্যতার পাতায় তাই বিদ্যা অসার।

১১ "Opposition of each to itself. Capital—stored-up labour—labour. Capital as such—splitting into capital itself and into its interest, and this latter again into interest and profit. The capitalist completely sacrificed. He falls into the working class, whilst the worker (but only exceptionally) becomes a capitalist. Labour as a moment of capital—its costs. Thus the wages of labour—a sacrifice of capital." K. Marx—*Economic and Philosophic Manuscripts of 1844*. p. 91.92

এই অংশটি মার্কস অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন, এর অর্থ স্পষ্ট নয়। মার্কস আর এক জায়গায় বলেন, Everything which appears in the worker as an activity of alienation, of estrangement, appears in the non-worker as a state of alienation, of estrangement.

.....that the worker's real, *practical* attitude in production and to the product (as a state of mind) appears in the non-worker confronting him as a *theoretical* attitude. ঐ, P. 82-83

বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা শোষককে মানুষ-প্রজাতির জগৎ থেকে সরিয়ে নেয়, শেষ অবধি ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সম্ভব হয়, আর মানুষ-প্রজাতির অন্তরতম হিসেবে শোষক জীবন-ক্রিয়া থেকে বিনিময় অবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির বা পুঁজির স্তরে পরিণত হয়। এভাবে পুঁজিপতি অর্থ নৈতিক দিক থেকে সম্পত্তির মালিক হয়েও চেতনার স্তরে তার সামাজিক সত্তাকে হারিয়ে ফেলে, চূড়ান্ত বৈরিতায় নিজের মানুষী সত্তার কাছে নিজে আগন্তুক হিসেবে প্রতিভাত হয় এবং পুঞ্জীভূত শ্রমের (stored-up labour) নিকট আত্মবিসর্জন করে। মার্কস অবশ্য বৈরিতার (alienation) তীব্র রূপ সামন্ততন্ত্রের তুলনায় ধনতন্ত্রেই লক্ষ্য করেছেন।

অন্যদিকে শোষিতের সংগে বা শ্রমিকের সংগে তার উৎপাদিত দ্রব্য তথা পুঞ্জীভূত শ্রমের বৈরিতার কারণ হলো এই যে প্রথম স্তরে তার সৃষ্টি তার অস্তিত্বের নিয়ামক হয়, যে দ্রব্য সে উৎপাদন করে সেটা তার থেকে পৃথক স্বাধীন শক্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়, তাই ইতর প্রাণীদের ন্যায় দ্রব্য বা জীব সম্পর্কে পার্থক্যবোধ থেকে বৈরীভাবের জন্ম নেয়। দ্বিতীয় স্তরে, ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ থেকে যে স্বার্থবোধের জন্ম, এক দিকে সেই স্বার্থবোধের বশে, অন্যদিকে জীবনক্রিয়ার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের প্রতিবন্ধকতার (যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে উৎপাদন সম্পর্ক) শ্রমিকের শিল্পীসত্তা চেতনার স্তরে প্রাণ হারায়, আর জীবসত্তা নিজেকে বঞ্চিত মনে করে। অন্যান্য প্রাণীর সংগে মানুষের একমাত্রই পার্থক্য যে মানুষের মধ্যে শিল্পীসত্তা রয়েছে তাই শ্রম বা জীবনক্রিয়া মানুষের অস্তিত্বে মিশে যায় না, কিন্তু প্রাণীজগতের অন্যান্য প্রাণীর জীবনকর্ম সম্পূর্ণই তাকে কেন্দ্র করে, তার নিজের আহার নিদ্রার জন্য, তাই তার অস্তিত্ব ও শ্রম পরস্পর একাত্ম হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে ঐ বিশ্বজনীনতার ভাব রয়েছে বলেই নিছক নিজের জীবনধারণেই সে নিজের শ্রমকে নিয়োজিত করে থাকতে পারে না। প্রজাতি হিসেবে তার শ্রমের একটা অংশ নিজের জীবসত্তার চরিতার্থতায় ব্যয়িত হয়, কিন্তু অন্য একটি অংশ বিশ্বভাবের প্রেরণায় শিল্পকর্ম গড়ে তোলে।[১৭] কিন্তু শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শ্রমিক-মানুষের চৈতন্যে ঐ শিল্পীসত্তা জানা যাবতে পারে না, কারণ তার উৎপাদন ক্রিয়ায় তার শিল্পীসত্তার ভূমিকা নেই, রয়েছে শুধুই জীবসত্তার। তার জীবন ও কর্ম তার নিজের জন্য নয়, অন্যের জন্য— এ চেতনার তার মধ্যে আত্ম-বৈরিতা (self-alienation) দেখা দেয়।

১৭ ঐ, P. 72-73

মার্কিনও বলেন, "ফলে মানুষ (শ্রমিক) ইতরপ্রাণিসুলভ ক্রিয়া যথা অর্থাৎ আহারে, পান, বৈষুন অথবা বড়জোর বাসস্থান ও বেশভূষা ব্যতীত কোথাও স্বাধীনভাবে কোন কাজে নিজেকে অনুভব করতে পারে না এবং জীবনচর্যায় নিজেকে পশুপাখী থেকে আলাদা অনুভব করে না।"[১১] অন্য কথায় বলতে গেলে, শ্রমিক আত্ম-বৈরিতায় যে মূল্যবোধকে লোষণ করে, সে মূল্যবোধ পুঁজিপতি বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকের মূল্যবোধের মতই অমানুষিক। দুই প্রকার মূল্যবোধই ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রজাতিগত বাস্তবতা থেকে বিচ্যুত, কারণ পুঁজিপতি প্রত্যক্ষভাবেই বৈরিতায় অবস্থান করে নিজের মানুষী সত্তাকে অর্থনৈতিক বাস্তবতায় হারায়, চৈতন্যে তো বটেই, আর শ্রমিক আত্ম-বৈরিতায় মূল্যবোধের জগতে, চৈতন্যের জগতে বাস্তবতাবোধকে হারায়, যদিও উৎপাদন ক্রিয়ায় প্রজাতিগত বাস্তবতায় বিকাশে সে 'মোডাস্ অপারেন্ডি'। সভ্যতার বিবর্তনে, মানুষের বিবর্তনে তাই মার্কস নিছক মূল্যবোধের ওপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন না, যতটা করেন অর্থনৈতিক ক্রিয়ার পরিবর্তন তথা উৎপাদন-পদ্ধতিগত বিকাশের উপর।

তার মানে এই নয় যে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে মূল্যবোধের জগতে চৈতন্যের বিকাশে— মার্কসের ধারণা অনুযায়ী— কোন পার্থক্যই নেই। একথা ঠিকই — স্বাতন্ত্র্যবোধে নিবন্ধিত একজন পুঁজিপতি ও একজন শ্রমিকের মধ্যে স্বার্থপরতার মূল্যবোধে তফাৎ নেই, একজন শোষকের হিসেবে ভালোবাসার প্রজাতিগত বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন, অন্যজন শোষণের ঘটনায় (শুধু পুঁজিপতির নয়, মানব নিজের নিছক জীবসত্তায়) আত্ম-বৈরিতায়, নিজেকেই ভালোবাসতে পারে না, তার অস্তিত্বই তার কাছে যন্ত্রণাময়, ভারবহ। কিন্তু শ্রেণীচেতনায় শ্রমিকের আত্ম-বৈরিতা দুর্বল হয়, কারণ চৈতন্যের স্তরে সে তখন নিজের শিল্পীসত্তায় আস্থাবান হয়। তাই ব্যক্তি হিসেবে নয়, শ্রেণী হিসেবে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মূল্যবোধের জগতে দ্বন্দ্ব থাকে এবং ঐ দ্বন্দ্ব অবক্ষয় ও বিকাশের মধ্যে দ্বান্দ্বিক দ্বন্দ্ব, কারণ পুঁজিপতির শ্রেণী হিসেবে মূল্যবোধ সংহারকের মূল্যবোধ অর্থাৎ অমানুষিক মূল্যবোধ যা মানুষপ্রজাতিকে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়, অপর দিকে শ্রেণীচেতনার উপলব্ধিতে আলোকিত শ্রমিকের মূল্যবোধ শিল্পীসত্তার মূল্যবোধ, বিকাশের মূল্যবোধ, যার প্রাণ স্বাধীন, তাই

---

১১ ঐ, P. 73

যার অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক কোন বুদ্ধি ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।

মার্কসীয় জগতে শ্রমিক তাই যুগত শিল্পী, জড়প্রকৃতিকে সক্রিয় তৎপরতায় নিয়ে আসাই যার কাজ।[১৫] শ্রমিকের শ্রেণীচেতনা ঐ শিল্পীসত্তার আত্মোপলব্ধি; ঐ উপলব্ধি আসলে মানুষের প্রজাতিগত বাস্তবতার উপলব্ধি। তাই শ্রেণীচেতনায় শ্রমিক মানুষ প্রজাতিগত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে, উপলব্ধি করে তার উৎপাদনক্রিয়ার বাস্তব তাৎপর্য। এই উপলব্ধিই শ্রেণীসংগ্রামে শ্রমিককে উদ্বুদ্ধ করে, ইতিহাসের পরিবর্তনে শক্তি দেয়।

৩

সুতরাং মার্কসের কাছে 'শ্রেণী' কথাটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য নিছক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের অবস্থানকেই বোঝায় না, তাঁর কাছে 'শ্রেণী' মানুষ-প্রজাতির মৌল সত্তার (of essential being) বাস্তব অগ্রগতিতে উৎপন্ন পারস্পরিক সম্পর্কের দ্যোতক। শ্রেণীসংগ্রাম ঐতিহাসিক দিক থেকে তাই সমগ্রতার সঙ্গে সমগ্রতাহীনতার সংগ্রাম। অর্থনৈতিক স্তরে পুঁজির সঙ্গে শ্রমের, পুঁজিপতির সঙ্গে শ্রমিকের সংগ্রাম। চৈতন্যের স্তরে ভালোবাসার সঙ্গে সংকীর্ণতার ও বিদ্বেষের, সহযোগিতার সঙ্গে স্বার্থপরতায় ও লোভের

---

১৫ মার্কস বলেন, The object of labour is the objectification of the species-life of man. আর এক জায়গায় বলেন, Man is a species being, not only because in practice and in theory he adopts the species as his object... but also because he treats himself as the actual living species: because he treats himself as a universal and therefore a *free* being.

The universality of man is in practice manifested precisely in the universality which makes all nature his *inorganic body*—both in as much as nature is (1) his direct means of life, and (2) the material, the object, and the instrument of his life-activity.

...It is just in the working up of the objective world, therefore, that man first really proves himself to be a *species being*...through and because of this production, nature appears as his work and reality.....In tearing away from man the object of his production, therefore, estranged labour tears from him his *species life*, his real species objectivity and transforms his advantage over animals into the disadvantage that his inorganic body, nature is taken from him. ⇒ Pp 74-76.

সংগ্রাম, পশুত্বলভ জীবনযাত্রার সঙ্গে মানুষ-প্রজাতির স্বভাবজাত বিশ্বমনস্কতার সংগ্রাম।

ইতিহাসে শ্রেণীসংগ্রাম হয়েছে অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরে স্তরে, কিন্তু শ্রেণীচেতনার সংগ্রাম হয়নি। মানবেতিহাসের যে পর্যায়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভ্যুদয়, সেই পর্যায়েই মানুষ জাতির এক অংশ উৎপাদন ক্রিয়া থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে ছদ্ম-শ্রীর জগতে চলে যায়, যে জগতে মানুষ নিঃসঙ্গ, স্বার্থপর ও পাশবিক। সভ্যতার বিকাশে তাই তাদের অবদান শুধুই নেতিবাচক। অপর পক্ষে যে অংশ উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় শ্রম প্রয়োগ করে, সে অংশ শ্রমের মধ্য দিয়ে মানুষ-প্রজাতির স্বভাবজাত প্রবণতাকেই রূপ দেয়, তাই বিকাশমান সভ্যতার ভারবাহী তারাই হয়। বৈরীচেতনায় তাদের মূল্যবোধের জগৎ আচ্ছন্ন হলেও শ্রমের মধ্যদিয়ে আত্মপ্রকাশেই সভ্যতার বনিয়াদ তারা গড়ে তোলে। সভ্যতার অর্থনৈতিক বনিয়াদের বিকাশের মধ্য দিয়েই দ্রষ্টার চেতনার ছাঁচেও পরিবর্তন ঘটে। তাই ইতিহাসের পটে মানুষ-প্রজাতি স্বভাব এবং স্বাভাবিক বাস্তবতা-বোধও ফুটিয়ে নেয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ-প্রজাতির চেতনার ছাঁচেও ক্রমতর লয়ে বিন্যস্ত চলে, এবং বৈরীভাবাপন্ন মানুষের চেতনায় ও মানুষের সমগ্রতার ছবি স্পষ্টতর হয়, অন্তর্গত সত্তাবনার উপলব্ধি ব্যাপক ও গভীর হয়, কিন্তু পাশাপাশি জীবন-যন্ত্রণাও বৃদ্ধি পায়, অন্তর্নিহিত সম্পদের বৈরিতামুক্ত প্রকাশের অভাববোধও তীব্র হয়।

তাই সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশমান মানুষ-প্রজাতিরই বোধ, বুদ্ধি ও ব্যবস্থার অবিরোধিতা প্রবলতর হয়। ব্যক্তির চেতনার সঙ্গে বাস্তবতার সংঘর্ষও তীব্রতর আকার ধারণ করে। ইতিহাসের শৈশবে যে পশুত্ব ব্যক্তির নিয়ে সভ্যতার যাত্রারম্ভ হয়েছিল, সে ব্যক্তির অধিকতর বিবর্তিত হয়।

মার্কসের ধারণা অনুযায়ী, মানুষ-প্রজাতির মূল্যবোধের জগৎ বাস্তবতার জগৎ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন হয় বাস্তবতার বিকাশের একটি পর্যায়ে অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভ্যুদয়ের পর্যায়ে। তাই মানুষের জ্ঞান ও চৈতন্য মানুষ-প্রজাতিগত বাস্তবতাকে ইতিহাসের কোন একটি মুহূর্তে বাস্তবতার সমগ্রতাকে প্রতিবিম্বিত করে না, মূল্যবোধ ও বাস্তবতার সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে সৃষ্টি হয় না। জ্ঞান, চৈতন্য ও মূল্যবোধের যে অংশটুকু মানুষকে কেন্দ্র করে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বা মানুষের সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে, সে অংশটুকুর অস্তিত্ব থাকে মানুষের অর্থনৈতিক শ্রেণী হিসেবে অস্তিত্বের সীমা-

সেখানকে অবলম্বন করে। কিন্তু জানি, চৈতন্যের বাকী অংশের সীমায়িত অস্তিত্ব স্থির থাকে না, সীমার সঙ্গে অসীমের দ্বন্দ্ব সেখানে ততটা প্রবল হয়, যতটা অসীমের অর্থাৎ বাস্তবতার জাগতিক বিকাশ হয়, ঐ দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতেই জ্ঞান তার সীমারেখা অতিক্রম করে, চৈতন্যের নতুন উত্তরণ ঘটে। যেমন অনুমান করা হয়, সভ্যতার প্রথম দিকে পরিবার গঠনের মূল্যবোধ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বোধে কোন পার্থক্য ছিল না[১৪]. কিন্তু ইতিহাসের ধারায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে, পরিবার গঠনের মূল্যবোধেও অনেকটা পরিবর্তন এসেছে।

যে তিন প্রকার বৈরিতার কথা মার্কস বলেছিলেন সেই তিন প্রকার বৈরিতাই অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকের সঙ্গে ব্যক্তিসম্পত্তি বৃদ্ধিতে নিয়োজিত মানুষের বৈরিতা ; মানুষের উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে বা সৃষ্টির সঙ্গে তার বৈরিতা ; মানুষের শিল্পীসুলভ সৃষ্টিধর্মিতা— যার ব্যাহত প্রকাশ শ্রমে, সেই শ্রমের সঙ্গে তার বৈরিতা (যাকে পূর্বে বলেছি বিষয়ভাবের সঙ্গে জীবভাবের পারস্পরিক বৈরিতা)— মানুষ প্রজাতির মূল্যবোধের জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করে, চৈতন্যকে স্বস্বয় করে।

অথচ বৈরিতার জন্যই মানুষমূর্তির সঙ্গে মানুষের প্রজাতিগত সত্তার বিচ্ছিন্নতায়, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির (বা তার অন্তরের) বিচ্ছিন্নতায়। ঐ বিচ্ছিন্নতার কারণ কি? মার্কস বলেন— কারণ ছিল, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপ্রবেশের পূর্বে মানুষ-প্রজাতির বাস্তবতাবোধের স্তর এবং সেই স্তরে শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমের ও উৎপাদিত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য শ্রমিকের নিকট স্বাধীন, আগন্তুক শক্তি হিসেবে তার চৈতন্যের জগতে আসে। ফলে যতই দ্রব্যের সমৃদ্ধি ঘটে শ্রমিকের চৈতন্যের জগৎও মানুষ প্রজাতিগত বাস্তবতা থেকে সরে এসে ততই সংকুচিত হয়, ততই মানুষ-প্রজাতি তার প্রজাতিগত সত্তাকে হারায়।[১৫]

---

১৪ *Famulus* means a household slave and *familia* signifies the totality of slaves belonging to one individual.....The expression was invented by Romans to describe a new social organism the head of which had under him wife and children and a number of slaves, under Roman paternal power, with power of life and death over them all.—*F. Engels, Origin of Family, Private Property and State, P. 198.*

১৫ মার্কস বলেন, the object which labour produces—labour's product—confronts it as something *alien*, as a power *independent* of the producer... Labour's realisation is its objectification...this realisation of labour appears

বৈরিতার বশেই মানুষের শ্রম সম্পর্কে, উৎপাদিত দ্রব্য সম্পর্কে মূলবোধ ইতর প্রাণীসাধারণের স্তরে হয়, কারণ বৈরিতা তাকে প্রজাতিগত বাস্তবতা থেকে সরিয়ে আনে, এবং শ্রম ও উৎপাদনকে শুধু তার জীবসত্তাকেই বাঁচিয়ে রাখার উপায়মাত্র হিসেবে প্রতিভাত করে, শ্রম ও উৎপাদন যে তার প্রজাতিগত শিল্পীসত্তার বিকাশের উপায় সেটা তার বৈরিতার আচ্ছন্ন চৈতন্যে থাকে না।[১৭]

বৈরিতার আচ্ছন্ন চৈতন্যের জগৎ তাই মানুষের বাস্তবতার জগৎ থেকে আলাদা। ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলো মানুষের সঙ্গে শ্রমের বা উৎপাদিত দ্রব্যের বৈরিতার ফলশ্রুতি। মার্কস বলেন, "একথা সত্য যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিকাশের মধ্যেই আমরা পোলিটিক্যাল ইকনমি থেকে বৈরিতার আচ্ছন্ন শ্রমের (বৈরিতার আচ্ছন্ন জীবনের) কথা জানতে পারি। কিন্তু ঐ বৈরিতার জগৎকে বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যদিও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বৈরিতাবোধের উৎস হিসেবে মনে হয়, আসলে ইহা (অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি) বৈরিতাবোধেরই পরিণাম, যেমনভাবে ভগবানেরা মানুষের বুদ্ধিগত বিভ্রান্তির সৃষ্টি, স্রষ্টা নহেন। পরে অবশ্য ইহার (ব্যক্তিগত সম্পত্তির) সঙ্গে বৈরিতার জগতের মেলবন্ধন উভয়পক্ষীয় হয়েছে।"[১৮]

---

as loss *of reality* for the workers; objectification as loss *of the* object and *object-bondage*; appropriation as estrangement, as alienation.

মার্কস অন্যত্র অভিযোগ করেন, Political economy conceals the estrangement inherent in the nature of labour by not considering the direct relationship between the worker (labour) and production.

১৭ In estranging from man (1) nature, and himself, his (labour's) own active functions, his life-activity, estranged labour estranges the *species* from man. It turns for him the *life of the species* into a means of individual life ····labour, life-activity, productive life itself, appears to man merely as a *means* of satisfying a need—the need to maintain the physical existence.

ঐ ; Pp 80-81

১৮ ঐ ; Pp. 80. আত্ম-বৈরিতাবোধ থেকেই মানুষ-প্রজাতির বাস্তবতাবোধের সংকীর্ণতা থেকে এসেছে ধর্মের ঠিক সেইভাবে এসেছে। শ্রম ও উৎপাদিত দ্রব্য যেমন সংকীর্ণ বাস্তবতা-বোধের ফলে অধিকের বিরুদ্ধে শত্রুতা, স্বার্থান্ধ ও হৈরী (কারণ অধিকের জৈবিক অস্তিত্বের বিপরীত), তেমনি ভগবানও শত্রুতা, স্বার্থান্ধ ও তারপর শুধু যা হৈরী হিসেবে আদিম মানুষের মনে দানা বাঁধে। তাই এঙ্গেলস বলেন—Religion arose in primitive times from erroneous, primitive misconception of men about their own nature and external nature surrounding them. *F. Engles—Feurbach and End of Classical German Philosophy. P. 360*

একথা ঠিকই যে পুঁজিবাদের অভ্যুত্থান পর্বে মানুষ-প্রজাতির অগ্রগমনে অর্থনৈতিক বিকাশ প্রধান ভূমিকা নিয়েছে, আর চৈতন্যের জগতে বিকাশ তার আলোকন তুলেছে, কিন্তু বৈরিতার জগতে বৈরিতাবোধ ঐ আলোকনে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে মাত্র, আগে চলে যায় নি. কারণ শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমের বৈরীভাব যায় নি. ব্যক্তিগত সম্পত্তিও পুঁজি ও সামন্ত-যুগের আকারে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তাই আজ-বৈরিতায় অভিশপ্ত মানুষ (শ্রমিক) ডঃ জেকিলের মানুষী সত্তা বহন করেও মিঃ হাইড হিসেবে জীবন কাটায়। মানুষ-প্রজাতির মৌল মূল্যবোধ অর্থাৎ ভালোবাসা, সহযোগিতার মূল্যবোধ ব্যক্তিকেন্দ্রিক মূল্যবোধে দাঁড়িয়ে যায়, যদিও ব্যক্তির ঐ মূল্যবোধ সামাজিক ক্ষেত্রে কার্যকরী মূল্যবোধের প্রতিবিম্ব বা নিয়ামক কিছুই নয়। চৈতন্যের জগতে বন্দী হয়েছে বলেই সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার বিরোধ এত তীব্র হয়। তাই একদিকে যখন মানুষ জন্মপ্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করে তার প্রজাতি-ধর্মের বলে, অন্যদিকে পারস্পরিক সম্পর্কে বৈরিতাবোধ তীব্রতর হয়। তাই সভ্যতার অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থপরতা, সীমাহীন লোভ ইতরপ্রাণীদের স্তর না থেকে সূক্ষ্মতার অনেক বেশি মূলধন হয়, বিশ্বের ঘৃণা হিসেবে জন্মান্তর লাভ করে। বৈরিতাবোধ চৈতন্যের জগতে সাম্রাজ্য গড়েছে বলে বুদ্ধিকে বিশ্বস্ত দূতী হিসেবে পায়, বলে অগ্নি থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের, জন্মপ্রকৃতির গুহা থেকে আণবিক্ষার কলা পরমাণবিক শক্তি থেকে আণবিক অস্ত্রের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং বর্তমান যুগে মানুষ-প্রজাতির বাস্তবতায় চৈতন্যের অভিষেক করতে হবে, কিন্তু চৈতন্যের জগতে সেই জন্যই বৈরিতাবোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রয়োজন, যতটা প্রয়োজন অর্থনৈতিক বিকাশের পরিপন্থী প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে। কারণ এ যুগের শ্রেণীসংগ্রাম বিগত যুগসমূহের সকল শ্রেণিসংগ্রামের চেয়ে অধিক মৌলিক, কঠিন ও ভিন্ন চরিত্রের কারণ শ্রেণিসংগ্রাম মানুষ-প্রজাতির মধ্যে আরোপিত শ্রেণীবাদের বিরুদ্ধে। এ যুগের শ্রেণিসংগ্রাম মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নতুন, সম্পূর্ণই নতুন অধ্যায় রচনার সংগ্রাম—যে সংগ্রাম শুধুই অর্থনৈতিক বিকাশের উপর নির্ভর করে না, করে শ্রেণিচেতনার উপর, জ্ঞানের বাস্তবতার উত্তরণের উপর, মানুষের বিশ্বসত্তার আত্মোপলব্ধির উপর, করে সংগঠিত জনশক্তির উপর। তাই মার্কস মানুষের মুক্তির জন্য ডাক দিয়েছেন দুনিয়ার শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ হতে, সাম্যবাদী সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়ে।

সভ্যতার বিবর্তনের উপরোক্ত মার্কসীয় বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে দু'প্রকার আপত্তি উঠতে পারে। প্রথমত, মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্কে যে মূল প্রস্তাবনা (premise) থেকে মার্কসের বিশ্লেষণের সুরু, সেই প্রস্তাবনা (অর্থাৎ প্রকৃতিগত চরিত্রের বশে মানুষ সামগ্রিকভাবে বিকশিত হতে চায়) সুস্পষ্টভাবে কোথায়ও মার্কস উল্লেখ করেন নি। যদি ধরেও নেওয়া যায় তিনি উল্লেখ করেছেন এক্ষ পরোক্ষভাবে, স্মরণ রাখতে হবে তখন মার্কস হেগেল, ফয়েরবাক্, হেস প্রমুখ দার্শনিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিলেন, সুতরাং ১৮৪৪-এর পুঁথিখানায় নিখিল চিন্তার প্রণালীতায় নিজেকে মেলে দিয়েছেন। পরবর্তী মার্কস অর্থাৎ ১৮৫৭ এর পরবর্তী মার্কস অনেক পরিণত এবং একমাত্র নির্ভরযোগ্য। অন্য কথায় মার্কস অমার্কসবাদী স্তরে ঐ পুঁথি লিখেছিলেন, সুতরাং ঐ পুঁথির উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কসীয় চিন্তার ধারাকে পরিচিত করানো ঠিক নয়। জ্ঞান, চৈতন্য, মূল্যবোধ প্রসঙ্গে তাই মার্কসের ফয়েরবাকের উপর আলোচনা ও জার্মান দর্শনের আলোচনা উল্লিখিত হয়। দ্বিতীয়ত, ১৮৪৪-এর পুঁথির সঙ্গে মার্কসের পরবর্তী আলোচনার কতকগুলো মৌলিক ব্যাপারে সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না, যেমন অনেক সমালোচক[১৯] অভিযোগ করেন যে আত্ম-বৈরিতা সম্পর্কে কোন কথাই তাঁর The German Ideology পুস্তিকাতে খুঁজে পাওয়া যায় না, সুতরাং এ সিদ্ধান্তে আসা হয় যে মার্কস জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রমিক আন্দোলনের ঝোঁকে বৈরিতাবোধের সমস্যা থেকে অর্থনীতিবাদে (Economism) সরে এসেছেন।[২০] এবং দাবাবাদ তাঁর অর্থনীতিবাদের উপর বসানো কল্পনা।

উপরোক্ত উভয় দৃষ্টিভংগী এ বিষয়ে একমত যে মার্কস চিন্তার দিক থেকে

---

১৯ Robert Tucker—Philosophy and Myth in Karl Marx, Pp. 136-149

Pp. 170-174

২০ কেউ কেউ মনে করেন যে যুবক মার্কসই প্রকৃত মার্কস, বয়সে পরিণত মার্কস হেগেল। যেমন লেশেক কোলাকোস্কি মনে করেন, যুবক মার্কসের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৪৪-এর পুঁথিতে মার্কস যে বৈরিতার তত্ত্ব এনেছেন, ঐ তত্ত্ব তাঁর জ্ঞানতাত্ত্বিক অপরিণত রূপ। মেথিন ও এংগেলসই মার্কসের জ্ঞানতত্ত্বকে প্রয়োগবাদী বিচ্যুতির পথে টেনে এনে অমার্কসীয় করে তুলেছেন। এই বিচ্যুতির পথ অবশ্য তাঁর মতে পরিণত মার্কসই প্রশস্ত করেছেন।—*Karl Marx and Classical Definition of Truth* : Leszek Kolakowski—article in *Revisionism* (collection of articles) *Ed. by L. Labedz.*

ছ'জন ছিলেন। কিন্তু কেউ বয়:প্রাপ্ত মার্কস, আবার কেউ যুবক মার্কসের মধ্যে প্রকৃত মার্কসকে খুঁজে বেড়ান। প্রথমোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী এমন মার্কসবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী যারা মার্কসের বৈরিতাতত্ত্বে বিপদ খোঁজেন। কারণ, মার্কস বলেছেন, বৈরিতা-বোধের জন্মভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অর্থাৎ চৈতন্যের জগতে মানুষ-প্রকৃতির বাস্তবতা-বিবর্জিত জ্ঞান ও মূল্যবোধই ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে বোধের জগৎ বাস্তবতার জগতের তুলনায় সংকীর্ণ ব্যক্তিগতসম্পত্তি-বোধের পূর্বেও পরেও, তাই জ্ঞান জ্ঞান হিসাবে কোনদিনই চরম নয়, বাস্তবতার পুরো প্রতিফলন নয়, শুধু বলা যায় ঐতিহাসিক রূপবিবর্তনে জ্ঞানের সঙ্গে বাস্তবতার বিরহ কমে যাচ্ছে। এভাবে বলা যায়, মার্কসের ঐতিহাসিক জ্ঞান ও তাঁর কালের বাস্তবতার বিকাশের অবলম্বনসমূহের নিরিখে ঐ কালেই সত্য, পরবর্তীকালে সত্য হবেই বলা যায় না। আবার মার্কসের সময়ে মার্কসবিরোধী ঐতিহাসিক জ্ঞানও যদি প্রয়োগ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহলে তাও মার্কসের জ্ঞানের মতো সমপরিমাণ সত্য। তাহলে জ্ঞান কতটা বাস্তব তা পূর্বাহ্নেই (a priori) জানা যাচ্ছে না, বিশেষ করে যে জ্ঞানকে গবেষণাগারে পরীক্ষা করে সত্যতা প্রমাণ করার উপরই তার বাস্তবতা নির্ভর করছে।[২১] অর্থাৎ মার্কসের বৈরিতাতত্ত্ব মার্কসবাদীকে এমন জায়গায় নিয়ে যায় যেখানে মার্কসবাদী সাম্যবাদী আন্দোলনের মূল্যবোধগত, ঐতিহাসিক জ্ঞানগত প্রশ্নে অনির্দেশ অবস্থায় চলে যান। তাই বৈরিতাবোধের মার্কসীয় তত্ত্বকে নীরবতার দ্বারা পরিহারের প্রচেষ্টা।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গী মার্কসের মানুষকে অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পুতুল হিসেবে দেখেন, অর্থাৎ মার্কস মানুষকে নিছক জীবসত্তার অধিকারী অন্য জীব হিসেবে দেখেছেন এবং সাম্যবাদীগণ 'অতিমানুষ' হিসেবে ঐ অন্য জীবদের অর্থ-নৈতিক মুক্তি আনবেন। অর্থনৈতিক মুক্তি আনলেই নাকি মার্কসীয় মতে মানুষ-প্রকৃতি হারানো স্বর্গে ফিরে যাবে।[২২]

এই প্রবন্ধে মার্কসের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর, তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের বিশদ আলোচনা

---

২১ অধ্যাপক ইকার বলেন, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ মার্কসের মতে paradise lost. কারণ মার্কসের মতে তা আদি আদিম সাম্যবাদী অবস্থা থেকে পিছু হটে আসা। সাম্যবাদে পৌঁছলেই নাকি আবার স্বর্গ ফেরা যাবে। এ প্রসঙ্গে এ প্রবন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। Communism—The Self Regained পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২২ এ বক্তব্য দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনে ধীরা মার্কসবাদের সংস্কারে সচেষ্ট, তাঁদের মধ্যেই অধিক দেখা যায়। যে কারণে কোন সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বে আলোড়নের

করা সম্ভব নয়। তবে একথা বলার প্রয়োজন রয়েছে যে দার্শনিক দৃষ্টিভংগীর দিক থেকে যদিও মার্কস হেগেলের নিকট ঋণী, ফয়েরবাখের বস্তুবাদকে হেগেলীয় ভাববাদের বিরুদ্ধে মূল্যবান প্রতিক্রিয়া বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন, নিজের দৃষ্টিভংগীতে তিনি হেগেল ও ফয়েরবাখ্ থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন, এ স্বাতন্ত্র্যকে বুঝতে না পারলেই তাঁকে দু'ভাগে বিভক্ত করবার প্রবণতা আসে। যে বৈশিষ্ট্যবোধ আদিম মানুষের মনে আসে, সেই বোধকে আগে, জিজ্ঞাসাকে পরে, এভাবে তারা খানিকটা বেপরোয়া গোছের হয়ে দাঁড়ায়। মার্কসের মানুষ-প্রজাতি সম্পর্কে প্রস্তাবনা ভালোবাসা ও সহযোগিতা অর্থাৎ বিশ্বজনীনতা বর্তমান প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিশেষত প্রাণীবিদ্যার উৎকর্ষের আলোকে প্রজাতিগত ধর্ম সুতরাং যৌল বাস্তবতা। এই বাস্তবতা অর্থনৈতিক বিকাশের পথেই স্থান, কাল ও বস্তুর বিভিন্ন বিন্যুতে নিজেকে প্রসারিত করবার বাস্তবতাতেই মানুষের মনে বৈশিষ্ট্যবোধের জন্ম। উৎপাদিত দ্রব্য মানুষের জৈবিক অস্তিত্বের নিয়ামক হিসেবে একমাত্র সত্য হয় বলেই দ্রব্য তার কাছে অসার অথচ প্রয়োজনীয় আপাতক বা মৌগী হিসেবে প্রতিভাত হয়, যদিও মানুষ-প্রজাতির বাস্তবতার আলোকে উৎপাদিত দ্রব্য হলো মানুষ কর্তৃক তার অকৃত্রিমপ্রকৃতির মধ্যে তার শিল্পীসত্তার, তার সামগ্রিকতার সত্তার প্রকাশ। সুতরাং সামগ্রিকতার সত্তার অর্থনৈতিক বিকাশের ঘটনাতেই (এক্ষেত্রে প্রাক্-ব্যক্তিগত সম্পত্তির যুগে উৎপাদনের ঘটনাতেই) মানুষের প্রজাতিগত বাস্তবতার সংগে চৈতন্যের স্বকীয়তার উদ্বোধনও বিশ্লিষ্টতার সৃষ্টি। সুতরাং ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়তে হবে, না পরে হবে— এ প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু চৈতন্যের বিশ্লিষ্টতা সামগ্রিকতার বিকাশের দিক থেকে আপেক্ষিক, কারণ চৈতন্য বস্তুনিরপেক্ষ নয় বলেই নিজস্বগতিতে এক বিশ্লিষ্ট বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে না, চৈতন্য তাই আবার ফিরে আসে প্রজাতির ধর্মের আকর্ষণে। জ্ঞান তাই অবাস্তবতার রাজ্যে স্থির থাকে না, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসায় জর্জরিত হয়ে, বাস্তবতার বিকাশের দাবীতে সে ফিরে আসে পৃথিবীতে, নিজেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, বাস্তবতায় তার প্রতিফলন দেখতে গিয়ে নিজেই পরিবর্তিত হয়, সংশোধিত হয় এবং বিকশিত হয়। সুতরাং জ্ঞানকে গোঁড়ামিতে পরিণত করতে না পারলে মার্কসবাদী সাম্যবাদী আন্দোলনে শক্তি পাবেন না বা অনির্দেশ অবস্থায় চলে যাবেন— এ ধারণা এমন কিছু

সমাজতন্ত্রের ইংগিত মার্কসের নিকট থেকে না মার্কসের নামে সৃষ্টি করে অনেকে খ্যাতি পান। উপরোক্ত দৃষ্টিভংগি প্রতিফলিত হয়েছে কোলাকাউস্কির লেখায়, যিনি মার্কসবাদে আধুনিক অস্তিত্ববাদের ছায়া খুঁজে পান, এবং যাঁরা মার্কসবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ঔর জানতত্ত্ব।

দার্শনিকদের উক্তি, যাঁদের মার্কস পৃথিবীতে বৈরিতাবোধ পরিমাপের উৎকৃষ্ট মানদণ্ড বলে অভিহিত করেছেন। মার্কসের ঐতিহাসিক জ্ঞানই যে একমাত্র সত্য হবে, একথা মার্কস কোথাওও বলেন নি। তাছাড়া মার্কসের ধারণানুযায়ীই মানুষ-প্রজাতির জ্ঞানের সীমারেখা সেকালের বাস্তবতাধিকারের চৌহদ্দিতে, সেখানে মার্কস-পরবর্তী কেউ যদি জ্ঞানের উৎকৃষ্টতায় মার্কসকে ছাড়িয়ে যান, তাতে সাম্যবাদীর বিচলিত হবার কি আছে? সাম্যবাদীর সাম্যবাদ তো মানুষ-প্রজাতির জন্য, মার্কসের জন্য নয়। তাই সাম্যবাদীকেই তার জ্ঞানের বিকাশের প্রশ্নে, বাস্তবীকরণের প্রশ্নে, মানুষ-প্রজাতির যৌথ কর্মকে জীবনচর্যার আনবার প্রশ্নে সর্বাধিক সচেষ্ট থাকতে হবে।

অধ্যাপক টুকারের যুবক-মার্কসের বৈরিতা তত্ত্বের বিশ্লেষণ মার্কসীয় বিশ্লেষণের ধারা সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা থেকে এসেছে, তাই তিনি মার্কসীয় বৈরিতাতত্ত্বকে একজন ব্যক্তি মানুষের আত্ম-বৈরিতা হিসেবে দেখেছেন, এবং ঐ আত্ম-বৈরিতার সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের সংগতি খুঁজে পান না। এ প্রসঙ্গে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে, সুতরাং পুনরাবৃত্তি করবার প্রয়োজন নেই।[৫০]

৪

একথা ঠিকই যে ইতিহাসের বৈরিতাযুক্ত প্রকাশের জন্য মার্কস নির্ভর করেছিলেন শিল্প-শ্রমিকশ্রেণীর ওপর, কারণ সত্তাতার অর্থনৈতিক বিকাশে উক্ত শ্রেণী প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, অথচ ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ এ শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা দুর্বল। তাই সাম্যবাদী দল গঠনে শ্রমিক শ্রেণীরই এগিয়ে আসা প্রয়োজন—একথা তিনি বারবার ঘোষণা করেছিলেন। মধ্যবিত্ত সমাজের বৈপ্লবিক

৫০ মার্কসের বৈরিতাবোধের ভিত্তি শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের আত্ম-বৈরিতা নিয়ে গড়া নয়। তাছাড়া আত্ম-বৈরিতা অর্থে নিছক ব্যক্তির অন্তঃকার আত্ম-বৈরিতা মার্কস বোঝাতে চান নি, আত্ম-বৈরিতার উৎস হলো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের (উৎপাদন ক্রিয়ার মাধ্যমে) বৈরিতায়। তাই আত্ম-বৈরিতা ব্যক্তিমানুষের আত্ম-বৈরিতা শুধু নয়, মানুষ-প্রজাতির আত্ম-বৈরিতা (human self-alienation)। মার্কসের এ প্রসঙ্গে উক্তি—The possessing class and the proletarian class represent one and the same human self-alienation. But the former feels satisfied and affirmed in this self-alienation, apprehends the alienation as its own power, and possesses in it the appearance of a human existence; the latter feels annihilated in this

করতার তিনি আস্থা স্থাপন করেন নি, কারণ সমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ার যে স্তরে রয়েছে, তাতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পত্তিবোধ জনিত বৈরিতাবোধের বিরুদ্ধে শ্রেণী-চেতনার সংগ্রাম করতে পারবে না। কিন্তু 'পবিত্র পরিবারে' তিনি বলেছেন যে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক ও সমাজের মৈত্রীসম্ভাবনা থাকে, কারণ শেষোক্ত দুই শ্রেণীও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই উক্ত মৈত্রী সংগ্রামী চরিত্র পেতে পারে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করে মার্কস বাস্তবিকভাবেই এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সভ্যতার পুঁজিবাদের যুগে সভ্যতার সমধিক বিকাশস্থান ক্ষেত্রে অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বই মৌলিক অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং মানুষ-প্রজাতির ঐ অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে ফেলার মধ্যেই সভ্যতার মুক্তি রয়েছে। তাই অর্থনৈতিক শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে সংগ্রামকেই তীব্র করতে হবে। শ্রেণীচেতনায় মানুষ-প্রজাতিকে আলোকিত করতে হবে তার জ্ঞানে, চৈতন্যে।

বিংশ শতাব্দীর ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং মানুষ পৃথিবীর নতুনতর অর্থনৈতিক বিকাশ, মানুষের বৈরিতাবোধের জগতে নতুন আলোড়ন, মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নতুন প্রশ্নের আলোকে মার্কসের সিদ্ধান্তকে বাস্তবতার সরলীকরণ বলে মনে হয়। মার্কসের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিত গোটা সভ্যতার ইতিহাসকে নিয়ে, সন্দেহ নেই, কিন্তু মার্কসের মৃত্যুর পরে পৃথিবী বিকাশের যাত্রার বেগবেগে আবর্তিত হয়েছে, ধনতন্ত্র বেগবেগে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতে এ যুগের সভ্যতার সংকট বা প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধুই অর্থনৈতিক সংকট মুক্তির অনুপস্থিতিকে কেন্দ্র করে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বৈষম্যিক বিকাশের ফলে—এ ধারণা একটু বেশবেগে প্রকৃতির। (এর দ্বারা অবশ্য এ কথা বোঝায় না যে মার্কসের কালের বিশ্লেষণে মার্কস সত্য ছিলেন, বস্তুতঃপক্ষে তাঁর বিশ্লেষণের সত্যতার আংশিক যাচাই[২৮] হয়েছিল সোভিয়েত বিপ্লবে, তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক বৎসর

alienation, sees in it his own impotence and the reality of a non-human existence. To use an expression of Hegel's, it is a depravity in revolt against this depravity, a revolt necessarily aroused in this class by the contradiction between its human nature and its life-situation, which is a manifest, decisive and total negation of this nature. *The Holy Family*, p. 175

২৮ সমাজবিজ্ঞানের সত্যতার যাচাই-প্রণালী (method of verification) প্রকৃতি-

পরে ; মার্কসীয় জ্ঞানের সামগ্রিক সত্যতা মার্কসও আশা করেন নি, তবে বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ককে দেখার প্রণালী অর্থাৎ দ্বন্দ্ব-প্রণালী মানুষের ইতিহাস বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আপেক্ষিক অর্থে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।)

অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে চারটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য বিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক সমাজে ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় নতুন।

প্রথমত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকটি দেশে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্র মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে বাস্তব ছিল। যদিও গত শতাব্দীর শেষার্ধে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রসার ঘটে, বিংশ শতাব্দীতেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বাস্তব রূপায়ণ দেখা যায়। পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় দু'দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, অর্থনৈতিক বিকাশ সমাজতন্ত্রে ধনতন্ত্রের তুলনায় অনেকখানি অধিক গতিশীল, এ ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সকল পরিচালনা মানুষের মূল্যবোধে, জ্ঞান ও চৈতন্যের জগতে অনেকখানি পরিবর্তন এনেছে। অর্থনৈতিক সমতাকে ভিত্তি করে সমাজ গঠন সম্ভব — এ ধারণা মানুষকে অনেকখানি আত্মশক্তি দিয়েছে। ফলে সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশেও অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার পূর্বের তুলনায় অনেক অধিক স্বীকৃত হয়েছে। ধনতান্ত্রিক দেশের অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যস্ত মানুষ শ্রমিক-আন্দোলনের সফলতা ও ধনতন্ত্রের ব্যবস্থাগত ব্যর্থতা সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়েছে। এদিক থেকে সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়কে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যায়।

দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশে

শিক্ষায় থেকে আলাদা। কার্ল পপারের ভাষায় কিছু কিছু ধার্মিক, জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সত্যতার যাচাই-প্রণালী যে পৃথক হবেরই, এ কথা মনে না রেখে মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্ব প্রয়োগ করলেই মার্কসের জ্ঞান বা বিশ্লেষণকে অনিবার্যভাবে অবজ্ঞায় দিয়ে যায়। বাস্তবতার টুকরো টুকরো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অংশ বিভিন্ন স্তরে সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে চৈতন্যে প্রবেশ করলেই, সেটাকে জ্ঞান বলা যায়। সুতরাং জ্ঞানের সত্যতার পরীক্ষা ঐ বস্তুখণ্ডের সম্পর্কের চৈতন্যগত অবয়বনের পরীক্ষা, বস্তু আছে কি নেই তার পরীক্ষা নয়। ইংরেজীতে যাকে 'অবজেক্ট' বলা হয়, সেই 'অবজেক্ট' সম্পর্কে জ্ঞান যাচাইয়ের ব্যাপারে সত্যতার ক্ষেত্রে জ্ঞান 'অবজেক্টিভ' হয়। তবে 'অবজেক্টিভিটি' পরীক্ষা প্রত্যক্ষে ও অনুমানে, আর্টে বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় একই প্রণালীতে হয় না।

জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে, এবং এশিয়া আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। যে গতিতে শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বর্তমানের নব স্বাধীন দেশগুলো অনেক দ্রুততর গতিতে ঐ অধিকারের প্রতিষ্ঠা করেছে। ঐ সকল দেশের শাসকশ্রেণী ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক পর্যায়ে থেকেও ধনতন্ত্রকে 'প্রগতিশীল' রূপ দেবার চেষ্টা করছেন, কারণ তাঁদের উপলব্ধিতে ধনতন্ত্রের উনবিংশ শতাব্দীর সংকটময় বিংশ শতাব্দীতে অচল অথচ পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ঔপনিবেশিক-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির উত্তরণ দুঃসাধ্য। তাই পার্লিয়ামেন্টারী আইনের চৌহদ্দীর মধ্যে ধনতন্ত্রকে প্রগতিশীল রূপ দেবার প্রচেষ্টা ঐসকল দেশে দেখা যায়।[৫৯]

তৃতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চরম পর্যায়ে যে সকল দেশ একচেটিয়া পুঁজিবাদে প্রবেশ করেছে, সেখানেও নিম্নলিখিত তিনপ্রকার বৈশিষ্ট্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে পুঁজির জৈবিক গঠন (organic composition of capital) এত পরিণত হয়েছে যে তার শ্রম ও সমাজশ্রম দুদিকেই উৎপাদনে শ্রমনিয়োগ কমে গেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে হস্তশিল্প ও যন্ত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও যন্ত্রের প্রসার শ্রমবিশেষীকরণ দেখা দিয়েছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে উক্ত বিশেষীকরণ 'অটোমেশন' পর্যায়ে উঠে এসেছে। ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রথম স্তরে পুঁজির সংগে অর্থাৎ পুঞ্জীভূত শ্রমের সংগে জীবন্ত শ্রমের স্বভাবিত্তিক সহযোগিতা যে পরিমাণে ছিল, পরিণত অবস্থায় উৎপাদন প্রণালীতে ঐ সহযোগিতা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরপক্ষে নির্দিষ্ট উৎপাদন প্রণালীতে মানুষ-শ্রমিকের সংগে মানুষ-শ্রমিকের উৎপাদনকার্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা যন্ত্র-শ্রমিকের উত্তরোত্তর উৎকর্ষতায় কমে গেছে। ফলে, তাৎক্ষণিক দৃষ্টিভংগী থেকে, শ্রমিকের সংগে শ্রমিকের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও উৎপাদনে যৌথ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শ্রমিকের মধ্যে যে সৃষ্টিধর্মী শ্রেণীচেতনা গড়ে ওঠে[৬০], তা আপেক্ষিকভাবে নিষ্ক্রিয়

৫৯ তাৎক্ষণিক, ঐ সকল দেশগুলোর অভ্যন্তর।

৬০ মার্ক্সের মতে, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার তুলনায় ধনতন্ত্রের উৎপাদনপদ্ধতি মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টিধর্মী সহযোগিতাবোধকে ঐতিহাসিক দিক থেকে নতুন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যেখানে বহু শ্রমিকের যৌথ উৎপাদন প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাবোধ এবং শ্রেণীচেতনাকে জাগিয়ে তোলে। তুলনা: Co-operation; Capital, Part V, Pp. 318-319 (Moore & Aveling Edition)

হচ্ছে।[১৭] এই পিছু হটা চৈতন্যের, বোধের অর্থনৈতিক বিকাশের অগ্রগতির তুলনায় অনেকখানি পেছিয়ে পড়া। অটোমেশন যন্ত্রের উৎপত্তি মানুষজাতির সৃষ্টিধর্মিতার প্রয়োগকে একটি বিশেষ দিকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যায়, সন্দেহ নেই, কিন্তু অর্থবৈষম্যের ফাঁকে অত্যন্ত মানুষ অটোমেশনের পরিবেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের নির্ভরশীলতাবোধকে হারায় এবং অধিকতর নিঃসঙ্গ, স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত এবং যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। স্রষ্টা সৃষ্টির মানব পরিপ্রেক্ষিতকে হারিয়ে ফেলে তার চৈতন্যে এবং সৃষ্টিকে স্বার্থআদায়ের, তার ঐশ্বর্যলালসাপূরণের উপায় হিসেবে মনে করে। একারণেই বিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্রে শ্রমিক সাধারণের একটা বড়ো অংশ উৎপাদনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের সমৃদ্ধির কারণ হিসাবে দেখে, এবং মূল্যবোধের দিক থেকে অধানুষিক মূল্যবোধের 'অভিজাত শ্রমিকে' পরিণত হয়। পুঁজিপতির সঙ্গে এঁদের ঐক্য মূল্যবোধের জগতে এবং ঐ ঐক্যই এদের পারস্পরিক শ্রেণীবৈরিতাকে স্বার্থের যোগসূত্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য প্রথমটিরই পরিণাম হিসেবে দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্রে যে সকল দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হতো, তার প্রতিটিই ছিল মানুষের তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাগুলোকে পূরণ করবার জন্য, যে কারণে সাম্যতন্ত্রের উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির সংঘর্ষ ও অন্তর্দাহ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক থেকে ধনতন্ত্র উৎপাদনপদ্ধতিগত উৎকর্ষতা এত বৃদ্ধি করেছে যে একচেটিয়া পুঁজিবাদে অতিসঞ্চয় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়।[১৮] একদিকে উক্ত অতিসঞ্চয় সমস্যা অন্যদিকে প্রকৃতি বিজ্ঞানের নতুন ও নতুনতর অনুশীলন ভোগকারীর চাহিদার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, উৎপাদন বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করে। নিশ্চয়ই উৎপাদন বৈচিত্র্য সৃষ্টির (অর্থাৎ নতুন

---

১৭ শ্রমবিশেষীকরণ প্রসঙ্গে ব্র.উস বলেন, ...it (specialisation of the instruments of labour—অ. ব.) presents itself historically as a program and as a necessary phase in the economic development of society, on the other hand it is a refined and civilised method of exploitation. ঐ, Pp. 359.

১৮ বিংশ শতাব্দীর একচেটিয়া ধনতন্ত্রে অতিসঞ্চয় সমস্যা কত তীব্র, তা ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক সিগেটো তুরু (Shigeto Tsuru), তাঁর সম্পাদিত Has Capitalism Changed? গ্রন্থে। বর্তমান বাজার অর্থনীতিতে উৎপাদন বৈচিত্র্য একটা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও অতি-সঞ্চয় সমস্যা তীব্রতালাভ করছে, এই সমস্যাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য একদিকে বেসরকারিখাতে ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে জনসাধারণকে ভোগে প্রলুব্ধ করবার জন্য ভোগ্যদ্রব্যের মূল্যের ঋণের পরিশোধ (Deferred Payments Scheme), এবং কিস্তি-পরিশোধ (Instal-

বিনিয়োগের পথ সহজ) হার সমহারে বৃদ্ধির হারের সঙ্গে পেরে ওঠে না, তবুও উৎপাদনবৈচিত্র্য এত বৃদ্ধি পায় যে সভ্যতার ধনতান্ত্রিক পর্যায়ে ভোগকারীর চাহিদার ধরনও অনেকখানি পালটে যায়। এভাবে উৎপাদন-বৈচিত্র্যবৃদ্ধির ফলে এমন অনেক উৎপাদন দ্রব্যের সৃষ্টি হয়েছে, যে দ্রব্যগুলো উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিককে মানুষ-প্রজাতিগত বাস্তবতার দিক থেকে সৃষ্টিধর্মী বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে— প্লাস্টিক শিল্পের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এমন প্লাস্টিক দ্রব্যসমূহ উৎপাদিত হয়, যে-দ্রব্য রমণীদের তথাকথিত 'সৌন্দর্য-চর্চায়' ভাক্তারের সাহায্যে ব্যবহৃত হয়। সামাজিক জীবনে সামগ্রিক অনিশ্চয়তাবোধের বৃদ্ধির ফলাফলে নতুন নতুন রোগবৃদ্ধি ও নতুন নতুন ওষুধ ও ট্যাবলেট উৎপাদিত হয়। সামাজিক জীবনে সাংস্কৃতিক আবহাওয়া বিষাক্ত বলে সাধারণভাবে ও বিশেষত উৎসবের দিনে বিভিন্ন প্রকার পানীয়, যাহাজানির বিভিন্ন প্রকার ঘরসাজি, ঘলোচিত কস্‌মেটিকের চাহিদা বাড়ে। সাধারণভাবে প্রমবিমুখতা বৃদ্ধির জন্য অনেক অটোমাটিক দ্রব্যের উৎপাদন ঘটে। দ্রব্যের বিভিন্ন 'ব্র্যাণ্ড'-এর মধ্যে প্রতিযোগিতায় বিরাট পরিমাণ বিজ্ঞাপন শিল্প গড়ে ওঠে। চলচ্চিত্রশিল্পের দ্রব্যও মানুষের বৈষয়িক লালসাকে সহজ করবার জন্য উৎপাদিত হয়। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং যে কারণে জড়পদার্থে আয়েয়শক্তির উৎপাদনে শ্রমিকের সৃজনশীল ও শিল্পীসত্তার প্রকাশ ঘটে বলা যায়, সেই কারণে আয়েয়াস্ত্রের শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিককে ঐতিহাসিক দিক থেকে মানুষ-প্রজাতিগত বাস্তবতার দিক থেকে তা বলা যায় না। উৎপাদনের বাস্তবতার জগতে সকল উৎপাদনই সৃষ্টিধর্মিতার প্রকাশ নয়, বরং উৎপাদনের মধ্য দিয়েই শ্রমিক, বিজ্ঞানী, এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির মতো একটা অংশ মানুষের বিশ্বভাবের বিরুদ্ধে যায়, আত্ম-বৈরিতার কুহেলিকায় অধিক পরিমাণে জড়িয়ে পড়ে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য আবার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের অপরিহার্য পরিণামে জন্মলাভ করে। এই বৈশিষ্ট্য হলো, ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রমিক ও মধ্যবিত্তে যে পরিমাণ

---

ment purchase) এবং তাহা পরিশোধ (Hire-purchase scheme) প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছে। মার্কিন অর্থনীতিতে এভাবে অতিসঞ্চয় সমস্যার সঙ্গে আপেক্ষিক ক্রয় ভোগের সমস্যা (problems of relative under-consumption) দেখা দেওয়ার ফলে পরবর্তীকালে বিভিন্ন পন্থায় ভোগবৃদ্ধির চেষ্টা চলতে থাকে এবং এভাবেই মার্কিন অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য অতিভোগ অর্থনীতিতে (High consumption economy) দাঁড়িয়ে যায়। অবশ্য অতিসঞ্চয় সমস্যার প্রতিষেধক হিসেবে বিদেশে বহু দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি, আর্থিক সুবিধা বিস্তারের বৃদ্ধি, লাভ-ব্যয়ভাতের বৃদ্ধিও দেখা যায়।

পার্থক্য ছিল, বর্তমান শতাব্দীর বিশেষত এই অর্থে সেই পার্থক্য ঘুচে যাচ্ছে। লাসালের শ্রেণী-বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে মার্কস বলেছিলেন (ম্যানিফেস্টোতেও বলেছেন), নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্রমশ প্রমিক সাধারণে পরিণত হবে।[২৮] কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে যে কারণে উক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যেকার পার্থক্য ঘুচে যাচ্ছে, তা মার্কস-বর্ণিত কারণের ঠিক উল্টো। বর্তমানে প্রমিক উৎপাদন-ক্রিয়ায় স্পেশালিয়াপনার মধ্যবিত্ত, আবার মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের জগতে 'অভিজাত প্রমিক'। ঊনবিংশ শতাব্দীর মার্কসীয় প্রলেটারিয়েট একচেটিয়া পুঁজিবাদের আশীর্বাদ ও অভিশাপে বিংশ শতাব্দীতে যে শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে, তার চরিত্র কিছুতকিমাকার। যদি নিছক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যবিত্ত বলা যায়, তাহলে বলতে হয়, পরিণত ধনতন্ত্রের বর্তমান অবস্থায় উক্ত মধ্যবিত্তের সংখ্যা গত শতাব্দীর তুলনায় অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার স্বাভাবিক ও বিজাতীয় উৎপাদনে নিযুক্ত সকল প্রমিকের অর্থনৈতিক মানকে ভিত্তি করে যদি মধ্যবিত্ত নির্ণয় করা হয়, তাহলে বলতে হয়, বর্তমান ধনতন্ত্রে প্রলেটেরিয়েট নেই, প্রমিক আছে, যার সঙ্গে মধ্যবিত্তের তফাৎ নেই। অথবা যদি অবসরের সুযোগভোগী দরুণ শ্রেণীকে (leisure class) মধ্যবিত্ত বলা যায়, তাহলেও বলতে হয় প্রমিক-মধ্যবিত্ত উভয়কে নিয়েই বর্তমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী। যে কোন ব্যাখ্যাতেই আর প্রমিক ও মধ্যবিত্তকে আলাদা করা যায় না। এ অবস্থা অধিকতর প্রকট হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী ব্যবস্থায় একচেটিয়া পুঁজিবাদের সংগঠনগত খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছে বিশেষ করে শিল্পতত্ত্বাবধানে তথাকথিত বিপ্লবের (Managerial Revolution) ফলে, যার ফলে প্রমিকও তত্ত্বাবধায়ক হতে পারে, যদি পুঁজিপতির আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয় ও উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক বিসর্জন দিয়ে অভিজাত হয়।

উপরোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য ঊনবিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্রকে বিংশ শতাব্দীর ধনতন্ত্র থেকে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পৃথক করে, যা মার্কস দেখে যেতে পারেন নি।

চতুর্থত, বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী স্থান, মানুষ ও কালের দিক থেকে অনেক ছোট হয়ে গেছে। প্রকৃতি বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতি মানুষের চৈতন্যের জগতে মানুষ প্রকৃতির সম্পর্কের বাস্তবতায় অহং-বোধকে গগনস্পর্শী করে। সমাজ-বিজ্ঞান ও সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারায় মানুষ-মানুষের সহকারী সম্পর্কে নতুন

---

২৮ Critique of the Gotha Programme, P. 84

মূল্যায়নের সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কের মূল্যায়নে যে মানুষ তার জৈবিক বাঁচার প্রশ্নে অবহেলিত, সে বাঁচা তুলবার অধিকারবোধ অর্জন করে। ঐ অধিকার-বোধ স্বাতন্ত্র্যের বোধে জারিত। স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তির, জাতির; তাই চেতনার স্তরে পরিণামে অহংবাদী বিকৃতির, চেতনার স্তরে প্রকৃতি মানুষের ভৃত্য অথবা ক্রীতদাস, চেতনার স্তরে সাম্যবাদী আমেরিকানের শত্রু, 'অবরিটি' ব্যক্তির শত্রু, যন্ত্র ও বিজ্ঞান মানুষের শত্রু।

৬

সভ্যতার বিংশ শতাব্দীর চেহারার তার অন্তর্দ্বন্দ্ব সংকটজনক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

অথচ অর্থনৈতিক বিকাশের প্রশ্নে বিংশ শতাব্দী ঊনবিংশ শতাব্দীকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গেছে, সামাজিক অধিকারের বন্টনগত বৈষম্য কমেছে। যে অর্থে অর্থনৈতিক শ্রেণীকে মার্কস সাম্যবাদী বিপ্লবের সৈনিক হিসেবে দেখেছিলেন, সেই অর্থে 'শ্রেণী'র অবলুপ্তি ঘটেছে; নতুন শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে, যে শ্রেণী মানুষ-প্রজাতির শিল্পীসত্তার প্রকাশে সার্থক এমন বলা যায় না। মার্কসের সময়ে অর্থনৈতিক শ্রেণীর সামাজিক ও মূল্যবোধ গত-অবস্থান যে ভাবে ছিল, বর্তমান দিনে সে ভাবে নেই, পূর্বে যেখানে শ্রেণী-বৈরিতাকে শ্রেণী-চেতনার উত্তরণ ঘটিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম করানো যেত, এ যুগে সেটা সম্ভব নয়, কারণ মূল্যবোধের জগতে শ্রেণী বিভাগ তো সম্ভব নয়ই, অর্থনৈতিক জগতেও পূর্বেকার শ্রেণী বিভাগ বিকাশের ধারায় পরিবর্তিত হয়ে যে শ্রেণী বিভাগে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই শ্রেণী বিভাগ সমাজবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে, সভ্যতার বিবর্তনের বর্তমান পর্যায়ে গুরুত্ব লাভ করছেনা। পুঁজিপতির অর্থনৈতিক বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে যে নতুন শ্রেণী বর্তমান ধনতন্ত্রে দেখা যায়, সে শ্রেণীর শ্রেণী-চরিত্র বলে আমরা কিছু পাইনা, বস্তুতঃ যেটা পাওয়া যায় সেটা হলো 'জন খণ্ডলী'—ঐ জনখণ্ডলী খণ্ডলী হিসেবে সত্তা হয় যখন পুঁজিপতির বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জীবিকার প্রশ্নে, জীবন যাপনের প্রশ্নে দাঁড়ায় এবং একমাত্র জীবিকার প্রশ্নেই আবদ্ধ থাকে। যথার্থ বিপ্লবী যে শ্রমিক শ্রেণীকে মার্কস কল্পনা করেছিলেন, সেই শ্রেণী এ যুগে নিছক শ্রমজীবীকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে না, গড়ে ওঠে যথাবিত বুদ্ধিজীবীকে নিয়ে, একমাত্র ঐ সকল শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে, বিজ্ঞানীকে নিয়ে, যারা সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের সত্তাকে মানব করে, মানবতাকে

বিকাশমান করে। পূর্বে যেখানে শোষণের ভিত্তি সামগ্রিকভাবে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর পারস্পরিক উৎপাদন সম্পর্কে ছিল, এখন ঐ ভিত্তি, বিস্তৃত হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণীর বর্তমান পর্যায়ের অন্তস্তলে. শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই শোষক ও শোষিতের সৃষ্টি হয়েছে, প্রত্যক্ষ ভাবে না হোক, পরোক্ষ ভাবে। অন্যদিকে এখানেই যে পুঁজিপতি শ্রেণীকে বাদ দিয়ে যে জনসাধারণ হয়েছে, তাদের মধ্যেকার শোষণের সম্পর্ককে পুঁজিপতি-শ্রমিকের শোষণের সম্পর্কের ন্যায় প্রত্যক্ষ ভাবে অর্থ নৈতিক শ্রেণীবিভাসের ভিত্তিতে রাখা যায় না. অথচ ঘটনা হিসেবে সত্য যে উৎপাদন বৈচিত্র্যে এখন অনেক উৎপাদন হয়েছে, যার লক্ষ্যই হলো মানুষকে ভাগে করা. যে উৎপাদন বেঁচে থাকতে পারে একমাত্র রুচি বিকৃতিকে ভরসা করে, যে উৎপাদনের লক্ষ্যই হলো মানুষকে প্রবঞ্চনা করা। এই অনুৎপাদক শ্রমিক জনসাধারণের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে।

অর্থ নৈতিক অবস্থা উৎপাদনের ঘটনাতেই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী হিসেবে স্বৈত অবস্থান শ্রেণী চরিত্রকে পরিবর্তন করে, উক্ত শ্রেণীর কাছ থেকে শ্রেণী-বোধের বাস্তবতা বা শ্রেণীচেতনা সরে যায়। সাধারণ ভাবে তাই ব্যক্তি-শ্রমিক ব্যক্তি-শ্রমিকের সঙ্গে একত্রে চলতো আন্দোলনের পথে পা দেয়, কিন্তু সে আন্দোলন ব্যক্তির স্বার্থবোধ থেকে, শ্রেণী স্বার্থের জন্য নয়। সমাজ ও অর্থ-নীতির পিরামিডে তাই ব্যক্তি-শ্রমিক পূর্বের তুলনায় উপরে ওঠে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই ওঠাতে প্রত্যয় থাকে না, শ্রেণী-বোধ কাজ করে না।

পাশাপাশি মূলবোধের জগতে বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি, সে শ্রমিকই হোক, বুদ্ধিজীবীই হোক, ভয়ংকর ভাবে বিধ্বস্তিত হয়ে বাঁচে। এরিক ফ্রম বলেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর তুলনায় তো বটেই, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বর্তমান শতাব্দীর মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে পেরেও অধিকতর অসহায়তা বোধ, নৈরাশ্য ও নিষ্ঠুরতায় জীবন কাটায়। প্রোটেস্টান্টবাদ মানুষকে অথরিটির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে, ধনতন্ত্র মানুষকে অর্থনৈতিক দিক থেকে 'ব্যক্তি' হিসেবে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিণামে মানুষকে একটা সৃষ্টিছাড়া 'স্বাধীনতা'র রাজ্যে ছুঁড়ে ফেলেছে, ব্যক্তিস্বাধের মরীচিকা-রাজ্যে তার চৈতন্যকে ঠেলে দিয়েছে, যেখানে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ, দুর্বল, তাই পাশবিক। ঐ নিঃসঙ্গ ব্যক্তি শ্রমিক হিসেবে উৎপাদন করে শুধু এ ধারণায় যে ফলশ্রুতি তার পক্ষে নয়, কিন্তু মজুরী পাবে। এই মজুরীর স্তরে তার স্বার্থ-

বোধ কাজ করে, ঐ স্বার্থ-বোধই তার কল্পনা-বোধকে উপেক্ষা করে, পুঁজির জন্য তার প্রয়োজনের বাস্তবতাকে তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখে।**

বুদ্ধিজীবী জনসাধারণ যারা বর্তমান সমাজে রাজনৈতিক উত্থান-পতনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে, এক কথায় জ্ঞানের দ্বারা বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার প্রশ্নে সক্রিয় ও মুখর, এমনই অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যে চিন্তাধারায়, মূল্যবোধে আত্মজিজ্ঞাসার নয়ক ও পৃথিবীর পথে আনাগোনা করে। এঁদেরও জীবন ধারণের উপায় মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই একদিকে এঁদের চিন্তা-ধারায় যেমন আত্মকেন্দ্রিক, সংকীর্ণ, সাত্ত্বিক মেকিয়াভেলি-হীচের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে, তেমনি এঁদেরই চিন্তাধারায় ভগবান ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেন। ব্রুনের মতে ফ্যাসিবাদী জার্মানীতে এঁদেরই একটি অংশ ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা হয়, অন্য একটি অংশ সংগ্রামে এগিয়ে আসে। অল্পচেষ্টায় পুঁজিপতির ন্যায় এঁদের সত্তা পুঁজির জন্য উৎসর্গীকৃত নয়, তাই মূল্যবোধের ক্ষেত্রেও পুঁজি-পতির ন্যায় ফ্রাংকেনষ্টাইন রূপে বাঁচতে পারে না। আবার শ্রমিক সাধারণের অর্থনৈতিক বাস্তবতাও এঁদের জীবনে অনুপস্থিত, তাই শ্রমিকের স্বার্থবোধ ও অমানুষিক অবস্থা এঁদের মনে করুণা ও ভালোবাসার বা ঘৃণা ও অবহেলার উদ্রেক করে ঠিকই, কিন্তু শ্রমিকের জীবন কর্মের গতিশীলতা ও সংকীর্ণতার সঙ্গে এঁরা একাত্ম হতে পারেন না। পরিণামে তাই চিন্তাধারায় এঁরা কেউ অসুর, আবার কেউ সুর, পুঁজিপতির পিতা, আবার কখনো শ্রমিকের নেতা, আবার কখনো কখনো জ্ঞানে, জীবিকা, অনুভূতি ও চিন্তার চৌঘোহানায় অতীন্দ্রিয়, লোলোকর্ষিয়ার ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত ও নির্বোধ। গোটা উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ও দৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এসব সত্ত্বেও সভ্যতার 'প্যারাডক্স' হলো ইতিহাস বাস্তবতার তিনটি দিগন্তেই জানা যেলে, 'ট্রাজেডি' হলো জানার গতি কূল খুঁজে পায় না। বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি মানুষ-প্রকৃতির সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয়কে তাই আত্মঅহংকারে পরিণত করে, প্রকৃতিকে তার অনুদের হিসেবে আবিষ্কারের পরিবর্তে তাকে জয় করতে যায়; বৈষয়িকবোধের আধিক্যতায় প্রকৃতির শক্তিকে যারণ্যে রূপায়িত করে, আর সেই যারণ্যের সত্তা থাকে তারই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষ, শুধু

** Objectively he (modern man) became a servant to ends which were not his, and yet that subjectively he believed himself to be motivated by his self-interest... [Erich Fromm—*The Fear of Freedom*. Pp. 98-99]

প্রকৃতিরই নয়, মানুষেরও প্রভু হতে চায়, কারণ সে বৈরিতার দাস, নিজেকে টুকরো টুকরো করে অসহায়, দুর্বল, তাই পাশবিক।

অর্থনৈতিক প্রভুত্বের সুযোগভোগে রক্তিত আপামর জনসাধারণও ঐ আত্মঅহংকারের বশে মানুষ-প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্কের, প্রজাতির অন্তর্নীন আত্মীয়তার সম্পর্কের, এমন কি নিজের জীবসত্তার সঙ্গে নিজের বিশ্বসত্তার সম্পর্কের বাস্তবতাকে চৈতন্যে, জীবনচর্যায় খুঁজে পায় না। পরিণামে তাদের মধ্যেও অসহায়তাবোধ আসে। ঐ অসহায়তাবোধেই একালের মানুষ আবার 'অথরিটি' খোঁজে, যে তাকে বুদ্ধির দিক থেকে আশ্রয় দেবে, আবেগের দিক থেকে তাৎক্ষণিক অবলম্বন দেবে, স্বার্থ ও ক্ষমতায় তাদের তুলে ধরবে, জ্ঞান, বোধ ও চেতনায় সায়লো শক্তি দেবে এবং নিঃসঙ্গতাবোধের দিক থেকে তাকে নির্বিশেষবোধে (consciousness of generality) মুক্তি দেবে।

চৈতন্যের রাজ্যে 'অথরিটি' খুঁজতে গিয়ে ফ্যাসিবাদের সম্ভাবনা যেমন উজ্জ্বল হয়, তেমনি অসহায় মানুষ শৈশবে ফিরে যেতে চায়, অথবা জীবনসংগ্রামে পরাজিত হয়ে হয়ে সাম্যবাদী দলে ভীড় করে সাম্যবাদের তাৎপর্য না বুঝেই এবং যাত্রার দলের 'কাস্টে' নিজেকে উৎসর্গ করে। যেখানে শূন্যতার মধ্যে অথরিটি-বোধ আশ্রয় চায়, সেখানে মানুষ নিজেকে কিছু ধর্ম-অনুশাসনে বাঁধতে চায় এবং কথামালার নীতিবোধের বিমূর্ত জগতে বাস করে। অথরিটি-বোধ যখন অন্ধ বৈরিতায় মানুষকে তাৎক্ষণিকতায় নিয়ে যায়, তখন স্বার্থপরতা, লোভ ও ঘৃণা জীবনচর্যার ভিত্তি হয়, স্বাভিজাত্যে আনন্দ আসে, মূল্যবোধে ইয়াংকি এবং হৃদয়বৃত্তিতে স্থূলিংস হয়।

সভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্বের মৌল চরিত্র অর্থাৎ সমগ্রতার সঙ্গে সমগ্রতাহীনতার লড়াই একই থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীর তুলনায় বিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্বের শক্তি সমাবেশে পরিবর্তন ঘটেছে। এ যুগে একদিকে সমগ্রতার বিকাশমান বাস্তবতা সমৃদ্ধিলাভ করে, অন্যদিকে মানুষের সমগ্রতাবোধ শিথিল হয়ে, একদিকে ভালোবাসা ও সহযোগিতার প্রজাতিগত ধর্ম বাস্তবতার বিভিন্ন দিগন্তে উত্তরণের সম্ভাবনায় উজ্জ্বলতর হয়, অন্যদিকে মানবজাতির ধ্বংসের সম্ভাবনাও আশংকা হিসেবে শক্তিশালী হয়, সভ্যতার মহীরুহ যখন গগনচুম্বী হয়, তখনই তার গোটা শেকড় হয়ে টান পড়ে। তাই এযুগের সভ্যতার সংকট মানুষের জৈবিক ও আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের অভাব সংকট। এ সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে শুধুই মানুষ-প্রজাতির জীবসত্তার অর্থনৈতিক নিগ্রহকে কেন্দ্র করেই নয়, অর্থাৎ শুধুই মানুষে-মানুষে

অর্থনৈতিক সম্পর্কজনিত বাস্তবতা নয়, মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্ক এবং মানুষের জীবনসত্তার সঙ্গে তার শিল্পীসত্তার বাস্তবতাও।

এ সংকট পাঁচটার মেলেছে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের বর্তমান স্তরের সঙ্গে, কিন্তু সমাজতন্ত্রের পৃথিবীও এ সংকট মুক্ত নয়, কারণ এ সংকটের ভিত্তি তীব্র বৈরিতাবোধে। ধনতান্ত্রিক দেশে এ সংকট তীব্র, অনুন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে তীব্রতর, কিন্তু সমাজতন্ত্রেও সংকটমুক্তির প্রচেষ্টা উপেক্ষিত।

এটা নিশ্চয়ই সঠিক যে বৈরিতাবোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিছক মূল্যবোধের সংগ্রাম নয়[১], কারণ এ সংকট থেকে মুক্তি সভ্যতার অর্থনৈতিক মুক্তির উপর অনেকটা নির্ভর করছে, কিন্তু এটাও সত্যি যে নিছক অর্থনৈতিক মুক্তির দ্বারা এ সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। তাই বৈরিতাবোধের যে সর্বগ্রাসী চেতনা এযুগের মানুষকে নৈতিক প্রবণতার সামনে, বাস্তবতার অর্থবহের জীবনকে পরিণত করে, যে বৈরিতাবোধ মানুষের ঐতিহাসিক মুক্তির আন্দোলনকে প্রতিপ্রস্ত করে, যে কোন রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক আন্দোলনের প্রাণ ছিনিয়ে ঐ বৈরিতাবোধের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সাজাতে হবে। ঐ পথেই এ যুগের সভ্যতার মুক্তি আসবে।

---

[১] শুধুমাত্র শ্রেণিবোধের কথা বলে সমাজে যে মুক্তি আনা যায় না, তার মূর্তি মূর্তি মূর্তিমান ইতিহাসের পাতায় রয়েছে, যখন সুবিধাভোগী শ্রেণী বাস্তবতাবিরহিত ঐ শ্রেণিবোধকে তার স্বার্থসিদ্ধির এবং অসামাজিক অসভ্যতাবোধের মধ্যে নিজেকে সচিব করে রাখতে চায়। ফরাসি সাথে একসঙ্গে যে অধ্যায় অনুষ্ঠান হয়েছে, তার কারণ ছিল উদ্যোক্তাদের সৈরতন্ত্র ও আন্দোলনের সংকীর্ণতা। উদ্যোক্তাদের সমস্তাবোধের মধ্য সামাজিক অর্থনৈতিক বাস্তবতার সংকীর্ণ ছিল, যেমন ভাবে, বর্তমান যুগে সামাজিক-অর্থনৈতিক সাম্য আনয়নের আন্দোলন মানুষ-প্রকৃতির বাস্তবতার সংকীর্ণ স্থান অধিকার করে, যদি না সামাজিক বৈরিতাবোধের বিরুদ্ধে ঐ আন্দোলন বিস্তৃত হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মের পরিবারে একসঙ্গে অনুভূতির সূত্র হয়ে উঠেছিল শুধুই সভ্যতার নিলয়ন, যুগের 'কমান্ডমেন্টস্' রাজকমিটি ও 'কমন্ডমেন্ট্' বিশ্বের মত আর আমাদের সভ্যতার নিকট ইসলাম উদ্ভবতা। ইতিহাসে যত বড়ো ধর্মপ্রবর্তক পীর পয়গম্বর হয়েছে তাঁরা সোচ্চারে মানুষে-মানুষে ভালবাসার কথা ঘোষণা করুন না কেন, শেষ অবধি তা ধর্মের পৌরোহিত্যে গিয়ে এসে ঠেকেছে, ফেরাম, জাতিভেদ ও বর্ণবৈষম্যের আঘাতে সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোভ ও স্বার্থবোধের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার বাস্তবতা হয়েছে। খ্রীষ্টধর্ম বিশেষ করেই বলা যায়—ইতিহাসের সেই ভিক্টোরিয়ান যুগের সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে।

[বি. দ্র. দুইটি পর্বে লেখাটি বিভক্ত। প্রথম পর্বে সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশের এবং সভ্যতার বর্তমান কালের বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে, সভ্যতার সংকট সাম্রাজ্যবাদী আন্দোলন, এবং ভারতবর্ষ— এই প্রসঙ্গে আলোচনা হবে।]

লেখক

অপস্তাবনা

দেবেশ রায়

চং-চং করে চারটা বাজলো, অভ্যাসবশত, তিন দিনেই অভ্যাস, দরজার দিকে তাকালো, যেন এইটুকু নিশ্চিত হওয়ার জন্য, ভুল করে কেউ এসে পড়ে নি। দরজা থেকে দৃষ্টি আবার ভেতরে ফিরে আসবার সময় মাথাটা ঘুরিয়ে কাঠের ফ্রেমে বাঁধা উল্টোকরা বোতলের দিকে তাকালো, ব্লাডপ্রেসারের লোকগুলো কী ভীষণ বোকা, পাছে জল্প ভয় পায়, সেজন্য ঐ বোতলবাঁধা কাঠের ফ্রেমটা মাথার দিকের দেয়ালে ঠেলে রেখেছে, আসলে ওটাকে পায়ের দিকে রাখা উচিত, তাহলে এই ফাঁকা কেবিনে সময়টা ভালো কাটতো, দেখতে দেখতে : বোতল থেকে টুপ্ করে একফোঁটা পড়লো কাচের ছোট্ট নলটাতে, নলটার ভেতরে আবার নানা-রকম আঁকিবুকি করা, পরীক্ষার জন্য সিরিঞ্জে রক্ত নিয়ে কাচের স্লাইডে যেভাবে সেটাকে মুছে নেয়, সেই নলটার ভেতরে সেই ভাবে ওষুধটা মিশে যাচ্ছিল, এবং তারপর এই এতবড়ো রবারের নল দিয়ে তার শরীরে এসে ঢুকছে।—এতোটা পর তার মনে পড়লো, বাঁ কোমরের নিচে একটা সুঁচ তার শরীরে ঢোকানো লুকোয়ার্ড দিয়ে শরীরের সঙ্গে সেঁটে দেয়া, বাঁ পা-টা দড়ি দিয়ে খাটের সঙ্গে বাঁধা, —অথচ আজ সকাল দশটার সময় যখন প্রথম এ-রকম সুরু তখন যে কী ভীষণ অস্বস্তি, একটুও নড়াচড়া না-করে ঘণ্টা এ-রকম ভাবে শুয়ে থাকা যে কী অসম্ভব মনে হচ্ছিল, অথচ ইতিমধ্যে কখন এক সময় ভুলেই গেছে যে শরীরে সুঁচ ঢোকানো, তা দিয়ে বিন্দু বিন্দু করে ঐ এক বোতল নাকি দুই বোতল ওষুধ তার শরীরে ঢুকছে, দুপুরে একটু ঘুমিয়েও নিয়েছে, চৈতু থাকলে বলতো ঢি-এন্-ঘি, কদ্দিন চৈতুকে বলেছে ঢি-এন-ঘি মানে কি? চৈতু জবাব দেয়, 'টানা নিদ্রা', 'তাহলে তো ঢি এন্ বললেই পারো, ঘি কেন—' 'টানা ঘুম', 'তাহলে এন্ কেন', 'মানে এতো ঘুম যে নিদ্রাও বটে, ঘুমও বটে'—চৈতুরা কি সংবাদ পেয়েছে, মা নিশ্চয়ই আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছেন, আর চৈতু হাত এগারোটায় ফিরে যায় ঘুম ভাঙিয়ে শুধোচ্ছে—'বৌদির কোনো চিঠি এসেছে?' —'ওরে কি আমার বৌদি রমণী রে, দায়াদিন যায় ভালে ভালে, রাত্রে বুঝি কাপাস জ্বলে'—মা এতো ছড়া জানেন, চৈতুর দাদা দুপুরে ঘুমোতে পারে না,

সারাদিন কী করলো আজ, যে-রকম লোক, হয়তো হাসপাতালের অফিসে বসে, আজ দেখা করতে দেবে না জেনেও হয়তো এসে বসে আছে, তার মিছিমিছি আসার কী দরকার ছিল, এখানে কাকা আছেন, জোঠা আছেন, মা আছেন, উনি এসে কী উদ্ধার করবেন, কলকাতার একটা রাস্তাও তো চেনে না, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে আসতেই লোক লাগে, তবে এসেছে, ভালোই হয়েছে, অন্তত কিছু খবর গল্প করা যায়, আজ একবার দেখাও হলো না, হবেও না, আজ সারাদিন ধরে ইনজাকশন চলবে, ঐ বোতলের ওষুধগুলো এই মোটা কাচের নল দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে পড়বে, নিয়মিত, তালে তালে, ঘিচিং বোতলের দুধের মতো, বেশ্যদিকে অপারেশন করতে হয়েছিল, আমাকেও হয়তো তাই করতে হবে, কতলোই পারে, আমি পারি না, বাবা ওঠানর জন্য বারোঘণ্টা ধরে পায়ে সূঁচ ফুটিয়ে রাখা, অপারেশন একবার করলে নাকি পরের বারও সিজারিয়ান করতে হয়, সেই জন্যই নাকি ডাক্তারেরা চেষ্টা করেন অপারেশন না করতে, "ফার্স্ট ডেলিভারি, ফাচারাল হওয়াই ভালো,"— বারোঘণ্টা ধরে ইনজেকশন দেয়া আবার কী রকম নেচার, বাবা উঠলো না কেন, গত দাতাশ তারিখে ডেট ছিল, অথচ বাবা উঠলো না, ডাক্তারবাবুর কথামতো কাকা হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন, ভালো অবস্থায় কারো হাসপাতালে থাকতে ভালো লাগে ? এখন চলছে এই ইনজাকশন, বাবা উঠলো তো উঠলো, নইলে কাটা ছেঁড়া। আজ রাত দশটায় ইনজাকশন বন্ধ হবে। তখন বসে বাবাকে চিঠি লিখবো, কাকা অবশ্য বাবাকে প্রতিদিন হুবেলা-ই লিখছেন, তবে আমি লিখলে বাবা বেশি খুশি হবেন, মেয়েদের জীবন, মরার আগেও কিসে শ্বশুরবাড়ির লোক খুশি হবে, ভাবতে হয়। কাল বিকেলে মা এলে বলতে হবে যে ওর ব্লাউজ যেন কাল বেশি না দেয়, এখান থেকে যদি শরীর খারাপ নিয়ে যেতে হয়ে মা আমাকে আর রাখবেন না, মুখে তো দুইজনকে-ই মা বলি, মনে মনেও তাই, অভ্যাস, দু বছর আগে হাজরা পার্কে বসে কী কোনোদিন ভেবেছি আমাকে এখানে আসতে হবে, আর এখন এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছি যাদের জিনিস করে তাদের কাছে নিয়ে যাবো, মা বলতেন— নাতি হবে, চৈতু বলতো— তাইকি হবে, মা বলতেন—'ছি ছি মেয়ে, বদি বদি' চৈতু বলতো—বৌদি বলো, আমি বলতাম —ঘোড়ার ডিম,—তা থেকে বাচ্চার নামই হয়ে গেল ঘোড়ার ডিম, সবাই জিগেস করতো—কি, ঘোড়ার ডিম কেমন আছে, চৈতু বলতো বেটির ডাকনাম দেব ঘোড়ার ডিম, ছেলে হোক্ মেয়ে হোক্ ঘোড়ার ডিমই নাম থাকবে,

তাহলে একটু ভয় পাবে. দুইুমি করলেই বলবো— বন্ধুদের কাছে আমলাম ফাঁস করে দেব— সত্যি কি হবে, ছেলে না মেয়ে, আমি বাবা ছেলে চাই,

দরজায় ধাক্কা, নার্স : "কী কোনো মুভমেন্ট ?" "না।" "আপনি তো আমায় পরদিন থেকেই না করছেন"—মুখে হাসির সঙ্গে পেটে স্টেথো—"দিবি। ধামাধুকি দিচ্ছে"—বোঝলে একটু বাঁকি। কী যে ওরা ছাই স্টেথো দিয়ে দেখে, দিন পনর আগে দিবি বুঝতে পারতাম পেটের ভেতর নড়াচড়া করছে, আর এখন সারাদিনে একবার কি দুবার সামান্য একটু মোচড় ওঠে কি ওঠে না, অথচ ওরা বলে ধামাধুকি দিচ্ছে, অথচ এখনই তো নাকি সবচেয়ে বেশি নড়াচড়া করবে, করতে করতে, করতে করতে একেবারে বাইরে আলোতে এসে উপস্থিত হবে, আর তখন আমার চোখমুখ অন্ধকার হয়ে যাবে, অথচ ব্যথা উঠছে না, অথচ আমাকে এখন আমারই ইনডাকসনের ওষুধ দেখে-দেখে সময় কাটাতে হচ্ছে, অথচ আমার সারা শরীরে সামান্য একটু অস্বস্তি-ও হচ্ছে না, আমার সব ছিছেঁচুকে ঘুমলে যেমন মা বলেন, কলকাত্তার মা, যেমন মা বলেন, শান্তুক-তলার মা, ছেলেটা বেরিয়ে আসতে চাক্ না, যে ব্যথা আর কষ্টের ভয়ে প্রথম কটা মাস রাত্রিতে আমার ঘুম আসতো না, সেই ব্যথা আর কষ্টের জন্য যেন এখন পাগল-পাগল লাগছে, উঃ যদি আজ রাত্রিতে ব্যথা ওঠে, ওঠারই তো কথা, এই যে ওষুধ পড়ছে, যদি আজ ব্যথায় ব্যথায় আমার ঘুম না আসে, না আসুক, গত দশমাস ধরে অনেক ঘুমিয়েছি, একদিন না ঘুমোলে কিছু এসে যাবে না, ব্যথা উঠে যদি ছটফট করি, কাটা পাঁঠার মতো, মা বলেন, শান্তুকতলার মা, আমা-টা সব চেনেটেনে তো, জানেকানে তো, তখন ডেকেকেকে আনতে পারবে তো, আর একটু পরই তো ডাক্তারবাবু রাউণ্ডে আসবেন, তাঁকে জিগেস করবো, আমা এসে তাকে জিগেস-ই করবো, তুমি বাবা সব চেনো-টেনো তো, নাকি রাত্রিতে ব্যথা উঠলে লেবারসদনের করিডোরে চিনতেই তোমার হাত পুইরে যাবে, আজ রাত্রিতে যদি ব্যথা ওঠে, কাল সকাল, এমনকি দশটা নাগাদ-ও যদি প্রসব হয়, তাহলেও বিকেল চারটায়, ওরা আদা নাগাদ আমি চোখ মেলে চাইতে পারবো, আমি ঠোঁট খুলে কথা বলতে পারবো, কিন্তু কাকা যা হচ্ছতো কথা বলতে-ও দেবেন না, চোখ খুলতেও দেবেন না, কাল বিকেলে তো ওকে সবাই ডেকে ধরবে খাওয়ার জন্য, কোত্থেকে পাবে, আমাকে তো সব বলেইছে, বলবেই বা আমার কি, আমি কি নিজেই বুঝি না, অফিস থেকে অ্যাডভান্স নিয়ে এখানে হাসপাতালের খরচ বাবদ দেড়শ' টাকা দিয়েছে, কাকা যদিও ভীষণ

রাগারাগি করেছেন কিন্তু ও বলে— নইলে প্রেস্টিজ থাকে না, কথাটা অবিশ্যি খুব খারাপ নয়, সত্যিই প্রেস্টিজ থাকতো না, কিন্তু এখন তো ওর কাছে ফেরার খরচের ওপর আর মাত্র পঁচেলশ টাকা আছে, তা নিয়ে আর কি হবে, যাক্, বলে দেব যাওয়ার টাকা খরচ করে দিতে, ততোদিনে আমি ঠিক হয়ে যাবো, কারো কাছ থেকে, মা-র কাছ থেকে যোগাড় করে দেব, কিন্তু কী মজাই হবে, গতকাল বিকেলে আমাকে দেখে গেল, আর, আগামীকাল বিকেলে দেখবে—পাশে একটা ছোট খাট—

চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের একটি ঘরে যখন প্রথম অন্তঃসত্ত্বা এক নারী এইসব নানা কথা ভাবছিল, তখন বাইরে, কলকাতার রাস্তায়, মা আকাশে, মা... কলকাতার নরক নেই, শুধু আকাশ আছে, আকাশের নিচে নিওন-ভাত জলসী আছে, আর তার নিচে রাশি রাশি অট্টালিকা চারে পাখা মেলি মাটির বন্ধন ফেলি,...

বিদিরপুর ডকের পিছনে, হাওড়া স্টেশনের পিছনে, সূর্যের অস্তগমন ঘটে, কিংবদন্তীর মতো, অপ্রাসঙ্গিক গৌরবে, কিছিন্দিক এক মহাকাল সময়ের জন্য শিবের জটানিঃসৃতা হয়ে যান, অর্ধ মুহূর্ত সময়ের জন্য কেয়ারী আকাশ ও পৌরাণিক নদীর মাঝখানে হাওড়া ব্রিজের মাথা, বিদেশি জাহাজের আর কয়েকটি চটকলের চোঙা ছায়াচ্ছন্নতার ধ্যানমগ্ন হয়ে যান,—যেন এরা পৌরাণিক পরাক্রান্ত বীর মহাপ্রস্থানের ব্রত নিলেন অথবা অস্ত্রত্যাগের, আর সেই অতি মূল্যবান অর্ধমুহূর্ত সমস্ত কলকাতা একটা অপরূপ বিকেলের অপরিচিত নদী হয়ে পৌরাণিক নদীতুল্য গঙ্গার তাজা বাইলায় বাইলায়-গোধূলির কণায় কণায়-হারায়-হারায় শিলালিপির ন্যায় বিচিত্র— অক্ষরখোদিত নির্বোক-কে চোরকাঁটা হাওয়া ঘাঠ বেয়ে যজ্ঞোপলাগরের দিকে বয়ে নিয়ে যায়, আর সুন্দরবনের উপকূলে রাজচক্রবর্তীকে বহন করে আনা অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো তরঙ্গ মুহূর্তীর লাঁধার মতো ভেঙে টুকরো-টুকরো, আর তারই পর প্রেতিনীর মতো হাতে কপাল থেকে সিঁদুর ঘুছে নিয়ে করাল অন্ধকার আকাশে উচ্ছ্বসিত, ধপ্ করে আলো জ্বলে এখানে সেখানে নানান্ রঙ্গা, সওদাগরি হাওড়া ব্রিজের মাথায় অন্ধকার ও ধ্যান নিষিদ্ধ হলো, বিদেশি জাহাজ ও চটকলের চোঙা তার তার অন্ধকার আকাশে উদ্গীরণ করলো, আইনী বেশ্যার মতো গঙ্গা ভাটো চিৎপাত এক কৃত্রিমজীবী গগনতলে, কলকাতার হাইড্রান্টের অমৃত নিঃশব্দ জল, অবিচ্ছিন্ন অবিরল চলে নিরবধি— গঙ্গায়, গঙ্গা

কলকাতায় প্রসাধিতত্তম ট্রেন, সন্ধ্যায় ঘষাকাচের মতো বুকে সূর্যাস্তকে ঘুরে ঘুরে ঘরে ফেরে সভ্যতা, হাওড়া স্টেশনে আধার লালবাতি আর পথ হারানো যাত্রির ফুসফুসে ডাক, সূর্যদেব, কোন্‌খানে ফুটলো ভোরবেলাকার কনকচাঁপা, সূর্যদেব, কোন্‌দেশে কোন্ সমুদ্রপারে তোমার প্রভাত হলো, মাত্র উনিশ বৎসর আগে, ভারত সমুদ্রের চার পারে, অন্তরীপে আশা, উত্তর আশা, পর্বতমালায় আশা, গভীর আশা, উনিশ বৎসর বয়সিনী আশা হে-এ-এ, লালকেল্লায় আছো হে-এ-এ? উনিশে যোগিনী আশা হে-এ-এ, রবারের বনে আছো হে-এ-এ? উনিশে পাগলী আশা হে-এ-এ, প্যাগোডায় আছো নাকি হে-এ-এ? উনিশে উদাসী আশা হে-এ-এ, পিরামিডে আছো নাকি হে-এ-এ? কোথায়— আশা—আ—আ—, হিরোশিমায়? আণ্ডুক ঘরে? বেদনায়? ব্যথায়? প্রসব ছবিতে? আশারে, তোরে আমি ভালোবাসিতাম, আশা হে, তোমায় আমি ভালোবাসি, আশা হে, যেমন বিশু প্রেম করেন তাঁর পায়ে রক্তমের মতো পেরেক, ও দুই করতলে খ্রিষ্ট যেবদেবীগণের ন্যায় রক্তবর্ণ নিয়ে, তেমনি এই হৃদয়ে রক্ত ও যন্ত্রকে কাঁটার মুকুট নিয়ে। আকাশে এরোপ্লেন আর সমুদ্রে জাহাজের দিকে চেয়ে সে অলিন্দে দাঁড়িয়েছিল, হিরোশিমায়, তার কটিদেশে খ্রিষ্ট ঐ কাফের মতো ও ইথরী সাপের মতো ছায়া,—সবাই তারই দিকে চেয়ে, অলিন্দে, সে কাউকে দেখতে পায় না, বাইরে। আকাশে উদাস চাঁদ। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিল চারদিক,— দূরের গাছের পাতায় পাতায় বালি কাগজ ঘষছিল হাওয়ায়, দুজিয়াবা একটা আহত বনবেড়ালের মতো থাবা নাবিয়ে পড়েছিল, তখন, যখন আশা আমার আশা উনিশ বৎসর আগে অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে আসে, সে আসে। অলিন্দে সুআজা আশা, চুল আকুল করে ভেবেছিল কোন্ সুদূর সমুদ্র-তরঙ্গের কথা।—'সখি হে, তোমার ঘরে আমার ঘোড়ায় এসো না বদল করি, তোমার আয়না আমার গদি এসো না বদল করি, তোমার ওড়না আমার ছুরি: সখি আমি সমুদ্র থেকে, উপত্যকা থেকে ছুটছি রক্তাক্ত', 'পারস্যের যদি বঁধু হে, সকল উজাড় করে দিতাম। আমি আমি নই, ঘর ঘর নয়' 'সখি, আমি যমিতে চাই তবনে, দেখো না বুকের কণাটখোলা রক্ত,' 'বঁধু তোমার বুকে দেখি তিনশ রক্তগোলাপ, কিন্তু, আমি আমি নই, গৃহ গৃহ নয়'*

* " 'Friend, I want to change my horse for your house, my saddle for your looking glass, my knife for your rug. Friend, I

প্রজাপতি ঋষি, আমি উনিশ বৎসর এই নদিনীর সঙ্গে ঘর করে, তার গর্ভে আমার পুত্র উৎপাদন করেছি, উনিশ বৎসর যাদিনী সে উনিশটি বৎসর-ই আমার সুখে আছে, অধুনা সে পূর্ণ-গর্ভিণী, তার প্রথম প্রসব বেদনার অপেক্ষায় শায়িত,

প্রজাপতি ঋষি, গর্ভে কি ঘটোৎকচ না অভিমন্যু ?

উনিশ বৎসর যাদিনী এই পৃথিবীর, এই নদিনীর, এই আমার শিয়রে সপ্তসমুদ্রের জল করে যাপন করে আমি দাঁড়ালাম, দশ-দিকের বাতাস, ছুরিতে নিয়ে আমি দাঁড়ালাম,— দশুরবদনতুল্য বেদনায় এই গর্ভিণী যন্ত্রিত হোক্, তারপর গর্ভ থেকে প্রসূত হোক্ দেবতা অথবা দানব।

ইনভাক্সন করার চব্বিশ ঘণ্টা পর মেয়েটির পেটে ক্ষীণ একটা ব্যথা দেখা দিল। সে নিজে তখন কামনা করছিল এই ব্যথা তার সহ্যের অতীত হোক্। এই চিন্তা থেকে সে দু'একবার ছটফিয়েছে-ও, যেন, নিজেকে কোনো রকমে ঘোলাতে পারলেই ব্যথাটাকে যথেষ্ট বাড়ানো যাবে। একটু দেরিতে হলেও সেদিক থেকে মেয়েটির অভিলাষই চরিতার্থ হলো। বেলা দুটো-তিনটের সময় গুঁড়ি গুঁড়ি ব্যথা দেখা দিল, সুতরাং ভিজিটিং আওয়ারে মেয়েটির ভিজিটরদের আসতে নিষেধ করে দেয়া হলো, মেয়েটি আশা করেছিল সেই যে ইনভাক্সনের আগে তাকে দেখে বাড়ির সবাই চলে গেছে, এর পর যখন আসবে, দেখবে পাশে একটা ছোট খাট। মেয়েটি তলপেটের একটা কোণায় সামান্য একটু ব্যথাকে সারা শরীরে ছড়াতে ছড়াতে ভাবছিল— তার আশা পূরণ হতে চলেছে। চব্বিশ ঘণ্টা আগেও যে মেয়েটি ওষুধের মোড়কের দিকে তাকিয়ে নানারকম সাতপাঁচ ভাবছিল, সে, নিজের ব্যথা বাড়বার লোভে ছোট্ট অপরিসর লোহার খাটটাতে দখীত সৃষ্টি করছিল।

আমা শিয়রে ছিল, সে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, কখনো বা পিঠে,— কিন্তু আমার এতোটা ব্যথা তো ওঠে নি, আমি যে এতোটা ব্যথা দেখাচ্ছি, যদি শেষে কাটা ছেঁড়া করে, অথচ এতো কম ব্যথা যে এটা প্রসব বেদনা নাও হতে পারে।

have come bleeding from the tassos of Cabra.' 'If I could, young man this bargain would be closed. But I am no longer I, nor is my house, my house.' 'Friend, I want to die decently in my bed...Do you not see the wound I have from my breast to my throat ?' 'The white front of your shirt bears three hundred dark roses...But I am no longer I. nor is my house now my house."

FEDERICO GARCIA LORCA

শাশুড়ী একটা গল্প বলতেন কোন্ এক পোয়াতি-র তখন ওরা মাস চলছে, ও একদিনের মধ্যেই ব্যথা উঠবে বলে সবাই সন্দেহ করছে. তো, একদিন রাতে সে শুতে যাবার আগে তার মাকে ডেকে বলছে— মা আমার ব্যথা উঠলে ডেকে দিও, তো. তার মা বললো— মা তুমিই কত লোককে ডাকবে, তোমাকে আর ডাকতে হবে না। কিন্তু আমার তো সে-রকম মনে হচ্ছে না, ডাক্তারের রাউণ্ডের সময় কখন, সাতটায়, কতো বাকি—

দরজায় ছায়া, নার্স, "কী খবর, শেষে উঠলো—" ভেতরে, "আচ্ছা কালকের মধ্যে সব চুকেবুকে যাবে তো" মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলো, এতোক্ষণ কৌতুকের জন্য তার গলায় বেদনা ছিল। "সে, আমরা কী করে বলবো, আপনার ওপর ডিপেণ্ড করে, যদি পেইন স্টেডিলি প্রোগ্রেস করে, তবে আজ মাঝরাত্রি বা শেষরাত্রিতে কিছু হয়েও যেতে পারে, তবে পেইনটার ওপর নির্ভর করছে, আর আমরা ঘণ্টার মধ্যেই তো ডাক্তারবাবু রাউণ্ডে আসবেন, তখনই সব জানতে পারবেন—"

আধঘণ্টা পরে দরজায় ডাক্তারের ছায়া—"কী খবর" প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি মধুর হাসির চেষ্টা করলো— খুব ব্যথার সময় কষ্টের সময় খুশি ফোটাতে হলে যেমন মুখভঙ্গি করা হয়। পেটে স্টেথো। মেয়েটি চোখবুঁজে পড়ে রইল। ডাক্তার যেন বড় তাড়াতাড়ি স্টেথো সরিয়ে সরিয়ে দেখছে, বাচ্চা খুঁজে বেড়াচ্ছে নাকি, ডাক্তারের পরীক্ষার প্রয়োজনে চুপচাপ শুয়ে থাকার সময় মেয়েটি টের পেল, তখন আর তার কোনো ব্যথা বোধ হচ্ছে না, তাহলে কি ব্যথা একেবারে ওঠেই নি, সবটাই আমার মনে হওয়া, ডাক্তার পাশ ফিরতে বললো, কোনোদিন তো বলে না, ডাক্তার সোজা হতে বললো। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে খুব কম সময়ের জন্য যেন কী ভাবলো এবং "ঠিক আছে" বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল. সঙ্গে নার্স-ও।

মেয়েটি জানলো না তার গর্ভের ভেতরের শিশুটি বৃত্ত। প্রাণপণে নিজের ইচ্ছাশক্তির বলে সে তার গর্ভের শিশুটিকে পেটের ভেতর আলোকিত করার জন্য চেষ্টিত হলো। মেয়েটির শরীরের ভিতরে শিরা-উপশিরা স্নায়ু-গ্রন্থীর জটিলতায় গুরুতর সব পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল : জনে রক্ত, শরীরে স্নেহ, হৃৎপিণ্ডের তালে তালে বাৎসল্যের প্রবাহ।

মাতৃত্ব যদি যৌবন বা যার্যকোর মতো একটি শারীরিক ঘটনা, মেয়েটি তবে মা হয়ে যাচ্ছে। অথচ মেয়েটি একটি মৃত সন্তানকে বহন করে ডেলিভারি টেবিলের দিকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় অগ্রসর হচ্ছিল।

কলকাতার আকাশের নক্ষত্ররাজিতে তখন অরাজকতা।

পটুয়া নিবারণ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আমাদের নিবারণ কর্মকার ছিলেন আঁকিয়ে মানুষ। লোকে বলত বটে পটুয়া নিবারণ— কিন্তু তাঁর ছবি-টবি কেউ কিছু বুঝতো না। সেই অর্থে পট-টট কখনো আঁকেননি নিবারণ কর্মকার। যদিও ঠিক পটুয়া ছিলেন না নিবারণ, তবু তাঁর আঁকার ধরন ধারণ ছিল অনেকটা পটুয়াদের মতোই। তুলির টান, রঙের মিশ্রণ— সব কিছুই ছিল সেই পুরোনো ধরনের। শুধু বিষয়বস্তুতেই তাঁর নতুনত্ব কিংবা মতান্তরে বিকৃতি ধরা পড়ত। আমি তাঁর আঁকা একখানা বাঘের ছবি দেখেছিলাম যার পেটটা ছিল কাচের মতো স্বচ্ছ, আর সেই পেটের ভিতরে দেখা যাচ্ছে একটি গর্ভবতী মেয়ে শুয়ে আছে— বাঘের পাকস্থলীর ওপর তার মাথা, বাঘের হৃৎপিণ্ডের ওপর তার পা, বিরাট ঢাউস পেটটা বাঘের মেরুদণ্ড পর্যন্ত ঝুলে আছে, আর মেয়েটির সেই পেটের প্রায় স্বচ্ছ চামড়ার ভিতর দিয়ে কোষবদ্ধ প্রায়-পরিণত ভ্রূণটিকেও দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি ও ভ্রূণ এই দুইজনের মুখেই নির্লিপ্ত, নির্বিকার হাসি। সব মিলিয়ে দেখলে কিন্তু বাঘটার জন্যই দুঃখ হয়। তার পেট ঝুলে গেছে, অকালবার্ধক্যে তার চোখ কোটরগত ও হিংস্রতাশূন্য। ছবির নীচে লেখা 'গর্ভবতী নারীকে ভক্ষণ করিয়াছ, এখন কেমন বল?'

'পাপের পরিণাম' নিয়ে যে কখানা ছবি এঁকেছিলেন নিবারণ কর্মকার, বাঘের ছবিটা ছিল তার দ্বিতীয় ছবি। সবগুলো ছবি আমি দেখিনি, কিন্তু যে কয়েকটা দেখেছি তার প্রতিটিই ছিল খানিকটা হিংস্র প্রকৃতির ছবি। যেমন মনে পড়ে একটি ছবিতে একটি অতিকায় বানর একটি কুমারী কন্যার সতীত্ব হরণ করছে— এমনি একটা বিষয়বস্তু এঁকেছিলেন পটুয়া নিবারণ। নীচে লেখা 'মৃতদেহীর প্রত্যাবর্তন ও নির্বিকার কাম-অভ্যাস।'

আমাদের নিশিন্দারোগার মেয়ে শেফালীর একবার অসুখ হল। সন্নি বাবো। ছবি ডাক্তার এসে বলে গেল 'সর্বনাশ। এ মেয়ে বাঁচলে হয়। অসুখ শরীরে যতটা, মনেও ততটা। মন ভাল রাখা চাই। ওকে কখনো কোনো অভাব দুঃখ কষ্টের কথা বলা যাবেন, কোনো মৃত্যুর খবর দেওয়া যাবেন। আর ও যা চায় ওকে তাই দিন।'

তাই হ'ল। সেকালীর ঘর থেকে ঘুলো ময়লা, কালো ঝুল, শিকলানী, ইঁদুর আরশোলা দূর করে দেওয়া হ'ল, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল কালো বেড়ালটাকে। তারপর ডাক পড়ল পটুয়া নিবারণের। মন ভাল থাকে এমন ছবি এঁকে টাঙিয়ে দিতে হবে ঘরের দেয়ালে।

পট এঁকেছিলেন নিবারণ। খুব পরিশ্রম করেই এঁকেছিলেন। একটা ছবিতে ছিল নদীর তীরে একপাল বাচ্চা ছেলেমেয়ে পরস্পরের মুণ্ড খেলাচ্ছলে কেড়ে নিয়ে এর মুণ্ড ওর ঘাড়ে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে; কারো মুণ্ডই যথাস্থানে নেই, এর মুণ্ড ওর হাতে, ওর মুণ্ড এর হাতে ধরেছে। আর সেই কবন্ধ ছেলেমেয়েদের দেহগুলি নিরানন্দ ও কঙ্কালসার। ছবির নাম দেওয়া ছিল 'একের মুণ্ড অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার পরিণাম।' 'রাক্ষসীর প্রসব' নামে আর একটা ছবিতে ছিল এক বিকট দর্শন রাক্ষসী তার নবজাত সন্তানকে রক্তচ্ছাত দলের মতো সহস্তে ধারণ করছে, আশেপাশে ইতস্তত কয়েকটা রাক্ষস-শিশুর কঙ্কাল পড়ে আছে। স্পষ্টই বোঝা যায় রাক্ষসী ইতিপূর্বে তার পূর্বজাত সন্তানদের ভক্ষণ করেছে এবং আজ সন্তান-ভক্ষণের আনন্দে তার মুখ লোল, চোখ উজ্জ্বল।

এই সব ছবি দেখার ফলেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণেই হোক ছবি ডাক্তারের সমস্ত চেষ্টা বিফল করে নিশি দারোগার মেয়ে সেকালী একদিন টুক্ করে মরে গেল। যতদূর জানা যায় বিকট ছবি এঁকে দারোগার মেয়ের মনে ভীতি উৎপাদনের অপরাধে গোপনে নিবারণের ওপর কিছু অত্যাচার হয়েছিল।

তাইতেই মনমরা হয়ে গেলেন পটুয়া নিবারণ। কেননা ছবি-আঁকা ছিল তাঁর প্রাণ। ছবিতেই কথা বলতে চাইতেন নিবারণ, সংসারের নানারকম ব্যথাকে ছবি দিয়েই ঢেকাতে চাইতেন। ছবি-আঁকা ছাড়া আর কিছুই শেখেননি তিনি। নিশি দারোগা তাঁর সেই ছবি-আঁকা প্রায় বন্ধ করে দেবার জোগাড় করলেন। কেননা কথা ছিল সেকালীর ঘরে গাছপালা, লতা, ফুল, পাখীর ছবি এঁকে দেবেন নিবারণ, যাতে ঘরে বসেও সেকালীর মনে হবে যে তার চারদিকে গাছপালা লতা ফুল পাখী মেঘ ও বাতাস রয়েছে— প্রকৃতি-প্রকৃতির ভিতরেই রয়েছে সে— এবং এইভাবে এক জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার কিছুকাল প্রকৃতি-ভক্ষণ করলে সেকালীর রোগের উপশম হতে পারত। অন্তত ছবি ডাক্তারের এই রকমই ধারণা ছিল।

এদিকে নিবারণের বয়স হয়ে এসেছিল। ছবির দিকেও ঝোঁকটা পড়ছিল। কেননা জনশ্রুতি শোনা যেত পটুয়া নিবারণের যাবতীয় শিল্পকর্ম তাঁকেই আক্রমণ করতে শুরু করেছে। ঘরে তিনি ঘরে ঢুকতে পারেন না। ঘরের ভিতরেও তিনি স্বস্তি পেতেন্নাল্লা যান, মুণ্ডহীন ছেলেমেয়ে ও গায়োপায় কঙ্কাল-গুলো দেখতে শুরু করেছেন। তাঁর প্রবল বিশ্বাস ছিল একদিন এরা সবাই ছবি ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এবং তার অনাবৃত ও রুগ্ন অবস্থায় কোনো সুযোগে তাঁকে আক্রমণ করবে। সুতরাং কয়েকদিন তিনি সুস্থির ও স্বাভাবিক কিছু আঁকবার চেষ্টা করে দেখলেন— ছবি ছেড়ে বেরিয়ে এলেও যা তাঁর খুব বেশী ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কিছুই আঁকতে পারলেন না। এই সময়ে তিনি শক্ত সমর্থ একজন সঙ্গী খুঁজছিলেন— যে তাঁকে তাঁর শিল্পকর্মের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। আর ছবি-আঁকা ভুলবার জন্য তিনি অন্যদিকে মন দিলেন। তখনো দেখা যেতে লাগলো নিবারণ উঠোনের মাটি কোপাচ্ছেন, নয়ত ইঁচেতলা থেকে কঞ্চিকাটির ঝোপ টেনে তুলে সাফ করছেন। যদিও বিয়ে করেননি, তবু মনে হচ্ছিল, সংসারে মন দিয়েছেন পটুয়া নিবারণ। এইবার হয়ত বিয়ে করবেন।

করলেনও।

মিস্ কে. নন্দীর নামডাক আজকাল আর শোনা যায় না। শোনবার কথাও নয়। তিনি যে সব খেলা দেখাতেন, আজকাল আর তা চলে না। কিন্তু আমাদের আমলে সেই সব খেলা দেখিয়েই যাদুর নাম হয়েছিল মিস্ কে. নন্দীর। 'প্রবর্তক সার্কাস' যখন নানা জায়গায় ঘুরছিল তখনই মুখে মুখে অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন নর্তকী বলিয়া মিস্ কে. নন্দীর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মনে পড়ে মিস্ কে. নন্দীর জন্য প্রবর্তক সার্কাসে একটা আলাদা তাঁবু ছিল— যার চারদিকে সারাদিন ভিড় লেগে থাকত। সার্কাসের খেলা আরম্ভ হ'লে এই তাঁবু থেকেই একটা চাকাওয়ালা খাঁচায় মিস্ কে. নন্দীকে নিয়ে আসা হ'ত রিংয়ের পাশে। হৈ হৈ পড়ে যেত চারদিকে। কিন্তু মিস্ কে. নন্দীকে দেখা যেতনা— খাঁচার চারপাশে কালো পর্দা ফেলা। তার ভিতরে বাস্তবিক কে. নন্দী আছেন কিনা বা থাকলেও কি করছেন কিছুই বুঝবার উপায় ছিল না। এদিকে জমে ট্রাপিজের খেলা, বড়ির ওপর নাচ, কৌতুক চল্

এবং বাঘ সিংহের খেলা শেষ হয়ে আসত। তারপর একজন স্যুট টাই পরা লোক পর্দা সরিয়ে একটা সোপন দরজা দিয়ে খাঁচার ভিতরে ঢুকে যেত। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে বলত 'অলরাইট।' দু-তিনজন লোক সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে নিত। হাততালিতে কানপাতা দায় হ'ত তখন। আর তখন দেখা যেত মিস্ কে. নন্দীকে। প্রকাণ্ড নয়, বরং রোগাই বলা যায় কে. নন্দীকে। রং কালো। পরণে সোনালী রঙের সাটিনের হাফ্ প্যাণ্ট, বুকে কাঁচুলি—সেও সোনালী রঙের সাটিনের। মাথায় চুল ঝুঁটি করে ওপরে বাঁধা, চোখে কাজল, ঠোঁটে লিপষ্টিক, পায়ে সোনালী মোজা, সোনালী জুতো। কাঠের একখানা ঝকঝকে চেয়ারে নিশ্চল হয়ে থাকতেন মিস্ কে. নন্দী—আধবোজা চোখ, মুখে একটু হাসি। হঠাৎ মনে হয় ঘুমিয়ে আছেন, নয়ত সম্মোহিত করে রাখা হয়েছে তাঁকে। একটা মুর্গীকে সেই সময়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ত খাঁচার ভিতরে —কোথায় কোঁ করে সেটা ডাকতে থাকত। আর, সেই ম্যানেজার গোছের লোকটা মিস্ কে. নন্দীকে ডাকতে থাকত, উত্তেজিত করত, হাতের লম্বা সরু লাঠিটা দিয়ে সজোরে খোঁচা মারত কে. নন্দীর পেটে, কোমরে। অবশেষে হঠাৎ কে. নন্দী রক্তবর্ণ একজোড়া চোখ খুলতেন, চারিদিকে তাকিয়ে দেখতেন, তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতেন। আর একবার হাততালি পড়ত। সম্ভবত ঐ শব্দেই ক্ষেপে যেতেন মিস্ কে. নন্দী। মুর্গীটার সঙ্গে তার প্রাণপণ লড়াই শুরু হয়ে যেত—সেই প্রাণান্তকর পাখা ঝাপটানোর শব্দ, মুর্গীর অস্ফুট ডাক, আর কে. নন্দীর দাঁত কড়মড় করবার সঙ্গে আমাদের গায়ের রোমকূপ শিউরে উঠত। মুর্গীটা ধরা পড়ত অবশেষে—ততক্ষণে মিস্ কে. নন্দীর কৌশলে-বাঁধা চুল খুলে পিঠময় মুখময় ছড়িয়ে পড়েছে—ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে তাঁকে। প্রথমেই দুহাতে টেনে মুর্গীর মুণ্ডুটাকে ছিঁড়তেন কে. নন্দী—মুর্গীটার গলা থেকে হঠাৎ হঠাৎ খাস নির্গত হতে থাকত বলে তখনো তার অস্ফুট ডাক শোনা যেত। পট্ করে ছিঁড়ে যেত গলাটা—মুণ্ডুটা ছুঁড়ে ফেলে কে. নন্দী ধড়টাকে দু'হাতে ধরতেন—কাটা গলাটা মুখের কাছে নিয়ে ভাবের জল খাওয়ার ভঙ্গীতে রক্তপান করতেন মিস্ কে নন্দী। তখন রক্ত বেয়ে, সোনালী কাঁচুলি বেয়ে, তলপেট থেকে ঝুঁইয়ে সোনালী জুতো পর্যন্ত নেমে আসত রক্তের কয়েকটা ধারা। তারপর মুর্গীটাকে খেতে শুরু করতেন—দু'হাতে পালক ছাড়াচ্ছেন আর ভিতরের মাংসের জঘন্যে কামড় বসাচ্ছেন—এ দৃশ্যের কোথাও শিল্প ছিল কিনা বলতে পারিনা।

মুর্গী খাওয়া হয়ে গেলে রক্তমাখা মুখে মুর্গীর পালক, নাড়ীভুঁড়ি ইত্যাদি

মুক্তাবস্থিতের মতো অবিচলভাবে পায়চারী করতেন মিস্ কে. নন্দী। তখনো তাঁর অভিনয় কেউ ধরতে পারত না। এই সময়ে একটা সাপের ঝাঁপি সেই খাঁচার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত। স্যুট পরা ম্যানেজার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতেন 'লেডী গণপতি দেখু-উ উ-উ-উ—'। তার অবাঙালি টানের কথাটা বিচ্ছিরি শোনাত। দেখা যেত ঝাঁপির চারধারে কে. নন্দী লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর ম্যানেজার হাতের লম্বা লাঠিটা খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ঝাঁপির ঢাকনাটা খুলে দিতেই ছিটকে উঠত সাপ। লোহার মতো ফণা মেলে দিয়ে কে. নন্দীর দিকে তাকাত। প্রথমটায় তার পাওয়ার ভাব করতেন তিনি— কয়েক পা পিছিয়ে যেতেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাত বাড়িয়ে দিতেন সাপের দিকে। সাপ ততক্ষণে ঝাঁপি ছেড়ে খানিকটা নেমে এসেছে – ছোবল দিতেই হাত সরিয়ে নিতেন কে. নন্দী। সারা তাঁবুতে শুধু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যেত তখন। দ্বিতীয় ছোবলের মুখেই সাপের গলাটা চেপে ধরতেন— আর সারা হাত জুড়ে লিক্ লিক্ করে উঠত সাপ, কিল্‌বিল্ করে জড়িয়ে ধরত তাঁর হাত। অনেকক্ষণ সময় নিতেন কে. নন্দী। খুব আস্তে আস্তে হাতটাকে মুখের কাছে নিয়ে আসতেন— যেন সাপের ঠোঁটে চুমু খাবেন তিনি। এই সময়ে তাঁর শিল্পকর্ম বোঝা যেত— তন্ময়তা ফুটিয়ে তুলতেন, তাঁর চোখেমুখে বড় জটিলের সরল কৌতূহল ফুটে উঠত। পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড হাঁ করলে তাঁর রক্তাক্ত মুখাভ্যন্তর দেখে বাচ্চা ছেলেরা ভয়ে চীৎকার করে উঠত, অনেরা চোখ বুজে ফেলত। ঐ টুকুই ছিল কৌশল। হয়ত চোখ চেয়ে ঠিক মতো দেখলে দেখা যেত বাস্তবিক সাপের মুখটাকে খাচ্ছেন না তিনি। পরমুহূর্তেই চোখ চেয়ে দেখা যেত মুণ্ডহীন সাপের দেহ একবগ্গা ঘড়ির মতো দুলছে, আর সাপের মুণ্ডটা আয়াসে চিবোচ্ছেন মিস্ কে. নন্দী।

বাইরে থেকে দেখে বোঝা যেত না, কিন্তু কে জানে, হয়ত' ঐ জীবন মিস্ কে. নন্দীর আর ভাল লাগছিল না। তাঁর খেলার মধ্যে অনেকটাই অভিনয় ছিল সত্য, কিন্তু যেন যেন সন্দেহ হ'ত ম্যানেজারের লাঠির খোঁচাটা তার মধ্যেই ছিল খাঁটি। কেননা যখন চেয়ারে এসিয়ে না খুব না-সম্মোহনের ভিতরে থাকতেন কে. নন্দী তখন মনে হ'ত তিনি বড়ই ক্লান্ত। মানুষের স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাসে প্রত্যাবর্তন করতে না পারার সেই ক্লান্তিকে দূর করতে যখন কে. নন্দীকে ম্যানেজার সেই লম্বা লাঠির ডগায় খোঁচা দিতেন, তখন মিস্ কে. নন্দীর জন্য আমি আমার যৌবনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম।

মিস্ কে. নন্দীর নামডাক এখন আর থাকবার কথা নয়। কেননা সময় পাল্টে যাচ্ছিল। মানুষ আর পুরোনো ধরনের খেলা পছন্দ করছিল না। ধীরে ধীরে প্রবর্তক সার্কাসের অবস্থাও খারাপ হয়ে এল।

অবশেষে একদিন সব সোলমাল করে দিলেন মিস্ কে. নন্দী। ম্যানেজারের ডাক, অনুনয়, লাঠির খোঁচা নিঃশব্দে হজম করে তিনি আধখোলা চোখে নিশ্চল শুয়ে রইলেন। মুর্গীটা খাঁচার ভিতরে ঘাপিয়ে বেড়ালো। উপায় না দেখে ম্যানেজার সাপের ঝাঁপিটাও ঢুকিয়ে দিলেন খাঁচার ভেতরে। ঢাকনাটাও খুলে দেওয়া হল। সাপটা ফণা মেলে লাফিয়ে উঠল, মুর্গীটা খাঁচার ছাদে পা আটকে রেখে প্রাণপণে চেঁচাচ্ছিল। আর ঠিক এই সময়ে তাঁর স্তব্ধি লোককে স্তম্ভিত করে দিয়ে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন কে. নন্দী। খেলা ভেঙে গেল।

কিন্তু মাত্র একদিনের জন্যই। তারপর থেকে মিস্ কে. নন্দী আবার খেলা দেখাতে শুরু করলেন। কিন্তু ঐ একদিনেই তাঁর বাজার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল. লোকে ধরে ফেলেছিল মিস্ কে. নন্দীকে। আর ভিড় জমল না। কে. নন্দীর খেলা শুরু হওয়ার আগেই তাঁর ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। অবশেষে সার্কাস থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়ার সময় হয়ে এল।

আমাদের পটুয়া নিবারণ এই সময়েই একজন মজবুত সঙ্গী খুঁজছিলেন— যে তাঁকে তাঁর নিজের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রবর্তক সার্কাসের ম্যানেজারের কাছে একদিন ধরনা দিলেন নিবারণ, কিছু টাকাপয়সা দিয়ে কে. নন্দীকে ছাড়িয়ে আনলেন, তারপর একেবারে বিয়ে করে ঘরে তুললেন।

এই সময়ে আমি একদিন নিবারণ কর্মকারের সঙ্গে দেখা করতে যাই। একখানা ছবির সামনে নিবারণ কর্মকার বসেছিলেন। আমাকে দেখে সম্ভবত বিরক্ত হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ আমরা মুখোমুখী চুপচাপ বসে রইলাম। কিছুই বলার ছিলনা। নিবারণ তাঁর ডান হাতটা চোখের সামনে ধরে মনোযোগ দিয়ে কিছু লক্ষ্য করছিলেন। মনে হল তিনি তাঁর ভাগ্যরেখা ও রবিরেখা মিলিয়ে দেখছেন। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন 'আমার ছুটো আঙুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!'

আমি কিছু না বুঝে প্রশ্ন করলাম 'কোন আঙুল!'

উনি তাঁর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী আমায় দেখালেন 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

আমি বললাম 'না।'

'আমিও বুঝতে পারছিনা ব্যাপারটা। কিন্তু আঙুল দুটো জরুরী অবশ্য হয়ে আসছে।'

আমি আঙুল দুটো দেখলাম। স্বাভাবিক মনেই হ'ল। রোগটা ওঁর মানসিক সন্দেহ করে আমি বললাম 'শুনেছিলাম আপনি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছেন! আর আঁকছেন না।'

'ছেড়ে দিইনি। তবে দেখ।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিবারণ 'আঙুল দুটোর জন্যেই ছেড়ে দিতে হবে।'

আমি চুপ করে রইলাম। উনি নিজেই বললেন 'এখন থেকে খেত-খামারের কাজ করব ভাবছি।'

আমি ওঁর সামনের সদ্য-আঁকা ছবিটা দেখছিলাম। পালঙ্কের ওপর মিথুনবদ্ধ নগ্ন নর-নারীর ছবি এঁকেছেন তিনি; আর দেখা যাচ্ছে একটা সাপ পালঙ্কের পিছন থেকে ফণা তুলে পুরুষটিকে দংশন করতে উদ্যত; মেয়েটি সাপটাকে দেখছে— অথচ কিছুই করছে না; তার চোখ সম্পূর্ণ নির্বিকার। কিংবা এও হতে পারে যে মিথুন তখন এমন পর্যায়ে যে বাধা দিলে তার বাধুর্য নষ্ট হয়— তাই মেয়েটি যা অযোধ্য, যা নিয়তি তাকে মেনে নিচ্ছে।

হঠাৎ মুক্ত মুক্ত করে হাসলেন নিবারণ। আমি উঠে পড়লাম।

চলে আসবার সময় কে. নন্দীকে দেখা গেল— ঘোমটা মাথায় সারা বাড়ী ঘুর ঘুর করে বেড়াচ্ছেন। মনে হ'ল সম্মোহন কেটে গেছে— সেই আদ্যোপান্ত ও অর্বাচীন থেকে ম্যানেজারের লাঠির খোঁচায় জেগে উঠেই অমানুষিক খাদ্যবস্তুর সন্ধানে হতে হচ্ছে না বলে তিনি বোধ হয় সুখী। কিংবা কে জানে— আমার দেখার ভিতরে ভুলও থাকতে পারে।

গ্রামে জনশ্রুতি ছিল, নানা রকম গল্প প্রচলিত ছিল। কিন্তু পার্কাসের মর্মন্তুদ মহিলার সঙ্গে পটুয়ার যৌথ জীবন ঠিক কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল তা বোঝা যাচ্ছিল না। কেননা, নিবারণ আমাদের আর ডাকতেন না, গেলে বিরক্ত হতেন। কে. নন্দী ও পাঁচজনের সামনে কদাচিৎ বের হতেন। জনশ্রুতি বাইরের জগৎ থেকে দু'জনেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। এক রকম ভাবে তাঁরা আর পাঁচজনের মনোযোগ থেকে আত্মরক্ষা করে রইলেন।

দীর্ঘদিন পর আমাকে আর একবার ডেকে পাঠালেন নিবারণ। গিয়ে দেখি আঁকবার ঘরে চুপচাপ বসে আছেন নিবারণ। আমি যেতেই প্রশ্ন করলেন 'আমার স্ত্রীকে আপনি চিনতেন?'

থতমত খেয়ে উত্তর দিলাম 'ঠিক কি বলতেন বুঝতে পারছি না। তবে ছিস্‌কে- নন্দীকে আমরা অনেকেই দেখেছি।'

'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে উনি ডাকিনী কিংবা পিশাচ-সিদ্ধ?'

'না।'

'তবে?'

'তবে কি?'

খুব চিন্তিত দেখাল নিবারণকে। কুঞ্চিত কপালে ছোট চোখে উনি ওঁর চারদিকে অস্পষ্টভাবে পটগুলোর দিকে চেয়ে দেখছিলেন। সেই চেয়ে-দেখার ভিতর খানিকটা ভয়ের ভাব ছিল। শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে উনি বললেন 'কুসুম সার্কাসে যা করত তাকে লোকে কি বলে। সেটা কি শিল্প, না খেলা?'

'কে কুসুম?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'কুসুম মানে—' হতচকিত হয়ে উত্তর দিলেন নিবারণ—'আমার স্ত্রী।'

'কে, নন্দী?'

'হাঁ।' মাথা নাড়লেন নিবারণ 'আমার সন্দেহ ছিল খাঁচা ভূগী ও সাপের মাথা খাওয়ার ভিতর কোনো শিল্প নেই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখন আমার মনে হয় ধারণাটা ভুল।'

আমি কিছু না বুঝে চুপ করে রইলাম।

নিবারণ বললেন 'সার্কাসে আপনারা কুসুমকে দেখেছেন, আমি দেখিনি। আমি শুধু কথা শুনেছিলাম, ওকে বলা হত পিশাচ-মহিলা।' আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন নিবারণ 'কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন?'

'কি?'

হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিবারণ। আর কোনো কথা বললেন না। দেখলাম উনি স্থির দৃষ্টিতে নিজের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ বললেন 'আমি কুসুমকে বুঝবার চেষ্টা করছি।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন 'হয়ত একটা জীবন সময় অনেক কিছুর জন্যই যথেষ্ট নয়।'

নিবারণ কর্মকার সামান্য পড়ুয়া— তাঁর চিন্তায় কিছু উদ্ভট ব্যাপার ছিল— এইটুকুই আমরা জানতাম। সব মিলিয়ে মানুষটা আমাদের কাছে ছিল সহজ। কিন্তু এখন কেমন সন্দেহ হ'ল— নিবারণের গলার স্বরে, চোখের চাউনীতে অন্যরকম কিছু প্রকাশ পাচ্ছে। হঠাৎ উঠে গেলেন নিবারণ, দরজার বাইরে মুখ বার করে কি দেখে নিলেন, ফিরে এলে নিজের ডান হাতের দিকে পূর্ববৎ

চেয়ে থেকে নীচু গলায় বললেন 'কিছুদিন আগে এক দুপুরবেলা দেখি দুজন ঠাঁচেরুর ওপর এসে বসা একটা মোরগের দিকে স্থির চোখে চেয়ে আছে। আমি ওকে ডাকলাম, সাড়া দিল না।' একটু চুপ করে থেকে বললেন 'আপনার কি মনে হয়?'

আমি মাথা নাড়লাম— জানি না।

নিবারণ বললেন 'আমার মনে হয় স্বাভাবিক মানুষ যা পায়— তা থেকে দুজনের তৃপ্তি হয়না। এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলতে পারেন?'

আমি আবার মাথা নাড়লাম— না। আমার গা শিউরে উঠছিল।

নিবারণ বললেন 'একদিন আমি ওর খেলা দেখতে চাইলাম। ও প্রথমে রাজী হ'ল না। বলল— সার্কাসে যা দেখাতে তার সবটাই ছিল কৌশল। কিন্তু আমার সন্দেহ ছিল। অবশেষে একদিন আমার সাধা সাধনায় রাজী হল। গভীর রাত্রে আমার সামনে একটা মুর্গী কাঁচা খেল ও। সে দৃশ্য বড় ভয়ঙ্কর।' বললেন নিবারণ কর্মকার— তাঁর মুখচোখে তার ছাপ ফুটে উঠছিল— যেন চোখের সামনে গভীর রাত্রে একা এক পিশাচ-মহিলার সামনে বসে থাকার সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে এখনো তাড়া করছে। একটু দম নিয়ে বললেন 'কল্পনা করুন ঘরের বৌ যাকে খুব চিনি জানি বলে মনে হয়— হঠাৎ গভীর রাতে তার চেহারা ও স্বভাব বদলে যেতে দেখলে কি মনে হয়।'

আমার কিছুই বলার ছিল না। চুপ করে রইলাম।

নিবারণ বলল 'কিন্তু ভেবে দেখলে এ ব্যাপারে বোধহয় ভয়ের কিছু নেই।' বলেই খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন নিবারণ, তারপর প্রায় আপন মনে বললেন 'ছবি আঁকার সঙ্গে এর তফাৎ কি? আমি ভেবে দেখছি— অভ্যাস না কৌশল না অসুখ— কোনটা?' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন নিবারণ, আমার নিজের ডানহাতের সন্দেহজনক ছুটো আঙুলের দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ বললেন 'আপনার কি মনে হয় না যে এ ব্যাপারে ভয় কিছুই করবার নেই?'

'কি রকম?' আমি প্রশ্ন করি।

হাসলেন নিবারণ কর্মকার 'যেমন ছবির ব্যাপারে আমার কিছুই করবার ছিল না। নিশি রাতের সেই ঘটনাটা ভেবে দেখুন।'

'দেখব।' বললাম। কেমন সন্দেহ হ'ল নিবারণের মাথায় কোনো অদ্ভুত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কেননা হঠাৎ এক সময়ে বললেন 'আমার আঙুলগুলো ও' নষ্টই হয়ে যাচ্ছে—'একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন 'দুজনকে বলে দেখব, যদি ও

আমার ছবি-আঁকার আঙুল দুটো খেয়ে ফেলতে পারে।' বলেই পুরোনো দিনের বিচ্ছিরি হাসি হাসলেন নিবারণ। হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন 'আপনারা কুসুমকে ভয় করেন, না?'

আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। পাগল আর কাকে বলে! যখন চলে আসি তখনো নিবারণ বিড়বিড় করে যা বলছিলেন তার অর্থ—ওঁর ছবি-আঁকার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

আমরা ভেবেছিলাম মিস্ কে. নন্দী দেবীচৌধুরানীর মতো প্রফুল্লে রূপান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা যা বোঝা যাচ্ছে তাতে মনে হয় কোথাও কোনো গোলমাল থেকে গেল।

এদিকে গাঁয়ের লোকেরা কে. নন্দী কিংবা নিবারণ কারুরই এই গাঁয়ে থাকা পছন্দ করছিল না। তারা বলে বেড়াচ্ছিল কে. নন্দী এবার তাঁর শেষ খেলা দেখাবেন। তিনি বড়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষাসম্পন্না মহিলা— সাপ মুর্গীর পর এবার তিনি আরো বড় কিছুর জন্য হাঁ করেছেন। নিবারণের বিপদ ঘনিয়ে এল বলে। মনে হচ্ছিল কে. নন্দীর সেই শেষ খেলাটা দেখার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করছে।

ছবি-আঁকা ছেড়েই দিলেন নিবারণ। ঘর থেকে বড় একটা বেরোতেন না। কিন্তু তাঁর ভিতরে যে একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে একদিন তার প্রমাণ পাওয়া গেল। গানের বাজনা শুনে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ঘর ছেড়ে বেরোলেন তিনি। ছেড়ে উঠলেন— হাত-পা ছুঁড়ে চীৎকার করলেন এবং এই সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত রক্তাক্ত শরীরে অবশেষে বুড়ো শিবতলার বটগাছের নীচে লুটিয়ে পড়লেন। কে. নন্দীর সেবা-যত্নে তাঁর শরীর ক্রমশ সুস্থ হ'ল, কিন্তু রোখ কমল না। পথে পথে ঘুরে বেড়ান আর বুড়ো বাচ্চা সকলকেই ডেকে তাঁর ডানহাতটা দেখান 'ভাখো তো, আমার আঙুলগুলো, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কেন?'

এই সময়ে একদিন হাজার আমার সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কষ্টে চিনতে পারলেন আমায়। বললেন 'শুনেছেন কিছু? নিশি দারোগা বলে পাঠিয়েছে যে কুসুমকে ত্যাগ করতে হবে। আশ্চর্য!'

আমি কিছু বললাম না। নিবারণের পিঠে হাত রাখলাম। নিবারণ নিজেই বলে চললেন 'কুসুম চলে গেলে আমার আঁকায় কি হবে।'

'আপনি আবার আঁকছেন?'

'না।' মাথা নাড়লেন নিবারণ 'আমার আঙুলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন 'কিন্তু কুসুমকে আপনারা ভয় পান কেন? আমি তো দেখছি কুসুম সার্কাসে যা করত তাও একটা খেলা। ছবি আঁকা যেমন খেলা, ঠিক তেমনি। কিন্তু মুস্কিল— আমরা কেউই অভ্যাস ছাড়তে পারছি না।' বলেই হঠাৎ হা হা করে হাসলেন নিবারণ 'কয়েকদিন আগে আমি একটা পায়রা মারলাম। তারপর ঘাড় ঘটকে সেটার গলার নলীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে বললেন 'মুখ দিতে প্রবৃত্তি হ'ল না। কিন্তু দেখবেন, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই।'

কয়েকদিন পর নিবারণকে বাস্তবিক দেখা গেল বনদুর্গার মাঠে— একপাল ছেলেপুলে ঘিরে রয়েছে তাঁকে, আর মাঝখানে নিবারণ একটা আবলুস কাঠের পালক দু'হাতে পটাপট করে ঝিঁকছেন, কাঁচা মাংসের ডেলা বাঘ কাবড় বসাচ্ছেন। তাঁর মুখের বিশ্বাস, যত্নোত্তেজক সব কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

এরপর প্রায় সবকিছুই ত্যাগ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন নিবারণ। মাঝে মাঝে আস্ত পাঁঠা-ছাগল কাঁধে ঘরেন, কুসুমকে তাড়া করে বেড়ান। দু'বার গাঁয়ের লোক তাঁকে বাঁশ পেটা করে আবদ্ধ করল। লোকে নিবারণের নামের আগে 'পাগলা' কথাটা জুড়ে দিল।

আমার মনে হয় নিবারণ ঠিক পাগল হয়ে যাননি। কে. নন্দী সার্কাসে যখন মুর্গী এবং মাস ভক্ষণ করতেন— তখন কেউ তাঁকে পাগল বলেনি, বরং অনেকদূর থেকে পয়সা খরচ করে দেখতে গেছে। নিবারণ সম্পর্কে আমার এই মনে হয় যে তিনি তাঁর শিল্পের অভ্যাস পরিবর্তিত করতে চাইছিলেন মাত্র। মনে হয়েছিল ছবি ছেড়ে বাস্তবিক তাঁর শিল্পগুলি এইবার তাঁকে আক্রমণ করতে শুরু করেছিল। তাই তিনি শিল্পান্তরে যেতে চাইছিলেন মাত্র।

এর কিছুদিন পর একদল যেতে এল আমাদের গাঁয়ে। নানারকম খেলা দেখাল, তমুখপত্র শিকড়বাকড় বিক্রী করল। তারপর একদিন ছাউনী গুটিয়ে চলে গেল।

দু'একদিন পর নিবারণ আমার কাছে এসে বললেন 'আমার স্ত্রী কুসুমকে আপনি চিনতেন?'

আমি মাথা নাড়লাম— হাঁ।

হঠাৎ খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠলেন নিবারণ, বললেন 'কুসুমের সার্কাসের খেলাগুলো কিন্তু তেমন সাঙ্ঘাতিক কিছু ছিল না। তার চেয়ে সাঙ্ঘাতিক খেলা আমিই আপনাকে দেখাতে পারি।'

আমি নিবারণকে দেখছিলাম— আগেকার মতোই আছেন নিবারণ। লক্ষ্য করলাম তিনি আর তাঁর ডানহাতের দিকে চাইছেন না এবং তাঁর বগলে মোড়কের মধ্যে কয়েকটা ছবি রয়েছে বলে মনে হ'ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কি ব্যাপার?'

খিক্ খিক্ করে হাসলেন নিবারণ 'কুসুমের সেই খেলাটার কথা বলছিলাম। সেই খেলাগুলো আমিই কুসুমকে দেখাতে শুরু করলাম। কুসুম কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। খেলা দেখাতো কুসুম, কিন্তু ঐ খেলা নিজে কখনো দেখেনি সে।' একটু চুপ করে থেকে বললেন 'আমার মতোই অবস্থা হ'ল কুসুমের। তার শিরাও তাকে আক্রমণ শুরু করল।'

আমি চেয়ে ছিলাম। খানিকটা আন্দাজ করে বিস্মিত না হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম 'কে, নন্দী কোথায়?'

'ঠিক জানি না। একদল যেন এসেছিল লক্ষ্য করেছেন?' আমি বুঝলাম। চুপ করে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম 'আপনার আয়ুল?'

নিবারণ উত্তর দিলেন না। আস্তে আস্তে ছবিগুলোর মোড়ক খুলে আমার সামনে পেতে দিলেন। প্রথম ছবিটাতেই ছিল দুটো ভয়ঙ্কর কালসাপ পরস্পরকে জড়িয়ে রয়েছে। আমি আর ছবিগুলো দেখলাম না। দেখবার দরকারও ছিল না।

বুঝলাম, পটুয়া নিবারণকে এবার ঠেকানো মুশকিল হবে। কেননা, তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর অস্তিত্বের অপরাংশ তাঁর শিল্পকর্মের বিদ্রোহী ধারণার ভয়ংকরতা ও হিংস্রতাকে ভক্ষণ করতে সক্ষম।

দীপ

উৎপল দত্ত

[সুপ্রিয়া চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত করছিল, মিলন সরকারের আসার সময় হয়েছে বলে। মিলন ঢুকলো কিন্তু এমন বিলিতি মদের গন্ধ বিকিরণ করে যে সুপ্রিয়া বুঝলো, চা ও খাবে না। খুব জোরে শব্দ ক'রে সে আবার পেয়ালা, টী পট তুলে ফেলতে লাগলো। মনের ক্ষোভটা টীনেমাটির পেয়ালার ওপর গিয়ে পড়তে সে সম্বরে ভেঙে গেল]

মিলন। আঃ, কী হচ্ছে ?

সুপ্রিয়া। একটা কাপ ভাঙলো।

মিলন। সে তো বুঝতেই পারছি। একটু আস্তে, সুপ্রিয়া, এক একটা শব্দ যেন……যেন বিস্ফোরণ……কাছে এস ……

সুপ্রিয়া। না।

মিলন। সে কী ? দিকে দিকে আজ অবাধ্যতার ঢেউ ?

সুপ্রিয়া। যে হুইস্কি গিলেছ, তার গন্ধ নাকে গেলে আমার বমি আসে।

মিলন। সে তোমার আপত্তিংসিং-এর দোষ।

সুপ্রিয়া। কিসের দোষ ?

মিলন। যে আবহাওয়ায় তুমি মানুষ হয়েছ, তার দোষ। মৌলভী সাহেবের বাড়িতে কাকেদের মেয়ে, হংসমধ্যে বকযথা, রক্তমত পানীয়ের মর্ম তুমি কী বুঝবে ?

সুপ্রিয়া। মাতাল অবস্থায় মৌলভী সাহেবের নাম মুখে নিতেও লজ্জা হওয়া উচিত।

মিলন। আশ্চর্য ! অতি আশ্চর্য !

সুপ্রিয়া। মানে ?

মিলন। মৌলভী সাহেবের নামে অমন দেবদাসীর স্বর্গীয়ভাব ফুটে ওঠে তোমার মুখে। অথচ……

সুপ্রিয়া। অথচ কী ?

মিলন। মাতাল অবস্থায় আমি মৌলভীর নাম মুখে নিতে পারবো না, অথচ সজ্ঞান অবস্থায় মৌলভীর পালিতা কন্যা বেসামাল করতে পারেন !

[মিলন ভেবেছিল সুপ্রিয়া এতে ভীষণ রেগে উঠবে, এবং ধারণত অবস্থায় ওর দেহ সম্ভোগ করতে মিলনের বড় ভাল লাগে। কিন্তু সুপ্রিয়ার অবিচলিত উত্তরে মিলন হকচকিয়ে গেল]

সুপ্রিয়া। বেশ্যাবৃত্তি করেছি পেটের দায়ে। ঠিক তোমার মতন।

মিলন। [অপ্রতিভ হাসি টেনে] আমি বেশ্যা? প্রথমত ব্যাকরণ ভুল। বোধহয় বেশ্যা হবে। দ্বিতীয়ত, আমি ওরকম নই, কারণ —

সুপ্রিয়া। তুমি বেশ্যার অধম। কারণ বেশ্যা দেহ বেচে। তুমি বেচো তোমার বুদ্ধি, আদর্শ, আত্মা, সব। যেজে বেচো।

মিলন। আমি সাংবাদিক।

সুপ্রিয়া। না। তুমি খবরের কাগজের মালিকের তাঁবেদার বেশ্যা, রক্ষিতা। মৌলভী সাহেব হলে বলতেন, তওয়াইফ। তাই বড় বড় কথা ছেড়ে দাও। একদালে নাকি জেল্-এ গিয়েছিলে, লড়াই করেছিলে, সব সময়ে তো ঐ সব কপচাও। সেই তুমি যখন রোজ দশটা-পাঁচটা কলম পিষে সেই লড়াই-এর শ্রাদ্ধ ক'রে আসো, সেটা বেশ্যাবৃত্তি নয়?

[মিলন কিছুক্ষণ কথা কইতে পারে না।
মুখের ঘোরও খানিকটা কমে এসেছে]

মিলন। তোমার পেছনে মাসে পাঁচ শ' টাকা ঢালি ঐ সব বুকনি শুনতে?

সুপ্রিয়া। পাঁচ শ' টাকা যে জন্যে ঢালো তা তো পাচ্ছই, রোজই পাচ্ছ। তার ওপর তোমার বুকনি আমায় শুনতে হবে এমন কোনো মাসখৎ তো লিখে দিই নি। দুজনেই যখন একই ব্যবসা করছি তখন বুকনি ঝাড়লেই উল্টে বুকনি শুনতে হবে।

[আবার মিলন গভীর বিষাদে চুপ ক'রে থাকে কিছুক্ষণ]

মিলন। যথার্থ। আমি বেশ্যা।

[সুপ্রিয়া হেসে ফেলে।

কাছে এসে বোসো।

[সুপ্রিয়া আসে

একটা বিষয়···—বিষম মোহলাময় অবস্থায় পড়েছি। তোমায় ছাড়া কাকে বলবো?

সুপ্রিয়া। ওপিতা ছেড়ে ছেড়ে কাশো দেখি।

মিলন। আমায় একবার নাম ধ'রে ডাকো দিকি।

সুপ্রিয়া। সে সম্ভব নয়। মৌলভী সাহেবের কাছে সে শিক্ষা পাই নি।

মিলন। হুঁ।

সুপ্রিয়া। কী হয়েছে বলো না।

মিলন। ব্যাপার গভীর। এবং এ ব্যাপার থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে আমি বেশ্যা। আজ মালিক সকলকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সবাই মানে আমরা চারজন। সম্পাদক, বার্তাসম্পাদক, একজন সহ-সম্পাদক, আর একজন চুনোপুঁটি রিপোর্টার, মানে আমি। ডেকে বললেন, খবর ম্যানিপুলেট করতে হবে।

সুপ্রিয়া। মানে?

মিলন। মানে আমিও খানিকক্ষণ বুঝি নি। তারপর বুঝলাম। বুঝে মনের কপালে-করাঘাত করতে লাগলাম।

সুপ্রিয়া। শাদা বাংলার কথাগুলোন বলবে কি?

মিলন। বলছি। মালিকের ভাষাতেই বলছি। আমি অভিনয় করতাম জানো? একেবারে খবর বেরোচ্ছি।

[উঠে দাঁড়িয়ে চশমা এঁটে সে কাল্পনিক মসনদ নেয়।
তারপর অদৃশ্য কর্মচারীদের উদ্দেশে বলে—]

আপনারা অতি অপদার্থ। খবর না পেলে খবর তৈরী ক'রে নিতে পারেন না? কাল সকালে প্রথম পাতায় প্রথম চার কলম জুড়ে একটি খবর বেরুবে। লিখে নিন। "পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত যাত্রীর বুদ্ধিতে নরমুণ্ড।" এইটে হোলো হেডলাইন। এইবার রিপোর্টার মিলন সরকারের কাজ হোলো কাহিনীটা লিখে ফেলা। বুঝেছেন?

সুপ্রিয়া। সে কি? তুমি কী বললে?

মিলন। সেটাই তো বলা। সেখানেই তো প্রমাণ হোলো আমি বেশ্যা। দেহের চেয়ে যা শতগুণ পবিত্র, সেই আত্মা পর্যন্ত বিকিয়ে দেছে আমার। মসনদের কালো ঘোরা-পড়ানো চেঁাট আর চশমা দেখে আমি কিছুই বলতে পারলাম না। কী করলাম জানো? নিজের টেবিলে ফিরে এলাম, এক গেলাস জল খেয়ে কলম চালাতে শুরু করলাম, এবং এইমাত্র লোমহর্ষক কাহিনীটা বার্তাসম্পাদকের ডেস্কে রেখে আসছি।

সুপ্রিয়া। তুমি ·····তুমি ঐ নরমুণ্ড পাওয়ার গল্প লিখে এলে ?

বিমল। হ্যাঁ। ঘরে আনতে বলেছিল, আমি মেরে এনেছি। একটির জায়গায় তিনটি নরমুণ্ড সৃষ্টি করেছি। সেই নরমুণ্ডের একটাকে আমার শিয়ালদা'র এক উদ্বাস্তু নারী চিনে ফেললো, এবং "ওগো, তোমার যতটা কোথায় গেল গো" বলে কান্না জুড়ে দিল।

সুপ্রিয়া। কাল·····কাল এ সব বেরুবে ?

বিমল। হ্যাঁ, ছবি শুদ্ধ।

সুপ্রিয়া। ছবি !!

বিমল। হ্যাঁ, অফিসের ফোটোগ্রাফ বিভাগে কর্তারা সব লুকেছেন দেখে এলাম। ৪৮ সালের দাংগার এক মুসলিম যাদের জলন্যত মুখ আর মালয় থেকে আনা ১৯৫০ সালের নিহত সেরিসা-সৈন্যের কাটা মুণ্ড এক সংগে জোড়া হচ্ছে। এ গ্রাস বি ইজ নট এ অর বি, বাট সি। ছটো ভালর ভালর মিলে গেলে কাল প্রথম পৃষ্ঠায়, "ওগো তোমার যত কই" শিরোনামায় আত্মপ্রকাশ করবে। তারপর·····হাসছো কেন, সুপ্রিয়া ?

সুপ্রিয়া। তোমার বলার ধরন দেখে।

বিমল। হাসার কিছু নেই। কাল বিকেলেই দাংগাটা লাগবে মনে হচ্ছে।

সুপ্রিয়া। দাংগা !!

বিমল। হ্যাঁ। দাংগা। মালিকের বড় আশা বিকেলেই লাগে। তবে এক আধবেলা এদিক ওদিক হতে পারে। আর এই দাংগা লাগানোর লেখনে আমারও হাত রইল। এই·····কুৎসিৎ·····কালীমাখা হাতটা খানিক থেকে গেল।

[পকেট থেকে ছোট এক বোতল মদ বার করে]

তুমি তো খাবে না। ভাল মাল। মাকিন। মালিক দশায় প্রচুর পান। কেন পান, কোত্থেকে পান কে জানে। কী দরকার জেনে ? অফিসে বিলি করেন, আমরাও ছিটেফোঁটা পাই, এ-ই যথেষ্ট।

সুপ্রিয়া। [প্রায় নিজের মনে] মৌলভী সাহেব থাকেন টালীগঞ্জে, একেবারে হিন্দু পাড়ায় মাঝখানে।

বিমল। টালীগঞ্জ ? সাফ, সাফ, সাফ হয়ে যাবে। এক্টালি যাবে। কলাবাগান যাবে। তবে প্ল্যান হয়েই আছে ; কারণ মালিকমশাই আরো ক'টি

কাহিনীর প্লট দিয়েছেন অলটেডি। এই যে— হেডলাইনগুলো দিয়ে দিয়েছেন, গল্পটা ফুটে দিলেই হোলো। জমে জমে ছাপা হবে। "কলিকাতায় সাংগায় জন্য মুসলমানরাই দায়ী"— এই যে আর এক-খানা, "এন্টালি এলাকায় মুসলমান গুণ্ডাদের দলের আক্রমণ"— এই যে আর, "টালীগঞ্জে পাকিস্তানী গুপ্তচর ধরা পড়িবার"। এ ছাড়া পূর্ব বাংলার সীমান্ত থেকে প্রেরিত বিশেষ সংবাদদাতার পত্রের কয়েকটি খবর। [হেসে] আসলে কী জানো? সেই বিশেষ সংবাদ-দাতা হোলো এই মিলন সরকার। সীমান্তে নয়, কলকাতায় এঁদো গলিতে থাকে।

সুপ্রিয়া। [ক্ষুব্ধ ভীতস্বরে] তুমি এইসব লিখবে?

মিলন। নইলে কি আর বেশ্যা। আলা বয়লো কখন জানো? যখন মালিক আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "মিলনের ওপর আমাদের অগাধ আস্থা, ও-ই পারবে।" অর্থাৎ আমি ওঁর ঘায়েদের খাস বেশ্যা।

সুপ্রিয়া। সত সাংগায় যা গেছেন— মানে মৌলভী সাহেবের স্ত্রী। এবার বোঝায়……

মিলন। তাই বলছি, এই মালটা টানো, আরাম পাবে।

সুপ্রিয়া। চোখেও দেখেন না মৌলভী সাহেব।

মিলন। ভালই তো। কে যে মারলো সেটাও দেখতে হবে না।

সুপ্রিয়া। কত টাকা মাইনে পাও?

মিলন। নূতন ক'রে বলতে হবে?

সুপ্রিয়া। এত জ্বরে তোমাকে কেনা যায় জানতাম না তো!

মিলন। [হঠাৎ গম্ভীর হয়ে] তাহলে তুমি কী বলো? কী করবো?

সুপ্রিয়া। কী করবে জানি না। তবে এই……এই ভীষণ পাপ……এ থেকে সাত হাত দূরে থাকা উচিত।

মিলন। নয়নুতের গল্প তো ইতিমধ্যে লিখে দিয়ে এসেছি।

সুপ্রিয়া। আর লিখো না। যা লিখেছ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে অন্য কাগজে পুরো বক্তব্যটা ফাঁস ক'রে দেয়া উচিত।

মিলন। প্রথমত, আমি না লিখলে ওরা অন্য কাউকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে। আর অন্য কাগজ মানে? কে ছাপবে? আমাদের কাগজের আভ্যন্তরীণ খবর ছেপে দেবে অন্য কাগজ? পাগল। কেউ ছাপতে

পারে না। তবের মধ্যে যোগসাজস আছে, তবু তাদের সেই হীন যোগসাজসের নাম দিয়েছে এটিকেট।

সুপ্রিয়া। তাহলে ধানবাদীদের কোনো কাগজে পাঠিয়ে দাও।

মিলন। কী লাভ? ক'জন পড়বে? উপরন্তু ও খবর বেরুলো মাত্র আমার চাকরী যাবে।

সুপ্রিয়া। কেন? চারজন লোক ছিল আজকের মিটিং-এ। কী ক'রে জানবে যে—

মিলন। কিন্তু তাদের মধ্যে আমার বাইরে সবচেয়ে কম। অতএব ওঁরা বুঝে নেবেন যে এ-ই ঝাঁক মেরেছে।

সুপ্রিয়া। যাক চাকরী। এখন খুনী ডাকাতদের নিমক খেয়ে কাজ নেই।

মিলন। বলা সহজ। বহুকাল অনাহার অর্ধাহারে কাটিয়ে আজ সুদিনের মুখ দেখেছি। খাবো কী?

সুপ্রিয়া। তা বলতে পারবো না।

মিলন। বাড়ীতে মা আছেন, চার বোন। বিয়ে দেবে কে?

সুপ্রিয়া। সে-ও জানি না।

মিলন। তোমার বাপোদ্ধারও বন্ধ হয়ে যাবে। তোমাকে যে বিয়ে করবো ভেবেছিলাম সে গুড়েও বালি পড়বে।

সুপ্রিয়া। সব জানি। জেনেও বলছি, যাও ফাঁস ক'রে।

মিলন। কিন্তু লাভ কিছুই হবে না, সুপ্রিয়া। যদি মুক্তভাষ কিছু ভাল লোক পড়বে, প'ড়ে এই ষড়যন্ত্রের কাহিনী বলে বেড়াবে হাজার মোড়ে, গ্রামের হাটে, গঞ্জে তুলবে জনতার প্রতিরোধ, তবে এ খুঁকির একটা অর্থ হোতো। কমিউনিষ্টদের অমন শক্তিশালী সৈনিক ছিল, তার আজ কী হাল জানো? সেতারা সব জেলে। কাগজটা গিয়ে পড়েছে এমন একদল লোকের হাতে যারা এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় দাঁড়িয়েও সমানে পাকিস্তান-বিরোধী লেখা ছাপছে। কলকাতা এমনই শহর যে পাকিস্তান-বিরোধী সমালোচনা অনেক সময়েই মুসলিম-বিরোধী উস্কানি হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় আমি কী করবো? রাগের মাথায় চাকরী-বাকরী ছেড়ে দিলাম বটে। পুরো ষড়যন্ত্রটা ফাঁস ক'রে লেখা পাঠিয়ে দিলাম কোথাও। তারপর? যেখানে ছাপা হোলো সেটা কেউ পড়লো না, জানলো না। ষড়যন্ত্র যেমন চলছিল তাই চললো।

ধাংগা যেমন লাগার ঠিক লাগলো। যে সব এলাকায় মুসলমানরা কমুকাটা হওয়ার কথা তারা ঠিক তাই হোলো। যতটা রক্ত বইবার কথা, যতটা চোখের জল গড়াবার কথা, সব ঠিক ততটাই হোলো। মাঝখান থেকে শুধু আমার চাকরীটা রইলো না। অনাহারপ্রস্ত বেকারের দলে আর একটি ক্ষুদ্র নাম যুক্ত হোলো। কী লাভ? এ তো আদর্শবাদ নয়, সাম্রাজ্যের সৌরাষ্ট্রভূমি। ধাংগা ঠেকানো কি আমার মতন নগণ্য আহাম্মুকের পক্ষে সম্ভব? তবে? কিসের জন্যে আমি সব খোয়াবো বলতে পারো?

[সুপ্রিয়া কোনো কথা না ব'লে কাগজ আর কলম এনে রাখলো মিলনের সামনে।]

মিলন। এর মানে কী?

সুপ্রিয়া। লেখো। সব ঝড়ঝঞ্ঝা কাল ক'রে যাও।

মিলন। আঃ, এতক্ষণ ধ'রে যা বললাম শুনলে না?

সুপ্রিয়া। ওসব বড় বড় কথা। ধাংগা লাগবে কি লাগবে না—ওসব বড়লোকদের দরকার-মাফিক স্থির হয়। তুমি আমি সাধারণ মানুষ। আমি দেখতে চাই শুধু এইটুকু—অন্যদের যা হয় হোক, তোমাকে যেন এই পাপ স্পর্শ করতে না পারে।

মিলন। [হেসে] পাপ!! এ লেখায় কি তুমি পাপ পুণ্যের কয়সলা করাতে চাও?

সুপ্রিয়া। হ্যাঁ। আমার শিক্ষাদীক্ষা বেশি নেই কিনা। কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা যদি ধাংগা লাগায় তবে ভগবান ওদের বিচার করবেন। কিন্তু সেই বিচারের দিন যেন মিলন সরকারকে আমরা বেঁচে করতে না হয়।

মিলন। বলেছে? আমায় নাম বলেছে।

[সুপ্রিয়া জীভ কেটে ফেলে]

দেখ, এই সব পাপ-পুণ্য-স্বর্গ-নরক আমার কাছে ছেলে-ভুলোনো রূপকথা। রাজনৈতিক প্রয়োজন একটা অনির্দিষ্ট জিনিষ। আগে থাকতে কোনো বাঁধাধরা ছক থাকে না যে সেই ছক অনুযায়ী কাজ ক'রে গেলেই হোলো। আমাকে বোঝাও কেন লেখা প্রয়োজন, আমি লিখবো। পাপ-পুণ্যের কথা ব'লে কিছু করতে পারবে না।

সুপ্রিয়া। আদর্শ নেই ?

বিমল। আদর্শও আপেক্ষিক জিনিষ। প্রয়োজন-অনুযায়ী আদর্শ সৃষ্টি হয়, বদলায়, ক্ষয় পায়।

সুপ্রিয়া। তর্ক করতে পারবো না, কারণ অত জানি না। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি কী যেন একটা ব্যাপার করছো। হয় রাজনীতি জিনিষটাই একটা চোখের অনুযাত ; আর না হয় তুমি নিজের সুবিধের জন্য রাজনীতিকে বিকৃত করছো। লেখ।

বিমল। না, আমি লিখবো না। আমার খিদে পেয়েছে।

সুপ্রিয়া। খাবারটা গ্রাম হয়ে এল। এক্ষুনি আনছি। ততক্ষণ লিখে ফেল।

[বলে সুপ্রিয়া চলে গেল]

বিমল। [চেঁচিয়ে পাশের ঘরে সুপ্রিয়াকে জানায়] কেন লিখবো ? যখন না খেয়ে মরছিলাম তখন ঐ পাপ-পুণ্য কেউ ভাবতো ?

[পকেট হাতড়ে দেশলাই পায় না, অথচ সিগারেট ওঁজেছে মুখে]

সুপ্রিয়া, দেশলাই দাও।

[হঠাৎ আলো কমে আসে ঘরে। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের হালচাল বিমল জানে, তাই গা করে না। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র আলোকের রহস্য ঘেরা জগতে পেছনের দরজা খুলে তিনজন বিচিত্র-বেশ, এলোমেলো-চুল ব্যক্তি প্রবেশ ক'রে পা টিপে টিপে বিমলের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। একজন বৃদ্ধ, মাথার চুল সাদা, এর নাম জনার্দন। একজন যুবক, বলিষ্ঠ, এর নাম কপিল। আর একজন কিশোর, এর নাম ইউসুস। বিমল দেখতে পায় নি। দেশলাইটা রোজকার মতন ডানহাতে এসে ঠেকবে এই ভেবে সে হাত বাড়িয়েছিল। সেটা ঠেকলো কপিলের গায়ে। আন্দাজে হাতড়ে বিমল বুঝলো অপরিচিত কেউ ঘরে ঢুকেছে। সভয়ে মাথা তুলতেই কপিল হাসলো]

কপিল। কেমন আছ, বিমল ?

বিমল। আরে, কপিল যে। কী মনে ক'রে ? কোত্থেকে ? কতক্ষণ ? আরে তুমিও যে……কী যেন নামটা……

জনার্দন। জনার্দন।

বিমল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জনার্দনদা। আর…একেও তো দেখেছি দেখেছি বোধ হচ্ছে ?

কপিল। ইউসুফকে চিনতে পারলে না?

মিলন। ইউসুফ! কি আশ্চর্য! তা দোষ নিও না, ভাই। কতদিন দেখা নেই বলো তো।

ইউসুফ। তা বারো বছর হবে। হাঁ, ১৯৭২-র শেষ দেখা।

মিলন। কপিলভাই, তুমি একটুও বদলাও নি। বোসো, জনার্দনদা। খাবে?

[মিলিতি স্বরের যোতল দেখায়]

কপিল। তোমার তো শালা কপাল ফিরেছে দেখছি।

মিলন। ওটা ধনিবের উপহার।

কপিল। ঘরখানা দেখছিলাম।

মিলন। হাঁ ···তা ···বর্তমানে অবস্থা যে আমার খুব খারাপ তা নয়···

জনার্দন। শুয়রে কে? বউ বুঝি?

মিলন। বউ? হাঁ, তা বউই বটে। ডাকছি।

কপিল। কোনো দরকার নেই। বোসো।

মিলন। তা আজ হঠাৎ সদলবলে কী মনে ক'রে?

কপিল। দরকার আছে।

মিলন। কী করা হচ্ছে আজকাল?

কপিল। কবা? কবার কিছু নেই আর। কবার পাট চুকে গেছে। আজকাল শুধু তোমাকে দেখি। আর ভাবি— যাঃ, শালার তো খুব হাতযশ। আগে তো বুঝি নি এ এত খেল জানে?

মিলন। [ঈষৎ সন্ত্রস্ত] আমার ওপর নজর রাখা হচ্ছে বুঝি?

জনার্দন। সেটাই আমাদের এখন একমাত্র কাজ।

মিলন। [ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে] কি অধিকারে? কোন অন্যায়টা করেছি আমি বলো? পার্টিতে থাকা আর সম্ভব হয় নি। পেট চালাবার জন্যে খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করি। কী অন্যায় করেছি? আমি কি পার্টিকে বিট্রে করেছি? কবায়? কাজে? কখনো? আর তোমরা কে? কি অধিকারে—

জনার্দন। একদিক থেকে বলতে গেলে আমরা তোমার অতীত।

মিলন। তাই বলে আমায় পাহারা দেবে? ইয়ার্কি নাকি? আমি পার্টিতে তোমাদের নামে কমপ্লেন করবো।

কপিল। [ধমকে] বোসো। পার্টি কিন্তু করতে পারবে না। আমরা পার্টির নাগালের বাইরে।

মিলন। [হঠাৎ হেসে] ও, তোমরাও পার্টি ছেড়েছ? তা, এতক্ষণ বলছো না কেন? উই আর অল অন দ্য সেম বোট। তাহলে মাল খাও।

জনার্দন। তুমি আর আমরা কিন্তু এক নই। তুমি পার্টি ছেড়েছ নিজের কাজ গুছোতে। আর আমরা ছেড়েছি বাধ্য হয়ে।

মিলন। বাধ্য হয়ে মানে? আমি লেটের দায়ে চাকরি নিয়েছি, সেটা বাধ্য হওয়া নয়?

[ধমকে] নিশ্চয়ই না। লেট। লেট আমাদের ছিল না? তোমার তো বাবের হোটেল ছিল। আর এই জনার্দনবাবু ঘরে দাত দাতটি প্রাণী ছিল না শুধু ওরই হোজপারের পথ চেয়ে?

মিলন। [ঘাবড়িয়ে] আয় রে ইউদুস। এখানে বোস।

[মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়]

ইউদুস। আপনি আমাকে চিনতে পারলে না, মিলনদা?

মিলন। চিনবো না কেন রে? প্রথমটা একটু অসুবিধে হচ্ছিল, কপিল বাবে দেখা। বারো বছর। অবশ্য তুই খুব বদলাস নি। [মনেই অনংগতিটা ধরা পড়ে নিজের কাছে] কেন? বদলাস নি কেন? ৫২ সালে তোর বয়স ছিল···ধরো···

ইউদুস। পনেরো।

মিলন। তাহলে এখন তোর বয়স হওয়া উচিত সাতাশ। জোয়ান মর্দ। বড় হসনি কেন?

[মিলনটা ওল্টিয়ে যেতে সে হাল ছেড়ে দিয়ে ইউদুসের দিকে তাকিয়ে থাকে]

কপিল। আমরা আদালত বসাবো। আসামী মিলন সরকার।

মিলন। [ক্ষেপে] ধামখেয়ালী। আমার ঘরে ঢুকে আমাকেই বিচার করবে তোমরা?

পুরো ৪৮ আর ৪৯ সাল যখন আত্মগোপন করে ছিলে তখন কার ঘরে ছিলে, মিলন সরকার? নিজের ঘরে?

মিলন। না, তা ছিলাম না। ছিলাম তোমার ঘরে। সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

কৃতজ্ঞ! তোমার কৃতজ্ঞতার মূল্য কি? জনার্দনদা কি তোমার চাঁদমুখ দেখে বরজামাই ক'রে রেখেছিল? রেখেছিল পার্টির জন্যে।

জনার্দন। তাই এটা তোমার ঘর বলে আমাকে তাড়াতে চাইছ কোন লজ্জায়, মিলন সরকার?

না, এখানে থাকতে পারো, যতদিন খুশী। কিন্তু এখানে ডেকে আমাকে বিচার করার কোনো অধিকার তোমাদের নেই। আদালত বসাবে। মামাবাড়ীর আব্দার।

জনার্দন। তোমার মনে যদি কোনো পাপ না থাকে তবে বিচারের নামেই এত লাফাচ্ছ কেন, মিলন সরকার?

পাপ? কোনো পাপের স্মৃতি আমার মনে নেই। প্রশ্ন হচ্ছে— তোমরা কে? কি অধিকারে আমার বিচার করবে? আমি পার্টি ছেড়েছি, ঠিক। কিন্তু তোমরাও ছেড়েছ, নিজেরাই স্বীকার করলে। পার্থক্য কী?

জনার্দন। তুমি কি কানে তুলো দিয়েছ, মিলন সরকার? কতবার বলবো আমাদের কেস অন্য। আমরা ছেড়েছি বাধ্য হয়ে।

মিলন। কেন বাধ্য হলে? কী হয়েছিল? খেতে পাচ্ছিলে না, এই তো?

জনার্দন। ওটা একটা কারণই নয়। পার্টির অর্ধেক সভ্যের খাওয়া জোটে না।

মিলন। তবে পরিবারের কান্নায় অস্থির হয়ে তো? আমারো চার-চারটে বোন—

কপিল। পরিবারের কান্নাকে কানে আঙুল দিয়ে ঠেলে রেখেছি, ব্যস্, সেটা আমার কারণ? কার পরিবার নেই? পার্টির কোন মেম্বর পরিবারের জন্যে রাজভোগের ব্যবস্থা করে?

মিলন। তবে কিসে তোমরা বাধ্য হলে পার্টি ছাড়তে?

জনার্দন। উপায় ছিল না। শুধু পার্টি নয়, সব ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম।

মিলন। কি ক'রে?

জনার্দন। ঘরে গিয়ে।

[কথাটা সম্যক না বুঝেই মিলন তর্ক ক'রে চলেছিল। ছোট্ট কথা বলেই সে থামলো। মাথাটা বেঁকে এক পাক ঘুরে গেল। সভয়ে সে হাতের সেলাইটার দিকে তাকালো। তারপর বোধ হয় ইউহুসের ধরন না বাড়ার কারণটাও হঠাৎ মাথায় ঢুকলো। কিছুক্ষণ ইউহুসের দিকে চেয়ে সে নিজের মাথা টিপতে লাগলো]

জনার্দন। নীরব কেন, মিলন সহকার? আমার দোষ নেই, ঠিকই শুনেছ। ১৯৫২ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গুলি চলে, মনে আছে? তিনজন মারা যায়—কপিল, ইউসুস আর আমি। তাই পার্টি না হেরে যাবো কোথায়?

কপিল। এর নাম পার্টি ছাড়তে বাধ্য হওয়া। আর কোনো কারণ প্রাহ্য নয়।

মিলন। আমার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে।

কপিল। এবার আদালত বসছে। জনার্দনবাবু, তুমি জজ। আমি খালি অভিযোগ করবো। ইউসুস, তুই আমার সাক্ষী। মিলন সহকার, তোমার পক্ষে উকিল পাওয়া গেল না। কেউ তোমার মতন বেজন্মার ঝীক নিল না। তাই নিজের কথাগুলোন নিজেই বোলো। একটু সাবধে বোলো, জজসাহেবের সম্মানহানি হলে কন্‌টেম্পো অফ কোর্ট হবে, দুই ঘাঁটার দিয়ে ক'রে দেব।

[জনার্দন চেয়ারে বসে ঝিমিয়ে। ইউসুস বসে একটা চেয়ারে]

জনার্দন। আসামী উঠে দাঁড়ায় না কেন?

কপিল। এই, এই, গোড়া থেকেই কন্‌টেম্পো সুরু করলে? ওঠো!

[মিলন ওঠে]

মিলন। এর কোনো মানে হয় না। মরেছ, মরেছ। মরার পরে এসে আমাকে জ্বালাচ্ছো কেন?

জনার্দন। সাইলেন্স! সাইলেন্স ইন দিস কোর্ট! উকীল কপিলবাবু, আপনি অভিযোগ পেশ করুন।

কপিল। ধর্মাবতার, আপনার সামনে যে বাক্স দাঁড়িয়ে আছে সে অত্যন্ত বাক্স।

মিলন। ভাষাটা সীল রাখলে হয় না? মানহানিসূচক ভাষায় আদালতকে অপমান করা হচ্ছে।

জনার্দন। কপিলবাবু কী বলেন?

কপিল। এই ভাষায় ওর মানের হানি হচ্ছে? তবে ধর্মাবতারের সমীপে একটা কাগজ পেশ করি। ওর লেখা। আজকেই বাক্স লিখেছে। [কাগজ থেকে পড়ে] "পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত মায়ের দুধিতে নরমুণ্ড। কাল বিকালে ইষ্ট পাকিস্তান এক্সপ্রেস শিয়ালদহে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান দুর্বৃত্তদের পাশবিকতার এক নূতন

প্রমাণ পাওয়া যায়। বাজের বুড়ি পুলিতেই নরপশুদের উৎকট অর্থোপার্জনার এক লোমহর্ষক পরিচয় বাহির হইয়া পড়ে। বিমলের প্রকাশ—"

বিমল । ও কাগজ পেলে কোত্থেকে ?

কপিল । সেটা তোমার না জানলেও চলবে। কথা হচ্ছে এইরকম বাজতের মতন কথা লিখে তুমি পুরো দেশের মানহানি করতে পারো আর আমার ভাষা একটু কটু হলেই আঁৎকে ওঠো ?

বিমল সরকার, ইমানীং তুমি লেখক হয়েছ, জজ হয়েছ। তাই বন্ধুর ভাষা সইতে পারছো না। আদালতের রায় হোলো— কপিলবাবু নিজের ভাষাতেই কথা কইতে পারবেন। তোমার মতন ভদ্রলোকে ওঁকে সাজতে হবে না।

বিমল । আমারও তাই মনে হয়। অবজেকশন উইথড্রন।

জনার্দন । প্রসীড।

কপিল । যা বলছিলাম— এই বাজৎ লোকটি এককালে পার্টি করতো। পা বাঁচিয়ে চলতো না, তাও স্বীকার করি। তারপর ১৯৫২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পার্টি একটা জনসভা করে বাসের দাবীতে। সেই সভা থেকে মিছিল বেরুচ্ছিল ; মিছিলের সামনে ছিল এই বাজৎ, কপিল নাথ, জনার্দন মল্লিক আর ইউসুফ মহম্মদ। গেটের মুখেই পুলিশ গুলি চালালো। কপিল, জনার্দন আর ইউসুফ মরলো। বেঁচে গেল এই বাজৎ। আমরা বলবো এই কপিলরা যে মরলো তা একে বাঁচাতেই। মানে কপিলরা মরলো বলেই এ বাঁচলো। এ মরলে কপিল বাঁচতো। গুলিটা এক ফুট ওদিকে গেলেই পটপরিবর্তন হয়ে যেত। অর্থাৎ, ঘোটঘাট, কপিলরা মরে একে আস্ত রেখে গেল। কিন্তু অন্যের প্রাণের বিনিময়ে জীবন বাঁচিয়ে এ বাজৎ কী করলো ? এ পার্টি ছাড়লো, কাজ ছাড়লো, কাগজের আপিসে চাকরী নিল, এবং বর্তমানে অষথা মানহানিকর কলটেষ্টো করছে : কলম ঘোটাচ্ছে পার্টির বিরুদ্ধে, জনতার বিরুদ্ধে। এর মনে গলিত কুষ্ঠ হয়েছে। সেই কুষ্ঠের পুঁজ ঢালছে কাগজে। এ মানবদ্বিষেষী শয়তান হয়ে উঠেছে। এই হচ্ছে আমার অভিযোগ। এ কপিলদের প্রতি বাজতের মতন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

মিলন এ অত্যন্ত উৎসে হচ্ছে ··আমি বন্ধুমের চাকর মাত্র··· আমাকে···

জনার্দন। আস্তে, আস্তে! দেখ, মিলন সরকার, আমার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা কইবে না, নইলে পাঁচটা মারবো। অভিযোগ শুনেছ, এবার বলো, তুমি দোষী না নির্দোষ?

মিলন নির্দোষ।

জনার্দন। সাক্ষী ডাকুন, কপিলবাবু।

কপিল। প্রথম সাক্ষী, জনার্দন মল্লিক।

মিলন। জজ সাক্ষী হতে পারে না। এ কোনো আইনে নেই।

কপিল। তুমি থামো। জজ নিজে বলবে সেটা।

জনার্দন। আমাদের আইন অন্য। জজ সাক্ষী দেবে। প্রশ্ন করুন উকিলবাবু।

কপিল। জনার্দনবাবু, আগে শপথ নিন। বলুন, নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে প্রত্যক্ষ জানিয়া বলিতেছি যে বিপ্লবের অন্তরায় হয় এমন কথা কখনো বলিব না।

মিলন। এ আবার কী শপথ?

জনার্দন। অন্যায়! অন্যায় ইন দি কোর্ট। নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে প্রত্যক্ষ জানিয়া বলিতেছি যে বিপ্লবের অন্তরায় হয় এমন কথা কখনো বলিব না।

কপিল। আপনি ঐ বাক্যকে চেনেন?

জনার্দন। হ্যাঁ।

কপিল। ৪৮ সালের জুলাই মাস থেকে ৪৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত—এই সময়ের মাস কাল ঐ উক্তি কি আপনার বাড়িতে থেকেছিল?

জনার্দন। হ্যাঁ।

কপিল। আপনার আত্মজন করেছিল?

জনার্দন। সেটাকে আত্মজন বলা ঠিক হবে না।

কপিল। কেন হবে না? কোন সুযোগের বান্ধা বলে হবে না? আজ ওকে দেখে মনে হচ্ছে না কি যে ছদ্মবেশ দিয়ে সাপ পুষেছিলেন ঘরে?

জনার্দন। সময় চলমান। এই মুহূর্তেই পরের মুহূর্তের বীজ বপ্ত। সে বিচারে ও সাপই ছিল। আমার প্রতি মুহূর্তই স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেই মুহূর্তে ও ছিল আমার অতি প্রিয় কমরেড।

কপিল। উল্টোপাল্টা বলছেন।

জনার্দন। ইন্টেলেকচুয়াল নয়, মার্ডারার। টাইপেকচুয়াল ব্যাপার, তোর মাথায় ঢুকবে না।

কপিল। এ কী সাক্ষী নিয়ে পড়লাম রে বাবা! কেন ও প্রিয় কমরেড ছিল আপনার?

জনার্দন। সহযোদ্ধা ছিল বলে।

কপিল। আপনার বাড়ীতে কে কে ছিল?

জনার্দন। বা, বাবা, বউ, ভাই, বোন, ভাসুরের বউ, ভাসুরের ছেলে।

কপিল। রোজগার?

জনার্দন। ছিল না। আমার রোজগার করার কথা, কিন্তু আমি তো বছরে ছ'মাস জেলে।

কপিল। তা ঐ হাতীকে যে পুষলেন, নিজের পরিজনকে অনাহারে রেখে?

জনার্দন। অতিথিকেই খেতে দিতে হয় আগে। ওরা হাসিমুখে তাই দিয়েছিল।

কপিল। আর জামাইবাবু হাসিমুখে তাই গিলেছিলেন?

জনার্দন। না, ও আপত্তি করতো। কিন্তু প্রশ্নটা তা নয়। ওকে ভাল ক'রে খেতে দেয়ার দরকার ছিল।

কপিল। কেন?

জনার্দন। ও ছিল পার্টির একজন অতি মূল্যবান কর্মী। আমার মতন দশটা মানুষের সমান ছিল ওর একার মূল্য। ওকে নিরাপদে রাখা এবং সুস্থ রাখা আমাদের কর্তব্য ছিল।

কপিল। তার পরে ৪৯ সালের অক্টোবরে ও বাড়ি থেকে হাওয়া হয়?

জনার্দন। হ্যাঁ, পার্টির নির্দেশে, কারণ আমরা জানতে পারি যে পুলিশ আসছে।

কপিল। পুলিশ কি এসেছিল?

জনার্দন। হ্যাঁ।

কপিল। এসে কী করলো?

জনার্দন। আমি তখন আণ্ডারগ্রাউণ্ড। বাবার মাথা কাটিয়েছিল, মাকে খোঁড়া করেছিল, বউ-এর কান থেকে দুল ছিঁড়তে গিয়ে কানটাকেই ছিঁড়ে কাটাকাটি করেছিল, ভাসুরের বউ-এর পেটে লাথি মেরে গর্ভের শিশুটিকে মেরে ফেলেছিল।

কপিল। অর্থাৎ এই পুরোহটাকে আশ্রয় দেয়ার ফলে আপনার পরিবার বেবড়ক ধোলাই খেল?

জনার্দন। হ্যাঁ।

কপিল । আমার শালা আর কোনো প্রশ্ন নেই।

জনার্দন। মিলন সরকার, তোমার কোনো প্রশ্ন আছে?

মিলন আছে। আপনি যে আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেটা নিজের ব্যক্তিগত, না পার্টির স্বার্থে?

জনার্দন। পার্টির নির্দেশে, তবে আমরা নিজেরা—

মিলন । শুধু আমার প্রশ্নের জবাব দেবেন। আপনি বড় বেশী কথা বলেন। সে সময়ে মিলন সরকার যে পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী ছিল এটা মানেন?

জনার্দন। হ্যাঁ, মানি।

মিলন । মিলন সরকারও প্রচুর নির্যাতন সহ্য করেছে?

জনার্দন। হ্যাঁ।

মিলন মিছিলে পুলিশের লাঠি খেয়েছে?

জনার্দন। হ্যাঁ।

মিলন । ওর পরিবারও না খেয়ে দিন কাটিয়েছে?

জনার্দন। হ্যাঁ।

মিলন । আপনার পরিবার যেমন মিলনের জন্য মার খেয়েছে, তেমনি আরেক দিক থেকে আপনার জন্যেই মিলনের পরিবার কষ্ট সয়েছে?

কপিল । অবজেকশন! অবজেকশন!

জনার্দন। না, চুপ করুন, এ অত্যন্ত বৈধ প্রশ্ন।

কপিল । তার মানে? আপনি কি ওর পরিবারের ঘাড়ে চেপে খেয়েছেন? আপনি কি ওর বাড়িতে লুকিয়েছিলেন? আপনার জন্যে মিলনের পরিবার কষ্ট সয়েছে মানে?

মিলন । এই ভদ্রলোক যত চেঁচান ততো কিন্তু বুদ্ধি নেই। মিলন সরকার কার জন্যে লড়াই করছিল? নিজের জন্যে?

জনার্দন। না, নিশ্চয়ই না। লড়ছিল জনার্দন, কপিল, ইউসুফ— সকলের জন্য।

মিলন । অতএব সে লড়াইয়ের ফলে যদি মিলন সরকারের পরিবার অনাহারে দিন কাটায়, তবে সে অনাহার জনার্দনবাবুদের জন্যেই?

জনার্দন। হ্যাঁ।

মিলন । সুতরাং জিনিষটা মিউচুয়াল? মিলন সরকার আপনার পরিবারের

কাছে যতটা ঋণী, আপনিও মিলন সরকারের পরিবারের কাছে ততটাই ঋণী ?

জনার্দন। হাঁ।

মিলন। নো মোর কোয়েশ্চন্‌স্।

জনার্দন। কপিলবাবু, আর কিছু বলবেন ?

কপিল হাঁ, বলবো। বলবো বই কি। শালা হাড়ি কাটাবো। জনার্দনবাবু, মিলন সরকারের পরিবারের কাছে আপনার যে ঋণ, সে ঋণ শোধ করবেন না ?

জনার্দন। ঋণ শোধ ক'রে দিয়েছি।

কপিল। কী ক'রে করলেন ? এ তো প্রায় মায়ের ঋণ। এ কি শোধ করা যায় ?

জনার্দন। করেছি। গুলি খেয়ে করেছি।

কপিল। আপনি গুলি খান, গাঁজা খান, তাতে ওদের কী লাভটা হোলো কচুপোড়া ?

জনার্দন। আমাদের লড়াই যে মহান সমাজের জন্য, সে সমাজ মিলনের জন্য, মিলনের পরিবারের জন্য। সে লড়াই থেকে এক মুহূর্ত চলি নি। এবং অবশেষে সেই লড়াইতেই প্রাণ বিসর্জন দিয়ে মিলন সরকারের পরিবারের ঋণ শোধ করেছি। প্রাণের চেয়ে বেশি আর কী দেব ? কিন্তু আপনার পরিবার যে ওর জন্যে প্যাদানি খেয়ে কৃষ্ণাবন দেখলো সে ঋণ ও শোধ করেছে ?

জনার্দন। তার লক্ষণ দেখছি না।

মিলন। প্যাদানি খেয়েছে আমার জন্যে নয়, পার্টির জন্যে।

কপিল। একই কথা। আমরা যে জলতে মানুষ হয়েছিলাম সেখানে তুমি, ও, আমি, পার্টি, পরিবার-মাগ, সব একাকার।
কাউকে আলাদা ক'রে কখনো দেখেছিলেন ?

জনার্দন। না।

কপিল। এইবার গভর্ণর তুলুন। পথের সাক্ষী, ইউদুস মহম্মদ।

মিলন। এক মিনিট, আমার একটা প্রশ্ন আছে।

কপিল। এ কী। আমার রি-এগ্‌জামিনেশন-এর পর আমার প্রশ্ন তুলছো কেন ?

জনার্দন। না, চলবে। করো প্রশ্ন।

মিলন কমরেড জনার্দন মল্লিক, আপনি মিলন সরকারের কাছ থেকে কিছু পান নি ?

জনার্দন। পেয়েছি।

কপিল। কত টাকা ?

জনার্দন। আঃ, টাকা নয়। জ্ঞান। প্রেরণা। পার্টির প্রতি কর্তব্য।

মিলন। মিলন সরকারের কাছেই কি আপনি লড়াইয়ের কায়দা শেখেন নি ?

জনার্দন। শিখেছি।

মিলন। আপনি শহীদ হয়েছেন। তাতে জনতা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। শহীদ হওয়ার দৃঢ়তা কোত্থেকে পেয়েছিলেন ?

অস্বীকার করবো না, পার্টিকে ভালবাসতে শিখেছিলাম প্রধানতঃ কমরেড মিলন সরকারের কাছে।

কপিল। এটা অত্যন্ত উঁচুকো কথা হোলো। পার্টির কাছে শিখেছিলেন।

জনার্দন। ঐ একই হোলো। মিলন সরকার আর পার্টি একাত্ম হয়েছিল।

মিলন। হ্যাঁ, সব একাকার, নিজেই বলেছেন একুণি। তাহলে মিলন সরকার আপনাকে দামী জিনিষই দিয়েছিল ?

জনার্দন। আমার জীবনের সবচেয়ে যা দামী তাই দিয়েছিল।

মিলন তবে আমিও মোদ্দয় আপনার পরিবারের ঋণ শোধ করেছি, কি বলেন ?

জনার্দন। হ্যাঁ, করেছ।

মিলন। বর্তমানে আমি যাই হই না কেন, যা দিয়ে গেছি তা বড় কম নয় ?

জনার্দন। না, কম তো নয়ই, বরং বেশই।

মিলন আপনাকে আমি কী দিয়েছি ? বেশ ছেঁকে বলুন।

জনার্দন। আমার জীবনের উদ্দেশ্য, গতি, লক্ষ্য, অর্থ।

মিলন। নো মোর কোয়েশ্চন্‌স্।

কপিল। এমন শালার হটাইল সাক্ষী জীবনে দেখি নি ! এখন জানলে কোন বাকৎ প্রশ্ন করতো ? স্বয়ের সাক্ষী— ইউসুফ মহম্মদ !

[শপথ প'ড়ে ইউসুফ প্রস্তুত হয় কাল্পনিক কাঠগড়ায়]

ছোটো ক'রে বোলো, যাদু, ওঁর মতন বেড়িও না। আপনি ঐ ব্যাটাকে কদ্দিন চেনেন ?

ইউসুফ। সে অনেক দিন।

অনেক বুঝি ? তা, কী সূত্রে আলাপ ?

ইনি আমাদের পার্টির কাজ করতে দেন। ইনিই আমাদের পরপর শেখান যে, ওরে ইউসুফ, নিজের মধ্যে বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই, দলের সঙ্গে এক হ'।

কপিল। আর কী শেখাতো শালা ?

ইউসুফ। ওরে শালা বোলো নি, মনে নাগে।

কপিল। ও বাবা। এও যে আবার ন্যাক মারে ! কী শেখাতো বলুন।

ইউসুফ। শিখলে হ্যালো, "ওরে ইউসুফ, জীবনের চেয়ে বড় হোলো আদর্শ" !

কপিল। আর কী ?

ইউসুফ। "প্রাণ গেলেও কোনোদিন পার্টির অবমাননা হইতে দিবে না।"

কপিল। আর কিছু ?

ইউসুফ। কত বলবো ? উনি হ্যালেন নিজেই এক মূর্তিমান শিক্ষা ! ওঁরে দেখলেই শিখতাম। নিজে ক'রে শেখাতেন।

কপিল। তারপর ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২, আপনি গুলি খেলেন ?

ইউসুফ। হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যবশতঃ।

কপিল। মরার সময়ে কী মনে হোলো ?

ইউসুফ। মনে হোলো, আরটু বাঁচলে ভাল হোতো।

কপিল। আর কী ? সবটা খুলে বলুন না।

ইউসুফ। আপনেই তো বললে "ওরে ইউসুফ, ছোটো করে বোলো"।

জনার্দন। করেই।

কপিল। এ যাবৎ সাক্ষীও মেরেছে, আমি ঠিক আনি। আর কী হয়েছিল ?

ইউসুফ। মনে হোলো, এ দেশের জলতে আমি আর থাকবো নি।

কপিল। চালাও, চালাও—

ইউসুফ। মনে হোলো, মিলনদা যে বলে হ্যালেন, জীবনের চেয়ে আদর্শ বড় সেইতে পরমাণ হোলো। আরো মনে হোলো, আমি মরেছি, মিলনদা তো মরে নি— ভালোই হোলো।

এতক্ষণে শালা গুমরালেন। কেন, মিলনদা মরে নি বলে ভালই হোলো কেন ?

ইউসুফ। আমি কোন কীটস কীট ? মিলনদারেই পার্টির বেশি দরকার।

কপিল । যা বলেছেন যাইরি। উঃ, শালা, আধৎ কথায় আসতে কালঘাম ছুটে গেল। আপনি ভেবেছিলেন, বিমলদা বাঁচলে পার্টির কাজ আরো ভাল চলবে?

ইউসুস । নিশ্চয়।

কপিল । চলেছে কি?

ইউসুস । বিমলদা……বিমলদা পার্টি ছেড়ে যাবেন।

কপিল । হুঁ। ! শুধু ছেড়ে যাবেন না, পার্টির আদর্শের বারোটা বাজিয়ে যাবেন। উনি ঘাংগা লাগাচ্ছেন। উনি কি আপনার আশা পূরণ করেছেন?

ইউসুস । কই, না।

কপিল । জীবনের চেয়ে আদর্শ বড়, এ শিক্ষা কি উনি নিজে পালন করছেন?

ইউসুস । কই না।

কপিল । অর্থাৎ আপনাকে বড় বড় বাকতাল্লা মেরে গুলি খাইয়ে নিজে কেলেকুত্তার মতন সটকান মেরেছেন?

ইউসুস । হ্যাঁ।

কপিল । আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই।

জনার্দন । বিমল সহকার কত।

বিমল । ইউসুস, আমার দিকে তাকাও।

কপিল । অবজেকশন, য়াই লর্ড। শালা মনস্তাত্ত্বিক পাঁচে মারছে।

জনার্দন । চোপ। বলো, বিমল সহকার।

বিমল । ইউসুস তাকাও আমার দিকে। হ্যাঁ, এবার বলো, গুলি যে খেয়েছিলে সে কি আমার বাকতাল্লায় ভুলে?

ইউসুস । না, না, বাকতাল্লা জেনে? আমি…আমি ঐ লাল খাতাটা আঁকতে ঘরে ঢুকলাম…ঐ খাতা কেমন ক'রে যেন হাতের চেটোয় মধ্য যে সাদা গায়ে যেন বিদ্যুৎ খেলছে ভালো…মনে হোলো, গুলি করুক না, এ খাতা ছাড়বো নে।

বিমল । পুলিশ যখন বন্দুক তুললো, তুমি কি জানতে গুলি চালাবে?

ইউসুস । হ্যাঁ…হ্যাঁ……পষ্ট মনে পড়ছে……আমি জানতে পেরে সেলাম গুলি চালাবে।

বিমল । ভয় করেছিল?

ইউসুস । ...না...হাতে আওয়া ভালো যে...

মিলন । তাহলে ঐ আওয়ার জন্যে তুমি পালাবার সুযোগ ইচ্ছায় ত্যাগ করলে ?

ইউসুস । হ্যাঁ ।

মিলন । আওয়ার জন্যেই ইাকিয়ে গুলি খেলে ?

ইউসুস । হ্যাঁ ।

মিলন । সে আওয়ার সন্ধান তোমাকে কে শিখিয়েছিল, ইউসুস ?

ইউসুস । আপনি, মিলনদা ।

মিলন । তাহলে তোমার মতন এক নির্ভীক পার্টি-কমরেডকে সৃষ্টি করেছি আমি ?

ইউসুস । নিশ্চয় ।

মিলন । তাহলে বলো, আমি কি পার্টির ক্ষতি করেছিলাম ?

ইউসুস । না ।

মিলন । তোমার মৃত্যুর জন্য তুমি কি অনুতপ্ত ?

ইউসুস । না, কখনো না । ঐ মৃত্যু ...ঐতেই আমার গৌরব ।

মিলন তাহলে তোমার ক্ষুদ্র জীবনের যা কিছু গৌরব, আমিই তার সুযোগ সৃষ্টি করেছিলাম ?

ইউসুস । হ্যাঁ ।

মিলন । বর্তমানে আমি যাই হই না কেন, তোমায় আমি এমন কিছু দিয়েছিলাম যা জীবনের চেয়ে প্রিয়, অর্থাৎ আদর্শ ?

ইউসুস । হ্যাঁ

মিলন । আজ আমি বরবাইশ হয়ে গেলেও তোমার মধ্যে বেঁচে থাকবে বিপ্লবী মিলন সরকার ?

ইউসুস । হ্যাঁ ।

কপিল । এক মিনিট । তার মধ্যে বিপ্লবী মিলন সরকার বেঁচে থাকে কি ক'রে ? ও নিজেই আর বেঁচে নেই ।

মিলন । তার মতন আরো অন্তত পঞ্চাশজন ছেলেকে পার্টিতে এনেছি আমি । তারা বেঁচে আছে, পার্টির শক্তিকে গড়ে তুলছে । তাদের মধ্যে বেঁচে আছে মিলন সরকার । কতকগুলো মড়া এনে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়াচ্ছেন কেন ? আপনারা মৃত, গলিত, স্পন্দনহীন ।

সবর আপনাদের কাছে স্তব্ধ, চলচ্ছক্তিরহিত। আপনাদের প্রাণহীন বিশ্লেষণে জীবন্ত মানুষের জীবন্ত ইতিহাস ধরা পড়বে না। ১৯৫২ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের বিকাল পাঁচটা সাতেরো মিনিটে আপনাদের চেতনার মৃত্যু ঘটে গেছে।

মৃত্যুকে অমন সরল ক'রে তুলবেন না। মার্কস্‌বাদে বলে, মৃত্যু হচ্ছে জৈবিক ধারার একটা ধাপ মাত্র।

বিমল — তবে আপনি মার্কস্‌বাদ বোঝেন নি। মার্কস্‌বাদ বলে, মৃত্যু হচ্ছে জৈবিক ধারার শেষ। আপনারা শেষ। আপনারা অস্তিত্বহীন। আজকে মানুষের বিচার করতে বসলে আপনারা কিছুই করতে পারবেন না, শুধু ভূত হয়ে তার ঘাড়ে চেপে থাকতে পারেন। এমন কি শুনেছি বাঁকড়া অশ্বত্থ গাছের তলায় গেলে তার ঘাড় মটকাতেও পারেন। তার বেশি কিছু নয়।

জনার্দন। — অর্থাৎ আমরা মৃতরা আপনার ঘাড়ে বোঝা হয়ে আছি?

বিমল। — হ্যাঁ।

জনার্দন। — অর্থাৎ যথেচ্ছাচার করার সময়ে আমাদের চাপে আপনার ঘাড় টন টন করে? নিশ্চিন্তে বদমাইশি করতে পারেন না?

বিমল — কতকটা তাই। আপনারা মড়ারা বড় গোঁড়াপন্থী, ডগমাটিষ্ট। জীবন্ত মানুষ নড়ে চড়ে বেড়াতে চায়, এক-আধ জায়গায় আপোষ করতে চায়। আপনাদের আলায় তা হবার নয়।

কপিল। — অর্থাৎ আপোষ করতে করতে সমস্ত নীতি শোষন ক'রে নেয়ার ইচ্ছে হয় এই শূয়োরের বাচ্চার, আমাদের ভস্মে যাবে। এই তো?

বিমল। — কতকটা তাই। আপনারা এক ধরনের নিষ্ফল বিবেক।

কপিল। — কই, তোমার তো কিছুই যাবে না। ধর্মাবতার, আমি খোদ আসামীকেই প্রশ্ন করতে চাই।

বিমল। — নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে আমি বাধ্য নই।

কপিল। — দুই চড় বাঁকলেই আপনে বাধ্য হবে।

জনার্দন। — হ্যাঁ, জবাব দিতে হবে। বলুন, কপিলবাবু।

কপিল। — যারা মরেছে তাদের প্রতি তোমার কোনো দায়িত্ব নেই বলছো। তারা ঘাড় থেকে নামলেই তুমি খুসী হও। ঠিক আছে। শালা

আজ ইতিহাস নিয়েই প্রশ্ন করা যাক। কাগজের অফিসে চাকরী নিলে কেন? পার্টি ছাড়লে কেন?

বিমল। আগেই বলেছি, স্পেটের ব্যাপারে। পরিবারের কারায় অস্থির হয়ে।

কপিল। সেটা কোনো কারণ নয়। ইউসুফকে তুমি কী বলেছিলে? জীবনের চেয়ে আদর্শ বড়ো।

বিমল আবার বড়ো হাঁটছেন।

কপিল। কিন্তু কথাটা সত্যি বলে মানিস কি না? তখন বলেছিলি মানতিস?

বিমল। হ্যাঁ।

কপিল। এখন আর মানিস না?

বিমল না। কারণ সত্যও আপেক্ষিক।

কপিল। এঁ্যা?

বিমল হ্যাঁ। আজ যা সত্য কাল তা মিথ্যে হয়ে দাঁড়াতে পারে। মার্কস্-বাদের শিক্ষাই এই। সব আইডিয়াই প্রথমে প্রগতিশীল শক্তি হিসেবে জন্ম নেয়; পরে সমাজের সম্পর্কগুলো পাল্টে গেলে সেই আইডিয়াই ক্রমতর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হয়ে ওঠে। যেমন পুঁজিবাদ। এ সমাজের সত্য পরবর্তী সমাজের মিথ্যা হয়ে উঠতে পারে।

জনার্দন। মানে? তখন জীবনের চেয়ে আদর্শ বড় ছিল; এখন আদর্শের চেয়ে জীবন বড়?

বিমল। আমার কাছে।

জনার্দন। সমাজের কী পরিবর্তন ঘটেছে যে ও আইডিয়াটা এমন উল্টে গেল?

বিমল। আমার ক্ষুদ্র সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে।

জনার্দন। যথা?

বিমল। আমার বোনেরা বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে।

[কিছুক্ষণ বিরক্ত ক্রোধে কপিলের বাক্যস্ফূর্তি হয় না]

কপিল। তোর সমাজ আমার কী যে থাকত? তোর সমাজ আমাদের সমাজ চেয়ে আলাদা?

বিমল হ্যাঁ এবং না।

কপিল। সে কি?

বিমল। দুটোই। একদিক থেকে আপনাদের ও আমার সমাজ এক, তাই আমি

মনে প্রাণে এখনো বিপ্লবী। আর এক বিচারে আমার সমাজে একান্তভাবেই আমার, নিজ-পরিবারের চিন্তায় সে সমাজ ভয়পুর, তাই কাজেকর্মে প্রতিবিপ্লবী।

জনার্দন। অর্থাৎ তুমি একই সংগে বিপ্লবী এবং প্রতিবিপ্লবী?

মিলন। হ্যাঁ, প্রত্যেক মানুষই তাই। সেটাই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল কথা। স্তালিন মহাবিপ্লবী; সামান্য হেরফেরে সেই স্তালিনই মহা-অত্যাচারী।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এমন বিচিত্র ব্যাখ্যা আর শুনেছি বলে মনে পড়ে না। মিলন সরকার, মার্কস্‌বাদের সোড়ার কথাটা কী?

মিলন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ।

জনার্দন। ভুল।

মিলন। শ্রেণী-সংগ্রাম।

কপিল। মিলন সরকার, ইচ্ছে ক'রে ভুল বলছো। তোমার যা পড়াশোনা তাতে পাই দেখা যাচ্ছে তুমি কারণ ক'রে ভুল বলছো। এক থাপ্পড় মারবো। সত্যি কথা বলো, মার্কস্‌বাদ-এর মূল কথাটা কী?

মিলন। বিপ্লব।

জনার্দন। কার জন্যে বিপ্লব? কার জন্যে শ্রেণী-সংগ্রাম? কার জন্যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ? তুমি বিষম ঠ্যাঁদরামি করছো, মিলন সরকার।

কপিল। মার্কস্‌বাদের সোড়ার কথা হোলো— মানুষ। মার্কস্‌বাদ তোমার রক্তশূন্য কচকচি নয়। মানুষকে বাদ দিয়ে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোচনা করলে যা খুশী তাই প্রমাণ করা যায়।

জনার্দন। হ্যাঁ। এ-ও প্রমাণ করা যায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদও মিথ্যা। মার্কস্‌বাদও মিথ্যা।

মিলন। অসম্ভব।

জনার্দন। মার্কস্‌বাদই বলে, সব আইডিয়া চলমান, পরিবর্তনশীল। আজ যা প্রগতিশীল, কাল তা প্রতিক্রিয়াশীল। আজ যা সত্য, কাল তা মিথ্যা। আজকের সত্যের মধ্যেই কালকের মিথ্যাও লুকিয়ে আছে। এবার বলো, মিলন সরকার, মার্কস্‌বাদও এই রকম আইডিয়া হবে না কেন? মার্কস্‌বাদ প্রয়োগ ক'রেই মার্কস্‌বাদকে ভবিষ্যৎ মিথ্যা বলে দেয়া যাবে না কেন?

[মিলন সরকার হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

যাই হোক, শালার পুঁথিপত্র নিয়ে, জবাব দিতে পারবে না।

না, পারি। মার্কস্‌বাদকে মার্কস্‌বাদের বিচারে মিথ্যা প্রমাণ করা এঁকে তর্কের পর্যায়ে পড়ে। দর্শন বলে, ধরা যাক "N" নামক এক তত্ত্ব আর সকল তত্ত্বকে খণ্ডন করলো; তখন আমাদের ধরে নিতে হবে যে N তত্ত্বের যেটা প্রতিপাদ্য সেটা N তত্ত্বের ওপর প্রযোজ্য নয়। মার্কস্‌বাদ নিজেই চলমান জগৎকে স্বীকার করেছে, অতএব সে নিজে এই চলমান জগতের ঊর্ধ্বে।

বাঃ, ভারী ভাল বলেছ তো, মিলন সরকার! অতএব একেবারে যদি গাড়ল না হও তবে এ-ও স্বীকার করবে যে সত্য বলে কিছু আছে, যা চলমান পরিবর্তনশীল জগতের ঊর্ধ্বে, আদর্শ বলে কিছু আছে যা তোমার সুবিধাবাদী বিকৃতির চেয়ে ঊর্ধ্বে। সত্যও আপেক্ষিক, এ কথাটা মার্কস্‌বাদী হলেও, এর সীমা আছে। একে বেশি বিস্তৃত করলে একে তর্ক হয়, কারণ মার্কস্‌বাদও তবে শুধু আপেক্ষিক সত্য হয়ে পড়ে। N তত্ত্বের প্রতিপাদ্য N-এর ওপরই প্রয়োগ করা হয়।

মিলন [মহা বিপদে পড়ে গিয়ে] হাঁ...তা কতকটা ঠিক...

কপিল। কান্না খুলেছে! বাবুর কান্না খুলেছে।

মিলন আমার মার্কস্‌বাদের মূলসূত্রগুলিকে ঈশ্বরের আসনে বসাতেও আমি রাজী নই। মার্কস্‌বাদ ভগবান নয়, কাজের নিশানা।

তা হলে যে কোনো কাজ নয়। যা খুশী লাম্পটা করবো আর বলবো মার্কস্‌বাদ থেকেই লাম্পটোর নিশানা পেয়েছি, তা তো চলতে পারে না, মিলন সরকার! পারে? বলো!

না, তা কেন?

তবে? মার্কস্‌বাদের যা মূল কথা তাকে বিস্তৃত হয়ে অবশ্যকে বজায় প্রয়োগ করবে কোথায়? তোমার মাথায়? মার্কস্‌বাদের কী সেই ভিত্তি যার ওপর দাঁড়িয়ে বুঝতে পারবো সব সূত্র ঠিক ঠিক প্রয়োগ করেছি কি না?

মিলন প্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ।

জনার্দন। তোমার বুদ্ধি বড় খাটো। বিপ্লবের পর শ্রেণীই থাকবে না। তখন কোথায় দাঁড়াবো?

মিলন । ···ইয়ে···মানুষ।

কপিল । এতক্ষণে বেরুলো। শালার বদমাইশি দেখলে ইচ্ছে করে কান ধ'রে একবার বৃন্দাবন দেখিয়ে আনি। সব ইচ্ছে ক'রে করছে, যাই লর্ড।

আপনারা মার্কস্‌বাদকে বিকৃত করছেন। তার সমস্ত সংগ্রামী সার বাদ দিয়ে তাকে নিছক বুর্জোয়া মানবতাবাদে পরিবর্তন করছেন।

উইটনেস, তুমি অত্যন্ত বদমাইশ হয়ে গেছ। তুমি বুর্জোয়াদের দল পাঁচ আরম্ভ ক'রে দেলেছ ! কে বলেছে সংগ্রামী সার ত্যাগ করার কথা? কে বলেছে শ্রেণী সংগ্রাম বাদ দিয়ে নিছক ছেলেভুলানো মানবতাবাদের কথা? সংগ্রামকে বাদ দেয়া দূরে থাক, মার্কস্‌বাদ বলে, শুধু সংগ্রামী মানুষই মানবতাবাদী। মার্কস্‌বাদ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদ। শ্রেণী-সংগ্রাম বাদ দিয়ে যে মানবতাবাদ তা হোলো বুর্জোয়াদের ধাপ্পাবাজী। শ্রেণী-সংগ্রামের শহীদ জনার্দন মল্লিককে সেই বুর্জোয়া ধাপ্পাবাজীর দায়ে অভিযুক্ত করছো, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়, মিলন সরকার?

যাই লর্ড, আর বলেন কেন বাক্যটার কথা? যে কাগজে কাজ করে সেই কাগজের চশমখোর মালিকের কাছ থেকে এইসব শিক্ষা পেয়েছে। শোন্ শালা সংগ্রাম-বিপ্লব-মার্কসবাদ কোনোটাকেই বাদ দেয়ার কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, এইসব কিসের জন্যে? এদের ভিত্তি কী? ভিত্তি হোলো মানুষ। তাই মার্কস্‌বাদ মানবতাবাদী। আর যেহেতু মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তির একমাত্র পথ হোলো সংগ্রাম, সেহেতু মার্কস্‌বাদ সেই সংগ্রামের পথ বেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদ হয়েছে।

জনার্দন । এটা বুঝতে তো খুব বেশি বুদ্ধি লাগে না, মিলন সরকার? নাকি, লড়াই ছেড়ে দিয়ে শুধু বই পড়ে পড়ে মাথা গুলিয়েছ?

কপিল এটা ঠিকই যে মার্কস্‌বাদ বুঝতে হলে লড়াইয়ে নামতে হয়। কিন্তু, যাই লর্ড, আপনার কি ধারণা এ শালার মাথা গুলিয়েছে বলে এ সব বলছে? এ জ্ঞানপাপী, রেনেগেড, দালাল, হারামির বাচ্চা।

[মিলন অট্টহাস্য ক'রে ওঠে]

জনার্দন । অভার, অভার ইন দা কোর্ট!

যাই লর্ড, কয়েকটা মড়ার মুখে মানবতাবাদের কথা শুনে হাসি পেয়েছে, দাঁড়ান একটু হেসে নিই।

[এই বলে সে এক ঢোক মদ খায়

মড়াদের তোমার বিষম ভয়, না?

যে জন্যে স্তালিনের মড়াকে ওরা পায় একদল সুবিধাবাদী। আমরা মড়ারা মরেও এদের কাছে দুঃস্বপ্ন। ঠিক আছে, যাই লর্ড, মড়াদের সঙ্গে মানবতাবাদ আলোচনা এ করতে চাইছে না. কারণ মড়ারাই মানবতাবাদের মর্ম সবচেয়ে গভীরভাবে বুঝেছে। ঠিক আছে। আন্তো ইভিয়াস নিজেই আমি এই হাঙ্গামিটাকে প্রশ্ন করবো। মিলন সরকার, তুমি কাগজের মালিকের হুকুমে নরমুণ্ডের গল্প লিখে এলে কেন?

মিলন। নিজেই তো জবাব দিলেন — মালিকের হুকুমে।

কপিল। মালিক যা বলবে তাই করবে তুমি?

মিলন। নইলে চাকরী যাবে, আমার বোনেদের বিয়ে হবে না।

কপিল। মালিক যদি বলে নিজের মার গলায় ছুরি মেরে এস তুমি তাই করবে?

মিলন। না, তা করবো না।

কপিল। কেন করবে না?

মিলন। জৈবিক আত্মরক্ষার তাগিদে। ওটা প্রত্যক্ষভাবে আমাকে আঘাত করবে।

আর তোমার নরমুণ্ডের গল্পের ফলে যে সর্বনাশ হবে, বহু মায়ের গলায় ছুরি বসবে, সেটা তোমাকে আঘাত করবে না?

মিলন। না, করবে না, কারণ নরমুণ্ডের গল্পের দায়ীত্ব আমার নয়। হাতের লেখাটা আমার, কিন্তু তার পরিকল্পনা, রচনা এবং দায়ীত্ব মালিকের। দেখুন, চিনাদুভি হত্যাকাণ্ডে মালিক বহু শ্রমিকের প্রাণ নিয়েছে। তাই বলে সেই কোম্পানির যে কেরানী লাভ-লোকসানের হিসেব কষছিল সে কি দায়ী? প্রতিটি কারখানার রোজ সহস্র শ্রমিকের জীবন নাশ হচ্ছে তিল তিল ক'রে; তাহলে বলে দিন এইসব কোম্পানিতে কোনো মানবতাবাদী মানুষ কাজ করতে পারবে না। যেহেতু এই পুরো বুর্জোয়া রাষ্ট্র ও সমাজ এক বিশাল মৃত্যু-কারখানা,

যেহেতু বলে দিন যে কোনো মানবদরদীর কোথাও চাকরী করা চলবে না।

কপিল। মানবদরদীদের চাকরী করতে বাধা নেই, কিন্তু প্রত্যক্ষ বদমাইসি দেখলে তাদের প্রতিবাদ করতে হবেই। নইলে তারা আর মানবদরদী থাকে না।

মিলন চাকরী করতে দিচ্ছেন, অথচ সে চাকরী রাখতে দিচ্ছেন না। প্রতিবাদ করলেই যে চাকরীটি যাবে। এমন বিচিত্র ব্যবস্থা টিঁকবে?

কপিল। [গর্জন ক'রে] যাক চাকরী!

মিলন। বলা সহজ।

জনার্দন। মিলন সরকার, একটু আগে আমরা প্রমাণ করেছি আদর্শ বলে একটা কিছু আছে। সে আদর্শটা কী?

মিলন। আমার ক্ষুদ্র জগতে সে আদর্শ হোলো— আমার পরিবারের নিরাপত্তা।

জনার্দন। তোমার ক্ষুদ্র জগৎ তোমার মনগড়া কল্পনা। বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সে একাত্ম।

মিলন। অর্থহীন কথাবার্তা। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা প্রতিদিন হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে তাহলে প্রতিদিন অন্তত কয়েক সহস্র লোকের কাজ ছেড়ে দিয়ে প্রতিবাদ করা উচিত।

কপিল। ঠিক তাই। প্রতিদিন তাই হওয়া উচিত। প্রতিদিন ইস্তফার বান ডাকা উচিত। যে জন্যে আমরা জীবন থেকে ইস্তফা দিতে পারলাম, সেজন্যে চাকরী থেকে ইস্তফা দিতে পারবে না?

মিলন। আমার সেই শব-ব্যবচ্ছেদ হচ্ছে। আপনারা মরেছেন, আপনারা মহান শহীদ, আপনাদের আমরা শ্রদ্ধা করি—

কপিল। এমন কি শহীদ-বেদীতে বছরে একবার ফুলও দিয়ে থাকি, কিন্তু যে জন্যে আপনারা মরেছেন সেই আদর্শটাকে প্রতিদিন বর্ষণ ক'রে থাকি। মালিকের জুতো চেটে থাকি।

মিলন। এসব ছন্নছাড়া বিশৃঙ্খলা, খোকামি-রোগ। বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত নেই, অথচ প্রত্যেককে এক্ষুণি সব বাঁধন কেটে ময়দানে নেমে পড়তে হবে। আশ্চর্য।

জনার্দন। বিপ্লবের ক্ষেত্র আকাশ থেকে পড়ে না। নিজেরা বাস্তিকের হুজুগে

বিপ্লবের সম্ভাবনাকে নির্মূল করবে, তারপরে বিপ্লব হচ্ছে না বলে সেই বালিকের পা চাটবে ? বিপ্লব হয় না বলে পা চাটো ? না, পা চাটো বলেই বিপ্লব হয় না ?

আপনারা ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ে পড়েছেন। সমষ্টি যদি না এগোয়, ব্যক্তি কি ক'রে এগুবে ?

বহু ব্যক্তি মিলেই সমষ্টি। সমষ্টির অগ্রগতি হবেই। ব্যক্তি হিসেবে তুমি তোমার স্বাধীনতা পালন করছো কি ? এটাই প্রশ্ন। এটাকে এড়িও না।

মিলন হ্যাঁ, করছি। যতদূর সম্ভব করছি।

জনার্দন। কতদূর সম্ভব ?

মিলন নিজের নিরাপত্তা, পরিবারের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে যতটা সম্ভব। বর্তমানে তার বেশি নয়। তারপর সংগ্রাম শুরু হলে দেখা যাবে মিলন সরকার কাজের চেয়ে কম যায় কি না।

আমরা যখন মরলাম, তখন তো এসব ভাবি নি। যাক্‌গে, আমরা তো জীবনদানটাকেও সম্ভব ভেবেছিলাম !

মিলন। আমায় ডাকা হয়েছে ?

কপিল। বেশ, তাহলে আর এক সাক্ষী ডাকি। সুপ্রিয়া বাগল !

মিলন এ কি ! ওকে এখানে ডাকছেন ? আপনারা অত্যন্ত……কি বলে…অভদ্র !

কপিল। কেন, আমরা তোর ভাবী বউকে দেখলে তোর ভাগে কম পড়বে ? শালা ভেতরে-ভেতরে কিউবাল !

জনার্দন। ডাকো, সাক্ষী সুপ্রিয়া বাগল !

ইউহুস। সাক্ষী সুপ্রিয়া বাগল হাজির !

[সুপ্রিয়া খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে সাক্ষীর স্থানে দাঁড়ায়। মিলন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে]

কপিল। বলুন, নিজের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে প্রত্যক্ষ জানিয়া বলিতেছি যে বিপ্লবের অন্তরায় হয় এমন কোনো কথা বলিব না।

সুপ্রিয়া। এ শপথে আমার আপত্তি আছে। আমি অত্যন্ত সাধারণ মানুষ, আমার কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই।

কপিল। এই খেয়েছে !

জনার্দন। আপনাকে শপথ নিতে হবে না। এখনি যান।

কপিল। ঐ হতভাগাকে আপনি চেনেন?

সুপ্রিয়া। ঐ ভদ্রলোককে আমি চিনি।

কপিল কদ্দিন ধ'রে ঐ শালা আপনাকে দেখেছে?

মিলন। আমি প্রতিবাদ করি। তীব্র প্রতিবাদ করি।

জনার্দন। চোপ। কপিলবাবু, ভদ্রমহিলাকে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন না। কেমন তাঁরা আপনার আদালতে নেই। ইউসুস মহম্মদ, আপনি প্রশ্ন করুন।

কপিল। যাঃ শালা, ভোবালে মাইরি!

ইউসুস। আচ্ছা মিসি, এরে আপনি কতদিন চেন?

সুপ্রিয়া। এক বছর।

ইউসুস। আপনাদের মধ্যে ভালবাসা হয়েছেল?

সুপ্রিয়া। হ্যাঁ।

ইউসুস। এই এক বছরের মধ্যে বিয়ে হলো নি কেনে?

সুপ্রিয়া। ওঁর টাকাপয়সার বিষম অভাব ছিল। জমিয়ে জমিয়ে এখন উনি কিছু টাকা করেছেন।

ইউসুস। এইবার শাদি হবে?

সুপ্রিয়া। হ্যাঁ।

ইউসুস। কবে?

সুপ্রিয়া। আসামি মাসের ৮ই তারিখে।

ইউসুস। সব ঠিক ঠাক?

সুপ্রিয়া। হ্যাঁ।

ইউসুস। কিন্তু, মিসি, বলতে বুক ফেটে যায়, সে শাদি হবে নে।

মিলন। [গর্জন ক'রে] এই শালা। কে বলে শাদি হবে না? তুই আমাকে এখন ছোটলোক ভাবিস? বিয়ে হবে না মানে? আলবাৎ হবে, শালা।

কপিল। যাক; এতক্ষণে মাননীয় মানুষের মতন কথা বলেছে।

মিলন। [আত্মসম্বরণ করে] ধর্মাবতার, এই সব ব্যক্তিগত প্রশ্নের উদ্দেশ্য কী? আমাকে অপমান করা কেন? আসলে আপনারা মনেপ্রাণে প্রতিক্রিয়াশীল। তাই, যেহেতু সুপ্রিয়ার ব্যক্তিগত জীবন

ঠিক স্বাভাবিক নয়, তাই তাকে এখন তার প্রতি যেমন আচরণ করছেন।

কপিল। শুভ্রোরের বাচ্চার মাথা খারাপ!

জনার্দন। বিলম্ব দরকার, ওঁর ব্যক্তিগত জীবন কি রকম সে সম্বন্ধে আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। বরং ওঁকেই তোমার বর্তমান জীবনের একমাত্র ভালো অধ্যায় বলে মনে করি।

তুই নিজেই তো ওঁকে বেশ্যা বললি। শালা নর্দমায় নামলি? বেশ্যা মানে? বেশ্যা আবার কী? শুনুন, দিদি, আমরা শালা আপনার কোনো অপমান করেছি সে দায়?

সুপ্রিয়া। না, নিশ্চয়ই না।

বিলম্ব। এ কী বলছো, সুপ্রিয়া? বলছে, আমাদের বিয়ে হবে না। অপমান নয়? ধর্মাবতার, আমি এই নারীকে ভালবাসি। তার মানে বোঝেন? প্রেম যে একটা মানুষকে মহীয়ান ক'রে তুলতে পারে তা বোঝেন?

জনার্দন। মার্কস্‌বাদী প্রেম থোড়ে না? তুমি অজ্ঞান বেরাদর। নিশ্চয়ই বুঝি। আর এ-ও বুঝি, তোমার বর্তমান পাংকিল জীবনে এই একটি ক্ষেত্রে তুমি সৎ। এ-ও জানি, এই প্রেম তোমাকে মহীয়ান ক'রে তুলতে পারে। এখনো তোলে নি, তবে তুলতে পারে। এই মহিলাই হয়তো পারেন আবার তোমাকে মানব-সন্তান ক'রে তুলতে। সুপ্রিয়া বাগল, আপনি কি আসামীকে ভালবাসেন?

সুপ্রিয়া। হ্যাঁ।

জনার্দন। একে বিয়ে করবেন?

সুপ্রিয়া। হ্যাঁ, ৮ তারিখে বিয়ে হবে স্থির হয়ে আছে।

ইউসুফ। কিন্তুক সে যে হবে সে।

বিলম্ব। আমার— আমার আমাকে অপমান করা হলো। ধর্মাবতার, বিশ্বাস করুন, আমি একে ঠকাবো না। আমি সত্য কথা বলছি।

কপিল। সত্যও আপেক্ষিক।

বিলম্ব। এঁ্যা? ধর্মাবতার, আমি একে ভালবাসি। আমার ক্ষুদ্র জগৎ আমার পরিবারকে ঘিরে নয়, সব বাজে কথা বলেছিলাম। আমার জগৎ এই নারীকে ঘিরে। একে ভালবেসে সব ভুলেছি।

জানাই। একে ভালবেসে সব ভুলেছি। ভালবাসাও আপেক্ষিক! ওকে হারাস করবেন না। দেখ, মিলন সরকার, যদিও তুমি আজকাল অতীত খুচরা, তবু তোমার একটা অত্যন্ত গৌরবজনক অতীত আছে। আমার মনে হয় এই মহিলাকে বিয়ে করলে তোমার ভালই হবে।

মিলন এবং বিয়ে করবো। ও মাসের ৮ তারিখে।

ইউসুস। কিন্তু সে বে হবে না।

মিলন আই প্রোটেস্ট।

জনার্দন। ইউসুস মহম্মদ, আমার মনে হয় মিলন অন্তত এই মেয়েটিকে ঠকাবে না। বিয়ে হবে না কেন?

ইউসুস। যে হবে না, বাস।

সুপ্রিয়া। কেন এ কথা বলছেন বার বার?

মিলন হ্যাঁ, কেন এই সন্দেহ?

কপিল। সন্দেহ নয়, আমরা একটা ভবিষ্যদ্বাণী করছি। একটা চরম সত্য কথা শুনতে চাচ্ছি।

মিলন কী সেটা?

কপিল। আগামী মাসের ৮ তারিখে বিয়ে হয় কি ক'রে? আগামি কাল রাত সাড়ে দশটায় ইনি যে মারা যাচ্ছেন।

[প্রচণ্ড বিস্ময়ে মিলন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে]

ইউসুস। দিদি, বুঝতে পেরেছেন? আপনার মরা উচিত নয় এখন। আপনের সামনে সুন্দর জীবন। তবু মরবেন।

সুপ্রিয়া। [কম্পিত স্বরে] কোথায় মরবো? কি ক'রে মরবো?

কপিল। একটা জটিল ব্যবস্থার ফলে মরবেন। চাঁদীগঞ্জে—

সুপ্রিয়া। [যেন মনে পড়ছে, যেন ভবিষ্যৎ হঠাৎ অতীত হয়ে গেছে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, আনোয়ার শা রোডে মৌলভী সাহেবের বাড়ি—

কপিল। গিয়ে দেখবেন মৌলভী সাহেবের বাড়ি থেকে টেনে বার করছে এক দল লোক—

সুপ্রিয়া। তাঁর কপাল থেকে কিলকি দিয়ে রক্ত ছুটছে—

কপিল। ছুটে গিয়ে বাবা বলে তাঁকে জড়িয়ে ধরবেন—

সুপ্রিয়া। তখন ..... পিঠে.....

কপিল। খোঁচা ····· তোমার···

সুপ্রিয়া। সেটা বুকের বাঁকখান অবধি এসে

জনার্দন। আমার মক্কা ঘাঁটিছি আমরা, মিলন সরকার।

ইউসুফ। তাই ও যে হবে নে।

[মিলন বসে পড়ছে]

কপিল। মৃত্যুও আপেক্ষিক!

জনার্দন। মিলন সরকার, নরমুণ্ডের কাহিনী লেখার সময়ে ভেবেছিলেন কি যে হারানো খতটা আদলে সুপ্রিয়া বাগচীর? সাক্ষী দেতে পারেন।

[সুপ্রিয়া উঠে উদাসীন মুখে ও-পাশে চলে যায়]

মিলন। আমার ·····আমার সাক্ষীর নেই ·····আমি কিছু জানি না!

ইউসুফ। ও যে হবে নে!

কপিল। বিয়েও আপেক্ষিক!

জনার্দন। তোমার ক্ষুদ্র জগৎটা কোথায় গেল, মিলন সরকার?

কপিল। জগৎ আপেক্ষিক!

জনার্দন। সব আপেক্ষিক, শুধু একটি জিনিষ ছাড়া — মানুষ।

কপিল। তুমিও যে মানুষ এটা যদি না বুঝলে থাকব, তবে এতদিন কী মার্কস্‌বাদ পড়লে?

[তিনজন সন্দেহে দরজার কাছে চলে যায়। সেখান থেকে জজ সাহেব হাত তোলেন]

জনার্দন। অর্ডার ইন দা কোর্ট। আসামী মিলন সরকার, দিস কোর্ট প্রোনাউন্সেস ইউ গিল্টি।

[তিনজনের নিঃশব্দ প্রস্থান। মিলন হাত এলিয়ে পড়ে দিল সোফায়। আলো যে আবার উজ্জ্বল হয়ে গেছে বুঝতে পারেনি। সুপ্রিয়া এসে দেশলাই দিল হাতে]

সুপ্রিয়া। কোথায় যে ফেলো দেশলাই?

মিলন। কী?

সুপ্রিয়া। দেশলাই চেয়েছিলে, এনে দিলাম।

মিলন। এতক্ষণ লাগলো দেশলাই আনতে?

সুপ্রিয়া। এতক্ষণ!! বললে আর আনলাম, এতক্ষণ মানে?

মিলন। [হঠাৎ বিভ্রান্ত] তাও তো বটে। মুহূর্ত আর শতাব্দী আদলে

একই, আপেক্ষিক বিচারে। এক মুহূর্তেই শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ভীড় করতে পারে মনে।

সুপ্রিয়া। লিখছো না কেন?

মিলন। তুমি মোছো না, কেমন?

[সুপ্রিয়া হাসে]

সুপ্রিয়া। খামোকা মরতে যাব কেন?

মিলন। খামোকা? খামোকা নয়, বুর্জোয়া সমাজে কিছুই খামোকা নয়। সবই পরস্পর যুক্ত, একাকার। নাড়ির যোগ সর্বত্র। কান টানলেই মাথা আসে। এখন কি মড়াদাও অ্যাম্বোধের সঙ্গে যুক্ত, কেনাপাওনার সম্পর্কে। তাই মরার ওপর খাঁড়ার ঘা মানুষে খাঁড়া চিটকে ফিরে আসে। জেমলিনেও তাই। আর এই সত্যেন্দ্র-এক শ্রীনিবাস মিত্র লেন-এও তাই।

সুপ্রিয়া। কী সব বলছো যাযাবর?

মিলন। বলছি ওরা মরে গেছে বলেই যে নেই তা নয়। যে অঙ্ক মরেছে সেটা মরে গেছে যে! অতএব যারা বেঁচে রইলো তারা যা-ইচ্ছে-তাই করতে পারে না, সাধ্যেতাই করার বাধা থাকে। আপেক্ষিকের ওপরে যে মূলনীতিগুলো সেগুলোর নিত্যানূতন ব্যাখ্যা খাড়া ক'রে আপেক্ষিক হালাদি তারা করতে পারে না। কবর থেকে মড়া তুলে পুকিয়ে ফেলেও লাভাল মেয়া যায় না।

সুপ্রিয়া। ওসব বই-পড়া বক্তৃতা বন্ধ ক'রে লেখো দিকি।

মিলন। সিগারেটটা ধরিয়ে নিই।

সুপ্রিয়া। [বিস্মিত, আনন্দিত] তারপর লিখবে?

মিলন। হ্যাঁ।

সুপ্রিয়া। সত্যি?

মিলন। হ্যাঁ।

সুপ্রিয়া। কেন? আমার কথায়?

মিলন। না।

সুপ্রিয়া। তবে?

মিলন। বিকজ নো ম্যান ইজ এন আইল্যাণ্ড। মানুষ দ্বীপ নয়। তাই এ পৃথিবীর কোনো প্রভুর উপদূলে সমুদ্র-তরঙ্গে যদি একটি সামান্যতম প্রাণী ভেসে যায়, তবে সেটা আমারই পাঁজর গলে গেল। মেলফকোর—বলেছিলেন কবি—মেরাবকোর নেভার সেণ্ড্ টু নো ফর হুম দা বেল টোলস্, ইট টোলস্ ফর থী।

সাহিত্যিকের সঙ্কট

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমি যে কাজ ভালোবাসি সে কাজ করতে পেলে আমিও খুশী আছি। কিন্তু তার বিনিময়ে আমাকে যেন আমার সংসার চালানোর সংস্থান দেওয়া হয়। নয়তো আমাকে বাধ্য হয়ে এমন কিছু করতে হবে যাতে সংসার চালানোর মতো অর্থ আসে। কিন্তু তা যদি আমি করি তা হলে আমি যে কাজ করতে ভালোবাসি সে কাজ করা হয় না, করা হয় এমন কোনো কাজ যে কাজ আমার ভালো লাগে না। অধিকাংশ সময় তো তেমন একটি কাজে খরচ হয়ে যায়। তা হলে আমি আমার মনের মতো কাজ করব কখন?

যা ভালোবাসিনে তা করা আমার প্রতিভার অপব্যবহার। যা ভালোবাসি তা করতে না পারা আমার প্রতিভার অ-ব্যবহার। এই অপব্যবহার ও অ-ব্যবহার আমাকে প্রতিদিন পীড়া দিত। দরকারী কাজ ও প্রেমের কাজ এই দুই ভাগে প্রতিদিনকে ভাগ করে দিতে হতো। দরকারী কাজ না করলে প্রেমের কাজ করার মতো সংস্থান জোটে না। প্রেমের কাজ থেকে অর্থ যদি কিছু আসে তা বাড়তি। ভালোবাসার কাজ থেকে অর্থ নেওয়া উচিত কি না এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মায়। জন্মানো উচিত নয়। কারণ সেইটেই আদর্শ। কবি যে কাজ ভালোবাসেন সেই কাজ করবেন। কবিতা লিখবেন। রাজা বা রাষ্ট্র বা সমাজ বা জনসাধারণ বা পাঠক সম্প্রদায় বা প্রকাশক বা সম্পাদক সে কবিতার বিনিময়ে তাঁকে অন্নবস্ত্র বা অন্নবস্ত্র কেনবার মতো অর্থ জোগাবেন। তাঁরা যদি বিনিময়ে কিছুই না দেন, তাঁকে যদি পরিবারের অন্নবস্ত্রের জন্যে দিনের অধিকাংশ সময় ভাবতে হয় তা হলে তাঁর কবিতা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। কেননা কবিতা এখন জিনিস নয় যে তোমার যখন সময় হবে তার তখন সময় হবে। বরং তার যখন সময় হবে তখনি তোমার সময় হওয়া চাই, নয়তো সে চলল নিরুদ্দেশ হয়ে।

লেখার জন্যে লেখককে কিছু দেওয়া হবে না, এই যে মনোভাব এটাও একটা ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সব জিনিসের দাম আছে, এর যেন কোনো দাম নেই। এটা যেন সময়সাপেক্ষ নয়, অন্নবস্ত্রনির্ভর নয়। যে লিখছে সে যেন মানুষ নয়, তার যেন ঘরসংসার নেই। অথচ এ কথা সেই মুহূর্তে অমনি

তোমার লেখার চাহিদা গেল বন্ধ হয়ে। তোমার লেখা আর ছাপা হবে না। তুমি লিখতে চাও তো নিজের জন্যে লেখ। কিন্তু যে কাজ আমি ভালোবাসি সমাজ যদি তার বিনিময়ে কিছুই দিতে না চায় আর অভিমানবশত আমিও যদি তা সমাজকে না দিই তা হলে তা শুধু আত্মতৃপ্তির জন্যে লেখা, লোকতৃপ্তির জন্যে নয়। এটা লেখার পক্ষে ভালো নয়। লেখা দশজনের তৃপ্তির জন্যেও বটে। তারা ভাল দিক না দিক একবার তো পড়ুক। পড়ে তৃপ্ত হোক। লেখকমাত্রেরই এটা অনেকের অভিপ্রায়। অন্তত ভাবীকাল পড়বে এটুকু তার সান্ত্বনা। কেউ আমার লেখা কোনোদিন পড়বে না, লেখা শুধু আমার একার তৃপ্তির জন্যে, এই যদি হয় লেখকের ধারণা তবে তা পাগলামির পর্যায়ে পৌঁছবে। দিন দিন দায়িত্বহীন হয়ে উঠবে।

অপরপক্ষে সমাজের কাছ থেকে বিনিময় আদায় করে নেবার জন্যে আপ্রাণ খেটে লাভ, যে ধরনের লেখার দাম আছে সেই ধরনের লেখা জোগানো, এতে হয়তো সংসার চালানোর মতন জুটবে, কিন্তু এও তো সে কাজ নয় যে কাজ আমি ভালোবাসি করতে। এও তো দরকারী কাজ বা সরকারী কাজের মতো দায় সারার কাজ। এতে নিজের তেমন তৃপ্তি নেই। এটা প্রতিভার অপব্যবহার বা অ-ব্যবহার। এর চেয়ে সরকারী বা দরকারী কাজ করা ভালো। তাতে জীবনের অভিজ্ঞতার বিচিত্র সুযোগ। এতে তা নেই। এতে হয়তো লেখার অভ্যাস থাকে, লিখতে লিখতে লেখা মক্সো হয়, কিন্তু যে কথাটা বলবার জন্যে কলম ধরা সে কথাটা কোথায়? এ কার কথা কে বলছে কাকে? এর মধ্যে আমি কোথায়? এ মধ্যে জনসাধারণের চাহিদারই জোগান। চাহিদা আছে তাই কবিকে নভেল লিখতে হয়, তাও সিনেমার দিকে নজর রেখে। ঔপন্যাসিককে অতিকায় উপন্যাস লিখতে হয়, বেশ উঁচুদরের বিষয় উপন্যাস। সাহিত্যের ভাণ্ডারে কিছু জমবে কি না, ভাবীকালের হাতে কিছু পড়বে কি না তার জন্যে মাথাব্যথা নেই। থাকলে সংসার অচল। বিশেষ করে আজকের বাজারে।

ইংরেজের মুখে আতা আর নারাঙ্গী

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

বাল্যকালে আমাদের word-book পড়িতে হইত। কিছু ইংরাজী শব্দ জোর করিয়া শিখাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সেকালের শিক্ষক মহাশয়রা word-book পড়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। আমাদের এক মেডমাস্টার মহাশয় প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা করিয়া তিন বছরে সমগ্র চেম্বার্স ডিকশনারি মুখস্থ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ শুনিয়াছি। সেকালে কাহারও ইংরাজী জ্ঞান সম্পর্কে প্রশংসা করিতে হইলে "stock of words"-এর কথাটা আগে উচ্চারিত। এই স্টকের গোড়াপত্তন হইত ওয়ার্ড বুকে।

ওয়ার্ড বুকে দুই চারিটি বজার বজার শব্দ মুখস্থ করিয়াছিলাম। একটি বেশ মনে আছে,— apple মানে আতা। অর্ধ-শতাব্দী পূর্বেকার গ্রামের ছেলের কাছে আপেল ফলটা বেশী পরিচিত ছিল না। কাচের কৌটার মধ্যে তুলার বালাপোশ মোড়া আঙুর রোগীর পথ্য হিসাবে কখনো কখনো কলিকাতা হইতে অতি সন্তর্পণে আনা হইতে দেখিয়াছি কিন্তু আপেলের এমন ছড়াছড়ি ছিল না। কাজেই তর্ক না করিয়া আপেল মানে আতা মুখস্থ করিয়া ইংরাজী stock of words বাড়াইয়াছি। আজ ভাবিতেছি word-book এর প্রণেতা আপেল ও আতার মধ্যে সাদৃশ্যটা কি পাইলেন?

নামবাচক শব্দে এই রকম গোলমালটা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এক ভাষার শব্দের প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় থাকিতেই হইবে এমন কথা নাই। আমাদের 'অভিমান' ইংরাজী কোন্ শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিব। অভিমান নামক হৃদয়ধর্ম ইংরেজের আদৌ নাই এমন কথা ভাবিতে পারি না।

অনেক ফুল ফল পশু পাখী ইংলণ্ডে আছে যাহা বাঙ্গালা দেশে নাই। বাঙ্গালায় তাহাদের প্রতিশব্দ আশা করিব না। Nightingale-কে বুলবুল বলিলেই ভুল হইবে। কারণ, নাইটিঙ্গেল বুলবুল নয়। তেমনি আপেলও আতা নয়। একালে কোনো কোনো বাঙ্গালা অভিধানে আতার প্রতিশব্দ দেখিতেছি custard apple। কাস্টার্ড মুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু আপেলটা রহিয়াই গিয়াছে।

আসল ব্যাপারটা হইল ইংরেজেরা এদেশে আসিয়া আতার সহিত তেমন পরিচিত হয় নাই, হয়তো তাহাদের তেমন ভাল লাগে নাই। সেই কারণেই এই ফলটার নাম তাহাদের মুখে তেমন শোনা যায় নাই।

ভারতীয় যে সব ফল তাহারা খাইয়াছে সাধারণতঃ ভারতীয় নামেই তাহাদের উল্লেখ করিয়াছে। অবশ্য উচ্চারণে রূপান্তর হওয়া স্বাভাবিক, এবং তাহা অনেক ক্ষেত্রেই হইয়াছে।

ভারতীয় ফলের মধ্যে কমলালেবু ইংরেজের সমাদর পায়। অরেঞ্জ নামটিও ভারতীয়। 'নারাঙ্গী' এক জাতীয় লেবুর নাম। এ নাম ভারতের অনেক অঞ্চলে প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা দেশেও আছে। ইংরেজ নারাঙ্গী শব্দটিই শুনিল, বানান করিল norange। একটি কমলালেবু হইল a norange। এই a norange কাছাকাছি আসিতে আসিতে an orange এ পরিণত হইয়া গেল। লোকে ভাবিল a নয় an শব্দটাই একটা আর্টিকল্। n হইতে বিচ্যুত হইয়া norange নরকলেবর লাভ করিল। শব্দটি যে আমাদেরই শব্দ তাহা হঠাৎ ঠাহর করাই কঠিন।

আর একটি ভারতীয় ফল ইংরেজের রসনাকর্ষণ করিয়াছিল— সেটি হইল আম। আম তো আজ রাষ্ট্রদূতের প্রতীক হইয়া পশ্চিমের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করিতেছে। ইউরোপ আমেরিকায় ভারতবর্ষের mango ফলের মধ্যে অগ্রগণ্যতা লাভ করিয়াছে। এই ম্যাঙ্গো নামটি ইংরেজী। ইংরেজী অভিধানে এই নাম স্থান লাভ করিয়াছে। ম্যাঙ্গো ইংরেজী হইলেও আসলে উহা ভারতীয় ভাষারই শব্দ। শব্দটির মূল পাওয়া যায় দ্রাবীড়ী ভাষায়। তামিল 'মন-কাই'-এর অর্থ আম। পর্তুগীজদের মুখে উহাই ম্যাঙ্গোতে পরিণত হয়। দক্ষিণ ভারতে অবস্থানকারী পর্তুগীজ অথবা ইঙ্গোপর্তুগীজদের নিকট হইতে এই ম্যাঙ্গো ইংরেজদের হাতে পড়িল এবং তাহাদের মুখে ম্যাঙ্গো রূপ পাইল।

ম্যাঙ্গোস্টীন mangosteen নামক ফলটির নামও এই প্রসঙ্গে তুলনীয়। ইহা মালয় ভাষার ম্যাঙ্গোস্টান mangustan-এর ইংরেজী রূপ। তামিল মন কাই পর্তুগীজ উচ্চারণে ম্যাঙ্গো হইল সম্ভবতঃ ম্যাঙ্গোস্টান-এর প্রভাবে।

ম্যাঙ্গো শব্দটা ইংরেজী ভাষায় একান্ত অন্তরঙ্গ শব্দ হইয়া গিয়াছে। অন্য শব্দের সহিত সংযুক্ত বা সমাসবদ্ধ হইয়াও ইংরেজীতে ম্যাঙ্গো শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন,— mango trick। ম্যাঙ্গো ট্রিক এক রকম ঐন্দ্রজালিক খেলা। বাজীকর একটি আমের গুঠলো খাঁটি হইতে কয়েক মিনিটের মধ্যে আম গাছ জন্মায় আবার মুহূর্ত মধ্যে তাহাকে উড়াইয়া দেয়। ইহারই নাম ম্যাঙ্গো ট্রিক।

ম্যাঙ্গো শব্দের সহিত সংযুক্ত আর একটি শব্দ পাই mango-fish অর্থাৎ তপসে মাছ। ইহার গায়ের রং একটু হলদে হলদে। পাকা আমের সহিত ইহার রঙের এই সাদৃশ্যমাত্র সাদৃশ্য হইতেই কি ম্যাঙ্গো ফিশ নাম আসিয়াছে? মনে হয় পাকাশ মাছই নাম সাম্যে প্রথমে ম্যাঙ্গো ফিশ হয়, পরে তপসে মাছ অনেকটা সমজাতীয় বলিয়া ওই নামের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

আকাশ ও পথ

নেসিপ ফজল কিসাকুরেক
(তুর্কী কবি)

অনুবাদ : অনীল ঘটক

একাধারে আমি আকাশ আমিই পথ,
আমিময় মহাশূন্য, জড় জগত।

ঊর্ধ্বে অসীম সুবহান ঘন নীল
নীচে ছায়া ঘেরা বনপথ নদিল।

আকাশ কয়না কথা
মেলে রাখে নীরবতা।
যেখানে সাগর জলে
প্রতিছায়া পড়ে চলে,
বন্ধকে দাঁড়ায়ে তীরে
দেখে সেই ছায়াচিত্রে।
এ উহার পানে চায়
প্রতিভাষ নাহি পায়।

মোরা ইসারায় আকাশ কী যেন কয়
অনুয়ান পথ পায়ের চিহ্ন বয়।

আকাশ, সুদূর নিঃসীমে মোরে তোলো
যেখানে ও পথ নেছে, সেথা নিয়ে চলো।

*

মর্ম্মর ধ্বনি কোনো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

দক্ষিণের ট্রেনে সিটি। ভোর-রাত্রি, তোমাকে জাগায়।
চায়টায় ঘণ্টা পড়ে। প্রহরী-রাত্রিও কামেলিয়ে রাত জাগে।
মর্ম্মর ধ্বনি তো নয়। ভুকম্প লাগায়
খরখর অশ্বাত্ত হৈশুনে।

তবু কি জাগেনা কোনো শব্দবোধ ঘুমন্ত এ অন্ধকার মনে:
স্মরণ: এ দক্ষিণেরই পূর্ব্ব-অনুরাগে
ছিল যে অজন-ধারে পল্লবিত একটি বাগান?

স্বপ্ন ভাঙে কিন্তু জেগে উঠি জলনায়াগের ফুলে।
এখনো আকাশ নেমি। শুকতারা সুন্দরী তেমনি।
দীপাবলী জ্বালি তাই। পাতালের ধ্বনি
নিজস্বে সুবর্ণরেখা আঁকে।
কী সুরমা গলি-পথ! দূর ও নিকট নেই আর।

বারান্দার থেকে ঘরে এসে আজ দেখছি তোমাকে—
তুমি, কের সকারিণী গান—
লতায়, পাতায়, ফুলে-ফুলে।
মাটির মেঝেতে এক ভিখারীর সাজ, অলঙ্কার।

*

এই ছন্দে

বিষ্ণু দে

এই দ্বৈতে অদ্বৈতও নেই।
আয়ু আর অন্তের অন্তেষে
দিগাবেনে অনন্ত মানুষ।

একই দেহে ক্ষিপ্র জিজীবিষা
ঘাসে কাঁদে, সন্নিপাতাতুর
আলিঙ্গনে চুম্বনের তৃষা—
দুঁহু কোরে দুঁহু বিচ্ছেদে,
আয়ুতে উথায় হাহাকার—
তাদের ধারায় নদী জলে।

এই ছন্দে যতদ্বৈত নেই,
দিনে দিনে বছরে বছরে,
বস্তুত প্রতিটি পলে পলে
অবিরাম রক্তের আদরে
লেহরোচনা মন্ত্রিত করে।

দেখি নিষ্পেষিত কৌতূহলে,
ভাবি কান্তি আদর কি তার
চৈতন্যের যবনোত্রী জলে?

কান্তিতে কি শান্তি পাবে আর?

*

দুটি আষাঢ়ে গল্প

অরুণ মিত্র

কর্মসূচী

আরও কত তর্ক হল মনে নেই.
বোঝা কথা বোঝা গেল অদৃশ্য তিলক
অতঃপর চওড়া ক'রে এঁকে নিয়ে
বলতে হবে সোজা আছে যেখানে কীলক।

ইস্তাহার দেখিয়ে কে বলতে চাইল
তার সাতটা···কিন্তু স্থির হল সাতটা বন্ধ
একসঙ্গে জেনেশুনে রাতারাতি
তৈরী ক'রে ফেলতে হবে একটি সাদা গল্প।

অন্ধ তার ঘোটা উলেই চাকতে হবে
কেমনা ছুরোশী ঠাণ্ডা ট্রিক্সে বোঝা চাই ;
দুপাশে পকেট কিন্তু আবশ্যিক,
বন্ধ দুটি, বামের একটিতে
বড় বড় বুলি থাকবে, অন্যটিতে কেবল চাকাই।

অন্য গল্প

"ছয়ে ছয়ে যে তিন হয়
তারই মোক্ষম প্রমাণ বাড়লাম।"
"ছয়ে ছয়ে পাঁচ নিশ্চয়
বাপমন্তরে চাপান দিলাম।"

সমালোচকদের এই কাণ্ডখানা দেখে
বেচারা চায় ছুট ক'রে
স'রে পড়ল চাঁদে।

তাকে এখন ফিরিয়ে আনবে কে ?
বাকিন না রুশ ?
না হাজরা রোডের ঐ ছুতো রুশ ?

*

অব্যক্ত

হরপ্রসাদ মিত্র

আমি যে টেশন দেখছি — যে ঘাটি, যে নির্জন বিকেল,
শুনছি যে পাখির শব্দ একলারি সাহের গভীরে,
সেইসব ঘুমে, সুখে চিঠি লিখবে
আমি তো, আমি তো···
কিন্তু সবই শূন্য থাকে।
বুঝবে তুমি এই নিবেদন।

শরীরস্বরেরই অন্ন কিংবা বিদ্যা কিংবা আর কিছু
কী জানি কী প্রয়োজন
কেন মন
প্রত্যেকের বুকে ?
কেন যে রয়েছ তুমি কোটি কোটি বিন্দুর সিন্ধুকে।

কথা দিয়ে রাখোনা যাবনা, ধরা যাবনা, পাওয়া যাবনা, শোনো—
নিজের বহৎ চেষ্টা কলকাতা তুমি পূর্ণ কোরো।
পাঠাবো, জানাবো, পাবো,
—এই নিয়ে সময় গুনছিই।
তোমাকে কেবলি লিখি,
এই সার প্রাণ-অনুভূতি।

*

ক্রমশ ভিতরে যাই

শ্যাম বসু

ক্রমশ ভিতরে যাই
ক্রমে ক্রমে আর্দ্র অন্ধকার
আমি আর উত্তার চাই না
এই ঢের ভাল
সর্বাঙ্গে আঁধার নিয়ে
এই কাদা, ধনি হীরার জননী যুক
জলার ভিতরে থাকি
শ্রীমের মহিষ হয়ে, থাকি
ঘুপচাতে জলমালা দিয়ে।

অনেক, অনেক আগে নষ্ট হয়ে গেছে দুটি চোখ
ঘেওয়ালে ঘেওয়ালে মাথা ঠুকে
কোন ক্রমে এসে গেছি
স্মৃতি বিস্মৃতির পারে এই অপূর্ব জলায়
এখানে গাছের ডাল নিচে নেমে যায়
সহস্র শিকড় তার মাটি খোঁড়ে সূর্যের কোমকে
এখানে অনেক পাখি সারাদিন মন্ত্র পাঠ করে
রাত্রির বিরাট শুড়ি ফাক হয়ে গেলে
যে যার আশ্রয়ে ফিরে যায়।

তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে
সেতু রচনার আর কোন প্রয়োজন নেই
যেহেতু সন্তাপ নেই
শেষহীন পিপাসায় অন্তর্দাহে পুড়ে পুনর্বার
জন্মাবার ইচ্ছা মাত্র নেই

তাই এই সুষমায় পাকে ভরে ধরা পল্লবনে
গ্রীষ্মের মহিম ঘরে চোখ বুজে প'ড়ে আছি আমি
লক্ষ লক্ষ বছরের শ্যাওলা ধরা উপকথা যেন।

*

অভ্যাসবাসার খেলা

কৃষ্ণ ধর

ভালবাসা ছিল একা ফুলশেজে
তুমি বুঝিবে না সে যে
কত চতুরালি মনে পকে খালি
যাওয়া
বাগানে বাগানে চৈত্রে কতই যাওয়া
পাচিল টপকে কখন চমকে দাঁড়াত বুক সমান
হৃদয় তখন ভেঙে হত খান খান
তুমি বুঝবে না তুমি বুঝিবে না
তুমি বুঝিবে না প্রিয়
কত মধুমাসী
মূল্যের বিনিময়ে
ভালবাসাটুকু খেখেছি যে সাধসিরে
বাসি ফুল নখে খুঁটে দিই ফেলে
একে একে সব অতিথিরা চলে গেলে
রেখে তাকে বুকে তুলি
অভিমান তুলি অঙ্গুলিগুলি
তাকে সেই ফুল বলে
যেগুলি ছড়ানো ছিল যা তখনো
তাহাদের পদতলে
ভালবাসা ছিল ফুলশেজে ছিল একা

যেহেতু আমার হয়তো আমার
মুখোমুখি হবে দেখা
যেখিনা কিছুই ঠোঁট দিয়ে ছুঁই
যত্নের ভালবাসা।
ছিল আশা ছিল আরও কত আশা
হায় তা জানি না দিনে দিনে গোনা
অ-ভালবাসায় দেনা।

ঘুরে, নিকটে

চিত্ত ঘোষ

নানান কিসিম কসি জোটবাঁধা।
নানা ধান্দা, তাল।
গা ভাসাও স্রোতে—
যখন-যেমন-তখন-তেমন সেজে চলে যাও :
সেই যোতা একটা মাঠ পার হয় কেন।
জ্যোৎস্নার আবর কাটে কারা।
বিস্ময় চিহ্নর সব সেজে
সার্কাসের বুড়ো বাঘ গলিত নখদন্ত রে।
একান্ত মুখের কাছে লেলে ধরে।
নিয়তই শাক দিয়ে মাছ ঢাকা—
জলময় সময় অগ্নি।
সময়ের বাসে তৈরি পোষাক প্রস্তুত কর
পরিধের এই এক রঙমহে
তারপর একই সুতে আমরা সব মিলিত মৌলিক
'দো কলি, পাকোড়া কলি, কলি, কলি' ··

কাল পর্ত অমুকের সঙ্গে অমুকের বিয়ে—
কিম্বা বিবাহ বিচ্ছেদ।
আততায়ী ঘোরে।
আত্মীয় স্বজনের কাছে ঘোরে।
লালিত স্বপন স্পৃহা ঘোরে।
নিজেকে নিজের কাছে ভয়
নিজের নিকটে সেই ছায়া
যাত্রিদের ততখানি দূরত্ব যায়।

*

অদ্ভুত আলোকে

সলিল গঙ্গোপাধ্যায়

দুপালিনী ডুবে গেল
বাঁচানো সম্ভব নয়
জল ফুলে ফেঁপে উঠে
দুপালিনী ডুবে গেছে
একজন অন্ধকার
নিরুপায় তীরে উঠে
রেখে গেছে বারান্দায়

কারণ তখন
সকলেই জানে
নিশ্চিহ্ন দখন্ত
আকস্মিক ক্ষতে।
একা শীতার্তকে
তারপর থেকে
কবে চুপিসারে।

এখনো বৃষ্টির দিনে
শীতার্ত কেদারা টেনে
যে গল্প জানে না কেউ
খোঁপা খুলে বারান্দায়
অশরীরী ছায়া কিংবা
জলে ভেজা দুই চোখ
ডেকে নিয়ে যায় তাকে

একা বসে থাকে।
রাত্রে অন্ধকারে
শীতার্তের বুকে
একটি গোলাপ
গভীর অসুখে
অদ্ভুত আলোকে—

হাওয়ায় ধ্বনিত কান্না অবরুদ্ধ দ্বারে
ডেকে নাও অভিসারে ক্লান্ত পথিকেরে।
ছলনিনীর ছন্দ্বা কি সত্য আকস্মিক ঝড়ে!

পাষাণাত্ত ঘরে জল মিথ্যা কি মল্লারে।

ছড়া

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

খ্যাতি

নাম ডাক তারি তার
ছড়িয়েছে চারিধার
হল বাড়ি গাড়ি আর
পটকাল নাড়ি তার।

বৈধ

কয়েকটি বসায়
নাকের ওপর বসায়
বেজায় চকম কারদা দেখে বাঁচি না।
নাকের নয়ন চামড়ায়
আদর করে কামড়ায়
শক করে তবু জোরে বাঁচি না।

আশা ও মিত্র

কবির লড়াই দেখতে গিয়ে
ছবির বড়াই করে
আর্টিস্ট বসাই আঁকেন ছবি
ভীষণ বেগে ছেগে
তাইনা দেখে কবি জ্বলন
সটান পড়ে ভেগে।

যাত্রা দলের পাণ্ডা ছিলেন
ধনঞ্জয় সাহা।
ভুলেও কভু বলেননি কো
মিথ্যে কথা তাহা -
তাঁরই নাকি বন্ধু ছিলেন
মেঘনাদ সাহা।

যেমন তাঁর মুখের হাসি
তেমন মুখের বচন
পদ্ম লিখে নাম পেয়েছেন
জলপদ্ম লোচন
মৃত্তা নাকি নিত্য নিধি
মুগ্ধ পাদের চলন
নিঃস্ব বিশ্বে ডাকেন তিনি
শ্রীধর সম্বোধন।

গায়ের মাথায় বসে আছে
সত্যিকারের ভূত
নয় কো মানুষ, কিংবা দানব
দেখতে সে অদ্ভুত
খালি চোখে যায়না দেখা
হাত পা এবং মুখ
চশমা ভবন আঁটলে চোখে
বুক ধরে দুরুদুরু।

দুটি কবিতা

শঙ্খ ঘোষ

বৃষ্টি

আমার দুঃখের দিন শুখাতো
আমার সুখের দিন ভাসমান।
এমন বৃষ্টির দিন পথে পথে
আমার মৃত্যুর দিন মনে পড়ে।

আমার সুখের মাঠ জলতরা
আমার দুঃখের ধান ঝরে যায়।
এমন বৃষ্টির দিন মনে পড়ে
আমার জন্মের কোনো শেষ নেই।

দুনিয়া

দুনিয়া সমস্ত দিন বাঁধা ছিল।

খুব ঝারোটায় উঠে চুপিচুপি খাঁচা খুলে
'উড়ে যা উড়ে যা' বলে প্ররোচনা দিতে
আমার বুকের দিকে তুলে দিল ঠ্যাং—

জ্যোৎস্নায় মনে হল বাঘিনীর থাবা।

*

যোগিনী, তোমার নীল

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বুড়নাটকের দলে তুমি আমি দারুণ সংসারী ;
সে কথা জানেনা কেউ। সারাদিন পথে-পথে কাটে,
পথ আমাদের ঘর (আমাদের দলে
সভ্যেন্দ্রো-কচির লোক, সাজপোশাকের ঝুলি আর
তিনটে কুকুর আছে)। বেলা ঘুরে যায়
লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের পাশে, সন্ধ্যা হওয়ার একটু আগে
সভ্যেন্দ্রো-জনতা যেই মহারানী মাল্লিক দেখায়,
তিনটে কুকুর সেই হিরণ্য-আঁধারে ত্রিলহরে
বলে যায়। অকস্মাৎ সূর্য আর চন্দ্রের তরীতে
যোগিনী, তোমার নীল সোভাষা উল্লাস দিয়ে ওঠে
মহাসুখে ! তবু কেউ তা সত্ত্বেও বুঝতে পারে না
আমাদের দুই রাত্রি প্রতীক্ষা করেছো তুমি, আর
তুমি যে শুধু-আমার তবু কেউ বুঝতে পারে না !

*

অনুনয়

শান্তিকুমার ঘোষ

প্রতীতি, আজকে তুমি
হলেই না হয় প্রীত আমার অতিথি।
এ রাতে ট্রাইন ট্রেনে
কী হবে ফিরে বা যাওয়া।

ফুলবাড় চারদিকে
আমার বাংলোয় :
পূর্ণা মগ পাবে, জংলা বহুয়া।

বায়োজ-এ জলের তোড়
নিশীথে প্রবল হবে :
সময় আয়ত্ত থেকে
নিখিল প্রণয়ী সব
যেমন চেয়েছে গাঢ়

তেমনি নিপুণ হবে, তেমনি নিকট।

প্রতীতি, একটি বার
হলেই না হয় সাথী বাংলো নিশীথে।

*

বিশুদ্ধ কমল

আলোক সরকার

কল্পনা কখন মৃত হয়ে যায়। কিশোরবেলার
সেই পক্ষিরাজ আর কোনোখানে নেই। এখন কি আমাদের
বিস্ময়গুলিরও স্থির হতে হয়। খোলা জানালার
প্রান্তর এখন আর তেপান্তর নয়। এইসব অত্যন্ত সত্যের
মতো মনে হয়, আমি সহজ বিষাদে গিয়ে বসি
ছোট বাগানের প্রিয় গন্ধরাজ গাছের ছায়ায়।
চারিদিকে নির্জনতা আরো গাঢ় শিখায় জাগাই।

কোনো পক্ষিরাজ নেই কোনোখানে, কোনো তেপান্তর, যতদূর চাই
কেবল একটি একাগ্রতা, একটি তন্ময়।
মাটির গভীর থেকে ধ্বনি ওঠে, প্রতিটি ফুলের ঝরে-পড়া
নিশব্দ ঘণ্টার মতো— আদিগন্ত শান্ত প্রতিধ্বনি।

কোন অলৌকিক জ্যোৎস্না নেমে আসে প্রস্তুত সন্ধ্যায়
পাতায়-পাতায়, আর সেই মনোময় সরোবর
অকস্মাৎ শিখার মতো আবির্ভাব, নিপুণ অন্বেষে স্থিরতায়।

কোনো আভরণ নেই কোনোখানে, সাতসমুদ্রের কলরব
কিংবা সেই হীরামন পাখিটির স্বর্গিল নির্দেশ।
কল্পনা কখন চুপ হয়ে যায়, আমাদের বিস্ময়গুলির
মতো সহজের অবসান শুধু এক অনিমেষে
মোমবাতি সমগ্র সত্তায় তার স্থিরপ্রভ শুভ্র সংহতির
বড়ো সরোবর নীল মূর্ত করে। সেইখানে বিশুদ্ধ কমল
জেগে ওঠে একটি সীমায় আর নিবিড় ক্ষেত্রের নিষ্কম্প।

সনেট

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

যেখানে যেগার্ত নদী অকস্মাৎ ঘুরে গেছে বাঁকে,
শোণল পাহাড় যারা তীর-লগ্ন অটল অনড়—
তরঙ্গের অজস্র জিজ্ঞাসা তারে পাকে পাকে
নড়ে না তবুও স্থাণু : হাওয়া যেন উন্মাদ শীতের
পিছুটান ফেলে ক্ষিপ্র পায়ে পায়ে যেন অবারিত
ঝরায় আকাশ খোঁজে, হংস বলাকাও উড়ে চলে
মানস-যাত্রীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে কল-মুখরিত
পক্ষ-বিধুননে ক্ষুব্ধ আমার হৃদ্দেও ঢেউ তোলে।

আমাকে রেখোনা স্থাণু পাহাড়ের মত নিষ্ক্রিয়ে,
স্থির শিলীভূত : তীক্ষ্ণ রৌদ্র-বৃষ্টি-ঝড়ের প্রহারে
আমাকে গলাও, মুক্তি দাও, ঘরপোতে ধ্বনিবায়,

দুরন্ত-হাওয়ায় বুকে, বহুদূরে উধাও পায়রে
আমায় প্রকাশ করো, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে।
নিশ্চিন্তে আমি যাবো সময়কে পিছে ফেলে রেখে।

*

সেই জলন্ত অন্ধকারে

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরে কাঁপে আলোর রেখা
তীব্র, তীক্ষ্ণ, চঞ্চল।
অন্ধকারে বসে ভাবি
ও বুঝি কোন নিরুদ্দেশের জ্যোতি।

আমার স্বপ্ন যেন না ভাঙে।
আমার তৃষ্ণা যেন না কেড়ে নেয়।

অন্ধকারকে যারা ভালবাসে
তারা আলোকে জানতে চায়।
আলো নেই। অন্ধকার উজ্জ্বল।

সেই জলন্ত অন্ধকারে বসে
সৃষ্টি তারার কম্পনে মথিত আলো
তরল অগ্নির মতো পান করি।
সব আলো শুষে নিয়ে
আমার অন্ধকারটাকে গাঢ় করি।
দেখি। ছুঁই। খুব পাতাই।

মৃত্যুর জন্যতা পায় হয়ে
জীবনকে কোলে নিয়ে যদি।
স্বপ্নকে জীবন ভেবে ভালবাসি।

*

কিম্বদন্তী রাজকন্যার দেশে

অরুণ ভট্টাচার্য

কিম্বদন্তী রাজকন্যার দেশে
মস্ত একটা পাহাড় ছিল ঘুমিয়ে
পাতটা দৈত্য ডাকলেও তার সাড়া
মিলত না। তাই রাজা বললেন, ওহে

ডাক তো সব মন্ত্রীমশাইদের
গভীর পরামর্শ করতে হবে,
বিদেশ থেকে বড়ি এনে আনো,
আমার রাজ্যে পাহাড় থাকবে ঘুমিয়ে!

মন্ত্রী এল, মন্ত্রী গেল, রাজবৈদ্য সবাই
রাজা ঘুরে ঘুরেও কাও বাঁধিয়ে
যে যার মতন চলে গেল বিফল মনোরথে,
পাহাড় কিন্তু তেমনি রইল ঘুমিয়ে।

কিম্বদন্তী রাজকন্যা ঘুমুর বাজিয়ে
একদা গেলেন প্রাসাদ ছেড়ে ভীষণ পাহাড়ে
হাতের কাঁকন খুলে দিলেন অঘোর ভালোবাসায়:
এত দিনের ঘুমিয়ে-পড়া পাহাড় উঠল জেগে।

কিম্বদন্তী রাজকন্যার দেশে
এতদিনের মস্ত পাহাড় ছিল ঘুমিয়ে
রাজকন্যার চরণ দুটির নূপুর শিঞ্জনে
উঠল জেগে হাজার পাখির অন্ধ কলরব।

ভীষণ পাহাড় উঠল জেগে রাজকন্যার দেশে।

*

বাস-স্টপ

শক্তিব্রত ঘোষ

কালো মেখে হোক, কিম্বা পাটভাঙা ধবল পোশাকে
একত্রে দাঁড়াই. এক বাস, এক প্ল্যাটফর্ম ; বোঝ
একই জায়গা থেকে উঠি, হ'তে পারে এক সঙ্গে নয় ;
যেমন সময়
কখনো আটটা, ন'টা বা দশটা, কিন্তু মিলে থাকে
এক সময়ের সঙ্গে ; থাকে
অনন্ত ধারাবাহিক বলে সংযুক্ত একের মত লাগে।

ডালহৌসী থেকে দূর টেরিটিবাজার
গন্তব্য যা হোক হ'তে পারে ; বেয়ারিং বা খনিজের কাজ,
বীমার দালালি. কিম্বা কাঁথা বোনা, বিয়েটায়ে তাঁক,
যে কোন পেশাও হ'তে পারে ; বিবাহিত বা কুমার,
যে কোন জীবন ; কিন্তু এক বাস, এক প্ল্যাটফর্ম থেকে
আমরা প্রত্যেকে কাজে যাই ; বাস-স্টপে ঘনিষ্ঠ সমাজ।
কখনো কখনো অলৌকিক
জীবনের মানে বই থেকে
স্বখাত মৌলিক।

অন্ধকারে ঢাকা ছিল

শিশির কুমার দাশ

অন্ধকারে ঢাকা ছিল সেই শুভক্ষণ
তুমি শুধু একা ছিলে তুমি বাহুকরী
আর আমি যেন কোন প্রসুপ্ত তস্কর।

সেই অন্ধকারে তুমি জ্যোতির্ময়ী তরী
কর্ণধারহীনা, হাতে ছিল সাদা হাড়
নয়নে কটাক্ষ রেখা তোমার সুন্দরী !

আমার সুচোখে শুধু ছিল অন্ধকার
বৃষ্টিময়ী, খুলে দিলে তুমি কেশপাশ
ধীরে ধীরে সংখ্যাহীন নাগলতিকার।

তারপরে অকারণে সহসা উচ্ছ্বাস
জোয়ারে জোয়ারে কাঁপে দেহের কুসুম
আতাল গন্ধের হাওয়া প্লাবিত আকাশ।

তুমি কেঁপে কেঁপে ওঠো, তালের কুসুম
বিদ্যুতের মত জ্বলে, হায় অভাগিনী
নিজেকে তোলাও নিজে, নিজে আনো ঘুম

মোহমন্ত্রে নিজ চোখে ; কিংবা যামিনী
নিজের সন্তান নিজে হত্যা করে যায়
তেমনই নিজেরই বুকে আবার রাগিণী

তুমি গাও, ইন্দ্রজালী চরণের ঘায়
দলে যাও অভিলাষ যত মনোরমা
তারপর অন্ধকার অনন্ত শয্যায়

জেগে থাক সারারাত্রি, নিশীথিনী অমা
চারিদিকে ; শূন্য প্রেক্ষা, তুমি যাদুকরী।
বাইরে দ্বার বন্ধ পুরী : চিরন্তন ক্ষমা।

*

অবেলায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অবেলা এই সকাল বেলা
দু তীরে ঢেউ ভাঙছে খেলা
কে আছে জন কার আছে মন
ভাষে তা পরিহাসে

কে আছে এসে খোলে এ ঢাকা
অন্তরাস এ আন্তরাখা
নয়নে কার তেমন প্রভা
যেমন নাকি ঘাসে ?

ঘাসেতে যদি লুকাতে পারি
লুকাতে পারি নয়নে তারই
কিন্তু ঢেউ পাবেনা ছুঁতে
রূপ করলেখা।

অতর্কিত দিনের ঢেউ
আড়াল দেবে এমন কেউ
আছো কি যারে
মরমে যারে শক্ত শয়েখা ?

সকাল বেলা কাটিয়া যায়
বিকালও যাবে তাহাই পা'য়
সেতুবন্ধবিমরীচিকার ব্যথিত উপহাসে
কে আছে জন কার আছে মন
ভাষে তা পরিহাসে।

*

সেক্রেটরিল

মানস রায়চৌধুরী

চৌরঙ্গীর রৌদ্রমাঝে তোমার সঙ্গে এক্সলক সেবা, সেক্রেটরিল
বারোটাকার সুদূর প্রেমে তুমি ছড়াও সম্মোহন আভা
তোমায় ছুটে আনতে পারি কোথায় আমার অমন বিশাল খাদা
তোমার চোখে সমুদ্র ছুন, শেওলা পাথর ঝিনুক শঙ্খের শ্রীদ।

বাদামবরণ নির্জনতা প্রশ্নের তবু কী ভাষর
পাতা উলটে কয় পুংক্তি ঘরে আনে প্রাকবিবাহ অর
কোন পল্লব সিপির ঘরে, কলপাই বন কোথায় চিরকাল
চিরহরিৎ সম্ভাবনায় ভরিয়ে রাখে ছায়াশীতল জল
অসভ্য অনুষঙ্গ··· নীল পালক, খাড়ি, কিরর্ত জলে
বসে পুরুষ হৃদয়টিকে তুলিয়ে দিলাম তালোলাগার ঘরে।

ভাঙাকুঠ জরুরি চেনা, হা কলকাতা, কোথায় রাখি বুকের চিহ্নগুলি
চৈত্র ওঠে দমস্ত পথ কড়ের বেগ, অটোমোবিল-ধূলি
তুমি সোপন বুকফেসের স্পর্শাতীত ছায়ায় আছো লীন
তবু তোমার মুখের ভাষা রক্তময় ফুলুল সারাদিন
ট্রপিক রৌদ্রে আমার গাহন মনোমোহন বন্ধুদের স্রোতে
জলের তলায় অন্ধকার আদিয়ে দিলে হেলেনীয় মায়াবী খদ্যোতে।

*

মন্দির

রাজলক্ষ্মী দেবী

শোনো, আদিবাসী,— আমি আসব সন্ধ্যায় এই মন্দিরে এসেছি।
বিচিত্র বীপের কেন্দ্রে উপনীত হ'য়ে গেছি নারিকেল-তরাক পেরিয়ে।
তবে আমি দিগন্তের কয়াস্থানে দুঃসাহসী নৌকায় ভেসেছি,

সম্বৎসর কাটিয়েছি চোরা ধরনের ভূল, তুফান এড়িয়ে।
অবশেষে মন্দিরে এসেছি।

শোনো, আদিবাসী,— আমি দৈবী উপচারে কিছু পুষ্প দিতে পারি।
সন্ধ্যায় সুদীর্ঘ দীপ-শিখা জেলে দিতে পারি দেবতা-সকাশে।
শোনো, আদিবাসী। আহা, সুরভি-সনাথ সন্ধ্যা বড়ো মনোহারী।
— বিচিত্র দীপের ক্ষেত্রে সুরম্য মন্দির-চূড়া গোধূলি-আকাশে।
পুষ্পদীপ আমি দিতে পারি।

আসন্ন সন্ধ্যার ধূপ-ধূমায়িত অন্ধকারে,— তুমি, আদিবাসি
অদৃষ্টের ছায়া থেকে দৃষ্টির গোচরে বুঝি এলে এতক্ষণে।
প্রস্তরে শাণাও ছুরি, দুই চোঁটে খেলা করে ভয়ানক হাসি।
কতবার এ মন্দিরে কোন্ পূজা হবে আজ, কোন্ আয়োজনে?
শোনো,— আদিবাসী।

*

পরস্পর দীপ্তিদান

নিখিলকুমার নন্দী

" — There was no light ; there was no light at all"
"And things threw light on things,
And all the stones have wings." Theodore Roethke

পথে পথে জনরোল গাড়িঘুড়ি কান্না আর কৌতুকে ও কৌতুকে মেশামিশি
উৎসবের উৎসহারা রাতোয়ারা জাগর জীবন ছায় অনাথ আবেশে
যারাদার দিনগুলি ক্রমাগত, প্রাত্যহিক, ম্লান আত্মগতি
চলো যাই একবার একরাত রাত্রিযাপনে অলি বহুরায় ঘরে।

এই শালবল্লভা পাইনের নম্রচূড়া ঘুলেফলে ঘরোয়া ঘরোঘরো
ইউক্যালিপ্টাস গন্ধে লবঙ্গ লতীরময় স্পর্শের বিভিন্ন
বেআব্রু নিলীন সত্তা এসো কাছে রাত্রি ভ'রে ভরো
রাত্রি ভ'রে নাও হাত এক হাত অন্য-অন্য অন্যার্ত পিপিলিন

অন্ধকার ঘর ছুঁয়ে অন্ধকার মন খুঁজে বসে থাকা ভালো
যখন এমন শীত ক্ষিপ্র তীব্র অন্ধকারে ভেসে যাওয়া চলে
অন্ধকার থেকে অন্ধকারে যেতে প্রতিঘাত ক্ষণস্থায়ী ত'রবার আলো
যখন পর্যাপ্ত পথে জীবনের ধনলতা যতকথা জালে ?

একাকী নীরব থাকা ভালো নয়। তাই মনে-মনে চলো জনকোলাহলে
সেখানে কড়ুর গন্ধে মনময় পথ আছে। পথ খোলা আছে
অত্যন্ত আড়াল আর পাঁচিলেরা ভেঙে যায় পুরুষত্ব রক্ত জালে-জালে
ওরাতে যে লাস্যময় যৌনাবয়ব— অন্ধকার নাগরিক স্মৃতিভুলে ছিন্নমূল।
ঘরে সুখ কী যে সুখ না-পেয়ে না-খেটে।

এই ক্ষুব্ধ নীতিহীন পলিত প্রহরাদের বিক্ষিপ্ত জীবনে যারা বাঁচে
জরতী এই জ্যোৎস্নারাতে মন নেই, সুখ নেই ;
চলো অন্ধকারে চলো মনে-মনে ভূমিকম্পে অন্ধকারে আত্মঘাত।
নৃত্যশীল মন্ত্রায় শালে শালবনে চলো যৌবনের উত্তরণ
শিখাহীন অন্ধকারে তিমিরান্ত স্থানিবিড় বেঁচে···
চলো বাঁচি পুনরায় বেঁচে উঠি মথিত-অর্ঘে।

খেয়াঘাটে

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ রুমালের ঢেউ নিবে আসে। দু-হাতে জড়ানো
নবীনরক্তের লাজবেশ।
নিরক্ষর মেঘপটে সূর্যাস্তকালীন অভিমান
ডেকে রেখে দেয়। সেই দিগন্ত অবধি এক অনায়াস সর্পশীলতা
বেঁকে ওঠে।

শুধু সেই দিগন্ত অবধি এক কম্পিত সড়ক বয়ে নিয়ে যায়
আমারই পায়ের রক্তরেখা।
আমার সমস্ত দেহ নিজেকে নিয়ে যায় অনায়াসে,
আমার সমস্ত দেহ নিঃশোষিত করে সে রুমাল

সন্ধল সোনার মুঠে দেয় তারে, আমাকে সে দু-হাতে ঝাঁকায়,
আমার প্রবেশপত্র ছিঁড়ে ফেলে সে আমায় অনচ্ছাত সেই খেয়াঘাটে
কপিশ হাওয়ার মধ্যে রেখে যায়,
বাসনাবিলোল সেই শিরওঠা বুকুবুকু সহস্রশাখি ঘটের চাঁদোয়াতলে এসে
হলুদ সুতোর সাথে সিঁথে রাখে।
সে আমার বুক থেকে কপালের নীলিমা মোচায়,
সে আমার বুক থেকে স্তনমুক্ত ছিনে নিয়ে তার
শিশিরপ্রতিম আয়ু ব্যাপ্ত করে রক্ষিতার ঘরে
মরণ বাপন করে নিতে ডেকে তমসন্ধ্যারাতে।

*

এলেজি : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অনন্ত নক্ষত্র আজ খেলা করে আকাশের বুকে
আমি যেন টের পাই
আমি যেন দেখে যেতে পারি
তোমাদের কঠিন অসুখে
তোমরা ঈশ্বরপত্র পেয়েছিলে কিনা ঠিকঠাক
অনন্ত নক্ষত্র ঘুরে খেলা করে— করে হতবাক্।

ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়— ঐ নক্ষত্রেরা
আমরা তো পৃথিবীর লোক
আমাদের অভিমান হোক
আমাদের হোক রাগদ্বেষ
আমরা মেটাবো একা-একা
অনন্ত নক্ষত্র শুধু খেলা করে— ঘুরে যায় দেখা

তবের সম্ভ্রম ওরা জানে কিনা
ভুল হয় কেবলি ঠিকানা।

ওরাও কি লেখালেখা জানে ?
মিছে কানে কানে
কথা বলে—ওদের সকলে
আমরা কি ইস্কুলের কলে
জল খাই— করি না টীফিন ?
নক্ষত্র—জেনেছে ছাই— পড়ে আছে গাঁথা সেল্‌টিপিন।

ঘুরে ঘুরে
আকাশের বুক খুঁড়ে খুঁড়ে
নক্ষত্র কোদাল হাতে চলে গেছে কে জানে কোথায়
কবে কোন্‌কালে দেখা যায়
ওদের রাজ্যের সব লোক ?
আমাদের অভিমান হোক
আমাদের হোক রাগদ্বেষ
আমরা মেটাবো একা-একা
নক্ষত্রের চেয়ে কিছু বাকি আছে মানুষের লেখা ?
মানুষ তোমারি বাঁশি শুনেছিলো প্রিয় অর্কিউস
তুমি জেনে গেলে সব
তোমার মৃত্যুর পর আমাদের ভুলেভরা টব
দুর্বনের দাগ রেখে আজো তো হাদেই পড়ে আছে
ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে
ভালোবাসা ছিলো খুব কাছে।

তুমি নীলকণ্ঠ চারা পুঁতে দিয়ে বলেছিলে—'একে জল দাও
একে আর বিষণ্ণ রেখো না
আমার মতন এ-ও খুঁজেছে বিছানা।'

'ভালোবাসে
কুকুরের মতো
একে তুমি দিও না বিফল
ভুলোবাসি'

বাংলাদেশে
তোমার প্রত্যাশ পথে এসে
শান্ত হলো—'সতর্কীকরণ'।
কত সুধা দেখেছিলো মন
কত বিষ চেখেছিলো মন
তা সবই অজানে
যতই বিদেশ থেকে আনো
স্বাধীনতা-বোধ কি তা আমি জানি— তুমি যতো জানো।

তুমি আছো দূর— পরপারে
সেখানে কখন ট্রেন যাকে ?
আছে টেলিফোন ?
তোমাদের বাজার কেমন
তোমাদের দোকান কেমন—
রাজধানী ?
কাছা সেই মধের দোকানী ?

তোমারো প্রকৃতি নয় নক্ষত্রের কাছে যায় কথা
যে-বাঁশি বাজাও তুমি
তাকে আরো মূল্যবান করা
হবে কি আমার ?
প্রিয় অর্কিউস, আমার তবেই হলো হার।

*

অন্যমনে

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

অন্যমনে বেসেছিলাম তোমায় ভালো।

ভেবেছিলাম, যেমন ক'রে জানলা থেকে
সন্ধ্যারাতের ছাদে ছুঁয়ে সূর্য দেখে
ফিরে এলে নিবিকার বুকের আলো
চমৎকার জ্বলতে থাকে
তেমন ভালোবাসব তাকে।

ভুল করেছি সূত্রপাতে…
সন্ধ্যারাতের বৃষ্টিপাতে
বৃষ্টি দেখে ভুল ঘটেছে।
এখন দেখি বৃষ্টিপাতে
তোমের ঘোরে, চৈত্ররাতে
গোপন কথা সব রটেছে!

ভুল করেছি তোমের বেলা—
এখন তারা যায়না খেলা।

*

নির্বাসন

শান্তি লাহিড়ী

প্রতিযোগিতায় হেরে হ'লে ক্ষমাহীন
পাশার খেলায় করি অজ্ঞাতবাস।
জানি দক্ষিণ করতল পেতে আছি
জয়ে, অনায়াস পরাজয়। কাকাকাকি
মুখ ভেসে ওঠে, ফুরালো চৈত্রমাস।

ঝিকলা কাচের শিয়রে ঝোপান কাঁকি
বুকে তার অহুভবে,
নিরালা পাখির বাসার আড়াল না কি
খুঁজিয়ে হয়েছে সন্ধ্যামণির টবে ?

আমি সহরের স্রোতোবেগ হবে ম্লান,
ফিরে যেতে হবে, হারানো বাউল গান
সন্ধ্যা তখনো বাকি,
গোধূলির মুখে পরাবলী শুধু ভাসে
কারো ছবি যদি ক্ষীণতর স্রোতে আসে
একাকী শূন্য দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকি !

*

ছুটি কবিতা

অশোক পালিত

১

এ কোথায় নিয়ে এলে, যাদুকর, এ কোন্ শহর
রাস্তায় অরাজকতা, নিরাপদে পথ চলা দায়
পুরোনো দলতন্ত্রটা খসে পড়ে, প্রতিদিন দেখি
শুদ্ধতাকে খেতে দেয় দুর্বিনীত বলো-হরিবোল।

এ কোথায় নিয়ে এলে, জল খেয়ে, পিপাসা মেটে না
নিরুদ্দেশভূমি থেকে সব ট্রেন পরবাসে যায় !

২

লতাপাতায় ভালোবাসায় সংগোপন মন
ঊর্মিলার আকাঙ্ক্ষায় মেঘাবনত চোখে
তাকায় দিন তাকায় রাত সময় বয় ছায়া
দলিতদাস এ পরবাস মেঘলাখানি জলে।

*

অনেকগুলি ছোট কবিতা

উৎপল কুমার বসু

আছে ভয়
মেয়েরা সারলা আর বালুচর যে ভাবে খেলছে
○
আমার ছিল না জানা তাকে পাওয়ার প্রতি
পুরুষের ভালোবাসা হতে পারে
হ'ল তাই
○
চাঁদ দেখে মনে পড়ে কবি লবণাক্ত
○
আজ বৃষ্টি নেই মেঘ নেই রৌদ্র নেই
মাঠে কামানে ঘরেছে
গোলন্দাজ খেলা করে ঐ মাঠে
উড়ে যায় ফুল
মাতাল ঘরেছে
○
যেখানে বালক বসে ছিঁড়ে ফ্যালে নীল দিগন্তের
নক্ষত্রসিন্ধুর লেখা
ওভারে চলে যায় আমাদের বাল্যসখা
টুপিবোনা শিখে নিতে যায়
○
এখন সবার হ'ল বিপ্রহর
এখন ইশারা হ'ল খেলা রই
তোমার নেতৃত্বাধীনে ফাঁকা হ'ল বনপথ
খর নূপুরের শব্দে মহাপুত্তে চলেছে ঘাউল
এবং অপরিণত ঘাটি খুঁড়ে পেয়েছি তোমায়
যেন বা কবর যেনে পেয়েছি মর্মর
○

আগ্রার মতন সহরে
    গিয়েছি প্রাবণ মাসে
গাছে গাছে দেখেছি শকুন
○
কোন তারা ? হায় কর্ণা সম্ভবত
○
প্রাচ্যের কাশার ভিতর
গাঁথা আছে আমাদেরই প্রিয় কবিতার বইগুলি
আমার ব্যক্তিগত নোটবুকে লেগে আছে
        আড়াআড়ি
    ঘোড়ার ঘুষের দাগ
○
লণ্ডনলিয়ায় গিয়েছিলেন কলকাতার শেরিফ
হাসতে হাসতে বলেছিলেন এমন কিছু নয়
○
বুজোয়ের ভালো তুমি সইতে পারো না মোটে
        কেবলই ওদের
মিথ্যে নিয়োগ করো যাহি তাবানোর মত ছক কাজে
○
মুরারী শ্মশানঘাটে পড়ে আছে
এবং তাহার কাছে একটি বালিকা এসে কিরি করে বই
        মুরারীকে নিরক্ষর জ্ঞান করে
○
আমার
স্বপ্নের ভিতর দিয়ে চলে পদ্মাবোট
        আরোহীবিহীন

আমার কথার তোড়

মল্লিকা দাশ

যেচে কথা বোঝানো সম্ভব নয়— কেননা অক্ষম
যন্ত্র-ব্যবহারে তুলি, শিল্পী নই, সহজে ঘরোয়া
ভুলে যায়, শব্দ দিয়ে লক্ষিত করি না আমি শব্দের সভায়।
কবিতা হবার আগে আমার কথার তোড় বেপাড়ায় ছুটে যায় দূর।
সাদা মেঘ বৃষ্টি হ'তে দূরকে সাজাই
জন্মের পর শুধু পীড়িত স্মৃতির মুখ তোমার আদল
যেন উপসাগরীয় কবিদের থেকে
একবিন্দু দ্বীপ দেখা, তোমার দু'চোখ
দূরন্ত ঘাউ-এর বনে ঘালিঙ্কে উড়ে যাওয়া
জোনাকীর মতো।

এক তীব্র বাঙালীর প্রলাপ

মালিনী বসু

"চার পাঁচবার মানুষের মত হয়েছি— হইনি আজ ?
অথচ হজুগে নাচিনি— নেচেছি ?" রাত্রে শেলের জলে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে অক্ষিকোটর কড়িকাঠে রেখে বলে :
দরদস্তুরিকারীর মতন ঘাড় নেড়ে হই রাজী।
দুর্ঘাস্থ্য হ'লে ঘরবাড়ী হাংড়িয়ে খোঁজে প্রেত
পাটল স্বরে—"না। যৌবনী আজও আছে যৌবন,
অধ্যাপনায় আবেগ বিলাই, করি কাব্যালোচনা,
হাওড়া : আলোয় অঞ্চলে আজও 'বেঙ্গলুরু' সংকেত।"
কিন্তু কি যেন রাখতে পারিনি কথা দিয়ে কার কাছে—
থাকতে না পেরে বলি, সন্ধ্যায় কাবুলিওলার ভঙ্গ,

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতে গেলেই নরকে পড়ার ভয়,—
"ভূত তো নেই খুশীর বিশানে। 'বেলভূল' ডাকে বাঁচে
তবু আস্থাও" ব'লে খুব তাড়াতাড়ির আখাসে
মহুয়বেশী সেই কঙ্কাল ঘুমায় আমার পাশে।

*

দুইটি কবিতা

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

এই শতকের

প্রভুত্ব রয়েছে এই ভূমি পরে, নিষ্ঠুর দাবেকি।
আত্মবলতায় চিত্র কোটাও এবার, যেন মেলে
ব্যবচ্ছেদ হতে দূর জীবনচরিতে।
মনে পড়ে, সকলই তোমার দেওয়া ; ঐ মুখখানি
রোদে জলে এখনো মহিমময় হয়ে যায়, কাঁধে
যন্ত্রক আবহমান, এই ছবি ক্রত ভুলে যেতে
আছে বহুতর সমর্পণ, কিন্তু তারও
পিপাসা রয়েছে, ক্ষুধা রয়ে গেছে আর্ত জিজ্ঞাসুলে।
যতোদূর জানো, তা কি বাহুর প্রতাপ ছাড়া কিছু,
যদি পাপ মঠ মন্দিরের অভিধানে ওঠে ফুঁসে—
নিয়ো তবে এই বিংশ শতকের বিজ্ঞপ্তিসূচক
প্রতীকা, পীড়ন, ক্ষীণ যুকের রক্তিমা ;
সিঁড়ি ভেঙে ঊর্ধ্বে-অধে উত্তর দিকের প্রতি দ্বার
বিচিত্রিত শবাধার, শোকহীন, সঙ্গবিহীন।

এইবার এসো

সকলই প্রাতঃস্নাতুর ; হাজার রাজার মাইলের
গতিহীন রাত্রি এক, ঐ তার জানা।
এসো প্রতিবেশ ভুলে, পরার্থপরতা বলো কারে ?
শুভ্রতা লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রে দেয়,
চিত্রপটে লিখি নাম, ফুরায় সকলই।

দেখি একাকার এই রোদে জলে আমার উঠান,
অবলুপ্ত কাননের প্রতিবন্ধকতা আসে ঐ,
বিকালের ছায়া বুনে প্রহর কোটাও,
কিন্তু কেন তারে সুখা বলো, চেতনারহিত, তবু ডাকো ?
স্পর্শ ক'রে আছি জানি, ধকধকানি :
এইবার এসো।

নিদ্রাহীন

রণজিৎ সিংহ

না হে, আমি সুখ চাই না আরাম চাই না
ঘুম চাই না, স্বপ্নও না :
দেখতে চাই আপন সত্তাকে
কঠিন প্রাণময় জাগর।

উদাসীনের পাখির ডাক শুনব
আর কোনো বাসনা নেই।
আমি যেন রাত ফুরোবার আগে জেগে উঠি,
ছুটতে ছুটতে পার হয়ে যাই তেপান্তর।

সূর্যের বলয়ে যেতে চাই।
যা কিছু মোহ ও আবেশ
পুড়ে যাক :
বিনাশ হোক বৈরিয়।
অন্ধের বুকের খাঁচার শুদ্ধ ও স্নিগ্ধ উৎকণ্ঠায়
কালের সোপান ঘষিৎ পায় হয়ে
পৌঁছব সূর্যের ভাস্বরতায়।

ছায়াহীন

শ্রীদিবারঞ্জন মালাকার

ছায়াহীনতায় ভেসেছি নিখর জলে
ছাতরা আলো অবেলায়,
এঘাট-ওঘাট ফিরিয়ে নানান ছলে
ঝাকঝাতে ছাওয়া অকারণ ডেকে যায়।
কেউ দেখে পাল, মেঘের মতন ভাবে
কেউ দেখে ঘরকান্নী
পাটাতন নেই, ভাবে যাবে কি না যাবে
সন্দেহে সোকে ভাবি।

যেন হাতী দেখা গল্পের সেই হাতী
অন্ধতা যাকে পাল্টায় মাতামাতি।

আমি যেন নাম, কুয়াশা জড়ায়ে রাখে :
সার্চলাইট ফেলে ফেলে
পাঁজরের হাড় দেখে যায় অবহেলে
কেউ ঘর থেকে উঠোনের পথে যেতে।

জ্যোৎস্না এবং রোদ্দুর বুকে বেঁধে
তোমায় নিকটে বিকলতা পেতে হয়,
আমুনা আলাদা জ্যোৎস্নার সংশয়
ভেঙায় যাবে না ; রোদ্দুর সেও সেধে
পৃথক করলে তুমি

যেন হাতী দেখা গল্পের সেই হাতী
অন্ধতা যাকে পাল্টায় মাতামাতি।

একটীবারেই বেদনা আমার যাবে
খণ্ডিত হয়ে যাই,
পূর্ণতা আমি ভাসাই নদীর ধারে
যাকে হাতে করে পাই ;
সে আমার নয় বিশ্বরণের পারে
আংশিক ভালবেসে...
অতএব তুমি অঞ্জলিস্নাত নীল
ঘুরে ঘুরে বেঁধে যেয়ো।

*

প্রবার ঘোষ কর্তৃক ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস ৯।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ৩ শাহাবাব মজুঃ লেন, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত।